সূর্যসাক্ষী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার সরকার
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৬০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু
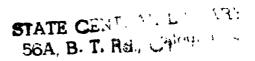
'জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।'

ঘুম ভাঙতেই বাবার মৃদু গম্ভীর কণ্ঠ শুনতে পেল মন্দিরা। তিনি ওদিকের ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছেন আর নিজের মনেই প্রণামমন্ত্র আবৃত্তি করছেন। একটু উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালে বাবাকে দেখতে পাবে মন্দিরা। আজ বোধহয় সূর্য উঠবার আগেই বেড়ানো শেষ করে এসেছেন। তারপর দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। এক্ষুনি মন্দিরাকে ডেকে তুলবেন। পুবদিকের জানালা খোলা। নেটের মশারির ফাঁক দিয়ে বিছানা থেকেই মন্দিরা সূর্যের আভাস দেখতে পাচ্ছে। সত্যি, ভোরের সূর্যকে দেখতে তারও ভারি ভালো লাগে। আবীরের মত রং, সিঁদুরের মত রং। কোন কারণ নেই তবু এই রঙীন সূর্যকে দেখলে মন্দিরার আরো এক-জনের কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর রংও সুন্দর। কিন্তু কোন দিনই সূর্যোদয় তিনি দেখেন না। বেলা আটটা-নটার আগে তাঁর ঘুমই ভাঙে না। ঘুম ভাঙলেও যে তাড়াতাড়ি সূর্য দেখবার জন্যে তিনি ছুটে বেরোবেন তেমন মানুষ তিনি নন। তবু আশ্চর্য, প্রতিদিন ভোর হতেই সূর্য উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কথা মনে পড়ে মন্দিরার। তাঁকে দেখে যেন সূর্য দেখারই আনন্দ পায়। প্রতিদিনের সূর্য যেমন নতুন তাঁর মুখও তেমনি। পুরোন হয়েও পুরোন হয় না—যত পুরোন হয় তত যেন প্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁকে মন্দিরার রোজ দেখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইচ্ছা করলেই সে ইচ্ছা এখন আর মেটাবার জো নেই।

সূর্য : সূর্য কথাটা বেশ লাগে। বাবাও খুব সূর্যভক্ত। তিনি অমনিতে ঠাকুর-দেবতা বেশি মানেন না। অন্তত ঘটা করে পুজো-আর্চা করবার মত শখ তাঁর নেই। সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন না, মন্দির দেখলেই দু'হাত জোড় করে কপালে ছোঁয়ান না। কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। মা তো তাঁকে নাস্তিকই বলেন। তবু আশ্চর্য, মেয়ের নাম তিনি মন্দিরাই রেখেছেন। যদিও অভিধান থেকে নিজের নামের মানে জেনে নিয়েছে মন্দিরা—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। তবু বাবা যে কোণারকের সূর্য মন্দির দেখে এসেই ওই নামটা রেখেছিলেন, একথা সে তাঁর মুখ থেকেই শুনেছে। এখনো আদর করে মাঝে মাঝে ডাকে 'মন্দির'। তিনি একদিন বলেছিলেন 'এই বৈজ্ঞানিক যুগে সূর্যের দেবত্ব গেছে কিন্তু তার তেজ-বীর্য ঔজ্জ্বল্য যায়নি। সূর্য হল পৌরুষের প্রতীক।'

সূর্যের ওপর বাবার এই পক্ষপাতের আরো কারণ আছে। মন্দিরা মনে মনে হাসল। ঠিক মনে নেই, গরীব আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কে যেন বাবাকে বলেছিলেন, আপনি নিজেও এক সূর্য। চাটুজ্যে বংশের গৌরব। বাবা মৃদু হেসেছিলেন। কোন প্রতিবাদ করেননি। কেন করবেন? আজ পাঁচজনের মত তিনি নিজেও সে কথা বিশ্বাস করেন। তাঁর সৌরজগতে বাবাই যে আদিত্য তিনি সে কথা জানেন। ডাক্তারি করে এই বাড়ি বাগান, বিষয় সম্পত্তি সব তিনি একা গড়ে তুলেছেন। কী ভালোই না লাগে অমন একজন পুরুষের মেয়ে হতে। কথায় কথায় লোকের মুখে শুনতে, 'তুমি তো বড়লোকের মেয়ে। তোমার সঙ্গে কার তুলনা।' শুনতে কি ভালোই না লাগে। তেমনি আরো একজন পুরুষের সঙ্গও ভালো লাগে মন্দিরার। তিনি নিশ্চয়ই বাবার মত বড় নন, বাবার মত বুড়োও নন। তবু তাঁরও গুণ আছে। অনেক গুণ আর রূপ। অমন রূপ মন্দিরা কারোরই আর দেখেনি। তাঁর আদর, তাঁর ভালোবাসা পেতে কার না ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে সে কী-ই বা আর পাবে। মন্দিরা পাশ ফিরল। বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল। দীর্ঘশ্বাস চাপল মন্দিরা। আর সেই মৃদু একটু শ্বাসের বাষ্পে ভোরের সূর্য যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সারা আকাশ এখন অন্ধকার। সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে পাশ-বালিশটা বুকে চেপে পড়ে রইল মন্দিরা। কিন্তু চোখ বুজবার সঙ্গে সঙ্গে আবীরের রঙে, সিঁদুরের রঙে আর এক সূর্য উঠে এল। সেই চিরপরিচিত স্মিত সুন্দর মুখ। সে মুখে ভাষা নেই। কিন্তু হাসিতে নিশ্চয়তা আর গভীর আশ্বাস—'তোমার অত ভয় কিসের। আমার কাছ থেকে কে তোমাকে কেড়ে নেবে। কার তেমন সাধ্য আছে।'

'আচ্ছা টুকু, তুই ভেবেছিস কি বল দেখি?' নিজের ইচ্ছামত খুশিমত যে স্বপ্নের জাল বুনে চলেছিল মন্দিরা তা ছিঁড়ে গেল।

কিন্তু মায়ের ডাকে সে সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিল না। ঘুমের ভান করে পড়ে রইল।

ইন্দ্রাণী মশারিটা তুলে ফেললেন। তারপর মেয়ের গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন, 'আজ কি আর উঠবি নে! বেলা কতখানি হল দেখ তো। উনি রাগারাগি শুরু করে দিয়েছেন।'

মন্দিরা চোখ মেলে মায়ের দিকে তাকাল, 'উঠছি মা।'

ইন্দ্রাণী সস্নেহে বললেন, 'হ্যাঁ, ওঠ এবার। লক্ষ্মী মা। বেশ বেলা হয়ে গেছে।'

মেয়েকে তাড়া দিয়ে ইন্দ্রাণী পাশের ঘরে গেলেন। মন্দিরা মাথা তুলে একটু দেখল। তারপর আবার শুয়ে পড়ল। মায়ের মুখে অমন আদরের মা ডাক শুনতে বেশ লাগে। বাবার মুখেও। বাবা অবশ্য অমন ঘন ঘন মা মা করেন না। কিন্তু যখন ডাকেন, যখন আদর করেন সে এক দর্শনীয় ব্যাপার

হয়ে ওঠে। এই সেদিন পর্যন্ত বাবা তাকে বুকে চেপে ধরেছেন, গালে দাড়ি ঘষে দিয়েছেন। আজকাল আর তা পারেন না। মন্দিরা অনেক বড় হয়ে গেছে। যেমনি মাথায় তেমনি মনে। মনে মনে যে কত বড় হয়েছে তা বাবাও জানেন না, মাও জানেন না। তাঁরা শুধু জানেন মন্দিরা কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়ে— বই-খাতা নিয়ে কখনো বাড়ির গাড়িতে, কখনো বাসে কলেজে যায় আসে আর ছন্দা নন্দার সঙ্গে খুঁটি-নাটি নিয়ে ঝগড়া করে। এর চেয়ে বেশি কিছু ওঁরা জানেন না। মন্দিরা ওঁদের জানতে দিতেও চায় না। না জানানোতেই আনন্দ বেশি। বাড়ির কাউকে না জানিয়ে, কাউকে বুঝতে না দিয়ে সবাইর অসাক্ষাতে বড় হয়ে ওঠার মত মজা আর কিছুতে আছে নাকি? লুকোচুরির মত আনন্দ জীবনে আর কিছুতে নেই। আজ নয়, অনেক দিন আগে থেকেই মন্দিরা এই আনন্দের স্বাদ পেয়েছে। সেই স্কুলের সেকেন্ড ক্লাস থেকে। যখন সে ফ্রক পরত তখনো। ঠাকুরমা কথায় কথায় বলতেন, চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী। কিন্তু কী মজা, জীবনের অনেক ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী রাখতে হয় না। রোদের আলো যেমন আছে, তেমনি আড়াল বলেও একটা বস্তু আছে। অবশ্য এ বাড়ির মেয়েরা এতকাল আড়ালেই থেকে এসেছে। সূর্য শুধু এ বাড়ির ছেলেদের জন্যে, মেয়েরা অসূর্যম্পশ্যা। অন্তত দাদু আর ঠাকুরদার আমল পর্যন্ত তাই ছিল। অসূর্যম্পশ্যা। বাব্বা, কত বড় শক্ত একটা কথা। অল্পবয়সে বানান করা যেমন কঠিন, বড় হয়ে সহ্য করাও তেমনি শক্ত। এ বাড়িতে মেয়েদের বেলায় ভারি কড়াকড়ি। পিসীদের কত অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে গেছে। দিদিরও তাই। আহা বেচারা। স্কুলের গণ্ডি পর্যন্ত পেরোতে পারল না, তার আগেই বিয়ে। আর সতের বছর পেরোতে না পেরোতেই কোলে দুটি বাচ্চা। মন্দিরার যদি অমন হতো। মাগো! ছি ছি ও কথা ভাবতেই পারে না মন্দিরা। ভাববার দরকার হয়নি। সে নির্বিবাদে সতের পার হয়ে এসেছে। কোন দুর্ঘটনাই ঘটেনি। মন্দিরাই এ বাড়ির প্রথম মেয়ে যে অসূর্যম্পশ্যা হয়ে থাকেনি। আচ্ছা, সূর্য মানে কি পুরুষ? যাঃ। যে কোন সূর্যই আর পুরুষ নয়। মন্দিরা যাঁকে দেখেছে, যাঁকে চিনেছে তিনি সূর্যেরই মত। যদিও নামটা সূর্যের নামে নয়। সূর্যের কত নাম আছে কিন্তু সে সব নামের একটিও তাঁর নয়। বরং উল্টো। তাঁর চাঁদের নামে নাম। শশাঙ্ক। প্রথম প্রথম কী বিশ্রী কী পুরোনই না মনে হতো নামটা। এখন আর তা হয় না। এখন কানে সয়ে গেছে। শুধু সয়ে গেছে নয়, এখন মনে হয় ও-নাম ছাড়া শশাঙ্কদার আর কোন নামই হতে পারত না। নামের সঙ্গে মানুষটি যেন একেবারে মিশে আছে। নামটি উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষটির আকৃতি, শুধু আকৃতি নয়, প্রকৃতিসুদ্ধ যেন মন্দিরার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। তবু ও-নামে তাঁকে বড় একটা ডাকে না মন্দিরা। যে নামে তাঁর নাম-ডাক সে নাম মন্দিরার জন্যে নয়। যে নাম অনেকের মুখে মুখে ফেরে সে নাম মন্দিরার জন্যে নয়। মন্দিরা বরং

তাঁর নামের লুপ্ত অংশটুকু গুপ্ত অংশটুকু নিজের জন্যে বেছে নিয়েছে—শেখর। বেশ আধুনিক বেশ নতুন আর বেশ সুগোপন। শেখর মানে উচ্চ চূড়া। নির্জন নিবিড় গিরিশৃঙ্গ। তিনি প্রথম দিন শুনে হেসে বলেছিলেন, 'ও আবার কি! আমি তো অনেক দিন এই মধ্যপদ লোপ করে ফেলেছি।' মন্দিরা বলেছিল, 'আপনি যা ফেলে দিয়েছেন সেইটুকু আমার।' তিনি একটু হেসে বলেছিলেন, 'বেশ তাই হবে। তবে সবার সামনে কিন্তু নয়।' মন্দিরাও তো তাই চায়। তাঁকে সবাইর সামনে নিজের দেওয়া নাম ধরে ডাকতে চায় না। সবাইর সামনে যেভাবে চায়, সবাইর আড়ালে সেভাবে চায় না। তিনিও তা চান না। কী সুন্দর, কী মধুর—দুজনের একই সঙ্গে এই গোপনে গোপনে চাওয়া। পাওয়াটা বড় কথা নয়, দুজনের একই সঙ্গে এই পেতে চাওয়াটাই যথেষ্ট। কী সুন্দর, কী মধুর—আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাইর চোখের আড়ালে আর একটি গোপন সম্পর্ক গড়ে তোলা। যা কেউ জানে না, কেউ জানবে না, কেউ কখনো ভাবতেও পারবে না—

'এই মেজদি, উঠলি না। এবার কিন্তু বাবা এসে তোর ঝুঁটি ধরে টেনে তুলবেন।'

মন্দিরা হাত বাড়িয়ে ছোট বোনের বিনুনিটা টেনে ধরে হেসে বলল, 'তাই নাকি!'

ছন্দা বলল, 'উঃ ছাড়। লাগছে।'

মন্দিরা আস্তে আস্তে ওর চুল ছেড়ে দিল। এই তের-চৌদ্দ বছর বয়সেই বেশ সুন্দরী হয়ে উঠেছে ছন্দা। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। মাথায় একরাশ চুল। যেভাবে বাড়ছে কালে কালে বোধ হয় সেকেলে উপন্যাসের ভাষায় 'আগুলফ লম্বিত' হবে। লম্বাটে ডোল মুখের। তুলতুলে সিঁদুরে ঠোঁট। গায়ের রঙ মাজা গৌর। মন্দিরা ওর মত অত সুন্দরী নয় তা সে জানে। অবশ্য কুরূপাও কেউ তাকে বলবে না। তবু মনে হয় আরো সুন্দরী হলে বেশ হতো। আরো বেশি আদর পেত। কিন্তু বেশি সুন্দরী না হয়েও কি কিছু কম আদর পাচ্ছে নাকি মন্দিরা? বিশেষ করে একজনের কাছে? আর তাঁর কাছে আদর পেলে অন্য কারো কাছে কিছু পাওয়ার কি দরকার থাকে? তাঁর কাছে অনেক পেয়েছে অনেক পাচ্ছে মন্দিরা। ওই ছন্দার বয়স থেকেই পাচ্ছে। তখন মন্দিরাও ফ্রক পরত। শাড়ি ক্বচিৎ কখনো। উৎসব অনুষ্ঠানের দিনে। কী বুঝত, কতটুকুই বা বুঝত তখন। শুধু এইটুকু বুঝত—তাকে শশাঙ্কদার খুব ভালো লাগে। আর তাঁকে একটি দিন না দেখতে পেলে মন্দিরার কিছু ভালো লাগে না।

'এই মেজদি, উঠে পড় এবার। আর জেগে জেগে ঘুমোসনে।' ছন্দা দিদির হাত ধরে ফের এক টান দিল। ওকে তুলে না দিয়ে ছন্দা কিছুতেই ছাড়বে না। কিছুতেই যাবে না এঘর থেকে।

মন্দিরাকে এবার উঠতে হল। খাট থেকে নেমে দাঁড়াল মন্দিরা। মার ঘরের

মত এ ঘরেও আয়না-বসানো একটি স্টীলের আলমারি আছে। সেই আয়নায় মন্দিরা নিজের প্রতিচ্ছবিটুকু আর একবার দেখে নিল। শুধু একবার কেন, দিনের মধ্যে অনেকবার নিজেকে দেখে মন্দিরা। নিজেকে দেখতে তার ভালো লাগে। কলেজের বন্ধু মীনাক্ষী বলে, 'তুই এক মেয়ে নার্সিসাস। তুই নিজেই নিজের প্রেমে পড়েছিস।'

কথাটা মিথ্যে নয়। প্রেমে যখন মানুষ পড়ে—গোটা এই জগৎটাই যেন প্রেমের পাত্র হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে নিজেও। মন্দিরার এই দেহের আধার তো জগৎ ছাড়া নয়। ভারি মধুর শব্দ এই আধার। এই দেহ কিসের আধার কে জানে? মন্দিরা শুধু জানে তা ভালোবাসার আধার। অফুরন্ত বাসনার আধার। নিজের এই দেহটিকে একটি পরম সুন্দর পানপাত্রের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা করে মন্দিরার। যদিও সে অত সুন্দর নয়। কিন্তু মনে মনে ভাবতে বাধা কি। পরম সুন্দর একটি পানপাত্র হতে ইচ্ছা করে আর সেই পাত্রটিকে পরম যত্নে পরম প্রিয়জনের হাতে তুলে দিতে ইচ্ছা করে মন্দিরার। 'হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ—কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।' তার দেবতা এই দেহাধারে অমৃত পান করুক। এই দুটি লাইন গুনগুন করে তাঁর কাছে একদিন আবৃত্তি করেছিল মন্দিরা। গান নয়, শুধু আবৃত্তি। তিনি তাতেই খুশী। মন্দিরার গলায় তো সুর নেই। শশাঙ্কদা বলেছিলেন, 'কে বলে নেই। তোমার কথাই তোমার গান।' কী মিথ্যে কথাই বলতে পারেন শশাঙ্কদা। তবু সেই মিথ্যেটা সত্যের চেয়েও মধুর হয়ে ওঠে। তিনি নিজেও এক মূর্তিমান অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। তবু তাঁর প্রতিটি উক্তি কী সুন্দর। তাঁর প্রতিটি স্তুতি মন্দিরাকে অপ্রস্তুত করে আর সেই সঙ্গে সহস্রবার অপ্রস্তুত হবার আকাঙ্ক্ষা জাগায়।

'এবার চলে আয় মেজদি। নিজের রূপ আর কত দেখবি। দেখে দেখে যে মুখস্থ করে ফেললি।'

মন্দিরা হেসে ছোট বোনের দিকে মুখ ফেরাল। 'ফাজিল কোথাকার। আয় তোকে আমি মুখস্থ করাই।'

হাত বাড়িয়ে ওকে ধরতে যাচ্ছিল মন্দিরা, কিন্তু ছন্দা এক লাফে ছুটে পালাল। উল্লম্ফনে কোন ছন্দ আছে কি নেই তা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত বয়স এখনো ওর হয়নি।

বেশ দীর্ঘাঙ্গী মন্দিরা। দীর্ঘ, তাই বলে ছিপছিপে বেতের মত নয়। বেশ একটু শক্ত ধরনের গড়ন। ছন্দার মত অত লালিত্য অত লাবণ্য তার নেই। শশাঙ্কদা বলেন, 'এই ভালো। ললিত লবঙ্গলতা আমি পছন্দ করিনে। একটি টোকা দিলে মুষড়ে পড়ে, একটু তাপ লাগলেই শুকিয়ে যায়, তেমন লতায় আমার দরকার নেই। বরং যে দু' এক ঘা সইতে পারে, দরকার হলে দিতেও পারে—'

কিন্তু সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি সেই ধরনের শক্তিমতী, তেজস্বিনী মেয়েকে পুরুষরা পছন্দ করে? মন্দিরার বিশ্বাস হতে চায় না। পুরুষরা এক ধরনের মেয়েকেই শুধু পছন্দ করে, যে ষোল আনা মেয়েলি মেয়ে, যে দেহে মনে পুরোপুরি মাখনের ডেলা। মুখে যাই বলুন শশাঙ্কদা, তাঁর ধরন-ধারণ দেখে তাই কিন্তু মনে হয় মন্দিরার। সেই জন্যেই কি সে যতখানি কোমল নয় তার চেয়ে বেশি কোমলা সেজে থাকে? দেহে মনে সত্যিই একটি নমনীয় লতা হয়ে যেতে তার সাধ যায়? না, ইচ্ছা করে নরম হয় না মন্দিরা। শশাঙ্কদার চোখের দৃষ্টি, মুখের কথা, হাতের আদর তাকে অমনিই গলিয়ে দেয়। মন্দিরা বুঝতে পারে না কেন এমন হয়। ইচ্ছা করে নয় বরং ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে কেন অমন অন্য রকম হয়ে পড়ে।

'টুকু, হল তোর?'

পাশের ঘর থেকে ইন্দ্রাণী ফের তাড়া লাগালেন।

মন্দিরা সাড়া দিয়ে বলল, 'যাই মা।'

তারপর তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকল। মুখ হাত ধুয়ে শাড়ি বদলে চায়ের টেবিলে এসে বসতে তার দশ-বারো মিনিটের বেশি লাগল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে যেমন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাবতেও পারে তেমনি দরকার হলে ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়তেও পারে।

ডাইনিং রুম নিচে। কিন্তু দোতলার খোলা বারান্দায় বাড়ির সবাইকে নিয়ে মাঝে মাঝে চা খেতে বাবা ভালোবাসেন। সকালের চা তিনি সবাইর সঙ্গে খাবেন এই তাঁর বিলাস। মন্দিরার অবশ্য এক সঙ্গে চা খেতে ভালোই লাগে। কিন্তু তার জন্যে অত ভোরে রোজ যে সাত-তাড়াতাড়ি উঠতে হয় তা তার ভালো লাগে না। ঘুম অবশ্য কোন কোনদিন আগেই ভেঙে যায় মন্দিরার; না ভাঙলে বাবার সূর্যস্তব সে শুনতে পায় কী করে? কিন্তু ঘুম ভাঙলেই কি আর সঙ্গে সঙ্গে উঠতে ইচ্ছা করে? বাবা তো জানেন না, ঘুম ভাঙবার পরেও শুয়ে শুয়ে ভাবতে কী ভালো লাগে। ভেঙে যাওয়া স্বপ্নকে ফের জুড়ে জুড়ে যেতে, নিজের ইচ্ছামত নতুন এক স্বপ্নের রাজ্য গড়ে তুলতে কী যে আনন্দ লাগে, বাবা তো তা জানেন না। আচ্ছা, বাবা কি স্বপ্ন দেখেন না? নিশ্চয়ই দেখেন। দিনরাত তাঁর এই স্বপ্নই আছে। কী করে আরো খ্যাতি হবে প্রতিপত্তি হবে সেই স্বপ্ন। নিজে একটা নার্সিং হোম গড়ে তুলবেন সে স্বপ্নও বোধ হয় মাঝে মাঝে দেখেন।

টেবিলে ছন্দা নন্দা পাশাপাশি বসেছে। মা ওদের উল্টোদিকে।

বাবার মুখোমুখিই বসতে হল মন্দিরাকে। ঠিক ওঁর সামনে বসতে সে চাইছিল না। আজকাল ওঁর সামনে বসতে কেমন যেন একটু সঙ্কোচ লাগে। বাবা এক এক সময় তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন দেখতে চান। ভারি অস্বস্তি লাগে মন্দিরার।

শুকলাল ট্রেতে করে চায়ের কেটলি আর খাবার নিয়ে এল। ডিম সিদ্ধ, রুটি-মাখন, মর্তমান কলা। আর দু' গ্লাস দুধ।

ইন্দ্রাণী দুধের গ্লাস ছন্দা আর নন্দার দিকে এগিয়ে দিতেই নন্দা বলল, 'আমি কিন্তু আজ আর দুধ খাব না মা। চা খাব।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'চা কি ভালো? দুধ খেলে কত উপকার হয়।'

নন্দা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'আমি উপকার চাইনে, আমার সঙ্গে যারা পড়ে তারা সবাই চা খায়।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'দুধ যারা জোটাতে পারে না তারাই চা খায়। আরো বড় হও তখন চা খেয়ো।'

নন্দা বলল, 'কালই তো বলছিলে মা, নয় উতরে দশে পড়লি, কত বড় হয়ে গেলি, এখনো বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু হল না? চা দেওয়ার সময় বুঝি সে কথা মনে থাকে না? চা খাইনে বলেই তো বুদ্ধিশুদ্ধি হয় না।'

ইন্দ্রাণী হেসে স্বামীর দিকে তাকালেন. 'কথা শোন তোমার মেয়ের।'

যোগরঞ্জন এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। একটু যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের এই সংসারটিকে দেখছিলেন। যেন গৃহী নন, গৃহস্বামী নন। যেন অতিথি।

স্ত্রীর কথায় একটু হেসে বললেন, 'তোমার কোন মেয়েকে রেখে কোন মেয়ের কথা শুনব? সবাই তো এক একটি লেডী বক্তিয়ার খিলিজী।'

ছন্দা প্রতিবাদ করে উঠল, 'সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও জড়াচ্ছ যে বাবা? আমি কি নন্দার মত? এসে অবধি একটা কথা বলেছি? দুধ খাব না দুধ খাব না বলে নন্দার মত মাতলামি শুরু করে দিয়েছি?'

মন্দিরা বলল, 'না, তুমি এখন একেবারে দুধের মেয়ে।'

যোগরঞ্জন আর ইন্দ্রাণী দুজনেই ছন্দার দিকে চেয়ে হাসলেন।

ছন্দার ভারি অপমান বোধ হল। মন্দিরার দিকে তাকিয়ে রুষ্টভাবে বলল, 'আমাকে ঘাটিয়ো না মেজদি। আমি তো তোমার কিছু করিনি। কেন আমার পেছনে লেগেছ। আমি যদি এখন তোমার সব কথা বলে দিই—'

মন্দিরা ভয়ে ভয়ে বলল, 'কী বলবি শুনি? কী বলবার আছে তোর?'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'এই আরম্ভ হল শরিকী বিবাদ। রাতদিন এই চলবে—'

ছন্দা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই চুপ করে গেল। শান্তভাবে দুধের গ্লাসে চুমুক দিল। মেজদির যে সব কথা সে জানে, তা যে এখনই বলে দেওয়া ঠিক হবে না সে বোধটুকু তার আছে। ওকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়েই জব্দ রাখতে হবে।

মন্দিরা লক্ষ্য করল, খেতে খেতে বাবা আবার তার দিকে তাকিয়েছেন। তাকে দেখছেন। কী দেখছেন কে জানে! কী অনুমান করছেন কে জানে। চায়ের টেবিলেও বাবা যেন বিচারকের আসনে বসেছেন। স্বাস্থ্যবান দীর্ঘকায় পুরুষ। পঞ্চাশ পেরোলে কি হবে, এখনো শরীরের কোথাও একটু টোল খায়নি, একটিও দাঁত পড়েনি। চুল দু একগাছি যা পাকে ছন্দা নন্দারা তা

তুলে দেয়। কখনো বা শুকলালও তোলে। তার নিজের মাথার সব চুল পাকা। বাবার অনেকদিনের পুরোন পেয়ারের চাকর। ওকে বোধ হয় মার চেয়েও বেশি বিশ্বাস করেন বাবা। বাবার পরনে এখন খাটো ধুতি, গায়ে ফতুয়া। ভিতর দিয়ে পৈতাটি। বাবা অমনিতে অনেক কিছুই মানেন না। কিন্তু পৈতাটি মানেন। মন্দিরার জামাইবাবু, জেঠতুতো খুড়তুতো ভাইয়েরা কিন্তু মানে না। তারা কবে কোথায় ওইসব পৈতা-টৈতা ছিঁড়ে ফেলেছে কে জানে। সেই সঙ্গে আরো অনেক সংস্কারও তারা ঝেড়ে ফেলেছে। বাবা ওদের মত আধুনিক নন। কী করে হবেন? কিন্তু যদি হতেন কী ভালোই না হতো।

'আজও তোমার উঠতে বেশ দেরি হল টুকু।'

যোগরঞ্জনের গলা শান্ত কিন্তু গম্ভীর।

তবু মন্দিরা একটু নিশ্চিন্ত হল। বাবা তার আর কোন দোষ আবিষ্কার করেননি। সেই পুরোন দোষের কথাই তুলেছেন। তিনি যেভাবে মন্দিরার দিকে তাকাচ্ছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল না জানি আরো কী বলবেন।

মন্দিরা কোন জবাব না দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল।

মেয়ের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে যোগরঞ্জন আরো একটু বিরক্ত হলেন; বললেন, 'এত বলা সত্ত্বেও তোমার অভ্যেস আর কিছুতে ফিরল না।'

মন্দিরা এবারও কোন জবাব দিল না। কিন্তু সে যে ভিতরে ভিতরে অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে তা বোঝা গেল।

ইন্দ্রাণী এবার মেয়ের পক্ষ নিলেন, 'কেন অমন করছ। টুকু আজ এমন কিছু দেরি করে ওঠেনি। সবাই যে তোমার মত রাত থাকতে উঠে—'

একটু হাসলেন ইন্দ্রাণী।

কিন্তু যোগরঞ্জন হাসলেন না। বললেন, 'কেন মিছিমিছি মেয়ের দোষ ঢাকতে চেষ্টা করছ। যে সব অভ্যেস ভালো তা ওদের চিরকাল শিখিয়ে যেতে হবে। না শেখালে ওরা শিখবে কী করে।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'বেশ তো, শেখাও না। শেখাতে পারলে তো ভালোই।'

যোগরঞ্জন বললেন, 'আমি ইচ্ছে করলে ঠিকই শেখাতে পারি। কিন্তু দুজনের শিক্ষা যদি দুরকম হয়—'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'তার মানে? দুজনের শিক্ষা দুরকম কোথায় দেখলে তুমি? আমি কি ওকে বেলা করে উঠতে বলি?—ও কি টুকু, ডিমটা আবার ঠেলে রাখলি কেন, খেয়ে নে। আর জ্বালাসনে বাপু। সব সময় তোদের জ্বালাতন আর ভালো লাগে না।'

মন্দিরা বলল, 'খেতে ইচ্ছা করছে না মা।'

ছন্দা নন্দা ততক্ষণে ডিম আর মাখন টোস্ট খেতে শুরু করেছে। এক ফাঁকে চোখের ইশারায় দিদিকে শিখিয়ে দিল ছন্দা, 'খেয়ে নে।'

যোগরঞ্জন সেদিকে একটু তাকিয়ে থেকে গলা চড়িয়ে বললেন, 'খাও, খেয়ে নাও।'

মন্দিরা আর কিছু না বলে খাবারের প্লেটটা ফের কাছে টেনে নিল। চামচ দিয়ে ডিমটাকে কুচি কুচি করে কাটল মন্দিরা। কিন্তু একটুকরোও মুখে তুলল না।'

যোগরঞ্জন সেদিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'টুকু, আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু কারো অবাধ্যতা, একগুঁয়েমি আমার সহ্য হয় না।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'খেতে বসেছে, খেতে দাও। অতবড় মেয়েকে যখন তখন যদি শাসন কর ওরই বা ভালো লাগবে কেন।'

যোগরঞ্জন চটে উঠলেন, 'কী শাসন করি শুনি। ভোরে উঠতে বলি সে ওদের শরীর ভালো হবে বলে। পড়াশুনো করতে বলি, ক্যারিয়ার যাতে ভালো হয় সেই জন্যে। বাজে বই পড়তে নিষেধ করি, তাতে সুশিক্ষা কিছু হয় না, কুশিক্ষা বাড়ে। আর কোন শাসন করি? হ্যাঁ, যেখানে-সেখানে যাওয়া, যার-তার সঙ্গে কথা বলা আমি পছন্দ করিনে। এখন ও বড় হয়েছে, সংসারের রীতিনীতি আদব-কায়দা বুঝতে পারার মত যথেষ্ট বয়স হয়েছে ওর।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'তা তো হয়েইছে। তাই এখন থেকে কিছু কিছু ওদের ওপরও ছেড়ে দাও। ওদেরও একটু বিশ্বাস করতে শেখো। তাছাড়া আমি তো আছি। আমি মরে গেলে তুমি এসব শেখাবার ভার নিয়ো। একই সঙ্গে বাবা মা দুইই হয়ো।'

যোগরঞ্জন গম্ভীরভাবে চুপ করে রইলেন। একটু বাদে চা আর খাবার শেষ করে উঠে পড়লেন।

সিঁড়িতে ওঁর পায়ের শব্দ শোনা গেল। নীচে গিয়ে এবার তিনি খবরের কাগজে একটু চোখ বুলিয়ে নেবেন, তারপর স্নান সেরে কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়বেন। একেবারে ঘড়ির কাঁটার মত জীবন। সবাইকে সেই একই কাঁটায় বিঁধে রাখতে চান।

মন্দিরা এবার মুখ তুলে বলল, 'আচ্ছা মা, কেনই বা তোমরা আমাকে ভোর হতে না হতে খাবি আয় খাবি আয় বলে চায়ের টেবিলে ডেকে আনো, আর আসতে না আসতে কেনই বা এসব শুরু হয় বল তো?'

ছন্দা হেসে দুই ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, 'চুপ মেজদি, চুপ। বাবা কিন্তু এখনো নেমে যাননি। শুনতে পেলে—'

নন্দা একবার বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে কী যেন দেখল, তারপর হেসে বলল, 'না রে মেজদি। ছোড়দি তোকে ভয় দেখাচ্ছে। বাবা কখন নেমে গেছে। তুই এখন যা খুশি তাই বল না। বাবা কিচ্ছু শুনতে পাবে না।'

ছোট বোনের কথার ভঙ্গি দেখে মন্দিরা হেসে ফেলল, 'যাক তোর আর পরামর্শ দিতে হবে না। আচ্ছা বুড়ী হয়েছিস একখানা। তোমাকে বলে

রাখছি মা, এরপর থেকে আমার চা আর খাবার আমার পড়ার টেবিলে পাঠিয়ে দিয়ো। আমি সেখানেই সব খেয়ে নেব। এ তো চা খেতে আসা নয়, কুইনাইন মিকশ্চার খেতে আসা। সকাল থেকে এই যে মর্নিং ডোজ শুরু হয়—।'

ছন্দা গম্ভীরভাবে বলল, 'সব বলে দেব।'

মন্দিরা বিরক্ত হয়ে বলল, 'ছন্দা কী ইয়ার্কি দিতেই শিখেছে, দেখেছ মা? আদর পেয়ে পেয়ে ও একেবারে মাথায় উঠে বসেছে। ওকে একটু শাসন-টাসন করো তো।'

'শাসন যে কাকে করা উচিত তা বাবা বলে দিয়ে গেছেন।'

'আঃ ছন্দা, কী হচ্ছে এসব? যাও যে যার পড়তে বসো গিয়ে, যাও। নন্দা, তুমিও যাও। আর গল্প করো না।'

ইন্দ্রাণী মেয়েদের তাড়া দিলেন।

ছন্দা বলল, 'মেজদি বুঝি যাবে না? ও বুঝি না পড়েই পণ্ডিত হবে?'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'তোর চেয়ে তো বেশি লেখাপড়া শিখেছে ঠিকই।'

ছন্দা বলল, 'সে আমার চেয়ে চার বছর আগে জন্মেছে বলে। আমি যদি মেজদি হয়ে জন্মাতাম ওর চেয়ে দ্বিগুণ লেখাপড়া শিখে ফেলতে পারতাম তা জানো?'

মন্দিরা বলল, 'তা আর নয়। তুই ঠিক বড়দির মত গিন্নীবান্নী হতিস। বিয়েটিয়ে হয়ে যেত—'

ছন্দা বলল, 'তা তো হতোই। আমি কি তোর মত বোকা? কেউ বিয়ে দিতে চাইলেই রাজি হয়ে যেতাম। তারপর রাশ রাশ শাড়ি পরতাম, গয়না পরতাম—'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'শাড়ি গয়না দুদিন পরে পরিস বাপু। এখন দুদণ্ড মন দিয়ে স্কুলের পড়াটা পড়ে নে। দিনে দিনে একেবারে কথার ফুলঝুরি হচ্ছিস।'

ছোট দুটিকে তুলে দিয়ে এবার মন্দিরার দিকে তাকালেন ইন্দ্রাণী। তার পিঠে হাত রেখে সস্নেহে বললেন, 'যা মা। এবার পড়তে-টরতে বোস গিয়ে। উনি একটু কিছু বললেই যদি অমন মুখ কালো করে থাকিস তবে কি আর ভালো লাগে—তাই বল? তাছাড়া উনি যা বলেন তা তো তোর ভালোর জন্যেই বলেন। এ কথা বুঝবার মত বয়স তো তোর হয়েছে।'

মন্দিরা বলল, 'তোমরা আমার ভালো চাও না তা কি আমি কখনো বলেছি মা?'

ইন্দ্রাণী চুপ করে মেয়ের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে ভিতরে চলে গেলেন।

মন্দিরা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই উঠল না। আরো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বাড়ি তো নয় যেন এক দুর্গ। চারদিকে যেমন উঁচু দেয়াল, দেয়ালের ওপারে নারকেল গাছের সারি, আমজামের বাগান। বাবা ইচ্ছা করেই যেন এক

জনমানবহীন দ্বীপে তাঁর এই দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরী করেছেন। পাছে কোন সুর্ব এসে হানা দেয়। দ্বীপ ছাড়া কি! কলকাতার এত কাছে, তবু যেন মনে হয় শহর থেকে অনেক—অনেক দূরে তারা এক নির্বাসনের জীবন কাটাচ্ছে। নামটাও কি অদ্ভুত। বেদিয়াডাঙা। এত ভালো ভালো জায়গা থাকতে এই বেদিয়াডাঙায় বাবা কেন এলেন তিনিই জানেন। হয়তো সস্তায় অনেক জায়গা জমি পাবেন বলে। জমির ওপর ভারি লোভ বাবার, ভারি লোভ। পূর্ব-পুরুষের সেই জমিদারির কথা ভুলতে পারেননি। জমির নেশা যেন ওঁর রক্তে। বাবা বলেন, 'জমি থাকলে তাতে অনেক কিছু গড়ে তোলা যায়। কিন্তু না থাকলে শুধু শূন্যে সৌধ তুলেই খুশি থাকতে হয়।'

কিন্তু তাই বলে এমন জায়গায় কেন এলেন বাবা? এমন বনবাদাড় আর খানাখন্দ ভরা এই বেদিয়াডাঙায়? এমন জায়গায় বেদেরাই তাঁবু ফেলে বাস করে, কোন ভদ্রলোক পাকাপাকিভাবে বাড়িঘর গড়ে তোলেন না। প্রথম প্রথম মারও তেমন জায়গাটা পছন্দ হয়নি। বলেছেন, ওই ঝোপঝাড়ের মধ্যে কর গিয়ে তোমার বাড়ি। তোমার ওই খানাখন্দের মধ্যে কে গিয়ে থাকে আমি দেখব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মা-ই আগে এসেছেন। বাড়ি গুছিয়েছেন, ঘর-সংসার গুছিয়েছেন। একেবারে আদর্শ গৃহিণী। এখন মার বোধ হয় ধারণা এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারত না। আর বাবা যা করেন ভালোর জন্যেই করেন এই বিশ্বাসের সৌধ মার মনে বাবা বেশ নির্মাণ করতে পেরেছেন। প্রায় সব ব্যাপারে বাবা যা বলেন, মাও শেষ পর্যন্ত সেই কথাই বলেন। মা যেন বাবার প্রতিটি কথার প্রতিধ্বনি।

'কী দিদিমণি, বসে বসে কী ভাবা হচ্ছে শুনি? পড়া-টড়া নেই?'

টেবিল পরিষ্কার করে নিতে এসেছে শুকলাল। মন্দিরাকে সেও পড়ার তাগিদ দেয়। বাবার পরে ওই যেন এ-বাড়ির কর্তা। দিদিমণি কথাটা একটু ঠাট্টার সুরে বলে। আসলে নাম ধরে ডাকে। ডাকবে না কেন? হতে দেখেছে তাকে শুকলাল।

'কলেজ নেই? কলেজে যেতে হবে না?'

মন্দিরা বলল, 'হবে বইকি।'

'কিসে যাবে? যদি তাড়াতাড়ি না বেরোতে পারো ডাক্তারবাবুর গাড়ি আর পাচ্ছ না।'

মন্দিরা বলল, 'ভারি ভয় দেখাচ্ছ। বাবার গাড়িতে আমি ক'দিনই বা উঠি। আমার বুঝি আর কোন সম্বল নেই! রিকশা আছে, বাস আছে, দুখানা পা আছে সঙ্গে।'

শুকলাল বলল, 'তা তো আছেই। আজকাল খুব হাঁটতে শিখেছ তাই না? ছেলেবেলায় সবাই বলত তুমি খোঁড়া হবে। হাঁটতেই পারবে না। আর এখন—'

মন্দিরা বলল, 'থাক, তোমাকে আর আদ্যিকালের গল্প শোনাতে বসতে

হবে না। কী বকবকই যে করতে পারো।'

শুকলালের মুখ ভার হল। ট্রেতে করে চায়ের কাপ-ডিশগুলি তুলে নিতে নিতে বলল, 'তা তো ঠিকই। সে দিন তো আর নেই। তখন এই শুকলালের গল্প ছাড়া তোমার খাওয়া হতো না, ঘুম হতো না। এই কোলে না উঠলে বেড়ানো হতো না—'

মন্দিরা শুকলালের দিকে তাকাল। শুধু মাথার চুলই নয়, ভ্রূ পর্যন্ত পেকে গেছে। কী বুড়োই হয়েছে শুকলাল। দাড়িগোঁফ অবশ্য কামিয়ে ফেলেছে। একবার রাখতে শুরু করেছিল। বাবা ধমক দিয়ে বলেছিলেন, দাড়ি-টাড়িই যদি রাখবি তাহলে তুই বনে চলে যা। সেখানে আশ্রম খুলে ঋষি-টিষি হয়ে বোস গিয়ে।'

ঋষি হবার মতই জীবন। দু-দুবার বিয়ে করেছিল। কিন্তু কোন বউই বেশিদিন বাঁচেনি। ছেলেমেয়ে কিছু রেখে যায়নি। তিনকুলে আত্মীয়স্বজন কেউ আছে কিনা কে জানে। কখনও কেউ খোঁজ নিতে আসে না। মন্দিরা জন্মাবধি দেখে আসছে তাদের বাড়িতেই আছে শুকলাল। তাদের ঘর-সংসারের কাজ করে দিচ্ছে। মেয়েদের সব কাজ জানে। এদিক থেকে শুকলাল প্রায় মেয়েমানুষেরই সামিল। মা অবশ্য ওকে মেয়েদের কাজ বিশেষ করতে দেন না। বাড়ির ঝি পদ্মমণিই সব করে। সে ক'দিনের জন্য ছুটি নিয়েছে বলেই ওকে এসব করতে হচ্ছে। বাবা অবশ্য ওকে দিয়ে চাকরের কাজও করাতে চান না। তিনি বলেছিলেন, 'তার চেয়ে তুই বরং আমার ডিস্‌পেনসারিতে যা, কি হাসপাতালে একটা কাজ-টাজ তোকে জুটিয়ে দিই।'

শুকলাল বলেছে, 'না বাবু, কাজ নেই আমার—দিনরাত ওই ওষুধের গন্ধ আমার সইবে না।'

দিনরাত এই বাড়ির মধ্যেই থাকে শুকলাল। ঘরের কাজও করে, বাইরের কাজও করে। ঘরদোর সাজায় গুছায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। বাগানের কাজ করতেও জানে। ওর জন্যে কোন মালী টি'কতে পারে না। ও এত হিংসুটে।

আরো একটা গুরুদায়িত্ব আছে ওর ওপর। দরকার হলে বাড়ির মেয়েদের স্কুল-কলেজে পৌঁছে দেওয়ার, কি সেখান থেকে নিয়ে আসার কাজও শুক-লালই করে। এ কাজেও বাবা ওকে যত বিশ্বাস করেন তেমন আর কাউকে করেন না। তাদের কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে শুকলাল, তার যত মায়া-মমতা হবে, সে যত সেবাযত্ন করবে তেমন আর কারই বা হতে পারে?

বাড়ির গাড়িতে কলেজে যেতে হবে না শুনে মন্দিরার ভারি ভালো লাগতে লাগল। গাড়ি তো নয় যেন কয়েদীদের ভ্যান। দূর থেকে কালো কালো এই ভ্যানগুলিকে যাতায়াত করতে দেখেছে মন্দিরা। চোর-ডাকাত দস্যুদের ওর মধ্যে ভরে নিয়ে যাওয়া হয়। শুকলালের কাছে গল্প শুনেছে। নিজেদের

গাড়িতেও সেই আসামীর মতই যেতে হয় মন্দিরাকে। অন্য কোথাও নামবার জো নেই, অন্য কোন দিকে তাকাবার জো নেই। বাড়ির গেট থেকে কলেজের গেটে, কলেজের গেট থেকে বাড়ির দরজায়। এর চেয়ে পাবলিক বাস অনেক ভালো। যত ভিড়ই হোক, যাতায়াতে যত কষ্টই হোক, তাতে স্বাধীনতা আছে। আর গাড়িতে যদি যেতে না হয় আসাটাও খুব-সম্ভব এড়াতে পারবে মন্দিরা। আর তাহলে বেনেপুকুরে যাওয়াও অসম্ভব হবে না। এক মধুর সম্ভাবনার আশ্বাসে মন্দিরার মন ভরে উঠল। আজ তাহলে ফের দেখা হতে পারে। একদিন দেখা না হলে মনে হয় যেন অনেকদিন দেখা হয় না। সারাদিন যেন কেমন খালি খালি লাগে। দুনিয়ার সবই যেন বিস্বাদ বিরস আর ব্যর্থ বলে মনে হয়। মাত্র দুদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি মন্দিরার। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন দুটি যুগ চলে গেছে।

আস্তে আস্তে ঘরে এসে ঢুকল মন্দিরা। কিন্তু পড়ার টেবিলে বসল না। পাশের ঘরে নন্দা আর ছন্দার কলকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে দু'জনে। একজনের সঙ্গে আর একজনের পাল্লা। পড়াশুনোয় ওদের মত মনোযোগ দুনিয়ায় যেন আর কারো নেই। বোনেদের এই সংদৃষ্টান্তে মন্দিরা একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলো। তারও উচিত এখন গিয়ে পড়তে বসা। পড়তে তো তার ভালোই লাগে। পরীক্ষা অনেক দূরে। পড়ায় এখন কর্তব্যবোধের চেয়ে, ভয়ের চেয়ে আনন্দই বেশি। প্রফেসররা বলেন, এই বছরটা তো তোমাদের সুখের বছর। মনের সুখে পড়বে। কিন্তু শেখার জন্যে নয়, সুখের জন্যে। সুখ। সুখই তো জীবনের উদ্দেশ্য। যে যা কিছু করে সুখের জন্যেই করে। নিজের টেবিলের ধারে থামল না মন্দিরা। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে তার ছোট ঘর পার হয়ে, বড় ঘরখানার ভিতরে ঢুকল। বাবা আর মার ঘর। আধখানা জুড়ে বিরাট এক খাট। আলমারি, ড্রেসিং-টেবিল। সবই জবরজং হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু মন্দিরার কোন দিকে লক্ষ্য নেই। উ'চু টুলটার ওপর যে টেলি-ফোনটি রয়েছে মন্দিরার দুটি চোখ সেই যন্ত্রটির ওপর নিবন্ধ।

কিন্তু রিসিভারটি তুলে নেওয়ার আগে একবার চারদিকে দেখে নিল মন্দিরা। না, দরজাটা খোলা রাখা ঠিক নয়। খিল তুলে দেবে কিনা একটু ভাবল। না, তা বোধ হয় ঠিক হবে না। মা এসে পড়লে কৈফিয়ত চাইবেন। বলবেন, 'ঘরে দোর দিয়ে কী করছিলি', তখন জবাব দেওয়া শক্ত হবে।

ঠিক খিল দিল না মন্দিরা, তবে দোরটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিল। ডায়াল করে নম্বরটা নিল। আশ্চর্য, ফোনটা বেজেই চলেছে। তবে কি তিনি ঘরে নেই? কিন্তু এত সকালে তিনি তো অন্য কোথাও যান না। যাওয়া তো ভালো, ওঠেনই না বিছানা ছেড়ে। আর তাঁর শোবার ঘরেই তো ফোন।

'হ্যালো? কে?'

'আমি।'

'ও তুমি!'

'আর কারো কথা ভাবছিলেন বুঝি?'

'ভাবছিলাম না, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম। ঘুমের মধ্যে ভাবা যায় না। আমি কোনদিন ভেবে দেখিনি।'

'কাকে স্বপ্ন দেখছিলেন? সত্যি করে বলবেন?'

'আমি সত্যি করেই বলব। কিন্তু যাকে বলব, সে কি আর বিশ্বাস করবে?'

'বিশ্বাস করবার মত হলে নিশ্চয়ই করব। বলুন না, স্বপ্নে কী দেখছিলেন।'

'স্বপ্নে যাকে দেখছিলাম, বাস্তবে তাকে আর দেখতে পাচ্ছি না। শুধু তার কথা শুনতে পাচ্ছি। আমার নিদ্রায় আর জাগরণে আকাশ-পাতাল তফাত।'

'সব আপনার মিছে কথা। মিছিমিছি আপনার ঘুম ভাঙালাম। ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি লক্ষ্মী ছেলের মত আবার ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'না-না-না, ছেড় না, ছেড় না। তা হলে সত্যিই একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে পড়ব।'

'বাঃ, ছাড়ব না কী করে? কতক্ষণ আর ফোন ধরে রাখা যায়?'

'যায় না বুঝি? বাড়ি থেকেই তো ফোন করছ?'

'তবে আর কোত্থেকে করব?'

'তোমার তো অসীম সাহস।'

মন্দিরা একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'সাহসের কীই-বা হল।'

'অত হতাশ হচ্ছ কেন? হওয়ার এখনই কী হয়েছে?'

'ছেড়ে দিচ্ছি।'

'আর এক সেকেন্ড পরে দিয়ো। আজ চলে এসো না।'

'কোথায়?'

'বাড়িতে।'

'কোন অসুবিধে হবে না তো?'

'অসুবিধে কিসের?'

'কখন?'

'যখন তোমার সুবিধে। চারটে পাঁচটা ছটা। আমি সন্ধ্যার আগে আর বেরোব না।'

'আচ্ছা দেখি।'

মন্দিরা ফোন ছেড়ে দিল।

পড়ার টেবিলে এসে বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগল মন্দিরার। এ কি তার ভয়? না, ভয় কিসের? ধরা তো আর পড়েনি যে ভয় করবে। কেউ এসে পড়েনি। কারো ভয়ে ফোনটা তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হয়নি। যতক্ষণ খুশি সে কথা বলতে পেরেছে। আর-একটা ঝুঁকি নিলে আরও কিছুক্ষণ কথা বলা

যেত। মা এখন রান্নাঘর ছেড়ে উঠে আসবেন না। বাবা শুকলালকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে গেছেন। ফিরে আসতে আসতে তাঁরও কিছু দেরি হবে। ততক্ষণ আরও কিছু কথা বলে নিতে পারত মন্দিরা। কিন্তু ঝুঁকি আর না নেওয়াই ভালো। ধরা পড়ে গেলে বাবাকে কৈফিয়ত দিতে হতো। বিশ্রী একটা কাণ্ড হতো। শশাঙ্কদার সঙ্গে মন্দিরা যে আর কোন যোগাযোগ রাখে, বাড়ির কেউ তা পছন্দ করেন না। তাই পারতপক্ষে বাড়ি থেকে তাঁকে আর ফোন করে না মন্দিরা, বাবার ডিস্পেন্সারী থেকেও না। নগদ পয়সা দিয়ে হয় পোস্ট-অফিস থেকে, না-হয় অন্য কোন জায়গা থেকে ফোন করে। কিন্তু সে-সব ফোনে কি আর কোন কথা বলা যায়? শুধু কেমন আছেন, ভালো আছি ছাড়া কিছুই বলা যায় না। আজ অনেকদিন বাদে বাড়ি থেকে ফোন করেছে মন্দিরা। বেশ একটু ঝুঁকি নিয়েছে। কিন্তু শুধু সেই উত্তেজনাতেই কি তার বুক এমন করে কাঁপছে! সারা শরীরে এমন চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে? তাঁর সঙ্গে কথা বললে, তাঁর সংস্পর্শে এলে আনন্দের চেয়ে যন্ত্রণা বেশি, কষ্টই বেশি হয় মন্দিরার, কত রকমের ভয় যে তাকে পেয়ে বসে, তার ঠিক নেই। ধরা পড়বার ভয়, এক অনিশ্চিত পরিণামের ভয়। কিন্তু এত ভয় সত্ত্বেও মন্দিরাকে কী যেন টেনে নিয়ে যায়, কে যেন টেনে নিয়ে যায়। আর সেই আকর্ষণের মধ্যে অদ্ভুত আনন্দ-বোধ করে, তীব্র অস্তিত্বের স্বাদ পায় মন্দিরা। অনেক রকমের নেশার গল্প শুনেছে মন্দিরা। এও কি তেমনি কোন নেশা? মদ গাঁজা চণ্ডু চরসের চেয়েও কি বেশি মাদকতা মানুষের মধ্যে?

সামনে ইণ্ডিয়ান ফিলজফি খুলে রেখে মন্দিরা এলোমেলো নানা কথা ভাবতে লাগল। এসব তার পাঠ্যতালিকার বহির্ভূত। কিন্তু জীবন-সমস্যার বহির্ভূত নয়।

না, মন্দিরা আর যাবে না সেখানে। কথা দিয়েছে বলেই যে যেতে হবে, তার কি মানে আছে? বরং তিনি আশায় আশায় থেকে শেষ পর্যন্ত নিরাশ হন। তাতে খুশী হবে মন্দিরা। মানুষটিকে কষ্ট দিতে পারলে সে খুশী হয়। আঘাত দিতে পারলে আনন্দ পায়। কিন্তু তেমন শক্তি কই মন্দিরার। দুদিন দূরে থেকে নিজেই এগিয়ে যায়, নিজেই ফোন করে, চিঠি লেখে। নিজের জন্যে লজ্জা হয় মন্দিরার। কিন্তু নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে, বিকিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ আছে, সেই আনন্দ সমস্ত লজ্জা দুঃখ আর পরিণামের ভাবনাকে ছাপিয়ে যায়।

কী এ-সব আজেবাজে কথা ভাবছে মন্দিরা। না, এ-সব সে মোটেই ভাববে না। এ ধরনের কোন চিন্তাকে সে আর কিছুতেই আমল দেবে না। মন্দিরা জোর করে বাইরের দিকে তাকাল। দেয়ালের ওপারের আমগাছগুলি এখান থেকে বেশ দেখা যায়। কয়েকটি গাছে এখনো বোল আছে। এখনো গুটি ধরেনি। মাঘে বোল ফাল্গুনে গুটি, চৈত্রে কাটাকুটি, ঠাকুরমা ছড়া বলতেন।

কিন্তু কোন কোন গাছে ফাল্গুনেও বোল থাকে। গুটি ধরে আরো দেরিতে। মন্দিরা অবশ্য আম খেতে তত ভালোবাসে না। পাকা আম তো নয়ই। বরং বোলগুলি দেখতেই তার ভালো লাগে। কী উগ্র মিষ্টি গন্ধ বোলগুলির। বড় ডালখানি জুড়ে এবারও একখানি মৌচাক পড়েছে। মৌমাছিগুলি উড়ে বেড়াচ্ছে। ও-গাছটা থেকে এবার আর পাড়ার ছেলেরা আম চুরি করতে পারবে না। কিন্তু শুকলাল মধু চুরি করবে। মৌচাক ভেঙে নিয়ে আসবে। মধু গলিয়ে নেবে। একবার ওই মধু খেতে গিয়ে কী বিপত্তি। বমি করে করে মারা যায় মন্দিরা। বাবা সবাইকে সেদিন খুব বকেছিলেন। তাঁর অত আদরের শুকলালকেও কম বকেননি। তার পর থেকে আর খায় না মন্দিরা। কিন্তু মৌচাক দেখতে ভালো লাগে, সোনালী রঙের মৌমাছিগুলিকে দেখতে ভালো লাগে, তাদের গুনগুনানি শুনতে ভালো লাগে। এমনকি টলটলে মধু দেখতেও কী লোভই না হয়। যা দেখতে ভালো, শুনতে ভালো তাই কি ভালো নয়? শশাঙ্কদার মত অমন সুপুরুষ সে আর কাউকে দেখেনি, অমন সুকণ্ঠ সে আর কারো শোনেনি। অথচ অনেকেই বলেন শশাঙ্কদা তেমন ভালো লোক নন। বাবা-মারও সেই ধারণা। তা হলেনই-বা তিনি মন্দ। ভালো মানুষ তো পথে ঘাটে হাটে বাজারে কত দেখা যায়। মন্দের আকর্ষণ তার চেয়ে অনেক বেশি। তার রহস্যের যেন শেষ নেই। ছেলেবেলা থেকেই যা অচেনা অজানা যা দেখলে গা ছমছম করে সেইদিকে আকর্ষণ মন্দিরার। যে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিদি যেতে ভয় পেত সেখানে মন্দিরা দিব্যি চলে যেত। ভয় যে পেত না তা নয়, কিন্তু যাকে দেখে ভয় তাকে দেখবার লোভ সে দমন করতে পারত না। সেই বয়সের পক্ষে দুর্গম এমন জায়গা থেকে কতবার সে ফুল কুড়িয়ে এনে দিদিকে অর্ধেক ভাগ দিয়েছে। কাঁটার খোঁচা খেয়ে কুঁচ ফল নিয়ে এসেছিল বাড়ির পিছনের জঙ্গলের ভিতর থেকে। ছোট একরত্তি একরত্তি সেই ফল-গুলির মুখের দিকটা শুধু কালো আর সর্বাঙ্গ টুকটুকে লাল। সেই লাল রঙ মনের মধ্যে মেখে রয়েছে মন্দিরার। একটুকু কৃষ্ণত্বের জন্যে সে কুঁচগুলিকে ফেলে দেয়নি। বরং তার মনে হয়েছে ওইটুকু কালো আছে বলেই কুঁচগুলির রঙের বাহার খুলেছে। চাঁদের কলঙ্ক আছে বলে কেউ কি আর চাঁদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকে? বরং কলঙ্ক সত্ত্বেও চাঁদের দিকেই ফিরে ফিরে তাকায়। আর পূর্ণিমার রাত্রে সেই কলঙ্ক কি কারো চোখে পড়ে, নাকি সেকথা কেউ মনে রাখে? জ্যোৎস্নার বন্যায় সব কি তখন ভেসে যায় না? শশাঙ্কদার বেলাতেও সেই কথাই মনে হয় মন্দিরার। শুধু রূপই নয় জোরও আছে শশাঙ্কদার। কুস্তিগীর পালোয়ানদের মত শরীরের যত্রতত্র তাঁর পেশীগুলি ঢিবির মত উঁচু হয়ে থাকে না। কারো সঙ্গে পাঞ্জা কষতেও তাঁকে দেখেনি। তবু ছ'ফুটের কাছাকাছি মানুষটিকে দেখলে মনে হয় ওঁর শরীর পলকা নয়, ননী মাখন দিয়ে গড়া নয়। হয়তো মনের জোরটাই তাঁর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে

অমনভাবে ফ্রটে ওঠে। কিছ্র গ্রাহ্য করব না, কাউকে পরোয়া করব না, সমাজের নিন্দামন্দ সব অগ্রাহ্য করে নিজের পথে চলব—শশাঙ্কদার এই জেদই মন্দিরাকে সব চেয়ে আকৃষ্ট করেছে। বাবার চরিত্রের একেবারে বিপরীত চরিত্র, একেবারে বিপরীত ধারার মান্বে। বাবা কষ্ট করে নিজেকে গড়ে তুলেছেন, ডাক্তারি পাশ করেছেন, একট্ব একট্ব করে পসার জমিয়েছেন, বাড়ি গাড়ি সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। কিন্তু শশাঙ্কদা এ সব কিছ্রই হননি। শ্বধ্র হতে পারার অফ্রন্ত সম্ভাবনা নিজের মধ্যে ধরে রেখেছেন। ওঁর যা রেজাল্ট তাতে ভালো কলেজে ভালো চাকরি নিয়ে পাকাপোক্ত প্রফেসারের গদি আঁকড়ে বসতে পারতেন। কিন্তু কোথাও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গরজ যেন শশাঙ্কদার নেই। তিনি ভিন্ন ভিন্ন কলেজে চাকরি নিয়েছেন আর ছেড়েছেন। মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরেও গিয়েছেন। যাওয়ার সময় বিদায় নিয়ে বলে গেছেন, 'অনেকদিন আর দেখা-সাক্ষাৎ হবে না।' কিন্তু ছ'মাস কাটতে না কাটতেই ফের এসে হাজির। যখন তিনি বাইরে গেছেন, অদর্শনের দ্বঃখটা মন্দিরাকে নিশ্চয়ই ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু আর একদিকে সেই শ্বন্যতা ভরাট হয়ে গেছে। চিঠির পর চিঠি লিখেছেন শশাঙ্কদা। সেই চিঠির ভিতর দিয়ে যেন তাঁকে আরো বেশি করে কাছে পেয়েছে মন্দিরা। আরো নিবিড় হয়ে উঠেছে সম্পর্ক। প্রথম প্রথম বাবা এসব চিঠিপত্রে তেমন আপত্তি করতেন না। হেসে বলতেন, 'ট্বকুকেও চিঠি লেখবার মান্বে আছে দেখছি।' তাঁর কাছে ট্বকু তখনও এতট্বকুই ছিল। কিন্তু পরে আপত্তি করতে লাগলেন। এত ঘন ঘন চিঠি লিখবার কী আছে। তারপর অবশ্য শশাঙ্কদার আর চিঠি লেখার বেশি দরকারই রইল না। মফঃস্বল কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি আবার কলকাতায় চলে এলেন। কিন্তু মন্দিরাকে আর পড়াতে এলেন না। একটানা এক বছর পড়িয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন এত দীর্ঘ দিন আর কোন ছাত্রীকে তিনি নাকি পড়াননি। মন্দিরা জানে, তিনি পড়াতে চাইলেও বাবা পড়াতে দিতেন না। তাঁর সম্বন্ধে বাবার ধারণা যে খারাপ হয়ে গেছে মন্দিরা তা টের পেয়েছে। আর মন্দিরা যে বাবার ইচ্ছার বির্বদ্ধে গোপনে গোপনে শশাঙ্কদার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে বাবা তা আন্দাজ করে আরও র্বষ্ট হয়েছেন। খেতে বসতে শ্বতে কথায় কথায় যে এত উপদেশ নির্দেশ শাসন অন্বশাসন, তার ম্বল যে কোথায় তা মন্দিরা জানে। মন্দিরার মনে হয় বাবা যেন সব কথা আজকাল স্পষ্ট করে বলতে পারেন না। কারণ স্পষ্ট করে বললে মন্দিরার সব সঙ্কোচ ভেঙে যাবে এই ভয় বোধ হয় তাঁর আছে। অনেক কথাই তাই তিনি এখন আভাসে ইঙ্গিতে বলেন। শাসনের বেতও যেন ইশারার আকার নেয়। কিন্তু তাই বলে তার জ্বালা কম নয়। মন্দিরার কতদিন মনে হয়েছে শশাঙ্কদার সঙ্গে সত্যিই সে আর কোন সম্পর্ক রাখবে না। রেখে যে কোন লাভ নেই তা কি সে নিজেই জানে না? কিন্তু তার সমস্ত সঙ্কল্প ভেঙেচুরে দিয়ে কিসের এক আকাঙ্ক্ষা

তাকে টেনে নিয়ে যায়। এ কি শুধু কৌতূহল? নাকি দুঃসাহসী হবার বাহাদুরি? নিজের কাছে আর নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে প্রমাণ করবার চেষ্টা কলঙ্কিত পুরুষের কাছে যেতে তার ভয় নেই, নিজের জীবনে কলঙ্ক রটনারও তার ভয় নেই? না, ঠিক কৌতূহল না, বাহাদুরি দেখাবার লোভও নয়—সে সব আরো কম বয়সে ছিল। মা আর ঠাকুরমা যে সব জায়গায় যেতে নিষেধ করতেন মন্দিরা জেদ করে সেই সব জায়গাতেই যেত। চুরি করে তেঁতুলমাখা খেয়ে একবার কী জ্বরেই না পড়েছিল। ঠাকুরমা বলেছিলেন, 'তুই মরবি। তুই এমনি করে অনাচার কদাচার করেই মরবি।'

একই সঙ্গে কালীবাড়িতে পাঁঠা আর মদনমোহনের কাছে সন্দেশের হরির লুঠ মানত করেছিলেন।

আর একবার বাড়ির পিছনে এঁদোপুকুরে লুকিয়ে লুকিয়ে সাঁতার কাটতে গিয়েও বিপদে পড়েছিল মন্দিরা। পিছনে পিছনে একটা সাপ এসেছিল তাড়া করে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ঢোরা সাপ। তবু ভয় পেয়ে দিদির কি কাঁপুনি আর ঠাকুরমার সে কী চীৎকার চেঁচামেচি। বাবা রাগ করে পুকুরটা আর কাটাননি, বন্ধ করে দিয়ে বাড়িতে টিউবওয়েল বসিয়েছেন। বাবা এমনি করে সব এঁদোপুকুর বন্ধ করে দিতে চান। কিন্তু মন্দিরার শুধু যে এঁদোপুকুরেই সাঁতার কাটবার ইচ্ছা হয় তা তো নয়, সে পুরীর সমুদ্রও সাঁতরে এসেছে। সে সমুদ্র তো আর বাবা বন্ধ করতে পারবে না। সেই সমুদ্র তাকে বার বার টানে। কতদিন যে সেই উত্তাল সমুদ্রকে স্বপ্ন দেখেছে মন্দিরা তার ঠিক নেই। সেই অসীম সমুদ্র পার হবার জন্যে সে সাঁতার কাটছে তো কাটছেই। ক্লান্তি নেই অবসাদ নেই। কারণ পাশে পাশে আরো একজন আছে। আর সে আছে বলে এমন দুরন্ত দুস্তর সমুদ্রকেও শান্ত স্নিগ্ধ সুপরিচিত পুকুরের মত মনে হচ্ছে। শুধু কি সমুদ্রের স্বপ্নই দেখে মন্দিরা? কত মরুভূমি পর্বত কান্তারও তার স্বপ্নলোকে এসে হানা দেয়। কখনো হেঁটে কখনো ঘোড়ার পিঠে, সে এই সব দুর্গম মরুকান্তার পাড়ি দিচ্ছে। কিন্তু কখনোই সে নিঃসঙ্গ নয়। তার সেই চিরপরিচিত, চিরপ্রিয় সহযাত্রীটি তার পাশে পাশেই আছে। একই সঙ্গে রক্ষী সঙ্গী অভিভাবক বন্ধু। দেয়ালঘেরা ঘরে একটি নিরাপদ আশ্রয়ের বাবা-মার মত সেও তার সঙ্গীকে নিয়ে ঘরসংসার করছে এমন কল্পনা কিন্তু মন্দিরার আসে না। কেন আসে না কে জানে। শশাঙ্কদা নিজেও অবশ্য যাযাবর জীবনের ভক্ত। এই সমাজসংসার সভ্যতার বন্ধনমুক্ত, সেই আদিম বন্য বর্বর জীবনের পরিকল্পনা তাঁরও ভালো লাগে। কতদিন তিনি সেই সব গল্প শুনিয়েছেন মন্দিরাকে। ছবি দেখিয়েছেন। কতদিন তিনি বলেছেন এই ভদ্র শান্ত পোষমানা জীবনে তাঁর অরুচি ধরে গেছে। তাঁর রক্তের মধ্যে তিনি নাকি সেই আদিম বর্বরতার বন্যাস্রোত অনুভব করেন। আর মন্দিরার মত বাঁধভাঙা স্রোতস্বত। তিনি নাকি দ্বিতীয় কাউকে দেখেননি। এসব কথা বুঝবার মত

বয়স তখন ছিল না মন্দিরার। তবুও একরকম করে বুঝে নিয়েছে। বুকের ভিতরটা দুরু-দুরু করেছে। কাঁটা দিয়ে উঠেছে সারা গা। এমন অনুভূতি আর কোথাও তার হয়নি। এমন মত্ততা আর কারো সান্নিধ্যে তার আসেনি। অস্তিত্বের এমন তীব্র এমন ঘনীভূত স্বাদ আর কোথাও গিয়ে সে পায়নি। শশাঙ্কদা যেন এক পূর্বনিয়ন্ত্রিত পূর্বনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ। মন্দিরা যত চেষ্টাই করুক তাঁকে এড়াবার তার উপায় নেই। ভাগ্য বলতে হয় ভাগ্য, দুর্ভাগ্য বললে দুর্ভাগ্য।

'হ্যাঁরে টুকু, এবার উঠবিনে? বেলা হল না তোর? ওরা তো নেয়ে-খেয়ে তৈরি হতে গেছে। ওদের স্কুলের গাড়ি তো নটা বাজতে না বাজতেই এসে পড়ে। তোর আজ কটায় ক্লাস?' ইন্দ্রাণী এসে মেয়ের পিছনে দাঁড়ালেন।

মন্দিরা বলল, 'আমারও আজ দশটায়। অনার্স ক্লাস আছে কিনা। আজ সকাল সকালই বেরোতে হবে। তোমার রান্নাবান্না হয়ে গেছে তো?'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'যা হয়েছে তাই দিয়েই তোমরা খেয়ে যেতে পারবে। আমি কি আর ঠাকুর-চাকরের ভরসায় থাকি?'

ইন্দ্রাণী একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'কিন্তু অনার্স-টনার্স কেনই বা তুই মিছামিছি নিয়েছিস টুকু? অত কঠিন কঠিন বিষয় কি তুই পড়তে পারবি? তোর কি আর পড়াশুনো হবে?'

মন্দিরা মার দিকে না তাকিয়েই বলল, 'কেন মা, ওকথা কেন বলছ? তোমার ধারণা আমি কি পড়াশুনো করিনে!'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'কী জানি বাপু, করো কি না করো তুমিই জানো। আমি এ দিক দিয়ে দু দুবার ঘুরে গেছি। অবশ্য দরকারেই এসেছিলাম। দেখলাম পাথরের মূর্তির মত বসে আছিস তো আছিসই। তুইও নড়ছিস না, তোর বইয়ের পাতাও নড়ছে না। শুধু বই সামনে নিয়ে বসে থাকলে কি পড়া হয়? দিন রাত অত ছাইপাঁশ কী ভাবিস তাই বলতো?'

মন্দিরা বলল, 'কী আবার ভাবব। পড়ার কথাই ভাবি।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'মিথ্যে কথা। আমি তোদের মত স্কুল-কলেজে না পড়তে পারি, তোদের মত পাশ পরীক্ষাও না দিতে পারি, কিন্তু তুই যে কখন পড়ার কথা ভাবছিস, আর কখন অন্য বাজে কথা ভাবছিস তা আমি তোর ভাবভঙ্গী দেখলেই টের পাই। আমাকে ফাঁকি দিতে চাসনে টুকু। চাইলেও পারবিনে। তুই কি শেষ পর্যন্ত একটা সর্বনাশ ঘটাতে চাস?'

এবার মন্দিরার ভারি রাগ হল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের কথার তীব্র প্রতিবাদ করে বলল, 'তোমরা দুজনে আমার বিরুদ্ধে এমন করে কেন লেগেছ বল তো মা? তাতে তোমাদের কার কি লাভ হবে! তোমরা কি চাও আমি বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যাই?'

মেয়ের মূর্তি দেখে ইন্দ্রাণী একটু শঙ্কিত হলেন। গলা নামিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'না বাপু। তোমাদের কারোরই কোথাও যেতে হবে না। বাড়ি যদি ছাড়তে হয় আমাকেই একদিন ছেড়ে যেতে হবে তা আমি জানি।'

মেয়ের জবাব শোনবার জন্যে ইন্দ্রাণী আর দাঁড়ালেন না। কথায় কথা বাড়বে। মেয়েকে এখন আর কথা ছোঁয়াবার জো নেই। এক কথায় দশ কথা শুনিয়ে দেয়। ইন্দ্রাণীর মাঝে মাঝে মনে হয় কথা একেবারেই বলবেন না। কিন্তু না বলেও তো পারেন না। গায়ে যার বাজে সে কি আর মুখ বুজে থাকতে পারে?

মা চলে যাওয়ার পরেও মন্দিরা সেখানে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ির আবহাওয়া ক্রমেই যেন তার কাছে সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। যতক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকে, ততক্ষণই যেন সময়টা ভালো কাটে। সব কিছু ভুলে থাকতে পারে মন্দিরা। বাবা-মার শাসন, তাঁদের পদে পদে খুঁত ধরার চেষ্টা—সব ভুলে যেতে পারলে যেন বেঁচে যায় মন্দিরা। অথচ বাড়ির বাইরে থাকতে তার ইচ্ছাই করত না, বাইরে গেলেই কেমন যেন অসহায় বোধ করত, কখন ফের বাড়িতে ছুটে আসতে পারবে তার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকত এমন দিনও গেছে। এখন কেন এই বিতৃষ্ণা বিদ্বেষ, মন্দিরা মাঝে মাঝে ভাবতে চেষ্টা করে। বাবার শাসন অনুশাসন বিধিনিষেধ দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে বাঁধবার চেষ্টা তো এই নতুন নয়, কিন্তু আজকাল যেন তার তীব্রতা আরো বেড়েছে। শুধু কি সেই জন্যেই! নাকি অন্য জায়গায়, অন্য পরিবেশে বাস করবার জন্যে তার মন উন্মুখ হয়ে উঠেছে? একথা অবশ্য স্বীকার করে না মন্দিরা। কিন্তু তার অস্বীকৃতি সত্ত্বেও এক গোপন উল্লাস তার সমস্ত মনকে রঞ্জিত, নন্দিত করে তোলে।

ছন্দা নন্দারা স্কুলের জন্যে তৈরি হয়ে নিয়েছে। ওদের গাড়ি আগে আগে আসে। বাড়ির গাড়ির তো কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই মা ওদের জন্যে ফের স্কুলের গাড়িই ঠিক করে দিয়েছেন।

মন্দিরার অত তাড়া নেই। তার হাতে সময় আছে। সে ধীরে সুস্থে তৈরি হয়ে নিলেই পারবে।

ছন্দা নন্দা বই খাতা হাতে সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। বেশ আছে। খুব স্ফূর্তি দুজনের মনে। এখনো কোন সমস্যা সঙ্কটের আঁচ ওদের গায়ে লাগেনি। মন্দিরা ভাবল এই অল্পবয়সের দিনগুলিই বেশ সুখের দিন।

'কি রে! এরই মধ্যে সময় হয়ে গেল?'

ছন্দা দিদির কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'হবে না! এ কি তোদের কলেজ? বসতে বসতে গড়িয়ে গড়িয়ে সেই দুপুর বেজে যাবে? কিন্তু যাই বলিস, বেশ আছিস দিদি। তাড়াহুড়ো নেই, কিছু নেই। ধীরে সুস্থে সেজেগুজে—ইস্, কবে যে এই স্কুলের বেড়াটা আমি ডিঙাতে পারব।'

মন্দিরা হেসে বলল, 'তুই আর পেরেছিস।'

ছন্দা বলল, 'কী দেমাক। তুই পারলি আর আমি পারব না!'

মন্দিরা বলল, 'আমি যা পারি তার সবই কি তুই পারিস!'

ছন্দা দিদির আরো কাছে সরে এসে ফিস ফিস করে বলল, 'না দিদি, সব পারিনে। তুই অনেক বেশি ওস্তাদ।'

'পাকা মেয়ে। আমার ওস্তাদি কিসে দেখলি তুই?'

ছন্দা মুখ টিপে হেসে বলল, 'আজও তো লুকিয়ে লুকিয়ে ফোন করলি, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করলি, আমি সব শুনেছি।'

মন্দিরা মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। কী সাংঘাতিক মেয়ে। এই বয়সেই কি রকম ঝানু হয়ে উঠেছে। মন্দিরার ইচ্ছা হল ঠাস করে ওর গালে এক চড় বসিয়ে দেয়। 'এই বিদ্যে শিখেছ। এখনই তুমি আড়ি পাততে আস!'

কিন্তু একটু চেষ্টা করে নিজেকে সামলে রাখল মন্দিরা। অধীর হয়ে লাভ নেই। বরং কৌশলে ওকে হাতে রাখতে হবে।

মন্দিরা মুখে হাসি টেনে বলল, 'ও, তুই বুঝি তখন এদিকে এসেছিলি? আমি ক্লাসের একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম, সেই যে মীনাক্ষী—'

ছন্দা তীর্যকাক্ষী হয়ে বলল, 'তাই নাকি রে দিদি? মিনুদিকে তুই বুঝি আজকাল আপনি বলতে শুরু করেছিস?'

তারপর আরো গলা নামিয়ে ছন্দা বলল, 'যা করছিস কর। আমাকে তোর ভয় করবার দরকার নেই। আমি চোখমুখ বুজে থাকব। শুধু দুটো একটা টাকা আমাকে দিস। সিনেমা দেখব।'

হর্ন বাজিয়ে মিশনারি স্কুলের বাস এসে দাঁড়াল।

'এই নন্দা শিগগির আয়।'

বলে ছন্দা বোনের সঙ্গে তাড়াতাড়ি গিয়ে বাসে উঠল।

বাস-ভরতি একদল মেয়ের মুখ মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

মন্দিরা সেদিকে তাকিয়ে দোরের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। ছন্দা তার চেয়েও সেয়ানা হয়েছে। মন্দিরা ওই বয়সে অমন ছিল না। চোখ মুখ অত ফোটেনি তার। যদিও লুকিয়ে লুকিয়ে রাশ রাশ নভেল পড়ে ফেলেছে। কিন্তু নভেলের সব কথা কি আর বুঝত তখন? কিন্তু ছন্দা তো বইও বেশি পড়ে না। নভেল-টবেল পড়ার দিকে ওর তেমন ঝোঁক নেই। দিনরাত তো লাফালাফি করেই বেড়ায়। তবু এতখানি পাকা হল ও কী করে? নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে সিনেমা দেখে, কি ওর চেয়েও বেশি বয়সী মেয়ের সঙ্গে গল্প গুজব করে। বাবা মা টেরও পান না তাঁদের সেজো মেয়েটি কী ভাবে পেকে উঠেছে, সে খোঁজই হয়তো রাখেন না তাঁরা। রাখবেন কি, দুজোড়া সতর্ক চোখ নিয়ে সব সময় তাঁরা মন্দিরাকেই পাহারা দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত। সেই একচক্ষু হরিণের সঙ্গে ওঁদের দুজনকে তুলনা করা যায়। জানেন না তো তলে তলে তাঁদের আর

একটি মেয়েও কিরকম ডাকাত হয়ে উঠছে।

ইন্দ্রাণী এসে ফের তাড়া লাগালেন, 'হল কি তোর বল তো। সেই থেকে এখানে দাঁড়াচ্ছিস ওখানে বসছিস। কিছুতেই যেন তোর গা নেই। যা এবার নাইতে-টাইতে যা। এর পর তো নাকে মুখে গুজবি।'

মন্দিরা বলল, 'যাই মা।'

আরো দেরি করলে আরো ধমক খেতে হবে, আরো গঞ্জনা শুনতে হবে মার কাছে। তার চেয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়া নিরাপদ।

তেল সাবান সব বাথরুমেই আছে। নিজের তোয়ালেখানা নিয়ে মন্দিরা বাথরুমের দিকে পা বাড়াল। ভারি নিরাপদ। সত্যিই খুব নিরাপদ জায়গা। এখন আর কেউ আসবে না। কাউকে ভাগ দিতে হবে না এই স্নানঘরের। যতক্ষণ খুশি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাবান মাখতে পারে, যত খুশি জল ঢালতে পারে। কেউ বাধা দেওয়ার নেই। বাবা স্নান সেরে খেয়েদেয়ে অনেক আগেই বেরিয়ে পড়েছেন। ফিরতে ফিরতে তাঁর সেই দুটো আড়াইটে। কোন কোন দিন আরো দেরি হয়। বাথরুম বেশিক্ষণ আটকে রাখলে শুধু মা এসে মাঝে মাঝে তাগিদ দেবেন, 'হল তোর? আর কত দেরি?'

খেতে, বসতে, শুতে মা শুধু তাগিদ দিতেই থাকেন। তিনি নিজেও এক-মুহূর্ত সুস্থ থাকবেন না, আর কাউকেও স্থির হয়ে কোথাও বসে থাকতে দেবেন না। দু তিনটি ঝি চাকর আছে বাড়িতে। তবু কোন সময়েই তাঁর ফুরসত নেই। কাজের বিরাম নেই। ঘর-সংসারের কাজ খুবই ভালোবাসেন তিনি। এই-ই তাঁর সমস্ত পৃথিবী। এর বাইরে যেন কিছু নেই। এর বাইরে যেন কিছু না থাকলেও চলে। আর কোন শখটখ নেই মার। জোর করে কেউ যদি তাঁকে সিনেমা থিয়েটারে ধরে নিয়ে যায় তো তিনি যাবেন। না হলে ওসব নাম মুখেও আনবেন না। আশ্চর্য মানুষ। মন্দিরাও কি ওই বয়সে এসে মার মতই হবে? বাইরে আর কোন দিকেই কোন আগ্রহ থাকবে না? কৌতূহল থাকবে না? শুধু ঘরসংসার রান্নাবান্না নিয়েই খুশী থাকবে? ভাবাই যায় না। এক বয়স থেকে আর এক বয়সের সুখ দুঃখকে পুরোপুরি বোঝা যায় না হয়তো। ছন্দার বয়সে মন্দিরাই কি জানত তিন চার বছরের মধ্যে জীবন এমন করে জট পাকিয়ে উঠবে? সে জট ইচ্ছা করলেই খোলা যাবে না? এমন কি খোলার ইচ্ছাও হবে না! যদি এমন হয় এ জট কখনো খোলাই যাবে না? দিনের পর দিন শুধু গিঁট পড়বে আর গিঁট পড়বে। যদি এমন হয়—

কেউ তাগিদ না দিলেও বাথরুমে আজ আর বেশি দেরি করল না মন্দিরা। সাবান মেখে চৌবাচ্চা থেকে ঝপ ঝপ করে কয়েক মগ জল ঢেলে স্নান শেষ করল। একটি গানের কলি মৌমাছির মত মনের মধ্যে গুন-গুন করছে, 'সকল ভাবনা ডুবানো ধারায় করিব স্নান।' কিন্তু পরের কলিটির সঙ্গে মন্দিরার মনোভাবের মিল নেই। 'ব্যর্থ বাসনার দাহ হবে নির্বাণ।' না, সে নির্বাণ চায়

না। আর তার বাসনা ব্যর্থও নয়। তবে দাহ? দাহ আছে বইকি। বাসনা থাকলেই তার দাহ থাকে। যৌবন থাকলেই তার জ্বালা থাকে। গতযৌবনা অধ্যাপিকাদের দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়। এথিকসের নীলিমাদির কথাটা বিশেষ করে মনে পড়ে মন্দিরার। রোগাটে চেহারা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। বিয়ে-থা করেননি। কেন করেননি তা নিয়ে অনেক কিংবদন্তী আছে। নীতিশাস্ত্রের শুড আর শুড নট্-এর ফাঁকে ফাঁকে নীলিমাদি তাদের দিকে মাঝে মাঝে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকেন। বলেন, 'বেশ আছ তোমরা। থাকবে না কেন, এই তো বেশ থাকবার বয়স।' সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য প্রসঙ্গটা পালটে নেন নীলিমাদি। তরুণ বয়স যে হেলাফেলার বয়স নয়, জীবনকে গড়ে তোলবার বয়স। আর অধ্যয়নই হল সেই জীবনগঠনের সোপান। জীবনের তপস্যা। অনেক বড় বড় তত্ত্বকথা দিয়ে একটি জীবনসত্যকে ঢাকবার চেষ্টা করেন নীলিমাদি। তবু কি ঢাকা পড়ে? তবু সেই সুর যেন বেজে বেজে ওঠে।

'বেশ আছ তোমরা।' সত্যিই বেশ আছে মন্দিরা। আকাশে বাতাসে সেই বেশ থাকার সুর ছড়ানো। সবুজ কলাপাতা রঙের শাড়িটাই পরবে, না বাসন্তী রঙের? মনস্থির করতে একটু সময় লাগল মন্দিরার। শশাঙ্কদার অবশ্য দুই-ই পছন্দ। কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'তুমি যা পরো তাই তোমাকে মানায়। কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডণং নাকৃতীনাম্?'

মন্দিরা হেসে বলেছিল, 'আহাহা। তাই বলে বাকল কিন্তু পরতে পারব না। সে যা শকুন্তলাই পরে গেছেন।'

শেষ পর্যন্ত চাঁপা রঙের শাড়িখানাই পরল মন্দিরা। সযত্নে চোখে কাজল দিল। আলতো করে পাউডারের পাফ বুলাল মুখে, ঠোঁটে স্বাভাবিক রঙের ওষ্ঠরঞ্জনী। যাতে ধরা যায় না, আবার যায়ও। যে দেখতে জানে, সেই শুধু দেখে।

এমন করে রোজ মন্দিরা সাজে না। সাজবার ইচ্ছাও হয় না। কিন্তু আজ সকাল থেকেই কিসের এক তীব্র ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসেছে। সকালে সূর্যের মধ্যে জীবনের উজ্জ্বল বর্ণকে সে দেখতে পেয়েছে। সূর্য তো রোজই ওঠে। কিন্তু রোজই কি সে কোন বিশেষ অর্থ নিয়ে দেখা দেয়? শুধু কোন কোন দিনই মনে হয় সত্যিই সে উদিত হয়েছে। জীবনকে অফুরন্ত আলোর ঐশ্বর্যে ভরে তুলেছে।

ঠাকুরচাকর নয়, মা নিজেই পরিবেশন করলেন। মাছ তরকারির কয়েকটি পদই তিনি এর মধ্যে রেঁধে ফেলেছেন। বাবাও তাই চান। নিজের হাতে বাজার না করলে তাঁর মন ওঠে না, চাকর একটি সাক্ষীগোপালের মত পিছনে পিছনে থাকে এই পর্যন্ত। রান্নার বেলায়ও তাই। ঠাকুর একজন নামে আছে। কিন্তু মা-ই সব করেন। মন্দিরারও মার হাতের রান্না ছাড়া আর কিছু রোচে না। শুধু কি মন্দিরার? সব ক'টি বোনেরই খাদ্যরুচি একই রকম।

'মাছের ঝোলটা আজ বেশ হয়েছে মা।'

এতক্ষণে ইন্দ্রাণীর মুখে হাসি ফুটল। রেঁধে রেঁধে বুড়ো হয়ে গেলেন। কিন্তু এখনো রান্নার সুখ্যাতি শুনলে খুশী হন। বললেন, 'দেব নাকি আর একখানা মাছ? খাবি?'

'না মা, এখন থাক। বিকেলে এসে—'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'হ্যাঁ, বিকেলে কত খাও। যত পচা মাংসের চপ কাটলেট খেয়ে পেট ভরে আস।'

বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বাইরে কচিৎ কখনো খায় মন্দিরা। কিন্তু মা তা নিয়ে নিত্য খোঁটা দেবেন। বলবেন, 'ঘরে এত ভালো ভালো খাবার করি তাতে তোদের মন ওঠে না। বাইরের যত পচা অখাদ্য কুখাদ্য তোদের কাছে অমেরতো।'

কথা শোন মার। ঘরের খাবার তো আছেই। তার সঙ্গে স্বর্গের অমৃতেরও তুলনা হয় না। কিন্তু তাই বলে কি এক-আধ দিন মুখ বদলাতে ইচ্ছে করে না মানুষের! মা যাকে বলেন অখাদ্য কুখাদ্য, মানুষের তা চেখে দেখতে ইচ্ছা হয় না! খেয়ে দেখলে বুঝতেন জিনিসগুলি কি সুস্বাদু। কিন্তু তিনি কোন দিনই খাবেন না। মার মনে ধর্মভয় প্রবল। আর শুচিবায়ুতাও আছে। এইজন্যেই তিনি পৈতাধারী ঠাকুরের রান্না পর্যন্ত খেতে চান না। বলেন, পৈতা থাকলেই কি আর বামুন হয়? বাবার আপত্তি অন্য কারণে। তিনি স্বাস্থ্যের দিক থেকে কথা বলেন। এক হাতে স্বাস্থ্যনীতি আর এক হাতে মনুসংহিতা। নীতি সংযম আর কাজ। বাবার মুখে দিনভর শুধু এই রব। যত সব কঠিন কঠিন শব্দ। যে সব শব্দের কোন রূপ নেই, ধ্বনির মাধুর্য নেই। কিন্তু কী ভাগ্য, সবাই বাবার মত নয়, সব পুরুষ সমান নয়। অন্তত একটি পুরুষকে মন্দিরা জানে, যাঁর কাছে শব্দ মানে শুধু রূপ, শব্দ মানে শুধু ধ্বনি। অর্থের দিকে তাঁর মোটেই নজর নেই। নাই-বা রইল। অর্থগৌরবই কি জীবনে একমাত্র গৌরব? অর্থের সাধনা ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে মন্দিরা। এবার স্বাদে আর স্বরূপে অনর্থকে দেখতে চায়।

গাড়ির শব্দ শুনে চমকে উঠল মন্দিরা। বাবা ফিরে এসেছেন। এ সময় তাঁর আসবার কথা নয়। তবু এসে পড়েছেন। শুকলাল এসে বলল, 'আর কেন দিদিমণি, এবার তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। বড়বাবু আবার এক্ষুনি বেরোবেন।'

এক্ষুনি যদি বেরোবেন, তবে এক্ষুনি এলেন কেন?

কথাটা শুকলালকে জিজ্ঞাসা করল না মন্দিরা। কিন্তু নিজের মনেই প্রশ্নটিকে খড়্গের মত খাড়া করে ধরল।

যোগরঞ্জন বললেন, 'কলে এসেছিলাম এদিকে। ফেরার পথে ভাবলাম তোর তো এই সময় ক্লাস। তোকে পৌঁছে দিয়ে যাই।'

বাবার কথাটা ঠিক বিশ্বাস্য মনে হল না মন্দিরার। কলটল নিতান্তই

ছল। বাবা তাঁকে নিজে গাড়িতে করে পৌঁছে দেবেন বলেই এসেছেন। কেন, বাড়ির গাড়িতে না গেলে সে কি কলেজ পালিয়ে অন্য কোথাও যেত? এত অবিশ্বাস কেন তাকে? বাড়ির গাড়িতে সে ক'দিনই বা যায়? তাই বলে সে কি কলেজে যায় না?

মন্দিরা বলল, 'এত কষ্ট করতে গেলে কেন বাবা? আমি তো বাসেই বেশ যেতে পারতাম।'

যোগরঞ্জন বললেন, 'তা পারতে। কিন্তু আমি চাই না ওই ভিড়ের মধ্যে—। বিশেষ করে তেত্রিশ নম্বর বাসের যা অবস্থা—।'

এখন আর ধুতি পাঞ্জাবি পরেননি যোগরঞ্জন। এখন একেবারে ডাক্তার-সাহেব। সাদা শার্ট আর ট্রাউজারে দিব্যি মানিয়েছে ওঁকে। বয়স যেন আরো বছর পাঁচেক কমে গেছে।

যোগরঞ্জন মেয়েকে বললেন, 'চল, আর দেরি করিসনে।'

শুকলাল বলল, 'আমি আসব নাকি বড়বাবু!'

যোগরঞ্জন বললেন, 'না, তোর এসে দরকার নেই। তুই যা করছিস কর।'

ইন্দ্রাণী দোরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বামীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'বুঝতে পেরেছি।'

যোগরঞ্জন বললেন, 'এর মধ্যে আবার বোঝাবুঝির কী আছে।'

ইন্দ্রাণী হেসে বললেন, 'কিছু একেবারে নাই বা থাকবে কেন?—সকালে মেয়েকে বকেছ, তাই আবার আদর করতে ফের ছুটে এসেছ। তোমার কি আর রোগী দেখাদেখি আছে? মেয়ে তো নয় একেবারে চোখের মণি।'

যোগরঞ্জন একথার কোন প্রতিবাদ করলেন না।

বাবার পাশে বসে যেতে কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল মন্দিরা। একবার ভয়ও হয়, হয়তো তিনি ধমক দিয়ে উঠবেন, 'অত সেজেছিস কেন? থিয়েটার সিনেমায় যাচ্ছিস, না বিয়ে-বাড়িতে?'

কিন্তু যোগরঞ্জন কিছুই বললেন না। এক পাল মোষ যাচ্ছিল, তাদের পাশ কাটিয়ে গাড়িকে বের করে নিতে নিতে বললেন, 'দেখেছিস রাস্তা! এই মোষের খাটাল যে এখান থেকে কবে যাবে তাই ভাবি। জায়গাটাকে একেবারে নরক করে তুলেছে। এবারের ইলেকশনে ওরা আমাকে দাঁড়াতে বলছে। যদি জিততে পারি, দেখবি এপাড়ার চেহারাই আমি ফিরিয়ে দেব।'

মন্দিরা এবার পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ পেল। বলল, 'ইলেকশনে তুমি জিততে পারবেই না বাবা। গতবারও তো চেষ্টা করলে। মিছামিছি কতকগুলি টাকা খরচ হয়ে গেল।'

'তাহলে এবার আর দাঁড়াব না বলছিস?'

'কী দরকার। তুমি ডাক্তার, ডাক্তারি নিয়েই থাকো। তাতেই তোমার নাম যশ হবে।'

যোগরঞ্জন বললেন, 'আমি বুঝি শুধু নাম যশের কাঙাল? তাই ভাবিস বুঝি তুই? আমার এক কাজ কি আর-এক কাজ ছাড়া? শুধু কি ওষুধ দিলেই রোগীর রোগ সারে? সে কী খায় পরে, কোথায় বাস করে তাও বুঝি দেখতে হয় না?'

লেভেল ক্রসিং-এর কাছে আজ আর দাঁড়াতে হল না। এখন কোন ট্রেন নেই। রাস্তা পরিষ্কার। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাবা তাকে পার্কের মোড়ে নামিয়ে দিলেন। ঠিক কলেজের গেট পর্যন্ত আর গেলেন না। মন্দিরার কথা রাখলেন!

মন্দিরা নেমে দাঁড়ালে যোগরঞ্জন বললেন, 'আজ তোর কটায় ছুটি?'

'সাড়ে তিনটায়। কিন্তু বাবা, তুমি যেন আবার গাড়িটাড়ি পাঠিয়ো না।'

'কেন?'

'ছুটির পর আমি একটু মিনুদের ওখানে যাব।'

যোগরঞ্জন মেয়ের দিকে তাকালেন, তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, 'আচ্ছা. যেতে হয় যেয়ো। কিন্তু বেশি দেরিটেরি কোরো না।'

কলেজের গেট দিয়ে দলে দলে মেয়েরা ঢুকছে। মন্দিরার দিকে কেউ তাকাচ্ছে, কেউ তাকাচ্ছে না, কেউ একটু তাকিয়ে একটু হেসে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দলের আরো মেয়েদের সঙ্গে চলে যাচ্ছে। শুধু একজন নড়ছে না, অন্য কোন দিকে তাকাচ্ছে না, দুটি অপলক চোখে শুধু মন্দিরার দিকে চেয়ে আছে। মুখে সেই পরিচিত মৃদু মিষ্টি হাসি। মন্দিরার বন্ধু। মাঝে মাঝে মনে হয়, বন্ধুত্ব সবচেয়ে বড়। এমনকি, প্রেমের চেয়েও। অন্তত প্রেমের আগে যে তার জন্ম, তাতে কোন সন্দেহ নেই মন্দিরার। এখনো মাঝে মাঝে তার সংশয় হয়, সে মীনাক্ষীকে বেশি ভালোবাসে, না, শশাঙ্কদাকে। কোন দেবতা যদি বর দিতে এসে বলেন, 'তুমি দুজনের মধ্যে কাকে চাও, বেছে নাও।' মন্দিরা চট করে জবাব দিতে পারবে না। শুধু একজনকে নিয়ে কি জীবন চলে? মন্দিরা এক হাতে শশাঙ্কদার হাত ধরবে, আর এক হাত মীনাক্ষীর দিকে বাড়িয়ে দেবে। দুজনের মধ্যে তো কোন বিরোধ নেই। কিন্তু এমন সম্বন্ধ আছে, যেখানে মিলনের চেয়ে বিরোধই বড়; যেখানে একজনকে চাইলে আর-একজনকে পাওয়া যায় না, যেখানে একজনকে নিলে আর-একজনকে ত্যাগ করতে হয়।

'কখন এলি রে মিনু?'

মীনাক্ষী বলল, 'এই একটু আগে। তিন-চার মিনিটও হয়নি। তোকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখলাম, তুই গাড়ি থেকে নামছিস। কে ছিলেন রে সঙ্গে? বাবা?'

মন্দিরা হেসে বলল, 'আবার কে? দুষ্টু কোথাকার?'

'আর বুঝি কেউ থাকতে পারেন না? আমি বুঝি আর জানিনে কিছু?'

জানবে না কেন? মন্দিরা তার এই অন্তরঙ্গ বন্ধুটিকে সবই জানিয়েছে। মীনাক্ষী জানতে চায়নি। ওর মনে তেমন উগ্র ধরনের কৌতূহল নেই। কি থাকলেও মিনু তা চাপতে জানে। মন্দিরাই সব বলেছে। তার সুখের কথাও বলেছে, দুঃখের কথাও বলেছে। অন্তহীন সমস্যার কিছুই গোপন রাখেনি। মিনু যেন আর কেউ না, মন্দিরার নিজেরই দ্বিতীয় সত্তা। ওর সঙ্গে কথা বলা যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলা মন্দিরার, যেন নিজেরই সরব চিন্তা।

কম্পাউন্ড পার হয়ে দুজনে ভিতরে ঢুকল। তারপর হল-ঘরের দিকে এগোতে লাগল।

মীনাক্ষী বলল, 'কি রে রাগ করলি, মন্দিরা?'

'বাঃ রে রাগ করব কেন? তুই জানবি না তো জানবে কে? আরো কেউ অবশ্য থাকতে পারত। কিন্তু ওই রেডক্রস মার্কা গাড়িতে বাবা ছাড়া আর কে থাকবেন বল? তাছাড়া আর কেউ কি আর কলেজের গেট পর্যন্ত নামিয়ে দিতে আসত? সেই সাহস হতো তার?'

মীনাক্ষী বলল, 'তা বলা যায় না। তোদের দুজনেরই অসীম সাহস। যেমন তোর, তেমনি তাঁর। আমি হলে তো—'

মন্দিরা বলল, 'তুই হলে—। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি যদি তুই হতাম বেশ হতো। তোর মত অমন শান্ত শিষ্ট বুদ্ধিমতী, ধীর স্থির—কারো দিকে কোন আকর্ষণ নেই, কোন জ্বালা-যন্ত্রণাও নেই, তোর মত যদি আমি হতাম মিনু, বেঁচে যেতাম।'

হলঘরে ঢুকে মাঝামাঝি জায়গায় পুব দিকে পাশাপাশি দুটি কোণের আসন নিয়ে ওরা বসল। ইংরেজীর ক্লাস আরম্ভ হবে। জুলিয়াস সীজার পড়াচ্ছেন মিসেস ব্যানার্জি। চমৎকার পড়ান। মেয়েরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে। কিন্তু এখনো প্রফেসরের আসতে কয়েক মিনিট দেরি আছে। মেয়েরা এখন কলরবে মুখরা ছোট-ছোট দল। দলে দলে আবার দলাদলিও আছে। কিন্তু মন্দিরা আর মীনাক্ষী যেন একটি দ্বিদল পুষ্প। একান্ত আত্মমগ্ন। ওদের এই অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠতা নিয়ে অনেকে কথা বলে। মন্দিরা তা জানে। মীনাক্ষীরও তা কানে গেছে। কিন্তু ওরা কেউ তাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। আর কোন মেয়ে এসে ওদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরাতে পারেনি। মীনাক্ষী অবশ্য ছাত্রী হিসেবে অনেক ভালো। পড়াশুনোয় ওর মনও খুব। মন্দিরা তেমন নয়। কোনবারই সে সেকেন্ড ডিভিশনের ওপরে উঠতে পারেনি। কিন্তু মিনু প্রতিবারই ফার্স্ট ডিভিশনওয়ালী। ম্যাট্রিকুলেশনে, আই-এতে লেটার পর্যন্ত পেয়েছে। একটুর জন্যে স্কলারশিপ হাতছাড়া হয়েছে। বি-এতে মিনু হয়তো সব পুষিয়ে নেবে। ফার্স্ট ক্লাস অনার্স যদি পায় মীনাক্ষী, অবাক হবার কিছু থাকবে না। মিনু খুব পড়াশুনো করে। আর কোন দিকে ওর মন নেই।

মন্দিরা মাঝে মাঝে ভাবে, সে-ও যদি অধ্যয়নকে অমন তপস্যা করে তুলতে পারত। আর কোন দুঃখ থাকত না, জ্বালা-যন্ত্রণা থাকত না, মিনুর মতই সে-ও দিনরাত অমনি বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতে পারত। কোন কোন দিন মন্দিরার ইচ্ছা হয়, সে-ও গোপনে গোপনে বন্ধুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। কোন ছেলেকে ছিনিয়ে নেওয়ার প্রতিযোগিতা নয়, ভালো মেয়ে হবার, ভালো ছাত্রী হবার প্রতিযোগিতা। কিন্তু তার নিজের মধ্যে যেন আরো একজন প্রতিযোগিনী ওত পেতে বসে রয়েছে। সে মন্দিরার ভালো ভালো সঙ্কল্পের ওপর বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে সেই সব সদিচ্ছা কোথায় যে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যায়, কোন হদিসই মেলে না। এই হিংস্র দুর্দমনীয় মন্দিরাই কি আসল মন্দিরা?

'আমি যদি তোর মত হতে পারতাম মিনু। তোর সঙ্গে কত খাতা পেন্সিল ডায়েরি ক্যালেন্ডার অদলবদল করেছি, তুই যখন আমাদের বাড়িতে এসেছিস, তোর শাড়ি আমি পরেছি, আমার শাড়ি তোকে পরতে দিয়েছি। তেমনি তোর স্বভাবের সঙ্গেও যদি আমার স্বভাবটা বদলে নিতে পারতাম।'

মীনাক্ষী ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, 'চুপ, মিসেস ব্যানার্জি এসে গেছেন। আর কথাটি নয়। তোকে আর কিছু বদলাতে হবে না। শুধু আমি যা বলছি, তাই কর। শুধু মন দিয়ে পড়াশুনোটা করে যা। দেখবি আর সব তুচ্ছ হয়ে গেছে। আর কোন দিকে মন দেওয়ার মত তোর সময়ই নেই।'

মিসেস ব্যানার্জি এসে রোল কল শুরু করলেন। হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর। অনেকটা মার মত দেখতে। কিন্তু মার চেয়ে বয়স অনেক কম। কে যেন বলেছিল, স্বামীর সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তবু শাঁখা-সিঁদুর ছাড়েননি। কী যে সব বাজে কথা মনে আসে মন্দিরার। মাথা নেড়ে যেন অবাঞ্ছিত চিন্তাগুলিকে মন্দিরা দূরে সরিয়ে দিল। সেই সঙ্গে এই চিন্তাও হল পাছে আর কেউ দেখে ফেলে তাকে। তাহলে পাগল ভাববে তাকে।

ইংরেজীর পরে পর পর দুটো অনার্স ক্লাস। বড় ঘর ছেড়ে ছোট ঘরে যেতে হল। কিন্তু যতবারই ঘর বদলাক, মীনাক্ষীর কোন অদলবদল নেই। শুধু লেকচার শুনল আর নোট নিল। এথিকস আর ইণ্ডিয়ান ফিলজফি, দুটোই ওর পরম প্রিয় বিষয়। গোপনে গোপনে ও অনেক পড়ে। ওর বাবার কাছ থেকেও বেশ সাহায্য পায়। বাপ আর মেয়ের মধ্যে প্রায় বন্ধুর মত সম্পর্ক। দেখতে ভারি ভালো লাগে মন্দিরার। যদি তাদেরও অমন হতো। ওর বাবা কিন্তু মাস্টারও নন, প্রফেসরও নন। সরকারী ফুড ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন। আর অবসর সময় পড়াশুনো নিয়ে থাকেন। বাপ মা মেয়ে তিনজনের ছোট সংসার। ল্যান্সডাউন রোডে তিনটি ঘরের একটি ফ্লাটে সেই সংসারটুকু বেশ ধরে গেছে। ভারি শান্ত আর নিরিবিলি। কোন রকম কোন জটিলতা নেই, ঝগড়াঝাঁটির অশান্তি নেই। বেশি [illegible]র সঙ্গে যোগাযোগও

ওঁদের আছে বলে মনে হয় না। ওঁরা যেন নিজেদের মধ্যে বড় বেশি সম্পূর্ণ, বড় বেশি পরিতৃপ্ত। মীনাক্ষীও তাই। বাইরের কারো সঙ্গে বেশি মিশতে পারে না। মেশাটা দরকার বলেও মনে করে না। এই জন্যেই ক্লাসে দেমাকী অহঙ্কারী বলে অখ্যাতি আছে মীনাক্ষীর। মন্দিরাও কি ওর বন্ধু হতে পারত? নিতান্তই স্কুলের আমল থেকে আলাপ পরিচয় আছে বলে এই ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ওর বন্ধুত্বের গৌরব শুধু মন্দিরারই আছে বলে অনেকে ওকে হিংসাও করে। শুধু তাই নয়, আরো নানারকম কথাই কানে গেছে মন্দিরার। মিনুর সঙ্গে সম্বন্ধ শুধু নাকি তার সখিত্বেরই নয়। আরো কিছু বেশি, আরো কিছু আছে। সেই স্কুলের আমল থেকেই এসব কথা শুনে আসছে মন্দিরা। প্রথম প্রথম ওরা কী বলতে চায় তার মাথায় যেত না। তারপর যখন বুঝতে পারল ভারি মজা লেগেছিল মন্দিরার। মেয়ে মেয়েতে ওরকম সম্বন্ধও হয় নাকি! 'যদি হয়, তাহলে আমি কিন্তু স্বামী, আর তুই আমার স্ত্রী হবি মিনু।'

মীনাক্ষী হেসে বলেছিল, 'ইস্ ভারি তো শখ তোর। তোকে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে।'

কিন্তু দুজনের মধ্যে মন্দিরাই পুরুষ হবার যোগ্য। মিনুর চেয়ে মাথায় মন্দিরা বেশ লম্বা আর গড়নও অমন নবনীত-কোমল নয়। শ্যামলা রঙ, টানা টানা নাক চোখ, মুখের মিষ্টি ডৌল আর মধুর স্বভাবটুকু নিয়ে মীনাক্ষী একেবারে বাংলা দেশের মেয়েলী মেয়ে। ওর নাম শ্যামলী হলেও হতে পারত। কিন্তু মন্দিরা ও জাতের মেয়ে নয়। স্কুল কলেজের থিয়েটারে সে তো ছেলেই সাজত, এখনো সাজে। মানায়ও বেশ। অনেক ছেলের চেয়েই ছেলে হিসাবে তাকে ভালো মানায়। বাবার ছেলের বড় শখ ছিল। এখনো আছে। কোন বাপ-মায়েরই বা না থাকে। মেয়ের চেয়ে ছেলের দাম বেশি, একথা যতবার শোনে ততবার হিংসা হয় মন্দিরার, রাগ হয়, ছেলেদের ওপর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা হয়। তবু ছেলেবেলায় মা তাকে শখ করে মাঝে মাঝে সাজাতেন। দিদি হবার পরে কোন কোন জ্যোতিষী নাকি বাবাকে বলেছিলেন, 'এবার তোমার ছেলে হবে।' কিন্তু মন্দিরা এসে সব ভবিষ্যদ্বাণী নষ্ট করে দিয়েছে। কোষ্ঠী আর করকোষ্ঠীতে বাবার বিশ্বাস উন্মূলিত, মার বিশ্বাস শিথিল করে ছেড়েছে। তারপর অবশ্য বাবার আরো দুটি মেয়ে হয়েছে, ছেলে আর হয়নি। কিন্তু মন্দিরা ওঁদের যেভাবে হতাশ করেছিল তেমন আর কোন মেয়েই করতে পারেনি। নিজের সেই বালকবেশ এখনো মাঝে মাঝে মনে পড়ে মন্দিরার। শুধু স্মৃতির দেয়ালেই নয়, তাদের পারিবারিক পুরোন অ্যালবামেও কিছু কিছু ফোটো এখনো আছে। কখনো ট্রাউজার আর শার্টে কখনো ধুতি পাঞ্জাবিতে মন্দিরা ছেলে হয়ে বাবা মা আর দিদির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেবেলায় পুরুষের বেশ, আরো একটু বড় হয়ে পুরুষের স্বভাব নিজের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে

মন্দিরা। মেয়ে বলে মনেই হয়নি নিজেকে। একবার তো আধা ঠাট্টার ভঙ্গিতে মিনুকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে চুমু পর্যন্ত খেয়েছিল মন্দিরা। কাণ্ড দেখে মীনাক্ষীর কি রাগ আর লজ্জা। মন্দিরাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল মীনাক্ষী। সারাদিন ছিল। ওর ভাবভঙ্গী দেখে মন্দিরার মনে হয়েছিল মিনু বুঝি তাদের বাড়িতে আর কোনদিনই আসবে না, কথাও বলবে না। মন্দিরার মত খারাপ মেয়ের সঙ্গে চিরদিনের জন্যে বুঝি সম্পর্ক ছেদ করে ফেলল। কিন্তু সেই বিচ্ছেদ স্থায়ী হয়নি। দু'একদিনের বেশি তার সঙ্গে আড়ি করে থাকতে পারেনি মীনাক্ষী। একটি খারাপ মেয়ের সঙ্গে একটি সৎ মেয়ের সম্পর্ক অচ্ছেদ্যভাবেই যেন জড়িয়ে রয়েছে। সেই স্পর্শ, সেই আবেগ মিনুরও কি ভালো লেগেছিল? মিনু অবশ্য তা কখনো স্বীকার করেনি, তাকে আর প্রশ্রয়ও দেয়নি। মন্দিরা যাই করুক মিনু তাকে সব সময় সৎ পরামর্শ দিয়েই চলেছে। মনে মনে মিনুর যেন পণ বন্ধুকে সে ত্যাগ করবে না, শুধু ভুল পথ থেকে তাকে সরিয়ে আনবে। যত দিনই লাগুক, যত দেরিই হোক, মিনুর ধৈর্যের যেন সীমা নেই। মিনু যদি কেবল একা মিনুই হতো তাহলে কি ওই হিতকারিণী, নীতিশাস্ত্রধারিণী মেয়েটিকে একবেলার বেশিও সহ্য করতে পারত মন্দিরা? আধখানা মিনু যে তার মধ্যেও আছে, আর সে মাঝে মাঝে পুরো আর একখানা মিনুই হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু পেরে ওঠে না। কেন পারে না কে জানে? এই না পারাটাকে মন্দিরা মাঝে মাঝে নিজের ক্ষমতা বলে জাহির করে, আর মাঝে মাঝে অক্ষমতার লজ্জায় কাঁদে। মিনু আকারে প্রকারে তার মত নয় বলেই যেন ওকে আরো বেশি ভালোবাসে মন্দিরা, পুরুষ যেমন তার বিপরীত আকৃতি প্রকৃতির জন্যে বাসনার আধার হয়ে ওঠে।

মিনুই একদিন বলেছিল, 'তুই পুরুষ হলেও হতে পারতি মন্দিরা।'

'কেন রে?'

'তুই পুরুষের মতই অ্যাগ্রেসিভ।'

'তুই কী করে জানলি পুরুষেরা অ্যাগ্রেসিভ হয়? তুই কি কারো আক্রমণ সহ্য করেছিস?'

'আর কারো আক্রমণের আমার দরকার নেই ভাই। তোর আক্রমণ দেখেই আমি থ হয়ে গেছি। সেদিন মেরে ফেলেছিলি আর কি।'

মন্দিরা হেসে বলেছিল, 'ফাজিল কোথাকার। কেউ কেউ মেরে বাঁচে, কেউ কেউ মরে বাঁচে। বাঁচবার জন্যে তোকেও একদিন মরতে হবে মিনু। নইলে পুরোপুরি বাঁচতে পারবিনে।'

পুরুষ হলেও হতে পারত; পুরুষ না হয়েও এতদিন প্রায় পুরুষ হয়েই তো ছিল মন্দিরা। শুধু একজন এসে তার প্রকৃতিকে একেবারে পালটে দিল। মন্দিরা যে পুরুষ নয়, মেয়ে, ষোল-আনা মেয়ে, সে কথা তাকে দেখবার আগে কি এমন করে কোনদিন বুঝতে পেরেছে মন্দিরা! গ্রীনরুমের মেক-আপ তার

একেবারেই ঝরে পড়েছে। কিছুতেই নকল গোঁফ দাড়ির আড়ালে তার আর আত্মগোপন করবার জো নেই। কিন্তু পুরুষ সেজে, পুরুষের স্বভাব নিয়ে থাকতে পারলেই যেন ভালো ছিল। মেয়ে হওয়ায় বড় যন্ত্রণা, বড় কষ্ট। আর মেয়ে মানেই অসূর্যম্পশ্যা। অসূর্যম্পশ্যা অথচ সূর্যের স্পর্শের জন্যে, তার আলো আর উত্তাপের জন্যে আকুলি-বিকুলির সীমা নেই। ভালোবেসে মেয়েরাই কি বেশি কষ্ট পায়? কে জানে? শশাঙ্কদার মনে কোন দুঃখ কষ্টের ছোঁয়া লাগে বলে তো মনে হয় না। মনে হয় যত দুঃখ, যত যন্ত্রণা সব শুধু মন্দিরারই। শশাঙ্কদার কাছে শুধু খেলা। খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি ভালোবাসেন না, শুধু খেলতে ভালোবাসেন। অনেকেই সে কথা বলে। অনেককে নিয়েই তিনি নাকি খেলেছেন, মিনু তাকে বহুবার সাবধান করে দিয়েছে। তবু তো সাবধান হতে পারল না মন্দিরা। খেলার পুতুল হবে বললেও পুতুল হওয়ার সাধ ছাড়তে পারল না। হাতের ছোঁয়ার লোভ ছাড়তে পারল না। পুতুল হয়েও যে ছোঁয়াটুকু পাওয়া যায় সেই অগ্নিস্পর্শের জন্যে মন্দিরার সর্বাঙ্গ আকুল হয়ে রইল। বড় যন্ত্রণা—যাকে ভালোবাসে তাকে অবিশ্বাস করার চেয়ে বেশি যন্ত্রণা আর কিসে আছে মন্দিরা তা ভাবতে পারে না। এই সংশয় আর অবিশ্বাসের যন্ত্রণা, পদে পদে লাঞ্ছিত হবার ভয়, বঞ্চিত হবার গ্লানি শুধু কি মেয়েদের ভাগ্যেই জোটে? পুরুষরা কি এই বন্ধন-ভয় থেকে একেবারে মুক্ত পুরুষ? মাঝে মাঝে পুরুষ হয়ে দেখবার সাধ যায় মন্দিরার। কিন্তু সেই সাধ্য বোধ হয় আর তার নেই। যদি থাকত ওই মীনাক্ষীকে ইলোপ করে নিয়ে সে কোথাও পালিয়ে চলে যেত। কিন্তু আজ মন্দিরাকে নিয়ে কেউ পালাক সেই প্রত্যাশায় সেই প্রতীক্ষায় দিন গুণতে হয়, রাত জাগতে হয়।

তিন পিরিয়ডের পর এক ঘণ্টা অফ। সেই বিরতির ঘণ্টায় মন্দিরা বন্ধুর কাছে ফের মুখ খুলতে পারল। ক্লাসরুমের ভিড়ে নয়, কমনরুমের নিরিবিলি কোণে গিয়ে ফের যখন সে মীনাক্ষীর পাশে দাঁড়াল শুধু তখনই অন্য কথা পাড়বার সুযোগ হল তার। এতক্ষণ মীনাক্ষী প্রত্যেকটি প্রফেসরের লেকচার মন দিয়ে শুনেছে, খাতাভরে নোট নিয়েছে। মন্দিরা যে তার পাশেই বসে আছে সেই জ্ঞানই হয়তো তার ছিল না। মন্দিরাও কি সব সময় তার পাশে বসে থাকা ওই বন্ধুটির সম্বন্ধে সচেতন ছিল? তারও মত কত কী চিন্তা করেছে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঢুকেছে আবার বেরিয়ে এসেছে, বাল্য-স্মৃতি, কৈশোর-স্মৃতির পাতা উলটে উলটে দেখেছে, আবার হয়তো কিছুক্ষণ প্রফেসরের বক্তৃতা শুনেছে। আশ্চর্য আর অবাধ গতিবিধি তার মনের। তার দেশের বাধাও নেই, কালের বাধাও নেই। কোন নিষেধের বাঁধনেই যে তাকে বেঁধে রাখতে পারে না মন্দিরা।

জানালার ধারে দুজনে এসে দাঁড়াল। বাইরে উজ্জ্বল আকাশ, উজ্জ্বল পৃথিবী। কিন্তু এই মুহূর্তে মন্দিরার মনে সেই উজ্জ্বলের ছাপ কোথায়।

শশাঙ্কদার সঙ্গে দেখা হবে এই সম্ভাবনায় সকালে তার যে মন উল্লসিত হয়ে উঠেছিল কলেজে এসে তার সেই মনেই ফের বিষণ্নতার ছায়া নেমেছে। মন্দিরার এখন মনে হচ্ছে, গিয়ে কী হবে? এত ঝুঁকি নিয়ে এত বিধিনিষেধ ভেঙে সে যাঁর কাছে যাচ্ছে তিনি কি তাকে সত্যিই ভালোবাসেন? না এ তার নিতান্তই খেলা, সময় কাটাবার উপকরণ মাত্র? ওঁর জীবনে যে আরো কেউ কেউ এসেছিল তা তো উনি অস্বীকার করেন না, মন্দিরা ছাড়াও আরো কেউ কেউ আছে, কি থাকতে পারে সে সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শশাঙ্কদা এসব ব্যাপারে ভারি চতুর ব্যক্তি। আসল কথা ঢাকবার, আসল কথা এড়িয়ে যাওয়ার মত ওস্তাদ ওঁর মত আর কেউ নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'এই মুহূর্তে তুমিই একেশ্বরী। এর আগে কী ছিল, পরে কী হবে তা নিয়ে মাথা ঘামালে মিছামিছি এখনকার আনন্দটুকু নষ্ট হয়ে যাবে।'

শুধু মুহূর্তের আনন্দ! কিন্তু মন্দিরা তো তা চায় না। সে চায় পুরো একটি জীবন। সেই জীবনব্যাপী অবিচ্ছিন্ন সুখ আর আনন্দ। পথের ভিখিরী মেয়েরা যেমন পয়সা কুড়োয়, তেমনি দুটি একটি করে সুখের মুহূর্ত সঞ্চয় করে তার লাভ কি? কিন্তু শশাঙ্কদা নিজের অভ্যাসে অটল। যা কেউ পারেনি মন্দিরা কি তা পারবে না? তাঁকে টলাতে পারবে না, সরাতে পারবে না? মন্দিরার মনে হয় যত বিদ্বান যত বুদ্ধিমানই শশাঙ্কদা হন, তিনি ঠিক পথে যাচ্ছেন না। শুধু কয়েকটি মুহূর্ত নিয়েই তো আর মানুষের জীবন কাটে না, তাকে গোটাজীবনের কথা ভাবতে হয়। আরো দশজনকে নিয়ে চলতে হয়। একটি বিশেষ লক্ষ্য সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হয়। শশাঙ্কদা তো তা এগোতে পারছেন না। তিনি সাফল্যের পথ থেকে সার্থকতার পথ থেকে বার-বার সরে সরে যাচ্ছেন। আর ভাবছেন এই সরে যাওয়াটাই বাহাদুরি। মন্দিরা কি তাঁর ভুল শুধরে দিতে পারবে না? তাঁকে ঠিক পথে নিয়ে এসে তাঁকে গৌরবের আসনে বসিয়ে দিতে পারবে না? মন্দিরা কি আরো পাঁচজনের মত তাঁর অবসর কাটাবার সঙ্গিনী হতেই জন্মেছে? কখনোই না। যারা পুরুষকে সঙ্গদানের বদলে শুধু টাকা চায়, শাড়ি গয়না চায়, কি চাকরি চায়, চাকরিতে উন্নতি চায়, মন্দিরা সে জাতের মেয়ে নয়। শশাঙ্কদা কি তাকে চেনেন না? ছেলেবেলা থেকেই তাকে দেখে আসেননি?

নিজের কাছে নিজের মর্যাদা ফের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে মন্দিরা যেন স্বস্তি পেল। আর তার মনে কোন গ্লানি নেই, অসম্মানবোধ নেই। নিজেকে সে বেশ কয়েক ধাপ ওপরে তুলে নিয়ে যেতে পেরেছে। শশাঙ্কদাকে সে নেমে যেতে দেবে না, ঊর্ধ্বে তুলে নেবে, তাঁর জীবনকে কলঙ্কমুক্ত করবে, তাঁকে গৌরবের আসনে বসিয়ে তাঁর পাশে বসবে মন্দিরা। একটি মহৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে নিজেকে বাঁধতে পেরে সে ভারি তৃপ্তি পেল। এতক্ষণ যে ক্লাসে হাজির থেকেও ক্লাস পালিয়েছে, প্রফেসরদের বক্তৃতা ভালো করে শোনেনি, শুনতে

শুনতে বিমনা হয়ে পড়েছে, একটি লাইনও নোট নেয়নি, মন্দিরার এই উচ্চ সঙ্কল্পে সেই অপরাধেরও যেন এতে স্খালন হয়ে গেছে। সব লোকসান মন্দিরার এতে পুষিয়ে যাবে।

মীনাক্ষী বলল, 'কী বলবি বল। কথা বলবি বলে ডেকে এনে এমন গোমরা-মুখ করে রইলি কেন?'

মন্দিরা বলল, 'তোর ধমক খাব বলে। তোর তিনটে কর্তব্য আমি আবিষ্কার করেছি। লেখা পড়া আর আমাকে ধমকানো। তুই বোধ হয় আর জন্মে আমার ঠাকুরমা দিদিমাদের কেউ ছিলি।'

মীনাক্ষী বলল, 'ধমকাবার কাজ করলেই ধমক খেতে হয়। সারাদিন আজ কী করলি বল তো। তোকে যেন জোর করে ধরে বেঁধে কেউ ক্লাসে বসিয়ে রেখেছে।. আসলে তোর পড়ায় মন নেই, কোন প্রফেসরের কথা তোর কানে যায়নি।'

মন্দিরা হেসে বলল, 'না রে আমি অতটা কালা নই। কিছু কিছু গেছে।'

মীনাক্ষী বলল, 'না না, হাসবার কথা নয়। তুই তো কলমটাও একবার খুলিসনি, একটা লাইনও নোট নিসনি। কী করে পাশ করবি বল তো? তোর একটুও চিন্তা হয় না?'

মন্দিরা বলল, 'চিন্তা করে আর করব কী। চিন্তাহরণী তো তুই-ই আছিস। তোর শাড়ির আঁচল ধরেই পরীক্ষা-সাগর সাঁতরে পার হয়ে যাব। আমি তো আর তোর মত ফার্স্ট ক্লাসের স্বপ্ন দেখিনে। কোনরকমে তরে যেতে পারলেই হল। শেষ দু'মাস আমাদের ভরসা, সেই দু'মাস আদা নুন খেয়ে মুখস্থ-টুখস্থ করে পার হবার চেষ্টা করতে হবে। শেষের সেদিন আসতে এখনো ঢের দেরি।'

মীনাক্ষী বলল, 'তুই তো হাসিস, কিন্তু তোর কথা ভেবে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তোর যে কী দশা হবে আমি ভেবেই পাইনে।'

মন্দিরা বলল, 'সত্যি অত ভাবিস তুই আমার জন্যে! তোর ক্যারিয়ারের ভাবনার ফাঁকে এত সময় পাস!'

মীনাক্ষি বলল, 'না, ঠাট্টার কথা নয়। দেখ, প্রেমে অনেকেই পড়ে, কিন্তু তোর মত তাকে এমন জপমালা করে রাখতে আমি আর কাউকে দেখিনি। তোর যেন নাওয়া নেই, খাওয়া নেই—'

মন্দিরা পাদপূরণ করে বলল, 'পড়া নেই শুনো নেই। মিনু, তুই কি জানিসনে আমার সমস্যা আর পাঁচজনের মত নয়, আমার সমস্যা একেবারে আলাদা।'

মীনাক্ষী বলল, 'তোর সমস্যার নিকুচি করি। বঁটি দিয়ে তোর সমস্যার গোড়াসুদ্ধু কেটে ফেলতে পারলে আমার জ্বালা যায়।'

মন্দিরা হেসে চুপ করে রইল।

মীনাক্ষী বলল, 'হাসিসনে মন্দিরা। তুই যাকে প্রেম বলছিস আমি তাকে পারভারসন—এক বিকৃত রুচি ছাড়া আর কিছুই বলতে পারিনে। কোন যুক্তিতেই তুই দাঁড়াতে পারিসনে। বয়সে তিনি তোর দ্বিগুণ। বোধ হয় দ্বিগুণেরও বেশি। ভদ্রলোকের অখ্যাতি জগদ্বিখ্যাত। মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর দুর্বলতার কথা কে না জানে? বাইরে গিয়েও স্ক্যাণ্ডাল-ট্যাণ্ডাল তিনি নিশ্চয়ই দু-চারটে করেন। যে মেয়ের কিছুমাত্র সম্মানবোধ আছে সে ওঁর কাছে ঘেঁষে না, ছায়া মাড়ায় না। তা ছাড়া ভদ্রলোক বিবাহিত।'

মন্দিরার বিগ্রহকে তার পরমবন্ধু মীনাক্ষী ধূলিসাৎ করে দিয়ে তবে ছাড়ল। সেই সঙ্গে মন্দিরাকেও কি গুঁড়ো গুঁড়ো করে ধুলোয় মিশিয়ে দিল না!

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বিবর্ণমুখে অস্ফুট স্বরে মন্দিরা বলল, 'কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি নাকি বাপের বাড়ি থাকেন। নাকি কোথায় থাকেন জানিনে। আর তুই তো জানিস, আর যেই হোক আমি এর জন্যে দায়ী নই। তাঁদের সম্বন্ধ অনেক আগে থেকেই ভেঙে গেছে।'

মীনাক্ষী বলল, 'তুই যদি ভালো মেয়ে হতিস তাহলে তোর উচিত ছিল সেই ভাঙা সম্পর্ককে জোড়বার চেষ্টা করা। কিন্তু তুই তো তা করিসনি। তুই সেই গালফ্ আরো বাড়িয়ে দিয়েছিস। উপসমুদ্রকে তুই সমুদ্র করে তুলেছিস। ওই ভদ্রলোকের সংস্রব তোকে ছাড়তেই হবে মন্দিরা। না ছাড়লে আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই তোর থাকবে না। এই আমার শেষ কথা। আমি যাচ্ছি লাইব্রেরীতে। যাবি তুই?'

মন্দিরা বলল, 'না।'

মীনাক্ষী বলল, 'তাহলে তুই এখানে বোস। বসে বসে ঠিক কর কী করবি। আমি ঘুরে আসি।'

মীনাক্ষী চলে যাওয়ার পরেও মন্দিরা সেই জানলার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সবই পুরোন কথা। নতুন কোন শাসনও নয় অনুশাসনও নয়। তবু মন্দিরার মনে হল মীনাক্ষী তাকে এমন অপমান আর কখনোই করেনি। কারো কাছ থেকে এমন মর্মান্তিক আঘাত আর যেন কখনো পায়নি।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে মন্দিরা কমনরুম থেকে বেরিয়ে এল। মীনাক্ষীর জন্যে অপেক্ষা করবার মত তার আর কিছুমাত্র ইচ্ছা রইল না। কী করে আর ওর সঙ্গে কথা বলে, ওর জন্যে অপেক্ষা করে? মন্দিরার সম্বন্ধে এমন হীন ধারণা যে মেয়ের সে কি সত্যিই তার বন্ধু? বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। সমান রুচি আর আদর্শে। একজন যদি আর একজনকে অমন খারাপ মেয়ে বলেই মনে করে আর কথায় কথায় অমন করে ধমকায়, তাহলে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকতে পারে না; তাহলে তাদের মধ্যে অন্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হতে

পারে সে সম্পর্ক টিচার আর ছাত্রীর, কি বা আরো খারাপ—মনিব আর চাকরের; কিন্তু বন্ধুত্বের সম্পর্ক কখনই তাদের মধ্যে সম্ভব নয়। মীনাক্ষী অনেক বদলে গেছে। ভালো ছাত্রী বলে দেমাক বেড়ে গেছে ওর। মন্দিরার ওপর কিছুমাত্র মমতা সহানুভূতি মীনাক্ষীর আর এখন নেই। আছে শুধু ঘৃণা। খারাপ মেয়ের ওপর ভালো মেয়ের যা থাকে তাই। তীব্র ঘৃণা। সেই ঘৃণাকে মীনাক্ষী হয়তো অনুকম্পা দিয়ে মাঝে মাঝে ঢেকে রাখে। আর একটু রাগ বাড়লেই তার সেই মুখের ঢাকনি সরে যায়। মীনাক্ষী তখন যেন আগ্নিগিরি হয়ে ওঠে। তরল লাভাস্রোত তার মুখ থেকে তখন অনর্গল ঝরে পড়তে থাকে। কিন্তু মীনাক্ষী তার ভালো ছাত্রী হবার গর্ব নিয়ে ভালো মেয়ে হবার অহঙ্কার নিয়ে আলাদা হয়ে থাকুক, মন্দিরা কোনদিন আর ওর সামনে যাবে না, ওর সঙ্গে কথা বলবে না। চিরদিনের মত ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে দেবে মন্দিরা। দেখিয়ে দেবে মীনাক্ষীকে বাদ দিয়েও তার চলবার ক্ষমতা আছে। পথেরও অভাব নেই। ইচ্ছা করলে এখনো সে অনেক মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারে। খাওয়াতে পারে, সিনেমা দেখাতে পারে, বেড়াতে যেতে পারে, আর সব খরচ একা চালাবার মত ক্ষমতা আছে তার। আর যার ক্ষমতা আছে তারই বন্ধু আছে। শুধু ভালো মেয়ে হলেই হয় না। মীনাক্ষী তো এত বড় ভালো মেয়ে। কিন্তু ক্লাসে ক'টি মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা আছে? নিজের দেমাকেই বাঁচে না তো বন্ধু! অত উঁচু থেকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকালে, জগৎসুদ্ধ সবাইকে অমন খারাপ, অতি খারাপ আর পাপীতাপী মনে করলে সে কি কারো বন্ধু হতে পারে? মীনু যদি বন্ধু না হতে চায়, ও যদি কোন কোন ব্যাপারে বিশেষ করে প্রীতি আর ভালোবাসার ক্ষেত্রে মন্দিরাকে তার সমান ভাবতে না পারে, তাহলে মন্দিরারই বা এমন কি দায় পড়েছে যেচে যেচে ওর গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে থাকবার? অমন বিশ্বহিতকারিণী পতিতোদ্ধারিণীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার? মীনাক্ষী আর যে যে দিক দিয়ে পারুক উদ্ধারকার্য চালিয়ে যাক কিন্তু মন্দিরাকে যেন দয়া করে ত্রাণ করতে না আসে।

ছোট ছোট দলে উপদলে ভাগ হয়ে হয়ে এখানে ওখানে মেয়েরা জটলা করছে। কী যে ওদের আলোচনার বিষয় তা জানতে বাকি নেই মন্দিরার। শাড়ি গয়না, সিনেমা, ছেলেবন্ধু, প্রেম আর বিয়ের স্বপ্ন। সবাই সেই স্বপ্নে মশগুল। যত দোষ শুধু মন্দিরার। যত নিন্দামন্দ শাসন তিরস্কার শুধু তার জন্যেই তোলা আছে।

মন্দিরা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, পিছন থেকে কে একজন ওর কাঁধে হাত রাখল। চমকে উঠে মন্দিরা মুখ ফিরিয়ে তাকাল। না মীনাক্ষী নয়, আর একটি মেয়ে। ঊর্মি। ওরও কালো ছিপছিপে ছোটখাটো চেহারা। দেখলে এখনো স্কুলের মেয়ে বলেই মনে হয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বেশ পাকা। ওরও অভিজ্ঞতা মন্দিরার চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। মন্দিরা চেনে ওকে। ওর কীর্তি-

কাহিনীও কিছু কিছু শুনেছে। ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই বলেছে মন্দিরাকে। অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই।

ঊর্মি পিছনে ছিল, সামনে এসে দাঁড়াল। পথ আটকে ধরল। হেসে বলল, 'কি রে এমন রেগেমেগে কোথায় চলেছিস।'

মনে মনে বিরক্ত হলেও মন্দিরা দাঁড়িয়ে গেল। মনের বিরক্তিটুকুকে সমমাত্রার হাসি দিয়ে ঢাকল, 'কী কথাই শিখেছিস। রেগেমেগে যাব কেন। তুই তো বন্ধুদের সঙ্গে খুব গল্প করছিলি, আড্ডা দিচ্ছিলি দেখলাম।' ঊর্মি বলল, 'তুই একা ছিলিনে, বন্ধুর সঙ্গেই ছিলি। বোবা হয়ে ছিলিনে, কথাও বলছিলি। আমরাও কেউ চোখ বুজে, কানে তুলো গুঁজে ছিলাম না মন্দিরা।'

হাসতে হাসতেই কথাগুলি বলল ঊর্মি।

তবু মন্দিরা ভ্রূ কোঁচকাল। মীনাক্ষীর সঙ্গে তার কখন কোন কথা হয় না-হয়, সদ্ভাবের হাওয়া বয় না-বয়, তা নিয়ে বাইরের কেউ কথা বলতে আসবে কেন। তাদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে আড়ি পাতবারই বা কার কোন অধিকার আছে?

মন্দিরা বলল, 'ছিলি তো বেশ ছিলি। যা এখন, যাদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলি, তাদের সঙ্গে গিয়েই আড্ডা দে। পথ ছেড়ে দে আমার।'

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'কোথায় আবার? ক্লাসে।'

ঊর্মি হেসে বলল, 'শোন, তোকে একটা সুখবর দিই। হিস্ট্রির ক্লাস আজ হবে না। রেবাদি আসবে না আজ।'

সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরার মনে হল তাহলে একঘণ্টা আগেই সে আজ বেরোতে পারবে। যেখানে যাওয়ার কথা ছিল একঘণ্টা আগেই সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। একঘণ্টা আগে গেলেও কোন অসুবিধে নেই। তিনি কখনো বলবেন না, এত তাড়াতাড়ি কেন এলে। বরং যদি কাজেও ব্যস্ত থাকেন, চোখের হাসি দিয়ে মিষ্টি কথা দিয়ে তাকে মধুর অভ্যর্থনা করে ঘরে ডেকে নেবেন। উঠতে চাইলেও উঠতে দেবেন না, যেতে চাইলে বলবেন, 'এক্ষুনি যাবার কী হয়েছে। বোসো বোসো। থেকে যাও।'

কাজ থাকলেও কাজের তাড়া নেই এমন পুরুষকেই সব চেয়ে পছন্দ মন্দিরার। যাঁর অনন্ত সময় আছে হাতে, আর আছে সময় অপচয়ের অফুরন্ত ক্ষমতা, তার মত ঐশ্বর্যবান কে? মন্দিরার মতে সে ষড়ৈশ্বর্যময় ঈশ্বরের সমান।

'কী রে খুব খুশী তো?'

ঊর্মি যে ওর সঙ্গেই আছে, পাশে পাশে হাঁটছে তা যেন এই মুহূর্তে ফের টের পেল মন্দিরা। এতক্ষণ সে অন্য জগতে ছিল, অন্য জগদীশ্বরের কাছে।

মন্দিরা হেসে বলল, 'বাঃ রে খুশী হবার আবার কী আছে।'

উর্মি বলল, 'কিছু নেই তবু তো হাসলি। আমি তাতেই ধন্য। বাব্‌বা, কি গোমড়া মুখ করেই ছিলি এতক্ষণ।'

হল ঘর থেকে বেরিয়ে ওরা কম্পাউন্ডে নামল। ক্লাসে আর যাওয়ার দরকার নেই মন্দিরার। আজ তো আর সোজা বাড়ি যাবে না। তাই বই-টই খুব কমই এনেছে। একখানি খাতা আর একখানি মেটাফিজিক্স। বিদ্যার্থিনী হিসেবে পরিচিত হতে এর চেয়ে বেশি কিছুর দরকার হয় না। কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যা এই মুহূর্তে মোটেই চিন্তার বিষয় নয় মন্দিরার। জড়জগৎ তাকে বড় মধুর বন্ধনে বেঁধেছে। তার ধুলোমুঠি এখন সোনামুঠি।

উর্মিরও বেশি বই-টই নিয়ে কলেজে আসবার অভ্যাস নেই। তার কারণ হিসেবে ও অবশ্য অন্য কথা বলে।

উর্মি বলে, 'কোনদিন একটা কোনদিন বা দু-দুটো টিউশনি সেরে বাড়ি ফিরতে হয় ভাই। ছাত্রীদের বাড়িতে ওই বইয়ের বোঝা নিয়ে যাই কী করে? তাছাড়া বই কি বেশি আছে যে আনব?'

বেচারার বাবা নেই। এই কলেজে যখন ভর্তি হয় তখন বেঁচে ছিলেন। এখন আর নেই। নিজেই নিজের পড়ার খরচ চালায়। সংসারের খরচও কিছু কিছু চালাতে হয়। যদিও একজন দাদা আছে মাথার ওপরে। মন্দিরা দেখেছে ওর দাদাকে। উর্মির চেয়ে সামান্য বড়। যেমন বয়সে তেমনি মাথায়। বেশি বইবার ক্ষমতা তার কোত্থেকে হবে? দাদা কি আর বাবার মত অত বড় ভারি বোঝা বইতে পারে? আচ্ছা, মন্দিরারও যদি অমন হয়! বাবা আর না থাকেন, চিরদিনের মত চলে যান! না না না, ছি-ছি-ছি। অমন কথা ভাবাই যায় না। যত কঠিন, যত গোঁড়া আর যত জবরদস্তই হোন, বাবা যেন থাকেন। মন্দিরা তাঁকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলবে. আড়াল দিয়ে চলবে, তবু থাকুন তিনি।

কলেজের গেট ছাড়িয়ে পুব মুখে খানিকটা হেঁটে ওরা বড় রাস্তায় পড়ল।

মন্দিরা বলল, 'তুই কোথায় যাবি উর্মি?'

'ভাবছি টিউশনিটা সেরেই যাই! আবার আসব?'

'কোথায় যেন তোর ছাত্রীর বাড়ি?'

'অনরেট সেকেন্ড লেন। যাবি আমার সঙ্গে? এগিয়ে দিবি একটু? হাঁটিয়ে নেব না তোকে। বাসেই যাব।'

মন্দিরা বলল, 'তা না হয় গেলি। কিন্তু তোর ছাত্রী এই ভরদুপুরে পড়বার জন্যে বসে আছে!'

উর্মি বলল, 'তা পড়বে। আমি যখনই যাব তখনই পড়বে। এই সুবিধে-টুকু আছে। আর বেশ খাওয়ায়। তুই যদি কিছু মনে না করিস আমার সঙ্গে আসবি—'

মন্দিরা হেসে বলল, 'আমাকেও পেট ভরে খাইয়ে দেবে। তাই না? আচ্ছা মেয়ে তুই। আমি জাতে বামুন হতে পারি কিন্তু তাই বলে কি অত পেটুক?'

ঊর্মি লজ্জিত হয়ে বলল, 'দূর, তা নয়। আমি কি তাই বলেছি? ওদের ব্যবহার-ট্যবহার খুব ভালো, সেই কথা বলছিলুম। আজ তোকেও ভারি ভালো লাগছে। ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।'

মন্দিরা মনে মনে ভাবল, 'এই মরেছে। ও যদি ছিনেজোঁকের মত আমার সঙ্গে এমন করে আটকে থাকে তাহলেই গেছি আমি।'

রাগ করেই হোক ঝগড়া করেই হোক মীনাক্ষীকে যদি বা এড়িয়েছে মন্দিরা, ঊর্মি লেগে রইল সঙ্গে। আচ্ছা মুশকিলে পড়ল তো মন্দিরা। ঊর্মি তো আর জানে না মন্দিরা তার মত ছাত্রীর বাড়িতে যাচ্ছে না, যখন-তখন গেলে তার চলবে না। তার এখন যেতে পারলেই ভালো। এক মিনিট সময় নষ্ট করা মানেই বড়রকমের ক্ষতি। ঊর্মিকে সেকথা বলা যাবে না। ইচ্ছামত চলবার পথে বাধা অনেক, মন্দিরা ভাবল। কখন যে কোন উপসর্গ এসে জুটবে তার কিছু ঠিক নেই।

তবু স্পষ্ট করে না বললে ও বুঝবে না। তাই মন্দিরা একটু অনুনয়ের সুরেই বলল, 'আজ আমাকে ছেড়ে দে ভাই, আজ আমার একটু তাড়া আছে।'

ঊর্মি হেসে বলল, 'তোর তো রোজই তাড়া। তোর তো আর টিউশনি-ঠিউশনি কিছু নেই। কোথায় যাচ্ছিস বল তো।'

মন্দিরা মনে মনে চটল। এমন বোকা বোকা ভাব করে মেয়েটা—যেন কিছু বোঝে না। আসলে বেশ সেয়ানা। আসলে মন্দিরার কাছ থেকে কথা বের করে নিতে চায়। অন্যের ব্যাপারে ওর ভারি কৌতূহল। অবশ্য মেয়েমাত্রেই কৌতূহল বেশি। ঊর্মি যেন সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু সবাইকে কি সব কথা বলা যায়? মিনুকে বলেছে বলে কি ঊর্মিকেও বলবে মন্দিরা? বরং মিনুকেও না বললেই হতো। বাড়িতে যেমন সবাইর কাছে লুকিয়ে রেখেছে, মিনুর কাছেও সব লুকোতে পারলেই ভালো ছিল। কেন যে বোকার মত সব বলতে গেল! না বললে মিনু কিছুই জানতে পারত না। তার সম্বন্ধে এমন খারাপ ধারণাও হতো না, এমন মর্মঘাতী বিশ্রী বিশ্রী সব কথা ও শোনাত না। ওকে না বললেই ভালো করত মন্দিরা। কিন্তু একদিনে কি আর বলেছে? কতদিন ধরে একটু একটু করে বন্ধুর কাছে নিজেকে উন্মোচিত করেছে মন্দিরা। যতদিন ধরে শশাঙ্কদার সঙ্গে আলাপ প্রায় ততদিন ধরেই প্রায় তত-দিনের কথাই মিনুকে মন্দিরা বলেছিল। কখনো তীব্র সুখের, কখনো তীব্র যন্ত্রণার সেই অনির্বচনীয় মুহূর্তগুলিকে এক একটি করে তুলে ধরেছে। প্রেম আর বন্ধুত্বের মধ্যে আলাদা যেন কোন সীমারেখা নেই—এমনিভাবেই দুই অনুভূতিকে মিশিয়েছে মন্দিরা। কখনও প্রণয়ীর সঙ্গে, কখনো বন্ধুর সঙ্গে নিজেও অভিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু আজ মীনাক্ষী দেখিয়ে দিল সে কত বিভিন্ন সে কত বিচ্ছিন্ন, মন্দিরাকে অন্তর থেকে সে কত ঘৃণা করে।

আরো খানিকটা পাশে পাশে নিঃশব্দে হেঁটে একটা বাসস্টপের সামনে

ঊর্মি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। মন্দিরার দিকে চেয়ে বলল, 'তুই তা হলে যেখানে যাচ্ছিস যা। আমি এখান থেকেই বাস নিই। এতটা পথ একা একা হেঁটে যাব না। না হয় ক'টা পয়সা যাবে। কী আর করা যায়?'

হঠাৎ এই ছোটখাটো রোগাটে সহপাঠিনীর জন্যে ভারি কষ্ট হল মন্দিরার। কার কোন কথা কোন ক্ষণে কীভাবে গিয়ে যে বেঁধে, বুকে গিয়ে আঘাত করে তা মানুষ নিজেও বলতে পারে না। ঢেউয়ের পরে ঢেউ উঠছে পড়ছে, উঠছে পড়ছে, কোন ঢেউ যে ছিটকে এসে গায়ে লাগবে, মনকে ভিজিয়ে দেবে কে জানে?

মন্দিরা বললে, 'এক কাপ চা খাবি ঊর্মি? আয় এক কাপ করে চা খেয়ে যাই।'

সঙ্গে সঙ্গে ঊর্মি খুশী। মন্দিরা নিজে বেশি চা-টা পছন্দ করে না। কিন্তু ঊর্মি যে চায়ের পোকা তা মন্দিরা ভালো করেই জানে। যে যা ভালোবাসে যার যা নেশা কোন কোন সময় তার বিন্দুতেও সিন্ধু, মন্দিরা কি আর তা জানে না?

ঊর্মি হেসে বললে, 'খাওয়াবি চা? বেঁচে থাক ভাই। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। শুধু বেঁচে থাকলেই হয় না, বাঞ্ছা পূর্ণ হোক। সেইটাই আসল কথা। কী বলিস?'

মন্দিরা বলল, 'যাক, তোকে আর ফিলসফাইজ করতে হবে না। তোকে আমি অমনিতেই চা খাওয়াচ্ছি। কিন্তু চায়ের দোকান এখানে কোথায়?'

ঊর্মি বলল, 'চল একটু এগিয়ে দেখা যাক। তেষ্টার জোর থাকলে মরুভূমির ভিতর থেকেও ভোগবতীর ধারা বেরোয়, আর এখানে একটি চায়ের দোকান জুটবে না?'

নতুন রাস্তা বের করেছে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট। দুদিকে বড় বড় বাড়ি উঠছে। তবে এখনো সব ভরে ওঠেনি। কিছু কিছু জমি এখনো খালি পড়ে আছে। এদিকে মন্দিরাদের একটি বাড়ি হলে বেশ হতো। কিন্তু এখানে জমির দাম বেশি। আর বাবার অনেক জমি নইলে মন ওঠে না। তাঁর কথা—কাঠাখানেক ছটাকখানেক জমিতে পা বাড়াবার হাতপা ছড়াবার জায়গা কোথায়? মা বলেন, 'তুমি কি এতই বড় হাতপা-ওয়ালা মানুষ?'

কিন্তু এদিকে বাড়ি না হয়ে ভালোই হয়েছে মন্দিরার। এ পাড়ায় বাড়ি হলে শশাঙ্কদার ওখানে কি আর ঘনঘন মন্দিরা যেতে পারত? এমন আড়ালে আবডালে লুকিয়ে আসা চলত? মন্দিরা দূরে আছে বলেই তো এমন কাছে আসতে পারছে। আরো খানিকটা সোজা গিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিলে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে মন্দিরা। কিন্তু যাবার কি জো আছে? ঊর্মি তার হাত ধরে টেনে বলল, 'ওই যে চায়ের দোকান।'

চাতকী যেন মেঘ দেখতে পেয়েছে।

কিন্তু দোকানের যা অবস্থা তাতে ঢুকতে দ্বিধা হল মন্দিরার। দোরের সামনে দেয়াল ঘেঁষে ছোট এক জোড়া টেবিল-চেয়ার। মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক সেখানে বসে সকালের কাগজ পড়ছিলেন। খদ্দের [illegible] দেখে তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আসুন, আসুন। ভিতরে মেয়েদের বসবার জায়গা আছে। ওরে ফটকে, এনাদের ভিতরে নিয়ে যা তো। কেবিনটা দেখিয়ে দে।'

দোকানে মোটেই ভিড় নেই। মাঝখানের টেবিলে পা-জামাপরা দু'টি যুবক দু'কাপ চা সামনে নিয়ে গল্প করছে আর সিগারেট টানছে। আড়চোখে তারা ঊর্মি আর মন্দিরার দিকে তাকাল। এসব দৃষ্টিকে উপেক্ষা দিয়েই শাসন করতে হয়।

ছোট্ট একটু খুপরি। হাতখানেক চওড়া এক টেবিলে দুজনে বসল মুখোমুখি। কথা বলবার জন্যে একটু ঝুঁকলেই মুখের সঙ্গে মুখ লেগে যাবে।

ঊর্মি নিজেই উঠে হাত বাড়িয়ে পর্দাটা টেনে দিতে দিতে বলল, 'কেবিনের কি ছিরি দেখেছিস? আর পর্দার বাহার? এত টানলাম তবু সবটা ঢাকল না।'

মন্দিরা বিরস মুখে বলল, 'তবু এই তোর স্বর্গ।'

ঊর্মি বলল, 'আহা রাগ করছিস কেন? স্বর্গ না হোক, না হয় নরকই আছে। আমরা তো আর বাস করতে আসিনি। একটু দর্শন করেই চলে যাব।'

মন্দিরা কথা বলল না।

ঊর্মি বলল, 'ছেলে দুটো কিন্তু ভাই বড়ো হ্যাংলা। কীভাবে এদিকে তাকাচ্ছিল দেখেছিস?'

মন্দিরা বলল, 'আমার তো আর খেয়ে না-খেয়ে কাজ নেই; ওই সবই দেখি।'

বয়কে ডেকে মন্দিরা দু কাপ চা আর একটি কাটলেটের অর্ডার দিল।

ঊর্মি বলল, 'একটা কেন? বললিই যদি দুটো কাটলেটের কথা বল।'

মন্দিরা বলল, 'তুই খা। আমি খাব না। খেতে ইচ্ছে করছে না ঊর্মি।'

'তাহলে আমিও খাব না। একা একা খেয়ে কি কোন সুখ আছে? মানুষ কি শুধু খাওয়ার জন্যে খায়?'

মন্দিরা এ কথার জবাব না দিয়ে হেসে বলল, 'একটু থাম দেখি এবার। সেই থেকে কী বকবকই না করছিস।'

ঊর্মি থামবার পর মন্দিরার মনে হল ওকে না থামালেই ভালো হতো। বাইরে যারা বসে আছে তাদের অশালীন কথাগুলি বড় বেশি কানে আসছে মন্দিরার।

'কী রে, বিদ্যাধরীদের চিনিস নাকি?'

'যাঃ। কী যে বলিস, কলেজের ছাত্রী।'

'আরে সেইজন্যেই তো বিদ্যাধরী বললাম। বিদ্যাং ধারয়তি যা সা। আর

যেখানেই ভুল পাস ব্যাকরণে পাবিনে। পণ্ডিতের কাছে বেত খেয়ে খেয়ে ব্যাকরণ শিখেছি। ধানচাল দিয়ে লেখাপড়া শিখিনি রে। বাপ-খুড়ো পয়সা খরচ করেছিল।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তুই চিনিস নাকি ওদের। বার বার তাকাচ্ছিলি! চেনাশোনা আছে নাকি?'

'একটু একটু আছে বই কি। একজন তো এ পাড়াতেই ছিল। স্কুলে পড়ত। তখন থেকেই ঝানু। এখনো শশাঙ্ক সেনের ওখানে গতিবিধি আছে।'

'তাই নাকি? তার তো শুনেছি অনেক—'

'হ্যাঁ ষোলশো গোপিনী। তারই একজন।'

'এই আস্তে। কী যে করিস তুই।'

বয় এনে চা আর খাবার রাখল সামনে। মন্দিরার দুটি গাল ততক্ষণে লাল হয়ে উঠেছে। জ্বালা করছে পাথরের ফুলবসানো দুটি কর্ণমূল।

ঊর্মি বলল, 'সত্যিই বড্ড বাজে জায়গা মন্দিরা। আগে জানলে এখানে আসতাম না। চল তাড়াতাড়ি চা-টা খেয়ে উঠে পড়ি। তুই কাটলেটের অর্ধেকটা নে ভাই। একা খেতে আমার মন সরছে না।'

মন্দিরা বলল, 'তুই ফের যদি বিরক্ত করবি ঊর্মি আমি সব ফেলে রেখে এক্ষুনি উঠে যাব। খাবি তো খেয়ে নে তাড়াতাড়ি।'

ঊর্মি কিছু বলল না। কাটলেটের প্লেটটা সরিয়ে রেখে শুধু চা খেতে লাগল।

মন্দিরার এবার চৈতন্য হল। সত্যি এমন চটে ওঠার কোন মানে হয় না। ঊর্মি তাহলে সব বুঝে ফেলবে। ও কি জানে শশাঙ্ক সেনের নাম? মন্দিরা তো অন্তত বলেনি। আর কে কী বলে না-বলে তাতে মন্দিরার কী এসে যায়? রাস্তার দুটি বাজে মার্কা ছেলের রদ্দি কথাবার্তা সে যে কানে তুলেছে তাই বা মন্দিরা স্বীকার করতে যাবে কেন? ঊর্মি যদি ওসব কথা ফের তোলে তাহলে কড়া ধমক দিয়ে কি ওর মুখ বন্ধ করতে পারবে না মন্দিরা?

কিন্তু রেস্টুরেন্টে খাওয়ার দিকে ঊর্মির যতই লোভ থাক, পরের ব্যাপারে যতই কৌতূহল সে মাঝে মাঝে দেখাক, বুদ্ধি-বিবেচনা তারও আছে, দরকার হলে সংযমের পরিচয় দিতে সেও কম জানে না।

ঊর্মি কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'চা-টাও তো তেমনি দেখছি। এখানে এসে তোর পয়সাটাই নষ্ট করলাম মন্দিরা। কাটলেট কি তুই একটুও খাবিনে?'

মন্দিরা বলল, 'দে একটু। না নিলে ভাববি আমি কেবল সুখাদ্যের ভাগীদার, অখাদ্যের কেউ নই।'

ঊর্মিই আগে একটুকরো ভেঙে দিয়ে বলল, 'খেয়ে দেখ একেবারে অখাদ্য নয়। বরং আশাতীত রকমের ভালো।'

চা খেয়ে বিল মিটিয়ে ওরা দুজনে যখন উঠে দাঁড়াল, বাইরের দুজন

তখনো বসেই আছে। চা খাচ্ছে আর গল্প করছে।

ওদের তির্যক দৃষ্টি অবজ্ঞা করে মন্দিরা ঊর্মিকে নিয়ে বেরিয়ে এল।

ঊর্মি বলল, 'আচ্ছা ইতর তো। ওরা যদি পিছু নেয় দারুণ অপমান করে দেব।'

মন্দিরা হেসে বলল, 'যাক, তোর এখন আর বীরাঙ্গনা হয়ে দরকার নেই। তুই তোর কাজে যা।'

'তুই কোথায় যাবি?'

ঊর্মি অবিবেচকের মত আর একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন করল।

মন্দিরা বলল, 'দেখি কোথায় যাই। বাড়িই যাব।'

ঊর্মি বলল, 'তাহলে তো তোকে রাস্তা পার হয়ে ও ফুটে গিয়ে বাস ধরতে হবে।'

'তাই ধরব এখন। তোকে আগে তুলে দিই। তোর বাসই তো আগে আসছে।'

ঊর্মি আর অবাধ্যতা করল না। বাস আসতেই উঠে পড়ল। উঠবার আগে বলল, 'কাল আবার দেখা হবে। বেশ কাটল সময়টা। তোর অনেক ধন্যবাদ পাওনা রইল। সব দিয়ে যেতে পারব না। আমার বাস এসে গেছে।'

বাসে উঠেও একটু হাত তুলে, একটু তাকিয়ে একটু হেসে অনেকখানি সৌহার্দ্য জানিয়ে গেল ঊর্মি।

মন্দিরা ভাবল, বেশ আছে ঊর্মি। ওর শুধু দারিদ্র্যের কষ্ট, আর কোন কষ্ট নেই। ওর শুধু অর্থনৈতিক সংগ্রাম। কোন নৈতিক সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়নি।

তাহলে ওই বাজে রকবাজ ছেলে দুটিও মন্দিরাকে চিনে ফেলেছে। কী করে চিনল? এ পাড়ার স্কুলে পড়বার সময় যারা মাঝে মাঝে সাইকেলে শো করে তার পাশ কাটিয়ে চলে যেত, ওই তুখোড় সবজান্তা ছেলেটা কি তাদেরই একজন? ঠিক মনে পড়ছে না। আরো যদি বাড়াবাড়ি করত, মন্দিরা উঠে এসে ওর গালে এক চড় কষিয়ে দিত। মন্দিরাকে যে বিন্দুমাত্র অপমান করে তাকে সে কক্ষনো ক্ষমা করে না। সে বন্ধুই হোক আর শত্রুই হোক। শুধু সীন ক্রিয়েট করার ইচ্ছা ছিল না বলেই মন্দিরা চুপ করে বসেছিল, চুপচাপ সহ্য করে যাচ্ছিল। কখনো কখনো নিঃশব্দ উপেক্ষা আর অবজ্ঞাই হল ভ প্রতিশোধ। শুধু ওই দুটি বখাটে ছেলের ব্যবহারেরই নয়, আরো অনেকের— তাদের মধ্যে হয়তো পরম আত্মীয় বন্ধুর দলই আছে—মন্দিরার তাঁদেরও হয়তো উপেক্ষা দিয়ে আঘাত করতে হবে। বিরোধ বিচ্ছেদের জন্যে তৈরি থাকতে হবে মন্দিরাকে! সেদিনের হয়তো আর বেশি দেরি নেই।

কিন্তু কেন? কিসের জন্যে এত দাম সে দেবে? গোপনে গোপনে কারো ষোলশো গোপিনীর একজন হবার জন্যে? না কিছুতেই না। সে আর কো

গোপন সম্পর্ক রাখবে না। প্রকাশ্যে দশজনের সমক্ষে সে তার হাতে হাত রাখবে। মন্দিরা অনেকের মধ্যে একজন হবে না, শুধু একজন হবে। অন্যতমা নয়, একতমা। শশাঙ্কদার নামে অনেক বাজে গুজব চারদিকে ছড়ানো আছে। অনেক গুজবেরই যে কোন মূল নেই তা মন্দিরা বেশ জানে। হাসতে হাসতে অনেক গল্প তিনি নিজেও বলেন। সে-সব গল্প হাসির গল্পই, প্রেমের গল্প নয়। মন্দিরা যখন তাঁর কাছে যাবে তখন সব গুজব ঝরে পড়বে। কোন নতুন গুজব আর মন্দিরা গজাতে দেবে না।

কিন্তু এখনো ফিরে যাওয়া যায়। রাস্তা পার হলেই নিরাপদে দক্ষিণমুখী বাসে গিয়ে উঠতে পারে। বণ্ডেল গেটে নেমে লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে রিকশায় কি হেঁটে একেবারে নিরাপদ চিরপরিচিত আশ্রয়ে গিয়ে পেঁছুতে পারে। সেখানে দুর্নামের ভয় নেই, কলঙ্কের ভয় নেই। সেখানে কত আদর, কত সমাদর, স্নেহপ্রীতি, সেখানে সবখানিই বরাভয়।

মন্দিরা বাধ্য মেয়ের মত দু-এক পা বাড়ালো কিন্তু এক-দু পা পর্যন্তই। তার বেশি এগোতে পারল না। আবার ফিরে এল।

ট্রাফিকের ভিড় বাড়ছে। পার হওয়া কি আর এখন সহজ?

॥ ২ ॥

ইজি-চেয়ারে শুয়ে শশাঙ্ক একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। ঘুম-সুষুপ্তি। সুপ্তি নাকি মুক্তিরই সহোদরা। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি থেকে যে মুক্তি সে মুক্তি তো এ জীবনে পাওয়ার আশা নেই শশাঙ্কের; তাই সুষুপ্তির ভিতর দিয়ে সেই মুক্তির ছিটেফোঁটা যতটুকু জোটে ততটুকুই ভালো। দুধের সাধ ঘোলে মেটানো। কিন্তু দুধ যাদের জোটাবার ক্ষমতা নেই, কি দুধ যাদের পেটে সয় না তাদের ঘোল ছাড়া আর উপায় কি। দুধ সয় না শশাঙ্কের, দুধ সইল না। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সবাই বলে, 'ভালো জিনিস তোমার সইল না। কেউ কেউ আছে যারা পাতে ঘি খেতে পারে না। ঘিয়ের গন্ধই তাদের সহ্য হয় না। তোমারও তেমনি অমৃতে অরুচি।'

সাংসারিক দিক থেকে ধরতে গেলে কথাটা মিথ্যা নয়। পড়াশুনোয় যতটা ভালো ছেলে হবার কথা ছিল, শশাঙ্ক তা হতে পারল না। চাকরির যে সব সুযোগ-সুবিধে একেবারে হাতের মুঠোয় এসে পড়েছিল, শশাঙ্ক সেগুলি একের পর এক ফসকে যেতে দিল। চিরজীবনের মত প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে মেয়েটির পাণিগ্রহণ করেছিল সেই হাতখানাও বেশি দিন ধরে রাখা গেল না। কখনো মনে হল বড্ড বেশি গরম, কখনো মনে হল বড় বেশি ঠাণ্ডা। এত সহজ স্বাভাবিক মসৃণ নিরাপদ দাম্পত্যজীবন যা শতকরা নিরানব্বই পয়েন্ট নয়

জনেরই সহ্য হয়, শশাঙ্ক তা সইতে পারল না। পারলে তার এই বাড়িটিও হয়তো জনপূর্ণ হতো, নারীর কলস্বরে, শিশুর কাকলিতে ভরে উঠত। কিন্তু শশাঙ্ক একক জীবনই পছন্দ করল। একক, কিন্তু ব্রহ্মচারীর জীবন নয়। ব্রহ্মচর্যে—সংযমের নামে আত্মনিগ্রহে তার বিশ্বাস নেই। একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে রাখতে পারেনি বলে সে হাতধরা কি একেবারে বন্ধ করে দেবে? তা দেয়নি শশাঙ্ক। বরং বারবার ধরেছে বারবার ছেড়েছে। পাণি-গ্রহণ বন্ধ হয়নি, শুধু মেয়াদ কমিয়ে এনেছে। আর বারবার হাত বদল করেছে। সকাল সন্ধ্যায় মেয়েরা যেমন শাড়ি বদলায় তেমনি করে বদলেছে। এখনো সে নিত্য পাণিগ্রাহী। নিত্য আর নতুন। কিন্তু এ জীবনেরও বিড়ম্বনা আছে, বখেরা আছে। কোন্ জীবনেরই বা নেই! দাম্পত্যজীবনের বিড়ম্বনাই কি কম? সে জীবনেও প্রতিটি রাত্রিই কি শুভ রাত্রি? প্রতিটি শয্যাই কি ফুল-শয্যা? নিষ্কণ্টক ফুল নিশ্চয়ই আছে কিন্তু নিষ্কণ্টক শয্যাসুখ কোথায়? এই মুক্তবন্ধ মুক্তছন্দ জীবনেও বিড়ম্বনা আছে। এমন বিড়ম্বনায় এমন পাকেচক্রে মাঝে মাঝে জড়িয়ে পড়তে হয় শশাঙ্কের, মনে হয় সাত পাক এড়াতে গিয়ে সে বুঝি সাতাত্তর পাকে বাঁধা পড়ল। কিন্তু নিপুণ হাতে পাক একটি একটি করে শেষ পর্যন্ত খুলে ফেলে শশাঙ্ক। যেখানে সহজে খোলা যায় না সেখানে ছিঁড়ে ফেলে। কষ্ট দুপক্ষেরই হয়। কিন্তু উপায় কি? পরিণাম যাতে শুভ হয় সেইজন্যেই এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থা নিতে হয় শশাঙ্ককে। কারণ বেঁচে থেকে এই অভিজ্ঞতা তার হয়েছে that love hath an end, শুধু প্রেমের কেন, যে কোন সম্পর্কেরই মৃত্যু আছে। স্নেহ প্রীতি শ্রদ্ধার, সৌখ্যের বন্ধুত্বের সব মধুর আর মহৎ সম্পর্কই মরণশীল। সেই মৃত্যুলক্ষণ টের পাবার সঙ্গে সঙ্গে সরে আসতে হয়। নইলে মরণকে তো এড়ানো যায়ই না, প্রকৃতি পচন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। শশাঙ্কের মোহ আছে কিন্তু মায়া নেই। আর মেয়েরা তার এই নির্মমতায় মুগ্ধ হয়। মমত্ববোধের স্বল্পতাকে শক্তি বলে মেনে নেয়। নির্মম না হয়ে উপায় নেই। সব বন্ধনকেই যদি স্বীকার করতে হতো তাহলে শশাঙ্কের এই বাড়িটি হারেম হয়ে উঠত। তত জায়গা কই শশাঙ্কের। তা ছাড়া সেই নবাবী আমল কি আছে? পৈতৃক সম্পত্তির অংশ হিসাবে ভাগের ভাগ চারখানা ঘর পেয়েছে শশাঙ্ক। এই চারখানা ঘর নিয়ে চারখানা ঘর জুড়ে সে একাই থাকে। একখানা বসবার, একখানা পড়বার, একখানা খাবার, একখানা শোবার। পার্টিশনের ওধারে আরো আট-দশখানা ঘর নিয়ে আর একপাল ছেলেপুলে নিয়ে দাদারা ঠাসাঠাসি হয়ে বাস করে আর হিংসায় জ্বলে, শশাঙ্কর নামে আরো বেশি করে কুৎসা কলঙ্ক রটায়। এতগুলি ঘরের তো দরকার নেই শশাঙ্কের। ভাইপো ভাইঝিদের বাস করতে দিলেই পারে। কিন্তু শশাঙ্ক তা দেয় না। দাদাদের বলে, 'তোমাদের ঘরসংসার আছে, আমার শুধুই কয়খানি ঘর। যদি কখনো সন্ন্যাস-টন্ন্যাস নিই তাহলে

তোমাদের সব ছেড়ে দিয়ে যাব।'

বড়দা মৃগাঙ্ক বলে, 'তোর কাছে দান চায় কে?'

ছোড়দা হিমাঙ্ক বলে, 'রাস্তায় দাঁড়াব, তবু তোর ঘর কোন দিন মাড়াব না।'

দাদাদের চটিয়ে খুঁচিয়ে এক ধরনের মজা পায় শশাঙ্ক। পাশাপাশি বাস করেও সে যে দাদাদের প্রতিবেশী নয়, [illegible] এক ভিন্ন প্যাটার্ন সে যে নিজের জন্যে তৈরি করে নিয়েছে, এটা তার অগ্রজদের কাছে অসহ্য মনে হয়। কিন্তু শাসন করবার উপায় নেই। চড় মারবার কান মলবার বয়স তো আর নেই শশাঙ্কের। যখন ছিল তখন যথেষ্টই শাসন করেছেন। শশাঙ্ক এখন যেন তার প্রতিশোধ নেয়। দাদাদের সঙ্গে ঝগড়া করে না, আড়ালে আবডালে নিন্দামন্দ করে না; শুধু নিজের বিসদৃশ আচরণ দিয়ে তাঁদের সদাচারের পাশাপাশি একটি ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে।

দাদারা কথা বন্ধ করে থাকেন, মুখ দেখেন না, মুখ দেখান না। ভাইপো-ভাইঝিদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে দেখতে আসে। তাদের চোখে শিশুর কৌতূহল। চিড়িয়াখানায় গিয়ে যে চোখে তারা হাতী দেখে বাঘ দেখে গন্ডার দেখে, সেই চোখে তারা ছোটকাকাকেও দেখে যায়। তাদের দেখাবার জন্যেই শশাঙ্ক যেন অদ্ভুত অদ্ভুত পোশাক পরে থাকে। কখনো নীল, কখনো লাল, কখনো সবুজ রঙের জামা আর পায়জামায় আচ্ছাদিত করে নিজেকে। ভিতরের বর্ণ-বৈচিত্র্য, স্বভাববৈচিত্র্যও কি তার এমনি জোর জবরদস্তির ফল? সেই সাজও কি তার নিজের জন্যে নয়? লোককে ভয় দেখাবার জন্যে? কোন কোন মুহূর্তে নিজের দিকে তাকায় শশাঙ্ক। কিন্তু ঘষা আয়নায় নিজের মুখের ছায়াও যেন পড়তে চায় না। নাকি তাকাবার আগেই চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে? কখনো মনে হয় নিজের মন নিজের স্বভাব প্রকৃতি নিজেরই নখদর্পণে। কিন্তু সেই দর্প আবার চুরমারও হয়। গুহাস্থিত অতল অন্ধকারে অন্তর্হিত নিজেকে আর কিছুতেই খুঁজে পায় না শশাঙ্ক।

উত্তর-চল্লিশ নিকট-পঞ্চাশ হয়েও দাদারা সমানে পুত্রকন্যার সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছেন। মাঝে মাঝে অকারণে বিরক্ত হয় শশাঙ্ক। কখনো বা শঙ্খধ্বনিতে উলু-ধ্বনিতে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। নবজাতকের পদক্ষেপ শোনা যায়। হাঁটতে শিখেই তারা শশাঙ্ককে দেখতে আসে দেখা দিতে আসে। মেজাজ খারাপ থাকলে শশাঙ্ক বিরূপাক্ষ হয়, ভয় পেয়ে পালায় তারা। আবার এর ব্যতিক্রমও হয়। মরুভূমিতে শ্রাবণের ধারা নামে। একসঙ্গে যে ক'টিকে পারে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। মুখের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে,

'ইহাদেরে কর আশীর্বাদ
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি
নন্দনের এনেছে সংবাদ।'

শশাঙ্কর মনে পড়ে এদের আবির্ভাব তার ঘরেও হতে পারত। কিন্তু শশাঙ্ক তা হতে দেয়নি। সুজাতার মনেও এই ইচ্ছা ছিল। নিজে যা পারল না, সন্তান এসে তা পারবে, হয়তো ভেবেছিল সুজাতা। ভেবেছিল এই উচ্ছৃঙ্খল পুরুষটিকে শিশুর শিকলি দিয়ে বাঁধবে। কিন্তু বাঁধা পড়েনি শশাঙ্ক। সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে। সুজাতার কোলে কেউ আসেনি। কিন্তু কারো কারো কোলে আসব আসব করেছিল। শশাঙ্ক প্রাণপণে সেই অনাহূত অবাঞ্ছিতদের আগমন বন্ধ করেছে। তা যদি না করত সেই সব বিধিবহির্ভূতের দল অনাথ আশ্রমে অজ্ঞাতকুলশীলের ভিড় বাড়াত। কি অন্য কোন গৃহাশ্রমে জাল পিতৃপরিচয়ে মানুষ হতো, কি মানুষ হতো না। ততদূর এগোয়নি শশাঙ্ক। কাউকে এগোতে দেয়নি। তার আগেই থামিয়ে দিয়েছে।

বউদিরাও মাঝে মাঝে আসেন। হয়তো এমনি। হয়তো কোন উৎসব অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ জানাতে। শশাঙ্কের ধারণা তাঁরাও কৌতূহল মেটাতেই আসেন। কোন সুখে আছে শশাঙ্ক, নতুন কোন মেয়েকে জুটিয়ে এনেছে কিনা তা নিয়ে তাঁদের কৌতূহলের সীমা নেই। কৌতূহলে নারীও শিশুর মত। চিরশিশু।

কোন কোন দিন শশাঙ্ক কৌতুক করে বলেছে, 'তোমাদের তো ভারি সাহস বউদি। আমার এ ঘরে আসতে ভয় হয় না?'

বড় বউদি বলেছেন, 'ভয় আবার কিসের!'

শশাঙ্ক হেসে বলেছে, 'দুর্নামের ভয়।'

ছোট বউদি বলেছেন, 'আমাদের আর ভয় দেখাতে হবে না তোমাকে। আমরা তো বুড়ী হয়ে গেছি।'

শশাঙ্ক জবাব দিয়েছে, 'তাই নাকি? সত্যি সত্যি বুড়ী হলে কিন্তু কথাটা অত সহজে স্বীকার করতে পারতে না। গলায় আটকাত।'

বউদিরা প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলেছেন, 'কেন মিছিমিছি এত কষ্ট করছ? অনেকদিন তো হল। আর কতকাল এভাবে থাকবে? সুজাতাকে এবার ফিরিয়ে নিয়ে এস।'

শশাঙ্ক হেসেছে, 'সে কি আর ফিরবার জন্যে গেছে বউদি? ডিভোর্স বিলটা পাশ হতে দাও। সে পরদিনই কোর্টে ছুটবে।'

বড় বউদি বলেছেন, 'মেয়েমানুষ কি আর তা পারে? ছুটলে তুমিই আগে ছুটবে। কিন্তু তার দরকার কি। বুঝিয়ে শুনিয়ে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে এস। ঝগড়াঝাঁটি সব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই হয়। হয় না?'

শশাঙ্ক জবাব দিয়েছে, 'নিশ্চয়ই। যারা ঝগড়া করে না তারা পুরোপুরি স্বামী-স্ত্রীই নয়। আধা আর উপর দলে।'

বউদি লজ্জা পেয়ে বলেছেন, 'থাক থাক, তোমার আর অত বিন্যাস করতে হবে না। সবই যখন বোঝ তাকে এবার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে এস।'

শশাঙ্ক বলেছে, 'দেখি।'

কিন্তু বুঝবার আর কিছু নেই। সুজাতা কয়েকবার বুঝে শুনেই এসেছে। তারপর দু-একদিন যেতে না যেতেই ফের অবুঝ হয়ে উঠেছে। তার পাগলামি সীমা ছাড়িয়ে গেছে। শেষবার সে যখন শশাঙ্কের ছাত্রীদের অপমান করে তাড়িয়ে দিল, কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছে নালিশ করল, কোন শালীনতা শোভনতার ধার ধারল না, শশাঙ্ক তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল। সারারাত ঘরের বাইরে শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে সে চলে গেছে। শশাঙ্কও তাকে আর ডাকেনি। স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলনের আর চেষ্টা করেনি। সুজাতাও নিজে থেকে আলাদা থাকবার ব্যবস্থাই করেছে। শান্তভাবে ঠাণ্ডা মেজাজেই বলেছে, 'এখানে থাকলে আমি নিশ্চয়ই একদিন তোমাকে খুন করে ফেলব। তারপর হয় আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে, না হয় ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে।'

শশাঙ্ক বলেছিল, 'ফাঁসি যাওয়ার ইচ্ছে আমারও তো হতে পারে।'

শশাঙ্ক অবশ্য প্রথম রিপুরই দাস। কিন্তু দ্বিতীয় রিপুরও তো প্রভু নয়। খুন মাঝে মাঝে তার মাথায়ও চাপে।

তাই দীর্ঘায়ু হবার উপায় হিসাবে দুজনে দুই আলাদা জায়গা বেছে নিয়েছে।

শশাঙ্ক তবু বলেছিল, 'কিন্তু কী করে চলবে তোমার?'

সুজাতা জবাব দিয়েছে, 'সে খোঁজে তোমার দরকার কি। চলবেই। আর কিছু না জানি ঘরসংসারের কাজ তো জানি। বাপ-মার ঘর থেকে তা তো শিখে এসেছি। কারো বাড়িতে রাঁধুনীগিরি ঝিগিরিও কি একটা জুটবে না? আমি তাই করেই খাব। তবু তোমার এখানে দিনরাত এমন করে জ্বলেপুড়ে মরতে পারব না। তুমি যাদের ভালোবাসো তাদের নিয়েই থাক। যা ভালোবাসো তাই নিয়েই থাক, আমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক তোমার নেই।'

কথাটা সুজাতাই আগে বলবার সুযোগ নিল দেখে অনুতপ্ত হয়েছিল শশাঙ্ক। সম্পর্কচ্ছেদের কথাটা তারই তো আগে ঘোষণা করবার কথা। কিন্তু সুজাতা তার পৌরুষে ঘা দিয়ে স্বামীর মুখের কথা কেড়ে নিল। একটি দুর্বল মুহূর্ত অবশ্য পরক্ষণেই এসেছিল। শশাঙ্কের ইচ্ছা হয়েছিল স্ত্রীকে ফের জড়িয়ে ধরে। তাকে ধরে রাখে। কিন্তু ইচ্ছাটাকে সরে যেতে দিয়েছে শশাঙ্ক। যদি সুজাতা আরো সুযোগ নেয়, শশাঙ্ককে আরো অপমান করে। তা হলে তার মুখ থাকবে কোথায়? তা ছাড়া এমন ঠাণ্ডা মেজাজে তো সব সময় থাকে না সুজাতা, যুক্তি বুদ্ধি খাটিয়ে ধীরে সুস্থে কথা বলে না। প্রকৃতির যে [illegible] পূজারী শশাঙ্ক, সুজাতার রূপে তার বৈপরীত্যই বেশি। ক্ষমাহীন, মমতাহীন সুজাতা যেন কঠিন এক রুদ্রাণী। তার প্রচণ্ডতায় শশাঙ্কের ঘরের কত দামী দামী আসবাবপত্র, বইপত্র নষ্ট হয়েছে, সামাজিক মান

সম্মান বিপর্যস্ত হয়েছে। এমন বজ্রযোগিনীকে ঘরে ধরে রেখে এক অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ডে বাস করে লাভ কি হতো শশাঙ্কের! সুখের চেয়ে স্বস্তিই তাই সে কামনা করেছে।

সেই বিচ্ছেদের পর প্রথম প্রথম দিনকয়েক বিমর্ষ, বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল শশাঙ্ক। ভেবেছিল এই শেষ। এ অবসাদ আর কাটবে না। জীবনে আর কোন নারীতে আসক্তি আসবে না, আর কোন রম্য বস্তুতে চিত্ত উল্লসিত হবে না। কিন্তু দিনকয়েক যেতেই শশাঙ্ক নিজের ভুল বুঝতে পারল। প্রবৃত্তির ইশারাকে জীবনেরই সাড়া বলে মনে হল শশাঙ্কের। সে যে বেঁচে আছে তা যেন শশাঙ্ক নতুন করে আবিষ্কার করল। আর সেই আবিষ্কারে তার উল্লাসের সীমা রইল না। অভ্যস্ত জীবনে ফিরে এল শশাঙ্ক। সে জীবন আরো অসংকোচ আর অবাধ হল। দেয়ালের যুগল প্রতিকৃতি থেকে শুরু করে দাম্পত্যজীবনের সব চিহ্ন ঘর থেকে শশাঙ্ক সরিয়ে দিল। যে চলে গেছে তার নামাবলী দিয়ে ঘর সাজাবার মত দুর্বলতা শশাঙ্কের নেই। অবশ্য ভদ্রতা শশাঙ্ক কম করেনি। ভবানীপুরে বাপের বাড়িতে স্থায়ীভাবে বাস করছে সুজাতা। এডভোকেট বাপের অবস্থা বেশ ভালো। তবু সুজাতাকে খোরপোষ দিতে চেয়েছিল শশাঙ্ক। কিন্তু সুজাতা সে দাবি ত্যাগ করেছে। দাবি কখনো তোলেওনি। বলে পাঠিয়েছে যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার হাত থেকে কিছু নিতে সে ঘৃণাবোধ করে। টাকাটা যেন ব্যাঙ্কে জমিয়ে রাখে শশাঙ্ক। আরো কতজনকে খোরপোষ দিতে হবে, চিন্তা কি!

শশাঙ্ক আরো এক দফা অপমানের জ্বালায় ছটফট করেছে। কিন্তু নতুন করে কোন প্রতিশোধ নিতে পারেনি। শোধ নেবার তার একটি মাত্র পদ্ধতিই আছে। অন্য মেয়েকে ডেকে আনা, অন্যের ডাকে সাড়া দেওয়া। কিন্তু এই পুরোন পদ্ধতি নতুন করে সুজাতার মনে কোন বিকার ঘটায় এমন কোন প্রমাণ শশাঙ্ক ইদানীং পায়নি। শুনেছে কর্পোরেশনের স্কুলে চাকরি নিয়েছে সুজাতা। বৃত্তির দিক থেকে সহধর্মিণীই আছে। মা নেই, বাবার সংসারে সেই এখন কর্ত্রী। ভাগাভাগি নিয়ে বউদির সঙ্গে কিরকম বিবাদবিসংবাদ হয় তা অবশ্য খোঁজ রাখে না শশাঙ্ক। অত কৌতূহল তার নেই। সুজাতার কোন পুরুষবন্ধু জুটেছে কিনা সে সম্বন্ধেও শশাঙ্ক সমান নিস্পৃহ। মাঝে মাঝে মনে হয় জুটলেই বরং ভালো। শশাঙ্কের একটা জবাবদিহি থাকে। আর ইচ্ছা করলে দ্বিতীয়বার ঘরও বাঁধতে পারে সুজাতা। তাতেও আপত্তি নেই শশাঙ্কের। গৃহবন্ধনে মেয়েদের মুক্তি। কিন্তু পুরুষ সম্বন্ধে, অন্তত সব পুরুষ সম্বন্ধে সেকথা খাটে না।

পুরোন দিনের স্মৃতিচারণ শশাঙ্ক বড় একটা করে না। অনুশোচনায় তার বিশ্বাস নেই। তা যতখানি মানুষকে শুচি না করে দগ্ধ করে তার চেয়ে বেশি। অতীতকে আমল দিলে তা শুধু সমূহ সম্ভোগে বাধা ঘটায়। তার চেয়ে

বর্তমানের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ঢের ভালো। মনে করা মন্দ নয় "আমি অতীতেরও নই, ভবিষ্যতেরও নই। আমি শুধু বর্তমান মুহূর্তটির। শুধু এই মুহূর্তের ওপরই আমার পূর্ণ অধিকার। আর কিছুই আমার হাতের মুঠোয় নেই। এই রঙীন মুহূর্তের ভাবনা।বলাসটুকুই শুধু সত্য।" আজকের এই মুহূর্তটি কাল নাও আসতে পারে। আজ যে এসেছিল আগামীকাল তার কোন প্রমাণ নাও থাকতে পারে। প্রায়ই থাকে না। গতকাল যেমন আজকের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, আজও তেমনি আগামীকালের মধ্যে লুপ্ত হবে। জীবনের অনেক অতীত স্মৃতি শুধু স্মৃতি মাত্র। সে যেন আর একজনের জীবন। আর একজনের সুখ-দুঃখের কাহিনী। শশাঙ্ক সেই কাহিনীর শুধু পাঠক কি শ্রোতা। শশাঙ্ক বেশ ভালো করে যাচাই করে দেখেছে অতীত সুখের অতীত দুঃখের সেই ঘনত্ব আর তীব্রত্ব থাকে না। বর্তমান মুহূর্তের ইনটেনসিটি সে কোথায় পাবে? এক সময় স্মৃতিকে কিছু মূল্য দিত, সঞ্চয়ের কিছু তৃষ্ণা ছিল শশাঙ্কের। অ্যালবামে মেয়েদের ছবি এ'টে রাখত, তাদের চিঠি জমিয়ে রাখত, তাদের কত প্রীতি উপহার কলম আর কলমদানি, ফুলদানি, ধূপদানি, ছাইদানি জমিয়ে জমিয়ে এক মিউজিয়াম করে তুলেছিল শশাঙ্ক। এখনো ওই কালো লম্বা দেরাজটায় কিছু কিছু অবশিষ্ট হয়তো আছে। তারপর আস্তে আস্তে মমত্ব কেটেছে শশাঙ্কের। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক দামী জিনিস নষ্ট হয়েছে। বাজারের দরে যাদের দর নয়, হৃদয়ের আদরে যার মূল্য। প্রীতির সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর প্রীতি উপহারগুলির বিশেষ কি কোন দাম থাকে ? এ কথা স্বীকার করতে কষ্ট হয়, মনে হয় অমানবিক নির্মমতা—কিন্তু থাকে না। বিশেষ করে যে সব মধুর সম্পর্ক বিষে গিয়ে নিঃশেষ হয় তার মাধুর্যের কোন মূল্যই থাকে না। মৌচাকের খোপে খোপে সেই মধুবিন্দুগুলি কখন যে শুকিয়ে বিলীন হয়ে যায় তার চিহ্নটুকুও যেন ধরে রাখা যায় না। নিজের মনকে অকৃতজ্ঞ নেমকহারাম বলে গালাগালি দিতে পারে শশাঙ্ক কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই। মন যা তা তাই থাকবে। তার কিছুমাত্র অদলবদল হবে না। কেন এমন হয়? একদিন যে সব বস্তুতে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেছিল শশাঙ্ক আর একদিন তা নিতান্তই লোষ্ট্রবৎ বস্তুপিণ্ড হয়ে ওঠে। বস্তু কখনো প্রাণসত্তা পায়, আবার একান্ত প্রিয় প্রাণবন্ত ব্যক্তিও নির্জীব বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

উপহার দ্রব্যের সংখ্যা পরিমাণ আজ কমে এসেছে। যেগুলি আছে সেগুলি থেকেও যেন অপহৃত। সেই অপহারকের নাম সময়।

স্মারক থাকতেও স্মৃতি সাড়া দেয় না। দর্শনে স্পর্শনে কিছুতেই মন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে না। নিজেকে শশাঙ্কের মাঝে মাঝে মনে হয় কাঠের পুতুল। যে পুতুলের চোখ আছে কিন্তু দৃষ্টি নেই, কান আছে শ্রুতি নেই, হৃদয় আছে ভালোবাসার শক্তি নেই।

বন্ধু প্রণব গুপ্ত মাঝে মাঝে বলে, 'শশাঙ্ক, যত নিষ্ঠুরতার তুমি ভান কর তত নিষ্ঠুর তুমি নও। এ তোমার ছেলেমানুষি। বাহাদুরি দেখাবার লোভ। এই লোভেই নিজেকে তুমি শেষ করলে। দিনরাত তুমি 'সিনি সেজে থাকতে ভালোবাস, আসলে তুমি হাড়ে হাড়ে সেণ্টিমেণ্টাল।'

সহকর্মী বন্ধুর মুখে নিজের চরিত ব্যাখ্যান সকৌতুকে শুনতে থাকে শশাঙ্ক। হেসে বলে, 'তাই নাকি?' প্রণব বলে, 'তা ছাড়া কি? তুমি লিখতে পারতে লিখলে না, পড়াতে পারতে পড়ালে না, সারাজীবন শুধু প্রচুর সম্ভাবনার আগ্নেয়গিরি হয়ে কাটালে। কিন্তু আগুন কোনদিন জ্বলে উঠল না।'

শশাঙ্ক বন্ধুর মুখে সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'বলো, বলে যাও।'

প্রিয়মুখে এই নিন্দা মন্দ লাগে না শশাঙ্কের। কোথায় যেন এর মধ্যে স্তুতির গন্ধ লেগে থাকে। শশাঙ্কের মধ্যে যে সম্ভাবনা ছিল এ স্বীকৃতিই বা ক'জন দেয়, তার মধ্যে যে একজন সহজ ভদ্র স্বাভাবিক মানুষ আছে তার মুখোমুখি ক'জন দাঁড়ায়? দাদারা দাঁড়াননি, স্ত্রী পরম ঘৃণায় ত্যাগ করে চলে গেছে। বন্ধুরা গুপ্ত-শত্রুর মত শুধু পিঠে ছুরি চালায়। শুধু প্রণবের মত দু-একজন আছে। তাদের আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছা করে শশাঙ্কের। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও হয়। হয়তো বেশি ভার সইবে না। বেশি বয়সে বন্ধুত্ব সয় না। মানুষ তখন বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক আর পরিবারকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। পরিবারের বাইরে চর্চা করবার মত হৃদয়ের আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সবাই তো আর শশাঙ্কের মত নয় যে, সংসারী হয়েও অসংসারী। যে কেবল গিঁট বাঁধে আর গিঁট ছেঁড়ে। বাইরে মুক্ত সেজে নতুন গ্রন্থিবন্ধনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

মাঝে মাঝে শশাঙ্ক নিজেকেই এর জন্যে ধিক্কার দেয়। গেরুয়া পরে, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি বেঁধে যাত্রার দলের বিবেকের পার্ট করে কী লাভ? নারীসঙ্গ তাকে কী দেবে? কোন নতুন সুধাপাত্র তার সামনে এনে উপস্থিত করবে? তার মধ্যে কী আছে যা শশাঙ্কের অজ্ঞাত? কোন্ মধু আছে যা অনাস্বাদিত? দর্শনে শ্রবণে স্পর্শনে সেই এক ইন্দ্রিয়সুখেরই তো পুনরাবৃত্তি। তবু অভ্যস্ততা তাকে বারবার একই পথে টেনে নিয়ে যায়, একই অভিজ্ঞতার অংশ-ভাগী করে। নিজের হাতে নিজের চারদিকে জট পাকায়, মাকড়সার মত জাল বোনে। তারপর সেই জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়। সেই মুক্তি সব সময় সহজলভ্য হয় না। অনেক ক্ষয় অনেক ক্ষতি স্বীকার করে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসে শশাঙ্ক। বেরিয়ে আসে আবার নববাসনার তন্তুজালে ধরা দেবার জন্যে। জীবন যেন একটিমাত্র পুরোন রেকর্ডে এসে ঠেকেছে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই একই রেকর্ড প্রতিদিন বাজে।

সেই একই সুরে একই বাজনা শোনবার জন্যে মন্দিরাকে কেন ডেকে পাঠাল শশাঙ্ক? কলেজে পড়া একটি মেয়ের জন্যে ফের সেই একই রাধাচক্রে অবতীর্ণ হয়ে লাভ কি। ওর বাবা মা টের পেয়েছেন, অপছন্দ করতে শুরু করেছেন। আর পথে যত বাধা আসছে মন্দিরা তত আকৃষ্ট হচ্ছে। স্রোতস্বতী যত বাধা পাচ্ছে তত দুর্বার হচ্ছে। দেখতে মন্দ লাগে না শশাঙ্কের। এ দৃশ্য কতবার দেখল, তবু যেন দেখার শেষ নেই। কেউ তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে—তা তার যে বয়েসই হোক, যত সামান্য রূপ গুণই থাকুক—আকর্ষণের সেই বোধই শশাঙ্ককে আনন্দ দেয়। শুধু সেই অনুভূতির রসেই শশাঙ্ক যেন নতুন করে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। শুধু আকৃষ্ট হওয়া আর আকর্ষণ করা—এই দুটি মাত্র পদেই যেন জীবনের সমস্ত পদাবলী শেষ হয়েছে শশাঙ্কের। এর বাইরে যাবার আর উপায় নেই। শশাঙ্কের যতটুকু গুণপণা আছে সবই যেন একই যাদুকর্মে নিযুক্ত। একই বশীকরণ মন্ত্রে পর্যবসিত। শুধু বশীভূত করা নয়, বশীভূত হওয়ারও। সেই মত্ততার মধ্যে মগ্নতার মধ্যেই তার আনন্দ। যাদুকরের সঙ্গে, তান্ত্রিকের সঙ্গে এইখানেই তার ভিন্নতা। সে শুধু সম্মোহন করে না, সম্মোহিত হয়ও। যেন আর কিছু হওয়ার ক্ষমতাই তার নেই শুধু মুগ্ধ হওয়া ছাড়া।

নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল শশাঙ্ক। মন্দিরাকে নিষেধ করে দিলেই হতো। তখন পারেনি কিন্তু তারপরে যেকোন সময় টেলিফোনে বারণ করে দিলেই হতো। কিন্তু বার বার টেলিফোনের কাছে গিয়েও তাকে নিষেধ করতে পারেনি শশাঙ্ক। নিষেধ তো করেইনি, বরং অতি প্রচ্ছন্নভাবে তারই জন্যে অপেক্ষা করেছে। বারবার তার কথা মনে করেছে। 'স্মরণং কীর্তনং কেলি প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।' যে কাঙ্ক্ষিতা তার স্মরণ কীর্তনেও আনন্দ।

অথচ মুখে বৈরাগ্যের আর ঔদাসীন্যের শেষ নেই। কতবার অক্লান্তভাবে বলে গেছে শশাঙ্ক। 'আমি ক্লান্ত, আমি ক্লান্ত।' কতবার নিজেকে নিজে আবৃত্তি করে শুনিয়েছে,

> 'I am weary of days and hours.
> Blown buds of barren flowers,
> Desires and dreams and powers
> And everything but sleep.'

কিন্তু ঘুমোবার মোটেই ইচ্ছা নেই শশাঙ্কের। সে অতন্দ্র ভাবে জেগে আছে। টেলিফোনের একটি ধ্বনি সকালে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। তারপর আর তাকে ঘুমোতে দেয়নি।

চাকর রামেশ্বরকে দিয়ে শশাঙ্ক ঘরগুলি আরও বিশেষ করে ঝাড়পোছ করিয়েছে। ফুলদানিতে রজনীগন্ধার তোড়া এনে রেখেছে। সুবিন্যস্ত করেছে বইয়ের র্যাক, জানলার যে পর্দাগুলি মাত্র পরশুদিন বদল করেছে, একজনের

আবির্ভাব সম্ভাবনায় আজও সেগুলি না বদলে পারেনি।

যে স্বয়মাগতা সুখের সম্ভার নিজে বয়ে নিয়ে আসছে তাকে কি স্বাগত না জানিয়ে পারে শশাঙ্ক? একটি মেয়ে নিজে যেচে তার কাছে আসছে এর চেয়ে বিস্ময়কর কোন ঘটনা দুনিয়ায় যেন আর ঘটেনি। শশাঙ্কের যে মন অভিজ্ঞ আর প্রাজ্ঞ সে মন জানে এ নিতান্তই মোহ। এ প্রহেলিকা একান্ত করে তার নিজেরই রচনা। তবু আর এক মন সেই স্বরচিত মুগ্ধবোধে প্রমত্ত হয়ে থাকে। এই তীব্র বাসনা আর আসঙ্গ লিপ্সার মধ্যেই শশাঙ্ক যেন নিজের পুনর্জন্ম, নবজন্ম, নবযৌবনের স্বাদ পায়। দ্বিতীয় কোন স্বাদ তার কাছে বিস্বাদেরই নামান্তর।

আর একটি সুরধ্বনি শোনা গেল। টেলিফোনের নয়, কলিং বেলের। যেন বৈদ্যুতিক যন্ত্রধ্বনি নয়, বিদ্যুতের স্পর্শই শশাঙ্কের সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শশাঙ্ক। রামেশ্বর আজ অনেক আগেই তাস খেলার ছুটি পেয়েছে। শশাঙ্ক নিজেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দোর খুলে দিয়ে পরিতৃপ্ত স্মিতমুখে বলল, 'এসো।'

এই একই মন্ত্রে একই উপচারে কতজনকেই তো আহ্বান করেছে শশাঙ্ক, কতজনেরই না অর্চনা করেছে। কিন্তু শশাঙ্ক তো জাতিস্মর নয়। বরং বিস্মরণেই তার স্বভাবজাত প্রতিভা।

মন্দিরা ঘরে ঢুকল। শশাঙ্কের দিকে তাকাল। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'একটু আগেই বোধ হয় এসে পড়লাম।'

শশাঙ্ক বলল, 'আরো আগে আসতে পারতে।' মন্দিরা ভিতরের দিকে এগিয়ে যেতে শশাঙ্ক দরজা বন্ধ করে দিল।

মাঝখানে একটি টেবিল। তাকে ঘিরে খানতিনেক চেয়ার। ডানদিকে একখানি মাত্র আরাম-কেদারা। এই ঘরটিতে শশাঙ্কের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এসে আসর জমাত। তর্কযুদ্ধে হেরে কেউ কেউ গিয়ে ওই চেয়ারশায়ী হতো। আজকাল বন্ধুদের আনাগোনা কম। চেয়ারটা নিজেরই শয্যা হয়েছে। যখন একা থাকে, শুয়ে-শুয়ে ঘুমোয়, শুয়ে-শুয়ে ভাবে।

মন্দিরাকে প্রথমে ওই চেয়ারটাতেই বসতে বলল শশাঙ্ক। হেসে বলল, 'মনে হচ্ছে, তুমি সত্যিই অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে এলে। এবার একটু জিরিয়ে নাও। পাখাটা কি আর-একটু বাড়িয়ে দেব?'

'না-না।'

মন্দিরা টেবিলের ধারে এসে বসল। হাতের বই আর বাঁধানো খাতাটা রাখল টেবিলের ওপরে।

শশাঙ্ক মনে মনে হাসল। ইজি-চেয়ারটা নিয়ে মন্দিরার একটু শুচিবায়ুতা আছে। তবে একটু সাধাসাধি করলে হাতলের ওপর এসে বসবে মন্দিরা। আর শশাঙ্ক ইজি-চেয়ারে শুয়ে দীর্ঘ হাতখানাকে ওর কটিভূষণ করে দেবে। কিন্তু

তা এখনই নয়। আরো পরে, আরো মন্থরে।

শশাঙ্ক ঘুরে এসে ওর মুখোমুখি বসল। প্রসন্ন পরিতৃপ্ত চোখে একটু-কাল তাকিয়ে রইল শশাঙ্ক। সুঠাম সংহত, একটু-বা দৃঢ়, পরিপুষ্ট দেহবল্লরী। বিশ্বে এত রূপ, এত বৈচিত্র্য। কিন্তু শুধু এই একটি বিশেষ রূপই কেন শশাঙ্ককে অমন করে আকৃষ্ট করে রাখে? যাকে দেখতে ভালোবাসে, তাকে পাশে বসিয়ে, সামনে বসিয়ে, আজকাল মাঝে মাঝে এই দেখার কথাও ভাবে শশাঙ্ক। নারী তো সত্যিই বিশ্বরূপিণী নয়। বিশ্বের একটি অংশ মাত্র। সেই অংশকে পূর্ণতার পদে বসিয়ে শশাঙ্ক বিশ্বের বিচিত্র রূপ থেকে বঞ্চিত হয়। তবু তো অভ্যাস ছাড়তে পারে না। পরমুহূর্তেই মনে হয়, এই বঞ্চনাই স্বর্গ। কী হবে বস্তুতে বস্তুতে রূপ খুঁজে? একই বস্তুর মধ্যে যদি শশাঙ্ক তীব্র অনুভূতির স্বাদ পায়, তাহলে অন্য দ্বারে গিয়ে লাভ কি।

'আমি উঠি।'

মন্দিরার কথা শুনে একটু চমকে ওঠে শশাঙ্ক। বুঝতে পারে ওর অভিমান হয়েছে। হেসে বলে, 'কেন?'

'এত কষ্ট করে এলাম। আর আপনি বোবার মত বসে আছেন তো আছেনই।'

'ও, সেই কথা। আমি জিভকে বন্দী রেখে, দুটি চোখকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। দেখছিলাম তোমাকে।'

মন্দিরা বলল, 'আপনি এতদিন শুধু মিথ্যে কথা বলতেন। এখন মিথ্যে করে দেখেনও। লোক-দেখানো দেখা। আমাকে সামনে রেখে কার কথা ভাবছিলেন, কে জানে।'

এ কি সত্যিকারের ঈর্ষা? না ঈর্ষার লীলা? শশাঙ্ক হাসল। সুজাতাও শশাঙ্কের বহুকামিতা নিয়ে পদে-পদে খোঁটা দিতে ভালোবাসত। মন্দিরাও তাই দেয়। কিন্তু শুধু কি ওরা দুজন? আরো কতজনের মধ্যেই ঈর্ষার বিলাস, ঈর্ষার বিকার দেখল শশাঙ্ক। ঈর্ষা মেয়েদের সহজাত। কিন্তু এ-বৃত্তি কি শুধু মেয়েদেরই একচেটিয়া? পুরুষরাও কি কেউ এতে কম যায়? ঈর্ষার সহস্র সূচীমুখে শশাঙ্কও কি কম বিদ্ধ হয়েছে? নাকি এখনো কিছু কম হচ্ছে? প্রেম আর বন্ধুত্ব সহস্র কাঁটায় গাঁথা কোরক। কাঁটা থেকে ফুলকে আলাদা করবার জো নেই।

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'আর কারো কথা নয়, তোমার কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম বললে ভুল হবে, অনুভব করছিলাম। সারাজীবন আর-কিছু করলাম না, শুধু যেন অনুভব করেই গেলাম।'

মন্দিরা শশাঙ্কের দিকে তাকাল। সেই শক্ত সমর্থ চেহারা। দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহ। ঘন কালো ঈষৎ কোঁকড়ানো চুল, সব সেই আগের মতই আছে। কিন্তু মুখের কথাগুলি যেন বেশি বয়সী মানুষের বলে মনে হয় মন্দিরার, তাতে

অনেক অভিজ্ঞতার গন্ধ জড়ানো। কিন্তু এসব ভালো লাগে না মন্দিরার। তার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে শশাঙ্কের যে অন্য কোন জীবন ছিল, সেই কল্পনা-টুকুও যেন তার পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে।

'আপনার কাছে কি ওই সব গুরুগম্ভীর কথা শুনতে এসেছি?'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'তা ঠিক। যদিও এক সময় আমি তোমার গুরুই ছিলাম। আর গম্ভীর হলে তখন মানাতও। কিন্তু এখন বোধ হয় আর সে-গৌরব দাবি করতে পারিনে। না মন্দির?'

মন্দিরার মনে হল, শশাঙ্কদা তার নামের আকারটুকু হরণ করে নিয়ে আবেগে আদরে আরো অনেকখানি পূরণ করে দিলেন।

'সেই উঁচু আসন থেকে আমি তোমার সমতলে নেমে এসেছি। এবার পদতলে বসতে বাকি, তাই না?'

পদতলে না বসলেও করতলটি ছেড়ে দিল না শশাঙ্ক। মন্দিরার হাতখানা নিজের মুঠিতে ধরে রাখল।

ছাড়িয়ে নেওয়ার একটু চেষ্টা করে মন্দিরা ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল, 'কী যে করেন। কেউ এসে পড়বে।'

শশাঙ্ক বলল, 'কেউ আসবে না। এলেই বা কি।'

তারপর সেই আগের কথার জের টেনে বলল, 'তুমি আমার কাছে গুরু-গম্ভীর কথা শুনতে আসোনি! কী শুনতে এসেছ?'

মন্দিরা একটু হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল, 'যান। আমি জানিনে।'

এই হাসি, এই মধুর ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া শশাঙ্ক কতবার দেখেছে, কতজনের মধ্যে দেখেছে। তবু যেন দেখে দেখে তৃপ্তি নেই। যত দেখে, তত নতুন লাগে। কিন্তু সত্যিই কি নতুন? নাকি একই আসক্তি আর অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি? একটি তরুণী মেয়ের একান্ত সান্নিধ্যে বসেও আজ-কাল মাঝে মাঝে এ-সব কথা মনে হয় শশাঙ্কের। অন্যের কাছে নিজের বয়স লুকোন সহজ, নিজের কাছে নিজের বয়স লুকোন যায় না। কিন্তু ক্লান্তির কিছুমাত্র লক্ষণ টের পেলেই শশাঙ্ক তা সঙ্গে সঙ্গে ঢাকতে চেষ্টা করে, অস্বীকার করতে চেষ্টা করে। তার আশঙ্কা, এই ক্লান্তির নামই জরা।

শশাঙ্ক মন্দিরার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে মুখখানা তুলে ধরে, 'একেবারেই জানো না? চল, ওপরে চল।'

মন্দিরা বলল, 'কেন?'

'সেখানে খাবার-দাবার আছে। কিছু খাবে। নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে তোমার।'

খাওয়ার কথা শশাঙ্ক বলে আর তার মনে হয়, একটি ছোট মেয়েকে সে যেন আদর করছে। আগেকার প্রণয়িনীদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে এমন উদ্বেগ বোধ করত না শশাঙ্ক। খাওয়ার কথা তার মনেই হতো না। প্রণয়িনীদের

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সে উদাসীন ছিল। আজকাল এই স্নেহপ্রবণতা কোত্থেকে এল?

'না, আমার ক্ষিদে পায়নি। আমি খেয়ে এসেছি।'

'কেন আবার খেয়ে আসতে গেলে। কোত্থেকে খেলে?'

'পথে। একটা রেস্টুরেন্টে। ভারি বাজে জায়গা।'

নিষিদ্ধ প্রেমের চেয়েও যেন জায়গাটা নিষিদ্ধতর।

মন্দিরার অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গিটুকু সকৌতুকে উপভোগ করল শশাঙ্ক।

'জেনে শুনে কেন ও-সব জায়গায় যাও!'

'আগে জানতাম না।'

হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল মন্দিরার। একটু গম্ভীরভাবে বলল, 'আগে জানলে কি আর যেতাম?'

শশাঙ্ক বলল, 'কেন, কী হয়েছিল সেখানে? তুমি কি একা গিয়েছিলে?'

'না। আর-একটি মেয়ে ছিল সঙ্গে। আর দুটি বাজে ধরনের ছেলে বসে আড্ডা দিচ্ছিল।'

শশাঙ্ক বলল, 'ও-সব রেস্টুরেন্ট তো বাজে ছেলেদের আড্ডার জন্যেই খোলা থাকে।'

মন্দিরা বলল, 'তারা আপনাকে চেনে।'

'চিনবে তা আর বিচিত্র কি। হয়তো এই পাড়ারই ছেলে।'

'তারা আপনার দুর্নাম করছিল।'

একটু চুপ করে রইল শশাঙ্ক। তারপর হেসে বলল, 'আমার দুর্নাম অনেকেই করে। কিন্তু ও-সব আমার কানে যায় না। গেলেও 'মরমে প্রবেশ' করে না। এক কান দিয়ে ঢোকে আর-এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।'

মন্দিরা মুখ তুলে নালিশের ভঙ্গিতে বলল, 'আপনার নামের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে তারা নানা বাজে-বাজে আলোচনা করছিল।'

শশাঙ্ক একটু হেসে বললে, 'তাতো করবেই। বাজে লোক তো বাজে আলোচনাই করবে। তাতে আমাদের কী এসে যায়?'

মন্দিরা হঠাৎ দৃপ্তভঙ্গিতে বলল, 'আমার এসে যায়। আপনারও এসে যায়। আর শুধু বাজে লোকেই কি এ-সব কথা বলে? অনেক ভালো লোকেও—'

শশাঙ্ক তেমনি স্মিতমুখে বলল, 'ঠিকই বলেছ। অনেক ভালো লোকেও বাজে কথা বলে থাকে।'

মন্দিরা বলল, 'আপনি সবই হেসে উড়িয়ে দেন। কিন্তু উড়িয়ে দিলেই তো সব উড়ে যায় না। এই সব নিন্দে-মন্দ বাজে আলোচনা আমি বন্ধ করে দিতে চাই।'

শশাঙ্ক হাসল, 'কী করে বন্ধ করবে। শহরে কতগুলি লোক আর তাদের কতগুলি মুখ ভেবে দেখ দেখি। একখানি হাত দিয়ে তুমি শুধু আমার এই একখানি মুখ বন্ধ করে দিতে পারো।'

মন্দিরার হাতখানি তুলে নিয়ে শশাঙ্ক নিজের ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল।

মন্দিরা হাত ছাড়িয়ে নিল না। একই ভাবে একই ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থেকে বলল, 'আমার ক্ষমতা কতটুকুই বা। কিন্তু আপনার ক্ষমতা আরো কত বেশি।'

হঠাৎ যেন চমক লাগল শশাঙ্কের। তার ধারণা, বেশির ভাগ সময়ই মেয়েরা শুধু চেয়ে দেখবার, আর ছুঁয়ে দেখবার। কিন্তু কদাচিৎ এমন সময়ও আসে, যখন তারা শোনার মত কথাও বলে।

হাতখানা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে ফের মুঠির ভিতরে নিল শশাঙ্ক। একটু একটু ঘামছে। একটু একটু কাঁপছেও কি? হৃদয়ের মত হাতও কি স্পন্দিত হয়?

'আমার ক্ষমতা বেশি, তুমি কি করে জানলে?'

'আমি জানি। জানি বলেই তো এসেছি।'

নারীর মুখে নিজের মহিমার কথা শুনলে কোন পুরুষ না প্রসন্ন হয়? অন্তত সেই সময়টুকুর জন্যে কার না আরো মহিমময় হতে ইচ্ছা করে।

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'আমার সেই ক্ষমতা কি হাজার হাজার লোকের মুখ বন্ধ করবার কাজে লাগাতে বলো?'

'তাই বলি। আপনি ইচ্ছে করতেই তা পারেন।'

শশাঙ্ক এবার পূর্ণদৃষ্টিতে মন্দিরার মুখের দিকে তাকাল। সে-মুখ এখন আর যেন কোন কমবয়সী মেয়ের নয়, পূর্ণযৌবনা নারীর।

'আমার ইচ্ছাশক্তির ওপর তোমার এত বিশ্বাস?'

মন্দিরা মুখ তুলে তাকাল, 'বিশ্বাস আছে বলেই তো এলাম। লোকে আপনার বিরুদ্ধে কত কী বলে। আমি গ্রাহ্য করিনে। আমি জানি, আমি যাঁর কাছে এসেছি, যাঁর ভালোবাসা পেয়েছি—তিনি খুব ভালো—খুব ভালো।'

কেবল ভালো আর ভালো, আর ভালো। অন্য সময় হলে হেসে উঠত শশাঙ্ক। ভালোত্বের যে প্রচলিত ধারণা, তাতে আর আস্থা নেই।

তবু মাঝে মাঝে অতর্কিত এক-একটা ধাক্কা খায় শশাঙ্ক। দুর্বল হাতের ধাক্কা। সেই স্নেহ প্রীতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস—সেই অতি পুরোন বস্তাপচা সব কথা কারো কারো মুখে যেন নতুন ধ্বনিমাধুর্য আর অর্থগৌরব নিয়ে দেখা দেয়। শশাঙ্ক স্তম্ভিত হয়ে থাকে। বিশ্বামিত্রের মত এক বিপরীত দুনিয়া গড়তে গড়তে হঠাৎ তার হাত থেমে যায়। সংশয় জাগে, এই বৈপরীত্য কতখানি টেকসই, কতখানিই বা বাহাদুরি এতে আছে। ছুটে ছুটে যতই দূরে যাক না, ইতস্তত যতই ঘুরে বেড়াক না, মন সেই গতানুগতিক স্বাভাবিকতার

আশ্রয়-কেন্দ্রে ফিরে ফিরে আসে। আশ্চর্য, এসে যেন আরো বেশি শান্তি, বেশি স্বস্তি পায়।

শশাঙ্ক উঠে এসে মন্দিরার পাশে গিয়ে বসল। আস্তে আস্তে ওর পিঠে হাত বুলোতে লাগল। যেন একটি অবুঝ অশান্ত মেয়েকে শান্ত করার ভার নিয়েছে।

'কে কি বলে না বলে তাতে আমাদের কিছুই এসে যায় না মন্দিরা। তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করো, আর আমি যদি সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখি, তুমি যদি আমার এখানে এসে খুশী হও, আর আমি যদি তাতে আনন্দ পাই, তাই কি যথেষ্ট নয়?'

'কিন্তু এমন লুকোচুরি করে আমি কতটুকুই বা পাব? এমন লুকিয়ে লুকিয়ে আমি ক'দিনই বা আসতে পারব? আপনি তো জানেন না, কী কড়াকড়ি, কত পাহারা এড়িয়ে আমাকে আসতে হয়।'

'আমি জানি। এক-একদিন ভাবি, তোমাকে আসতে না করে দেব। তোমার ওপর কোন উৎপীড়ন অত্যাচার হোক, তা আমি সহ্য করতে পারব না।'

'বাইরের উৎপীড়ন বন্ধ করলেই বুঝি সব বন্ধ হয়?'

শশাঙ্ক একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বেশ তো, আমিই যাব মাঝে মাঝে।'

মন্দিরা বলল, 'আপনি যেতে পারবেন না, তা আমি জানি। আপনি কোন বাধাবিঘ্ন অসুবিধের মধ্যে যেতে চান না। আপনার সব মুখে মুখে। আপনার কি সেই সাহস আছে? নাকি আপনি ততখানি ভালোবাসেন?'

শশাঙ্ক নিঃশব্দে এই তিরস্কার হজম করল। প্রিয়ার মুখের গঞ্জনা। তবু গুঞ্জনধ্বনির মত শোনাচ্ছিল না। শশাঙ্ক ভাবছিল সত্যিই কি তাই? সামাজিক রীতি নীতি সে গোপনে গোপনে ভাঙে। কৌশলকে কুশলতা বলে জাহির করে সে বন্ধুদের কাছে বাহাদুরি নেয়। সিঁদকাঠি হাতে সে চুরি করতে ওস্তাদ। কিন্তু বুক ফুলিয়ে ডাকাতি করবার মত সাহস সত্যিই কি তার আছে!

রূঢ় কথাগুলি বলবার পর মন্দিরা নিজেই ফের নরম হয়। শশাঙ্কের বুকে মাথা রেখে বলে, 'আমার এই লুকোচুরি আর ভালো লাগে না।'

শশাঙ্ক আস্তে আস্তে ওর গালে মুখে হাত বুলিয়ে দেয়, 'ভালো লাগে না বুঝতে পারি। কিন্তু উপায় কি বলো?'

মন্দিরা বলল, 'উপায় আছে।'

'আছে? বল তো কী উপায়?'

'এবার আশ্বিনে আমি আঠেরো পার হয়েছি। আমি তো এখন সাবালিকা। আমি এখন যা খুশি, তাই করতে পারি।'

সাবালিকা শব্দটিতে শশাঙ্কের হাসি পেল। মনে হল, যে অমন কথা বলতে পারে তার গা থেকে বালিকার গন্ধ এখনো যায়নি। কেমন একটু

সহানুভূতি আর অনুকম্পা বোধ করল শশাঙ্ক। এই অনুভূতির স্বাদ স্পর্শ-সুখ থেকে আলাদা।

শশাঙ্ক একটু হেসে বলল, 'তুমি যা খুশি, তাই করতে পারো?'

যেন আঠেরো বছরের নয়, আট-দশ বছরের একটি মেয়ের সঙ্গে কৌতুক করছে শশাঙ্ক।

'পারিই তো। আপনি যদি সঙ্গে থাকেন, আমি সব পারি।'

'তবু শুনিই না একবার কী কী পারো।'

শশাঙ্কের ঠোঁটে তখনো হাসি।

মন্দিরা এবার মরিয়া হয়ে বলল, 'পালিয়ে এসে বিয়ে করতে পারি। আপনাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না। আমি যদি স্বেচ্ছায়—'

শশাঙ্ক বলল, 'এবং সজ্ঞানে—'

মন্দিরা মুখ ফিরিয়ে তাকাল, 'আপনি হাসছেন। আপনি ভাবছেন, আমি কিছুই বুঝিনে। আপনি ভাবছেন, আমি একেবারেই ছেলেমানুষ।'

মন্দিরার ভঙ্গি দেখে শশাঙ্ক একটু থমকে গেল। আস্তে আস্তে বলল, 'তা কেন ভাবব?'

মন্দিরা বলল, 'আপনি তাই ভাবছিলেন। কিন্তু কেন আপনি আমাকে অত ছোট ভাববেন? আমি কি কিছু বুঝিনে?'

শশাঙ্ক বিব্রত হয়ে বলল, 'কী হচ্ছে মন্দিরা? তুমি কি পাগল হলে? শিশু নও, বালিকা নও, তুমি সাবালিকা। হল তো এবার।'

মন্দিরা সে কথায় কান না দিয়ে বলল, 'আমি সব বুঝি। আপনি এখন এড়াতে চাইছেন। তাই এত ঠাট্টা তামাসা। কিন্তু আপনি তো এতদিন ঠাট্টা করেননি।'

শশাঙ্ক ওকে শান্ত করবার জন্যে আরো একটু কাছে টানল। আরো নরম সুরে আবেগের সঙ্গে বলল, 'আমি আজও তো ঠাট্টা করিনি মন্দিরা। কিন্তু তুমি যা বলছ তাও তো সম্ভব নয়।'

মন্দিরা বলল, 'কেন সম্ভব নয়? আপনি চাইলেই তা হতে পারে।'

শশাঙ্ক একটু হাসল, 'আমি চাইলেও তা হতে পারে না।'

'কেন নয়?'

তার যে স্ত্রী আছে, যোগাযোগ না থাকলেও আছে, সেকথা তুলল না শশাঙ্ক। সে ইতিহাস মন্দিরার কাছ থেকে সে ঢেকে রেখেছে। নিজেও আর মনে করতে চায় না।

শশাঙ্ক অন্য কথা পাড়ল, 'তুমি এখনো কলেজে পড়ছ। তোমার ভবিষ্যৎ সামনে। তুমি পরীক্ষা দেবে, পাশ করবে। এম-এ পর্যন্ত পড়বে। তখন এসব কথা ভেবে দেখা যাবে। তোমার এই বয়সে মেয়েরা আগে বিয়ে করত, এখন আর করে না।'

মন্দিরা রাগ করে বলল, 'থাক, আপনাকে আর আমার গার্জিয়ানগিরি করতে হবে না। তার জন্যে বাবা আছেন।'

শশাঙ্ক ধমক খেয়ে চুপ করে রইল।

মন্দিরা হঠাৎ যেন নিজের মনেই বলল, 'পড়া আমার আর হবে না।

শশাঙ্ক চমকে উঠে বলল, 'কেন? পড়া না হলে চলবে কী করে?'

মন্দিরা ছলছল চোখে শশাঙ্কের দিকে তাকাল, 'কেন? তা আবার জিজ্ঞেস করছেন? আপনিই তো সব মূল। আমি তো পড়তেই এসেছিলাম, আপনি কি পড়তে দিলেন? আপনি কি মাথা ঠিক করে আমাকে কিছু ভাবতে দিলেন?'

শশাঙ্ক একটু চুপ করে রইল। এমন হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়ে সে অবশ্য আরো দেখেছে। কিন্তু মন্দিরা যেন সবাইকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা বিপদে পড়েছে তো শশাঙ্ক। এবার থেকে তার শিক্ষা হয়ে গেল। আর কোন শিক্ষার্থিনীর সঙ্গে —।

'সত্যি ভুল হয়েছিল মন্দিরা। তোমার যে এত ব্যাঘাত হবে, এত অশান্তি হবে আমি ভাবতে পারিনি। এবার থেকে ফের আগের মত—।'

যেন কেউ তাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে সেই ভয়ে আকুল হয়ে উঠল মন্দিরা। দু হাত বাড়িয়ে শশাঙ্ককে সে আঁকড়ে ধরল, 'না, আর আগের মত নয়। আগের মত আর আমি হতে চাইনে।'

নিজে অত্যন্ত প্যাশনেট পুরুষ শশাঙ্ক। নারীর মধ্যে সেই প্যাশন সঞ্চারিত করে তার আনন্দ। তাতেই যেন তার শক্তিমত্তার পরিচয়। প্রমত্ততা তাকে মুগ্ধ করে, মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে, তার সত্যিকারের রূপ যাই হোক না। শশাঙ্কের কাছে রূপ আর বাসনা অঙ্গাঙ্গী। তার কাছে বাসনা ছাড়া রূপ নেই, বাসনার দৃষ্টি ছাড়া যেন রূপের অস্তিত্ব নেই। বক্ষলগ্না তরুণীকে শশাঙ্ক আরো নিবিড় করে বুকে চেপে ধরল। ওর ভিজে চোখের পাতায়, তারপর দুটি সুন্দর ঠোঁটে চুম্বন করল। মুগ্ধ চোখ মেলে দেখল মুদিতাক্ষীকে। ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্রুত ছন্দে কান ভরে নিল। একটু বাদে ছাড়া পেয়ে মন্দিরা হাসল। দুই ঠোঁটে বিজয়িনীর জয়-পতাকা।

আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মন্দিরা বলল, 'কী দুষ্টুই হয়েছেন। আপনার স্থান কাল কিছু জ্ঞান থাকে না।'

'তোমার থাকে?'

'যান।' মন্দিরা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'তার জন্যে দায়ী কে! আসছি। ওপরের ঘর খোলা আছে তো?'

শশাঙ্ক বলল, 'হ্যাঁ, সবই খোলা।'

মন্দিরা একটু হেসে বলল, 'শুধু একটি ছাড়া।'

'কোন্‌টি?'

মন্দিরা একটু হেসে শশাঙ্কের বুকে আঙুল দিয়ে দেখাল। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'বসুন। দেখি চা-টা কিছু করা যায় নাকি।'

শশাঙ্ক উঠে গিয়ে ফের সেই ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে দিল। লাইটার জেবলে সিগারেট ধরাল। 'ছাড়াতে গিয়ে আরো এক পাক জড়িয়ে পড়লাম।' শশাঙ্ক ভাবল, 'বাসনার রূপ আছে, কিন্তু কোন বুদ্ধি নেই। লক্ষ্য নেই। বরং মুহূর্তে মুহূর্তে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াই তার স্বভাব। ভ্রষ্ট হওয়াতেই তার আনন্দ।'

কোথায় বুঝিয়ে-সুজিয়ে মন্দিরাকে নিবৃত্ত করবে শশাঙ্ক, তা নয়, চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর পাকা করে দিল। মন্দিরাকে বালিকা ভেবে মনে মনে হেসেছিল শশাঙ্ক। আসলে সে নিজেই বালক ছাড়া কিছু নয়। বড় হওয়ার সংকল্প, ভালো হওয়ার সংকল্প, বিদ্বান হওয়ার সংকল্প, কর্মী হওয়ার সংকল্প, সবই সেই অবুঝ বালকের হাতের খেলনা মাত্র। সে-খেলনা সে মুহূর্তে গড়ে, মুহূর্তে চুরমার করে।

পাশের বাথরুম থেকে জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মন্দিরা নিশ্চয়ই প্রথমে বাথরুমে ঢুকেছে। এখন ও ভালো করে মুখ-হাত ধোবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখবে কোথাও কোন চিহ্ন আছে কিনা। তারপর খাবার ঘরে গিয়ে হিটার জেবলে কফি করবে, খাবার করবে। এ-বাড়ির সব ঘরই তার চেনা, সব ঘরেই তার স্বচ্ছন্দ গতি। শুধু পর্দা-ঢাকা যে পাশের ঘরটি, শশাঙ্কের লাইব্রেরী ঘর, যে-ঘরে আলমারি-ভরা বই সাজানো, সে-ঘরে পারতপক্ষে মন্দিরা ঢোকে না। কিন্তু শশাঙ্ক নিজেই বা আজকাল ক'দিন ঢোকে, কতক্ষণ থাকে। অথচ বই তাকে সব কিছু দিতে পারত। জ্ঞানের যিনি অধিষ্ঠাত্রী তাঁর অদেয় কী আছে!

'How elsewise flit we through the mind's dominion,
From book to book, from leaf to leaf, at will!'

জ্ঞানের রাজ্যে সেই স্বচ্ছন্দ বিচরণের সুখ সে স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছে। একটু একটু আঁকতে পারত শশাঙ্ক। এখনো এই লাইব্রেরী ঘর খুঁজলে মাকড়সার জালে জড়ানো একটি ইজেল আবিষ্কার করা যাবে। এখান থেকে ওখান থেকে কিছু ছবিও বেরোবে। অবশ্য বেশির ভাগ ছবিই মেয়েদের মুখচ্ছবি। কলেজের আমলে একটু একটু লিখতে পারত শশাঙ্ক। সে-লেখা শেষ পর্যন্ত পত্রলেখায় পর্যবসিত হল। আর সব পত্রই প্রেমপত্র। অধ্যাপক হিসাবেও কিছু খ্যাতি হয়েছিল। স্বভাবের অস্থিরতা কোন পথেই তাকে স্থির থাকতে দিল না। শক্তিকে বাড়তে দিল না। বিদ্যা নয়, বিত্ত নয়, খ্যাতি নয়, প্রতিপত্তি নয়, তবে কী? নারী! তার চুম্বন, আলিঙ্গন, সোহাগ-ভালোবাসার সঞ্চয় দিয়ে শশাঙ্ক যেন নিজের কীর্তিসৌধ গড়ে রেখে যাবে।

প্রথম যৌবনের কলেজের ইউনিভার্সিটির সমবয়সী সহপাঠিনী বান্ধবীর দল কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। স্বামী-পুত্র, কেউ কেউ হয়তো নাতিনাতনি নিয়েও দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘর-সংসার করছে, শশাঙ্কেরই শুধু নিবৃত্তি নেই। সে সদ্য-যৌবনের পায়ে পায়ে ছুটছে। জীবনভর একই বৃত্তির পুনরাবৃত্তি করে চলেছে শশাঙ্ক। কোন ফল-কামনা নেই। শুধু প্রতিটি সদ্যফোটা ফুলে তার আসক্তি। মাঝে মাঝে মনে হয়, যেন শশাঙ্ক নয়, যেন আর কোন ব্যক্তি তার মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, ইন্দ্রিয়-সুখ ছাড়া যে দ্বিতীয় সুখ জানে না। ইন্দ্রিয়-বিলাস ছাড়া যার দ্বিতীয় স্বর্গ নেই। সেই অপরিণামদর্শী মূঢ়কে কী বলে ধিক্কার দেয় শশাঙ্ক। নির্মম হাতে কতবার তার বাসা ভেঙে দেয়, তাকে ভিটেছাড়া করে। কিন্তু এবেলা ভাঙে, ওবেলা পরম সোহাগে আবার সেই বাসা একটু একটু করে গড়ে তোলে।

শুধু নিজের বাসনাই তো নয়, আর-একটি মেয়ের বাসনাকে উদ্রিক্ত করে, তার তন্তুজালে নিজেকে যে ফের এমন করে জড়ালো শশাঙ্ক, এবার সে বেরোবে কী করে? অথচ বেরোতেই হবে। ওই মেয়েটিকে নিয়ে দিনরাত ঘর-সংসার করার কথা ভাবতেই পারে না শশাঙ্ক। ভাবলেই হাসি পায়। আবার সেই স্বামী-স্ত্রী স্বামী-স্ত্রী খেলা। সে-খেলা খেলে কি একবার সাধ মেটেনি শশাঙ্কের? ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়? মেয়েদের যতই ভালোবাসুক শশাঙ্ক, সে ভালো করেই জানে, তারা ক্ষণসঙ্গিনী ছাড়া কিছু নয়। ফুলকে চিরদিনের মত যদি ঘরে রাখতে চাও, কাগজের ফুল করে রাখো। গাছের ফুল নিত্য ঝরে, নিত্য ফোটে। নারীকে রাঙা বসনে সাজিয়ে দেখতে হয়, তবে সুন্দর দেখায়, রাঙা বাসনায় রাঙিয়ে দেখতে হয়, তবে সুন্দর দেখায়। সে-রঙ রামধনুর রঙের মত ক্ষণস্থায়ী। তাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না। এই জন্যেই দেবী প্রতিমার আবাহনও আছে, বিসর্জনও আছে। তাকে অষ্টপ্রহর ধরে রাখতে গেলে ঝড়ে জলে তার মাটি ধুয়ে যায়, রঙ ধুয়ে যায়, দড়ি-খড় বেরিয়ে পড়ে। শশাঙ্ক জানে, ওরা যুক্তির ধার ধারে না, বুদ্ধির ধার ধারে না। শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ আবেগের আধার। ওরা যেন আলাদা জাত, আলাদা জগতের বাসিন্দা। সে-জগতে বেশিক্ষণ বাস করা যায় না, শুধু ক্ষণিকের অতিথি হওয়া যায়। শশাঙ্ক সব জানে। তবু আশ্চর্য, সে ওদের ছেড়ে থাকতে পারে না। ছাড়তে গেলেই পৃথিবী যেন রসহীন ছোবড়া হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক আকর্ষণ করতে করতে আর আকৃষ্ট হতে হতে ফের এক রক্তবর্ণা নতুন গ্রহের কাছাকাছি যায়। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, দু'দিন পরে সরে আসে। কাউকে নিয়ে চিরদিন বসবাসের কথা শশাঙ্ক এখন আর ভাবতে পারে না। ফের সেই সুজাতা এপিসোডের পুনরাবৃত্তি করে লাভ কি!

নিত্য কলহ, নৈমিত্তিক কেলেঙ্কারি, সেই অগ্নিগিরির কোলে বাস, যে-কোন মুহূর্তে লাভাস্রোতে ভাসমান হবার আশঙ্কা। তার চেয়ে এই বেশ

আছে শশাঙ্ক। ক্ষণে ক্ষণে সঙ্গিনী আর ক্ষণে ক্ষণে নিঃসঙ্গতা। এই স্বাধীনতা শশাঙ্ক হারাতে চায় না।

মন্দিরার সাড়া মিলেছে পাশের ঘর থেকে। সুজাতা যতদিন ছিল এ-বাড়িতে আর-কোন মেয়ের ছায়া পড়তে পারত না। এখন ইচ্ছামত যে-কোন মেয়েকে যে-কোন ঘরে প্রবেশের অধিকার দিতে পারে শশাঙ্ক। তবু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর নয়। সব টেম্পোরারি সেটেলমেন্ট। যারা আসে, ছায়ার মত আসে, আবার ছায়ার মতই মিলিয়ে যায়। এখন সুজাতা শুধু স্মৃতিমাত্র। দশ বছরের বিচ্ছেদ মৃত্যুর দূরত্ব এনে দিয়েছে। সুজাতা আর কাউকে বিয়ে করলে, বিয়ে না করেও স্বামী-স্ত্রীর মত থাকলে, একের কি অনেকের উপ-স্ত্রীর মত থাকলে এর চেয়ে কি বেশি সুখী হত শশাঙ্ক? বলা যায় না। তখন হয়তো ঈর্ষায় জ্বলত। অধিকার বোধ, আধিপত্য বোধ তাকে রেহাই দিত না। কিন্তু সুজাতা সেদিকে যায়নি। রক্তমাংসের ক্ষুধা নিয়ে রক্তমাংসের কোন মানুষের কাছে হাত পাতেনি। পাথরের দেবমূর্তিতে প্রাণ সঁপেছে। সে-মূর্তি শিবের, না বিষ্ণুর, না বুদ্ধের, নাকি আধুনিক কোন সাধু মোহান্তের, খোঁজ নিতে যায়নি শশাঙ্ক। এক হিসেবে ভালোই করেছে সুজাতা। পাথরের মানুষের চেয়ে পাথরের দেবতা অনেক ভালো। মাঝে মাঝে কেন যেন কষ্ট হয় শশাঙ্কর। আশ্চর্য, শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না, শশাঙ্কের নিজের পক্ষেও বিশ্বাস করা শক্ত, তবু সত্যি কষ্ট হয়। নিঃসঙ্গ নিচ্ছিদ্র রাত্রে চৌচির হয়ে পাথর ফাটার শব্দ শোনা যায়। কিন্তু ছিন্নগ্রন্থিতে যে ফের গিঁট পড়বে, তেমন সম্ভাবনা আর নেই। এই দশ বছরে সে চেষ্টা কয়েকবার করা হয়েছে। গিঁট পড়েনি। বরং নতুন কতকগুলি স্নায়ু ছিঁড়েছে। শশাঙ্ক নিজের স্বভাব বদলাতে পারেনি, সুজাতাও নিজের শুচিতা, শুচিবায়ুতা ছাড়তে পারেনি। শেষ পর্যন্ত খুনোখুনি, রক্তারক্তির মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়েছে। এখন দুজনের মধ্যে কঠিন ঘৃণা আর বিদ্বেষের দেয়াল। তবে সে-দেয়াল হয়তো একেবারে নিচ্ছিদ্র নয়।

মন্দিরা ট্রে-তে করে দু-কাপ কফি এনে টেবিলের ওপর রাখল।

হেসে বলল, 'ঘরে আর কিছু নেই যে করে দেব।'

মন্দিরা যেন এরই মধ্যে এ-বাড়ির গৃহিণীর পদটি দখল করে বসেছে।

শশাঙ্ক বলল, 'আবার কি করবে? যথেষ্ট করেছ।'

মন্দিরা বলল, 'রামেশ্বরের টিকিটিও আর দেখা যাচ্ছে না। আপনি কি ওকে সারাদিনের জন্যে ছুটি দিয়েছেন নাকি?'

শশাঙ্ক বলল, 'সারা রাতের জন্যেও।'

দুজনে ফের মুখোমুখি বসল। কাপে চুমুক দিতে যাচ্ছিল শশাঙ্ক, বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ হল। একটু বাদে কলিং বেলের কর্কশ অসহিষ্ণু উদ্ধত 'ক্লীং ক্লীং।'

শশাঙ্ক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, 'দেখলে তো অধরে অধরে যাই হোক,

'There is many a slip between the cup and the lip.'

দোর খুলে দিয়ে শশাঙ্ক একপাশে সরে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকলেন যোগরঞ্জন। দেহ শুধু দীর্ঘই নয়, বিপুলও। মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটা। পরনে সাদা রঙের শার্ট আর ট্রাউজার। গলায় ঝুলানো সর্পসদৃশ স্টেথিস্কোপ। শুধু দুটি চোখের রঙ লাল। খোলা দরজা দিয়ে পশ্চিমের আকাশে যে রক্তসূর্য দেখা যাচ্ছে, তারই ছটা লেগেছে হয়তো।

যোগরঞ্জন ঘরের মধ্যে একমুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। পলকে সব দেখে নিলেন। তারপর তর্জনীর ইশারার সঙ্গে মেয়েকে বললেন, 'উঠে এসো।'

দ্বিধান্বিতাকে দ্বিতীয়বার নির্দেশটি শোনাতে হল, 'উঠে এসো মন্দিরা।'

মন্দিরা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, বই আর খাতাটি তুলে নিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

যোগরঞ্জন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, শশাঙ্ক বলল, 'শুনুন।'

শব্দটি আর-একটু স্ফুটতর হলে ভালো হতো। যোগরঞ্জন শুনলেন কি শুনলেন না, বোঝা গেল না। কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন না। বাঁকা ঠোঁটের হাসিতে ক্ষুরের ফলা ঝলকে উঠল, 'আপনি পড়ান, আপনি শিক্ষক, তাই না?'

শশাঙ্ক এ-কথার কোন জবাব দিল না।

যোগরঞ্জন বললেন, 'শিক্ষা দিতে আমরাও জানি।'

উঠে গিয়ে স্টিয়ারিং-এ হাত রাখলেন যোগরঞ্জন।

মন্দিরা পিছনের সীটে গিয়ে বসেছিল।

সেদিকে একবারও না তাকিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

শশাঙ্ক একমুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এর চেয়ে বেশি শিক্ষা দেওয়ার কি দরকার আছে। শশাঙ্কের ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে যোগরঞ্জন তাকে যেভাবে ধমকে গেলেন, নিজের মেয়েকে যেভাবে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেলেন, তাতে অপমানের কি কিছু বাকি রইল? মন্দিরাই বা কি ভাবল। শশাঙ্কের ওপর কী ধারণা হল তার? মন্দিরার কাছে যতই বাক্‌পটু হোক শশাঙ্ক, নারীর তনু-মন সম্বন্ধে যতই দক্ষ আর বিশেষজ্ঞ হোক, তার বাবার কাছে সে দুর্বল, অসহায় আর পরম কাপুরুষ। যোগরঞ্জনের একটি কথার প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা হল না শশাঙ্কের। ছি-ছি-ছি। অন্তত মিথ্যা করেও তো বলতে পারত, 'মন্দিরা আমার কাছে পড়তে এসেছে যোগরঞ্জনবাবু। আপনার চটবার কোন কারণ নেই। বসুন চা-টা খান।'

কিন্তু শশাঙ্ক যেন সিগারেট খেতে গিয়ে প্রথম ধরা-পড়া স্কুলের ছেলের মত বোবা হয়ে রইল। যেন নারীঘটিত জটিলতা জীবনে এই তার প্রথম

এসেছে। ছি-ছি-ছি। মাঝে মাঝে শশাঙ্কের মনে হয়, এ-পথ তার নয়! সে ভুল পথ নিয়েছে। এ-সব পথে যাতায়াত করতে হলে যতখানি পুরু চামড়ার মানুষ হওয়া দরকার, যতখানি শঠতা আয়ত্ত করা দরকার, শশাঙ্কের তা নেই। তার ফলে নীতিবাগীশ আর ন্যায়াধীশদের ধমকানি তাকে মুহূর্তে মুহূর্তে সহ্য করতে হয়। সে না পারে তাদের চোখে ধুলো দিতে, না পারে তাদের রক্তচক্ষুর সামনে চোখ রাঙা করে দাঁড়াতে। সমাজবহির্ভূত, বিধিবহির্ভূত প্রণয়ের, এমন-কি, ইন্দ্রিয়পরতার পক্ষ নিয়ে নিজের ঘরে বসে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করে বিজয়ীর বরমাল্য ছিনিয়ে নেওয়া সহজ, কিন্তু প্রকাশ্য রাজপথে গতানুগতিক নীতিধর্মের প্রতিনিধি হয়ে একটি কনেস্টবলও যদি তাকে বাধা দেয়, একটি ক্ষীণকায় রুগ্ন ছেলেও যদি তার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'মশাই, আপনি করছেন কী,' শশাঙ্ক বীরোচিত কাজ করতে পারবে না। পারবে না, তার কারণ এই গতানুগতিক সমাজধর্মের পক্ষ নিয়ে হাজার হাজার লোক সেই দুর্বল ছেলেটির পিছনে এসে দাঁড়াবে। আইন তার পক্ষে, দেশাচার তার পক্ষে, প্রচলিত ন্যায়-নীতি তার পক্ষে। সে বহুবলে বলী। সেই সহস্র বাহুর সঙ্গে শশাঙ্ককে একহাতে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু মজা এই, যারা শশাঙ্কের বিচারক, তারাও ভিতরে ভিতরে অন্তত আংশিক-ভাবে সমাজবিরোধী। তাদের মধ্যেও ষড়রিপু ছত্রিশটি দুর্ভেদ্য প্রচ্ছন্ন গড় তুলে রেখেছে। শুধু সুযোগ-সুবিধের অপেক্ষা। তাই প্রকাশ্যে শশাঙ্কের শত্রুর দল বেশি। কিন্তু গোপন মিত্রকুলই আসলে দলে ভারি।

দরজা বন্ধ করে দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল শশাঙ্ক। আগন্তুকের হাতে আর-একবার কলিং বেল বেজে উঠল। বিরক্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে শশাঙ্ক গিয়ে দরজা খুলে দিল।

বাঞ্ছিতা নয়, অবাঞ্ছিতও কেউ নয়, শশাঙ্কের ছোকরা চাকর রামেশ্বর। রোগা কালো ছিপছিপে চেহারা। সতের-আঠার বছর হবে বয়স। বেশ চালাক চতুর। চোখ দেখলেই বোঝা যায়, ভারি ধূর্ত। ঘর-সংসারের ভার এখন ওর হাতেই ছেড়ে দিয়েছে শশাঙ্ক। বাজার করতে গিয়ে ও যে চার-ছ আনা রোজ চুরি করে, শশাঙ্ক তা টের পায়। কোন কোনদিন পকেট থেকেও দু-একটা টাকা সরায়। সরাক। ও যে পুকুর চুরি করে না, দুপুরে ডাকাতি করে না, তাতেই কৃতজ্ঞ শশাঙ্ক। অতদূর যেতে বোধ হয় রামেশ্বরের বিবেকে বাধে। ইচ্ছা করলে ঘড়ি, পেন, বাসন-কোসন, দামী বই কি দেরাজ থেকে নগদ দু-একশ টাকা নিয়েও সরে পড়তে পারে রামেশ্বর। কিন্তু বছর তিনেক ধরে এখানে আছে, ও-সব করেনি। সরেওনি সরায়ওনি। শশাঙ্কের মনে হয়, ব্যক্তিভেদে যেমন সৎকাজ করার ক্ষমতার সীমা আছে, অসৎ কাজ করার ক্ষমতারও তেমনি। তা অপরিসীম নয়। শশাঙ্ক নিজের মনেই হাসল। এক হিসাবে তারা দুজনেই অসামাজিক নয়। এখানেও কিছু-না-কিছু স্নেহ,

প্রীতি, শ্রদ্ধা, নির্ভরতা, কৃতজ্ঞতার বন্ধন স্বীকৃত।

শশাঙ্ক চাকরের দিকে চেয়ে বলল, 'এত দেরি করলি যে!'

রামেশ্বর মাথা চুলকে বলল, 'দেরি হয়ে গেল বাবু।'

শশাঙ্ক বলল, 'হয়ে গেল বাবু। এতেই কি তোর সব কৈফিয়ত দেওয়া হয়ে গেল?'

রামেশ্বর এ-কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'দু কাপ চা-ই যে পড়ে রয়েছে বাবু। খাননি।'

শশাঙ্ক বলল, 'না, চা নয় কফি। এখন বোধ হয় সরবত। ফেলে দিয়ে আর-এক কাপ করে আন।'

'কী খাবেন বাবু। চা না কফি?'

'তোর যা খুশি।'

রামেশ্বর হেসে ভিতরে চলে গেল।

চা খেয়ে শশাঙ্ক কলেজে বেরোবার জন্যে তৈরি হতে লাগল। উত্তর কলকাতার একটি কলেজের নৈশ বিভাগের ছাত্রদের ইংরেজী ভাষা আর সাহিত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দেওয়ার আংশিক দায়িত্ব সে নিয়েছে। অস্থায়ী চাকরি। যে-কোন মুহূর্তে কর্তৃপক্ষও তাকে বিদায় দিতে পারেন, আবার যে-কোন অজুহাতে নিজেও বিদায় নিয়ে আসতে পারে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিছু কথান্তর, কিছু মনোমালিন্যই তার কাজ ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। প্রণব বলে, 'তুমি অত্যন্ত সেনসিটিভ। কিন্তু ঘাড়ে যদি দায়িত্ব পড়ত, যদি একপাল ছেলে-মেয়ে কি নাবালক ভাই-বোন মানুষ করতে হতো, কোথায় থাকত তোমার এই সূক্ষ্ম মান-অপমান বোধ?'

তা ঠিক। দায়িত্ব আসতে পারত। কিন্তু সে এড়িয়ে গিয়েছে। এক হিসেবে সে গৃহী হয়েও অসংসারী। বিয়ে করল কিন্তু স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করল না, কোন সন্তানকে আসতে দিল না। কেউ তার মুখাপেক্ষী নয়, শশাঙ্ক নিজেও কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। মাঝে মাঝে কোন কোন দুঃস্থ আত্মীয় বন্ধুকে সাহায্য করে শশাঙ্ক, কিন্তু কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কখনো কখনো প্রণয়ঘটিত জটিলতা কিছু সঙ্কট সৃষ্টি করে, কিছু অর্থব্যয় হয়, ভুলেরই হোক আর বিশেষ ধরনের একটি নেশার মাশুলই হোক, জোগাতে হয়। দিন কয়েক অনুতাপ অনুশোচনায় কাটে। তারপর নিজের অভ্যস্ত পথে ফিরে আসে শশাঙ্ক। শুধু কলেজে মাস্টারীর আয়ে এমন ব্যয়বহুল নেশা সে নিশ্চয়ই বেশি দিন পুষে রাখতে পারত না যদি পৈতৃক বিত্তের সহযোগিতা না পেত। ক্যানিং স্ট্রীটে বাবার আমলের যে এক্সপোর্ট ইমপোর্টের কারবার আছে সেখানে বছরে একবার পা না দিয়েও শশাঙ্ক তার মুনাফার অংশ ভোগ করে। এ ছাড়া চা বাগানের শেয়ার আছে, ব্যাঙ্কের শেয়ার আছে, তালতলায় দু'খানা ফ্লাট বাড়ি থেকে যে ভাড়া আদায় হয় তারও প্রাপ্য অংশ

শশাঙ্কের একাউণ্টে বছরে বছরে জমে। সম্পত্তি আছে এইটুকু জেনেই তৃপ্তি। তা যে বাড়াতে হয়, লাভ-লোকসানের হিসাব রাখতে হয়, সেদিকে কোন খেয়াল নেই।

তাই শশাঙ্কের চাকরি করবার এবং না করবার স্বাধীনতা আছে। নিজের জীবনটাকে মোমবাতির মত দুদিক থেকে যদি সে পোড়ায়, কেউ বাধা দেবার নেই, তবু নিজের ভিতর থেকেই কে যেন বাধা দেয়। মোমবাতি পুড়িয়ে নিঃশেষ করবার আগেই পরম মমতায় কে যেন আগুনটুকু নিবিয়ে ফেলে। জ্বলে পুড়ে একেবারে শেষ হয়ে যেতে দেয় না।

কলেজে যাওয়ার পথে এবং ক্লাস নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে যোগরঞ্জনের শাসানির কথাটা তার ফিরে ফিরে মনে পড়তে লাগল। এমন করে মেনে নেওয়াটা শশাঙ্কের পক্ষে একান্তই কাপুরুষের কাজ হয়েছে। সে তো নিঃসহায় নয়, কিছু সহায় সম্পদ তারও আছে। এমন কি মন্দিরা নিজেও তার পক্ষে। সে যদি সাহস করে ওই সাবালিকা মেয়েটিকে বলতে পারত, 'তোমার যাওয়ার দরকার নেই, তুমি থাকো এখানে', তাহলে কি সেই সম্মোহিতাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাধ্য ছিল ওই যোগরঞ্জন ডাক্তারের? কিন্তু শশাঙ্ক তা বলতে পারেনি। সে কথা বললে অনেক দায়িত্ব নিতে হয়। অন্তত সাময়িক-ভাবে কিছু দায়িত্ব বহন না করে উপায় থাকে না। কিন্তু অত ঝামেলা ঝক্কি পোহাবার জন্য মন যেন তৈরি নয় শশাঙ্কের। আর যেন কোন রকমের কোন জালে জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছা করে না। যে গিঁট সহজে খোলা যায় তেমন ফসকা গেরোই ভালো। এত স্পর্শকাতর হওয়ার কোন মানে নেই। শশাঙ্ক আহত মনকে প্রবোধ দিল। সে যদি চুরি করে নিষিদ্ধ ফলের রসটুকু উপভোগ করতে চায় গৃহস্থ টের পেলে তাতে বাধা দেবে না, সুবিধে পেলে দুচার ঘা লাগিয়ে দেবে না, এমন আশা করাই ভুল। তবু শুধু ফলের মধ্যে নয়, ফল চুরি করার মধ্যে যে রস পেয়েছে সে ফের চুরি করতে যাবে, চুরি করে খাবে। নিষিদ্ধ প্রণয়রসের তৃষ্ণা যদি থাকে, ঘৃণা লজ্জা ভয়ের এই ঝুলি তাকে বইতেই হবে। গৃহস্থ-কন্যাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার এই এক বিপদ—শশাঙ্ক নিজের মনে হাসল। তাদের বাপ থাকে, ভাই থাকে। বিবাহিতা হলে স্বামী-পুত্রের বন্ধন থাকে। শশাঙ্কের কোন কোন বন্ধু আরও উচ্চ স্তরের রসিক। তারা এ সব ঝামেলার মধ্যে যেতে চায় না। নহ মাতা নহ কন্যা উর্বশী কি অর্ধ উর্বশীদের নিয়েই তারা তৃপ্ত। কিন্তু অমন নিষ্কণ্টক প্রণয়ে শশাঙ্কের তৃপ্তি নেই। তার মনে রোমান্সের ক্ষুধা প্রবল। প্রতিটি সম্পর্কে সে প্রথম প্রণয়ের রোমান্স চায়। আর তার ফলও ভোগ করে।

এর পর দিন কয়েক শশাঙ্ক নিজেকে কড়া শাসনে রাখল। অন্যের হাত থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেয়ে নিজের হাত থেকে নেওয়া ঢের ভালো। অবশ্য যোগরঞ্জনবাবুর বিশেষ কিছু ক্ষতি করবার ক্ষমতা যে নেই তা সে জানো

করেই জানে। এমন কিছু কিছু ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ বিস্মিত বাপ ভাই স্বামীর সঙ্গে শশাঙ্কের আগেও পরিচয় হয়েছে। মৌখিক আস্ফালনের পর শেষ পর্যন্ত তারাই পিছিয়ে যায়। কোনরকম কেলেঙ্কারি হলে জাত তাদেরই যাবে। শশাঙ্কের জাত যাওয়ার ভয় নেই। হারাবার মত তার কী আছে? নেই। তবু পুরোপুরি নির্ভয় থাকতে পারে না শশাঙ্ক। এত অভিজ্ঞতা তার হয়েছে তবু নতুন কোন সঙ্কটের সূত্রপাতে সে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই স্বভাব-ভীরুতার জন্যে নিজেকে সে কম ধিক্কার দেয় না। পূর্ণ সম্ভোগের পথে এই ভয়ই পরম বাধা। আসক্তি যেমন তার মজ্জাগত, ভয়ও তেমনি তার রক্তের মধ্যে। নিরাসক্ত না হলে কি শশাঙ্ক কোনদিন নির্ভীক হতে পারবে না?

যোগরঞ্জনবাবুর কাছে অবশ্য এমন কোন প্রমাণ নেই যাতে শশাঙ্ককে তিনি মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে দিতে পারেন। মন্দিরার কাছে কিছু চিঠিপত্র আছে। শশাঙ্কের এই আর-এক বোকামি। শতং বদ মা লিখ—বিজ্ঞজনের এই সুপরামর্শ সে মানতে ভুলে যায়। সে চিঠি লেখে, ডায়েরি লেখে। না লিখলে সম্ভোগ যেন সম্পূর্ণ হয় না। মন্দিরার কাছে তার কিছু চিঠি জমে আছে। সে সব চিঠি মন্দিরা কি তার বাবাকে দেখাবে? কিংবা যোগরঞ্জনবাবু নিজে সেসব কেড়ে নিয়ে দেখবেন? তা নিয়ে মামলা মোকদ্দমার মধ্যে গেলে তাঁর নিজেরই ক্ষতি। তেমন অবুঝ যোগরঞ্জন নিশ্চয়ই হবেন না। যেটুকু তিনি দেখে গেছেন, বুঝে গেছেন, সেটুকু চুপচাপ হজম করে যাওয়া ছাড়া তাঁর উপায় নেই। আর কী ক্ষতি তিনি করতে পারেন শশাঙ্কের? আড়ালে আবডালে কিছু বদনাম ছড়াতে পারেন, কি পথে-ঘাটে কোথাও দেখা হলে আরো কিছু রূঢ় কথা শোনাতে পারেন। তা যদি করেন শশাঙ্ক অবশ্য তাঁকে ছেড়ে দেবে না। সে একবার যে ভুল করেছে দ্বিতীয়বার আর সে ভুল করবে না শশাঙ্ক। এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে যোগরঞ্জন নিশ্চয়ই তার পিছনে গুপ্তঘাতক লাগাবেন না, কি লাঠি-সোটা নিয়ে বাড়িও আক্রমণ করতে আসবেন না। রাত্রির অন্ধকারে নিঃসঙ্গ শয্যায় এইসব অহেতুক অযৌক্তিক ভয়ের সঙ্গে শশাঙ্ককে মাঝে মাঝে যুদ্ধ করতে হয়। তারপর নিজের ভীরুতা দুর্বলতাকে নিজেই সে বিদ্রূপে উপহাসে খানখান করে কাটে। নিজেই নিজের গলায় বিজয়ীর বরমাল্য পরায়।

সেদিন কলেজের পর প্রণব তাকে ধরে নিয়ে গেল বাসায়। বলল, 'চল যাই আমার ওখানে। অনেকদিন যাও না।'

শশাঙ্ক বলল, 'এত রাত্রে?'

প্রণব বলল, 'ভূতের মুখে রাম নাম? রাত নটা তোমার কাছে আবার রাত নাকি? তাছাড়া যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী!'

শশাঙ্ক খোঁচা খেয়ে বলল, 'আমার কাছে না হোক তোমার কাছে তো রাত।'

'না হে, আমারও আজকাল শুতে শুতে বেশ রাত হয়। একটা দেড়টার

আগে কোনদিনই বিছানায় যেতে পারিনে।'

'কেন বল তো?'

প্রণব একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সে কথা বলে আর লাভ কি। জানোই তো অনেক বাজে কাজে আমার সময় নষ্ট হয়। বহু বাজে জিনিস লিখতে হয়। কখনো স্বনামে কখনো বেনামে, কখনো কোন বৃহৎ নামের আড়ালে। মাঝে মাঝে ভাবি, কী করছি। এই সব করতেই কি এসেছিলাম!'

শশাঙ্ক কোন জবাব দিল না। প্রণব সাধারণত নিজের কথা এভাবে বলে না। খুব সংযত স্বভাবের মানুষ প্রণব। দুঃখ দৈন্যের সঙ্গে সেই ছেলেবেলা থেকে যুদ্ধ করে চলেছে, আজও সেই সংগ্রামের শেষ হয়নি। কলেজের দুটো সিফটে পড়ায়। ছোট সংসার হলে এতে বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই থাকতে পারত প্রণব। কিন্তু পোষ্য অনেক। গুটি পাঁচেক ভাইবোন। বিধবা বউদি, তাঁর ছেলেমেয়ে। বয়স প্রায় চল্লিশ হতে চলল, নিজে এখনো বিয়ে করেনি। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'ভাই ওসব ভাববার আর সময় পেলাম কোথায়। তাছাড়া দারিদ্র্য বাড়িয়ে লাভ কি। একটি মেয়েকে ঘরে আনা মানে তারও সুখশান্তি নষ্ট করা, নিজেরও অশান্তি বাড়ানো। আমাকে ঘানি টানতে হবে বলে আর একজনকে কেন তার সঙ্গে জুড়ে দিই। তাতে কি কষ্ট কিছু কমবে?'

শশাঙ্কের মাঝে মাঝে অস্বস্তি লাগে। সেই এক শতাব্দী আগের পুরোন আদর্শকে আঁকড়ে রাখার কী মানে হয় আজকাল? ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য থেকে নিজেকে এভাবে বঞ্চিত করে কোন স্বর্গের সঞ্চয় বাড়াচ্ছে প্রণব? নিজের পরিবারে আর আত্মীয়স্বজনের গণ্ডির মধ্যে সৎ, নিঃস্বার্থ, আদর্শবাদী ছেলে বলে হাততালি পাচ্ছে বটে, কিন্তু এই পারিবারিক চাপে ওর ব্যক্তিগত বিকাশ কি ক্ষুন্ন হয়নি? একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি? বাংলা ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে ছাত্র মহলে অবশ্য ওরও কিছু খ্যাতি আছে। কিন্তু সেই সঞ্চয় বাড়াবার জন্যে প্রণব কি বেশি কিছু করতে পেরেছে? ইংরেজীতেও এম. এ. দেবে বলে শশাঙ্কের কাছ থেকে সে অনেক বইটই ধার নিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত ফেরত দিয়ে গেছে। দু-তিনবার ডক্টরেট করবার জল্পনা-কল্পনা করেছিল, আজ সে প্লানও পরিত্যক্ত। সংসার চালাবার জন্যে, যারা তার পোষ্য তাদের আর একটু স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবার জন্যে ও টুইশন করবে, নোট লিখবে, ইয়ার-বুকের পাতা ভরাবে; অন্য কিছু করবার সময় কই প্রণবের, যাতে সত্যিকারের বিকাশ, যেখানে পূর্ণতার আনন্দ, সেখানে গিয়ে সে পৌঁছতে পারল কই? পৌঁছনো তো ভালো, যাত্রাই শুরু করতে পারল না। শশাঙ্ক নিজে এসব কথা কিছু বলে না। ভাবে, প্রণব আঘাত পাবে। কিন্তু প্রণব নিজেই বলে। দিনের পর দিন চেপে রাখতে রাখতে হঠাৎ হয়তো কোন একদিন রুদ্ধ আবেগ বেরিয়ে পড়ে। কখনো বাষ্পে, কখনো অগ্নির উদ্গারে। প্রণব বলে, 'শশাঙ্ক, তোমার মতে আমিও বোধ হয় আর এক ধরনের এক্সট্রিমিস্ট। আর-

এক প্রান্তের অমিতাচারী।'

শশাঙ্ক হেসে বলে, 'অনর্থক আমার ঘাড়ে কেন দোষ চাপাচ্ছ? তোমার নিজের মনেই ও রকম ধারণা মাঝে মাঝে হয়।'

'অস্বীকার করব না শশাঙ্ক। মাঝে মাঝে হয় বই কি। আমিও তো একালেরই মানুষ। দ্বন্দ্ব আর সংশয়ের অতীত আমি হব কী করে। একি self-sacrifice না self-denial—মাঝে মাঝে আমার মনেও প্রশ্ন ওঠে।'

শশাঙ্ক তা জানে। আর সে প্রশ্ন শুধু মনের মধ্যেই আটকে থাকে না, প্রণবের চোখে মুখে, ভাষায় ভঙ্গিতেও তা ফুটে বেরোয়। বুড়ো মা থেকে শুরু করে ভাইবোন ভাইপো ভাইঝিদের ওপরও তার দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়। কান্নাকাটি মান অভিমান, অনশন কথাবন্ধ। সারা পরিবারে অন্তর্বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। একটি পরিবার তো নয়, একটি সাম্রাজ্য। মাঝে মাঝে প্রণবের মনে হয় আলমগীরের মোগল সাম্রাজ্য বুঝি ছত্রখান হয়ে পড়ল। একটি মাত্র গিঁটও বুঝি ছিঁড়তে বাকি রইল না। কিন্তু ছিঁড়তে ছিঁড়তেও ছেঁড়ে না। খানিকটা লেগে থাকে, ঝুলে থাকে।

আর একদিন প্রণব বলেছিল, 'এক একদিন ইচ্ছে হয় আমিও তোমার দলে ভিড়ে যাই শশাঙ্ক। সুরা আর সাকি নিয়ে আমিও মেতে উঠি।'

শশাঙ্ক বলেছিল, 'ইচ্ছেটা খুবই মহৎ। তবে তোমার সহ্য হবে না এই যা। সুরার গন্ধে তোমার বমি আসবে।'

'আর সাকি?'

'দেখলেই পতন ও মূর্ছা। তুমি তো একেবারে অরক্ষিত ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গ। সইবে কেন?'

প্রণব হেসেছিল, 'তোমার সঙ্গে থেকে শুধু বদনামের ভাগীই হব? আর কোন রসের ভাগ পাব না?'

ঠাট্টার সুরেই কথাগুলি অবশ্য বলেছিল প্রণব। প্রায়ই বলে। কিন্তু ঠাট্টা কি ষোল আনাই ঠাট্টা? তার মধ্যেও কি অর্ধসত্য নেই? কখনো দুঃখে ক্ষোভে নৈরাশ্যে, কখনো প্রবৃত্তির প্রবণতায় সহজ স্বাভাবিক প্রলোভনে এই বন্ধুটির মনেও সেই তরুণ বয়স থেকে বহু দুর্বল মুহূর্ত এসেছে। কিন্তু শশাঙ্ক সেসব মুহূর্তের সুযোগ নেয়নি। এই পিওরিটান বন্ধুটিকে বখাতে চেষ্টা করেনি। চেষ্টা করলেই পারত। সঙ্গে করে টেনে নিয়ে যেতে পারত বারে, রথেলে কি রেসের মাঠে। কিন্তু তা নেয়নি শশাঙ্ক। অনেককে বখিয়েছে, কিন্তু প্রণবকে ছেড়ে দিয়েছে। কিছু অর্থবল, সাহস আর উদ্যম থাকলে প্রণবও যে দল ভারি করত তা শশাঙ্ক জানে। যতই পূত পবিত্রতার বুলি আওড়াক, প্রণব আলাদা জগতের বাসিন্দা নয়। একই পাড়ার, হয়তো একই বাড়ির, এ-ঘরের ও-ঘরের অধিবাসী। কিন্তু শশাঙ্ক ওকে ওর ঘরে থাকতে দিয়েছে। গৃহচ্যুত করেনি। আর প্রণবও শশাঙ্কের চালচলনের যত নিন্দামন্দই করুক,

যত ব্যঙ্গবিদ্রূপই করুক, সামনে করেছে, আড়ালে পঞ্চমুখ হয়নি। অস্পৃশ্য বলে এক-ঘরে করে রাখেনি, কুসঙ্গ বলে বর্জন করেনি বন্ধুসঙ্গ।

প্রণব বলে, 'শশাঙ্ক, তুমি এই [illegible]কে একটা cult করে তুলেছ। আমার ওতে বিশ্বাস নেই। আমাদের যা বয়েস তাতে তুমিও আমাকে কনভার্ট করতে পারবে না, আমিও তোমাকে কনভার্ট করতে পারব না। এ নিয়ে ঝগড়া করে কোন লাভ নেই। তুমি তোমার মত নিয়ে থাক, আমি আমার মতে চলি। যার যেমন রুচি।'

এতখানি সহনশীলতা অবশ্য গোড়ার দিকে ছিল না প্রণবের। বয়েস তার সহিষ্ণুতা বাড়াচ্ছে। তবু এই ঔদার্য বোধ হয় এ যুগেই সম্ভব। বিপরীত রীতির এই 'পিরীত' আগে কি কেউ ধারণায় আনতে পারত? তবু দরিদ্র বলে প্রণবকে কেউ কেউ হয়তো ভুল বোঝে। দূর থেকে ওকে অবস্থাপন্ন বন্ধুর স্তাবক বলে মনে করে কেউ কেউ। হয়তো ভাবে এর সঙ্গে কাঞ্চনগন্ধ জড়ানো আছে। কিন্তু শশাঙ্ক জানে প্রণব এদিক থেকে দারুণ খাঁটি। বন্ধুত্বকে সে স্থূল স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাখতে পেরেছে। সৌখ্য ছাড়া তার আর কিছু চাইবার নেই।

শ্যামপুকুরের একটি দোতলা পুরোন বাড়ির সামনে এসে বন্ধুর সঙ্গে দাঁড়াল শশাঙ্ক। প্রণবই এগিয়ে গিয়ে নিজের ঘরের কড়া নাড়ল। ওর বৃদ্ধা মা এসে দরজা খুলে দিলেন। ভালো করে দেখতে পান না। চোখে ছানি।

মহামায়া বললেন, 'কত রাত হল বল দেখি। আমি সেই থেকে ঘর বার করছি। সঙ্গে কে?'

'শশাঙ্ক। আমার বন্ধু। চিনতে পারছ না মা?'

'কথা শোন ছেলের। চিনতে পারব না কেন? রাতে ভালো করে দেখতে তো পাইনে, তাই।'

তারপর একটু হেসে বললেন, 'দেখতে না পেলেও ছেলেদের চিনতে আমাদের বাকি থাকে না বাছা। ছেলেরাই বড় হয়ে মা মাসীদের ভুলে যায়। শশাঙ্ক, তুমি কতকাল পরে এলে বল তো বাবা।'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'সময় পেয়ে উঠিনে মাসীমা। আসব আসব তো প্রায়ই ভাবি।'

মহামায়া বললেন, 'এসো বাবা এসো। তোমাদের দেখলেও ভালো লাগে।'

ছেলেদের গল্প করবার সুযোগ দিয়ে মহামায়া পর্দা সরিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

ভিতর থেকে সাত-আট বছরের একটি বালককণ্ঠের অভিযোগ শোনা গেল, 'আমাকে অত ছোট মাছ দিলে কেন মা। রোজ তুমি বেছে বেছে আমাকে ছোট মাছ দাও।'

'মানুষটা তুই কত বড় রে সুকু, দাদার মত দিদিদের মত বড় হও তখন

বড় মাছ চেয়ো।'

একটি মহিলার মৃদু মিষ্ট বাৎসল্যাসিক্ত কণ্ঠ।

গলা শুনেই শশাঙ্ক বুঝতে পারল প্রণবের বউদি।

প্রণব উঠে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এল। একটু হেসে বলল, 'ভাইপো ভাইঝিদের ভোজনপর্ব চলছে। আমার ছোট ভাইপোটি বেড়ালের মতই মৎস্য-প্রিয়। কিন্তু মাছের যা বাজার। দুবেলা মাছ যোগানো শক্ত।'

শশাঙ্ক বলল, 'বন্ধ করলে কেন। বেশ তো হচ্ছিল।' সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, প্রণব আবার কিছু ভাবল না তো?

হেসে বলল, 'ছেলেদের কোন্দল শুনতে মন্দ লাগে না যাই বলো। আমরা তখন নিজেদের কোন্দলের কথা ভুলে যাই।'

প্রণব বলল, 'না ভাই, খেতে বসে ওরা বড্ড গোলমাল করে। চেঁচামেচি করে কান ঝালাপালা করে দেয়। অন্য দিন এর আগেই এ পর্ব শেষ হয়ে যায়। আজ বোধ হয় বউদির রান্নাবান্না সারতে দেরি হয়েছে। তবে আজকের আবহাওয়া তেমন উত্তপ্ত নয় এই যা ভরসা।'

নিচু মোড়া পেতে মুখোমুখি বসল দুই বন্ধু। চেয়ার-টেয়ারগুলি সরিয়ে ঘর জুড়ে ইতিমধ্যেই ঢালা বিছানা পাতা হয়েছে। প্রণবের এই বসবার ঘর-খানাই রাত নটার পর শোবার ঘর হয়ে ওঠে। দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি বইয়ের র‍্যাক। পুরোন বই কেনার অভ্যাস প্রণবের ছেলেবেলা থেকে। এখনো সেই নেশা অক্ষুণ্ণ রেখেছে প্রণব।

বন্ধুর দেওয়া সিগারেট ধরিয়ে শশাঙ্ক ভাবল, এবার সত্যিই অনেকদিন পরে এল এখানে। বিশেষ কিছু পরিবর্তন যে এ ঘরের হয়েছে তা মনে হচ্ছে না। অবশ্য বাইরে থেকে কতটুকু পরিবর্তনই বা বোঝা যায়? মাঝে মাঝে এমন এক একটি আত্মীয় বন্ধুর পরিবারে আসতে মন্দ লাগে না শশাঙ্কের। যেখানে কোন স্বার্থের বন্ধন নেই, আসক্তির বন্ধন নেই; যেখানে সে শুধু একজন বহিরাগত দর্শক মাত্র। চোখের সামনে যেন একটি নাটক অভিনীত হয়ে চলেছে। তার দুটি কি একটি দৃশ্য দেখেই সে বিদায় নেবে। চরিত্রগুলির সুখদুঃখ হাসিকান্নার ভাগ সে খানিকটা নিতে পারবে, খানিকটা বা পারবে না।

প্রণব বলল, 'কি ব্যাপার। তুমি এমন গম্ভীরানন্দ হয়ে রইলে যে? দাঁড়াও চায়ের কথা বলি। নইলে তোমার মুখ খুলবে না।'

শশাঙ্ক বাধা দিয়ে বলল, 'আরে না না। তুমি ক্ষেপেছ নাকি? এত রাত্রে চায়ে কি হবে। মিছামিছি ওঁদের অসুবিধে বাড়ানো।'

প্রণব হেসে বলল, 'অসুবিধে আবার কিসের। ইলেকট্রিক হিটার করে নিয়েছি। ওই একমাত্র বিলাসিতা। দিন-দুপুরে রাত-দুপুরে যখন-তখন চা করে খেতে পারি। এই একমাত্র পানদোষ।'

বলতে হল না। প্রণবের বউদি নির্মলা নিজে থেকেই চা করে নিয়ে এল।

মৃদু হেসে বলল, 'নমস্কার শশাঙ্কবাবু। নিশ্চয়ই পথ ভুলে এসেছেন।'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'আমার ভুল সম্বন্ধে আপনার বুঝি কোন সন্দেহই নেই?'

নির্মলার পরনে কালো-পেড়ে সাদা খোলের শাড়ি। সিঁথিও সাদা। মাথায় একটু আঁচল টানা।

বছর পাঁচেক হল প্রণবের দাদা মারা গেছেন।

বয়সে প্রণবের চেয়ে বছর চার পাঁচেকের ছোটই হবে নির্মলা। দেখলে আরো কম মনে হয়, যদিও চারটি ছেলেমেয়ের মা।

আর একজনের চেহারার সঙ্গে ক্ষীণ সাদৃশ্য মনে পড়ল শশাঙ্কের। সুজাতার চেহারাও এমনি আঁটসাট ধরনের। তারও অমনি লম্বাটে ধরনের মুখ। একজন দেওরের সংসার করছে, আর একজন ভাইয়ের। একজন বাধ্য হয়ে, আর একজনও কি তাই?

'শশাঙ্কবাবু, আপনার কাছে একটি আবেদন আছে। একটি নয়, দুটি।'

শশাঙ্ক একটু চমকে উঠল। পরক্ষণেই হেসে বলল, 'বলুন বউদি। আবেদন কেন বলছেন? বলুন আদেশ।'

প্রণব বলল, 'বউদি তোমাকে কল্পতরু ভেবেছেন শশাঙ্ক।'

'আহাহা কথার কি ধরন। যদি ভাবিই, কিছু অন্যায় হয়? ওঁর মত বড়লোক বন্ধু তোমার আর ক'জন আছে ঠাকুরপো?'

শশাঙ্ক বলল, 'বড়লোক বলবেন না বউদি। বড়লোক আমি নই। কোন অর্থেই না। তাছাড়া প্রণবরা দল বেঁধে ওকথার মানেটাকে বড় ছোট করে দিয়েছে।'

নির্মলা ইঙ্গিতটা যে না-বুঝল তা নয়। কিন্তু রাজনৈতিক বিতর্ক এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'আমার এক নম্বর আবেদন জোরজবরদস্তি করে ঠাকুরপোর একটা বিয়ে দিয়ে দিন। কতকাল আর আইবুড়ো থাকবে বলুন? বিয়ে করবে কি আর বুড়ো হলে?'

প্রণব হেসে বলল, 'বুড়ো হতে যেন বড় বাকি আছে।'

নির্মলা সে কথা কানে না তুলে বলল, 'আপনার তো অনেক জানাশোনা—'

শশাঙ্ক বলতে যাচ্ছিল, 'আমার জানাশোনা কোন মেয়েকে কি প্রণব ভরসা করে ঘরে নিতে পারবে?'

কিন্তু রসিকতাটা চেপে গিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই চেষ্টা করব বউদি। প্রণবকে এবার ধরে বেঁধে রাজী করাতেই হবে। আর আপনার দু নম্বর—'

নির্মলা বলল, 'আমার দু নম্বর আরজি হল আমার জন্যে একটা চাকরি-বাকরি যোগাড় করে দিন। আপনার এত জানাশোনা—'

শশাঙ্ক বলল, 'নিশ্চয়ই চেষ্টা করব বউদি। তবে দুটো দিন সবুর করুন। নতুন জা'কে ঘরে এনে নিন। তারপর তো নিজে বাইরে বেরোবেন।'

'না না, ঠাট্টা নয় সত্যি। আপনি তো ইচ্ছে করলে আমাদের মত মেয়েদের

জন্যে নতুন কিছু একটা গড়েও তুলতে পারেন। আপনার এত ক্ষমতা। স্কুল হোক, অফিস হোক, কলকারখানাতেও আপত্তি নেই।'

শশাঙ্ক জবাব না দিয়ে স্মিতমুখ হয়ে রইল।

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল খানিক বাদে। প্রণব বাসস্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

চলন্ত বাসে চিন্তাস্রোত বয়ে চলল শশাঙ্কের। অনেক ক্ষমতা। সে কথা শশাঙ্ক নিজেও জানে। কিন্তু অব্যবহারে অপব্যবহারে সব মরচে ধরে গেল। প্রিন্সিপ্যাল আজ বলেছেন শশাঙ্কের অধ্যাপনায় ছাত্রেরা খুব খুশী। এমন যত্ন নিয়ে নাকি অনেকেই পড়ান না। শিগগিরই তার চাকরি পাকা হবে সে আভাস দিলেন অধ্যক্ষ। শশাঙ্কের ঘাড়ে আরো দায়িত্ব চাপবে সে ইঙ্গিতও সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে রাখলেন। কিছুই নয়। তবু এইটুকু সাধারণ সামান্য স্বীকৃতির মধ্যেও যেন নিজের একটি অন্য চেহারা দেখতে পায় শশাঙ্ক। নিজেকে যে মাঝে মাঝে একমাত্র যৌন বাসনার মূর্ত রূপ বলে মনে করে শশাঙ্ক, তা হয়তো সত্যি নয়। তার মধ্যে আরো কিছু আছে। আছে আরো পাঁচজনের মত পাঁচ রকমের আকাঙ্ক্ষা। একান্ত সহজ সাধারণ, স্বাভাবিক এবং সম্ভ্রান্ত হবার ইচ্ছা। প্রণবের বউদি তার কোন ক্ষমতার কথা বললেন—হয়তো আর্থিক ক্ষমতার ইঙ্গিতই করে থাকবেন। সে কিন্তু তার নিজের নয়, পৈতৃক। নিজের আছে শুধু এক অস্বাভাবিক বাসনার অগ্নিকুণ্ডে জ্বলতে জ্বলতে একান্ত স্বাভাবিক হবার সাধ। অন্যের পক্ষে যে সুখ সহজ আর তুচ্ছ, শশাঙ্কের কাছে তাই অনায়ত্ত উচ্চ বৃক্ষচূড়ের ফল। তবু উম্বাহু বামনের মত শশাঙ্ক তার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ায়। আর সেই মুহূর্তে টের পায় সে আরো একটু বেড়েছে।

বিজলী রোডের মোড় থেকে একটা রিকশা নিল শশাঙ্ক। গাড়িটা কারখানায় পড়ে আছে তো আছেই। ফিরিয়ে আনবার গরজ নেই শশাঙ্কের। কী হবে এনে? গাড়িতে করে সে তো আর কলেজে যায় না। বাইরে বেরোনও ইদানীং কমে এসেছে।

মোড়ের পানবিড়ির দোকানটায় এখনো বেশ একটু জটলা আছে। পাড়াটা ভালো নয়। খুন-জখম, সোডার বোতল ছোঁড়া-ছুঁড়ি মাঝে মাঝে বেশ চলে।

একটু এগোতেই পিছনের সহাস্য মন্তব্য ভেসে এল। 'বাবু কি রকম টং হয়ে ফিরছে দেখছিস? মাথা আর তুলতে পারছে না।'

শশাঙ্ক মৃদু হাসল। ঘাড় ফিরিয়ে বক্তাকে আর দেখবার চেষ্টা করল না। কী হবে দেখে? শুনল, এই তো যথেষ্ট।

রামেশ্বর জেগেই ছিল। সাড়া পেয়ে দোর খুলে দিল।

ঘরে ঢুকে অভ্যাসমত শশাঙ্ক জিজ্ঞেস করল, 'আমার ফোন-টোন কিছু এসেছিল?'

'না বাবু।'

'চিঠিপত্র?'

'একখানা চিঠি আছে।'

খামখানা রামেশ্বর তার হাতে এনে দিল।

হাতের লেখা দেখে ফের চঞ্চল হয়ে উঠল শশাঙ্কের মন।

মন্দিরার অক্ষরগুলি মুক্তার মত সুন্দর নয়, কিন্তু বাসনার বিন্দুতে বিন্দুতে গড়া।

রামেশ্বরকে সদর দরজা বন্ধ করে দিতে বলে দোতলার ঘরে উঠে এল শশাঙ্ক। ঘরের উত্তরদিকে একখানা সিঙ্গলবেড খাট। আগে আরো একখানা খাট কয়েক হাত ব্যবধানে পাতা ছিল। সে খাট সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সেখানে যে থাকত তার সঙ্গে শশাঙ্কের আজ যোজনপ্রমাণ ব্যবধান। শোবার ঘরের দেয়ালগুলি শূন্য। কারো ফোটো সে এ-ঘরে টাঙিয়ে রাখেনি। না স্ত্রীর, না প্রাক্-বিবাহ কি বিবাহপরবর্তী যুগের প্রণয়িনীদের। ফোটো রেখে কী হবে। যেটুকু থাকবার তা বিনা প্রতিকৃতিতেই থাকবে। কিছু টাঙিয়ে রাখবার পক্ষে শশাঙ্কের মনের দেয়ালই যথেষ্ট।

দক্ষিণদিকের জানালার ধারে শশাঙ্কের লিখবার টেবিল, বইয়ের র‍্যাক। অবিন্যস্ত বইপত্রগুলি এখানে-সেখানে ছড়ানো রয়েছে। শশাঙ্কের এই ঘর তার শৃঙ্খলাহীন সামঞ্জস্যহীন জীবনের যেন নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। মাসে কি দু মাসে একদিন গৃহসংস্কারেও প্রবৃত্ত হয় শশাঙ্ক। রামেশ্বরকে হাঁকডাক করে আনে। ঘরদোর সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতে তার নিজেরই অজ্ঞাতে ঘরখানি আগের চেহারায় ফিরে যায়।

খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে খামখানার দিকে তাকাল শশাঙ্ক। সাদা সরকারী খাম। এবার আর রঙীন খাম পাঠায়নি মন্দিরা। হয়তো কাছে ছিল না। হয়তো তাড়াতাড়িতে সময় পায়নি। অমনিতে রঙের ভারি ভক্ত মন্দিরা। তার চোখে রঙ, ঠোঁটে রঙ, চিঠিতে রঙ। এই বর্ণাঢ্যতা শশাঙ্ক নিজেও চায়। নইলে মেয়েদের সে এত পছন্দ করবে কেন। তবু কখনো কখনো মনে হয় তার, এই [illegible] মধ্যে অপরিণত বয়সের ছেলেমানুষি আছে। যতই বয়স বাড়ুক, সেই কৈশোরকে সে যেন কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তার সব প্রেমই কি সেই একই কিশোর প্রেমের পুনরাবৃত্তি?

চিঠিখানা হাতে নিয়ে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা অনুভব করেছিল শশাঙ্ক, দোতলার ঘরে উঠে আসতে না আসতেই তা যেন অনেকখানি স্তিমিত হয়ে গেছে। এই কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙেই কি এমন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল শশাঙ্ক? না কি জোয়ার আর ভাঁটা একই সঙ্গে তার মনের মধ্যে মিশে রয়েছে? মুহূর্তে মুহূর্তে আসক্তির আক্রমণ আর নিরাসক্তির অবসাদে শশাঙ্ক যেন বড় বেশি পর্যুদস্ত। দিনরাত উন্মত্ত হাওয়ার এই স্বেচ্ছাচার তার ব্যভিচারের

তীব্রতাকেও যেন বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে।

চিঠিখানা ধীরে ধীরে খুলে ফেলল শশাঙ্ক। তারপর অসমান অসমান্তরাল নিচু থেকে মন্দিরার ক্রমশ উচ্চারোহী পংক্তিগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল।

শেখরদা,

জানিনে এই চিঠি আপনি পাবেন কিনা। না পাওয়াই সম্ভব। তবে আশা করি ছন্দা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। ও চিঠিখানা ঠিকই পোস্ট করবে। ওকে অনেক কাকুতি মিনতি করে চিঠি নিতে রাজী করিয়েছি। যদি পথে কোন অঘটন না ঘটে, যদি কেউ মাঝপথে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে না যায় তাহলে এ চিঠি আপনি পাবেনই। আর যখনই পাবেন দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে চলে আসবেন। এসে আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন। আমি এখন শত্রুপুরীতে আছি। আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমার বাবা পর মা পর, এ সংসারের সবাই পর। আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমার কলেজ বন্ধ, বাইরে কোথাও বেরোন বন্ধ। এমনকি বাড়ি থেকে উঠোনে নামা বন্ধ, বুড়ো শুকলাল আমার দোরের সামনে দিনরাত বসে পাহারা দিচ্ছে। এতদিন দারোয়ান ছিল না, সদর দরজায় এখন আমার জন্যে দারোয়ানও রাখা হয়েছে। আমি একটা ফোন করতে পারিনে, একখানা চিঠি লিখতে পারিনে, বাইরের কারো সঙ্গে একটা কথা বলবার অধিকারও আমার নেই। বাড়ির ভিতরে কারো আসা-যাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। বাবার কথার ওপর কে কথা বলবে? বাড়ির বাইরে তিনি নামকরা ডাক্তার, গরীব রোগীর কাছে দয়ালুও, কিন্তু বাড়ির মধ্যে তাঁর আর এক চেহারা। এখানে তিনি আস্ত অটোক্রাট। তিনি যেন একই সঙ্গে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, পালন করেছেন, এখন ইচ্ছা করলে সংহারও করতে পারেন।

আপনি আমাকে এই মৃত্যুপুরী থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। শুধু আপনিই পারেন উদ্ধার করতে। আর কেউ পারে না। আপনার যদি এ বাড়িতে আসতে লজ্জা হয়, আপনি বাবার ডিসপেনসারিতে গিয়ে দেখা করুন। গিয়ে বলবেন—কী বলবেন তা আমি আপনাকে আর কী বলে দেব। বলবেন, মন্দিরার ওপর এ সংসারে আপনারই শুধু একচ্ছত্র অধিকার। আর কারো এক ফোঁটাও কোন দাবি নেই। যে দাবি ছিল আমার ওপর অত্যাচার করে করে সে দাবি তাঁরা হারিয়েছেন। আর বলবেন, আমি এখন আর নাবালিকা নই। আমি এখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। নিজের পথ বেছে নিতে পারি। নিজের পথের সঙ্গীও বেছে নিতে পারি। আপনি আমাকে শুধু সাহায্য করুন।

বাবা অবশ্য আমার এত বয়েস স্বীকার করবেন না। তিনি একে বাবা, তারপরে ডাক্তার। ডবল সাক্ষী হয়ে তিনি হয়তো আমার দু বছর বয়েস কমিয়ে দেবেন। দরকার হলে জাল ঠিকুজী তৈরি করে ফেলবেন। ওঁরা সব পারেন।

আপনাকে আর একটা কথা বলি। ওঁরা কিন্তু জোর করেই আমার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। মার সঙ্গে বাবা সেদিন পরামর্শ করছিলেন। আমি আড়াল থেকে শুনেছি। বাবা বলেন, আমাকে যে রোগে ধরেছে তার একমাত্র অমোঘ ওষুধ হল বিয়ে। মা একটু আমতা-আমতা করেছিলেন, বাবা ধমক দিয়ে তাঁকে বোবা বানিয়ে দিয়েছেন। কী যে বাজে বাজে সম্বন্ধই আসছে। বাবা যেন সেই রূপকথার রাজা হয়েছেন। তিনি ভোরে উঠে যাঁর মুখ দেখবেন, তাঁর সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। আমি দিনরাত ভগবানকে ডাকি, রাজা যেন ভোরে উঠে আপনার মুখ দেখেন। আমি দিনরাত ভগবানকে ডাকি, তিনি যেন মুখ দেখাবার মত সাহস আপনাকে দেন। আপনার ভয় কিসের? লোকে নিন্দে করবে! আমরা লোকালয় ছেড়ে চলে যাব। আপনি তো কতদিন বলেছেন আমরা বনে বনান্তরে ঘুরব, দেশে দেশান্তরে বেড়াব। ইংরেজী বাংলা কত কবির কবিতা কোট করে করে আপনি সেই স্বপ্নরাজ্য গড়েছেন। আমিও তাই গড়ব। শুধু মার মত আসবাবপত্র বাসন-কোসন দিয়ে সংসার গড়ব না। আপনি যেখানে থাকতে বলবেন সেখানে থাকব, যেখানে যেতে বলবেন যাব। কিন্তু আপনাকে ছাড়া থাকতে পারব না। আর কাউকে ভালোবাসতে পারব না।

আমি এ কথা বলছিনে আজই আপনাকে বিয়ে করতে হবে। আপনি যখন খুশি করবেন, আমি অপেক্ষা করে থাকব। কিন্তু যাতে অপেক্ষা করতে পারি শুধু সেই ব্যবস্থাটুকু আপনি করে যান। হস্টেলে হোক, অন্য কোথাও হোক, আপনি যেখানে রাখবেন আমি সেখানেই থাকব। বিয়ের কথা আর কাউকে বলব না, শুধু মনে মনে জেনে রাখব। জানব যে আমার একজন আছেন।

আপনি কিন্তু আর দেরি করবেন না। যা করবার তাড়াতাড়ি করবেন। এঁরা কিন্তু আর মোটেই সময় দেবেন না। আমার তো কিছুই করবার ক্ষমতা নেই। আমি এখানে সম্পূর্ণ বন্দিনী। কিন্তু আর আমি এভাবে থাকতে চাইনে। শেখরদা, আজ আর আপনাকে আপনি বলতে ইচ্ছে করছে না। সবই তো বলে ফেললাম, এখন যদি 'তুমি' বলি আপনি কি রাগ করবেন? আপনি বলেছিলেন তুমি আমাকে তুমিও বলতে পার। তখন পারিনি। আজ আর না বলে পারছিনে। ইতি—

তোমার মন্দিরা

চিঠি শেষ করে শশাঙ্ক কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। প্রথমবারের পাঠে এ চিঠি তার মনে নতুন কোন আবেগ কি বাসনার সঞ্চার করল না। এমন একটা

কাণ্ড যে হবে তা যেন সে আগেই টের পেয়েছিল। এ ধরনের ঘটনা তার অভিজ্ঞতার বাইরে নয়। আরো দু-একবার ঘটেছে। মেয়েরা এই চায়। তারা ঘর বাঁধতে চায়। যাদের ঘর আছে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা ঘরে থেকেও বাইরে দু'এক পা ঘুরে আসতে রাজী হয় না। কিন্তু যাদের তা নেই তারা শুধু ঘরণীই হতে চায়। বন্ধনহীন গ্রন্থির রস ওদের জন্যে নয়। গৃহ সংসার আর সন্তান-কামনা—প্রকৃতি এই প্রবণতাই ওদের মধ্যে ভরে দিয়েছে। ওদের দোষ নেই। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের কথা লিখেছে মন্দিরা। ওরা প্রকৃতির সেই বিষ্ণুশক্তি। ওরা বিষ্ণুপ্রিয়া। তা তো হল। কিন্তু এই বিশেষ বিষ্ণুপ্রিয়াটিকে নিয়ে এখন কী করবে শশাঙ্ক। সেদিন যোগরঞ্জনবাবু চটেমটে কটমট করে তাকাতে তাকাতে যেভাবে চলে গেলেন তাতে তিনি নন্দিনী-শাসনকে—তটিনী শাসনকে একেবারে সমুদ্রশাসনের পর্যায়ে নিয়ে তুলবেন, তা অনুমান করতে বেশি দেরি হয়নি শশাঙ্কের। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির গৌরবে, ওই অবুঝ মেয়েটি যে সব কাণ্ড শুরু করেছে তাকে এখন বুঝায় কী করে শশাঙ্ক, তাকে সামলায় কী করে। অথচ সামলাতেই হবে। মেয়েরা ক্ষেপে গেলে না পারে এমন কিছু নেই। ছুটে হয়তো শশাঙ্কের কলেজে গিয়ে হাজির হবে। সবাইর সামনে বলবে "এই প্রফেসর আমার প্রাণেশ্বর।" ঈর্ষা আর হিংসার জ্বালায় সুজাতা যেমন সেই কাণ্ড করেছিল, এক-কলেজ ছাত্র আর প্রফেসরের সামনে শশাঙ্কের মুখ হাসিয়েছিল, মন্দিরাও হয়তো তাই করবে। তাকে শেষ পর্যন্ত সেই কলেজ ছাড়তে বাধ্য করেছিল সুজাতা। মন্দিরাও কি তাই করবে?

অথচ অনেক চেষ্টায় যত্নে, অনেক ঘাট ঘুরে ঘুরে এতদিনে শশাঙ্ক ওই নতুন কলেজটির ঘাটে তরী ভিড়িয়েছে। ছাত্রেরা অনুরাগী হয়ে উঠেছে, অধ্যক্ষ তার দক্ষতা স্বীকার করেছেন। নাইট-সেকসনের উপাধ্যক্ষগিরি জুটে যাবে এমন আভাসই তো তিনি সেদিন দিলেন। হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার প্রায় করে এনেছে শশাঙ্ক। এই অবস্থায় সে কি আবার সব হারাবে? শশাঙ্ক ভেবেছিল সে বুঝি নারী ছাড়া আর কিছু চায় না। যৌনকামনা ছাড়া আর বুঝি তার কোন কামনা নেই। এখন দেখতে পাচ্ছে সে সব চায়। অর্থ যশ, বিত্ত প্রতিপত্তি—সব। সেই সঙ্গে নারী। সব বাদ দিয়ে নারী নয়। বরং নারীকে বাদ দিয়েও অন্য সব পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবার তার মনে আস্তে আস্তে জন্ম নিচ্ছে। এবার বোধ হয় তার জীবনের মোড় ফিরবে। অন্তত ফিরুক তাই চায় শশাঙ্ক। নতুন বয়ঃসন্ধির স্বাদ পেতে চায়। এরই নাম কি প্রৌঢ়ত্ব? স্বীকার করতে এখনো কষ্ট হয়, কিন্তু অস্বীকার করবারও উপায় নেই। মন্দিরা, তুমি কেন আগে এলে না? তপস্যার নিশ্চল আসনের দিকে শশাঙ্ক এখন মাঝে মাঝে তাকায়। সেই অলব্ধ অনায়ত্ত অপার্থিব ফলের দিকে উদ্বাহু হাতখানা উত্থিত হতে চায়। মন্দিরা, তুমি কেন আগে এলে না?

সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। শশাঙ্ক একটু চকিত, একটু ত্রস্ত হয়ে উঠল, 'কে?'

আর কেউ নয় রামেশ্বর।

'বাবু, খাবেন না? কত রাত হল।'

শশাঙ্ক মুখ খিঁচিয়ে উঠল, 'যাঃ ভাগ। তোকে কে আসতে বলেছে?'

'বাবু, আপনার খাবার কি ঢাকা দিয়ে রাখব?'

'আচ্ছা রাখ। এখানে নিয়ে আয়। এখানে এনে ঢেকে রেখে তুই খেয়ে শুয়ে পড় গিয়ে।'

রামেশ্বর খাবার নিয়ে এল। ছোট একটি টেবিলও নিয়ে এল টানাটানি করে। সযত্নে খাবারগুলি রাখল, ঢাকল। কিন্তু সে যতক্ষণ ঘরের মধ্যে রইল শশাঙ্ক অতি কষ্টে তার অস্তিত্ব সহ্য করলে। এই নিভৃত ঘরে, এই নিশীথ চিন্তার আসরে আর কোন প্রাণস্পন্দন শশাঙ্কের কাছে অসহনীয়।

অবশ্য বয়স একটা বড় ফ্যাক্টর নয়, শশাঙ্ক ভাবতে লাগল। তার ঠাকুরদা কবিরাজ মুরারি সেন তৃতীয় পক্ষ পর্যন্ত করেছিলেন। পঞ্চাশ পার হয়েও ষোড়শীর পাণি-পীড়নে কিছুমাত্র মনঃপীড়া বোধ করেননি। শশাঙ্কের বাবাও দ্বিতীয় পক্ষ করে গেছেন। অবশ্য প্রথমা স্ত্রী বিগত হওয়ার পর। কিন্তু তৃতীয় পুরুষে এসে সামাজিক রুচি আর রীতি দুই-ই পালটেছে। এখন শশাঙ্ক বহুপত্নিক হবার কথা ভাবতেই পারে না। যদিও বহুবল্লভতা তার রুচিতে বাধে না। দাদার আমলের উপপতি উপপত্নী শব্দ শুনলে সে দুটি কানে দুটি আঙুল গোঁজে, এমন কি, মিসট্রেস শব্দটিও সুখশ্রাব্য মনে হয় না। তার বদলে বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড, বন্ধু আর বান্ধবীর চলন হয়েছে। হয়তো এ-চালও একদিন উঠে যাবে। এ-শব্দগুলিও একদিন ভালগার বলে গণ্য হবে। অভিধানে নতুন শব্দ আসবে। কিন্তু নতুন মানে নিয়ে আসবে কি? নাকি এই বহুকামিতাই সেদিন বিলুপ্ত হবে!

শব্দার্থ চিন্তা থেকে শশাঙ্ক ফের এই মুহূর্তের জটিল ধাঁধার উত্তর অন্বেষণ শুরু করল। বয়স এখনো একটা বড় ফ্যাক্টর নয়। এই বয়সে, এমনকি এর চেয়েও বেশি বয়সে তরুণী ছাত্রীকে বিয়ে করার দৃষ্টান্ত এই শহরে এই সমাজে একান্ত বিরল নয়। সুজাতাকেও দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বলে গণনা না করলে চলে। সে তো এখন প্রায় আধা-সন্ন্যাসিনী। বলা যায় না, এতদিনে হয়তো পুরো সন্ন্যাসিনীই হয়েছে। প্রণয়-পীড়ায় জর্জরিতা ভক্তির আরোগ্য-শালায় ঠাঁই নিয়েছে। হয়তো বহু-বাসনার বন্ধন থেকে আংশিক মুক্তি পেয়েছে। শশাঙ্ক তার জন্যে সেই মুক্তি কামনাই করে। বাসনায় বড় জ্বালা, বড় সহনাতীত যন্ত্রণা। হিন্দু কোড বিল পাশ হতে যাচ্ছে। প্রথম পক্ষকে বাতিল করে দ্বিতীয় পক্ষকে আইনসম্মত, সমাজসম্মত এবং রুচিসম্মত করে নিতে শশাঙ্কের বাধবে না। তবু কোথায় বাধা? সে-বাধা বাইরের নয়,

ভিতরের। গহন মনের কন্দরে কন্দরে সেই দুর্নিরীক্ষ্য অথচ দুর্ভেদ্য প্রাচীর আর পরিখাগুলিকে খুঁজে বেড়াতে লাগল শশাঙ্ক। কিন্তু কিছুতেই কোন হদিস মিলল না। 'আমি বড় ক্লান্ত, আজ আমি বড় ক্লান্ত। মন্দিরা, তুমি কেন আগে এলে না?'

টেবিলের ওপর ঢাকনিতে ঢাকা ভাত-তরকারি পড়ে রইল। ক্ষিদে নেই শশাঙ্কের। কি ক্ষিদে যদি-বা আছে, রুচি নেই, প্রবৃত্তি নেই। এই প্রবৃত্তিই সব। 'তুমি নিজেকে যতই প্রবৃত্তিপরায়ণ বলে মনে কর না, কি বাইরে উচ্চ-কণ্ঠে জাহির কর না, প্রকৃতি কখন যে আড়ালে আড়ালে তোমার বাসনার শিকড়গুলি আস্তে আস্তে কেটে নেয়, তুমি তা টেরও পাও না। আনমনে নিবৃত্তির পথে কখন যে তুমি চলতে শুরু কর, তুমি তা জানতেও পার না। তখন ক্ষিদে মরে যায়, শুধু দুষ্ট ক্ষিদেটুকু থাকে। তৃষ্ণা মরে যায়, শুধু হাঁ করবার অভ্যাসটুকু থাকে।

'মন্দিরা, তুমি কেন আগে এলে না?'

খাদ্যে রুচি না থাকলে পানীয় আছে। ওই ছোট আলমারিটার মধ্যে সব ব্যবস্থাই রয়েছে। অবশ্য মদ আজকাল আর নিয়মিত খায় না শশাঙ্ক। ডাক্তারের বারণ। খেলে সহ্যও হয় না। এখন শুধু ওষুধের মাত্রায় খায়। তা-ও রোজ নয়। কখনো কখনো। শুধু অবসাদ কাটাবার জন্যে। তা-ছাড়া, সুরায় কখনো বেশি আসক্তি বোধ করেনি শশাঙ্ক। নারীদেহের যে আনন্দ, এতদিন তাই তার কাছে সব ছিল। আজও কি আছে? মন্দিরা, তুমি কেন আগে এলে না?

উঠে গিয়ে আলমারিটা খুললে হয়। তাতে আর কিছু না হোক, অবসাদ কাটবে, ক্লান্তি দূর হবে। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে বিছানা থেকে তুলতে পারল না শশাঙ্ক। মন্দিরার চিঠিখানা ভাঁজ করে বালিশের তলায় রাখল। এ কি শরজর্জর স্মরশয্যা না শেষ শয্যা? ইচ্ছা কি আকাঙ্ক্ষা থাকলেও ওকে উদ্ধার করে আনা কি এতই সহজ? সে পিতৃস্নেহের পিতৃ-শাসনের কল্যাণ-দুর্গে বন্দিনী। তাকে সেখান থেকে বের করে আনার সাধ্য শশাঙ্কের নেই। সে ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম। ঘোড়া নেই যে, সংযুক্তা হরণ করবে। শশাঙ্কের সংযুক্তাকে বিযুক্তা হয়েই পিতৃগৃহে থাকতে হবে, যদি না পায়ে হেঁটে সে নিজে এসে হাত ধরে।

শশাঙ্কের কি লোকলস্কর সৈন্যসামন্ত আছে যে, তাই নিয়ে যোগরঞ্জনের দুর্গ আক্রমণ করবে, অবরোধ করে রাখবে। বরং আইন তাঁর পক্ষে, সমাজ তাঁর পক্ষে, এমনকি, ন্যায় তাঁর পক্ষে, নীতি তাঁর পক্ষে।

শুধু অন্ধ আবেগের কথা নয়, শশাঙ্কের মত অমিতাচারী, বিগত, বিগত না হোক, অপচিতযৌবনের মন্দিরা শুধু ক্ষণসঙ্গিনীই হতে পারে। চির-সঙ্গিনী হতে পারে না। তাহলে তাকে চিরকাল কাঁদতে হবে। অনেককে

কাঁদিয়েছে শশাঙ্ক, ওকে আর কাঁদাতে চায় না। এই সংকল্পের মধ্যে কোথায় যেন একটু গৌরব বোধ করল শশাঙ্ক। এবার যেন সেই জটিল ধাঁধার সঠিক উত্তরটি সে খুঁজে পেয়েছে। স্ক্যাণ্ডালের ভয় নয়, কলেজে অপদস্থ হবার ভয় নয়, তরুণী ভার্যা নিয়ে চিরকাল সন্দেহ-সংশয়ের অশান্তিতে কাটাবার আশঙ্কায় নয়, শুধু ওই অবুঝ মেয়েটির জীবনকে সৌন্দর্যে কল্যাণে সাফল্যে সার্থকতায় ভরে দেওয়ার জন্যেই নিজেকে সরিয়ে আনবে শশাঙ্ক। যদিও সরে আসতে কষ্ট হবে। এক-পা সরবে তো আর-এক-পা সরতে চাইবে না। বাসনার শিকড় অসংখ্য, ভোগ না করতে পারলেও শুধু অধিকার করে রাখবার লোভ সীমাহীন, এ যেন ব্যাঙ্কের টাকার অঙ্কের ওপর শুধু হাত বুলিয়েই আনন্দ। ভিতর থেকে সহজে সরে আসতে পারবে না শশাঙ্ক। বেশ কষ্ট হবে। তবু শুভ-পরিণামের কথা ভেবে শুভ-পরিণয়ের প্রস্তাবটিকে বাতিল করা ছাড়া তার উপায় নেই।

দোর বন্ধ করে দিয়ে এল শশাঙ্ক। সুইচ অফ করে দিতে অন্ধকারে যেন সে নিজের মুখ লুকোতে পারল, যেন সমস্ত সত্তাকে লুকোতে পারলে বাঁচে! তুমি কেন আগে এলে না মন্দিরা?

কিন্তু এলেই বা কী হতো? মন্দিরা না আসুক—আরো তো কেউ কেউ এসেছে। তাদের কাউকেই কি সে ধরে রাখতে পেরেছে? ধরে রাখতে চেয়েছে? তার প্রবৃত্তির এমনই ধারা, তা কিছুতেই অনির্বাণ অগ্নিশিখা হতে পারল না, বিদ্যুতের ফোয়ারা হতে পারল না। তা শুধু ক্ষীণজীবী জোনাকির মত নিবল আর জ্বলল, নিবল আর জ্বলল। এই ক্ষণিকতা দিয়ে সে অনুক্ষণ কাকে বেঁধে রাখতে যাবে?

তার চেয়ে ছেড়ে দেওয়াই ভালো, সরে আসাই ভালো। তাতেই মঙ্গল। শব্দটি উচ্চারণ করে নিজেই হাসল শশাঙ্ক। সে কি নতুন করে মঙ্গলকাব্যের পাঠ শুরু করল? নব-প্রণয়িনীমঙ্গল রচনা করতে চায় নাকি সে? কল্যাণ, মঙ্গল এ-সব শব্দ শশাঙ্কের হাসির খোরাক জোগাত। নিজেকে সে ভাবত মঙ্গল-অমঙ্গল-নিরপেক্ষ জীবনশিল্পী। আসক্তির বন্যায় ভেসে যাওয়া, তারপর পরম নিরাসক্তভাবে সেই আসক্তিরই বিচার-বিশ্লেষণ, এই ছিল তার বৃত্তি। একই সঙ্গে বিষয় আর বিষয়ীর দ্বৈত ভূমিকায় সে প্রবৃত্ত।

কিন্তু কিছুদিন ধরে অন্য কথা মনে হচ্ছে শশাঙ্কের। স্পর্শে যে সুখ, সে-সুখ দেহসান্নিধ্য ছাড়া চলে না। কিন্তু এমন আরো কিছু সুখ কি নেই, যা সান্নিধ্যের ওপর নির্ভর করে না? যা সান্নিধ্য ছাড়াই স্পর্শানুভূতির মত তীব্র স্বাদ এনে দেয়?

এরই নাম কি দেহাতীত ভালোবাসা? এরই নাম কি মনে মনে ভালো-বাসা? কোথায় এই মন, তা জানে না শশাঙ্ক। এখনকার মনস্তত্ত্ব তো মনোহীন। মনও আর-এক ধরনের দেহ। দেহজাত সংস্কার ছাড়া কিছু নয়।

শশাঙ্কেরও তাই বিশ্বাস। যুগের হাওয়ায় তাকেও তো নিঃশ্বাস নিতে হয়।

তবু যাকে সে ভালোবাসে, তাকে সে বাপের মত পরের হাতে, বরের হাতে দিতেও ভালোবাসে, এই বোধ আজ কোত্থেকে এল শশাঙ্কের মনে, এ কি শুধু দীনতার সৃষ্টি? যৌবনহীনতা? সম্ভোগ কামনার ক্ষীণতা ছাড়া এর মূলে কি আর কিছু নেই?

হয়তো তাই, নির্লজ্জ নির্জলা নির্মম সত্য। তবু স্বীকার করতে মন চায় না। মন অন্য কথা বলে। মন বলে, 'আমি তার কল্যাণ চাই। আমি তাকে সুখী করতে পারি বা না পারি, আমি তাকে সুখী দেখতে চাই। সে সুখ স্পর্শসুখ নয়, সে সুখ চক্ষুগোচর নয়। সে সুখ অবিমিশ্র সুখও নয়, অধিকার হারাবার ভয়ে জর্জর, হীন পুরুষত্বের অপমানভারে ভরা।'

যোগরঞ্জনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না শশাঙ্ক। কারণ তিনি আর তার কথা বিশ্বাস করবেন না। তিনি নিশ্চয়ই তার এই মতপরিবর্তনের স্থূল ব্যাখ্যা করবেন। সুযোগ অন্বেষী, সুবিধাবাদী ছাড়া আর কিছুই তাকে ভাবতে পারবেন না। কিন্তু যদি পারতেন, আর শশাঙ্ক যদি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারত, তাহলে তাঁর হাতে হাত মিলিয়ে বলত, 'আপনার সঙ্গে আজ আমার আর কোন তফাত নেই। আপনার মত আমিও আজ আর শুধু ওকে চাই না, আমিও ওর সুখ চাই, শ্রী, সৌন্দর্য, পূর্ণতা চাই। আমি শুধু ওর দেহ চাই না। আপনার চেয়ে আমার কষ্ট কম নয়। আপনি অনেক পণ দেবেন, যৌতুক দেবেন, আর আমাকে দিতে হবে পৌরুষ। আমাকে খোয়াতে হবে আমার আইডেনটিটি। বৃদ্ধ বাপের চেয়ে প্রৌঢ় প্রণয়ীর ত্যাগ কম নয়, যোগরঞ্জনবাবু। আপনি আমাকে কী শিক্ষা দেবেন? আমি কি নিজেই নিজেকে কম শিখিয়েছি! কিন্তু সে শিক্ষার কোন মূল্য নেই। আমি আজ শিখি, কাল ভুলি। কিছুতেই সেই বর্ণলিপি মনে রাখতে পারিনে। চিরবিস্মৃতিই আমার ললাটলিপি।'

ঘুম এল না। বেড-সুইচ টিপে ফের আলো জ্বালল শশাঙ্ক। বালিশের তলা থেকে চিঠিখানা নিয়ে আবার পড়ল। আরো একবার পড়ল। আপন ঘরে বন্দিনী একটি মেয়ের আবেগ, উৎকণ্ঠা, তার প্রথম যৌবনের প্রেম, দয়িতের সঙ্গে একাত্ম হবার উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা অনুভব করল শশাঙ্ক। এতক্ষণ সে নিজের দিক থেকে ভেবেছে। প্রবীণ বয়সের বিচারবুদ্ধি দিয়ে কামনার বন্যাকে বিন্দু বিন্দু করে বিশ্লেষণ করে দেখেছে। এবার দেখল মন্দিরার দিক থেকে। তার বাসনার পীড়ন, বাধা পাওয়া কামনার উদ্দামতা সর্বাঙ্গ মনে অনুভব করবার চেষ্টা করল। এক সময় শশাঙ্কেরও তো এই বয়স ছিল। এই অন্ধ আবেগ, এই আসক্তির উন্মত্ততা তাকেও কি বার বার চুরমার করে ফেলেনি? আজও কি ছেড়ে দেয়? সেই উত্তাল তরঙ্গবন্যা আজও কি তাকে আছড়ে আছড়ে মারে না? প্রণয়ের এই পীড়ন নিপীড়নে আর যারই হোক,

শশাঙ্কের অন্তত রঙ্গ করবার অধিকার নেই।

তবু মন্দিরা, তুমি বড় দেরিতে এসেছ।

শশাঙ্ক মনে মনে বলল, 'আমার সেই ভালোবাসার জোর আর নেই, যাতে সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ, বিচার-বিবেচনা ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলো হয়ে উড়তে পারে। আমি রাশ টেনে ধরিনি। তবু সেই ধাবন্ত অশ্ব আজ থমকে দাঁড়িয়েছে। সামনে পাহাড় দেখেছে না নদী দেখেছে, কে জানে? ও কি দেখতে পেয়েছে যৌবনলীলা চির-অবসিত কালো কালিন্দীকূলে?'

হঠাৎ চোখে জল দেখা দিল শশাঙ্কের। ছি-ছি-ছি, ছি-ছি-ছি। ঘরে আর কেউ অবশ্য দেখবার নেই। তবু নিজের মধ্যেই আর-এক জোড়া চোখ তির্যক হয়ে রয়েছে।

শশাঙ্ক আবার আলো নিবিয়ে দিল।

'আমি কি আমার ভালোবাসার ক্ষমতা হারিয়েছি?'

শশাঙ্ক নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল।

রক্ত যৌবনের প্রতীক, রক্ত পৌরুষের প্রতীক। অশ্রু তো তা নয়। এ-অশ্রু তবে কিসের? শুধু কি গ্লানি আর অনুশোচনার অপচয় আর অক্ষমতার? কিন্তু ঝাপসা চোখে করুণ কোমল মমতায় ভরা যে একটি নতুন জগতের আভাস নিজের মধ্যে অনুভব করছে শশাঙ্ক, তা কি একান্তই নেতিবাচক?

অনেক সাধ্য সাধনার পর ঘুম এল শশাঙ্কের। যেন অভিমানিনী কলহান্তরিতার আঁচল এতক্ষণে তার হাতের মুঠিতে এসেছে।

ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। শশাঙ্কর, তার মধ্যে একটির কথা, ভোরে ঘুম ভাঙবার পর অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল। সে যেন কোথায় এক বিবাহ-সভায় বরযাত্রীর দলে গিয়ে বসেছিল। বর আসেনি দেখে কারা যেন তাকে সচিত্র পিঁড়িতে বসিয়ে দিল। সামনে রক্তবর্ণ চেলিতে সজ্জিতা সালঙ্কারা কন্যা অপেক্ষা করছে। কেউ সম্প্রদান করতে আসেনি তাকে। সে স্বয়ম্বরা হবে। সে যে কে, তা জানতে বাকি নেই শশাঙ্কের। সে শতজনের ভিতর থেকেও বেছে বের করতে পারে। আলো জ্বলছে, পরজ বসন্তে সানাই বেজে চলেছে। পুরোহিত নেই, তাঁর কণ্ঠে মন্ত্রও নেই। মন্ত্র শুধু হৃদয়ে হৃদয়ে।

যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম
যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

দুজনে উঠে দাঁড়াল। এবার মালা বদলের পালা। অবগুণ্ঠিতা স্মিত প্রসন্ন হাস্যে অনবগুণ্ঠিতা হল।

কিন্তু একি! এ যে সুজাতা! সেই চোখ, সেই মুখ, সেই ঠোঁট। ঠোঁটের সেই বিদ্রূপের বাঁকা হাসি। সেই চিত্রার্পিত নিঃশব্দ হাস্যে আলো নিবে

গেল, বাজনা থেমে গেল, ঘুম ভেঙে গেল শশাঙ্কের।

ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। একমুহূর্ত শশাঙ্ক স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর আর-একটি অট্টহাসিতে রাত্রির সমস্ত আবেগ, অধীরতা আকুলতাকে উড়িয়ে দিতে দিতে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শশাঙ্ক হাঁক দিল, 'রামেশ্বর, চা নিয়ে আয়।'

যদিও নিজে নিশাচর শশাঙ্ক, কখনো বা নিশাকান্ত, তবু রাত্রিকে সে মাঝে মাঝে বড় ভয় করে। অমাবস্যার অন্ধকার তাকে ডুবিয়ে ছাড়ে। বল বুদ্ধি সাহস কেড়ে নেয়। তার চেয়ে দিনের আলো অনেক ভালো। সহস্র-লোচন সূর্যের চোখের সামনে নিজের স্বাক্ষর ভাস্বর হয়ে ওঠে। প্রতিটি পদক্ষেপ প্রতীতি আনে। আশ্চর্য, নিজের মনেই হাসল শশাঙ্ক। সে-ও কি মন্দিরার বাবার মত সৌর হয়ে উঠল?

'ওরে রামা, চা নিয়ে আয়।'

॥ ৩ ॥

যোগরঞ্জন শেষ পর্যন্ত মেয়ের বিয়ে দেওয়াই ঠিক করলেন। কোন রকম ঝোঁকের মাথায় নয়, বেশ ভেবেচিন্তেই তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল মন্দিরাকে এম. এ. পর্যন্ত পড়াবেন। তারপর বিয়ে-থার কথা ভাববেন। বাপ-মায়ের পীড়াপীড়িতে বড় মেয়ে ইন্দিরাকে অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়েছেন। ইন্দু স্কুলের গণ্ডী পার হয়নি। মন্দিরার যতদূর ইচ্ছা, যতদূর সাধ্য পড়বে। কন্যাকেও পুত্রের মত পালন করতে হয়, শিক্ষা দিতে হয়। তবেই সে পুত্রের তুল্য হয়ে ওঠে। ছেলে যখন হলই না, তখন সাধ্যমত মেয়েদেরই তিনি ছেলের মত মানুষ করে তুলবেন। শুধু কন্যা সম্প্রদান করে পিতৃত্বের দায় হতে রেহাই নেবেন না। পালন করে পোষণ করে, উপযুক্ত লেখাপড়া গুণ যোগ্যতায় শিক্ষা দিয়ে তবে তো সম্প্রদান করতে হবে। নইলে তিনি যাকে সম্প্রদান করবেন সে তো মাটির ঢেলা, বড়জোর রঙকরা মাটির পুতুল। তার কী দাম আছে? শুধু পণযৌতুকের ঘুষ দিয়ে কি তার মূল্য বাড়ানো যায়? সুযোগ্যতায় অলঙ্কৃতা করে কন্যা সম্প্রদান করতে হয় বরকে, আর পুত্র সম্প্রদান করতে হয় সমাজকে, দেশকে। বর সেই সমাজেরই প্রতিভূ। ছেলের বেলায় যেমন প্রতিভূ তার হাসপাতাল ডিসপেনসারী, অফিস আদালত, শত শত ব্যক্তির শত শত কর্মকেন্দ্র। কিন্তু ছেলে যখন হল না যোগরঞ্জনের তখন সে চিন্তা থেকে তিনি মুক্ত। এখন মেয়েদের কথাই তিনি ভাবেন। আর ভাবেন নিজের একটি নার্সিংহোমের কথা। সেই সেবাকেন্দ্র হবে তাঁর পুত্রতুল্য। তাঁর কৃতিত্ব দক্ষতা যদি কিছু থাকে সেই প্রতিষ্ঠান তার স্বাক্ষর

বহন করবে। মেয়েদের মধ্যে যদি কেউ ডাক্তার হয় তার হাতে তিনি এই নার্সিংহোমের ভার দেবেন। কি জামাইদের মধ্যে যদি কেউ চিকিৎসক হয়ে আসে তার ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন। তাও যদি না হয় যোগরঞ্জনের অনেক অনুরক্ত ছাত্র আছে, তরুণ উৎসাহী উদ্যমশীল সহকর্মীরা আছে, তাদের কাউকে বেছে নেবেন।

মন্দিরাকে নিয়ে এইসব উচ্চ আশাই যোগরঞ্জনের মনে ছিল। ও যখন হয়, ছেলে হয়েছে বলে ভুল খবর পেয়েছিলেন যোগরঞ্জন। সেই ভুল সংগে সংগে শোধরানো হয়েছে। কিন্তু মেয়েকে ছেলের চেয়ে কম আদরে মানুষ করেননি তিনি। তবু মেয়ে অন্য পথ নিল। ছেলেবেলা থেকেই অতিরিক্ত সাজসজ্জার দিকে তার ঝোঁক। যত সব বাজে নাটক নভেল পড়ার দিকে আসক্তি। গান কবিতা ছবি, সিনেমার দিকে মেয়ের অত্যধিক প্রবণতা। নিজের প্র্যাকটিস নিয়ে ব্যস্ত থাকবার ফাঁকে ফাঁকে মন্দিরার সব চালচলনই তিনি লক্ষ্য করেছেন। শাসন করেছেন, ধমক দিয়েছেন, শান্তভাবে সব কথা বুঝিয়ে বলেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। মেয়েকে ঠিক নিজের মনের মত করে গড়ে তুলতে পারেননি যোগরঞ্জন। মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁর মেয়ে হয়ে জন্মালেও ও যেন অন্য কারো মেয়ে হয়ে গড়ে উঠেছে। ভারি অবাক লাগে। সন্তান যদি নিজের চিত্তবৃত্তির অনুসারী না হয় তাকে সন্তান বলেই স্বীকার করতে ইচ্ছে করে না। অথচ ঠিক লেবরেটরীতে রেখে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করা যায় না। তাদের বৃহৎ সমাজ-সংসারে ছেড়ে দিতেই হয়। সেখানে তারা নিজের নিজের প্রকৃতি প্রবৃত্তি অনুসারে শিক্ষা নেয়, সংগী বাছাই করে। যোগরঞ্জন বড়জোর উপদেশ নির্দেশ দিতে পারেন, কখনো স্নেহকোমল কখনো শাসনে কঠোর হতে পারেন। আর কী করবার ক্ষমতা আছে তাঁর?

রোগী দেখে তার ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করে খানিকক্ষণ ইতস্তত করেছিলেন যোগরঞ্জন। যাবেন, না ফিরে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না গিয়ে পারেননি।

শশাঙ্কের বাড়িতে মেয়েকে দেখে ক্রোধে ঘৃণায় বিদ্বেষে মন ভরে উঠেছিল যোগরঞ্জনের। এত বড়ো স্পর্ধা মেয়ের? তিনি যা নিষেধ করেছেন ও তাই করবে? যে লোকটিকে দুর্বৃত্ত জেনে তিনি ত্যাগ করেছেন, সমস্ত সম্পর্ক তুলে দিয়েছেন, যার ছায়া মাড়াতে পর্যন্ত নিষেধ করেছেন, মেয়ে তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে? সেই মুহূর্তে ওই দুজনকে তিনি যে কোন শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু সভ্যসমাজে রাগ হলেই গায়ে হাত তোলা যায় না। সে ভার দিতে হয় পুলিসকে, অন্যায়কারীর শাস্তির ভার ছেড়ে দিতে হয় আদালতের হাতে। যদিও কথায় কথায় মানুষ আইন-আদালতের শরণ নিতে পারে না। নিজেকেই একই সংগে একজিকিউটিভ আর জুডিসিয়ারীর প্রতিনিধি হতে হয়। শশাঙ্ককে তিনি শুধু অন্তরের প্রচণ্ড ঘৃণা দিয়েই

বিন্ধ করে এসেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওই ভীরু কাপুরুষ মেয়েঘেঁষা পুরুষটির ওপর তাঁর অনুকম্পাও হয়েছিল। যারা অসচ্চরিত্র আসলে তারা দুর্বলচরিত্র। যাকে সাপের মত দেখতে, একবার রুখে দাঁড়ালেই সে কেঁচো হয়ে যায়। ওই কেঁচোর শাস্তি তিনি পরে দেবেন, তার আগে মেয়ের ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথ যোগরঞ্জনকে বেঁধে দিতে হবে। বাপ হিসেবে সেইটাই তাঁর প্রথম দায়িত্ব, প্রধান কর্তব্য।

সেদিন নিজে ড্রাইভ করে ওকে কলেজে পেঁাছে দেবার সময় গভীর অপত্য-স্নেহে মন ভরে গিয়েছিল যোগরঞ্জনের। সকালে যেটুকু রূঢ় ব্যবহার করেছিলেন ওকে নিজের পাশে বসিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে সেই রূঢ়তাটুকু যোগরঞ্জন যেন মুছে দিতে চাইলেন। তখন তিনি যেন ডাক্তার নন, মেয়ের শাসক নন, শিক্ষক নন, শুধুই জনক। স্নেহপ্রবণ বাপ। মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে বন্ধুর মতও তো ব্যবহার করেন যোগরঞ্জন। কিন্তু তাঁর সস্নেহ সৌখ্য মেয়ের পছন্দ নয়, অথচ তাঁরই প্রায় সমবয়সী স্ত্রীত্যাগী এক দুশ্চরিত্র পুরুষ মেয়ের মন আকর্ষণ করে রেখেছে। আশ্চর্য রুচি আর বিচিত্র প্রবৃত্তি। পারভারসন, নিতান্তই পারভারসন। একে রুচি-বিকৃতি ছাড়া আর কী বলা যায়। এই বিকৃতিকে মেনে নেওয়ার মত মানুষ যোগরঞ্জন নন। কোন বাপই মেনে নিতে পারেন না।

মন্দিরা যে সেদিন শশাঙ্কের ওখানে যাবে, আশ্চর্য, যোগরঞ্জন অনেক আগেই তা যেন টের পেয়েছিলেন। দেখে দেখে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে। স্ত্রীর মনের কথা তিনি যেমন টের পান মেয়ের মনের কথাও তেমনি টের পান। সে কথা তাদের মুখের কথা থেকে সম্পূর্ণ উল্টো হলেও যোগরঞ্জনের তা বুঝতে বাকি থাকে না। গাড়ি থেকে নেমে মেয়ে যখন একটু বেশি আদুরে ভাব দেখিয়ে বলল, 'আমার ফিরতে দেরি হবে বাবা, আমি আমার বন্ধুর ওখানে যাব, তুমি গাড়ি পাঠিয়ো না', তখনই যোগরঞ্জন ওর মনের আসল কথাটির আভাস পেয়ে গেছেন। আর আশ্চর্য, তিনি লক্ষ্য করে দেখেছেন তাঁর প্রিমনিশনগুলি ঠিক ফলে যায়। অনেক আশাই ফলপ্রদ হয় না। কিন্তু আশঙ্কাগুলি দিব্যি সুখপ্রসব করে। মেয়ের মতিগতি তিনি সেই সকালেই বুঝতে পেরেছেন। ওই যে মধুর হাসিটুকু, ওই যে বাড়তি আদরটুকু—ওটুকু যে ঘুষ তা তাঁর বুঝতে বাকি ছিল না। মেয়ের মন কখন ভক্তিপ্রীতিতে সিক্ত হয়, কৃত্রিম ওষ্ঠরঞ্জনীর মত কখন তাতে অতিরঞ্জনের ছোঁয়া লাগে তা বেশ বুঝতে পারেন যোগরঞ্জন। গাড়ি নিয়ে তিনি ঠিক ছুটির সময় ওদের কলেজের গেটে হাজির হয়েছিলেন। সন্দিগ্ধ স্বামীকে স্ত্রীর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন যোগরঞ্জন। কিন্তু সন্দিগ্ধ বাপের যন্ত্রণাও কম নয়। একটু ভেবে দেখলে রুচিতে বাধে মর্যাদায় বাধে যোগরঞ্জনের। কিন্তু অন্য কাউকে এ কাজের ভার দিলে আরো জানাজানির ভয়। আর কাকে পাঠাবেন

যোগরঞ্জন? কম্পাউণ্ডার নীরোদ অবশ্য খুবই বিশ্বাসী। সে টাকা পয়সার গরমিল করে না, ওষুধ চুরি করে না, বয়সে যুবক হয়েও সে চপল নয়, বাচাল নয়। তবু নিজের মেয়ের খবরদারির ভার ওর ওপর দিতে ইচ্ছা হল না যোগরঞ্জনের। শুকলালও অনেক দিনের পুরোন বিশ্বাসী চাকর। তবু মেয়ের খারাপ চালচলনের ও সাক্ষী থাকুক তিনি তা হতে দিতে পারেন না। তাই এই অপ্রীতিকর দায়িত্বের ভার যোগরঞ্জন নিজেই তুলে নিলেন।

ইন্দ্রাণী বাধা দিয়েছিলেন, 'এখনই আবার কোথায় বেরোচ্ছ—খেয়েদেয়ে এই তো কেবল একটু শুয়েছ, খানিকক্ষণ বিশ্রাম-টিশ্রাম কর তারপর না হয় বেরোবে।'

অন্যদিন তাই করেন যোগরঞ্জন। সাড়ে-পাঁচটা ছটা পর্যন্ত ঘরেই থাকেন। তারপর শুকলালকে নিয়ে চলে উদ্যানচর্চা। মাটি কোপান, চারা গাছ লাগান, গাছের গোড়ায় জল দেন। পোকায় কাটা পাতাগুলি বেছে ফেলেন। কিন্তু আজ তাঁর মন অস্থির। মন্দিরা সত্যিই তাঁকে প্রতারণা করেছে কি করেনি সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত হতে চান। বেরোবার সময় স্টেথোস্কোপটাও নিলেন হাতে। লিণ্টন স্ট্রীটে একটি টাইফয়েডের পেশেণ্ট আছে। আসবার সময় তাকে দেখে আসবেন।

তবু ইন্দ্রাণী এসে পথ আগলে ধরলেন, 'কোথায় যাচ্ছ, এই রোদের মধ্যে?'

'যাচ্ছি একটু দরকারে।'

ইন্দ্রাণী মুখ টিপে হাসলেন, 'কী যে দরকার তা আমি বুঝতে পেরেছি। যাচ্ছ তো টুকুদের কলেজে। ওকে নিয়ে আসবার জন্যে। বাব্বাঃ, একেবারে মেয়ে-অন্ত প্রাণ।'

ধরা পড়ে গিয়ে যোগরঞ্জনও হাসলেন, 'কী করে বুঝলে!'

'বুঝি গো আমি সব বুঝি। তুমি যত রাগ যত চেঁচামেচিই করো ওই মেয়েই তোমার মাথার মণি।'

সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি এই জেদী অবাধ্য মেয়েটিকে যোগরঞ্জন তাঁর অন্য মেয়েদের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন? না কি ওর সম্বন্ধে তাঁর আশঙ্কা আর উদ্বেগ বেশি বলেই ওকে তিনি বেশি কাছে কাছে রাখতে চান? যখন কাছে থাকে না তখনো ও যেন তাঁর মনকে বেশি অধিকার করে রাখে।

কলেজ পর্যন্ত যেতে হল না। তার আগেই মীনাক্ষীর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল যোগরঞ্জনের। মন্দিরার বন্ধু মীনাক্ষী। ভারি সুন্দর মেয়ে, মধুর স্বভাব।

ওকে দেখে গাড়ি থামালেন যোগরঞ্জন।

মীনাক্ষীও তাঁর দিকে এগিয়ে এল, হেসে বলল, 'কোথায় যাচ্ছেন মেসো-মশাই! মন্দিরার খোঁজে বুঝি!'

যোগরঞ্জন বললেন, 'না ঠিক খোঁজে নয়। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম তোমাদের যদি ছুটি হয়ে থাকে—'

মীনাক্ষী বলল, 'ছুটি তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। মন্দিরা কখন বাড়ি চলে গেছে মেসোমশাই। দেখুন গিয়ে এতক্ষণে সে বোধ হয় ছন্দা-নন্দার সঙ্গে দিব্যি গল্প জুড়ে দিয়েছে। কি খাবার-টাবার নিয়ে মাসীমার সঙ্গে কোন্দল করছে।'

যোগরঞ্জন হেসে বললেন, 'তাই নাকি?'

মনের উদ্বেগ আর অস্বস্তি কিছুই ওকে জানতে দিলেন না। তাঁর সন্দেহ আরও গাঢ় হল। আশঙ্কা তীব্রতর। মীনাক্ষীকে বললেন, 'তাই হবে বোধহয়। তুমি কোথায় যাচ্ছ! তোমাকে কি বাড়িতে পৌঁছে দেব?'

মীনাক্ষী লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না, আপনি কেন অত কষ্ট করবেন। তাছাড়া সঙ্গে ক্লাসের আরো দুটি মেয়ে আছে। আমি মন্দিরার সঙ্গে আর একদিন বরং যাব।'

যোগরঞ্জন বললেন, 'বেশ তো তাই যেয়ো। তোমার মাসীমা তো প্রায়ই তোমার কথা বলেন।'

মীনাক্ষী স্মিতমুখে বলল, 'তিনি আমাকে খুব ভালোবাসেন।'

'তোমার মত মেয়েকে কে না ভালোবাসে?'

মীনাক্ষী হেসে বলল, 'আপনি এত বাড়িয়ে বলেন! আমি কিন্তু মন্দিরাকে আজ খুব বকে দিয়েছি। পড়াশুনোয় মাঝে মাঝে বড্ড ফাঁকি দেয়।'

যোগরঞ্জন বললেন, 'বেশ করেছ। ফাঁকি দিলে তো বকবেই। এই তো বন্ধুর কাজ।'

'আমি তা হলে—'

'নিশ্চয়ই।' খুশি হয়ে তাকে যাবার অনুমতি দিলেন যোগরঞ্জন।

কী স্নিগ্ধ আর মধুর ওর ব্যবহার। ব্যবহারই সব, যোগরঞ্জন ভাবলেন। এই ব্যবহারের জন্যেই পর আপন হয় আবার আপন সন্তানও পর হয়ে ওঠে। মন্দিরা কি কেবল কলেজকেই ফাঁকি দিচ্ছে? ও ফাঁকি না দিচ্ছে কাকে? বোকা। মেয়েটা একেবারে বোকা। ও জানে না সব চেয়ে ফাঁকি দিচ্ছে ও নিজেকেই। কষ্ট ওরই বেশি হবে, দুঃখ ওই বেশি পাবে। যে ভাবে, বাপকে ঠকালাম, মাকে ঠকালাম, আসলে সে যে নিজেই চূড়ান্তভাবে ঠকে সে বোধ মেয়ের হয়নি। যে ভাবে, বাবার চেয়ে মায়ের চেয়ে ঢের বেশি জানি, বেশি বুঝি, সে যে কত বড় বোকা সে নিজেই তা জানে না। যোগরঞ্জন মনে মনে বললেন, 'বোকা মেয়ে, এই দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা তুই কোথায় পাবি? সংসারে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সেই বোধ কি তোর হয়েছে। তুই জলে ঝাঁপ দিতে চাইলেই কি আমি তোকে তা দিতে দেব? না কি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেই আমি তোকে তা পড়তে দিতে পারি?'

অপরাধ করেও সারাটা পথ মন্দিরা গাড়ির মধ্যে যেভাবে ছিটে কঞ্চির মতো শক্ত উদ্ধত ভাবে বসে রইল তাতে যোগরঞ্জন আরো ক্রুদ্ধ হলেন। লজ্জার

মাটির সঙ্গে মিশে গেল না, ভয়ে কেঁদে ফেলল না, ত্রাসে যোগরঞ্জনের পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইল না, এ কী ধরনের মেয়ে? মেয়ে না কালনাগিনী? সেই মুহূর্তের জন্যে নিজের মেয়ের ওপর সন্তানস্নেহ যেন লোপ পেয়ে গেল যোগরঞ্জনের। ইচ্ছা করতে লাগল, ওকে বাড়ি পর্যন্ত না নিয়ে গাড়ি থামিয়ে পথেই কোথাও ফেলে দিয়ে যান। এই মূল্যহীন মাটির ঢেলাটাকে যেখানে খুশি সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলে যেন গায়ের জ্বালা মেটে যোগরঞ্জনের। নিজের এই অনাসৃষ্টি অপসৃষ্টির দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলে তিনি যেন বেঁচে যান।

কিন্তু কোন রকম অস্বাভাবিক কাণ্ড কিছু করে বসলেন না যোগরঞ্জন। পরম ধৈর্যে তিনি মেয়েকে তার মার হাতেই ফিরিয়ে এনে দিলেন।

ইন্দ্রাণী হেসে বললেন, 'এত দেরি হল যে? মেয়েকে নিয়ে বেড়িয়ে-টেরিয়ে এলে নাকি?'

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল।

যোগরঞ্জন বললেন, 'তোমার মেয়েকে নিয়ে বেড়াবার লোকের কি অভাব আছে? চৌদ্দ পুরুষের মুখে কালি না মাখিয়ে ও মেয়ে কি ছাড়বে?'

ইন্দ্রাণী মুখ কালো করে বললেন, 'কেন মিছিমিছি বাজে কথা বলছ? হয়েছে কি শুনি দেখি!'

যোগরঞ্জন স্ত্রীকে ধীরে ধীরে সব শোনালেন। তারপর হঠাৎ তীব্র তিক্ত স্বরে বললেন, 'তোমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তো এতদিন দেখলাম। এখন আমার কথা শুনে যদি চলতে পারো ভালো, নইলে তুমি তোমার ব্যবস্থা দেখ, আমি আমার ব্যবস্থা দেখি।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'আর পারিনে। দিন রাত মেয়ের জন্যে খোঁটা শুনে শুনে আমার হাড় জিরজিরে হয়ে গেল। তোমার মেয়ে। তুমি রাখতে হয় রাখো জলে ভাসিয়ে দিতে হয় ভাসিয়ে দাও। ফের যদি কথাটি বলি আমি আমার বাপের বেটি নই।'

জলে ভাসিয়ে দেবেন কেন যোগরঞ্জন? জলে ফেলবার কি জিনিস? মেয়ে কি শুধু ইন্দ্রাণীর? মেয়ের জন্যে যোগরঞ্জনের ভাবনা নেই মনে? মমতা নেই বুকে? দুদিন বাদে তাঁর রাগটা পড়ে এল। কিন্তু সঙ্কল্প থেকে টললেন না যোগরঞ্জন। এই মেয়েকে এখন আর পড়িয়ে লাভ নেই, কারণ পড়ায় ওর মন নেই। চিত্ত ওর অন্য কিছুর জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেই চাঞ্চল্য শুধু বিয়েতেই নিবৃত্ত হবে। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ও ফের পড়াশুনো করবে। তেমন পরিবারে তেমন ছেলের হাতে যদি পড়ে ও ফের কলেজে ভর্তি হতে পারবে। আর যদি না পারে নাই পারল। আধুনিক শিক্ষাবিধিকে অবশ্যই মূল্য দেন যোগরঞ্জন। গড়পড়তা ছেলেমেয়েদের জ্ঞানবুদ্ধি এই পথেই বাড়ে। কিন্তু সবাইর পক্ষে এই পথ-ই যে একমাত্র, জীবনের একমাত্র রাজপথ তা

যোগরঞ্জন স্বীকার করেন না। ইচ্ছা অভিরুচি আর চেষ্টা যত্ন থাকলে বিদ্যা-বুদ্ধি অর্জনের আরো কত উপায় আছে, সার্থকতার, চরিতার্থতার আরো কত পথ আছে। বিশেষ করে মেয়েদের বেলায়। সব মেয়েই বিদুষী হবে না, সব মেয়েই চাকরি-বাকরি করবে না, বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে যশস্বিনী হবে না। এখনো তাদের মৌলিক প্রয়োজন শুধু সংসারের মধ্যে স্বামীর সেবায় সন্তান পালনে। এখনো গৃহ-শিল্পই তাদের কাছে চারু-শিল্প, গৃহ-বিজ্ঞানই পরম বিজ্ঞান। আর পাঁচজনকে সুখী করার ভিতর দিয়েই সুখী হওয়ার সেই সনাতন পথ তাদের সামনে প্রসারিত। সে পথ দীর্ঘ নয়, সুবিস্তৃত নয়, বিচিত্রও নয়, খুবই সীমাবদ্ধ। তবু স্বামী-পুত্রের সেই বন্ধনের মধ্যেই মেয়েদের মুক্তি। এতে যোগরঞ্জনকে কেউ যদি অনাধুনিক বলেন তো বলুন। যোগরঞ্জন সে অপবাদ ঘাড়ে নিতে রাজী আছেন। তাঁর আধুনিকতা শুধু ভাষাভঙ্গী আদব-কায়দার শুধু বেশ-বাস ধরন-ধারণের আধুনিকতা নয়। যোগরঞ্জন জানেন ভিতরে ভিতরে তিনিও আধুনিক। তাঁর মত, তাঁর মূল্যবোধ ঘন ঘন পালটায় না। শেয়ার বাজারের মত এবেলা ওবেলা ওঠানামা করে না। তাঁর আধুনিকতা আজ টাটকা কাল বাসি নয়।

প্রথম প্রথম ডাক্তারদের মধ্যেই পাত্র খুঁজে ছিলেন যোগরঞ্জন। বড় জামাইও ডাক্তার নয়, চার্টার্ড একাউনট্যান্ট। বাপের ফার্ম আছে মুখার্জী এন্ড সন্স। সেই ফার্মেই সুরজিৎ ছোট সাহেব। প্রথম বারের জামাই পছন্দ করবার ভার যোগরঞ্জনের ওপর ছিল না। বাবা-মা শ্বশুর-শাশুড়ীই তখন যোগরঞ্জনের অভিভাবক, তাঁদের ডিঙিয়ে মেয়ের পাত্র খুঁজতে তাঁর চক্ষুলজ্জায় বেধেছে।

কিন্তু এই মেজো মেয়ের বেলায় সব দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হল যোগরঞ্জনকে। বাবা মা শ্বশুর তিনজনেই পরলোকে। শাশুড়ী আছেন। চোখে কম দেখেন, কানে প্রায় শুনতেই পান না। মাঝে মাঝে বলেন, 'এখন যারা আছে তাদের রেখে যেতে পারলেই বাঁচি।'

প্রাক্তন ছাত্র কি হাসপাতালের তরুণ সহকর্মীদের ভিতর থেকেই ভাবী জামাইকে যোগরঞ্জন অন্বেষণ করেছিলেন। যে যাই বলুক, ছেলের মধ্যে, জামাইর মধ্যে মানুষ প্রথমে তার প্রোটোটাইপকেই চায়। ছেলে কি জামাই নিজের বৃত্তির অধিকারী হবে, নিজের চিত্তবৃত্তির শরিক হবে, তবেই তো তার মধ্যে নিজেকে দেখতে পাবেন যোগরঞ্জন। তবেই তার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাবেন, তার সঙ্গে গল্প করে সুখ হবে। জামাই যদি তাঁর মত ডাক্তার হয় তাহলে তাকে শুধু কন্যা নয়, যৌতুক নয়, নিজের অভিজ্ঞতার অংশও তাকে দিতে পারবেন। ঘন্টার পর ঘন্টা একই ভাষায় তাঁরা আলাপ করবেন। অচিকিৎসকের সে পরিভাষা একেবারেই দুর্বোধ্য। তাছাড়া যে নার্সিং হোম এখনো তাঁর কল্পনায় তা তো একদিন গড়ে উঠতেও পারে। সেই সেবাকেন্দ্রের উত্তরাধিকার ডাক্তার না হলে তিনি কাকে দিয়ে যাবেন?

কিন্তু যা খোঁজা যায় তা পাওয়া যায় না। যোগরঞ্জনের চেনা-জানা তরুণ সহকারীদের মধ্যে রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ মাত্র দুজন। একজনের সবুর সয়নি, আগেই বিয়ে-থা করে বসেছে। বিয়ে করেছে আবার একটি নার্সকে। কী প্রবৃত্তি। কুল দেখেনি, শীল দেখেনি, শুধু সুন্দর মুখ দেখেছে। দ্বিতীয় যে অস্থিবিশারদ ছেলেটি, সেই কুমুদ বাঁড়ুয্যে, যোগরঞ্জনের খুবই প্রিয়পাত্র। কিন্তু হলে হবে কি, তাকে পাত্র হিসেবে ভাবা যায় না। মন্দিরার চেয়ে সে মাথায় অন্তত ইঞ্চি চারেক খাটো। আরো কয়েকটি ছেলেকে শুধু খর্বতার জন্যেই বাতিল করতে হয়েছে। জামাই সুরজিৎ তাঁর অসাক্ষাতে ঠাট্টা করে বলে, 'টুকুর জন্যে আমার মহামান্য শ্বশুর মশাইকে পাঞ্জাবে যেতে হবে। বাংলা দেশে ওর বর মিলবে না।'

স্বামীর মনোভাব টের পেয়ে ইন্দ্রাণীও বাধা দিলেন। বললেন, 'আর যাই আনি ডাক্তার জামাই আমি আনব না। ডাক্তারের সংসার করা যে কী মজা তা আমি টের পেয়েছি।'

যোগরঞ্জন বলেন, 'কেন, ডাক্তার কি দোষ করল?'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'সময়মত নাওয়া নেই খাওয়া নেই। কেবল রোগ আর রোগের চিকিৎসার কথা। একটু আনন্দ নেই, উৎসব নেই। শুধু রোগ আর রোগের ওষুধ। শুনে শুনে কান পচে গেল। আমার টুকুকে আমি বরং মোক্তারের হাতে দেব কিন্তু ডাক্তারের হাতে কক্ষনো নয়।'

বিকেলের চায়ের আসরে ছন্দাও এসে বসেছিল। মন্দিরাকে ডাকাডাকি করেও আনা যায়নি।

ছন্দা বলল, 'মোক্তারের চেয়ে কলেজের প্রফেসরের প্রেস্টিজ কিন্তু বেশি মা।'

যোগরঞ্জন তার দিকে কটমট করে তাকালেন। এ মেয়েও যেভাবে পাকতে শুরু করেছে বেশি দিন আর ওকে ঘরে রাখা যাবে না। তা ছাড়া যা দেখবে তাই তো শিখবে।

ইন্দ্রাণী গম্ভীরভাবে বললেন, 'তোর বড্ড বকবক করা স্বভাব হয়েছে ছন্দা। এত বলি বড়দের কথার মধ্যে আসবিনে, তবু তোর আসা চাই-ই চাই।'

ধমক খেয়ে ছন্দা খানিকক্ষণ মুখ ভার করে রইল। তারপর এক ফাঁকে উঠে চলে গেল—'নন্দা কী করছে দেখে আসি।'

দু-একটি অধ্যাপক ছেলের খোঁজও এসেছিল। ভালো মাইনে, ভালো কলেজে চাকরি। উক্টরেট উপাধিও আছে। কিন্তু যোগরঞ্জন আর ইন্দ্রাণী দুজনে একজোট হয়ে বলেছেন, 'না, প্রফেসর ছেলে চাইনে।'

একজন প্রফেসরকে দেখেই তাঁদের ঢের শিক্ষা হয়েছে। সে যা মেয়েকে শিখিয়ে গেছে তাকে তা এখন ভোলাতে পারলে তাঁরা বাঁচেন।

আশ্চর্য, ওই শশাঙ্ককে দেখে প্রথমে যোগরঞ্জনই তো বেশি মুগ্ধ হয়েছিলেন। অমন সুদর্শন সুকান্ত সরস সদালাপী পুরুষ তিনি কমই

দেখেছেন। শশাঙ্কের সঙ্গে আলাপ শুরু করলে তিনি নিজের কাজের কথা ভুলে যেতেন, রোগ আর রোগীদের কথা ভুলে যেতেন। যে কাব্যসাহিত্য প্রথম যৌবনের পর যোগরঞ্জন আর ছুঁয়ে দেখেননি তা আবার নতুন করে পড়বার আগ্রহ জাগত তাঁর মনে। শশাঙ্কের বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে যোগরঞ্জনই তো মেয়েকে পড়াবার ভার ওর ওপর তুলে দিয়েছিলেন। তখন একই পাড়ায় পাশাপাশি বাড়ি ছিল। শশাঙ্কও আসত। আবার মন্দিরাও কখনো কখনো যেত। শুধু মন্দিরাই নয় আরো ছাত্রছাত্রী আসত। নিজের বাড়িতেই টোল খুলে বসেছিল শশাঙ্ক। সে যে এক বড়রকমের ভেক আর ভোল তা কি আগে বুঝতে পেরেছেন যোগরঞ্জন? পারলে কি টুকুকে ওভাবে ছেড়ে দিতেন? টুকু তখন কতটুকুই বা। ফ্রক পরে, পুতুল খেলা তখনো বোধ হয় শেষ করেনি। কে জানে অভিজ্ঞ পুরুষের হাতের পুতুল হবার সাধ তখনই তাকে পেয়ে বসেছে? যোগরঞ্জন কিছুই জানতেন না, কিন্তু ইন্দ্রাণীর বুঝতে পারা উচিত ছিল। হাজার হলেও তিনি তো মেয়ে। কিন্তু তিনিও কিছু আশঙ্কা করেননি। না কি গাদায় গাদায় গল্প-উপন্যাস জুগিয়ে তাঁকেও মুগ্ধ করেছিল শশাঙ্ক? মেয়েরা বড় বিশ্বাসপ্রবণ জাত। যাকে তারা বিশ্বাস করে, যারা কোন না কোন ভাবে তাদের মনোহরণ করে, তাদের দোষ মেয়েরা দেখতে পায় না। এইজন্যেই গুরু, সাধু মহান্ত, লেখক, গায়ক, অভিনেতাদের পসার তাদের মধ্যে এত বেশি। যোগরঞ্জন জানেন, এইজন্যেই কত ভণ্ড তাদের ঠকিয়ে নেয়। সর্বস্বান্ত করে পথে বসিয়ে ছাড়ে। হাসপাতালে নার্সিং হোমে, কত মহিলা-আশ্রমে অনেক মেয়ের অনেক দুঃখের কাহিনী যোগরঞ্জন তাদের রোগ সারাতে সারাতে শুনেছেন। তাদের দেহ হয়তো সুস্থ হয়েছে, কিন্তু মন? মনের রোগ সারানো অত সহজ নয়। তাঁর টুকুকে তিনি কিছুতেই ওই দলের ভিড় বাড়াতে দিতে পারেন না। রোগ ক্রনিক হবার আগেই ওর নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্যে দরকার হলে বজ্রের চেয়েও কঠোর হতে পারা চাই। যে বাপ তা হতে পারে না সে স্নেহে অন্ধ। তার অন্ধতার ফল সারাজীবন সন্তানসন্ততিকে ভোগ করতে হয়। তা ছাড়া স্নেহ করবে মা, শাসন করবে বাপ। কাছে টানবে মা, দূরত্ব রেখে চলবে বাপ। সন্তান-পালনের এই দায়ভাগ দুজনকেই মেনে চলতে হয়। যে বাপের হৃদয়মন মায়ের মতই নরম তার ছেলেমেয়ে অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়ের সামিল। নিজের বাবার কাছেই এই কঠোরতার দীক্ষা পেয়েছেন যোগরঞ্জন। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। যোগরঞ্জন জানেন আজ তাঁর ওপর টুকুর বিরূপতার সীমা নেই। আজ বাপকে সে শত্রু ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। কিন্তু মেয়ের যখন বয়েস বাড়বে, বুদ্ধি পাকবে, স্বামী-সন্তান নিয়ে যখন সুখী হবে সেইদিন বুঝতে পারবে যোগরঞ্জন যা করেছেন ওর ভালোর জন্যেই করেছেন। ওর সুখের জন্যেই ওকে দুঃখ দিয়েছেন।

ঘটকালি-করা সম্বন্ধের অনেক জ্বালা। কিছুতেই সব দিক মিলতে চায় না। জাত মেলে তো ধাত মেলে না, গুণের বহর যদি বা থাকে রূপে এমন খাটো হয় যে চোখ তুলে তাকানো যায় না। পুরুষের অবশ্য গুণেই রূপ। তবু রূপ বলে আলাদা বস্তুর কথা অস্বীকার করা যায় না। লম্বায়-চওড়ায় বিরাটকায় হলেও যোগরঞ্জন সুপুরুষ নন। সে সম্বন্ধে তিনি নিজেও সচেতন। এই জন্যেই রূপবান যুবক পুরুষের দিকে তিনি মুগ্ধ চোখে তাকান। শুধু নারীর মধ্যেই তিনি রূপ দেখেন না, পুরুষের রূপও তিনি দেখতে জানেন। যুবকই হোক, প্রৌঢ়ই হোক, বৃদ্ধই হোক, বয়সে কিছুই যায়-আসে না। সে সুপুরুষ হলেই হল। স্ত্রী কি মেয়ে কারো কাছেই অবশ্য স্বীকার করেন না যোগরঞ্জন, ওই হতচ্ছাড়া শশাঙ্কের রূপেই তিনি প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গোড়ার দিকে একটু-আধটু দুর্নামের কথা, নিন্দার কথা যা তাঁর কানে গিয়েছিল তাকে তিনি আমল দেননি। মানুষের চোখই বোধ হয় সব চেয়ে বেশি ছলনাময়। দৃষ্টিবিভ্রমই বেশির ভাগ ভ্রান্তির মূল।

কিন্তু চোখকে বাদ দিতে পারেন না যোগরঞ্জন, বিশেষ করে মেয়ের চোখকে। যে মেয়ে এতদিন ধরে একটি রূপবান পুরুষকে মুগ্ধ চোখে দেখেছে তার সামনে একটি কুরূপ পুরুষকে বর হিসেবে এনে হাজির করলে মেয়ে তাকে দুচক্ষে দেখতে পারবে না, শুভদৃষ্টির সময় চোখ বুজে বসে থাকবে। যত নীতিবাগীশই হোন যোগরঞ্জন, প্রণয়কলার এ রীতিটুকু তিনি মানেন।

কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে সর্বগুণে অলঙ্কৃত, সর্বরূপে ভূষিত সেই পুরুষোত্তমকে? বরপক্ষের মেয়ে পছন্দ হওয়া চাই, যোগরঞ্জনের শক্তিসামর্থ্যে কুলোন চাই। শুধু আকাশের চাঁদ চাইলেই তো হবে না।

আজকাল তো আর ঘটক ঘটকী নেই। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে পাত্র নিজেদেরই খুঁজে বের করতে হয়। বড়জোর কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে। মন্দিরার মামারা মেসোরা যে সব সম্বন্ধ আনলেন সেগুলি কারোরই তেমন পছন্দ হল না। পিতৃকুলে জ্ঞাতি সম্পর্কে জ্যেঠা কাকাদের আনা সম্বন্ধেও খুঁত বেরোল। যোগরঞ্জন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বেশি দেরি করতে চান না। মেয়ের কলেজ বন্ধ করেছেন, গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এত কড়াকড়ির মধ্যে তো ওকে বেশি দিন রাখা যাবে না। মেয়ে মনে মনে ঘোঁট পাকাবে আর যত সব বাজে বিষয় নিয়ে চিন্তা করবে। তার চেয়ে দামি দামি শাড়ি-গয়না বর-দেবর শ্বশুর-শাশুড়ীর এক নতুন রূপরসের জগৎ ওর সামনে যদি খুলে দেওয়া যায় মেয়ে সব ভুলে যাবে। বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে মিশে মিশে টুকুর চালচলন যতই বদলাক, যতই মাঝে মাঝে পাকা পাকা কথা বলুক আসলে তো সেই ছেলেমানুষই আছে। ওর সেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যোগরঞ্জনের। কী মতলবই না মেয়ের ছিল। যত কাজের জিনিসের

ওপর ওর দাবি। তাঁর ইনজেকশনের বাক্স, ওষুধের শিশিগুলি নিয়ে ও খেলবে, স্টেথোস্কোপ কেড়ে নেবে, বইগুলির পাতা টেনে টেনে ছিঁড়বে। একটু বকলেই সেই যে কান্না শুরু করে দেবে সে কান্না আর সহজে থামবে না। নিজের দরকারী জিনিসপত্রগুলি বাঁচাবার জন্যে ওকে দামি দামি খেলনা কিনে দিয়েছেন যোগরঞ্জন। দিদির সঙ্গে ঝগড়া করে, কোন্দল করে সেই খেলনা মেয়ে নিজেই আছড়ে আছড়ে ভেঙেছে। তারপর রাগে দুঃখে জেদে ক্ষোভে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছে। তাড়াতাড়ি নতুন পুতুল কিনে এনে ওর হাতে গুঁজে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে হাসি ফুটেছে মুখে। চোখে জল মুখে হাসি। একই আকাশে মেঘ বৃষ্টি আর সাতরঙের রামধনু।

কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে যাচ্ছিলেন যোগরঞ্জন। সুরজিৎ আর ইন্দিরা অন্য একটি সম্বন্ধ নিয়ে এল। ওদেরই জানাশোনা।

ছেলেটি ইঞ্জিনীয়ার। শিবপুর থেকে পাশ করে ভালো চাকরি করছে। বয়েসও বেশি নয়। পঁচিশ ছাব্বিশের মধ্যে।

ইন্দিরা বলল, 'বাবা, আমাদের টুকুর সঙ্গে বেশ মানাবে। মাথায় বেশ লম্বা। ছ ফুটের কাছাকাছি।'

যোগরঞ্জন হেসে বললেন, 'দৈর্ঘ্য আছে সে তো বুঝলাম, কিন্তু প্রস্থে তালপাতার সেপাই নয় তো?'

সুরজিৎ বলল, 'না না, তা হবে কেন? স্বাস্থ্যও বেশ ভালো। তা ছাড়া টেম্পারামেন্টেও আপনার সঙ্গে বেশ মিলবে। ওদের ফ্যামিলিও খুব কনজারভেটিভ।'

'আমি কি কনজারভেটিভ? কোন্ অর্থে?'

যোগরঞ্জন জামাইকে তর্কযুদ্ধে আমন্ত্রণ জানালেন।

ইন্দ্রাণী বললেন, 'আঃ থামো। শুনতে দাও আগে। সুরজিৎ, আমারও ওইরকম গেরস্থ ঘরই পছন্দ। বাপ-মা আছেন তো?'

'আছেন। একটি ছোট ভাই আর বোনও আছে।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'বেশ বেশ। দেওর-ননদের সুখও হবে, অথচ বাড়িতে ভিড়ও তেমন থাকবে না। ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র কেমন সুরজিৎ? খোঁজ নিয়েছ তো?'

সুরজিৎ বলল, 'নিয়েছি মা। ভারি ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে। কোন অহঙ্কার-টহঙ্কার নেই, পোশাক-আসাক সাধারণ। পান-সিগারেট কিছু খায় না। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে একালের ছেলে। কিন্তু চালচলনে সেকেলে বনেদিয়ানা আছে।'

ইন্দিরা সায় দিয়ে বলল, 'আমিও তাকে দেখেছি। দেমাক কিছু নেই। বেশ বিনয়ী ভদ্র। ওর সঙ্গে আলাপ করলে তুমি খুশী হবে মা।'

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারা বংশে কী?'

সুরজিৎ হেসে বলল, 'আমাদের মত মিহিররাও মুখুজ্যে।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'হোক না, মুখুজ্যেদের সঙ্গে কাজ করে আমার তো কোন অশান্তি হয়নি বাবা। আমি শান্তিই পেয়েছি। দাবিদাওয়া কিরকম হবে?'

সুরজিৎ বলল, 'তার জন্যে আটকাবে না মা। মেয়ে দেখে যদি ওঁদের পছন্দ হয়, চাহিদা খুব বেশি হবে না।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'মেয়ে যা একখানা মনসা হয়ে রয়েছে এখন দেখাদেখিতে রাজী হলে হয়।'

সুরজিৎ বলল, 'মিহিরের বাবাই অবশ্য মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছেন। যতদূর জানি মিহির এখনো [illegible]কে দেখেনি। এদিক থেকেও ওরা খুব সেকেলে। মিহির হয়তো নাও [illegible]তে পারে।'

ইন্দিরা বলল, 'না মা, তা কি হয়? ছেলে মেয়ে দেখে পছন্দ করুক, মেয়েও ছেলেকে দেখুক, একটু আলাপ-টালাপ হোক—এটুকু না হলে হয় নাকি?'

যোগরঞ্জন হেসে বললেন, 'দেখেছ, আমাদের খুকু কী রকম গিন্নী হয়ে উঠেছে? কোথায় কতটুকু না হলে হয় না, কোথায় কতটুকু হওয়া দরকার—এখন সব জানে।'

ইন্দিরা বলল, 'এই বুঝি? অমনিতে বলো, বোনের বিয়ের জন্যে তোর কোন গরজ নেই, কোন রা শব্দও করিসনে। আর যখন কিছু বলতে যাই তখন কেবল ঠাট্টা আর ঠাট্টা।'

তারপর মাকে একটু খোঁটা দিল ইন্দিরা, 'গিন্নী হব না, কী করব বলো। পনের বছরে পড়তে না পড়তে বিয়ে দিয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত হয়েছ। আমার বোনেরা যে সব সুযোগ-সুবিধে পাচ্ছে, পাবে—আমি কি কিছুই তার পেয়েছি?'

যোগরঞ্জন বললেন, 'আমাদের খুকুর সেই খোঁটা দেওয়ার অভ্যাস আর গেল না। ও সব সুযোগ-সুবিধে না পেয়ে তোমার ভালোই হয়েছে খুকু।'

মন্দিরার ব্যাপারটা ইন্দিরার অজানা নয়। তাই বাবার কথা শুনে সে লজ্জায় মুখ নিচু করল।

কথাবার্তা এগোতে লাগল। মিহিরের বাবা মুকুন্দবাবু প্রথমে এসে মেয়ে দেখবেন। তিনি হয়তো দু'একজন বন্ধুকে সঙ্গে আনতে পারেন, কি বন্ধুকে বাদ দিয়ে স্ত্রীকেও আনতে পারেন সঙ্গে। তাহলে দেখাদেখির ব্যাপারটা প্রথম পর্যায় বাদ দিয়ে একেবারে দ্বিতীয় পর্যায় থেকে শুরু হয়। যোগরঞ্জনেরও তাই ইচ্ছা। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো।

ওঁদের আসবার দিন তারিখ নিয়ে কথা হচ্ছে, ছন্দা এসে বলল, 'বাবা, মেজদি বলছে কেন এসব করছ তোমরা। সে কিছুতেই বিয়ে করবে না।'

যোগরঞ্জন মেয়ের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন। ছন্দাকেই সব ব্যাপারে দূতী করে তুলেছে মন্দিরা। ওকেও অকালপক্ক করে ছাড়বে।

কিন্তু বিরক্তি গোপন করে বললেন, 'তোমার মেজদি এসে কথা বলতে পারে না আমার সঙ্গে? তাকে গিয়ে বল এ বাড়িতে মেয়েরা বিয়ে করে না, তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। তার বেলায়ও অন্য রকম কিছু হবে না।'

মেয়ের ভাবচরিত্র দেখে ইন্দ্রাণী যা আশঙ্কা করেছিলেন তেমন কিছু হল না। তাতে তিনি খুশিই হলেন। মন্দিরা যেন হঠাৎ ভারি শান্ত, গম্ভীর আর বিষণ্ণ হয়ে গেছে। মেয়ের সেই ছটফটানি নেই, কথায় কথায় জ্বলে ওঠা নেই, মেজাজ দেখানো নেই, চুপ করে আছে। হয়তো জানলার ধারে বসে বই পড়ে, নয়তো বিছানায় শুয়ে সেই যে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে মেয়ে, বারবার না ডাকলে তার আর সাড়া মেলে না। পেটেরই তো মেয়ে। ওর দুঃখ ইন্দ্রাণী বুঝবেন না তো কে বুঝবে।

'কিন্তু তুই যে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার ঘটাতে চাইলি মা। যদি সম্ভবের মধ্যে হতো আমি যেমন করেই হোক ওঁর মত করাতাম। মানুষ অবশ্য খুবই একরোখা, একগুঁয়ে, তবু আমি তেমন করে ধরলে উনি না করতে পারতেন না। এমন কত গোঁ ভেঙেছি ওঁর, কত "না"কে "হাঁ" করিয়েছি। কিন্তু তুই যে একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেলি বাছা। শুধু জাতে আলাদা যদি হতো তাও না হয় বুঝতাম। তেমন তেমন অবস্থায় আজকাল বামুন কায়েত বৈদ্যে বিয়ে তো হয়ও। কিন্তু শুধু জাতই তো আলাদা নয়, স্বভাব চরিত্রও যে একেবারে বিপরীত। বয়েস কত বেশি, বউটাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে। ছি ছি ছি, চণ্ডাল আর কাকে বলে। তুই বিষ চাইলেই তো আমি ঝিনুকে করে তার খানিকটা তোর মুখের সামনে তুলে ধরতে পারিনে বাছা।'

মেয়ের ভাবভঙ্গী দেখে এখন রাগের চেয়ে ইন্দ্রাণীর মনে কষ্টই হয় বেশি। শরীরের যে অঙ্গে ব্যথা সেই অঙ্গই সর্বাঙ্গ হয়ে ওঠে। আরো তিনটি সন্তান থাকলেও এখন মন্দিরাই তাঁর মনের সবখানি জুড়ে রয়েছে। বিয়ে মানুষের জীবনে একটা পরম উৎসবের দিন, আনন্দ আহ্লাদের সময়। সেই আনন্দের দিনে মেয়ে যদি অমন মুখ ভার করে থাকে কার ভালো লাগে!

ইন্দ্রাণী ভেবেছিলেন, স্বামীকে বলবেন, 'কাজ নেই এখন জোর জবরদস্তি করে। ওর যখন ইচ্ছে নেই, কটা মাস দেখা যাক। কটা দিন না হয় চুপ করেই থাকো। মেয়েকে বাড়ির বাইরে যেতে দিতে না চাও না দিলে। মেয়ে-মাস্টার রেখে ঘরেই পড়াও ওকে। তারপর দেখে শুনে ধীরে সুস্থে বিয়ে দিয়ো।'

কিন্তু স্বামীর মুখ দেখে ও কথা পাড়তে সাহস হয়নি ইন্দ্রাণীর। মেয়ের মতিগতি দেখেও কথাটা শেষ পর্যন্ত চেপে গেছেন। বলা যায় না বাবা, কিসে কি হবে, শেষে সারাজীবন তাই নিয়ে আফসোস করে মরতে হবে ইন্দ্রাণীকে। তাছাড়া এই এক বয়স, এই এক নেশা। এ নেশায় মানুষ না করতে পারে এমন কিছু নেই। তার জাত মানের ভয় থাকে না, পরিণামের চিন্তা আসে না, যাকে

চায় তাকে পাওয়ার জন্যে সে তখন সব করতে পারে। একজনের জন্যে সে তখন দশজনকে ছেড়ে চলে যায়। এ সব কীর্তিকাহিনী তো আর জানতে কিছু বাকি নেই ইন্দ্রাণীর। শুধু নাটক নভেলে কেন খবরের কাগজেই তো কত বেরোয় আজকাল। মেয়েরও যদি সেই মতিগতি হয় তখন কী করবেন? তখন কী উপায় হবে ইন্দ্রাণীর?

মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সময় এখন তাঁদের নয়। বাড়ি তৈরির জন্যে ক' বছর আগে কত টাকা খরচ হয়ে গেছে। সে টাকা বোধ হয় এখনো সব শোধ হয়নি। ওই একটিই তো রোজগেরে মানুষ। চারদিকে খরচ, চারদিকে খরচ। তবু যে সাহস করে উনি এ কাজে নেমেছেন, মনে অসম্ভব জেদ আছে বলেই। সেদিনও দুপুর রাত্রে হঠাৎ পাশ ফিরে শুয়ে বললেন, 'নার্সিংহোমের জন্যে যে টাকা কটা রেখেছিলাম, তা টুকুর বিয়ের কল্যাণেই যাবে বুঝতে পারছি। শুধু তাতেই কি কুলোবে ভেবেছ? আরো কত ধার হবে, দেনা হবে।'

মশারির মধ্যে ইন্দ্রাণী স্বামীর পিঠের কাছে আরো সরে এসেছিলেন। গায়ের সঙ্গে গা মিশিয়ে চুপ করে শুয়েছিলেন আরো একটুকাল। অমন জাঁদরেল, জবরদস্ত বদরাগী মানুষটিও কোন কোন সময় এমন অভিমানী, দুর্বল আর নরম হয়ে ধরা দেন ইন্দ্রাণীর কাছে যে, অবাক হতে হয়। তখন উনি যেন আর-এক মানুষ। ভারি মায়া হয় যাই বলো। এই মমতা তো সব সময় থাকে না। ওঁর মনেও থাকে না, তাঁর মনেও থাকে না। কতদিন এই সংসার করতে করতে ইন্দ্রাণীর মনে হয়েছে তিনি যেন পরের সংসার করছেন। যে পুরুষ টাকা রোজগার করে আনে সংসার শুধু তারই। সেই ওপরওয়ালা। বিনা মাইনের ঝি চাকরানীর মতই ইন্দ্রাণী যেন এ সংসারে শুধু চাকরি করে যাচ্ছেন। চাকরি যাবে না ঠিকই, কিন্তু চাকরানীর পদটিও যাবজ্জীবন সঙ্গে লেগে থাকবে। জীবনেও আর উন্নতি হবে না। কথায় কথায় ধমক, কথায় কথায় চোখ-রাঙানি, কথায় কথায় জিজ্ঞাসা, 'তুমি কে?'

তখন ইন্দ্রাণীর মনে হয়েছে, 'আমি কেউ নই, সত্যিই আমি কেউ নই। যদিও এতকাল ধরে বসবাস করছি, এতগুলি সন্তানের মা হয়েছি, তবু তোমার সংসারে আমি কেউ নই।'

কিন্তু সেই মানুষই যখন পরম দুর্বল শিশুর মত আশ্রয় চায়, অর্থ-চিন্তায় বিব্রত হয়, প্রিয়জনের কাছে ঘা খেয়ে সান্ত্বনা চায়, তখন কি আর ইন্দ্রাণী মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন? তখন আর শুধু দাসী বাঁদী বলে মনে হয় না নিজেকে, তখন কখন যে অভয়দাত্রী জগদ্ধাত্রীর আসনে উনি তাঁকে তুলে দেন ইন্দ্রাণী নিজেও তা জানতে পারেন না। তিনি দেখেছেন পুরুষ মানুষের রূপ এক রকম নয়। সে ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট। সে ক্ষণে শক্ত, ক্ষণে নরম। সেই অসহায় মানুষের ওপর মানুষ কতক্ষণ রাগ করে থাকতে পারে? মেয়েমানুষের মনও এক রকম নয়। তাও যেমন জ্বলে তেমনি গলে। আসলে

পুরুষের কাছে নয়, নিজের মনের কাছেই সে নিজে জব্দ।

ইন্দ্রাণী স্বামীর গায়ে গা মিশিয়ে বলেছিলেন, 'এখন যদি তোমার অত অসুবিধে হয় তাহলে থাক না। মেয়ে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।'

যোগরঞ্জন বলেছিলেন, 'বলা যায় না, তাও যেতে পারে।'

'না না, তুমি যতই বলো, মেয়ের সে সাহস হবে না।'

যোগরঞ্জন বলেছিলেন, 'সাহস কি শুধু ওর একার? আড়াল থেকে কে হাতছানি দিচ্ছে বুঝতে পারছ না? টের পাচ্ছ না কে সুতো ধরে টানছে?'

ইন্দ্রাণী বলেছিলেন, 'তা আর পারব না কেন? তবু—'

যোগরঞ্জন জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'না, আর তবু-টবু নয়। স্থির যখন করে ফেলেছি আমি ওর বিয়ে দেবই। দু একমাসের মধ্যেই দেব। যত কষ্টই হোক, যত ধারদেনাই হোক, কাজ আমাকে সেরে ফেলতেই হবে। রোগীরা বলে ডাক্তারের টাকা ভূতে জোগায়, মক্কেলরা বলে উকিলের টাকা ভূতে জোগায়। আমি জানি বিয়ের সময় মেয়ের বাপের টাকাও ভূতে জোগায়। খুকুর বিয়ের সময় সব টাকা কি আমার হাতে ছিল? সে টাকাও ভূতে জুগিয়েছে। সেই ভূতের নাম কি জানো? পুরুষের জেদ। তুমি আমাকে বাধা দিও না রানী।'

স্ত্রীকে যোগরঞ্জন আরো কাছে টেনে নিয়েছিলেন। ইন্দ্রাণী কথা বলেননি, কিন্তু বাধাও আর দেননি। হয়তো এমনি করেই পুরুষের ইচ্ছা বার বার জয়ী হয়। কিন্তু সেই জয় শুধু কি তাঁর একার! তাতে কি ইন্দ্রাণীরও অংশ নেই!

তারপর থেকে দুজনে মেয়ের বিয়ের চেষ্টায় হাত মিলিয়েছেন। টাকা জোগাড় করবার ভার যোগরঞ্জনের। আত্মীয়স্বজনকে খবর দেওয়ার, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার, জিনিসপত্র কেনাকাটার, বাড়িঘর সাজাবার গুছাবার ভার ইন্দ্রাণীর। পুরুষে শুধু টাকা আনতেই জানে। কিন্তু টাকায় কি আর সব হয়?

ভারত ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ইন্দ্রাণীর ছোট ভাই নীলমাধব। সে এসে বলল, 'দিদি, তুই ভাবিসনে। মেয়ের বিয়ে দেওয়াই যদি তোদের মতলব হয়, আমি এক সপ্তাহের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে দেব।'

নীলু ইচ্ছা করলে তা পারে। ওর জামাইবাবু শুধু ডাক্তারি ছাড়া আর কিছু জানেন না। কিন্তু নীলু সব জানে। বড় মেয়ের বিয়ের বেলাতেও ইন্দ্রাণী তা দেখেছেন। সব কাজে, সব ব্যাপারে ওর অদম্য উৎসাহ।

শেষ পর্যন্ত দিনক্ষণ দেখে মুকুন্দবাবু এলেন মেয়ে দেখতে। সঙ্গে স্ত্রী আর ছোট শালী। ইন্দ্রাণীর জামাই আর মেয়েই এ বিয়ের ঘটক। তাঁর আর ভাবনা কিসের?

গাড়ি নেই। ট্যাক্সীতে করেই এসেছেন মু[illegible]দবাবু। সুরজিৎ তাঁদের পথপ্রদর্শক। ড্রয়িং রুমের পাশের ছোট ঘরটিতে যোগরঞ্জন তাঁদের ডেকে

এনে বসালেন। একেবারে বাইরের ঘরে তাঁদের বসতে দেবার ভরসা নেই। হয়তো কোন রোগী এসে রসভঙ্গ করবে।

ধুতি পাঞ্জাবি পরা মাঝবয়সী ভদ্রলোক। যোগরঞ্জনের চেয়ে কিছু বড়ই হবেন। ষাটের কাছাকাছি বয়স। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। মুখ দেখে মনে হয় চুল বৃথাই পাকেনি। সংসারে অনেক দেখেছেন শুনেছেন, অনেক অভিজ্ঞতাও হয়েছে তাঁর।

ইন্দ্রাণী অতিথিদের এক পলক দেখে নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। মেয়ে কিছুতেই সাজবে না, ভালো শাড়িটাড়ি পরবে না বলে জেদ ধরে বসে আছে। অবশ্য খুকু আর নীলুর স্ত্রী মিনতি তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ঠিক রাখবার ভার নিয়েছে।

তবু মেয়ের ঘরের দিকে ইন্দ্রাণী একবার না গিয়ে পারলেন না। বড় মেয়েকে বললেন, 'টুকুকে বলিস ওঁরা যা জিজ্ঞেস করেন যেন সব কথার ভদ্রভাবে জবাব দেয়। যেন কোন জাতনাশা কাণ্ডকারখানা না করে বসে।'

ইন্দিরা বলল, 'তুমি ভেব না মা। ওর যা একটু পাগলাটে ভাব তা আমাদের কাছে। বাইরে একেবারে লক্ষ্মী মেয়ে।'

মিনতিও তাঁকে ভরসা দিয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন দিদি। টুকু আমাদের অবুঝ মেয়ে নয়। কোথায় কি রকম চলতে হয় না-হয় ও বেশ জানে।'

ইন্দ্রাণী ওদের ওপর সব ভার দিয়ে জল খাবারের ব্যবস্থা করতে চলে গেলেন। এত সাহস নেই মেয়ের, যা তা কিছু একটা করে বসবে। বিশেষ করে এমন কড়া শক্ত বাপ যার মাথার ওপর। তবু কেন যেন বড় ভয় করে বাপু। এমন ভয় বড় মেয়ের বেলায় হয়নি ইন্দ্রাণীর। সে ছোট ছিল। যা বলেছেন তাই শুনেছে। কিন্তু এ মেয়ের স্বভাব আলাদা। যেমন জেদী তেমনি এক-গুঁয়ে। ঠিক একেবারে ওঁর ধারা পেয়েছে। বললে উনি রেগে যান, কিন্তু অবিকল ওইরকম। ছেলে হলে এই জেদ এই রোখ কাজে লাগত। কিন্তু মেয়ের বেলায় তো আর তা নয়। মেয়ের বেলায় তা দোষের। যাকে পরের ঘরে গিয়ে সারাজীবন থাকতে হবে, পরকে আপন করতে হবে, তার কি আর গোঁয়ার্তুমি সাজে? ইন্দ্রাণী দেখেছেন নরম স্বভাবের মেয়েই শেষ পর্যন্ত সুখী হয়। তারাই দশজনকে সুখী করতে পারে।

মেয়েকে নিয়ে তার বাবার চিন্তাও কম নয়। শুধু নিজের আদেশ নির্দেশের ওপর ভরসা করতে পারেননি। বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করবার জন্যে টুকুর বন্ধু ওই মীনাক্ষী মেয়েটাকেও বার কয়েক ডেকে এনেছেন। অমনিতে বেশি কাউকে পছন্দ করেন না, ছেলেই হোক মেয়েই হোক, কেউ এলেই ভাবেন আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করার জন্যে এসেছে। কিন্তু মীনাক্ষীর ওপর ওঁর ভারি ভরসা। প্রায়ই বলেন, 'মেয়েটি বড্ড ভালো। যেমন লেখাপড়ায় তেমনি

স্বভাবে। ছেলে থাকলে ওকে আমি বউ করে ঘরে আনতাম।'

স্বামীর মুখে পরের মেয়ের প্রশংসায় একটু হিংসা হয় ইন্দ্রাণীর। কেন, তাঁর মেয়েরা কি ফেলনা নাকি? কিন্তু হেসে বলেন, 'বল কি, জাত যে আলাদা।'

'তা হোক।'

প্রথম প্রথম মীনাক্ষী কিন্তু উল্টো কথাই বলতে শুরু করেছিল, 'কেন মাসীমা, ওর বিয়ের জন্যে কেন ব্যস্ত হচ্ছেন আপনারা। বেশ তো পড়ছিল কলেজে। অন্তত বি.এ-টা পাশ করুক তারপর ওসব দেখা যাবে।'

কিন্তু টুকুর বাবা মীনাক্ষীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কী সব বললেন-টললেন। মেয়েদের জীবনের সুখ-শান্তির কথা, সিদ্ধি সার্থকতার কথা। আরো কত কি। এতটা অবশ্য ভালো লাগেনি ইন্দ্রাণীর। শত হলেও মেয়ের বয়সী একটা মেয়ে। না হয় বই মুখস্থ করে পরীক্ষায় একটু ভালো নম্বরই পায়। তবু তার সঙ্গে অত তত্ত্বকথা কিসের। নিজেদের ঘরের কথা নিয়ে অত আলোচনাই বা কেন। কিন্তু সময়টা তো ভালো নয়। স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে বেশি বাদ-প্রতিবাদ করেননি ইন্দ্রাণী।

সেই সব তর্কাতর্কি তত্ত্ব আলোচনার ফল অবশ্য খারাপ হয়নি। মীনাক্ষী শেষ পর্যন্ত তার মেসোমশাইর দলে এসেছে। বিয়েটা যে কোন কোন মেয়ের পক্ষে খুবই আদর্শ, আঠার উনিশ বছর বয়েস তার উপযুক্ত সময় এ কথাও বন্ধুকে সে অনেক করে বুঝিয়েছে। বলা যায় না হয়তো বন্ধুর পরামর্শেই মেয়ে এখন বুঝ মেনেছে। রাগারাগি ছাটাছাটি থামিয়ে অনেকটা শান্ত হয়ে রয়েছে। যার চেষ্টাতেই হোক, ফল হলেই হল। পরের মেয়ের ওপর ইন্দ্রাণীর এ জন্যে কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত।

ভাঁড়ার থেকে ঘি ময়দা চিনি বার করে আনছিলেন ইন্দ্রাণী, ছন্দা আর নন্দা এসে সামনে দাঁড়াল।

ছন্দা বলল, 'আচ্ছা মা, মেজদির শাশুড়ী কোনজন হবেন বল দেখি। ওই যে মোটাসোটা মহিলা, হাতে আবার একটা কবচ বাঁধা। মাগো কি বিশ্রী দেখতে।'

নন্দা বলল, 'ওঁর বোন কিন্তু দেখতে ভালো। তাই না মা? অত মোটাও নয়, অত কালোও নয়।'

ছন্দা বলল, 'নন্দার ওঁকে খুব পছন্দ হয়েছে মা। উনি নন্দার শাশুড়ী হলে ও খুব খুশী হবে। উঃ রাক্কুসী। চিমটি তো নয়, এক খাবলা মাংসও তুলে নিয়ে গেল, দেখ মা।'

'নেবে না? তুই দিনরাত ওর পেছনে লাগিস।'

ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় কাটল দেখে ইন্দ্রাণী স্বস্তি পেলেন। ওপক্ষ থেকে উকিলের মত মেয়েকে কেউ জেরা করলেন না, শুধু নামধাম আর

পড়াশুনোর কথা জেনেই মুকুন্দবাবু সন্তুষ্ট রইলেন। মন্দিরা গান জানে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন একবার। জানে না শুনে তেমন কোন আপত্তি করলেন না। একেবারে যে জানে না তা নয়। গলা ভালো। তবু কারো সামনে গাইবে না। কী যে স্বভাব মেয়ের। একটু রসিকতা করে মেয়েকে হাসিয়ে দেখলেন মুকুন্দবাবু। দাঁতগুলি সমান কি না সুন্দর কি না তাই দেখবার ইচ্ছে। হাঁটিয়ে দেখলেন একটু। খড়ম-পা না লক্ষ্মী-পা যাচাই করতে চান। করুন। ইন্দ্রাণীর কিছুতে ভয় নেই। ওসব পরীক্ষায় মেয়ে সহজেই পাশ করে যাবে। হাতখানা তুলে নিয়ে কী পরীক্ষা করলেন। খুশী হয়ে বললেন, 'বেশ।'

তারপর স্ত্রী আর শ্যালিকার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করবার আছে নাকি?'

মুকুন্দবাবুর স্ত্রী বললেন, 'আমরা আর কী জিজ্ঞেস করব?'

শ্যালিকা বললেন, 'আপনি কি কিছু বাকি রেখেছেন জামাইবাবু?'

'বল কি। রান্নাবান্না ঘর-সংসারের কথা আমি তো কিছুই জিজ্ঞেস করিনি।'

'ওসব আবার জিজ্ঞেস করে জানতে হয় নাকি? এ কি আমাদের সেই আমল আছে? এখনকার মেয়েরা কি আর রান্নাঘরে ঢুকতে চায়!'

ইন্দ্রাণী হেসে বললেন, 'করতে হয় না অবশ্য। করতে দিইওনে। তবে জানে সবই।'

জল খাবারের আয়োজন ইন্দ্রাণী যথেষ্টই করেছিলেন। লুচি, মোহন-ভোগ, সন্দেশ। কিন্তু ওঁরা প্রায় কিছু খেলেন না। ইন্দ্রাণী ভাবলেন হয়তো মেয়ে পছন্দ হয়নি। নইলে খেতে এত অনিচ্ছা কেন।

বিদায় নেওয়ার আগে মুকুন্দবাবু চাইলেন মেয়ের ঠিকুজী আর তাঁর শ্যালিকা চাইলেন একখানা ফোটো। সবাইকে দেখাবেন।

সুরজিৎ বলল, 'তাহলে মিহির একদিন শিগগিরই আসবে তো? আমি তো ভেবেছিলাম ওকে আপনারা আজই ধরে নিয়ে আসবেন।'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'সে যে কী অদ্ভুত ছেলে তুমি তো জান না। বলে. তোমরা দেখে শুনে ঠিক করলেই হবে। আমি আর নতুন কী দেখব।'

ইন্দ্রাণী মিহিরের মা আর মাসীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, 'এ তো আজকালকার ছেলের মত কথা নয়। কেন, বিয়েতে কি তেমন মত নেই নাকি?'

মাসী হেসে বললেন, 'মত ঠিকই আছে। তবে মুখে কি আর এখনকার ছেলেরা তেমন গরজ দেখায়?'

মুকুন্দবাবু হেসে বললেন, 'আপনাদের কাছে বলে রাখি আমার ছেলে কিন্তু অনেক ব্যাপারেই ভারি সেকেলে। সুরজিতের কাছে শুনে থাকবেন সব। চালচলন দেখে বুঝতে পারবেন না আমিই বাপ না ওই বাপ। লোকে বাবুগিরি বিলাসিতার জন্যে ছেলেকে ধমকায়। আর আমি ধমকাই একেবারে

উল্টো কারণে। ভদ্রসমাজে চলতে গেলে যেটুকু দরকার সেটুকু তো চাই, কী বলুন?'

যোগরঞ্জন হেসে বললেন, 'তা তো বটেই।'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'তবে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন নয়, সেটুকু বলতে হবে। ধোপা বাড়ি থেকে কাপড় চোপড় পেতে দেরি হলে নিজের হাতে সাবান কাচতে বসবে, ইস্ত্রি করতে বসবে, কিন্তু ময়লা জিনিস কক্ষনো পরবে না। ঘরে আসবাবপত্রের ভিড় মোটেই পছন্দ করে না। কিন্তু যে ক'টি জিনিস থাকবে তা বেশ গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখা চাই।'

যোগরঞ্জন বললেন, 'বাঃ, স্বভাবটি তো বেশ।'

দোরের দিকে এগোতে এগোতে মুকুন্দবাবু মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে ফের একটু হাসলেন, 'আর এসব সম্বন্ধ-টম্বন্ধ দেখতে আরম্ভ করবার আগে ছেলে আমাকে দিয়ে এক কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে।'

যোগরঞ্জন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রকম?'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'ছেলে বলেছে বাংলা দেশের মেয়েদের গায়ে আমি যেন দুধে-আলতার রঙ না চাই। আমি যেন বেশি বাছাবাছি না করতে যাই। আর আমি যেন মেয়ের বাপের ওপর বিন্দুমাত্র চাপ না দিই। বিয়ে যদি করে পণ যৌতুক নিয়ে বিয়ে করবে না, এই হল আমার ছেলের ধনুর্ভাঙা পণ।'

ইন্দ্রাণী তো অভিভূত হলেনই, তিনি চেয়ে দেখলেন ঘরে আর যাঁরা আছেন, তাঁর স্বামী জামাই মেয়ে, সবাই একেবারে চুপ করে রয়েছেন। মুকুন্দবাবু যে নিতান্তই সাধারণ জামা কাপড় পরে এসেছেন ধরন-ধারণ দেখে একটু কৃপণ-কৃপণই মনে হয় তাঁকে, তিনি দেখতে যে সুন্দর নন, পানের ছোপে তাঁর দাঁতগুলি যে কালো, শুধু তাঁর স্ত্রীর হাতেই নয়, তাঁর বাহুতেও যে একটি বিসদৃশ রক্ষা-কবচ আছে, সেই মুহূর্তে ইন্দ্রাণীর তা চোখে পড়ল না। গয়নার পুরোন প্যাটার্নে, শাড়ি পরার ধরনে, কথাবার্তায় মুকুন্দবাবু আর তাঁর বোন, দুজনের মধ্যেই যে একটু গ্রাম্য ভাব বেশি, তাও তাঁর কাছে তুচ্ছ বলে মনে হল। যে ছেলে এমন উদার তার পরিবারের লোকজন যেমনই হোক না তাতে কিছু এসে যায় না। আর সেই উদারতা তো অক্ষমতার নয়, ক্ষমতাবানের উদারতা। কতই বা বয়স, এই বয়সে ছ'সাতশ টাকার মাইনের চাকরি করে যে ছেলে সে তো আর যে-সে পাত্র নয়।

মুকুন্দবাবু বলতে লাগলেন, 'আমি তাকে বলেছি, তোমার ভয় নেই বাপু, তোমার বিয়ে দিয়ে আমি বড়লোক হতে চাইনে। একটি লক্ষ্মী বউ আমার বাড়িতে আসবে, তার শোভায় আমার ঘরদোর আলো হয়ে উঠবে, এছাড়া আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই।'

যেমন ছেলে তেমনি তার বাপ।

যে লক্ষ্মীকে মুকুন্দবাবু খুঁজে বেড়াচ্ছেন, ইন্দ্রাণী ভাবলেন তাঁদের

মেয়ের মধ্যে তিনি কি তাকে দেখতে পাবেন! না পাওয়ার অবশ্য কোন কারণ নেই। তাঁদের টুকু কোন রকম অবাধ্যতা করেনি, কোন রকম অশোভন অবিনয় দেখায়নি। ঘরে ঢুকে নম্রভাবে সবাইকেই নমস্কার করেছে। নত মুখে মুকুন্দবাবুর সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। তারপর দেখা সাক্ষাৎ শেষ হবার পর তেমনি বিনীতভাবে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়েছে। মেয়ের এমন শান্ত স্নিগ্ধ শ্রীমণ্ডিত রূপ এর আগে দেখেননি ইন্দ্রাণী। ওর এই লক্ষ্মীশ্রী কি কেবল মায়ের চোখেই ধরা পড়বে, আর কারো চোখে ধরা পড়বে না? মেয়ের মতিগতি তাহলে বদলেছে, ইন্দ্রাণী মনে মনে হাসলেন। বদলাবে না? অল্প বয়সের চাঞ্চল্য কদিন থাকে? মেয়ে তো আর তাঁর অবুঝ নয়, অশিক্ষিতাও নয়। কিসে সুখশান্তি মান সম্মান তা ভেবে দেখবার সময় এতদিনে সে পেয়েছে। সবই বুঝতে পেরেছে মেয়ে।

মুকুন্দবাবুরা মেয়ে দেখে চলে যাওয়ার পর ঘরের মধ্যে শ্বশুর-জামাইতে ফের তত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ হল।

যোগরঞ্জন বললেন, 'আধুনিকতা আধুনিকতা করো সুরজিৎ, এই হল যথার্থ আধুনিকতা। বিয়ে করতে গিয়ে কে এমন বলতে পারে, আমি রূপ চাইনে, পণযৌতুক চাইনে—'

ইন্দিরা সুরজিৎকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'বাবা, ওঁরা যেন কত পণ নিয়েছিলেন তোমার কাছ থেকে? দেড় হাজার না?'

যোগরঞ্জন লজ্জিত হয়ে বললেন, 'সে যাকগে। সে কথা হচ্ছে না। সুরজিৎ এমন ছেলে ওকে আমি আরো বেশি দিতে পারতাম। টুকুকেও দেব। খালি হাতে নিশ্চয়ই মেয়ের বিয়ে দেব না। কিন্তু ওই যে মুখ ফুটে বলা—আমাদের কোন দাবিদাওয়া নেই—এই বলাটাই অনেকখানি।'

সুরজিৎ হেসে বলল, 'মুকুন্দবাবু তা জানেন। ভারি বিচক্ষণ মানুষ। কোথায় কোন কথা বলতে হয়, কোথায় কিছু চাইনে-চাইনে বললে বেশি পাওয়ার আশা থাকে তা ওঁর মত কেউ জানে না। মার্চেণ্ট অফিসের কেরানীগিরি করতে করতে উনি ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়েছেন, টালিগঞ্জে দোতল বাড়ি করেছেন, আমরা তো ভাবতেই পারিনে, কী করে করলেন এসব। অবশ সাইড বিজনেস কিছু কিছু আছে। তবু সবাই ওঁর অ্যাচিভমেণ্ট দেখে অবাব হয়ে যায়।'

যোগরঞ্জন বললেন, 'তুমি কি বলতে চাও উনি মানুষটি সৎ নন? খোল বাজারের লোক নন?'

'ছিঃ তা বলব কেন। আপনি ভুলে যাচ্ছেন মুকুন্দবাবু আমার বন্ধুর বাবা আর মিহির ছেলেটি সত্যিই ভালো। কিছু কিছু অদ্ভুত চালচলন ধরন-ধারণ থাকলেও সত্যিকারের ভালো ছেলে।'

যোগরঞ্জন বললেন, 'সেইটাই কি আসল কথা নয় সুরজিৎ?'

ইন্দিরা একটু হেসে বলল, 'বাবা, ভালোকে কে না ভালো বলে। ওঁরা ভালো বলেই তো উনি এ সম্বন্ধ এনেছেন।'

যোগরঞ্জন হেসে বললেন, 'আমার সতী মা, আমি কিন্তু তোর পতিনিন্দা করিনি।'

'কী যে করো বাবা।' ইন্দিরা লজ্জিত হয়ে মুখ নামালে।

যোগরঞ্জন জামাইর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মুকুন্দবাবুর সঙ্গে আলাপ করে মনে হল ওঁদের হিন্দুয়ানী আমার চেয়েও কয়েক ডিগ্রী বেশি। পাঁজি-পুঁথির শাসন ওঁরা আমার চেয়ে আরো বেশি মানেন। দৈব-টৈব, ঠিকুজী কোষ্ঠি অষ্টগ্রহ নবগ্রহ আর ওইসব কবচকুণ্ডল আমি এড়িয়ে যেতে চাই। ওসবের মাহাত্ম্য আমি স্বীকারও করিনে, অস্বীকারও করিনে।' জামাই কোন প্রতিবাদ করে কিনা একটু দেখে নিয়ে তিনি ফের বলতে লাগলেন, 'আসলে ওসব নিয়ে আমি ভাবতে চাইনে। ভাবলে মন দুর্বল হয়। যেটুকু পুরুষকার আমার আছে সেটুকুও আর থাকে না এই আমার ধারণা। মুকুন্দবাবু দেখছি সব মানেন। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। ও সব বাইরের ব্যাপার। আসলে মানুষ সৎ কিনা হৃদয়বান কিনা তাই দেখতে হয়। পাঁচ বছর আগে হলে ওই কবচকুণ্ডলে আমার দৃষ্টি আটকে যেত সুরজিৎ। তার আড়ালে আমি আসল মানুষটিকে দেখতে পেতাম না, এখন পাই। সত্যিকারের আধুনিকতার বড় লক্ষণ কি জানো? সহনশীলতা।'

জামাই মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। শ্বশুরই আসর গরম করে রাখলেন। ইন্দ্রাণী খানিকক্ষণ শুনে হেসে ভিতরে চলে গেলেন। পুরুষ মানুষ তর্ক করতে বড় ভালোবাসে। আর বয়স যত বাড়ছে ওঁর বক্তৃতা দেওয়ার স্বভাব তত বাড়ছে।

ইন্দ্রাণী যাওয়ার আগে বললেন, 'সুরজিৎ, তুমি ভিতরে এসো বাবা, ভিতরে এসো। ওঁর বক্তৃতা সহজে থামবে না।'

সপ্তাহখানেক যেতেই মুকুন্দবাবু খবর দিলেন। নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন যোগরঞ্জনকে। ফিরে এসে তিনি একই সার্টিফিকেট দিলেন, 'চালচলনে একটু সেকেলে। তবে মানুষ বড় ভালো। ছেলেটি বড় ভালো। ভদ্র বিনয়ী। খুব শান্তশিষ্ট। লম্বা আছে। টুকুর সঙ্গে মানাবে।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'তা তো বুঝলুম। কিন্তু তোমার মেয়েকে পছন্দ হয়েছে তো?'

যোগরঞ্জন হেসে বললেন, 'তোমার কি মনে হয়?'

॥ ৪ ॥

সকাল থেকে নহবত বাজতে শুরু করেছে।

বাড়ি তো নয় একটি উৎসব-নগরী। আত্মীয়স্বজন, কুটুম্ব-কুটুম্বিনীতে ঘর-বারান্দা ছাদের চিলেকোঠাটি পর্যন্ত বোঝাই। হাঁক-ডাক হই-চই ছুটো-ছুটির বিরাম নেই। ছন্দা-নন্দারা ক'দিন ধরে সমস্ত শাসন বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। ওদের কলকণ্ঠ প্রায়ই থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে।

আষাঢ় মাসে উদার অকৃপণ শুভক্ষণটি অবশেষে সত্যিই এসে পড়েছে। আকাশে যেভাবে মেঘ জমেছে, তাতে সন্ধ্যাটি সজল হবারও আশঙ্কা আছে। কিন্তু যোগরঞ্জন তার জন্যে তৈরি আছেন। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন শুধু মেরাপ-বাঁধা ছাতেই করেননি, ঘরে বারান্দায় বিকল্প ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। বৃষ্টি যদি না নামে তাহলে, আর যদি নামে, তাহলে বিয়েও ঘরের মধ্যেই হতে পারবে।

শুভদিনটি সত্যিই এসে গেছে।

মন্দিরা কিন্তু ভেবেছিল আসবে না। শেষ পর্যন্ত কোথাও না কোথাও এমন কিছু একটা অঘটন ঘটবে—মন্দিরার ধারণা—সেটাই তার পক্ষে শুভ ঘটনা—তাতে এই বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। এই অলৌকিক শক্তির ওপর বিশ্বাস কেন এসেছিল মন্দিরার বলা সহজ নয়। মনের তীব্র ইচ্ছাই হয়তো তার মনে এই অহেতুক বিশ্বাস এনে দিয়েছিল। তার মন বলছিল, 'আমি যা চাইছি, তাই-ই হবে, আমি যা চাইনে, তা কিছুতেই হতে পারবে না।'

অবশ্য শুধু অলৌকিক শক্তির ওপর নির্ভর করে সে বসে থাকেনি। এই তিন মাসের মধ্যে সে অন্তত তিন-চারবার বাড়ি থেকে পালাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারেনি। বড়জোর উঠান পর্যন্ত, বাড়ির সীমানা পর্যন্ত, বুড়ো শুকলাল কোত্থেকে এসে পিছু নিয়েছে, 'কোথায় যাচ্ছ দিদি?'

কী আপদ!

মন্দিরা জবাব দিয়েছে, 'মরতে।'

শুকলাল কোনদিন ধমক দিয়ে বলেছে, 'ছি-ছি-ছি। অমন কথা মুখে আনলেও পাপ হয় দিদি।'

কোনদিন বা হেসে এগিয়ে এসে হাত ধরেছে, 'চল, আমি ভালো জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি। ওই আমগাছগুলোর তলায় মরতে গেলে সুবিধে হবে না। একটু ঝড় উঠলেই ঢিপ ঢিপ করে গায়ে মাথায় আম পড়বে, ভারি ব্যথা লাগবে। অথচ টুঁ শব্দটি করতে পারবে না, মরে রয়েছো তো। মরে গেলে তো মানুষ আর শব্দ করতে পারে না। তার চেয়ে চল, আমি তোমাকে খুব ভালো একটা নিরিবিলি জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি। সেখানে দিব্যি সুখে মরতে পারবে। কেউ দেখবে না, কেউ জিজ্ঞেস পর্যন্ত করবে না, এই মরছিস যে। আমার পরামর্শ

নাও দিদি। আমি অমন অনেকবার মরেছি কিনা। তোমাকে ঠিক পথ বাতলে দিতে পারব।'

মন্দিরা অসহিষ্ণু হয়ে বলেছে, 'শুকলালদা, কেন অমন বিরক্ত করছ। আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।'

শুকলাল হেসে জবাব দিয়েছে, 'সেইজন্যেই তো এসব ব্যবস্থা হচ্ছে দিদি। তুমি সুখে-শান্তিতে থাকবে বলেই তো—'

সবাইর মুখে ওই একই বুলি। মন্দিরার ইচ্ছা থাক আর না থাক, তার ঘাড়ে সুখশান্তির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া চাই।

পালাতে আরো কয়েকবার চেষ্টা করেছে মন্দিরা। কিন্তু কয়েক পা বাড়িয়ে আর এগোতে পারেনি। বাধা তো শুধু বাইরেরই নয়, ভিতরের বাধা যে তার চেয়েও বড়। কেন পালাবে? কোথায় পালাবে? কিসের জন্যে? কার জন্যে? যার জন্যে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নেবে মন্দিরা সে তো কই চিঠিখানার উত্তরও দিল না। ছন্দা তার কাছে মিথ্যে কথা বলবার মেয়ে নয়। সে চিঠি ঠিকই পোস্ট করেছে, তার চিঠি সে পেয়েওছে তাতে কোন সন্দেহ নেই মন্দিরার। কিন্তু জবাব দেয়নি। তার জবাব দেবার কিছু নেই বলেই দেয়নি। অবশ্য এমনও হতে পারে চিঠি সে দিয়েছিল, কিন্তু তা আর কারো হাতে পড়েছে। সে-চিঠি মন্দিরার হাতে আর আসেনি। কিন্তু চিঠির জবাবে তার তো শুধু চিঠি লেখার কথা নয়, তার যে চলে আসবার কথা, তার যে জোর করে নিয়ে যাওয়ার কথা, জয় করে নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কই, তেমন তো কিছু হয়নি। পারুক আর না পারুক, সে যদি চেষ্টাটুকু অন্তত করত, তাদের গেটের সামনে হই-চই করে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে ফিরে যেত, তা হলেও যেন কিছুটা সান্ত্বনা থাকত মন্দিরার। একজন মানুষ তার জন্যে অশেষ কষ্ট পেয়েছে, সে কথা শুনতে শুনতে সে-কষ্টের শরিক হয়েও আনন্দ। দুজনে মিলে যে দুঃখ ভোগ, সে-দুঃখ প্রায় সুখেরই সামিল। কিন্তু সব দুঃখ লজ্জা আর গ্লানি মন্দিরাকে একাই সইতে হবে। পালাবার কোন মানে হয় না, কার সঙ্গে পালাবে মন্দিরা? একা একা কি পালানো যায়? একা একা এই পৃথিবী থেকে পালানো যায়! সে চেষ্টাও করে দেখেছে মন্দিরা। লুকিয়ে লুকিয়ে ছাদের কার্নিসের কাছে কয়েকদিন। আশে পাশে পিছনে ফিরে দেখেছে কেউ নেই। কিন্তু লাফিয়ে পড়বার মুহূর্তগুলি একের পর এক হাতছাড়া হয়ে গেছে। কেন? কিসের জন্যে? কার জন্যে? একা একাও মরা যায় কিন্তু সে কিসের জন্যে মরছে, তা না জেনে মরলে মরবার বলটুকু কোথায় পাবে মন্দিরা? যাবে যে, চলে যাওয়ার আগে কোন্ সম্বল-টুকু নিয়ে যাবে?

দিনের পর দিন গেল। কেউ এল না, কোন চিঠি এল না, কোন ফোন এল না। দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত গেল। শ্রদ্ধা, প্রীতি, বিশ্বাস,

ভালোবাসা পৃথিবী থেকে সব নিঃশেষে মুছে নিতে নিতে চলে গেল। কেউ এল না।

আর কেউ আসুক, তা মন্দিরা চায়ও না। সে এখন শুধু চুপচাপ একা থাকতে চায়। আত্মীয়ই হোক, পরই হোক, কারো স্পর্শ পর্যন্ত তার কাছে অসহ্য। পৃথিবীর কোন শব্দটুকু, গন্ধটুকু পর্যন্ত সহ্য হতে চায় না।

তবু অতর্কিতে একদিন মীনাক্ষী এসে হাজির হল। দোর ভেজিয়ে নিজের ঘরে দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়েছিল মন্দিরা, হঠাৎ এসে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল।

হেসে বলল, 'ঈস্, একাকিনী শোকাকুলা অশোককাননে। মন্দিরা, তোর চেড়ী এসেছে, এবার মুখ ফেরা।'

মন্দিরা বলল, 'কেন এলি। কেন ছুঁলি আমাকে। আমি তো তোর কাছে অস্পৃশ্যা।'

মীনাক্ষী ওকে জোর করে টেনে তুলল, 'বাব্বা, এখনো রাগ পড়েনি মেয়ের! সেই রকম টং হয়েই আছিস দেখছি।'

'তুই আমাকে সেদিন কি অকথ্য অপমান করেছিলি মনে আছে?'

মীনাক্ষী নরম হয়ে বলেছিল, 'সত্যি, সেদিন আমার মাথার ঠিক ছিল না। মনমেজাজ ভারি খারাপ ছিল। আমাকে ক্ষমা করিস ভাই। কিন্তু সেদিন যা বলেছি, তোর ভালোর জন্যেই বলেছি।'

মন্দিরা ফের চটে উঠল, 'তোরা বিশ্বসুদ্ধ লোক আমার ভালোর জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিস। তোদের পায়ে পড়ি, আমার অত ভালো করে তোদের দরকার নেই। নিজের ভালো আমি নিজেই বুঝতে পারব।'

মীনাক্ষী গম্ভীর গলায় দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, 'তা পারা যায় না রে মন্দিরা, সব সময় তা পারা যায় না। এইজন্যেই কখনো কখনো Friend, Philosopher and Guide-এর দরকার হয়।'

মন্দিরা বলল, 'আমার গাইড তা হলে আমাকে এখন কোন্ পথ দেখাচ্ছে?'

মীনাক্ষী তেমনি গম্ভীরভাবে বলল, 'বাসর ঘরের।'

ছন্দা আর নন্দা খাবার আর চা নিয়ে এল। মীনুদিকে কে হাতে করে দেবে, তাই নিয়ে দুজনের মধ্যে রেষারেষি। ইন্দ্রাণীও এসে দাঁড়ালেন একটু বাদে। 'তুমি এসেছ? বাঁচলুম মা। এবার তোমার বন্ধুকে একটু বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলো। মেয়ে যে কী কাণ্ড শুরু করেছে।'

মীনাক্ষী হেসে বলল, 'আমার বন্ধু খুব বুদ্ধিমতী। ওকে বেশি বোঝাতে হবে না মাসীমা।'

তারপর নিরিবিলিতে দুজনে কথা বলবার জন্যে মীনুকে নিয়ে ছাতে গিয়ে বসেছিল মন্দিরা।

আস্তে আস্তে দিনের আলো শেষ হয়ে এল। চারদিকের গাছগুলি যেন

জীবন্ত গাছ নয়, কালো তুলিতে আঁকা ছবি।

মীনাক্ষী বলেছিল, 'তোদের এদিকটায় কিন্তু বেশ ফাঁকা। খুব নিরিবিলি। যখনই আসি আমার ভালো লাগে। চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করে।'

মন্দিরা বলল, 'তোর কি, তুই তো বর্ন ফিলসফার।'

মীনাক্ষী হেসে বলল, 'আর সেই সঙ্গে ফ্রেন্ড অ্যান্ড গাইড। সেকথা ভুলিসনে।'

মন্দিরা বলল, 'শুধু কি আমার? আমার বাবারও।'

মীনাক্ষী লজ্জিত হয়ে বলল, 'কী যে বলিস। মেসোমশাই আমার গুরুজন। তাঁর গাইড হব কী করে? তবে রেলওয়ের টাইম টেবলও তো গাইড, ফোন-গাইডও তো গাইড। সেই হিসেবে যদি ধরিস।'

একটু চুপ করে থেকে মন্দিরা বলেছিল, 'বাবা তোর কথা শোনেন। তোকে গার্গী মৈত্রেয়ীর স্বজাতীয়া বলে মনে করেন।'

'ঠাট্টা করছিস? সেদিন বকেছিলুম বলে বুঝি শোধ নেওয়া হচ্ছে?'

'না, ঠাট্টা নয়। তুই আমার হয়ে বাবার কাছে একটু উমেদারি কর না।'

'কিসের উমেদারি?'

'আমাকে তিনি আবার পড়তে দিন। আমি আর কিচ্ছু চাইনে। শুধু কলেজে যেমন পড়ছিলাম, তেমনি পড়তে দিন আমাকে। ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থেকে থেকে আমি একেবারে পচে গেলাম মীনু। আমি তাঁকে বণ্ড লিখে দিতে রাজী আছি। আমি আর কোথাও যাব না। কারো সঙ্গে কথা বলব না, শুধু লিখব, পড়ব আর কিচ্ছু করব না। বল-না বাবাকে।'

মন্দিরা সেদিন বারো তের বছরের কিশোরী মেয়ের মতই আকুল হয়ে উঠেছিল।

মীনাক্ষী বলেছিল। তার আবেদন বাবার কাছে পেঁছে দিয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি। বাবা যা ভালো বুঝবেন, তাই-ই করবেন। তাঁর মত ঘন ঘন বদলায় না। ভালো হোক, মন্দ হোক, কারো সম্বন্ধে তিনি যা ধারণা করে রাখবেন, তা সহজে কেউ ভাঙতে পারবে না। তাঁর এই স্বভাবের কথা মন্দিরা জানে। জেনেও চেষ্টা করতে ছাড়েনি। মাকে বলেছে, দিদি-জামাইবাবুকে বলেছে, বন্ধুকে বলেছে, কিন্তু হাজার বলাবলিতেও কোন ফল হয়নি। আর-এক কাজ করতে পারত মন্দিরা। নিজে গিয়ে বাবার পা জড়িয়ে ধরতে পারত। কিন্তু তাতে কি তিনি ক্ষমা করতেন? মন্দিরার ইচ্ছা পূর্ণ করতেন? মনে হয় না। তিনি অত সহজে নরম হবার মানুষ নন। তাছাড়া সেদিনের সেই কাণ্ড ঘটবার পর বাবা আর তাকে বিশ্বাসও করবেন না। তাঁর সেদিনের সেই দুটি চোখ দেখে মন্দিরা তা বুঝতে পেরেছে। মানুষ মানুষের দিকে ওভাবে তাকায় না। বাঘও কি তার সন্তানকে কখনো অমন হিংস্র ঘাতকের চোখে দেখে! তাঁর সেই চোখ দেখে মন্দিরা বুঝে নিয়েছে কোনদিন আর

সে বাবার স্নেহ-ভালোবাসা পাবে না। এমন কি, মায়া-মমতাও তার ওপর থেকে বাবার চলে গেছে। এখন শুধু শুকনো কর্তব্য করে যাবেন। সবাইকে দেখাবেন, যা উচিত তিনি তাই করে যাচ্ছেন। আসলে গোপনে গোপনে শাস্তি দেবেন মন্দিরাকে। শাস্তি ছাড়া আর কি? ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসহায় মেয়েকে এমন জোর করে কারো হাতে গছিয়ে দিলে তাকে শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কি বলে? মন্দিরা যদি ছেলে হতো, তিনি কি পারতেন এমন জোর করে তার বিয়ে দিতে? মুখ বুজে সয়ে যাওয়া ছাড়া মন্দিরার আর কোন উপায় নেই। বাবার বিরুদ্ধে তীব্র এক বিদ্বেষ মনের মধ্যে জমে উঠতে থাকে মন্দিরার। অনেক সময় এই অন্ধ ক্রোধ আর বিদ্বেষের কোন কারণ খুঁজে পায় না, তাঁর ওপর মমতা সহানুভূতি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টাও করে, কিন্তু কিসের এক অস্থিরতা সব ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

পালাতে গিয়ে পালাতে পারল না মন্দিরা, মরতে গিয়ে মরতে পারল না। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই। আর পাঁচজনের ইচ্ছা তাকে জোর করে একটা ঘটনার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাণ পর্যন্ত পণ করলেও মন্দিরা তাকে বাধা দিতে পারবে না।

কখনো নিজেকে ভারি অসহায় মনে হয় মন্দিরার, কখনো বা মরীয়া হয়ে ওঠে। ইচ্ছা হয়, সব ভেঙেচুরে ছারখার করে দেয়। এক নিমেষে এদের সব আয়োজন পণ্ড করে দেয়। মনে পড়ে, ছেলেবেলায় তাকে কোলে করে মা একদিন ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাদীপ দিতে যাচ্ছিলেন। 'দেখ মা, কেমন ঝড় উঠেছে' বলে দুষ্টুমি করে মন্দিরা ফুঁ দিয়ে সেই মঙ্গলদীপ নিভিয়ে দিয়েছিল। মা অবশ্য ছেড়ে দেননি। ঠাস করে তার গালে এক চড় মেরে বসেছিলেন। এখনো ইচ্ছা করলে এক ফুঁয়ে এদের সব দীপ কি নিভিয়ে দিতে পারে না মন্দিরা? যাঁরা দেখতে আসছেন, তাঁদের কাছে তারস্বরে চিৎকার করে যদি বলে, 'এঁরা জোর করে আমার বিয়ে দিচ্ছেন। মোটেই আমার মত নেই বিয়েতে।' তা হলে কী হয়? তারপর যা-যা হতে পারে—সেই অঘটনপরম্পরা পরম নিপুণভাবে একের পর এক সাজিয়ে গেছে মন্দিরা। প্রথমবারের বিন্যাস পছন্দ হয়নি, দ্বিতীয়বার সাজিয়েছে। দ্বিতীয়বারের সাজানো মনঃপূত না হলে তৃতীয়বার নতুন করে সাজাতে বসেছে। কিন্তু আশ্চর্য, ফুঁ দেওয়া আর হয়নি। মায়ের হাতের সেই একটি মঙ্গলদীপ আজ তার বিয়ের রাতে শত দীপে জ্বলে উঠেছে; ফুঁ দেওয়া আর হয়নি।

এঁদের এই মেয়ে দেখানো, ছেলে দেখা, পাকা দেখা, কেনাকাটা, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের প্রতিটি স্তরে মন্দিরার মনে হয়েছে, এইবার ফুঁ দিলে হয়, তা হলেই সব নিভে যাবে। কিন্তু দিতে গিয়ে দিতে পারেনি মন্দিরা। সেই সুন্দর পবিত্র দীপশিখাটির কাছে বার বার মুখখানা এগিয়ে নিয়ে গেছে, তবু ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে পারেনি। সেই দীপ আজ লক্ষ শিখায় অনির্বাণ হয়ে

উঠেছে। শুধু কি জাতনাশের ভয়? শুধু কি কলঙ্ক-কেলেঙ্কারির ভয়? তেমন কিছু একটা করে বসলে বাবা তাকে বেত পর্যন্ত মারতে পারেন, নবাব বাদশাহের মত হয়তো তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলতে পারেন, শুধু কি সেই ভয়ে পিছিয়ে এসেছে মন্দিরা? তা নয়, শুধু প্রাণের ভয়ই নয়। কেমন যেন একটা মমতাও এসেছে। বাবার কথা মনে হয়েছে মন্দিরার। তাঁর মান-সম্মানের কথা মনে হয়েছে। মার উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা মনে হয়েছে। ছন্দা-নন্দার উল্লাস আনন্দ ছুটোছুটি দেখে সেদিকে না তাকিয়ে পারেনি মন্দিরা। ওদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয়, যেন ওদেরই বিয়ে। জুয়েলারের দোকানে ওদেরও দু-একখানা করে গয়নার অর্ডার গেছে। নন্দা সেদিন এসে নাচতে নাচতে জানিয়েছে, 'দিদি, আমিও এবার শাড়ি পরব।' ছন্দা বলেছে, 'হ্যাঁ মেজদি, এবার থেকে বেনারসী পরবে। যদি ওকে আলাদা বেনারসী কিনে দেওয়া না হয়, তোর খানাই ও কেড়ে নিয়ে যাবে তুই দেখিস।'

মন্দিরা না হেসে পারেনি। বলেছে, 'শুধু বেনারসী কেন, সবই তোরা নিস।'

তার নিজের মন্দির অন্ধকার। কিন্তু সেই মন্দিরের চারদিকে এত যে আলো জ্বলে উঠেছে, এত আনন্দ, এত উৎসাহ, এত উল্লাস—সবই কি একটি ফুঁতে নিভিয়ে দেওয়া যায়? কিন্তু না দিয়েও তো উপায় নেই। বাসরঘরের নামে কোন্ এক অপরিচিত অন্ধকার গহ্বরের দিকে তাকে কারা যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পরিণাম না-জানা সেই অনিশ্চিত অন্ধ ভবিষ্যতের দিকে যারা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তারা তার পরম আপন জন। তাদের মুখের দিকে চেয়ে সুখ আর সন্তুষ্টির কথা ভেবে মন্দিরা কয়েক পা এগোচ্ছে, তারপর হঠাৎ পরিণাম ভয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছে, চিৎকার করে বলছে, 'যাব না, যাব না, যাব না।'

কিন্তু সব চিৎকারই যেন তার আপন মনের, সবই যেন অবাস্তব এক স্বপ্নের, তাই কারোরই তা কানে যাচ্ছে না, কেউ তা কানে নিচ্ছে না।

নিজে যা বন্ধ করতে পারেনি মন্দিরা, সমস্ত আশা দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে মনে মনে কামনা করেছে, শেষ মুহূর্তে একটি অলৌকিক কাণ্ডে তা বন্ধ হবে। শুধু তার মুখের একটি ফুৎকার নয়; সত্যিকারের ঝড় উঠবে, আষাঢ়ের আকাশ থেকে শুধু বৃষ্টিপাত নয়, বজ্রপাতও হবে। বিশ্বব্যাপী সেই একটি অলৌকিক প্রলয়কাণ্ডে বেদিয়াডাঙার এই অতি ক্ষুদ্র এক লৌকিক উৎসব নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে।

কিন্তু তেমন কিছুই হল না। বরং সন্ধ্যার আগে আগে একটা দমকা হাওয়া উঠে আকাশের সব মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গেল।

ইন্দ্রাণী বললেন, 'যাক বাবা। বিষ্টি-টিষ্টি হলে আর রক্ষে ছিল না। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।'

মন্দিরা ভাবল, 'ভগবান মায়ের মুখের দিকে তাকালেন, আমার মুখের দিকে তাকালেন না!'

সন্ধ্যার পর থেকে নিমন্ত্রিতেরা আসতে শুরু করলেন। বৃষ্টি বাদলের দিন। অনেকেই সকাল সকাল নিমন্ত্রণ রক্ষা করে চলে যেতে চান। বিশেষ করে যাঁরা দূর থেকে এসেছেন, তাঁরা কোন ঝুঁকি নিতে চান না। যাঁরা কর্ম-কর্তা, তাঁরাও যত তাড়াতাড়ি পারেন অভ্যাগতদের খাইয়ে দিতে পারলেই রেহাই পান। কিন্তু শুধু কি খেয়ে গেলেই হয়। হয় খেতে বসবার আগে, নয়তো খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মেয়েকে আশীর্বাদ করেও তো যেতে হবে।

মন্দিরার দিদিমা এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাচ্ছেন, 'কী যে কাণ্ড তোমাদের। মেয়েকে এখনো তোমরা সাজাতেই পারলে না। লোকজন আসতে শুরু করেছে। কী যে করো তোমরা।'

ইন্দিরা বলল, 'দিদা, তুমিই একটু সাজিয়ে-টাজিয়ে দাও না। টুকু বলছে, তুমি না সাজালে ও আজ আর সাজবে-টাজবে না। তুমি না সাজালে দিদা, সাজিবে না নাতিনী।'

ছন্দা বলল, 'বড়দি, পরের লাইনটা বলো। পরের লাইনটা কী। মুশকিল, নাতিনীর সঙ্গে ঘাতিনী ছাড়া কিন্তু সহজে আর কিছু মেলাতে পারবে না বড়দি।'

নন্দা বলল, 'কেন, হাতীর স্ত্রীলিঙ্গে হাতিনী। তুই যা হয়েছিস।'

মস্ত হস্তিনীর সামনে নন্দা কিন্তু এক সেকেণ্ডও দাঁড়াতে সাহস পেল না। তাড়াতাড়ি দিদিমার পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিল।

দিদিমা বললেন, 'সাজাতে পারব না কেন, সাজাতে আমরাও জানি। আমাদের আমলে কি সাজসজ্জা কিছু ছিল না? সবই তোদের আমলে হয়েছে? তোরা কি ভাবিস আমি বুড়ি হয়েই মায়ের পেট থেকে পড়েছি। কোন কালে আমার আর বয়েস কাল ছিল না?'

সত্তর বছরের বৃদ্ধাকে ইন্দিরা তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা দিলে, 'ছি-ছি-ছি, তোমাকে কে বুড়ি বলে দিদা? তুমি এখনো ষোড়শী রূপসী। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, বলো তোমার নাত-জামাইকে ডেকে আনি।'

মেয়ে সাজাবার ভার ইন্দিরা কিন্তু দিদিমার ওপর দিল না, তাঁর মেয়ের ওপরও নয়। নিজেরাই নিল সেই সুখের দায়িত্ব। ডাকল মীনাক্ষীকে। 'এসো ভাই, কলেজে-পড়া মেয়ে। একটু সাজিয়ে-টাজিয়ে দাও বধূকে।'

মীনাক্ষী হেসে বলল, 'কলেজে কিন্তু এ-সব পড়ায় না ইন্দুদি।'

জামাইবাবু সুরজিৎ কার্তিকবাবু সেজে ঘরের সামনে দিয়ে ঘুরঘুর করছিল, হেসে বলল, 'ও-সব আবার পড়াতে হয় নাকি? ও-বিদ্যা শেখে না কোন নারী!'

কিন্তু ইন্দিরা এখন নারী পুলিস। স্বামীকে চ্যালেঞ্জ করে বলল, 'তুমি

এখানে কেন? যেখানে খাওয়ানো-দাওয়ানো হচ্ছে, সেখানে যাও। পরিবেশন করো গিয়ে।'

সুরজিৎ বলল, 'আমি পরিবেশনই করছি।'

তারপর মন্দিরার দিকে চেয়ে বলল, 'বাব্বা! কী শাড়ি-গয়নার ঘটা। ভগবান, আর জন্মে যেন মন্দিরা হয়ে জন্মাই।'

মীনাক্ষী হেসে বলল, 'তা হলে আমাদের ইন্দিরাদির কী উপায় হবে? তিনি কী হয়ে জন্মাবেন?'

সবাই হঠাৎ চুপ করে গেল। কারো মুখেই যেন জুতসই জবাবটা যোগাচ্ছে না।

মন্দিরা ভাবল, 'ঘুরেফিরে প্রত্যেকেরই কি একটি নামই মনে পড়ছে যে-নাম আজ কিছুতেই মুখে আনা যায় না?'

মন্দিরা সাজতে খুব ভালোই জানে। প্রসাধনকলায় তার যে হাত আছে, সে কথা সবাই স্বীকারও করে। কিন্তু আজ তার সাজবার মন ছিল না। নিজের হাতে সাজবার তার দরকারও ছিল না। আজ সে দিদি বউদি বন্ধুদের হাতে পড়েছে।

খানিক বাদে ইন্দিরাই দিদিমাকে টেনে নিয়ে এল, 'দেখ তো দিদা, নাতনীকে চিনতে পারছ কি না।'

দিদিমা বাঁকা কোমরখানা আর-একটু সোজা করে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, তারপর স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে বললেন, 'বাঃ, বেশ হয়েছে, সুন্দর হয়েছে। খুব গয়না দিয়েছে আমার যোগরঞ্জন। দেবে না কেন? ও তো আর কিপটে নয়। বাঃ রাঙা চেলিতে একেবারে লাল টুকটুকে দেখাচ্ছে আমার টুকুকে। কুঁচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুল। গল্প শুনে শুনে আর আশ মিটত না মেয়ের। আজ তুমি সেই কুঁচবরণ রাজকন্যা। দেখি, ভালো করে দেখি। তোরা একটু সরে দাঁড়া তো।'

ইন্দিরা বলল, 'দেখ না দিদা, ঘরের মধ্যে একশ পাওয়ারের বালব জ্বলছে। তুমি ভালো করে দেখে নাও।'

দিদিমা আরো এগিয়ে এসে মন্দিরার চিবুকটি তুলে ধরলেন, 'আলো তো জ্বলছে। কিন্তু আমার দিদির মুখখানা তেমন ঝলমল ঝলমল করছে কই! কেবল বলত, বিয়ের গল্প বলো দিদা, আমার বিয়ের গল্প বলো। বিয়ের সময় আমাকে কী দেবে। আমি বলতাম, শাড়ি দেব, গয়না দেব, মণি-মুক্তা-মাণিক্যে তোর অঙ্গ একেবারে ভরে দেব। আর তাই-না দেখে তোর মুখখানা ঝলমল ঝলমল করবে। মেয়ের অঙ্গ তো আমার ভরেই দিয়েছে যোগরঞ্জন। কিন্তু মুখখানা ঝলমল ঝলমল করছে কই?'

আবার এক মুহূর্তের নীরব অস্বস্তি। কিন্তু দ্বিতীয় মুহূর্তে ইন্দিরা ধমক দিয়ে উঠল, 'করছে গো বুড়ি করছে। ভালো করে ঝলমলানি দেখতে হলে তোমাকে ছানি কাটিয়ে আসতে হবে। চোখে যে ছানি।'

দিদিমা বিড়বিড় করে বললেন, 'তাই হোক ভাই, তাই হোক। ভগবান করুন, আমার দেখাই যেন ভুল দেখা হয়।'

ইন্দিরা বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন টুকু। দিদাকে প্রণাম কর। উনিই তো সবচেয়ে বড়, ওঁকে দিয়েই শুরু করতে হবে।'

মন্দিরা নত হয়ে দিদিমার পায়ের ধুলো নিল।

দিদিমা বললেন, 'ধানদূর্বা কোথায়। ধানদূর্বার রেকাবিখানা আমাকে এনে দে তোরা। শতজনে শত জিনিস দেবে। আমি ধানদূর্বা দিয়েই আশীর্বাদ করব।'

তারপর থেকে প্রণামের পালা চলল আর প্রণম্যদের হাত থেকে আশীর্বাদী গ্রহণ। শাড়ি, গয়না, আংটি, হার। একটু দূরসম্পর্কীয়দের কাছ থেকে, কি অসচ্ছল অবস্থার আত্মীয় বন্ধুদের কাছ থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ, টেবল ল্যাম্প। ছন্দা একপাশে বসে খাতায় দাতার আর উপহারদ্রব্যের নাম লিখতে লাগল। মন্দিরা এখন একেবারে কলের পুতুল হয়ে গেছে। আর কোন অসুবিধে নেই।

মীনাক্ষীর বাবা-মা এলেন। শাড়ি আর কানের ফুল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। কাকীমাকে নিয়ে ছোটকাকা নিরঞ্জন চাটুয্যে এলেন। বাবার জ্যেঠতুতো ভাই। বেলেঘাটার বেশ বড় এক ট্যানারীর মালিক। বাবার মতই লম্বা চওড়া চেহারা। তবে আরো স্মার্ট আর উদারপন্থী।

নিরঞ্জনকাকা হেসে বললেন, 'জানিস তো বাইরে ছিলাম। ভালো চামার কীভাবে হওয়া যায়, দেখতে গিয়েছিলাম সাদা চামড়ার দেশে। প্লেন থেকে নেমেই শুনি বড়দা এক কান্ড ঘটিয়ে বসেছেন। বিয়ে দিচ্ছেন তোর। রক্ষে যে ঘড়িটা এনেছিলাম। এই নে।'

মন্দিরা একটু হেসে বলল, 'কাকীমার জন্যে আনা নয়তো ছোটকাকা?'

হঠাৎ উঠানে গেটের কাছে কিসের একটা গোলমাল শোনা গেল। সবাই গিয়ে সেখানে ভিড় করেছে। ছোটকাকাও তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন।

একটু বাদে সে গোলমাল থেমেই গেল। বিয়েবাড়িতে কত রকমের কত গোলমালই তো হয়। তবু আরো অনেক পুরো-চেনা আধা-চেনা আত্মীয়-স্বজনের হাত থেকে আশীর্বাদী নিতে নিতে বাইরের দিকে কান খাড়া করে রইল মন্দিরা। কে এসেছিল? কে? কাকে নিয়ে এত হৈ-চৈ?

একটু বাদে ঘরের ভিড় কমলে মন্দিরা দিদিকেই জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছিল রে? কিসের গোলমাল হচ্ছিল নিচে?'

ইন্দিরা বলল, 'ও কিছু না। তা দিয়ে কী করবি তুই?'

মন্দিরা বলল, 'দিদি, তোর পায়ে পড়ি। আমার একটা কথাও তোরা যদি না রাখিস, আমি কিন্তু এর পর কোন কথাই শুনব না।'

বোনের রুদ্রমূর্তি দেখে ইন্দিরা একটু নরম হল, তারপর ঘরের অন্য

মেয়েদের সরিয়ে দিয়ে, প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'শশাঙ্কবাবুর ভাইপো এসেছিল তাঁদের বড় গাড়িখানা নিয়ে। ওই যে সুন্দর-পনা ছেলেটা। ফার্স্ট ইয়ার না সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। গাড়ি বোঝাই ইংরেজী বাংলা বই আর বই। গোটা একটা লাইব্রেরী সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আর-একটি সেতার। তুই সেই কবে একটু টুং-টাং করেছিস, আর কবে ছেড়ে দিয়েছিস, তার ঠিক নেই। কী হবে ও ছাই দিয়ে?'

মন্দিরা বলল, 'তারপর?'

ইন্দিরা সংক্ষেপে সারতে চায় ব্যাপারটা! অবহেলার সুরে বলল, 'তারপর আর কি? বাবা বললেন, এদের নিমন্ত্রণ করেছে কে? ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে ছাপানো চিঠি তার বুক পকেট থেকে বার করল। কে দিয়েছে, কে জানে। যত সব ভুতুড়ে কাণ্ড। বাবা বললেন, 'তোমার কাকাকে বোলো ওসব নেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা সাহিত্য বুঝিনে সঙ্গীতও বুঝিনে। তবে তুমি এসেছ খুশি হয়েছি। খেয়ে যাও। এই ব্যাচেই বসে যাও। দেখ গিয়ে জায়গা আছে। ছেলেটি অবশ্য খায়নি। কেউ কি খায়? সব ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেছে। বালাই গেছে। তুই ওসব নিয়ে কিছু ভাবিসনে। লক্ষ্মী বোনটি আমার।'

ইন্দিরার কথা শেষ হল না। তার আগেই ছন্দা-নন্দার দল ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে এল, 'দিদি, বর এসেছে। শাঁখটা কোথায়? শাঁখটা?'

একটু বাদেই হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনির মধ্যে বরের শুভাগমন আরো উচ্চ-রবে ঘোষিত হল।

বিয়ের আসরে কনেকে কীভাবে নেওয়া হবে তা নিয়ে একটু মতদ্বৈধ দেখা গেল। কেউ কেউ বললেন, 'মেয়ে নিজেই হেঁটে যাক। আজকাল তো আর ছোট মেয়ের বিয়ে হয় না। সেই আগেকার দিন তো আর নেই। বড় মেয়েকে এভাবে পিঁড়িতে করে ঘোরানো দৃষ্টিকটু।'

কিন্তু অন্দর মহল থেকে আপত্তি উঠল। এ বাড়িতে নিয়ম নেই মেয়ে হেঁটে গিয়ে নিজেই বরের চারপাশে ঘুরবে। মেয়েকে তুলে নিতেই হবে। কেন, সমর্থ জোয়ান ছেলেদের কি অভাব? তারা ক'জন মিলে ধরতে পারবে না পিঁড়িখানা? কি রকম কবজীর জোর তাদের? কয়েক মিনিটের জন্যে একটি মেয়ের ভার বইতে পারবে না?

মৃদুকণ্ঠে মন্দিরা বলল, 'আমি হেঁটেই যাব।'

ইন্দিরা বলল, 'কেন, হাঁটবি কেন? যা নিয়ম নেই তা কেন করতে যাবি?'

সুরজিৎ কাছেই ছিল, হেসে বলল, 'দেখছ কি টুকু, নিয়মনিষ্ঠায় তোমার দিদি এখন দিদিমা-সমানা হয়েছেন। কিচ্ছু ভেব না। ভার বওয়া আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। আমি একাই তোমার বাহন হতে পারব।'

মন্দিরার খুড়তুতো ভাইয়ের স্ত্রী অমলা ঠাট্টা করে বলল, 'আপনার তো সবই মুখে মুখে ভাই। কোন কাজে তো এখন পর্যন্ত হাত লাগাতে দেখলাম না। আর সেই সন্ধ্যে থেকে কেবল মেয়ে মহলের কাছ দিয়েই ঘোরাঘুরি—'

সুরজিৎ জবাব দিল, 'কী করব বলুন। হিন্দু বিয়েটাই তো আসলে মেয়ে মহলের ব্যাপার। আমার যা কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা তাতে দেখেছি বিয়ের পোনে ষোল আনাই স্ত্রী-আচার। সবই আপনাদের হাতে। পুরুষের সমাজ থেকে একজন বর আর একজন পুরোহিতকে শুধু দয়া করে আপনারা নিয়েছেন।'

শালাজ বলল, 'শুধু মুখের মিষ্টি কথায় হবে না। যান, এবার আস্তিন গুটিয়ে শ্যালিকার পিঁড়িখানা ধরুন গিয়ে।'

জামাইকে অবশ্য পিঁড়ি ধরতে হল না। তার শ্যালকেরাই এগিয়ে এল। ব্যাপারটা মোটেই স্বস্তিকর নয়। তবু সচিত্র পিঁড়িতে বসে খুড়তুতো দুই ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে মন্দিরা বিবাহসভায় যাত্রা করল।

আকাশের মেঘ কেটে যাওয়ায় বড় সামিয়ানার নিচে উঠোনেই বিবাহ-আসর বসানো হয়েছে। উজ্জ্বল আলোয় সারা বাড়ি ঝলমল করছে। জন পঞ্চাশেক বরযাত্রীর মধ্যে দুজন জার্মান যুবক আছে। কে একজন ইংরেজীতে তাঁদের সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। পুরোহিতের মন্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে তার কিছু কিছু কানে যেতে লাগল মন্দিরার। একজন ক্যামেরাম্যান ঘন ঘন ফটো তুলছেন। ইনিও কি ওই জার্মান ভদ্রলোকদের সঙ্গে এসেছেন? মন্দিরার বিয়ের আসরের এই ছবিগুলি কি কোন বিদেশের কাগজে ছাপা হবে? ভাবতে মন্দ লাগছে না মন্দিরার। সব মিলিয়ে এখন যেন ভালোই লাগছে। এত আলো লোকজন সানাইয়ের সুর, পুরোহিতের কণ্ঠে সংস্কৃত মন্ত্র, সম্প্রদানকর্তার আসনে বড় জ্যেঠামশাই, জ্ঞাতি সম্পর্কে দাদা হন বাবার। গরদের ধুতি চাদর তাঁর পরনে, গলায় শ্বেত উপবীত, সৌম্য প্রশান্ত প্রসন্ন তাঁর মুখ। তিনি নিজেই এক প্রীতিকর পবিত্র পরিবেশ হয়ে উঠেছেন। এতদিনের সেই বিতৃষ্ণা বিদ্বেষ এখন অন্তর্হিত। খানিকটা কৌতূহল খানিকটা আত্মসমর্পণের ভাব নিয়ে মন্দিরা এখন অপেক্ষা করছে। এই উৎসবের আসর তাকে ভবিষ্যতের কোন কক্ষপথে পৌঁছে দেবে কে জানে। যেখানেই দিক, মন্দিরার পথ ঠিক হয়ে গেছে। এখন শান্ত পায়ে শুধু অনুগমন। আর ছটফট করে লাভ নেই। মন্দিরার মন এতদিনের অন্তর্দ্বন্দ্বের পর পরম স্বাভাবিকভাবেই এখন যেন সব কিছু মেনে নেওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে। অতীতের সব কথা ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতের কোন কল্পনাকে মনের মধ্যে পোষণ না করে উৎসবমুখর এই বর্তমান মুহূর্তটিকেই একান্তভাবে আশ্রয় করে থাকতে চাইছে।

তোমাকে মিত্রের চোখে দেখছি।

পিঁড়িতে করে বরের চারপাশে কনেকে সাতবার ঘোরানো হল। তারপর

বরের সামনে উঁচু করে ধরা হল তাকে। পিছনে পুরোহিত মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন :

অক্ষ্যৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্জনম্
অন্তঃ কৃণুষ্ব মাং হৃদি মন ইন্নৌ সহাসতি॥

—আমাদের উভয়ের নয়ন মধুময় হোক, আমাদের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি প্রীতির অঞ্জন পরুক, আমাকে অন্তরে গ্রহণ করো, আমাদের উভয়ের হৃদয় ও মন এক হোক।

মন্দিরা মুখ নিচু করে ছিল। কিন্তু সবাই বলতে লাগল, 'চোখ তুলে তাকাও, চোখ তুলে তাকাও। ভালো করে দেখ। লজ্জা কি, দেখ, দেখ, এই সময় দেখতে হয়।'

বর আর কনের মাথার ওপর আচ্ছাদন। শুধু দুজন দুজনকে দেখবে। পরস্পরের সেই প্রথম সলজ্জ শুভদৃষ্টি বাইরের আর কেউ দেখতে পারবে না।

সবাইর অনুরোধে মন্দিরা চোখ তুলে তাকাল। মাত্র পলকের জন্যে। কিন্তু সেই একটি পলকেই বুঝতে পারল, যাকে সে এতদিন ধরে দেখেছে তার সঙ্গে এই সদ্যঃদৃষ্ট মুখের কোন তুলনাই হয় না। যদিও মাথায় উচ্চচূড় মুকুট, যদিও মুখখানি চন্দনচর্চিত, তবুও বড়ই কালো আর প্রায় গোলাকার। পুরু ঠোঁট, চ্যাপটা নাক। চোখদুটি সুন্দর নয়। সেই মুখের কাছে এই মুখ?

কিন্তু ছি ছি ছি, সে স্মৃতি এখন কেন? সেই তুলনার কি এখন আর কোন মানে হয়? তা ছাড়া বাইরে সুন্দর হলেই তো মানুষের সবখানি সুন্দর হয় না। সুন্দর যে হয় না তা মন্দিরার চেয়ে কে আর বেশি জানে? তিনি অনেক বই আর একটি সেতার পাঠিয়েছিলেন। কেন, কী দরকার ছিল? কেই বা নিমন্ত্রণ করেছিল তাঁকে? মন্দিরা করেনি। সে অত বোকা নয়, সম্মান-বোধহীনা নয়। তবে কে এমন অপকর্ম করল? ছন্দাই কি? মজা দেখবার জন্যে সেই কি গোপনে গোপনে আর একখানি চিঠি পোস্ট করে এসেছে? প্রথম চিঠিখানা মন্দিরা আর কাউকে না জানিয়ে পোস্ট করতে বলেছিল। দ্বিতীয় চিঠির বেলায় ছন্দা হয়তো দিদির ওপর টেক্কা দিয়েছে। কিন্তু চিঠি পেয়েই তিনি উপহার পাঠালেন কোন সাহসে? কোন লজ্জায়? বাবা সেগুলি ফেরত দিয়ে ভালোই করেছেন। মন্দিরা নিজে হলেও ফেরত পাঠাত।

দুদিকে দুপক্ষের পুরোহিত। বরাসনে বর। সামনে সিঁদুরের পুত্তলী আঁকা জলঘট, আম্রপল্লবে শোভিত। মন্দিরার মন্ত্রপূত হাতখানি জেঠামশাই আর একখানি হাতে তুলে দিলেন। মন্দিরা সেই অপরিচিত হাতের স্পর্শ অনুভব করল। স্বল্প অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করল হাতখানা কালো, রোগা, আর নরম। তবু সেই হাতের উপর মন্দিরার হাতখানা কেন যেন একটু কেঁপে উঠল। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন—

বরেণ্যস্ত্বং বৃণে ত্বাদ্য বৃণে চিত্তং বৃণে মনঃ।
বৃণে সৌমনসং হার্দিম্ আত্মানং হ্যাত্মনা বৃণে॥

জ্যেঠামশাইর সবই অদ্ভুত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শ্লোকগুলির বাংলা বলে দিচ্ছেন—তুমি বরণীয়, তোমাকে আজ বরণ করি। তোমার মনকে বরণ করি, তোমার প্রীতি ও তোমার হৃদয়কে বরণ করি, আমার আত্মা দিয়ে তোমার আত্মাকে বরণ করি।

যদন্তরং তদ্ বাহ্যং যদ্ বাহ্যং তদন্তরম্
অসৌ মে স্মরতাদিতি প্রিয়ো মে স্মরতাদিতি॥

—যা অন্তরে আছে তা বাইরে প্রকাশ হোক, যা বাইরে প্রকাশ হয়েছে তা অন্তরের বস্তু হোক। ইনি আমাকে স্মরণ করুন, ইনি আমার প্রিয় বলেই আমাকে প্রীতিপূর্বক স্মরণ করুন।

স্ত্রী-আচারের জন্যে বর-কনেকে ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে। চিকনপাটির ওপর স্বামীর পাশে বসে মন্দিরা অনন্যমনা হতে চেষ্টা করল। অন্য কোন কথা ভেবে এখন আর লাভ নেই। অন্য কারো কথা ভাবা এখন পাপ।

দিদি-বউদিরা সবাই মিলে বরকে কীভাবে নাস্তানাবুদ করে তুলছে মন্দিরা সকৌতুকে তাই বরং আড়চোখে একটু তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করল।

কত খেলাই যে আছে। আজকালকার মেয়েরা এসব খেলা জানে না। বিশেষ পছন্দও করে না। কিন্তু মায়ের ছোট মাসিমা, মন্দিরার রাঙাঠানদি কোন খেলা বাদ দিতে চাইলেন না। তাঁর পাকা চুলে সিঁদুর। মুখের কথা-গুলি রসে টসটস করছে।

রাঙাঠানদি বললেন, 'ভাই বর, এসব খেলা তো আজকালকার মেয়েরা খেলে না। তারা সব নতুন খেলা খেলে। এসো দুজনে মিলে একটু সেকেলে খেলা খেলা যাক। আমি তো সেকেলে মানুষ। ভাবগতিক দেখে তোমাকেও খুব একেলে বলে মনে হচ্ছে না।'

বর বলল, 'কেন বলুন তো?'

ঠানদি বললেন, 'চুলের অমন কদমছাঁট কেন ভাই? আমার নাতনী কিন্তু অমন ছাঁট পছন্দ করে না।'

'বেশ তো এখন থেকে বাবরি রাখলেই হবে।'

ঘরসুদ্ধ মেয়েরা হেসে উঠল।

মন্দিরা ভাবল, 'রসবোধ আছে। ঠাট্টা-তামাসার জবাব দিতে তো জানে।'

রাঙাঠানদি সহজে ছাড়লেন না। মুঠি মুঠি সরু চাল মন্দিরার হাতে দিয়ে বললেন, 'বরের গায়ে ছুঁড়ে মার। আহা, অত আস্তে আস্তে নয়। জোরে খুব জোরে। লাগবে না লো, লাগবে না। ভাবিসনে তুই। এ তো কেবল চাল। তুই পাথরের কুচি ছুঁড়লেও আমার নাতজামাইর কাছে তা পুষ্পবৃষ্টি মনে হবে।'

তারপর ঠানদির হুকুমে পাটির ওপরে ছড়িয়ে পড়া চালগুলি সব কুড়িয়ে বরকে ফের কনের মুঠি ভরে দিতে হল। কনে আবার ছড়াল, বর আবার কুড়োল, বারবার তিনবার।

মন্দিরা দেখল ভদ্রলোক আপত্তি করছেন না। রাঙাঠানদির মুখের কথা যেন শাস্ত্রবাক্য। সবই নির্বিবাদে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিচ্ছেন।

ঠানদি বললেন, 'প্রথম পরীক্ষায় পাশ করলে। এ হল ধৈর্যের পরীক্ষা। কোন পুরুষ কেমন মেজাজের মানুষ হবে তা আমরা এই বাসরঘরে প্রথম রাত্রেই টের পাই।'

আরো অনেক পরীক্ষা করলেন ঠানদি। এক হাঁড়ি জলের মধ্যে ঘূর্ণি-স্রোতের সৃষ্টি করে দুটি কুটো তার মধ্যে ভাসিয়ে দিলেন। বরকে বললেন, 'ওদের এক করে দাও।'

বর বলল, 'ভাববেন না, ভাসতে ভাসতে ওরা আপনিই মিশে যাবে।'

ঠানদি বললেন, 'তাই কি হয় ভাই। নিজেরও হাত লাগাতে হয়। শুধু স্বভাবের ওপর ছেড়ে দিলে চলে না।'

যতক্ষণ সেই কুটো দুটো অঙ্গে অঙ্গে মিশে না গেল ততক্ষণ বরকে সেই হাঁড়িতে ধরা সমুদ্রের দিকে স্থিরনেত্র হয়ে থাকতে হল। এমনি বার বার তিনবার।

তারপর দীপের খেলা শুরু করলেন রাঙাঠানদি। হেসে বললেন, 'এসো ভাই বর, এতক্ষণ জল নিয়ে খেলেছি, এবার এসো একটু আগুন নিয়ে খেলি। জীবনভোর এই দুই খেলাই তো খেলতে হবে। একবার জলের খেলা আর একবার আগুনের খেলা। কেমন খেলোয়াড় তুমি, তার একটু নমুনা দেখাও।'

ঠানদি এবার দুটি চিত্রিত সরার মধ্যে একটি পিতলের জ্বলন্ত প্রদীপ রাখলেন। তারপর ওপরের সরাটি সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'দেখেছ? ওই হল পরিবার। ঘরের বউ। পরিবারকে কি বেআব্রু করে রাখবে? তা কি কোন পুরুষে করে? ঢাকো ঢাকো, আব্রু দাও।'

সরাটি একবার পাশে একবার পিছনে, একবার ঘরের কোণে আর একবার আঁচলের তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে রাখতে লাগলেন ঠানদি। বরের কাজ হল সেই আবরণ খুঁজে বার করা। ঠানদি সরা বার বার সরান, আর বর বার বার তা কুড়িয়ে এনে দ্বিতীয় সরার মুখে বসিয়ে দেয়।

ধৈর্যের পরীক্ষায় এবারও বর বিজয়ী।

রাঙাঠানদি বললেন, 'সাবাস। জীবনভোর এই করবে। বউকে ঢেকে রাখবে। তার কোন দোষ বাইরে ছড়াতে দেবে না। মনে রেখো বর, সতীর নিন্দেয় সব চেয়ে বড় অপযশ হল পতির। পুরুষের দুর্নামে স্ত্রীর কিছু হয় না। কিন্তু স্ত্রীর দুর্নামে পুরুষের দুকান কাটা যায়। এই সরার ওপর হাত রেখে তিনবার প্রতিজ্ঞা করো ভাই বর—আমি আমার বউয়ের সব দোষ

ঢাকব, সব দোষ ঢাকব, সব দোষ ঢাকব। হ্যাঁ তিনবার। তিনবার না হলে মন্তর-তন্তর ফলে না।'

শুনতে শুনতে মন্দিরার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। এ কি খেলা শুরু করলেন রাঙাঠানদি। অবশ্য এ খেলা উনি দিদির বেলাতেও খেলেছিলেন। রাঙাঠানদি হয়তো কিছু জানেনও না। কোনরকম কিছু না ভেবেই তিনি এসব পুরোন স্ত্রী-আচার পালন করে যাচ্ছেন। তবু মন্দিরার মন থেকে অস্বস্তি দূর হচ্ছে না।

বর হেসে বলল, 'যেভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিচ্ছেন তাতে মনে হয় আপনার নাতনীর দোষের পরিমাণ কিছু বেশি।'

রাঙাঠানদি তাঁর পাকা মাথা নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, 'মোটেই না। আমার নাতনীটি একেবারে খাঁটি সোনা। সবটুকুই গুণ। তোমার নিজের যদি চেনার ক্ষমতা না থাকে তুমি জহুরী দিয়ে যাচাই করে নিতে পারো ভাই। আমার নাতনীর কোন দোষ নেই। মেয়েদের কোন দোষ নেই। যত নষ্টের গোড়া তোমরা পুরুষ মানুষরা।'

ইন্দিরা বলল, 'তোমার বুড়ো জহুরীর কাছ থেকে তুমি বোধহয় এসব শিখেছ ঠানদি। সবাই কি এরকম নাকি?'

রাঙাঠানদি বললেন, 'বুড়ো বলিসনে দিদি, বুড়ো বলিস নে। মনে বড়ো দাগা লাগে। চুল পাকলেই কি মানুষ বুড়ো হয়? মুখ শুকিয়ে আমসি হলেই কি মানুষ বুড়ো হয়? মুখের ভিতরের জিভখানা কিরকম তাই তোরা একবার দেখ।'

ইন্দিরা বলল, 'দেখেছি ঠানদি। জিভ তো নয় একেবারে জিভেগজা।'

রাঙাঠানদি খুশি হয়ে বললেন, 'তবে? তবে যে বুড়ী বুড়ী করছিলি? আচ্ছা ভাই বর, তোমাকেই সাক্ষী মানি, 'ঘরের মধ্যে তো এতগুলি মেয়ে গিজ গিজ করছে, কত বেশবাসের বাহার, কত রঙ কত ঢং—এখানে সব চেয়ে সেরা সুন্দরী কাকে তোমার মনে হচ্ছে বল তো?'

বর হেসে বললে, 'আপনাকে।'

রাঙাঠানদি সঙ্গে সঙ্গে তার চিবুকে হাত দিলেন, 'বাঃ। বেঁচে থাকো দাদা, বেঁচে থাকো। এই তো চাই। আর আমার কি মনে হচ্ছে জান? এমন সুপুরুষ আমি আর জন্মে দেখিনি। বুঝলি মন্দিরা, দেখাদেখির রীতিই হল এই। তুই বলবি, তোমার মত মানুষ হয় না, আর আমার নাতজামাই বলবে তোমার মত মেয়ে হয় না। তবেই তো রাজযোটক হবে।'

রাঙাঠানদির খেলা শেষ হল তো এল গানের আবদার। বাসরঘরে গান না হলে চলে নাকি? কিন্তু সবাইর মুখেই কেবল না না না। গান জানে অনেকেই। কিন্তু সবাইর সামনে গাইতে কেউ রাজী নয়। গানের নাম শুনে মেয়েরা একটি দুটি করে পালাতে লাগল। ইন্দিরা মীনাক্ষীকে ধরে ফেলল, 'তোমার

বন্ধুর বিয়ে, তুমি একখানা গান না গাইলে কিছুতেই ছাড়ব না।'

মীনাক্ষী মিনতি করে বলল, 'গান আমি জানিনে ইন্দুদি।'

ছন্দা বলে উঠল, 'না না, জানে। আমরা শুনেছি।'

মীনাক্ষী বিনয় করে বলল, 'সে ঠিক সবাইকে শোনাবার মত নয়।'

রাঙাঠানদি বললেন, 'শোন কথা। এখানে সবাই আবার কোথায়। পুরুষ তো এখানে একজনই। তোমার সইয়ের বর।'

শেষ পর্যন্ত গান গাইতেই হল মীনাক্ষীকে। হারমনিয়ম বাজাতে জানে না। খালি গলায় গায়। গলাটি মিষ্টি। যেটুকু পটুত্ব আছে তা বিনা শিক্ষার।

একটু ভেবে মীনাক্ষী গান ধরল—'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে...'

গানের সবাই প্রশংসা করল। বেশ গেয়েছে মীনাক্ষী।

শুধু সুরজিৎ ঘরের বাইরে থেকে বলল, 'এর পর বোধহয় রামমোহন রায়ের—মনে করো শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। বাসরঘরে কোথায় মীনাক্ষী দু-একটি রাগ-সঙ্গীত অনুরাগ-সঙ্গীত গাইবে, তা তো নয়, একেবারে আধ্যাত্মিকতায় চলে গেলে!'

মন্দিরা ভাবল এ গানটি কি মীনাক্ষী তাকে লক্ষ্য করে তার জন্যেই গাইল? গানের ভিতর দিয়ে এ কি মিনুর সেই চিরাচরিত উপদেশ আর পথ নির্দেশের ধারা?

কিন্তু পথ তো মন্দিরার ঠিক হয়েই গেছে।

ঠিক হয়ে গেছে। তবু বাসরঘরে একজন অপরিচিত—অপরিচিত না হোক অল্পপরিচিত পুরুষের সান্নিধ্যে মন্দিরা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। আর কোন উপায় নেই। আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। মুখ বুজে মেনে নিতে নিতে মন্দিরা সবই মেনে নিয়েছে। আসতে আসতে এই বাসরঘর পর্যন্ত এসেছে। এখন এই ঘরই তার পৃথিবী। বাইরের কারো কথাই আর মনে রাখলে চলবে না। সব যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে হবে। ভালো লাগুক আর না লাগুক, ইচ্ছা করুক আর না করুক, তার জীবন মিহির মুখুজ্যে নামে এই মানুষটির সঙ্গে গাঁথা হয়ে রইল। সে এই মানুষটির স্ত্রী। এই এখন মন্দিরার একটি মাত্র পরিচয়। জীবনভোর এই পরিচয়কেই মনে করে রাখতে হবে, এই পরিচয়কেই সার্থক করে তুলতে হবে। সেই তার জীবনের একমাত্র কাজ। ভালো লাগুক আর না লাগুক এই হবে একমাত্র কর্তব্য। মীনাক্ষী বলে 'কর্তব্য যে সব সময়েই প্রীতিকর হবে তার কোন মানে নেই।'

কিন্তু মন্দিরার ভয়, কোন সময়েই যদি প্রীতিকর না হয়। তাহলে তো এক শুকনো কর্তব্যের বোঝা সারাজীবনই তাকে বয়ে বেড়াতে হবে।

ঘরে এখন তীব্রদ্যুতির বিদ্যুৎ বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাইরের আলোগুলিও এখন জ্বলছে না। এই শেষরাতে উৎসবমুখর বাড়িটি সত্যিই যেন এবার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। যারা যাবার তারা চলে গেছে। যারা যেতে

পারেনি তারা যে যেখানে পেরেছে ঘুমোবার জায়গা করে নিয়েছে। মন্দিরা লক্ষ্য করল তাদের এই ঘরখানি কিন্তু একেবারে নিষ্প্রদীপ হয়নি। এক কোণে পিতলের পিলসুজের ওপর ঘিয়ের দীপ জ্বলছে। বাসরঘরের মঙ্গলদীপ। এ দীপ নেভাতে নেই। এ দীপটি সারারাত জ্বালিয়ে রাখতে হবে। সারাজীবন জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

মেঝেয় বিছানা পেতে শুতে হয়। উঁচু খাটে শোয়ার নিয়ম নেই আজ। বিছানার এক ধার ঘেঁষে পড়ে রইল মন্দিরা। যে অবগুণ্ঠন তাকে পরানো হয়েছিল তা খুলল না। এই গুণ্ঠন আজ তাকে সারা পৃথিবী থেকে আড়াল করুক। পরম নিভৃতির মধ্যে তাকে প্রচ্ছন্ন করে রাখুক। কিন্তু এই শেষ রাতেও পাশের ভদ্রলোকের কৌতূহল শেষ হয়নি। ঠানদির সঙ্গে অত রসালাপের পরেও আলাপের তৃষ্ণা মেটেনি।

তিনি মন্দিরার একটু কাছে সরে এসে বললেন, 'ঘুম পেয়েছে বুঝি? ক্লান্তি লাগছে, না?'

দ্বিতীয়বারের প্রশ্নের মন্দিরা সংক্ষেপে জবাব দিল 'হুঁ!'

ভদ্রলোক সহানুভূতির স্বরে বললেন, 'ক্লান্তির আর দোষ কি। সারাদিন ধরে আচারের যা অত্যাচার চলে। হয়তো স্নেহের অত্যাচার। আমার কোন কোন বন্ধু একেবারে কালাপাহাড়। কিচ্ছু মানে না। তারা রেজিস্ট্রি ম্যারেজের পক্ষপাতী। বাকি আচার-অনুষ্ঠান তাদের পক্ষে সময় নষ্ট আর অর্থ নষ্ট। এই স্পীডের যুগে এমন সব অতিকায় মহোৎসবের সময় কই মানুষের। তারা নেহাৎ মিথ্যে বলে না।'

ভদ্রলোক একটু থামলেন। হয়তো মন্দিরার কাছ থেকে কিছু একটু মন্তব্য শোনার জন্যে প্রতীক্ষা করলেন। যাই হোক, কিছু অন্তত বলা নিশ্চয়ই ভদ্রতা। কিন্তু মন্দিরা কী যে বলবে কিছুই ভেবে পেল না। মীনাক্ষী হলে হয়তো পারত। যে কোন সময় যে কোন রকমের তত্ত্বে তর্কে আলোচনায় তার অপার উৎসাহ। কিন্তু মন্দিরার ভিতর থেকে সামান্য একটা কথা বলবার আগ্রহটুকুও এমন করে কেড়ে নিল কে?

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'তারা মিথ্যে বলে না! কিন্তু আমার যেন কেমন বড়ো মায়া হয়। তাদের মত আমি সব ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারিনে। তারা এইসব প্রথা আচার, রিচুয়ালের মধ্যে কোন সৌন্দর্যই দেখতে পায় না, আমি পাই। তারা বলে আসলে এ আমার গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা। পৈতৃক প্রভাব। তারা মাঝে মাঝে আমাকে ঠাট্টা করে বলে টালিগঞ্জের আনোয়ার শা রোডে দুজন মুকুন্দ মুখুজ্যে আছেন। একজন সিনিয়র মুকুন্দ আর একজন জুনিয়র মুকুন্দ। মুকুন্দলাল মুখোপাধ্যায় আমার বাবার নাম। জানো বোধহয়?'

জানবে না কেন, জানে। শ্বশুরের নাম মন্দিরা অনেকবারই শুনেছে। কিন্তু জানান দিল না। তাহলে অনেক কথা বলতে হয়। আলাপে যোগ দিতে

হয়। বাসরঘরে এ ধরনের আলাপ কেউ করে কিনা মন্দিরার জানা নেই। অন্তত সে কারো কাছে কখনো শোনেনি। মন্দিরার যতদূর ধারণা বাসরঘর এ ধরনের তত্ত্ব আলোচনার জায়গা নয়। কিন্তু মন্দিরার বেলায় সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটবে বলে কপালে লেখা আছে। ভদ্রলোক বিয়ের আগে তাকে নিজে দেখতে আসেনি। বাপ-মার দেখাকেই পাকা দেখা বলে মেনে নিয়েছেন। আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে তিনি নাকি বলেছেন, 'একদিন মেয়ে দেখে আমি আর কতটুকু দেখব? কয়েক মিনিটের আলাপে আমি আর কতটুকু বুঝব? কয়েক বছর ধরে কোর্টশিপ যদি হতো তাহলে আমার যাওয়ার একটা মানে ছিল। তার চেয়ে না দেখার রোমান্স, প্রথম দৃষ্টিতেই শুভদৃষ্টির রোমান্স আমার কাছে বড়।'

কিন্তু ভদ্রলোক এখন যেসব কথা বলছেন তাতে ওঁকে তো খুব রোমাণ্টিক বলে মনে হচ্ছে না। বরং মন্দিরার কেন যেন মনে হল, নিজে দেখতে শুনতে ভালো নয় বলেই তিনি আর বেশি যাচাই বাছাইয়ের মধ্যে যাননি। কে জানে, নিজের দীনতাই তাঁকে হয়তো এতখানি উদার করেছে।

ভদ্রলোক তাঁর স্বগতোক্তি শেষ করলেন, 'কিন্তু আমার বন্ধুরা ভুল করে। দেখতে-টেকতে অনেকটা একই রকম হলেও আমি আমার বাবার অবিকল প্রোটোটাইপ নই। আমি তাঁর চেয়ে আলাদা। আমি নির্বিচারে গ্রহণ করিনে। বিচার করে গ্রহণ করি। আর দরকার হলে বর্জন করতেও জানি।' তিনি একটু থামলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু তোমার বোধহয় ঘুম পাচ্ছে। তুমি ঘুমোও। আর তোমাকে ডিস্টার্ব করব না।'

ভদ্রলোক পাশ ফিরলেন। আর আশ্চর্য, ওঁর যেন সাধা ঘুম। খানিক-ক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়লেন। আর মন্দিরা এতক্ষণ ঘুমের ভান করে পড়ে ছিল। তার শাস্তি হিসেবে বোধহয় তার আর সত্যিকারের ঘুম এল না। এ-পাশ ফিরে ও-পাশ ফিরে অনেক চেষ্টা করল। কিছুতেই ঘুম এল না। মন্দিরা একবার ভাবল উঠে গিয়ে ঠাণ্ডা জলে মুখহাত ধুয়ে আসে। কিন্তু উঠতে সাহস হল না। যদি ওঁর ঘুম ভেঙে যায়, ঘুম ভাঙবার পর যদি টের পান মন্দিরা ঘুমায়নি, জেগেই আছে—সে আর-এক বিপদ হবে। তার চেয়ে বাকি রাতটুকু এইভাবে কাত হয়ে পড়ে থাকা ভালো। রাত্রি আর কতটুকুই বা আছে। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

কিন্তু কাটতে যেন আর চায় না। ভারি অসহ্য মনে হতে লাগল মন্দিরার। মনে হল এই নিঃসঙ্গ বিনিদ্র রজনীর যেন আর শেষ নেই। এ বাড়িতে সবাই যেন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। শুধু তারই চোখের ঘুম চলে গেল। পৃথিবীতে সবাইরই সঙ্গী আছে, শুধু তারই কোন সঙ্গী রইল না।

হঠাৎ কিসের এক অবর্ণনীয় অহেতুক যন্ত্রণায় মন্দিরার বুক ভেঙে কান্না এল।

কাঁদা উচিত নয়। দেয়ালের কাছে পিলসুজের ওপর মঙ্গলদীপ জ্বলছে। মন্দিরার ঠাকুরদার আমলের এই দীপ। এই মঙ্গলদীপ ঠাকুরদা-ঠাকুরমার ঘরে, বাবা-মার ঘরে জ্বলেছে, পিসীদের, দিদির বাসরশয্যা স্নিগ্ধ পবিত্র আলোয় ভরে দিয়েছে; কিন্তু তার বেলায় এমন হল কেন? তার বেলায় দীপটাকে এমন উদ্ভট রাক্ষসের চোখের মত দেখাচ্ছে কেন? পিলসুজের নিচেই বরণডালা। কত সুন্দর করে আলপনা দিয়েছেন মা, কত সুন্দর করে সাজিয়েছেন। পঞ্চ শস্য, পঞ্চ পুতুল, পঞ্চ মধু, পঞ্চ প্রদীপের মাঙ্গলিক।

তবু চোখের জল কেন? এও কি মঙ্গলচিহ্ন? এও কি শান্তিবারি? না কি অশান্তির বন্যার সূচনা?

মন্দিরা সভয়ে চোখ বুজল।

॥ ৫ ॥

বিয়ের পরদিন বাসি বিয়ে। বাসি বকুলের মত আচারে অনুষ্ঠানে এই অনুবিবাহও কম মধুর নয়। সারাদিন প্রহরে প্রহরে সে গত রাত্রির মৃদু গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে চলল।

কাল শেষ রাত্রির দিকে মন্দিরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে উঠে দেখে তার আগেই রোদ উঠেছে। মিহির পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তাকে কিছু না জানিয়ে মন্দিরা আস্তে আস্তে উঠে আসছিল, আঁচলে টান পড়ল। চমকে পিছন ফিরে তাকাল। না, সদ্যপরিচিত স্বামী প্রগল্‌ভতা করেনি। তার চাদরের খুঁটের সঙ্গে মন্দিরার আঁচলের খুঁট বিবাহ-বিধিতে বাঁধা হয়ে রয়েছে।

চাদরে টান লাগায় মিহিরও পাশ ফিরল। হেসে বলল, 'দাঁড়াও খুলে দিচ্ছি। কাল মন্ত্র পড়েছিলাম, 'বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ং চ তে। এ বোধ হয় সেই বন্ধন।'

কিন্তু খুলে দিলেই কি বেরোবার উপায় আছে। ছন্দা নন্দারা আরো একদল মাসতুতো পিসতুতো বোনদের জুটিয়ে এনে দোর আগলে রেখেছে। নতুন জামাইবাবু টাকা না দিলে তারা দোর ছাড়বে না, শয্যা তুলবে না, নব দম্পতিকে বিছানা ছাড়তে দেবে না।

মিহির বলল, 'কথায় কথায় টাকা কেন। তোমরা ফুল চাইবে, মালা চাইবে। চাও তো মাথার মুকুটটাও দিয়ে দিচ্ছি। টাকা দিয়ে কী করবে?'

ছন্দা তার মাসতুতো বোনের দিকে চেয়ে বলল, 'কী চালাক দেখেছিস মলি? বলে কিনা টাকা দিয়ে কী করবে। টাকা ছাড়া যেন কিছু করা যায়। ও সব ফুলদূর্বা বেলপাতা দিদিকে দেবেন। আমাদের টাকা দিন। শয্যা-

তুলে নিতে একশ টাকা চাই-ই চাই। আমরা এখানে দশজন আছি। বেশি চাইনি আপনার কাছে।'

মিহির বলল, 'ওরে বাবা, একশ! অত টাকা কোথায় পাব? আমি গরীব মানুষ। দশ টাকা দিচ্ছি।'

ছন্দা বলল, 'গরীব নয়, আপনি কৃপণ। হাড়কিপটে। আপনি মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। কত বড় চাকরি করেন। খনির ভিতর থেকে টাকা তুলে তুলে আনেন। আপনার অগাধ টাকা। তার থেকে মাত্র একশটি টাকা আমাদের দিন।'

মলি বলল, 'আপনি কম দিলে আপনার প্রেস্টিজও মাটি—আমাদের প্রেস্টিজও মাটি।'

ছন্দা বলল, 'আমরা দশজন আর আপনারা দুজন। এই বারোজনের মুখ চেয়ে আমাদের ফিস্টের জন্যে—'

শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ টাকায় রফা হল। খুব যে খুশি হয়ে মিহির টাকাটা দিল তা মন্দিরার মনে হল না। ছন্দারা অত বাড়াবাড়ি না করলেই পারত।

কুশণ্ডিকা কাল রাত্রেই শেষ হয়েছে। মন্দিরা বড়দের আলোচনা করতে শুনেছে। অল্পবয়সী মেয়েদের বেলায় পরদিন যজ্ঞ করবার বিধান ছিল। এখন বড় হয়ে মেয়েদের বিয়ে হয়। তাই ওসব অনুষ্ঠান বিয়ের রাত্রে মিটিয়ে ফেলাই ভালো। এই বড় হওয়ার মধ্যে যে নিহিত অর্থটুকু আছে সেটুকুও জানে মন্দিরা। সে যে বড় হয়েছে তা ওঁরা কখনো স্বীকার করেন কখনো করেন না।

দ্বিপ্রহরে যৌথ স্নান। প্রশস্ত উঠোনের এক ধারে চারদিকে চারটি কলাগাছের চারা রোপণ করে স্নানকুঞ্জ রচনা করা হয়েছে। মাঝখানে আধ-হাতখানেক চওড়া আর ইঞ্চি কয়েক গভীর একটি পুকুর। বৃহৎ সরোবরের প্রতীক। যৌবনসরসীও হতে পারে। সেই পুকুর জলে ভরতি। দলবলের সঙ্গে বাসরঘরের সেই রাঙাঠানদি এখানেও আছেন। তিনি বললেন, 'কী ভাই বর, কূলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছ? ঝাঁপ দাও গো, ঝাঁপ দাও।'

মিহির বলল, 'এই পুকুরে?'

রাঙাঠানদি বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, ওই পুকুরে। দেখতে অতটুকু হলে কী হবে, ঝাঁপ দিয়ে দেখ, ঠাঁই পাবে না। ঝাঁপ দিলেই দেখবে পুকুর তো নয় সমুদ্র। তার তলও নেই কূলও নেই। কেমন বীর, কেমন সাঁতরাতে জানো তুমি তখন দেখা যাবে। সাঁতার যদি না জানো ভাই, তাহলে কেবল হাবুডুবু খাবে, আর ঢোকে ঢোকে নোনা জল গিলবে।'

মিহির বলল, 'তাহলে তো বড়ো চিন্তার কথা রাঙাঠানদি।'

'চিন্তার কিছু নেই ভাই, চিন্তার কিছু নেই। ঝাঁপ দাও, হাত পা ছুঁড়তে শুরু করো, সাঁতার আপনিই শিখবে। জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার। বইতে পড়নি?'

আধ হাত পুকুরের পাড়ে পাশাপাশি দুখানি পিঁড়ি। পুবমুখী হয়ে স্বামীর বাঁ পাশে বসল মন্দিরা। মাথার ওপরে সূর্যের এখন মার্তণ্ড মূর্তি।

ঠানদি সহজে ছেড়ে দিলেন না। এখানেও আচার অনুষ্ঠান মন্ত্রতন্ত্র কম নেই। সংস্কৃতে মন্ত্র পড়ান পুরোহিত আর প্রাকৃত বাংলায় মন্ত্র পড়ান ঠাকুরমা-দিদিমা কি তাঁদের উত্তরসাধিকা মা-মাসীমারা।

পুকুরপাড়ে আংটি হারানো আংটি অন্বেষণের খেলা। মন্দিরার হাতের আংটিটি খুলে নিয়ে রাঙাঠানদি সেই প্রতীকী পুকুরের জল-কাদার তলায় গুঁজে রাখলেন। তারপর মিহিরের দিকে চেয়ে বললেন, 'ভাই, আংটি বার করো।'

মিহির বলল, 'আমি তো লুকোইনি যে বার করব। আপনি লুকিয়ে রেখেছেন আপনিই বার করুন।'

ঠানদি বললেন, 'উঁহু, তা শাস্ত্রের নিয়ম নয়। আমরা ঢেকে রাখব, তোমরা খুলে ধরবে।'

মিহির বলল, 'কাল যে অন্য কথা বলছিলেন। আমাকেই নাকি ঢাকতে হবে।'

ঠানদি বললেন, 'কী রকম পণ্ডিত তুমি ভাই। এত পাশ পরীক্ষা দিয়েও এই বুদ্ধিটুকু হয়নি? শাস্ত্রের বিধি একেক জায়গায় একেক রকম। একেক সময় একেক রকম। দিনে এক রকম, রাতে আর-এক রকম। সন্ধ্যা রাতে এক রকম শেষরাতে আর-এক রকম। কিন্তু রাতের কথা এই দিনদুপুরে বলে কী হবে। আজ আর কপালে রাত নেই ভাই। রাত আসবে সেই কাল। সারা-দিনমান রোদে পুড়ে তবে শুভরাত্রি। নাও, হাত উঁচু করে বসে থেকো না। বউয়ের আংটি খুঁজে দাও।'

'আমাকেই খুঁজতে হবে?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তোমার বউয়ের আংটি, তুমি খুঁজবে না কি ওপাড়ার ছটকে ফটকেকে ডেকে আনব? কাল রাত্রে ঢাকবার কথা বলেছি, দোষ ঢাকবে। আজ বার করার কথা বলছি, গুণ বার করবে। সোনা গয়না হারালে খুঁজে দেবে, হৃদয় মন হারালে খুঁজে দেবে। সব খোঁজার পালা তোমার ভাই। তুমি যে বর, তুমি যে বড়ো।'

ইন্দ্রাণী কোথায় ছিলেন, পিছনে এসে দাঁড়ালেন, অনুনয়ের সুরে বললেন, 'মাসীমা, এবার ওদের ছেড়ে দিন। এই রোদের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে ওদের। তার-পর সারাদিন না খাওয়া গেছে—'

ঠানদি হেসে বললেন, 'ঈস, নতুন শাশুড়ীর কী মায়া। ভয় নেই, আর বেশি আটকে রাখব না তোর জামাইকে। আর জামাই দুদিন ধরে না খেয়ে আছে কে তোকে বলল। হয়তো কাল দুপুরে আচ্ছা করে মুরগীর মাংস আর ভাত খেয়েছে। তারপর রুমালে মুখ মুছে দিব্যি বিয়ের পিঁড়িতে বসে

বেদমন্ত্র আওড়াচ্ছে। পেট একটু টিপলেই হাতে ঠেকবে, কী বলো মুখুজ্যে মশাই, টিপে দেখব নাকি একটু?'

মিহির হেসে বলল, 'ছি ছি ছি, আপনি ব্রাহ্মণকন্যা হয়ে একথা বলছেন?'

ঠানদি বললেন, 'নবীন ব্রাহ্মণরা কী করে না করে, কী মানে না মানে আমরা ব্রাহ্মণকন্যারা সব টের পাই। পুরুষ হয়ে জন্মেছ ভাই, তোমরা দেবতার জাত, রাজার জাত। শাস্ত্রও তোমাদের হাতে, আবার তা ভাঙবার অস্ত্রও তোমাদের হাতে। মরি আমরা।'

মন্দিরার মনে রাঙাঠানদির কথাটি প্রতিধ্বনিত হল, 'মরি আমরা।'

ঠানদি তিনবার তার আঙুল থেকে আংটি নিয়ে সেই ছোট পুকুরের মধ্যে লুকোলেন। আর তিনবার মিহির তা খুঁজে বার করল, তিনবার পরিয়ে দিল মন্দিরার অনামিকায়। কিন্তু নিতান্তই যেন শুকনো আচার। নিতান্তই যেন যন্ত্রের মত কাজ করে যাচ্ছে বরের পিঁড়িতে বসা ওই পুরুষপ্রবরটি। তার স্পর্শে মন্দিরার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে না তো। বরং আর একদিনের আর একটি আংটি পরানোর স্মৃতি মনে পড়ছে। সে আংটি মন্ত্রপূত নয়, আচারে মার্জিত নয়। অনাচারের আংটি। সন্ধ্যাবেলায় লেকের ধারে হীরের আংটি একজন তাকে জোর করে পরিয়ে দিয়েছিল।

মন্দিরা বলেছিল, 'না, ওসব নয়। আপনি ফুল দিন বই দিন সব নেব। কিন্তু আপনার কাছ থেকে আংটি নেব না।'

'আমি ফুলও দেব, বইও দেব, আবার হীরেও দেব, মুক্তোও দেব। কেন, তোমার হাতে আংটিটি তো চমৎকার মানিয়েছে।'

মন্দিরার সেই আংটি-পরা হাতখানা তাঁর উত্তপ্ত মুঠির মধ্যে যেন গলতে শুরু করেছিল। আংটি খুলে নেওয়ার সাধ্য ছিল না মন্দিরার, হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার সাধ্য ছিল না।

'কিন্তু আমি কী করে পরব? কী করে বাড়ি নিয়ে যাব?'

'কেন, বাড়িতে কি গয়না পরো না?'

'পরি। কিন্তু মা আমার সব গয়নাই চেনেন। তিনিই তো সঙ্গে করে কিনে দেন। এই অচেনা আংটি হাতে দেখলে—'

'বেশ তো না দেখিয়ে পরো।'

'গয়না কি না দেখিয়ে পরবার জন্যে?'

'কিন্তু কোন কোন গয়না কি লুকিয়ে পরতে ভালো লাগে না? কোন কোন লুকোন সম্পর্কের মত? কদিন না হয় লুকিয়ে লুকিয়েই পরো। তারপর আর একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে এসে এই লেকের জলে ফেলে দিয়ে যেয়ো।'

মন্ত্রের মতই যেন অমোঘ সেই বাক্যশক্তি, যা দিনকে রাত করে দিয়েছিল, রাতকে দিন, যা ভালোমন্দ লাভ-লোকসানের কোন সীমাচিহ্নই রাখেনি।

রাঙাঠানদি বললেন, 'নাও, এবার জগন্নাথকে স্নান করাও। কলসী থেকে বরের মাথায় জল ঢালো তোমরা। আর দেরি করলে মাথা গরম হয়ে যাবে।'

শুকলাল এগিয়ে এল। কিন্তু ঠানদি তাকে তাড়া দিয়ে বললেন, 'তুই কেন? এখানে শালীরা আছে কী জন্যে? সখীরা আছে কী জন্যে?'

শুকলাল হেসে বলল, 'বাঃরে আমি যে কলাগাছ লাগালাম, পুকুর কাটলাম, এত কাজ করলাম, তখন ঠাকরুণরা কোথায় ছিলেন?'

ঠানদি এবার নিজেই এগিয়ে এলেন। বরের মাথায় এক ঘটি জল ঢাললেন, কনের মাথায় আর এক ঘটি। তাঁর হাত থেকে ঘটি নিয়ে মিহির অবশ্য নিজেই স্নান করতে লাগল। ঠানদি তার হাতখানা মন্দিরার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'আর এক অঙ্গ যে শুকনো রইল। ওই অঙ্গে ঢালো গো ওই অঙ্গে ঢালো। তবে তো সর্বাঙ্গ জুড়োবে।'

স্নানের পরে পংক্তি-ভোজন। ডাইনিং টেবিল সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তবু শুধু খাবার ঘরে কি এত লোক ধরে! মাঝের বড় ঘর আর বারান্দা জুড়ে আসন পড়েছে। মেয়েরা একদিকে বসেছে, ছেলেরা তাদের মুখোমুখি। সুরজিৎ আর মিহির দুই ভায়রাকে পাশাপাশি বসতে দেওয়া হয়েছে।

ইন্দ্রাণী আজ অন্নদা। জামাইদের সামনে প্রথম এনে ভাতের থালা রাখলেন তিনি। মাথায় আঁচল, মুখে লজ্জিত হাসি। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে ইন্দ্রাণীকে। যেন তিনিও আজ নববধূ।

দিদা আর রাঙাঠানদি দুই বৃদ্ধা সহোদরা দোরের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তরুণ-তরুণীদের এই ভোজসভার ওপর একটু স্নিগ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন তাঁরা।

দিদা বললেন, 'খাও, তোমরা খাও। রান্নাবান্না ভালো হয়েছে তো?'

সুরজিৎ বলল, 'অমৃত।'

দিদা বললেন, 'আহা, তাই হোক। অন্ন যেন তোমাদের অমৃতই হয়।'

রাঙাঠানদি বললেন, 'ও কী, বর আর কনেকে তোমরা অত দূরে দূরে বসিয়েছ কেন? পাশাপাশি বসতে দিলেই পারতে।'

ইন্দিরা বলল, 'মুখোমুখি বসতে দিয়েছি ঠানদি। খারাপ হয়েছে কি?'

রাঙাঠানদি বললেন, 'না না, বেশ হয়েছে। বারবার চোখাচোখি হবে। অবিশ্যি লুকিয়ে লুকিয়ে। তোরা কিন্তু ওদের দিকে তাকাসনে। লজ্জা পাবি।'

মন্দিরা সামনাসামনি বসেছিল। কিন্তু মুখ নিচু করে ভাতের থালে আলপনা কাটছিল। তেমন করে খাচ্ছিলও না, তাকাচ্ছিলও না কোনদিকে। দু একবার তাকিয়ে দেখেছে, তার বর দিদির বরের চেয়েও দেখতে খারাপ। মন্দিরার আশঙ্কা হল, ঘরে যতগুলি পুরুষ ছেলে রয়েছে সবাইর চেয়েই বুঝি দেখতে খারাপ। যৌবনের দীপ্তি সবাইর চেয়েই বুঝি কম। বাবা

তাহলে কী দেখে পছন্দ করলেন? শুধু বিদ্যা দেখে? বিনয় দেখে? পণ-যৌতুক নেবে না—সেই সাধুসংকল্পের কথা শুনে? চেহারার দিকেও কি একটু তাকাতে নেই? কিন্তু ছি ছি, এসব কী ভাবছে মন্দিরা? রূপ যে কত অসার, কত কপট, কত ছলনাময় তা কি মন্দিরা জানে না? তা কি সে নিজের চোখেই দেখেনি? তবু পোড়াছাই কেন সেই রূপের জন্যেই এত আকুলি-বিকুলি? 'ভগবান আমার দুটি চোখ অন্ধ করে দাও। আমি রূপও দেখতে চাইনে, কুরূপও দেখতে চাইনে।'

বেলা চারটে বাজতে না বাজতেই বিদায়ের পালা শুরু হল। লরী ভরতি যৌতুকের পাহাড় আগেই আনোয়ার শা রোডের দিকে রওনা হয়েছে। কার্পণ্য করেননি যোগরঞ্জন। বড় মেয়েকে যেমন দিয়েছিলেন বরং মেজো মেয়েকে তার বেশিই দিয়েছেন। না দিলে কি মান থাকে? মিহিরের বাবার বোধহয় পণ শব্দটিকে বাড়ি খরচে অন্তরিত করে হাজার তিনেক নেবার ইচ্ছা ছিল। লোকজন তো তাঁকেও খাওয়াতে হবে। কিন্তু মিহিরের জন্যে পারেননি। মিহির নাকি শক্ত হয়ে বলেছে, 'তাহলে আমি এর মধ্যে নেই।'

শুধু পণ নয়, যৌতুকেও মিহিরের আপত্তি। সে নাকি বলেছিল, 'আমি শুধু কনেটিকে নেব, সচন্দন গন্ধপুষ্পটুকু নেব, সংস্কৃত মন্ত্রের ধ্বনিটুকু নেব। আর কিছুতে আমার বিশ্বাস নেই, আর কিছুতে আমার দরকারও নেই।'

সবই কানে গেছে মন্দিরার। স্বামীর উদারতার কথা, তার স্বমতে অবিচল থাকবার কথা—সবই শুনেছে মন্দিরা। বাবা বলেছেন, 'পৌরুষ? পৌরুষ কি মানুষের শুধু চেহারায়? পৌরুষ তার চিন্তায় কর্মে আচরণে।'

পৌরুষের আরো অনেক লক্ষণ, আরো অনেক প্রমাণ বাবা খুঁজে খুঁজে বার করেছেন। তার ছাত্রজীবনের কৃচ্ছ্রতার কথা, তার মিতাচার আর সংযমের প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করেছেন, স্ত্রীকে মেয়েদের শুনিয়েছেন। তিনি তাড়াহুড়ো করে মেয়েকে যার-তার হাতে ধরে দেননি। ডাক্তারের চোখে ছেলের স্বাস্থ্য তিনি মোটামুটি দেখে নিয়েছেন। ওর শরীরের গড়ন একটু রোগাটে হলে কী হবে, যোগরঞ্জনের যা অভিজ্ঞতা, তিনি দেখে যতটা বুঝেছেন, তাতে ওর দেহে কোন রোগ-ব্যাধি নেই। পূর্ণবয়স্ক যুবকের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য আর শক্তিসামর্থ্য ওর আছে। আর সবচেয়ে সুস্থ ওর মন। তিনি ওর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা আলাপ করে বুঝতে পেরেছেন। সুস্থ মনই দেহকে সুস্থ রাখতে পারে।

নতুন জামাইকে কেউ তো খারাপ বলছে না। সবাই বলছে, 'বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে।' তবে কি মন্দিরারই চোখের দোষ? তার কি এখনো শুভদৃষ্টি হয়নি?

মিহির শুধু গন্ধটুকু চাইলে কি হবে, ধীরে ধীরে গন্ধমাদন এসে জুড়ে

বসেছে। কান টানলে মাথা আসে। আচার অনুষ্ঠান কোনটিই বাদ যাবার উপায় নেই। পান থেকে চূণ খসলে দোষ।

তবু লরি বোঝাই আলমারি, ড্রেসিং টেবল, রাইটিং টেবল, সোফাসেট, সিউইং মেসিন, রেডিও সেট দেখে মিহির বলল, 'এ সব কেন? এসব তো আমি চাইনি। এ সব তো নেওয়ার কথা ছিল না।'

শ্বশুরকে নতুন জামাইয়ের এই প্রথম সম্ভাষণ। প্রায় নাটকীয় উক্তি। নাটকীয় আচরণ। গুরুজনদের অনেকেই অবাক হলেন, কেউ কেউ বা একটু অস্বস্তিই বোধ করলেন।

কিন্তু যোগরঞ্জন সামনে এগিয়ে এলেন, স্মিতমুখে বললেন, 'তুমি চাওনি, আমি দিচ্ছি। আমি আমার মেয়েকে দিচ্ছি। আমরা যে দেওয়ার জন্যেই এসেছি তা এই মেয়েকে দিতে এসে টের পাই মিহির। আমাদের কন্যা দানের জন্যে, আমাদের বিদ্যা দানের জন্যে, আমাদের যার মধ্যে যতটুকু কল্যাণশক্তি আছে সব দানের জন্যে। না দিলে না দিতে পারলে আমরা যে কিছুই পাব না মিহির। আমাদের দিতে দিতে পেতে হবে।'

গাড়িতে উঠবার আগে গুরুজনদের সবাইকে প্রণাম সেরে মন্দিরা এসে যখন বাবার পায়ের ধুলো নিল, তিনি মেয়ের মাথাটি নিজের বুকের ওপর চেপে ধরলেন, ধানদুর্বার বদলে দু বিন্দু অশ্রু আশীর্বাদ হয়ে ঝরে পড়ল।

যোগরঞ্জন ধরা গলায় বললেন, 'মা, আমি তোর শত্রু নই। আমি যা করেছি, তোর ভালোর জন্যেই করেছি। তুই সুখে থাকবি বলেই করেছি। যে যাই বলুক, একা একা কখনো সুখী হওয়া যায় না; শুধু দুজনে মিললেই সুখী হওয়া যায় না। দশজনকে নিয়ে সুখী হতে হয়।'

মন্দিরা জলভরা চোখে বলল, 'বাবা, আমার ওপর তোমার আর কোন রাগ নেই তো?'

যোগরঞ্জন একথার কোন জবাব না দিয়ে মেয়ের মাথায় আস্তে আস্তে আর একটু হাত বুলিয়ে দিলেন।

গোত্রান্তর তো নয় যেন গ্রহান্তর, লোকান্তর জন্মান্তরের মত। যেতে কষ্ট, যেতে দিতে কষ্ট। আড়ালে দাঁড়িয়ে মা কাঁদছেন, সঙ্গে সঙ্গে বোনেরা। তবু তো এখান থেকে ওখানে। বেদিয়াডাঙা থেকে আনোয়ার শা রোড। কতটুকুই বা পথ, গাড়িতে কতটুকু সময়ই বা লাগে। তবু মন্দিরার মনে হল এই বিচ্ছেদের ক্ষণটিই একটি চরম ক্ষণ। এই যে সে আলাদা হয়ে গেল, বাপের বাড়ির সঙ্গে আর সে এসে আগের মত সংযুক্ত হতে পারবে না। দিদি যেমন বেড়াতে আসে তাকেও তেমনি অতিথি হয়ে আসতে হবে। এই বাড়ির সঙ্গে আগের মত সম্পর্ক তার আর থাকবে না। দাবিও থাকবে না। এক গৃহ থেকে আর এক গৃহ। সব অচেনা অপরিচিত লোকজন। তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ পাতাতে হবে। আর এক বাড়ির [illegible], আদব-

কায়দায় রুচিতে বিশ্বাসে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। পারবে কি মন্দিরা? সবাই পারে। মা পেরেছে, দিদি পেরেছে। কিন্তু তাই একমাত্র ভরসার কথা নয়। স্কুলে কলেজে মীনাক্ষী যে সব পরীক্ষা অনায়াসে দিতে বসেছে, অবলীলায় পাশ করেছে, তার পাশাপাশি সীটে বসে সেই প্রশ্নের সেই উত্তর লিখতে গিয়ে মন্দিরার ঘাম ছুটেছে। প্রশ্ন একই। কিন্তু উত্তর নিজের হাতে লিখতে হবে, অনেক সময় নিজের ভাষায়। মুখস্থ করে আর কতটুকু চালানো যায়। মীনাক্ষী সকালেই চলে গেছে। আর একটু কাল থাকতে পারত। থাকেনি। কাজ আছে বলে বিদায় নিয়েছে। কাজের মধ্যে তো পড়া। হয়তো গিয়েই পড়তে বসেছে। যা পড়ুয়া মেয়ে একটি। এখন যদি সুযোগ সুবিধা পায় মন্দিরা আবার পড়বে। এখন তার অনুতাপ হচ্ছে। আর কিছু না করে আর কিছু না দেখে মন্দিরা শুধু যদি বই নিয়ে থাকত তাহলে আর এ দশা হতো না। পড়তে তো তার ভালোই লাগে, শুধু পরীক্ষা দিতে গেলেই অস্বস্তি। পরীক্ষা দিতে বসলেই যত ভয় আশঙ্কা চিত্তদৌর্বল্য। যেখানে যাচ্ছে সেখানে গিয়ে আবার কী পরীক্ষা দিতে হবে কে জানে। এখন পর্যন্ত সবই আনসিন পেপার। অদৃষ্টপত্র।

'বউদি, কী ভাবছেন বলুন তো?'

দাদার মাথার মুকুটটি ধরে মন্দিরার পাশেই যে বসে আছে সে তার দেওর। ষোল সতের বছরের ছেলে। শ্যামবর্ণ ছিপছিপে চেহারা। ঠোঁটে গোঁফের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মন্দিরা ওর নাম শুনেছে—তপন। এ বংশের সবাইরই কি সূর্যের নামে নাম? তপনের পাশে একটু গম্ভীর হয়ে বসে আছে তার দাদা—আর-এক আদিত্য।

ড্রাইভারের পাশে বসে যাচ্ছে শিশির। মন্দিরার খুড়তুতো ভাই। সেও বিদ্যার্থী। কলেজে পড়ে। ছন্দা-নন্দাদেরও আসবার কথা ছিল। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত মাকে ছেড়ে এল না।

মন্দিরার চিন্তাস্রোতে হঠাৎ একটি ধ্বনিরূপের ফুল যেন স্থির হয়ে দাঁড়াল। বউদি। কানে নতুন গয়নার মত লাগল নতুন সম্বোধনটি।

মন্দিরা তার দিকে মুখ ফেরাল; একটু হেসে বলল, 'কী আবার ভাবব।'

তপন বলল, 'কী জানি কী ভাবছেন। সেই থেকে আপনারা দুজন ভেবেই চলেছেন। দাদা তো গম্ভীরই, আপনিও গম্ভীরা।'

মন্দিরা হেসে বলল, 'গম্ভীরা? সে তো মালদহের গান।'

তপন বলল, 'যাক, তবু একটু হাসলেন।'

'তুমি কি আমাকে হাসাবে বলেই পণ করে বসে আছ?'

'আমি তো ভাবছিলাম আপনি হাসবেন না বলেই পণ করে বসেছেন।'

মিহির ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'তুই বড্ড বাচাল হয়েছিস তপু।'

তপন বলল, 'দাদা, এই ক'টা দিন আর ধমক-টমক দিয়ো না। তোমার হলুদ সুতো বাঁধা হাতে দর্পণ। গায়ে বিয়ের উড়ুনি, পাশে নতুন বউদি। এখন তোমার মুখে ধমক মানায় কি? বউদি, আপনাকে কিন্তু এর আগে আমি আরো দেখেছি। সেইজন্যেই তো এত চেনা চেনা মনে হচ্ছিল।'

মন্দিরার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে উঠল। একমুহূর্ত চুপ করে থেকে মুখে আরো একটু হাসি টেনে বলল, 'কোথায় দেখেছ? তুমি তো বাবা-মার সঙ্গে দেখতে আসনি। তোমরা কেউ তখন আসনি।'

তপন বলল, 'না না, আপনাদের এই বোদিয়াডাঙার বাড়িতে নয়। অন্য জায়গায়—'

মিহির আবার ধমক দিল, 'তপু, তুই বড্ড বক বক করতে শিখেছিস।'

দাদার ধমক খেয়ে তপন এবার সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল। এবার তার মুখবন্ধ। আর কোন বাচালতা নেই।

মন্দিরা নিজের বুকের মধ্যে আবার সেই গুরুগুরু শব্দ শুনতে পেল। কোথায় দেখেছে? কোথায়? লেকে? গঙ্গার ধারে? না কি পার্ক স্ট্রীটের কোন রেস্টুরেণ্টে, থিয়েটারে সিনেমায়? কোথায় দেখেছে? কই, তপনকে তো কোথাও দেখেছে বলে মন্দিরার মনে পড়ছে না। দেখলে নিশ্চয়ই মন্দিরাকে একা দেখেনি। কোন একজনের সঙ্গেই দেখেছে। কবে? কোথায়? তাহলে কি এরা সব জানে? কতটুকু জানে? শুধু কি তপন? নাকি তপনের দাদাও কিছু টের পেয়েছে? যেভাবে ধমক দিয়ে ভাইকে থামিয়ে দিল তাতে কি তাই মনে হয় না? বাসর ঘরে যেসব বক্তৃতা দিয়েছে তা কি এইজন্যে? সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে মিহির যেভাবে শক্ত কাঠ হয়ে ছিল, তার কারণ কি এই! বাবার কাছ থেকে যৌতুক নিতে চায়নি, সব কিছুকেই বাহুল্য মনে করেছে তার মূলেও কি—। না না, তাহলে কি আর এত কাণ্ড হতে পারত? তাহলে কি আর বিয়ে হতো?

তবু এক অনিশ্চয়তা, অজ্ঞাত আশঙ্কা আর ভয় মন্দিরার সমস্ত মন জুড়ে রইল। তপন তারপর আরো কত কথা বলল, তার কলেজের কথা ক্লাবের কথা—মন্দিরার ভালো করে যেন কানেই গেল না। হাঁ, না করে জবাব দিয়ে চলল। উল্টোপাল্টা জবাব দিয়ে বসল কি না কে জানে। সেও তো আর এক বিপদের কথা।

ট্যাক্সি এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে পুলিসের নিষেধের হাত দেখে থামছে, ট্রাফিক লাইটের রক্তচক্ষু দেখে থমকে দাঁড়াচ্ছে, আবার ছুটছে। কিন্তু কোন্ পথে যে যাচ্ছে, সে খেয়াল নেই মন্দিরার। সে তখন পিছনের অনেক দিনের অনেকগুলি পথরেখা তন্ন তন্ন করে দেখছে। কোথায় তপন তাকে দেখে থাকতে পারে।

কতক্ষণ বাদে, খেয়াল নেই মন্দিরার, ট্যাক্সিখানা এবার সত্যিই এসে

দাঁড়াল। সামনে একটি ছোট দোতলা বাড়ি। অনেক লোকজন। ফের হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি।

তপন বলল, 'দাদা, তোমার রাজমুকুট পরো এবার। বউদি, নামুন, আমরা এসে গেছি।'

॥ ৬ ॥

এ বাড়িতে উঠান নেই। লম্বা সরু চোঙার মত বাড়ি। সিন্দুকের মত এক একখানা ঘর। ছোট ছোট জানলা দরজা। জাফরিকাটা জানলা এখনো কয়েকটা রয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় কোন মুসলমান ভদ্রলোক এ-বাড়ির প্রথম মালিক ছিলেন। পরে তা হিন্দু ব্রাহ্মণের হাতে এসেছে।

একতলার বড় ঘরখানার মধ্যে বধূ বরণের ব্যবস্থা। একজন মাঝবয়সী মহিলা—মন্দিরা বুঝতে পারল না কে—মামীশাশুড়ী না মাসীশাশুড়ী, জ্যেঠশাশুড়ী কি খুড়শাশুড়ী কেউ একজন হবেন তার হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন। শাশুড়ী আর মাসীশাশুড়ী এলেন তারপর। মন্দিরা ওঁদের একবার দেখেছে। তাই চিনতে পারল। ওঁদের একজন মন্দিরার মাথার ঘোমটাটা আর একটু নামিয়ে দিলেন, সেই সঙ্গে মাথার মুকুটখানাও একটু ঠিক করে দিলেন। আর সেই মোটাসোটা মহিলা—মন্দিরা বুঝতে পারল ইনিই সাক্ষাৎ শাশুড়ী—এনে দিলেন মাঝারি আকারের জলভরা একটি পিতলের কলসী। পূর্ণকুম্ভটি বউয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'নাও এটি কাঁখে রাখো।'

রোগা কালো মত আর একটি কুমারী মেয়ে মাছের থালুই হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, 'বউদিকে একটা কিছু বলে ডাকো মা। হয় বউমা বলো, না হয় মন্দিরা বলো। নাও এবার মাছের থালুইটা হাতে তুলে দাও। আমি দিলে তো হবে না। তোমাকেই দিতে হবে। দুটো কই মাছ আবার লাফালাফি করছে। লাফিয়ে পড়লে মহাভারত অশুদ্ধ।'

তপন বলল, 'নেকড়ায় বেঁধে দিলিনে কেন দিদি? নিয়ে আসবো নেকড়া?'

'না, আর বাঁধাবাঁধি করতে হবে না।' তিনি হাত থেকে মাছের থালুইটি নিয়ে মন্দিরার হাতে দিলেন। তারপর বললেন, 'নাও, এবার ওই দুধের পাথরের ওপর গিয়ে দাঁড়াও।'

বড়, কালো কুচকুচে একখানি পাথরের থালায় এক পাথর দুধ। মন্দিরা একটু দ্বিধার সঙ্গে সেদিকে এগিয়ে গেল। পাথর কি তার সারা দেহের ভার সইবে?

মিহির বলল, 'দুধের পাত্রই তো বেশ ভালো ছিল মা। আবার একটা অড্ লুকিং মাছের থালুই কেন দিলে?'

মনোরমা বললেন, 'যা নিয়ম তাই করতে হয় বাপু। শুধু কোনটা তুমি ভালো দেখ, কোনটা মন্দ দেখ, তাই নিয়েই তো আর জগৎ চলে না।'

বোন বলল, 'অড্ লুকিং অড্ লুকিং কোরো না দাদা, মাছও একটা মঙ্গলচিহ্ন তা জানো? অমনিতে তো মাছ ছাড়া একবেলাও খাওয়া হয় না দেখি।'

মিহির একটু হেসে পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার বোন বিশাখা। অপভ্রংশে বিশি। বাংলায় এম-এ পড়ছে। সম্পর্কে ননদিনী রায়বাঘিনী।'

বিশাখা বলল, 'ঈস, মোটেই তা নয়। আজকালকার ননদরা আর সে ননদ নেই। সেই জটিলা কুটিলারা আজকাল অষ্টসখী ললিতা বিশাখাদের দলে এসে ভিড়েছে। এখনকার বউদিরা তা জানে।'

মন্দিরা ভাবল, তবু সমবয়সী একটি মেয়েকে পাওয়া গেল। কিন্তু তার মনে হচ্ছে বিশাখাকে সে যেন কোথায় দেখেছে! প্রথম দর্শনে বিশাখারও কি তাই মনে হয়েছিল? তাই একটু গম্ভীর দেখাচ্ছিল মুখ? কিন্তু মেয়ে কিনা তাই ভারি চালাক। সঙ্গে সঙ্গেই তপনের মত বলে বসেনি, 'বউদি তোমাকে অমুক জায়গায় দেখেছি।'

নাকি এসব শুধু মন্দিরারই মনের ভয়? মূলহীন আশঙ্কা? কে জানত, এক বুক ভয় নিয়ে তাকে শ্বশুরবাড়িতে এসে দাঁড়াতে হবে।

অন্যমনস্কভাবে দুধের পাথরের মধ্যে দাঁড়াতে গিয়ে কানায় পা দিয়ে খানিকটা দুধ মেঝেয় ফেলে দিল মন্দিরা।

শাশুড়ী বললেন, 'ভালো হয়ে দাঁড়াও।' তিনি হাত ধরে বউকে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

দুধের পর মধু। ছোট একটি বাটিতে করে তরল মধু এনে বউয়ের মুখে ছুঁইয়ে দিলেন মনোরমা। দুই কানে ছোঁয়ালেন, দুই নয়নে ছোঁয়ালেন।

বউ যা বলবে তা মধু হবে, যা শুনবে তা মধু হবে, যা দেখবে তা মধুর হবে।

মন্দিরার মনে পড়ল এই মধু খেতে গিয়ে কী বিপত্তিই না সেবার হয়েছিল। আজও গন্ধটা তার ভালো লাগে না।

মিহির বলল, 'কোন মন্ত্রতন্ত্র নেই মা? একেবারে নিঃশব্দে কাজ সারছ?'

মনোরমা বললেন, 'মন্তর আবার কিসের?'

মন্দিরা ভাবল, ভদ্রমহিলা কি একটু রূঢ়ভাষিণী? না কি কোন কারণে মনে মনে চটে আছেন? ওঁকেও তো মা বলে ডাকতে হবে মন্দিরার। কিন্তু না আকারে না প্রকারে, তার নিজের মায়ের সঙ্গে কিছুরই মিল নেই। কিন্তু ভদ্রমহিলার চটবার কি কারণ থাকতে পারে! মন্দিরার বাবার দেওয়া যৌতুক-

যৌতুক কি পছন্দ হয়নি? না কি মন্দিরাকেই অপছন্দ হয়েছে? কিন্তু সেই প্রথম দিন তো ওঁরা নিজেরাই গিয়ে পছন্দ করে এসেছেন। পছন্দ না করলে তো বেঁচে যেত মন্দিরা।

বিশাখা বলল, 'মা, তোমার মুখে একটু মধু ছোঁয়াবে না বউদি?'

মনোরমা চটে উঠে বললেন, 'যত সব অনাসৃষ্টি কথা। তোদের ভাই বোনের তো কেবল সব তাতেই ঠাট্টা। কিছুই যদি তোরা মানিসনে আমাকে দিয়ে এসব করাচ্ছিসই বা কেন? রেজিস্ট্রি-মেজিস্ট্রি করলেই পারতিস!'

মিহির বলল, 'বিশিকে আর তা শিখিয়ে দিতে হবে না মা। ও তাই করবে। শুধু আমার বেলাতেই তোমরা আদ্যোপান্ত পুরোহিত দর্পণ ফলো করলে।'

মধুদানের পর বউ আর ছেলেকে নিয়ে শীতল পাটির ওপর বসালেন মনোরমা। দু হাতে দুটি পানের পাতা নিয়ে বরণ করলেন। তারপর সেই দুটি পান বউয়ের দুটি গালে সাদরে চেপে ধরলেন। এখানে আবার সেই স্ত্রী-আচারের পালা শুরু হল। সেই চাল খেলা, সরায় ঢাকা দীপের খেলা। একটু কমফেরে সবই আছে। কিন্তু আসর মাতিয়ে রাখতে পারেন রাঙাঠানদির মত তেমন কেউ নেই। শুধু সেই মাসীশাশুড়ী আর দুজন ভদ্রমহিলা বিধি অনুযায়ী স্ত্রী-আচার করে যাচ্ছেন।

আচারের পালা একটু বাদেই শেষ হল। তারপর আশীর্বাদ।

মনোরমা প্রথমে সোনা-বাঁধানো লোহার চুড়ি দিয়ে বউকে আশীর্বাদ করলেন।

মন্দিরা তাঁকে প্রণাম করল।

তারপর পিসিশাশুড়ী মামীশাশুড়ী খুড়শাশুড়ী। মিহিরের সম্পর্কিত এক বউদি এসেও আশীর্বাদ করলেন। সবাই কিছু না কিছু গয়না দিলেন। তবে সবই ছোট আর কম ওজনের। কেউ বা কানের ফুল, কেউ বা হাতের আংটি। সরু সরু দুগাছা হারও পেল মন্দিরা। কিন্তু বাবার কাছ থেকে সে অনেক পেয়েছে। এসব তার না পেলেও চলবে। মন্দিরার মনে হল উৎসবের ঘটাটা এ-বাড়িতে যেন কিছু কম। কার নির্দেশে কে জানে? তার শ্বশুর নগদ টাকা নেননি বলেই কি বাড়ির খরচ কমিয়ে দিয়েছেন? ভদ্রলোককে দেখতে অবশ্য একটু কৃপণ কৃপণ, গেঁয়ো গেঁয়ো মনে হয়েছিল মন্দিরার।

শ্বশুরের গলা, তাঁর হাঁকডাক হইচই মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছিল মন্দিরা। লরী থেকে যৌতুকের জিনিসপত্রগুলি লোকজনের সাহায্যে তিনিই নামাচ্ছেন। ফার্নিচারগুলির কোনটা কোন ঘরে থাকবে সব বলে বলে দিচ্ছেন। এক ঘরে তো আর সব ধরবে না। ঘরগুলি সব ছোট ছোট। চারখানা ঘরের মধ্যে সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে।

বিশাখা একসময় হেসে বলল, 'বাবা খুব প্র্যাকটিক্যাল। আর, সব কাজে

উৎসাহ। দেখলে মনে হবে না এত বয়েস হয়েছে।'

মন্দিরা জিজ্ঞাসা করল, 'কত হবে বয়েস?'

'ষাটের কাছাকাছি। মনে হয় দেখলে?'

'না।'

'খুব পরিশ্রম করেন। রিটায়ার করবার পরেও বসে নেই। জমি বাড়ি বেচাকেনার কাজ নিয়ে আছেন। এ-বাড়ি যে ওঁর খুব পছন্দ তা নয়। সস্তায় পেয়ে গেলেন তাই কিনলেন। কিনেও ফেলে রেখেছেন। কোন রকমে বসবাসের যোগ্য করে নিয়েছেন। আসলে এমন পাড়ায় এমন বাড়িতে থাকবার ইচ্ছে নেই বাবার। তিনি আরো ভালো জায়গায় ভালো বাড়ির সন্ধানে আছেন। পেলে কিনবেন। না হয়, তৈরি করবেন।'

পিতৃপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃপরিচয়ও কম দিল না বিশাখা। কালরাত্রি বলে মন্দিরাকে তার কাছেই শুতে হল। আজ রাত্রে বরবধূর দেখাসাক্ষৎ নিষেধ। বিয়ের পরদিন কালরাত্রি, তার পরদিন শুভরাত্রি।

বউদি সম্পর্কে কে একজন এসে একটু ঠাট্টা করে গেলেন, 'আজ ননদের কাছে একটু কষ্ট করে থাকো ভাই, তারপর কাল যথাস্থানে—'

ননদের সঙ্গে আলাপ করবার মত বেশ একটু নিরিবিলি ঘরই পেল মন্দিরা। দোতলার এই ঘরে আর কেউ শুতে আসেনি। জানলার ধার ঘেঁষে একটি সতেজ সবুজ ফলবান বিল্ববৃক্ষ বাড়ির শুচিতা রক্ষা করছে।

খাটের ওপর পাশাপাশি শুয়ে মন্দিরা চুপ করেই ছিল। কিন্তু বিশাখাই কথা বলে আর কথা বলিয়ে আলাপ জমিয়ে নিল।

'বউদি, আমি তোমার চেয়ে বয়সে দুতিন বছরের বড়ো। তুমি বড়ো সম্পর্কে। আমি তোমার তুমি, তুমি আমার তুমি। রাজী আছ তো?'

মন্দিরা বলল, 'বেশ তো।'

বিশাখা বলল, 'আমি তোমাকে বউদি বলে ডাকব, দয়া করে তুমি যেন আমাকে ঠাকুরঝি বোলো না। তুমি আমাকে নাম ধরে ডেকো। তবে বিশি টিশি না কিন্তু, পুরো নাম। বিশি বললে আমি কিন্তু অফেন্স নেব।'

মন্দিরা হেসে বলল, 'না না, তা কেন বলব? আমি তোমাকে বিশাখাদি বলে ডাকব, চাও তো ঠাকুরঝিও বলতে পারি।'

বিশাখা বলল, 'ও সব ঝি টি পুরোন হয়ে গেছে। আমরা অত সেকেলে নই। জানো এই বিশাখা নামটা আমার দাদার দেওয়া।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো না?'

'ভালোই তো।'

বিশাখা বলে চলল, 'শুধু নাম নয়, দাদা এ বাড়ির হাওয়াই বদলে দিয়েছে। এ নিয়ে বাবার সঙ্গে তার নিত্য বিবাদ। অবশ্য তুমি দেখলে বুঝতে পারবে না, কথায় বুঝতে পারবে না। দাদা তো বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে যায় না, ঝগড়া করে না। শুধু যা করবার তা করে।'

কাল রাত্রে মিহির যে সব কথা বলেছিল ফের মনে পড়ে গেল মন্দিরার। কিন্তু সে যেমন চুপ করে ছিল তেমনি চুপ করে রইল।

বিশাখা বলল, 'আমি যে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যেতে পেরেছি দাদা তার মূলে। বুঝতেই পারছ বাবা অনেকদিন আগে থেকেই পার করবার মতলবে ছিলেন।'

মন্দিরা বলল, 'তোমার বুঝি এত তাড়াতাড়ি পার হবার মতলব নেই?'

'নাঃ, এখনই তার কি। পাশটাশ করি, চাকরিবাকরি করি তারপর ওসব দেখা যাবে।'

মন্দিরা ভাবল, এ তো তারও বলবার কথা ছিল। এ কথা তো সেও বলেছিল কিন্তু বাবা কি শুনলেন?

বিশাখা বলল, 'ধীরে ধীরে দাদা অনেক ধারা বদলে দিয়েছেন, অনেক সংস্কার ভেঙে দিয়েছেন। অবশ্য বাইরে থেকে শুনলে মনে হবে এ আর এমন কি—। কিন্তু আমি তো জানি, এই অল্পস্বল্প পরিবর্তনের জন্যও দাদাকে কত বেগ পেতে হয়েছে। অথচ তার জন্যে বাবার সঙ্গে লাঠালাঠিও হয়নি, মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়নি। বাবা প্রথমে খুব চটে উঠেছেন, তারপর আস্তে আস্তে সব মেনে নিয়েছেন।'

বিশাখার মুখে তার দাদার মাহাত্ম্য নিঃশব্দে শুনে গেল মন্দিরা। ভাবল, দাদাকে ভক্তি করে বিশাখা, খুবই ভালো কথা। কিন্তু অত গুণগান করবার কী আছে। বিয়েতে ভদ্রলোক পণ নেননি, সে তো আজকাল অনেকেই নেয় না, তার জন্যে অত কেন।

মন্দিরা একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, 'একটা কথা বলব, কিছু ভাববে না তো বিশাখাদি?'

'না না, কী আবার ভাবব, বল না।'

'তোমার মা গোড়া থেকেই কেমন যেন একটু অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। কেন বল তো?'

বিশাখা বলল, 'প্রথমেই তোমাকে বলে দিই আমার মা কিন্তু তোমারও মা। জেঠিমা খুড়ীমা নন, মাসীমা পিসীমাও নন।'

'বিশাখাদি, শাশুড়ীকে যে মা বলে ডাকতে হয় তা আমি জানি।'

বিশাখা বলল, 'জানলেও অনেকে তা ডাকতে পারে না। আমার এক বন্ধুর গল্প তোমাকে বলি শোন। তারা ভালোবেসে বিয়ে করেছে। বিয়ের

আগে সুমিতা স্বামীকে বলত অসিতদা, আর তার মাকে বলত মাসীমা, বাবাকে মেসোমশাই। বিয়ের পরেও সে অভ্যেস যায়নি। তার নাকি শ্বশুরকে বাবা বলে ডাকতে লজ্জা করে, শাশুড়ীকে মা বলে ডাকতে লজ্জা করে। আর আড়ালে স্বামীকে এখনো অসিতদা বলেই ডাকে,—অসিতদা আমাকে অমুক কথা বলেছিল, অসিতদা তমুক কথা বলেছিল। আমরা এই নিয়ে ওকে খুব ঠাট্টা করি।'

বিশাখা হেসে উঠল, কিন্তু মন্দিরা হাসল না।

সে ফের সেই আগের কথায় ফিরে গেল, 'বিশাখাদি বললে না তো, মা কেন শুরু থেকেই এমন অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। আমার বাবার দেওয়া জিনিসপত্র কি তাঁর পছন্দ হয়নি?'

'ছিঃ তা কেন। তুমি কি ভাবো আমরা জিনিসপত্রের কাঙাল?'

'তবে? আমাকে কি তাঁর অপছন্দ হয়েছে?'

'তোমার কি মাথা খারাপ? এসো বউদি এবার ঘুমোন যাক। কত রাত হল। কাল সকাল থেকে আবার তোমাদের বউভাতের তোড়জোড় শুরু হবে। তোমার আর কি, তুমি তো সেজেগুজে দিব্যি বউরানী হয়ে বসে থাকবে। —এখন একটু ঘুমিয়ে নিই।'

কিন্তু মন্দিরা তাকে অত সহজে ছেড়ে দিল না। অনুনয় করে বলল, 'কারণটা না শুনে আমি কিছুতেই ঘুমোতে পারব না বিশাখাদি।'

বিশাখা তবু এড়াতে চেষ্টা করল, 'ব্যস্ত হচ্ছ কেন। আর একদিন শুনবে। তুমিও পালাচ্ছ না, আমিও পালাচ্ছিনে। আর একদিন শুনো, আর একদিন বলব তোমাকে।'

কিন্তু মন্দিরা নাছোড়বান্দা। অশুভ কিছু একটার সঙ্কেত সে পেয়েছে। তার যত ভয় তত কৌতূহল। কেঁচো খুঁড়তে যদি সাপ বেরোয় তো বেরোক। মন্দিরা সাপের সঙ্গেই বোঝাপড়া করবে। তবু না দেখা সাপের ফোঁসফোঁসানি শুনে সে দিনরাত দুরু দুরু বুকে থাকতে পারবে না। মন্দিরা যত ভয় পেল তত মরীয়া হয়ে উঠল। সর্বনাশের গহ্বরের মুখে ঝুঁকে পড়ে তার অন্ধকার তলদেশ দেখবার জন্যে মন্দিরার ঔৎসুক্যের যেন আর সীমা নেই।

'যা বলবার আজই বলো। তোমার পায়ে পড়ি বিশাখাদি, নইলে আমার একটুও ঘুম আসবে না।'

খুবই বিব্রত হল বিশাখা, বিরক্তও হল। তারপর একটি পরম রূঢ় বক্তব্যের ওপর কোমল শোভন আবরণ পরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ব্যাপারটা কিন্তু খুবই কনফিডেনসিয়াল। শুধু তোমার আর আমার মধ্যে থাকবে। আর কাউকে কিন্তু বলতে পারবে না।'

'বেশ।'

'এমন কি দাদাকেও না।'

'বেশ। কিন্তু তাঁর কাছে কি আমার কিছু গোপন করা উচিত? তবু তোমার জন্যে করব।'

'হ্যাঁ, আমার জন্যেই কোরো।'

'বলো এবার।'

বিশাখা আস্তে আস্তে খুব সতর্কভাবে প্রতিটি শব্দ বেছে বেছে বলতে লাগল, 'এইসব বিয়ে-থার ব্যাপারে কতরকম কত কুচক্রী মানুষ থাকে জানোই তো। তারা কিছুই গড়তে জানে না, শুধু ভাঙতেই তারা আনন্দ পায়। মাকেও এসে কে কে যেন কী সব বলেছিল। যত সব বাজে কথা।'

মন্দিরা একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। খানিক বাদে বলল, 'তারপর?'

'মা বললেন বাবাকে। তিনি খানিকক্ষণ চিন্তা-টিন্তা করে বললেন, 'তাহলে সব বন্ধ করে দেওয়া যাক। অন্য সম্বন্ধ দেখি। বাংলাদেশে তো আর মেয়ের অভাব নেই।'

মন্দিরা রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল, বলল, 'তারপর?'

'দাদা বলল, তা কিছুতেই হতে পারে না। আমি প্রথমে বিয়ে করতে চাইনি, তোমরা জোর জবরদস্তি করে কেঁদেকেটে এই কান্ড করেছ। পাকা দেখা হয়ে গেছে, সে ভদ্রলোক সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন, এখন তোমরা যা তা একটা অজুহাতে সম্বন্ধ ভেঙে দেবে তা হতে পারে না। অমন নিষ্ঠুর হতে আমি পারব না। বাবা বললেন, তাহলে বিয়ের তারিখ পিছিয়ে দিয়ে আরো ভালো করে খোঁজখবর নাও। দাদা বলল, তা হবে না। ওসব নোংরামির মধ্যে আমি নেই। যদি তেমন কিছু হয় সেই মেয়েই আমাদের জানাবে। আমরা নিজেরা জানতে যাব না।'

মন্দিরা অস্ফুট স্বরে বলল, 'তারপর?'

'তারপর আমি আর দাদা এক পক্ষে, বাবা আর মা এক পক্ষে। ঘরে খিল এঁটে খুব তর্কযুদ্ধ। শেষপর্যন্ত আমরাই জিতেছি বউদি। তুমি আমাদের সেই জয়মাল্য।'

বিশাখা যা বলবে না ভেবেছিল, জয়ের উল্লাসে উদার হতে পারবার আত্মপ্রসাদে তাও বলে ফেলল। শেষে অবশ্য মনে মনে অনুশোচনা হল, ছি ছি ছি, এত কথা সে বলতে গেল কেন। এতখানি তো তার বলবার ইচ্ছা ছিল না।

বিশাখা একটু বাদে বলল, 'এবার ঘুমোও বউদি। ওসব বাজে কথায় আমরা কেউই বিশ্বাস করিনি। শেষে বাবাও আমাদের দলে এসেছেন। মার মনে যদি এখনো একটু অন্যরকম ভাব থেকেই থাকে তুমি কি আর তা জয় করে নিতে পারবে না? আমার তো বউদি বাধাবিঘ্নের সঙ্গে ফাইট করতেই বেশি ভালো লাগে। তোমারও কি তাই লাগে না?'

মন্দিরা বলল, 'হুঁ।'

কিন্তু এ-রাত্রেও তার সুনিদ্রা হল না।

পরদিন বউভাত।

কিন্তু যে কারণেই হোক এ'রা খুব ঘটাপেটার মধ্যে যাননি বলেই মন্দিরার মনে হল। এ'দের আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা বোধহয় তত বেশি নয়। তেমন ভিড় নেই, হইচই নেই। অল্পলোকের আনাগোনায় মন্দিরা অবশ্য স্বস্তিই বোধ করল।

দুপুরের আগেই মন্দিরার বাপের বাড়ি থেকে ফুলশয্যার তত্ত্ব এসে পে'ছিল। দই মিষ্টি মাছ, জামাই-মেয়ের আর-একদফা জামা কাপড় গাড়িতে করে পাঠিয়ে দিয়েছেন যোগরঞ্জন।

সন্ধ্যার আগে আগে সপরিবারে সবান্ধবে তিনি নিজেও এলেন। ছন্দা নন্দা মন্দিরার কাছে গিয়ে গা ঘে'ষে দাঁড়াল।

ছন্দা কাছে এসে বলল, 'দিদি, কেমন আছিস? মনে হচ্ছে কত কাল তোকে দেখিনি।'

বাবাকে দেখে মন্দিরারও সেই কথা মনে হচ্ছিল। মুখে অবশ্য কিছু বলল না। যে বাবা এতদিন তার বিরুদ্ধতা করেছেন, মন্দিরার মন আজ অসহায়-ভাবে ফের তাঁরই আশ্রয় চাইছে। যেন আরো প্রবল, আরো নিষ্ঠুর এক শত্রুদুর্গে এসে পড়েছে মন্দিরা। সেই তুলনায় বাবা নিজের দলের মানুষ। স্বজন গোষ্ঠীর প্রধান সহায়।

দুপুরে পাকস্পর্শ হয়ে গেছে। শ্বশুর, স্বামী, দেওর আর শ্বশুরকুলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করেছে মন্দিরা। নববধূর হাতের অন্নে পরমান্নে পরিতৃপ্ত হয়েছেন সবাই। সকলেই বলেছেন, 'বেশ সুন্দরী বউ এসেছে ঘরে, লক্ষ্মী বউ। মুখশ্রী একেবারে প্রতিমার মত।'

বিকাল থেকে মন্দিরার আর কোন কাজ নেই। শুধু সাজ। সে সাজও নিজের হাতে তাকে করতে হচ্ছে না। সাজাবার ভার নিয়েছে আজ বিশাখা। আলতায় কাজলে ওষ্ঠরঞ্জনীতে আজ অতিরঞ্জিতা মন্দিরা। পরনে বেনারসী। অঙ্গে পুষ্পাভরণ আর স্বর্ণাভরণে প্রতিযোগিতা লেগেছে।

দোতলার বড় ঘরখানিতে উ'চু ডায়াসের ওপর মন্দিরা বউরানী হয়ে বসেছে। পিছনের চিত্রপটে পর্বতের সানুদেশ, ঘন অরণ্য। আকাশে মেঘ, ঘন ঘন বিদ্যুৎচমক। আলোকশিল্পী তপন মুখার্জীর নাম অলঙ্কৃত অক্ষরে নিচে লেখা আছে।

বউ দেখবার জন্যে আত্মীয়স্বজনের স্রোত সন্ধ্যার পর থেকেই বইতে শুরু করল।

'উনি তোমার পিসেশ্বশুর, প্রণাম করো।'

'ইনি সম্পর্কে ঠাকুরদা হন। উনি জ্যেঠামশাই, ইনি মামীশাশুড়ী। উনি আমাদের খুব হিতৈষী, আত্মীয়ের মত। ইনি আমাদের বাড়ির ডাক্তার। উনি তোমার শ্বশুরের বন্ধু।'

ডায়াস থেকে উঠে আসতে হল না মন্দিরাকে। বার বার ওঠানামায় সকলেরই অসুবিধে। তাই যাঁদের পায়ে হাত দেওয়া অপরিহার্য ছিল তাঁদের উদ্দেশ্যে যুক্তকর হয়েই রেহাই পেল।

মিহিরেরও বন্ধুজন আছে। তার গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি পরনে কোঁচানো কাঁচি ধুতি। পায়ে গ্রিসিয়ান কাফের প্লেজকিড।

মিহির নিমন্ত্রিতদের তদারক করছে। কখনো বা কাউকে এনে স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। কেউ আবাল্যের বন্ধু, কেউ সহপাঠী, কেউ সহকর্মী। আশ্চর্য, প্রত্যেকেরই একটি করে নাম আছে, আর পরিচয়ও আছে। কিন্তু এই নামাবলী কি মন্দিরার মনে রাখবার জন্যে না মুখস্থ রাখবার জন্যে? ত্যেককেই স্মিতমুখে নমস্কার জানিয়ে পরমুহূর্তে ভুলে গেল মন্দিরা। ভুলে যাওয়াটা অবশ্য অকৃতজ্ঞতা। কেউ খালি হাতে আসেননি, বইতে নাম লিখে নিয়ে এসেছেন। যাঁরা শাড়ি গয়না টি-সেট ফুলদানি কি আতরদান নিয়ে এসেছেন তাঁদের নাম বিশাখার খাতায় লেখা হতে লাগল।

খানিক বাদে যোগরঞ্জন এসে বিদায় নিয়ে গেলেন। 'যাই টুকু। মুকুন্দবাবু খুব খাইয়েছেন। আমি অনেকদিন নিমন্ত্রণ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু উনি আজ কিছুতেই ছাড়লেন না।'

ছন্দা বলল, 'মিহিরদাকে বলে গেলাম একটা ফোন নিতে। তাহলে রোজ আমরা ফোনে কথা বলতে পারব। একদিন তুই ফোন করবি, আর একদিন আমি।'

নন্দা বলল, 'আমি বুঝি করব না? তুই একবেলা করলে আমি আর একবেলা করব।'

নিমন্ত্রিতদের শেষ বৈঠকে বউকেও বসতে হল। খাওয়ায় তেমন রুচি ছিল না মন্দিরার। কিন্তু না খেলে কি হয়? না খেলে দোষ হয়। বিশাখা পাশে বসে বউদিকে খাওয়াতে লাগল। মেনু ঠিক একই রকমের। লুচি পোলাও, মাছ মাংস চাটনি দই মিষ্টি। ঘণ্ট আর ছ্যাঁচড়া জাতীয় পদার্থও ছিল। সেগুলি পাতে পড়লেও মন্দিরা তাতে হাত দিল না।

শোবার ঘরখানিও বিশাখাই সাজিয়েছে। খাটখানি রক্তগোলাপ আর রজনীগন্ধায় ভরতি। ঘরখানি মন্দিরার বাবার দেওয়া আসবাবে সাজান। সব জিনিস ধরেনি। কিন্তু বাছাই জিনিস এঘরেই এসেছে। তাকের ওপর রেডিও সেট। নিচে ড্রেসিং টেবিল, পাশে একটি গোদরেজের আলমারি। জানলার ধার ঘেঁষে পুষ্পশয্যা। জানলাগুলি অবশ্য পুরু পর্দায় ঢাকা। বাইরে থেকে কেউ কান পাতলেও চোখে কিছু দেখতে পাবে না।

অনেক রাত হয়েছে। বিশাখারা নবদম্পতিকে অল্পেই রেহাই দিয়ে চলে গেল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অলঙ্কারের ভার গা থেকে খুলতে লাগল মন্দিরা। সব তো আর খোলা যাবে না। খুলতে খুলতে একটুকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে

রইল। সিঁদুরভূষিতা বধূবেশিনী যে মেয়েটিকে মন্দিরা আয়নায় দেখতে পাচ্ছে সে যেন আর কেউ। তার সবটুকু যেন মন্দিরার চেনা নয়।

'মন্দিরা!'

হঠাৎ নিজের নাম কানে যাওয়ায় সে চমকে উঠল।

পিছন ফিরে তাকাল। কিন্তু সাড়া দিল না।

মিহির বলল, 'রাত একটা বেজে গেছে। দোর বন্ধ করে দিয়ে এসো।'

কিন্তু কথাটা মন্দিরা শুনতে পেল বলে মনে হল না।

মিহির একটু অপেক্ষা করে থেকে বলল, 'আচ্ছা আমিই দিচ্ছি। যাও এবার শুয়ে পড়ো।'

মিহির উঠে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিয়ে এল। আলোও নিভিয়ে দিল। কিন্তু ঘর একেবারে অন্ধকার করল না। স্নিগ্ধ কোমল নীলাভ আলোটা জ্বালিয়ে রাখল। আরো একটুকাল বসে বসে কী যেন ভাবল। কিসের দ্বিধা কিসের দ্বন্দ্ব কে জানে। তারপর উঠে এসে স্ত্রীর হাতখানা ধরে কোমল স্বরে বলল, 'এসো।'

কিন্তু কী হল মন্দিরার! সে সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা ছাড়িয়ে নিল, তারপর রূঢ় রুক্ষ গলায় বলল, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

মিহির স্ত্রীর দিকে কী একটু তাকিয়ে দেখল, তারপর মুখে একটু হাসি টেনে বলল, 'আমাকে আপনি বলছ কেন? অবশ্য আমাদের জানাশোনা মাত্র দুদিনের। কিন্তু দুজনে মিলে এত মন্ত্রতন্ত্র পড়েছি এত আচার অনুষ্ঠান করেছি—আমাদের মোটামুটি আলাপ পরিচয় হয়ে গেছে ধরে নিতে পারি।' মিহির ফের একটু হাসল, 'শুনেছি অনেক কাল আগে কোন কোন স্ত্রী স্বামীকে আপনি বলত। তখন বয়সের তফাত থাকত অনেক। আর পতিকে একেবারে পরম গুরু হয়ে থাকতে হতো। কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই সেই প্রপিতা-মহের আমল পার হয়ে এসেছি। এসো। তুমি পরশু রাত্রে ঘুমোওনি, কালও নতুন জায়গায় এসে বোধহয় ঘুম হয়নি। আজ—'

কিন্তু মন্দিরা তার সেই আগের প্রশ্নটিই ফের আবৃত্তি করল, 'কেন আমাকে দয়া করলেন? সব জেনেও কেন দয়া করে বিয়ে করলেন? আমি কারো দয়া চাইনে, আমি কারো স্নেহ চাইনে, আমি কারো ভালোবাসা চাইনে। আমি আর কারো কাছে কিছু চাইনে।' হঠাৎ উঠে গিয়ে সামনের সেই নাতিউচ্চ পুষ্পশয্যায় উপুড় হয়ে পড়ে দুহাতে মুখ ঢাকল মন্দিরা।

একরাশ ফুলের মধ্যে প্রোথিত তার মুখ। তার খোঁপায় এখনো বেল ফুলের মালা জড়ানো। সেই শুভ্র সুন্দর কবরীভূষণ কিসের আবেগে বার বার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

বিশাখা জোর করে মিহিরের গলায়ও একটি গোড়ের মালা পরিয়ে দিয়ে গেছে। মালাটা খোলা হয়নি।

মাল্যবান মিহির সেই পুষ্পিতা পুষ্পভূষিতা নারীর দিকে স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল; ফুলের মধ্যে যে এত কীট কে জানত। ফের একটু হেসে মিহির আস্তে আস্তে বলল, 'কিন্তু ঘুমুতে তো চাও।'

॥ ৭ ॥

শশাঙ্কের স্ত্রী সুজাতা সংসার ত্যাগ করবে বলে স্থির করেছে। অবশ্য ছাড়া-ছাড়া ভাব তো তার অনেকদিন থেকেই। স্বামীই তাকে ছেড়ে দিক কি সে নিজেই ঘরসংসার ছেড়ে আসুক, ঘরকন্না তো সে আর করল না। যে মেয়ে বছর দশেক স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারে, সব রকম আমোদ-আহ্লাদ, ভোগসুখ থেকে আস্তে আস্তে সরে আসতে পারে, সে কি আর একটু সরে এসে বাপ-ভাইয়ের সংসার থেকে বেরিয়ে অন্য কোন আশ্রম-টাশ্রমে গিয়ে বাস করতে পারে না?

সুজাতার বাবা বলেন, 'বাইরে যাবার তোর দরকারটা কি? এত বড় বাড়ি এতগুলি ঘর, তুই মন্দির কর, ঠাকুরঘর কর, যা তোর খুশি। বাড়িতে থেকে কি ধ্যানধারণা জপতপ করা যায় না?'

প্রশান্তবাবু পেশায় উকিল। কিন্তু মেয়ের কাছে তাঁর সব আর্গুমেণ্ট নিষ্ফল হয়ে যায়। সুজাতা তো তর্ক করে না, শুধু মৃদু হেসে সব যুক্তিতর্ক অস্বীকার করে। অবশ্য সত্যিই বাইরে থেকে দেখতে গেলে অসুবিধার কিছু নেই। একখানা কেন, তিনখানা ঘরও সুজাতা ব্যবহার করতে পারে। একতলা দোতলা মিলিয়ে বাড়িতে আটখানা ঘর। বাসিন্দার মধ্যে বাবা, দাদা-বউদি আর তাদের একটি বাচ্চা ছেলে। মা অনেক আগেই সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন। কিন্তু সুজাতা কোণের দিকের একখানা ঘরই নিজের জন্যে বেছে নিয়েছে। ইচ্ছা করলে চব্বিশ ঘণ্টা এই ঘরে সে পড়াশুনো, ধ্যানধারণা নিয়ে থাকতে পারে। সংসারের কোন গোলমাল চেঁচামেচি এখানে এসে পেঁাছয় না। কিন্তু বাইরের নিভৃতিই কি সব? সুজাতার দাদা প্রভাসও প্রতিষ্ঠাবান এডভোকেট। বয়স চল্লিশ হয়নি। কিন্তু এরই মধ্যে পশার বেড়ে উঠেছে। বিত্তবান মক্কেলের সংখ্যা তার কম নয়। স্ত্রী আর একটি ছেলে নিয়ে তার ছোট সংসার। বৃহৎ সংসারের অন্তর্গত এ সংসারকে সে সুখের সংসার করেই গড়ে তুলেছে। প্রভাসের ক্ষমতা এত সামান্য নয়, কি মন এত সঙ্কীর্ণ নয় যে, সেখানে স্বামীত্যক্তা দুঃখিনী বোনের স্থান হবে না। বিপত্নীক বাবাকে যেমন যত্ন করে প্রভাস, তেমনি বোনকেও সে সুখে না পারুক স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে চায়। কিন্তু সুজাতার মতিগতি ক্রমেই অন্য ধারা নিচ্ছে। দাদার সংসারে তার আর মন বসছে না।

প্রভাস অনেক রকম চেষ্টা করে দেখেছে। প্রথমে সে চেয়েছিল খোরপোষের মামলা করতে। প্রেস্টিজহানির ভয়ে বাবা অরাজী। সুজাতাও রাজী হয়নি। প্রভাস বলেছিল, 'কেন, আপত্তিটা কিসের? তোর তো আর উকিলের ফী লাগবে না।'

সুজাতা বলেছিল, 'উকিলের ফীটাই বুঝি সব? তুমি কি দুমুঠো খেতে দিতে পারবে না দাদা; আমার খোরাকির জন্যে এত ভাবছ?'

প্রভাস জবাব দিয়েছিল, 'তা নয়। তুই তো শুধু আমার দেওয়ার ওপর নির্ভর করছিস নে। নিজেও রোজগার করে আনছিস। সে জন্যে নয়। তুই তোর প্রাপ্য টাকা কেন ছাড়বি। তা ছাড়া আমি চাই শশাঙ্ক একটু জব্দ হোক। ও কেবল মেয়েদের পিছনে ছুটোছুটি করে, কিছুদিন উকিলমোক্তারের পিছনেও ঘুরুক।'

সুজাতা জবাব দিয়েছে, 'তাতে লাভ কি দাদা? তোমার সমব্যবসায়ীদের দুটো পয়সা হবে এই তো।'

প্রভাস আর কিছু বলেনি।

ব্যভিচারী স্বামীকে জব্দ করবার চেষ্টা কি কম করেছে সুজাতা? শোধ কি কম নিয়েছে? কিন্তু সত্যিই শোধরাতে পেরেছে কি? পারেনি। শশাঙ্কের স্বভাব একটুও বদলায়নি। এই সেদিন পর্যন্ত মন্দিরার মত অল্পবয়সী একটি ছাত্রীর সঙ্গে সে চূড়ান্ত কেলেঙ্কারি করে ছেড়েছে। সবই কানে যায় সুজাতার। কানে যাতে তার যায় তার জন্যে দুই জা উপযাচক হয়ে তাকে মাঝে মাঝে ফোন করেন। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। আজকাল আর জ্বলে ওঠে না সুজাতা। পাগলের মত যা তা কিছু একটা করে বসতে তার ইচ্ছা করে না। আজকাল তার সবই সয়। মনকে শাসন করে, কখনো বা পীড়ন করে, নিয়ন্ত্রণ করে সুজাতা তাকে সহ্যগুণ শিখিয়েছে। সুজাতা বুঝতে পেরেছে সর্বংসহা হবার সাধনাই সবচেয়ে বড় সাধনা। এই সিদ্ধিই সর্বোত্তম সিদ্ধি।

এই নিরাসক্তি আর নিস্পৃহতার পথ তাকে চিনিয়ে দিয়েছে ধর্ম, আনুষ্ঠানিক ধর্ম।

ধর্মের কথা শুনলে দাদা ঠাট্টা করে, বউদিও ঠাট্টা করে। নন্দিতাও দাদার সঙ্গে সঙ্গে সহ-অধর্মিণী হয়ে উঠেছে। তারও পুজো নেই, পার্বণ নেই, কোনরকম আচার অনুষ্ঠান সে মানে না। মা যতদিন ছিলেন প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী পুজো হতো, পুঁথি পড়া হতো।

ফাল্গুন পূর্ণিমা নিশি নির্মল গগন
মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয় পবন।

মা তাকে পুঁথি পড়তে শিখিয়েছিলেন। সেই পবনে কত সুখস্মৃতি আজও ভেসে আসে।

কিন্তু এ বাড়িতে এখন আর সে সব কিছু হবার জো নেই। প্রশান্তবাবু আইনের বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে ধর্ম আর দর্শন নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। কিন্তু তা নিতান্তই তত্ত্বগত। আচার অনুষ্ঠান নিয়ে মাথা ঘামান না। প্রভাসও পুজোআর্চা ব্রত অনুষ্ঠান সব বন্ধ করে দিয়েছে। এসব কথায় সে হেসে বলে, 'কোন রিচুয়াল নেই, এই আমাদের একমাত্র রিচুয়াল। তোরাও নেতি নেতি করে ব্রহ্মকে জানতে চাস।'

সুজাতা লক্ষ্য করেছে এদিক থেকে তার স্বামীর সঙ্গে দাদার মিল আছে। শুধু দাদা চা সিগারেট ছাড়া অন্য কিছু ছোঁয় না, স্ত্রী ছাড়া অন্য মেয়ের সঙ্গে মেশে না। সুজাতা জানে, যে মতবাদ ঈশ্বর আর অধ্যাত্ম চিন্তাকে বাদ দিয়েছে দাদা সেই সাম্যবাদেও দীক্ষিত নয়। তবু পুরোপুরি জড়বাদী। তারও কোন ধর্মে বিশ্বাস নেই, ধর্মানুষ্ঠান নেই। সে হিন্দু সমাজে বাস করে, কিন্তু হিন্দুধর্মের ধার ধারে না। স্বামী আর স্বামীর বন্ধুদের দেখেছে, দাদা আর দাদার বন্ধুদের দেখেছে সুজাতা। দেখতে সবাই একরকম নয়, কিন্তু মতে বিশ্বাসে চালচলনে সবাই প্রায় এক। এখনকার বুদ্ধিজীবীদের ধারাই নাকি এই। এখনকার বুদ্ধির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার কোন সম্পর্ক নেই। আছে কি নেই সুজাতা নিজে একটু যাচাই করে দেখতে চায়। নিশ্চয়ই সেটুকু সাধ্য তার আছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসবার পর নিজের চেষ্টায় সে বি-এ পাশ করেছে। এই পাশ-টাশ অবশ্য কিছুই নয়। ডিগ্রীকে সে চাকরির কাজে লাগায়নি। কর্পোরেশনের যে স্কুলে সে মাস্টারি করত সেই স্কুলেই রয়েছে। ছোট ছোট মেয়েদের আগেও যা পড়াত, এখনো তাই পড়ায়। সেই সাহিত্যপাঠ, সরল গণিত আর আদর্শ ভূবিদ্যা। কিন্তু পড়ে অন্য জিনিস, ভাবে অন্যরকম। বুদ্ধি কিছু বেড়েছে কি বাড়েনি তা সে জানে না, কিন্তু বোধের সীমা যে অনেকখানি ছাড়িয়েছে তা সুজাতা টের পায়।

প্রভাস ঠাট্টা করে বলে, 'নাইনটিনথও নয়, বুলি, তুই একেবারে এইটিনথ সেঞ্চুরি থেকে উঠে এসেছিস। তুই যে এই বিশ শতকের ষষ্ঠ দশকের কেউ তা আর মনেই হয় না। আমি তো ভেবেই পাইনে প্রভাস দাশগুপ্তের বোন স্বামীর অত্যাচার মাথা পেতে নিয়ে শেষপর্যন্ত মালা জপ করবে আর তপ-তপস্যার শরণ নেবে।'

'মালা জপ আমি করিনে দাদা। আর তপ—'

'আরে ওই হল। না হয় একটু অলঙ্কার দিয়েই বললাম। এককালে সাহিত্য-টাহিত্য তো কিছু করেছি। এখনই না হয় জেলাস ।মস্ট্রেসের জ্বালায় কিছু পেরে উঠিনে। আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আমার বোন অন্য রকম হবে। সে পুরুষের অত্যাচারের প্রতিবাদ করবে। একবার ঘর বেঁধে যদি সুখ না হয় আর একবার ঘর বাঁধবে।'

নন্দিতা ছেলের গায়ের সোয়েটার বুনতে বুনতে স্বামীর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়েছিল, তারপর মৃদু ধমক দিয়ে বলেছিল, 'তোমার যত অনাসৃষ্টি কথা। একবার বিয়ে হয়ে গেছে, ওকে এখন ফের কে বিয়ে করবে? তোমাদের কি সেই সমাজ? ক'জন পুরুষের সেই সাহস আছে শুনি? তারা বড় জোর ফ্লার্ট করবে, এখানে সেখানে বেড়াতে কি চা খেতে ডাকবে। কিন্তু সবাইয়ের সাক্ষাতে পরস্ত্রীকে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারে কেউ? আছে সেই স্ট্যামিনা?'

প্রভাস স্ত্রীর কথার কোন প্রতিবাদ না করে তেমনি আধা ঠাট্টার সুরে বলেছিল, 'আমার এত বন্ধুর সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দিলাম। তাদের মধ্যে আইবুড়োর সংখ্যা কম ছিল না। তুইও দেখতে-টেখতে খারাপ ন'স। তাদের কারো একজনকে ইলোপ করে নিয়ে চলে গেলেও তো পারতিস। মামলা মোকদ্দমা হলে আমি তো ছিলাম।'

নন্দিতা হেসেছিল, 'বুলি, তোমার বাবা একবার তোমার বিয়ে দিয়েছেন, সেটা সুবিধে হয়নি। তোমার দাদার আরো একবার দেওয়ার ইচ্ছে।'

প্রভাস ভ্রূ কুঁচকে বলেছিল, 'মানে তোমার ইচ্ছে নয়। তুমি লিপস্টিক পরো, আর বুলি পরে না। কিন্তু দুজনের মধ্যে আসলে কোন তফাত নেই। দুজনের ঠোঁটই একই কথা বলে। দুজনেই সমান রক্ষণশীলা।'

কিন্তু দাদা যতই ঠাট্টা করুক, যতই অনুকম্পার চোখে দেখুক, প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি বলে তো একটা বস্তু আছে। প্রোগ্রেসিভ হব বলেই তো আর গায়ে পড়ে কারো প্রেমে পড়া যায় না। মরীয়া হয়ে বরং অনেকবার স্বামীকে খুন করতে গেছে সুজাতা কিন্তু অন্য কোন পুরুষকে ভালোবাসার কথা তার মনে হয়নি, তেমন আকাঙ্ক্ষাই জাগেনি। কাউকে দেখে মনে হয়নি এর কাছে যাই, এর কাছে গিয়ে বাস করি।

যাকে সে পেয়েছিল তাকেই প্রাণপণে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছে সুজাতা। স্বামী হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে, দুঃখে অপমানে সে যে কী করেছে আর না করেছে আজ ভাবলেও হাসি পায়। সেই দুঃসহ ক্রোধ, ঈর্ষা আর মত্ততার যুগ সে পার হয়ে এসেছে। কিন্তু যতদিন তার মধ্যে ছিল, কী মর্মদাহী জ্বালাতেই না জ্বলেপুড়ে মরেছিল সুজাতা। সেই দগ্ধ দিন, দগ্ধ রাত্রি, দগ্ধ ক্ষতের স্মৃতি আজও মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ব্যভিচারী বিশ্বাসভঙ্গকারী স্বামীকে বশে আনবার জন্যে কী কাণ্ডই না করেছে সুজাতা। বাবার কাছে নালিশ করেছে, দাদার কাছে নালিশ করেছে, যদিও গৃথগন্ন তবু ভাসুরদের কাছে, জা'দের কাছে স্বামীর কীর্তিকাহিনী অকপটে প্রকাশ করেছে। প্রতিবেশীর কাছে বলেছে, কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেছে। শুধু কি শোধ নেবার জন্যে? সুজাতা ভেবেছিল এইভাবেই সে স্বামীকে শোধরাতে পারবে। কঠিন, অতি কঠিন শাস্তি না দিলে এই মানুষটি ঠিক পথে আসবে না। কিন্তু শাস্তি দিতে গিয়ে নিজেই বোধ

হয় সবচেয়ে বড় শাস্তি পেল সুজাতা। নিজেকেই সরে আসতে হল। তার স্বামীর রুচি বুদ্ধি ধরন-ধারণ কিছুই বদলাল না। তার প্রণয়িনী তেমনি জুটতে লাগল। কখনো একজন কখনো একই সঙ্গে কয়েকজনের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠতা রেখেছে। তার অর্থ আছে, রূপ আছে, তার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি, গুণ-যোগ্যতাকে সে শুধু নারী বশীকরণের কাজে লাগিয়েছে। মেয়েরা তার কাছে আসবে না কেন। না এলে তার স্বামী থাকতে পারেনি। এগিয়ে গিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছে। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে নারী সম্ভোগের তার কত ধারা কত কৌশল। কারো সঙ্গে চিঠিতে, কারো সঙ্গে ফোনে, কারো সঙ্গে আলাপে, কারো সঙ্গে বেড়িয়ে, সে তার উপভোগের সাধ মিটিয়েছে। সুজাতা সব বুঝতে পারত—সব। বুঝতে পারত আর অন্তর্দাহে জ্বলত। সেই জ্বালা তাকে দিয়ে নানা কাজ করিয়েছে। বিচারবিবেচনাহীন অন্ধ নির্বোধ মূর্খ স্ত্রীলোকের মত কাজ করেছে সুজাতা, আজ সে স্বীকার করে। সে তার স্বামীর অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র নষ্ট করেছে, বইপত্র পুড়িয়ে দিয়েছে, দামী দামী ঘড়ি পেন ভেঙে চুরে ছত্রখান করে ফেলেছে, আবার সেই ভাঙা টুকরোগুলি জুড়তে বসতেও তার দেরি হয়নি। কিন্তু জোড়া শেষ পর্যন্ত লাগেনি।

অনেকের কিন্তু লাগে, অনেকে কিন্তু পারে। স্বামী অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে জড়িত আছে জেনেও দিব্যি তার ঘরসংসার করে যায়। হয়তো সুখে শান্তিতে করে না, কিন্তু করে তো যায়, ছেড়ে তো আসে না। ক্রমে দুজনেরই বয়স বাড়ে, ছেলেমেয়ে হয়, ধীরে ধীরে একরকম মিটমাট বোঝাপড়া হয়ে যায়, সংসারে শান্তি আসে। কিন্তু সুজাতা সেই বয়সে এসে পৌঁছবার আগেই সব ছেড়ে চলে এল। পারল না, কিছুতেই সহ্য করতে পারল না। অনেকে পারে। সুজাতা নিজে কতজনকে পারতে দেখেছে। কতজনের আরো কত কষ্টের কথা শুনেছে। সুজাতার দুই জা তাকে কত বুঝিয়েছে, 'তুই কী বোকা মেয়ে রে সুজাতা। কেন অমন ছটফট করে মরিস। যতই বাইরের মেয়েদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করুক, আর তো কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। সে সাহস হবে না ঠাকুরপোর। তুই যে আসনে বসে আছিস সেখান থেকে তোকে নামায় কে? তুই বরং এই সুযোগে আরো গয়নাগাটি করে নে, জিনিসপত্র, জমিজায়গা বাড়ি গাড়ি করে রাখ নিজের নামে। যে পাপ করবে সে প্রায়শ্চিত্ত করুক। যেই একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে তুই অমনি হাত পেতে বলবি টাকা দাও, গয়না দাও, গাড়ি দাও, বাড়ি দাও। হ্যাঁ, ঘুষ। ঘুষ চাইবি। ভালোবাসা না দিয়ে যাবে কোথায়। দুদিন যেতে দে, সব তোকে উজাড় করে দিতেই হবে। কিন্তু তার আগে যেন নেশার ঘোরে ফতুর না হয়ে যায়। যেখানে যা আছে নিজের নামে লিখিয়ে নে। ভালো চাস তো আমাদের কথা শোন।'

শুনেছে, কিন্তু মনে রাখতে পারেনি সুজাতা। ভিতরের এক দুঃসহ জ্বালায় সব বিস্মৃত হয়েছে। স্ত্রীর আসন থেকে গৃহিণীর আসন থেকে কখন

যে নেমে এসেছে নিজেও টের পায়নি সুজাতা। শেষ পর্যন্ত তাকে যেন এক রোগে ধরেছিল। মেয়ে-আতঙ্কে পেয়ে বসেছিল তাকে। স্বামী যে কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বললে রাগ হতো সুজাতার, বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে হেসে কথা বললে তার গায়ে জ্বালা ধরত। সহ্য করতে পারত না সুজাতা কিছুতেই, সহ্য করতে পারত না। সন্দেহের বিষে নিজেই সে পাগল হবার জো হয়েছিল।

বঞ্চনা প্রতারণা অপমানে লজ্জায় কী দুঃখ আর গ্লানির মধ্যে দিনগুলি তার কেটেছে আজ ভাবলে অবাক হয় সুজাতা।

স্বামীর দিকে অগ্নিবর্ষী চোখে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে অকথ্য গালাগাল করতে করতে সুজাতা চীৎকার করে বলেছে, 'তুমি মরো, তুমি মরো, তুমি মরো।' শুধু কি তাই? দিনে রাত্রে প্রহরে প্রহরে কতবার তার মৃত্যু কামনা করেছে, কত বিচিত্র রকমের মৃত্যু কল্পনা করেছে তার ঠিক নেই। দিনে সচেতন মনের কল্পনা, রাত্রে অচেতন মনের স্বপ্ন। তার নানাবিধ রূপ, কিন্তু বিষয় অভিন্ন। সুজাতা কখনো দেখেছে রাস্তায় অ্যাকসিডেণ্ট ঘটিয়েছে শশাঙ্ক। গাড়ি চাপা পড়েছে, কি গাড়িতে গাড়িতে সংঘর্ষে ছিন্ন অঙ্গ রক্তে সিক্ত হয়েছে। বাইরের লোকজন তার নিষ্প্রাণ দেহ ধরাধরি করে এনে সুজাতার কোলের কাছে নামিয়ে দিয়েছে। আর সেই মৃতদেহের বুকের ওপর আছড়ে পড়ে সুজাতা চোখের জলে কেঁদে ভাসিয়েছে, 'তুমি আমার, তুমি আমার, তুমি আমার।' পরম তৃপ্তিতে স্বস্তিতে অনুভব করেছে তার স্বামী এখন তার ছাড়া আর কারো নয়। কখনো বা অন্যরকমের মৃত্যুকল্পনা মনে এসেছে সুজাতার। আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা নয়, বাড়িতেই শেষ শয্যায় শায়িত শশাঙ্ক। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গেছেন, আত্মীয়স্বজনরা স্বামী-স্ত্রীকে শেষ বিদায়ের সুযোগ দিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আর সুজাতা সেই পরম বিদায় ক্ষণটিকে পরম মিলনক্ষণের মধ্যে নিবিড় করে পেয়েছে। সেখানে কেউ আর প্রতিদ্বন্দ্বিনী নেই।

কখনো বা দুর্ঘটনা কি দুরারোগ্য ব্যাধির ভরসায় না থেকে সেই কাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকে নিজেই বয়ে এনেছে সুজাতা। ধারালো ছোরা শশাঙ্কের বুকে বিঁধেছে আর সেই ছোরারই দ্বিতীয় আঘাতে বিদ্ধ হয়েছে সুজাতা নিজে। তারপর দুটি রক্তস্রোত একই ধারায় মিলেছে। আর কোন অমিল হয়নি।

রক্তাক্ত ছোরা কখনো হয়েছে বিষের বাটি, কখনো হয়েছে ইনজেকসনের সুচ। সুজাতা হয় সহমৃতা, না হয় পরম শোকার্তা। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ নেই। আশ্চর্য, তবু সে সান্ত্বনা পাচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর কল্পনায় নিজেই মাঝে মাঝে শিউরে উঠত সুজাতা। তবু এর হাত থেকে তার মুক্তি ছিল না। এমন সময়ও গেছে যখন স্বামীহত্যার ইচ্ছা তার পায়ে পায়ে হেঁটেছে। জীবনের এক পরম আকাঙ্ক্ষার মত তাকে পেয়ে বসেছে। কত স্তব্ধ গভীর রাত্রে ঘুমন্ত স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুজাতার মনে এই হত্যার

ইচ্ছা জেগে উঠেছে। যে ব্যভিচারী পুরুষ খানিক আগে আর একটি মেয়েকে আদর করে এসে সুজাতাকে সোহাগ জানাতে এসেছে তাকে শেষ করে দাও। যে ব্যভিচারী পুরুষ মনে মনে আর কোন মেয়ের রূপ কল্পনা করে সুজাতাকে আদর করছে তার সেই হীনপ্রণয় অভিনয়ের সমাপ্তি ঘটাও। নিতান্তই বাঙালী গৃহস্থের ঘরে কোন মারাত্মক অস্ত্র থাকে না। থাকলে কী যে ঘটত তার ঠিক নেই। তবু শোয়ার আগে সুজাতা ঘর থেকে কাগজ কাটা ছুরিখানা পর্যন্ত সরিয়ে ফেলেছে। সুতো কাটা কাঁচি, সুপুরি কাটা জাতিখানা পর্যন্ত হাতের কাছে রাখেনি। বিশ্বাস নেই, নিজেকে তার বিশ্বাস নেই।

ঝগড়ার শেষে শশাঙ্ক কোন কোনদিন বলেছে, 'তুমি আমাকে আজ প্রায় মেরেই ফেলেছিলে।'

'কী করে?'

'দুহাতে প্রাণপণে গলা টিপে ধরেছিলে।'

সুজাতা অস্বীকার করেছে, 'কক্ষনো না। মেয়েরা কখনো তা পারে?'

শশাঙ্ক জবাব দিয়েছে, 'যতক্ষণ মানবী থাকে ততক্ষণ পারে না। যখন দানবী হয় তখন পারে।'

সুজাতা একটুকাল চুপ করে থেকে জবাব দিয়েছে, 'দানবী আমাকে তুমিই করে তুলেছ।'

হত্যার চিন্তা, হত্যার চেষ্টা আর তারপর অনুতাপ আর অনুশোচনা—এই দুই অনলকুণ্ডে দগ্ধ হতে হতে শেষ পর্যন্ত স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে সুজাতা। সম্ভাব্য স্বামীঘাতিনীর হাত থেকে স্বামীকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু নিজে বেঁচেছে কি? পদে পদে ঈর্ষা, হিংসা, নৈরাশ্য আর পরাজয়ের গ্লানি তাকে কি সহস্র ছুরিকায় বিঁধে মারেনি! বাপের বাড়িতে এসেও কি নিশ্চিন্তে থাকতে পেরেছে সুজাতা? বাবাকে লুকিয়ে, দাদা বউদিকে লুকিয়ে মন্দিরে মন্দিরে সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে কি হাত পাতেনি? একালের লেখাপড়া জানা মেয়ে হয়েও অনেক লজ্জাকর কাণ্ড সে করেছে। সেদিন তার যা কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। খড়ি হাতে জ্যোতিষী দেখলেই সুজাতা হাত পেতে বসেছে। করকোষ্ঠীতে যদি অন্ধকার অজ্ঞাত ভবিষ্যতের কোন সঙ্কেত ধরা পড়ে। রেখার ভাষায় বিশেষজ্ঞ দৈবজ্ঞ বলেছেন, 'তুমি রাজরানী হবে মা। পুত্রবতী হবে। তুমি ভাগ্যবতী। এখন একটু কষ্টে আছ। কিন্তু সুদিন আসছে।'

জ্যোতিষীকে দক্ষিণা দিয়ে উঠে এসেছে সুজাতা। কিন্তু সুদিন আসেনি। যে সুদিন সে চেয়েছিল, যে সুদিনের ভবিষ্য বাণী জ্যোতিষীরা করেছিলেন, তার দেখা সে পায়নি। খ্যাত অখ্যাত কত কালীমন্দিরে, শিবমন্দিরে, রাধা-মাধবের মন্দিরে, সিঁদুর মাখা কত বটতলায়, শেওড়াতলায় সুজাতা গোপনে গোপনে মানত করেছে, প্রার্থনা করেছে, কিছুই ফলেনি। কত যোগী

সন্ন্যাসীর দেওয়া অমোঘ কবচ মাদুলী গাছগাছড়া গোপনে গোপনে ধারণ করেছে। কিছুই হয়নি, কোন মনস্কামই পূর্ণ হয়নি। সব জলে ভাসিয়ে দিয়ে চোখের জলে ভেসেছে সুজাতা। ধর্মের নামে যা-কিছু হচ্ছে সব মিথ্যা বুজরুকি বলে সে সরে আসতে পারত। এল না। একজন বললেন, 'ধর্মের কাছে কিছু চেয়ো না মা। চাইতে নেই। ধর্ম যদি সত্যিই কিছু আমাদের দেয় সে এই না-চাওয়ার দীক্ষা।'

সেই গেরুয়াপরা প্রসন্নমুখ সন্ন্যাসী সুজাতাকে আর কোন মন্ত্র দেননি, শুধু ওই ক'টি কথা বলে দিয়েছিলেন।

তারপর অনেকের মুখে, অনেক বইতে, অনেক শ্লোকে, অনেক মন্ত্রে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনেছে সুজাতা। চেয়ো না চেয়ো না। মা ফলেষু। তুমি যেন নিষ্কাম হতে পারো এই তোমার একমাত্র কামনা হোক। বড় কঠিন পথ। কিন্তু তার পর থেকে এই কঠিন পথই বার বার সুজাতাকে টেনেছে। স্খলিত হয়েছে, পতিত হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই সরে আসেনি। চেয়ে চেয়ে যে পেল না, আকাঙ্ক্ষা আর প্রাপ্তির মধ্যে যে শুধু অকূল সমুদ্রের ব্যবধানই দেখতে পেল, আজ সে সমুদ্রের সেই বিশালতাকেই পেতে চায়। ব্যবধানকে দেখতে চায় না।

কিন্তু বড় কঠিন, বড় দুর্গম। তবু দ্বিতীয় পথ কোথায়!

পারিবারিক জীবনে অসুখী হয়ে এখনকার মানুষ যে সব বস্তু আঁকড়ে ধরতে চায় সেগুলির ওপর সুজাতার স্বাভাবিক স্পৃহা ছিল না। সাহিত্য শিল্প সঙ্গীতের ওপর বরং তার কিছু বিমুখতাই ছিল। ও সব তো শশাঙ্কের সম্ভোগের উপকরণ, তার উপভোগের সহায়। যা শশাঙ্কের তা যেন সুজাতার নয়। রাজনীতির দিকে যাবার কোন উপলক্ষ ঘটেনি, তেমন সুযোগও আসেনি। বাবা, দাদা, স্বামী, তাঁদের বন্ধুরা—যাঁদের সংস্পর্শে এসেছে সুজাতা তাঁরা কেউ রাজনীতির মানুষ নন। অবলম্বন হিসাবে সুজাতা ধর্মকেই হাতের কাছে পেল আর দু হাতে তাকে তুলেও নিল।

পুজোর ছুটিতে কোর্ট বন্ধ হলে প্রশান্তবাবু প্রায়ই মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। প্রভাস আর নন্দিতাও তাকে কম ডাকাডাকি করত না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যবর্তিনী কি পার্শ্ববর্তিনী না হয়ে সুজাতা বরং বুড়ো বাবার সেবাশুশ্রূষার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠত। দাদা-বউদিরা যেতেন শিলং-এ, দার্জিলিং-এ, নৈনিতালে, ওয়ালটেয়ারে। আর বাবা তাকে নিয়ে ঘুরতেন সেই জগন্নাথের পুরোন পুরীতে, কাশী, গয়া, মথুরা বৃন্দাবনের পথে পথে। প্রথম যৌবনে মাকে নিয়ে এই সব তীর্থে এসেছেন বাবা। প্রথম বয়স থেকেই ধর্মে মতি ছিল মা'র। তিনি নাকি বলতেন, 'যেখানে দেবদেবীর মন্দির আছে আমাকে সেখানে নিয়ে চল। আমি অযথা কোথাও যেতে চাইনে। শুধু দালান কোঠা পাহাড় পর্বত দেখে আমার লাভ কি। আমি ভগবানের মন্দির দেখতে চাই, তাঁর মূর্তি দেখতে চাই।'

সেই মন্দির আর মূর্তির কি অভাব আছে দেশে? ক্রোশে ক্রোশে গাঁয়ে গাঁয়ে শহরে শহরে মন্দির। নদীর ধারে ধারে পাহাড়ের কোলে কোলে পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় মন্দির। আর মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ। আর তার দ্বারে দ্বারে অগণিত মানুষের ভিড়। এই গণমূর্তিই কি দেবমূর্তি? ভগবানের বাস কি একমাত্র ভক্তের হৃদয়ে? দাদা বলে, হৃদয়ে নয় উর্বর মস্তিষ্কে।

কিন্তু দাদা যাই বলুক, সুজাতা দেখেছে দাদা-বউদিদের মত অবিশ্বাসীর সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়, যাদের গোনা যায় না তারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি। তারা এখনো মঠ-মন্দির মসজিদ-গীর্জা আশ্রয় করে আছে। দাদা বলে, অশিক্ষার ফল, অজ্ঞানতার ফল। শিক্ষায় এই কুফল দূর হবে। যত তাড়াতাড়ি দূর হয় ততই মঙ্গল।

সুজাতা তর্ক করে না। তর্কে দাদার সঙ্গে পেরে ওঠে না বলে নয়, তর্কে তার প্রবৃত্তি হয় না। তর্কে লাভ কি, তর্কে শুধু তিক্ততা বাড়ে।

বাবার সঙ্গে অনেক তীর্থ দেখেছে সুজাতা, অনেক মন্দির আর অনেক বিগ্রহ। এতদিনে শিক্ষা হয়ে গেছে সুজাতার। সে কোন দেবতার কাছে আর কিছু চায় না। শুধু দু-চোখ ভরে চেয়ে দেখে আর ধুলোর ওপর মাথা লুটিয়ে দিয়ে বলে, 'আমাকে না চাইতে শেখাও।'

মা'র স্মৃতি বাবার বুকের মধ্যে। তীর্থের পথে পথে বাবার মুখে তা রূপকথার মত শোনায়। কলকাতায় যে মানুষ টাকা ছাড়া আর কিছু চেনেন না, শুধু মক্কেলের গাড়ির শব্দে উৎকর্ণ হয়ে থাকেন, তিনি তীর্থস্থানে এলে অন্য মানুষ হয়ে যান। শাস্ত্রের কথা বলেন, পুরাণের কথা বলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সুজাতার মায়ের কথা বলেন যা চির নতুন। মাকে নিয়ে কবে কোন ধর্মশালায় উঠেছিলেন, কবে কোন হনুমান তাঁর হাত থেকে পুজোর ফুলফল কেড়ে নিয়েছিল সেই সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ গল্প। তবু বাবার মুখে তা কী মধুর আর অপরূপই না হয়ে ওঠে। শুনতে শুনতে সুজাতার মন কেমন করতে থাকে। শুধু কি মা'র জন্যে? শুধু কি বিচ্ছেদকাতর স্মৃতিভারাতুর বাবার জন্যে? আরো একটি দম্পতিকে কি পাশাপাশি দেখে না, যারা কিছুতেই পাশাপাশি হতে পারল না, কাছাকাছি হতে পারল না?

ধর্মের দিকে যাঁরা সুজাতার মনকে টেনে এনেছেন বাবা তাঁদের একজন। বোধ হয় সবচেয়ে নিকটতম গুরু।

তবু বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার কথায় তিনিই সবচেয়ে বেশি বাধা দিলেন, 'কেন যাবি? তুই যা করতে চাস এখানে থেকে কি তা করা যায় না?'

'এখানে আমার মন টিকছে না বাবা।'

'কী নিষ্ঠুর মেয়ে তুই। আমাদের ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে থাকলে মন টিকবে? স্থির হয়ে থাকতে পারবি?'

এর জবাব দেওয়া সহজ নয়।

সুজাতা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি তো একেবারে ছেড়ে যাচ্ছিনে বাবা। ওঁরা আমাকে সন্ন্যাস দেবেন না বাবা।'

প্রশান্তবাবু বললেন, 'বুদ্ধিমানের কাজই করবেন। তবে যাচ্ছিস কেন? কী করবি সেখানে গিয়ে?'

'এখানে যা করছি সেখানেও তাই করব। ওঁদের একটা স্কুল আছে। সেই স্কুলে পড়াব। আর ওঁদের সঙ্গে থাকব। শুধু মেয়েরাই সেখানে থাকে বাবা।'

'কিন্তু মেয়েদের ভিড়ও তো ভিড়। তুই পারবি ওই ভিড়ের মধ্যে থাকতে?'

'পারব বাবা।'

'কিন্তু আমি যে পারব না।'

বাবাই সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে উঠলেন সুজাতার।

বাড়িতে থেকে কি ধর্মসাধনা চলে না সুজাতার? বাবা দাদা বউদি, এমন কি সাত-আট বছরের ভাইপো বাবলুরও সেই জিজ্ঞাসা, 'পিসীমণি, তুমি কোথায় যাবে? তুমি যেতে পারবে না। তোমাকে যেতে দেবই না।'

হয়তো ওর মা শিখিয়ে দিয়েছে। হয়তো ওর বাবা। হয়তো বা নিজের বুদ্ধিতেই এগিয়ে এসেছে বাবলু।

এক মুহূর্তের জন্যে সুজাতার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মনে হয় আলাদা ধর্মচর্চার কী দরকার। বাবার সেবা-শুশ্রূষায়, দাদা-বউদির সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তর্কবিতর্কে হাসি-ঠাট্টায় আর ওই বাবলুকে নিজের ছেলের মত ভালোবেসে, তাকে আদর করে তার দুটি কচি কোমল হাতের আদর পেয়ে দিব্যি দিনগুলি কাটিয়ে দিতে পারে সুজাতা। তাদের মত মেয়েরা তো এইভাবেই কাটায়। যার স্বামীর সঙ্গে বনিবনাও হয় না, সে বাপ ভাইয়ের সঙ্গে বনিয়ে নেয়। তাছাড়া এই পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে তো আরো একটু কর্মক্ষেত্র আছে সুজাতার। পাড়ার কর্পোরেশন স্কুলটায় সে ছোট ছোট মেয়েদের পড়ায়। পড়াতে তার খারাপ লাগে না। মেয়েরা তাকে ভালোও বাসে। একটা জীবন কাটিয়ে দেওয়ার পক্ষে এই অবলম্বন কি কিছু কম? না সংখ্যায় না গুরুত্বে, এদের অল্প বলা চলে না। তবু তো সুজাতার মন ভরে না। তবু যেন সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এ'রা তো তার পর নয়। বাবা একবার তাকে গোত্রান্তরিত করেছিলেন। সুজাতা আবার তার নিজের গোত্রে ফিরে এসেছে। কিন্তু নিজের জায়গাটি ফিরে পেয়েছে কি? বাইরে থেকে দেখতে গেলে পেয়েছে। কিন্তু ভিতর থেকে অনুভব করতে গেলে পায়নি। এ সংসার তার নিজের নয়। এখানে সে বাহুল্য। নিতান্তই অতিরিক্ত একজন। বাবার কাছে, দাদার কাছে সে স্নেহ পায়, প্রশ্রয় পায়, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু পায় কিনা

খুবই সন্দেহ আছে সুজাতার। বউদি তাকে কখনো মনে করেন জেদী, কখনো মনে করেন বোকা। একান্ত বোকা। নইলে স্বামীর দুটো একটা বাতিক আছে বলে কেউ অমন করে নিজের বাড়িঘর বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে আসে? চোরের ওপর রাগ করে কেউ মাটিতে ভাত খায়? সুজাতার জায়েরা যা বলেন বউদিও সেই কথা বলেন। ছোট বড়ো সবাই বলে, স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থেকে সুজাতা সুবুদ্ধির পরিচয় দেয়নি। তার মানিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। সয়ে যাওয়া উচিত ছিল। মেয়েরা তো সহ্য করবার জন্যেই এসেছে। কিন্তু তারা তো জানে না একটি বিকৃত রুচির মানুষকে নিয়ে দিনের পর দিন বিশেষ করে রাতের পর রাত কাটানো কী কঠিন। যে সুজাতাকে ভালোবাসে না, কি ভালো-বাসার ভান করে, তার হাত থেকে আদর-সোহাগ শাড়ি-গয়না নেওয়া, একই ছাদের নিচে তার সঙ্গে বাস করা যে কী অসহনীয় তা সুজাতার বাবাও বোঝেন না, দাদাও বোঝেন না। যাঁরা তার একান্ত আপন তাঁরাই যদি না বুঝলেন, বাইরের কেউ বুঝবে এমন আশা সুজাতা কী করে করতে পারে?

বাইরের জ্ঞাতিকুটুম্ব যারা এ বাড়িতে এসে সুজাতাকে দেখে গেছে তারা সবাই মুখে সহানুভূতি জানালেও, আর শশাঙ্কের চরিত্রহীনতার নিন্দা করে গেলেও আড়ালে গিয়ে সুজাতারও নিন্দা করেছে, সেটুকু বুঝবার মত বয়স কি তার হয়নি?

সবচেয়ে বড় নিন্দা, বড় লজ্জার কথাও সুজাতার কানে গেছে। মেয়েমানুষ হয়ে সুজাতা তার স্বামীকে খুন করতে গিয়েছিল, প্রায় খুন করে ফেলেছিল, একটুর জন্যে পারেনি। কী করে যেন এই অপবাদ হাওয়ায় হাওয়ায় তার বাপের বাড়ি পর্যন্ত ভেসে এসেছে। শ্বশুরবাড়ির লোকই রটিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের, শশাঙ্ক নিজেই এই অপবাদ রটনায় সাহায্য করেছে। নিজের আচরণ সমর্থন করার জন্যে, নিজের ভালোমানুষি জাহির করবার জন্যে শশাঙ্ক নিজে আত্মীয় বন্ধুমহলে বলে বেড়িয়েছে, সুজাতা তাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল। স্ত্রীকে জেলে কি পাগলা-গারদে না পাঠিয়ে তাই তাকে বাপের বাড়িতে ফেরত পাঠিয়েছে শশাঙ্ক। নির্লজ্জ কাপুরুষ। নিজের স্ত্রীর নামে এই অপবাদ রটাতে তার দ্বিধা হয়নি। তখন তার নিজের কুকীর্তিগুলি সাফাই গাওয়া দরকার ছিল।

অপবাদ ছাড়া কী। স্বামীর অনাচার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সুজাতা অবশ্য মাঝে মাঝে চীৎকার করে বলে উঠেছে, 'তোমাকে খুন করব, গুলী করে মারব, বিষ খাইয়ে মারব।' বলেছে, সুজাতা স্বীকার করে, সে বলেছে। বাড়ির ঝি-চাকর সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছে। গলা ফাটিয়ে চীৎকার করেছে সুজাতা। কিন্তু তার আগে কি বুক ফেটে যায়নি? স্বামী হত্যার কথা সুজাতা মুখেও বলেছে আবার মনে মনে কখনো কল্পনা কামনাও করেছে। কিন্তু সেই বলা সেই চাওয়াটাই কি সব? রাগ হলে বউদি কি মাঝে

মাঝে বলে না, 'তুই মর। তুই মর।' কিন্তু সত্যিই কি আর ছেলের মৃত্যুকামনা করে বউদি?

শশাঙ্ক কি একবারও ভেবে দেখেছে কোন জ্বালায় এমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল সুজাতা? একবারও কি তার মুখের দিকে তাকিয়েছে শশাঙ্ক? তার উন্মথিত মনকে বুঝবার চেষ্টা করেছে? স্ত্রীকে ভালোবেসে—ভালোবেসে না হোক একটু সহানুভূতি, একটু মমতার সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে দেখে নিজের স্বভাবচরিত্র রুচি প্রবৃত্তি বদলাবার কি চেষ্টা করেছে শশাঙ্ক? কিছুই করেনি। উল্টে তার নামে বদনাম রটিয়েছে—সুজাতা বিপজ্জনক খুনী স্বভাবের স্ত্রীলোক। ওর মনের মধ্যে অস্বাভাবিক অপরাধপ্রবণতা জট পাকিয়ে আছে। সেই জট মমতা দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে খুলবার চেষ্টা করেনি শশাঙ্ক, বরং তাকে আরো পাকিয়ে পাকিয়ে জটিল করে তুলেছে।

আশ্চর্য, বাবাও শুনে সব বিশ্বাস করেছেন। গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছেন, 'দরকার নেই ওসব খুনখারাবি, কেলেঙ্কারি কাণ্ডের ভিতর গিয়ে। তুই আমার কাছেই থাক। সবাইর সব সুখ সয় না। ভগবান একজনকে সব সুখ দেন না।'

তারপর ওপর থেকে ভগবানের মতই ভরসা দিয়ে বলেছেন, 'তুই ভাবিসনে, মরবার আগে আমি তোর ব্যবস্থা করে যাব। আমি শুধু ছেলের ভরসায় থাকব না।'

ব্যবস্থা মানে আর্থিক ব্যবস্থা। যেন অর্থটাই সব। যেন সুজাতা মূর্খ নিরক্ষরা অসহায় অক্ষম। যেন বাকি জীবনের জন্যে দু মুঠো ভাতের ব্যবস্থা সে নিজেই করে নিতে পারবে না।

অর্থসাহায্য শশাঙ্কও তাকে করতে চেয়েছিল। কিছুদিন বাদে দেড়শ কি দুশো টাকা মাসোহারা দেবার প্রস্তাব করেছিল।

কিন্তু সুজাতা বলে দিয়েছে, 'এক পয়সাও না।'

শুনে সুজাতাকে সেদিন বোকা খেয়ালী জেদী বলে গাল দিয়েছিল বউদি। দুঃখে রাগে মুখ ভার করে থেকেছিল অনেক দিন। লোকসানটা যেন তারই। কিন্তু বউদি কী করে বুঝবে, যার সব পাওয়ার কথা ছিল সে অমন ছিটেফোঁটা নিয়ে খুশি থাকতে পারে না। যে দু' পায়ে সব ঠেলে এসেছে সে হাত পেতে কোন লজ্জায় করুণাকণা ভিক্ষা করবে?

বরং যেদিন সুজাতা শুনল স্বামী তার নামে ফৌজদারী মামলা না এনে যেখানে-সেখানে দজ্জাল খুনী মেয়েমানুষ বলে তার নামে কুৎসা রটাচ্ছে সেদিন এক দুঃসাহসের কাজ করে বসেছিল সুজাতা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘষে ঘষে সিঁথির সিঁদুর তুলে ফেলেছিল। দাঁতে দাঁত ঘষে মনে মনে বলেছিল, 'খুন করলাম। তোমাকে সত্যিই খুন করলাম।'

বাবা দেখে খুশি হননি। বলেছিলেন, 'এ কী ব্যাপার? ছি ছি ছি। সিঁদুর পরছিস না কেন?'

অতিআধুনিকা বউদি, ঠানদির মত আঁতকে উঠে বলেছিলেন, 'ছি ছি ছি, এ কী অলক্ষুণে কান্ড! সধবার সিঁথির সিঁদুর কি তুলতে আছে? কল্যাণ-অকল্যাণের কথা থাক, কিন্তু বড়ো বিশ্রী দেখায়। তুমি আবার সিঁদুর পরো বুলু।'

শুধু দাদা বলেছিল, 'বেশ করেছিস। এমনি করেই প্রতিবাদ করতে হয়। বিয়ে করবার পরেও সে যদি অবিবাহিতের মত চলতে পারে, ম্যারেড লাইফের কোন স্যাংটিটি না রাখে, তুই বা পারবিনে কেন? যে সিঁদুরের কোন মূল্য নেই তা কেন পরতে যাবি? দূর-দূর।'

সিঁদুর পরতে এমনিতেও অসুবিধে বোধ করত সুজাতা। যার জন্যে সিঁদুর সে যদি কাছে না থাকে, কাছে না রাখে, পরিচিত-অপরিচিত অনেকেরই সরব-নীরব জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে হয়। সে সব প্রশ্নের জবাব কি সব সময় দেওয়া চলে, নাকি দিতে কারো ইচ্ছে হয়? তার চেয়ে অপরিচিত আধা-পরিচিত কেউ যদি ভাবে, সুজাতা এখনো কুমারী আছে, তার সেই ভ্রান্ত ধারণায় বরং নিরাপদে থাকা যায়। সিঁথির সাদা রেখার ওপর কারো কারো উৎসুক আগ্রহী সানুরাগ দৃষ্টি সকৌতুকে লক্ষ্য করতে বরং মন্দ লাগে না।

একবার সিঁদুর তুলে ফেলে দ্বিতীয়বার আর তা পরতে পারেনি সুজাতা। লজ্জায় সংকোচে আঙুল যেন অসাড় হয়ে গেছে।

সিঁদুর পরেনি। কিন্তু সেই সঙ্গে এক যুক্তিহীন অপরাধবোধও তার মনকে অশান্ত করে তুলেছে। এক অসহনীয় আশঙ্কা আর অস্বস্তিতে ভরে দিয়েছে।

এতে কি সত্যিই অকল্যাণ হবে শশাঙ্কের? সত্যিই কি কোন দুর্ঘটনা ঘটবে? অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কায় তার মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে? বেনেপুকুর থেকে কোন ফোন এলে সুজাতা দুরু দুরু বুকে পাংশু মুখে অপেক্ষা করেছে। কিছু ঘটেনি শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছে। এই মানসিক উদ্বেগ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তবু ফের সিঁদুর পরতে পারেনি।

এক দুঃসহ অপরাধবোধ আর গ্লানি তার মনকে ভরে রেখেছে। সত্যিই কি সুজাতা তার স্বামীর মৃত্যু কামনা করেছিল? কি এখনো করে? সুযোগ পেলে সুজাতা কি তাকে সত্যিই হত্যা করত?

জায়েরা মন্দিরার সঙ্গে তার স্বামীর ঘনিষ্ঠতার কথা সরস কৌতুকের সঙ্গে যখন তার কানে তুলে দিলেন, সুজাতা ঠিক একই ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। মনের মধ্যে ঠিক একই রকম বিক্ষোভ উত্তেজনা, সেই নিষ্ফল জিঘাংসা আর প্রতিশোধস্পৃহা তার মনকে পরম বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। সুজাতার মনে হয়েছিল স্বস্তি সুস্থতা সে বোধ হয় আর ফিরে পাবে না।

তার সেই অস্থিরতা দেখে বউদি বারবার জিজ্ঞাসা করেছে, 'তোমার কী হয়েছে বলো? শরীর খারাপ করেছে?'

'না।'

'তবে।'

তবে যে কী সে কথা কাউকে আর বলা যায় না। যে স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘদিন সে সম্পর্ক ছেদ করে এসেছে এখনো তার নিত্যনতুন অনাচারের কথা শুনলে সুজাতার মন ঠিক আগের মতই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সুজাতার মনে হয়, স্বামীর কাছ থেকে সরে এসে সে তাকে স্বেচ্ছাচারের পূর্ণ সুযোগ দিয়ে এসেছে। শশাঙ্কের কোন পরিবর্তন হয়নি, লজ্জা হয়নি, অনুতাপ আসেনি, সুজাতার ওপর বিন্দুমাত্র মমত্ব জাগেনি, সে তার আগের পথেই চলেছে। এখন আর তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। অবাধে সে তার সাধ মিটিয়ে চলেছে। যে ঘরে সুজাতা থাকত সে ঘরে নিত্য নতুন মেয়ে এসে বাস করছে। এই অনুমান তার মনে এখনো জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তাকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেয় না।

জায়েরা পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'চলে আয়, দূরে থেকে আর নিজের সর্বনাশ করিসনে। যেটুকু বাকি আছে, এখন যদি আসিস, সেটুকু অন্তত রাখতে পারবি।'

কিন্তু কে কাকে রক্ষা করবে? সুজাতার কি আর সেই শক্তি আছে? যে স্ত্রীকে প্রলয়ঙ্করী সংহারকারিণী বলে চিনে রেখেছে শশাঙ্ক, আত্মীয়স্বজনের কাছে অপবাদ রটিয়ে দিয়েছে, তাকে সে আর বাড়িতে ঢুকতে দেবে কেন? আর ঢুকেই বা কী করবে সুজাতা? সেই অগ্নিদাহ আর মৃত্যুজ্বালা। সেই দুঃখ আর গ্লানির পুনরাবৃত্তি সুজাতা আর চায় না। চায় না। তবুও সব খবর কানে এলে তার মনের প্রশান্তি নষ্ট হয়ে যায়। তার নিত্য কর্মপদ্ধতি বিপর্যস্ত হয়। পড়াশুনো ধ্যান-ধারণায় কিছুতেই আর সে মন দিতে পারে না। এখনো আত্মসংযম আসেনি সুজাতার। এই সংসারে থেকে বোধ হয় আসবেও না। আরো দূরে সরে যেতে হবে। এমন পরিবেশ এমন নিভৃত নির্জন জায়গা বেছে নিতে হবে যেখানে তার স্বামীর নামগন্ধ গিয়ে পৌঁছবে না, তার কীর্তি-কাহিনীর কোন সংবাদ প্রচারিত হবে না। সেই জায়গায় সুজাতা নিশ্চিন্ত মনে প্রশান্তচিত্তে নিজের সাধনার পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

তাছাড়া চিত্তবিক্ষোভ শুধু এক রকমের নয়। বিক্ষোভের হেতু শুধু যে একটিই তাও মনে করা ভুল। চোখের সামনে দাদা-বউদির সুখের সংসার নিত্য দেখে সুজাতা। তাদের দাম্পত্যলীলা আদর সোহাগ মান-অভিমান, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হইচই, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ পান-ভোজন, সবই তো চোখে পড়ে সুজাতার, সবই তো কানে যায়। এদের আনন্দ উৎসবে, আত্মীয় বন্ধুদের আদর আপ্যায়নে সুজাতাকেও এগিয়ে যেতে হয়। না গেলে নিজের মনই খুঁত খুঁত করে। লজ্জা

হয়। সে তো এই বাড়িরই মেয়ে। আর এখন তো শুধু মেয়েই। বধূত্ব সে বিসর্জন দিয়ে এসেছে। মেয়ে হিসাবে, বোন হিসাবে যেটুকু তার কর্তব্য সেটুকু না করতে পারলে তার নিজেরই অস্বস্তির সীমা থাকে না। অথচ এ সব কাজে সত্যিই আর তেমন কোন আগ্রহ বোধ করে না সুজাতা। তবু যেতে হয়। দাদা বউদির তাসের আসরে গিয়ে বসতে হয়, কোন কোন দিন সিনেমা থিয়েটারেও দাদা তাকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু যেখানেই যাক সুজাতা আনন্দ পায় না। তার মনে হয় সে এদের মধ্যে বড়ো বেমানান। এদের মধ্যে তার স্থান নেই। সুজাতার মনে হয় সবাই তাকে এখানে অনুকম্পা করে। সংসারে সে এখন যা পায় তা যেন আর দাবির জোরে পায় না, অধিকারের জোরে পায় না, দুর্ভাগ্যের সান্ত্বনা হিসাবে পায়। কিন্তু এই প্রাপ্তিতে কি আর মন ভরে? হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে যায়? যায় না। সুজাতা এমন কিছু পেতে চায় যাতে তার সব না-পাওয়া প্রাপ্তিতে পরিণত হয়, সব শূন্যতা ভরে ওঠে। মনের সব হাহাকারের অবসান হয়। কিন্তু সেই প্রাপ্তি এখানে কোথায়।

প্রাপ্তি নেই। কিন্তু দিনরাত এই ভোগ-সম্ভোগে ভরা সংসারের মধ্যে বাস করে বলে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাটুকু আছে। সেই তৃষ্ণা সহজে মরতে চায় না। সে কোন্ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা? নিশ্চয়ই কোন মহৎ আকাঙ্ক্ষা নয়। ঘুমোবার আগে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সুজাতা তার আচার আচরণের বিচার করে। হিসাব করে দেখে কতখানি এগিয়েছে। পথরেখা মোটেই চোখে পড়ে না। মনে হয় সে এগোয়নি, এগোতে পারেনি। শুধু চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। এখনো কত মান অভিমান, ছোট ছোট ঈর্ষা হিংসার কাঁটা তার মনকে ক্ষতবিক্ষত করে।

সুজাতার সামনেই দাদা আর বৌদি যখন দাম্পত্য আলাপ জুড়ে দেয় আর সেই আলাপের ভিতর থেকে তাদের এক পরম অন্তরঙ্গ রহস্য-মধুর সম্পর্কের আভাস আসতে থাকে, সুজাতার মন অস্বস্তিতে ভরে ওঠে। কখনো মনে হয় ন্যাকামি, কখনো মনে হয় অশোভন নির্লজ্জতা, কখনো বা অকারণে ওদের নিষ্ঠুর বলেও মনে হয় সুজাতার। পরে বুঝতে পারে তার এই বিরূপতার মূলে কী আছে। ঈর্ষা আর হিংসা ছাড়া কিছু নয়। নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না সুজাতা। ছি ছি ছি, এখনো তার মন এইসব তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতার মধ্যে ডুবে আছে। এখনো সে এই হীনতা সঙ্কীর্ণতার ওপরে উঠতে পারল না। বৃথাই সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গীতা উপনিষদের পাতা ওল্টায়।

দাদার সঙ্গে বউদিকে দেখলে তার হিংসা হয়। বাবলুকে আদর করা নিয়ে যখন দুজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় সুজাতা সেখান থেকে সরে যায়। দাদা বউদির এই বাৎসল্যকে সে কিছুতেই স্বাভাবিক প্রসন্নতায় গ্রহণ করতে পারে না। লজ্জায় আর অনুশোচনায় মরে যায় সুজাতা। ছি ছি ছি, ছি ছি ছি। এই কি তার ধর্মপথে অগ্রগমন! এই কি তার রিপুজয়ের সাধনা!

ছেলেকে নাওয়ানো খাওয়ানো, স্কুলে পাঠানো, স্কুল থেকে সময়মত না ফিরলে উৎকণ্ঠায় সময় কাটে বউদির। সুজাতা মাঝে মাঝে চেয়ে চেয়ে দেখে। কোন কোন সময় ভারি বাড়াবাড়ি মনে হয়। ছেলে যেন আর কারো হয় না, শুধু ওদেরই হয়েছে। বউদির এই অতি বাৎসল্য, স্নেহান্ধতা অসহ্য লাগে সুজাতার। নন্দিতা যদি কখনো বলে, 'বাবলুর মাথাটা একটু আঁচড়ে দাও তো।' সুজাতার মুখ থেকে বেরিয়ে যায় 'তুমিই আঁচড়াও। আমার সিঁথি করা ওর পছন্দ হবে না বউদি।' নন্দিতা একটু গম্ভীর হয়ে যায়, তারপর মুখে হাসি টেনে বলে, 'পছন্দমত করে দিলে হবে না কেন। কারো মন জোগাতে তো আর শিখলে না। শুধু নিজের মন নিয়েই পড়ে রইলে।'

সুজাতা তাড়াতাড়ি সরে যায় সেখান থেকে। পাছে আরো কথা কাটাকাটি হয়। সুজাতার মুখ থেকে পাছে আরো বেশি রূঢ় কথা বেরিয়ে পড়ে।

সরে যায় কিন্তু জ্বালা অত তাড়াতাড়ি যায় না। অনেকক্ষণ ধরে বিদ্বেষে বিক্ষোভে জ্বলতে থাকে। তারপর অনুশোচনার জ্বালা শুরু হয়। ছি ছি ছি, এই তার ধর্মসাধনা? এই তার অগ্রগমন? না, এখানে যেমন অগ্রগতি আছে, তেমনি পশ্চাৎ গতিরও বিরাম নেই। এখান থেকে যদি সরে যেতে না পারে সুজাতা, তা হলে জীবনভোর সে এমনি এক-পা এগোবে আর এক-পা পিছোবে। একটি সিঁড়ি উঠবে আবার আর একটি সিঁড়ি নামবে। চঞ্চল বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে কিছুতেই নিজের উপলব্ধির আসনটিতে স্থির হয়ে বসতে পারবে না। যদি ইষ্ট বস্তুকে চায় এখান থেকে সরে যেতেই হবে সুজাতাকে।

কিন্তু যাবে কোথায়। সত্যি সত্যিই তো বনে-জঙ্গলে গুহাগহ্বরে গিয়ে বাস করতে পারে না। পুরুষ হলে যা পারত—ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে—মেয়ে হয়ে সে সাধ মেটাবার জো নেই। অনেক অসুবিধে আছে। বাবার সঙ্গে ছোট বড় অনেক সাধু মহান্তের আশ্রম ঘুরে দেখেছে সুজাতা। কোথাও বাস করবার মত স্পৃহা বোধ করেনি। বরং অনেক জায়গায় রীতি-নীতি দেখে তার অরুচি ধরেছে। দাদা যতই তাকে আঠার শতকে কি আরো দুশো বছর আগে মধ্যযুগে ঠেলে দিক, সুজাতা তো সত্যিই সেকালের নয়। এ যুগেরই রুচি শিক্ষায় শাসিত মার্জিত তার মন। সেও সাধুদের উদ্ভট অহেতুক কৃচ্ছ্রতার অর্থ গ্রহণ করতে পারেনি, অনেক আশ্রমকে কতকগুলি নিরর্থক শাসন-অনুশাসন বিধিনিষেধ ভরা লোকসঙ্ঘ বলে তার মনে হয়েছে। নিষেধের দেয়াল যেমন আছে তার ছিদ্রপথেরও তেমনি অভাব নেই। কোন কোন আশ্রমকে মনে হয়েছে ছোট ছোট রাজ্য কি জমিদারি। আর শিষ্যাশিষ্যারা সেখানে প্রজাপুঞ্জ। আইন যেমন আছে আইনের ফাঁকও তেমনি আছে। আইন-জীবীর মেয়ে সুজাতা, আইনজীবীর বোন। আইনের ফাঁক যে কী বস্তু তা সে কিছু কিছু জানে। অপরাধীদের যত বেশি নিরপরাধ বলে প্রমাণ করতে পারেন ওঁরা, তত ওঁদের যশ তত ওঁদের অর্থ। তেমনি অনেক আশ্রমে আইন

বিধিনিষেধ শুধু শিষ্যদের জন্যে, গুরুদের জন্যে আইনের ফাঁক। তবু এসব দেখেও দাদার মত ধর্মকে সুজাতা অগ্রাহ্য করতে পারেনি। মানতে পারেনি ধর্ম গাঁজা-আফিম-চণ্ডু-চরসের সগোত্র। অর্থের অপব্যবহার হয় বলে কেউ কি অর্থকে বাদ দিয়ে চলে? সুজাতা নানা ধর্ম-প্রতিষ্ঠানে যত আবিলতা যত কলুষতা দেখেছে ততই সে যেন ধর্মের বিশুদ্ধ রূপকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করেছে।

দক্ষিণ শহরতলীতে যে কল্যাণ আশ্রম আছে, প্রথম প্রথম বাবার সঙ্গে সেই আশ্রমে গিয়েছে সুজাতা। ঘুরে ঘুরে দেখেছে, কখনো বা বসে বসে শুনেছে স্বামী শুদ্ধানন্দের কথা। কল্যাণ শুধু নামে নয়, কল্যাণ ওঁদের কর্মে আচরণে, মননে ভাষণে। তা ছাড়া অমন প্রশান্ত সৌম্যদর্শন রূপবান পুরুষ খুব কমই দেখেছে সুজাতা। তার স্বামীও রূপবান। কিন্তু সেই রূপের সঙ্গে কোথায় যেন অশান্ত চঞ্চলতা, আসক্তির আকুলতা জড়িয়ে আছে। সে রূপও একদিন সুজাতাকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু সে মোহের পরিণাম যে কী তা তো সুজাতা দেখল। সে রূপ নিজের সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু নিজের মধ্যে নিজে পরিতৃপ্ত নয়। তার তৃপ্তির জন্য আর একটি আধারের দরকার। শুধু একটি নয়, অসংখ্য। সেই রূপতৃষ্ণার সীমা নেই, পরিমাপ নেই। কিন্তু গেরুয়া পরিহিত স্বামীজীর মধ্যে যে রূপ সুজাতা দেখতে পেয়েছে সে যেন পাহাড় পর্বতের রূপ। সে রূপ নিজের সম্বন্ধে অচেতন, সে রূপ দর্শনে মনে কোন অশান্তির উদয় হয় না। পঞ্চাশের ওপর বয়স হয়েছে। কিন্তু প্রৌঢ়ত্ব দেহকে কিছুমাত্র বিকৃত করেনি। মাথার চুল গোঁফ দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো। পেকেছে কিনা বোঝা যায় না। পাকলেও যে তাঁর সৌন্দর্যের কোন হানি হতো, মনে হয় না সুজাতার। তাঁর সৌন্দর্য শুধু কান্তিতে নয় বরং কর্মে। এই যোগীকে কখনো পদ্মাসনে দেখেনি সুজাতা। বাবা যেমন চেয়ার টেবিল সামনে নিয়ে কাজ করেন ওঁকেও তেমনি কর্মরত দেখেছে। আশ্রম তো নয় যেন এক অফিসঘর। টেবিলের ওপর রাশ রাশ ফাইল। এপাশে ওপাশে দুজন স্টেনো টাইপিস্ট। শুদ্ধানন্দ বিশুদ্ধ ইংরেজীতে ডিক্টেশন দিচ্ছেন। কখনো বা নিজেও ওঁকে লিখতে দেখেছে সুজাতা। কল্যাণ শুধু আশ্রমের নামই নয়, দেশময় কল্যাণকর্মের সঙ্গে এ আশ্রম সংযুক্ত। এঁদের বাইরের কোন বিভূতি নেই, এঁরা ভস্মও গায়ে মাখেন না, তাবিজ কবচ বিতরণ করেন না। এঁদের কর্মীরা সব কর্মব্যস্ত। সে কর্মে অলৌকিকতা কিছু নেই, সবই লৌকিক সবই লোককল্যাণের। স্কুল কলেজ হাসপাতাল সেবাশ্রম মহিলাশ্রমে এঁদের কর্মীরা নিযুক্ত। যাঁরা বাইরের তাঁরা মাইনে নেন। যাঁরা চালান তাঁরা কিছুই নেন না। তাঁরা শুধু দেবার জন্য এসেছেন।

সুজাতার নিজের সাহস ছিল না, সাধ্য ছিল না শুদ্ধানন্দর কাছে যায়; তাঁর সামনের চেয়ারে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারে। কিন্তু অনেকদিন

আগে থেকেই বাবার সঙ্গে ওঁর আলাপ। তিনি যখন স্বামীজী হননি, শুধু ব্রহ্মচারী মাত্র, তখন থেকে ঘনিষ্ঠতা। আইন আদালতের কিছু কিছু কাজও সুজাতার বাবা করে দিয়েছেন ওঁদের। সুজাতার মন যাতে শান্ত হয় সেজন্যে বাবাই তাকে ওঁর কাছে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর থেকে সুজাতা নিজেই আসে।

যেদিন নিজের কথা প্রথমে বলতে শুরু করেছিল সুজাতা, শুদ্ধানন্দ তাকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিয়েছিলেন, 'আমি জানি, আমি সব শুনেছি।' কর্মব্যস্ত সন্ন্যাসী নিজের কাজে মন দিয়েছিলেন। তাঁর রূঢ়তায় সুজাতা একটু দুঃখ পেয়েছিল। শুনলেও কি শোনাতে ইচ্ছা করে না। তাঁর হয়তো শুনবার দরকার নেই, কিন্তু সুজাতার যে বলা বড়ো দরকার।

হয়তো সঙ্গে সঙ্গে সে কথা তাঁর মনে হয়েছিল। পরমুহূর্তে তিনি ফাইল থেকে মুখ তুলে প্রসন্ন হেসে বলেছিলেন, 'তুমি বুঝি আরো কিছু বলতে চাও। আচ্ছা আর একদিন শুনব।'

তারপর শুধু একদিন নয়, একাধিক দিন নিজের কথা বলবার সুযোগ পেয়েছে সুজাতা। নিজের সমস্ত যন্ত্রণা, অপরাধ আর অনুশোচনার কথা তাঁর কাছে প্রকাশ করেছে। লজ্জা, সংকোচ মাঝে মাঝে এসে যে বাধা না দিয়েছে তা নয়, কিন্তু সেই সংকোচকে অতিক্রম করেছে সুজাতা। সন্ন্যাসী নিতান্ত নিস্পৃহভাবে নিজের কাজ করতে করতে শুনেছেন। যেন গাছের কাছে কথা বলছে সুজাতা, যেন পাহাড়ের কাছে বলছে, যেন গর্জমান জল-প্রপাতের কাছে আত্মনিবেদন করছে। সেই প্রপাতের শব্দে আর কিছুই কানে যাচ্ছে না। নিজের কথা নিজেও শুনতে পাচ্ছে না সুজাতা। যেন বলা শুধু বলবার জন্যেই।

সুজাতা বলেছিল, 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমি যেন পাগল হয়ে যাব।'

তিনি হেসে বলেছিলেন, 'কেন, পাগল হবার কী আছে। তুমি তো শুধু একা নও, অমন আশঙ্কা আমাদের সবাইরই হয়। শুধু আশঙ্কা কেন। কতবার আমরা সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাই। সুস্থতার সীমা ডিঙিয়ে যাই, কিন্তু আবার ফিরেও আসি। সেইটাই বড়ো কথা। সেই ফিরে আসবার পথ খোলা রাখতে হবে।'

সুজাতা উপমার আশ্রয় নিয়ে বলে, 'আমার মনে হয় আমার মন কাদা-জলের মত, ঘোলাজলের মত। সেই জলের তলে কী যে হচ্ছে না হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারিনে। আমার কিছুই দেখবার জো নেই।'

শুদ্ধানন্দ আশার কথা শোনান। 'ও তোমার ভুল ধারণা। তুমি বেশি কবিত্ব করে কথা বলছ। আমাদের মন যেমন আবিল হয়, তেমনি নির্মলও হয়। আমরা ফুল দেখি, তারা দেখি, শিশুর মুখের হাসি দেখি। শুধু

চোখ দিয়ে দেখিনে মন দিয়ে দেখি। মন কখনো সমল, কখনো নির্মল। কখনো স্ববশ, কখনো রিপুর বশ। নির্মলতাকে স্থায়ী করবার সাধনাই সাধনা।'

তিনি সুজাতাকে কোন দীক্ষার কথা বলেননি। বলেছেন, 'যখন সময় হবে, তখন নিজেই নিজের পথ ঠিক করে নিতে পারবে।'

কিন্তু এই সংসারে থেকে এই পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে বাস করে নিজের মনের সেই প্রশান্তি সেই স্থায়ী নির্মলতা আনতে পারছে না সুজাতা।

শেষ পর্যন্ত তিনি রাজী হয়েছেন। কল্যাণ আশ্রমেই মহিলা বিভাগে সুজাতার থাকবার ব্যবস্থা তিনি ঠিক করে দিয়েছেন। পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা। ইচ্ছা করলে সে যেকোন দিন চলে আসতে পারবে। কিন্তু চলে আসবার কথা এখন ভাবছে না সুজাতা। এখন চলে যাওয়ার জন্যেই সে ব্যাকুল।

সঙ্কল্পের জোর আছে সুজাতার। তা না থাকলে এতকাল স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারত না। হাতে পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি করে তাঁর কাছেই ফিরে যেত। মুখ বুজে তাঁর সমস্ত অনাচার সহ্য করত। কিন্তু 'আমার যা ভালো লাগে না, যা আমি খারাপ বলে মনে করি, তা সহ্য করব না, তাতে আমার যত ক্ষতি হয় হোক, কপালে যত লাঞ্ছনা গঞ্জনা জুটুক আমি তা গ্রাহ্য করব না' মনের এই জোরই তাকে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।

স্বামী বলতেন, 'জোর নয়, জেদ। মেয়েমানুষের এত জেদ থাকবে কেন?'

সুজাতা জানে, তিনি নারীত্ব আর দৃঢ়তার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পেতেন না। তাঁর ধারণা ছিল, জেদ পুরুষের ভূষণ কিন্তু নারীলাবণ্যের শত্রু। নারী মানে তাঁর কাছে ছিল শুধু নমনীয়তা, কমনীয়তা—যেমন দেহে তেমনি মনে। নারী মানে অভিমান আর অশ্রু; নারী মানে অনুচ্চ ভাষণ, অনুচ্চ হাসি, আভাস আর ইশারা—তার স্বামীর ধারণা ছিল। নারীকে তিনি রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে করতেন না। যদিও তাঁর নিজের মনে রক্ত-মাংসের ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই ক্ষুধাকে তিনি তুলির রঙে রাঙাতেন, কবিতা দিয়ে মুড়ে রাখতেন। নারী মানে তাঁর কাছে ছিল শুধু রেখা আর রঙ, শুধু ছন্দ আর মিল। সুজাতা বুঝতে পারত, সেই মিল স্বামী তার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন না। সুজাতার শুচিতা পরিচ্ছন্নতা, তার সংযম আর দৃঢ়তার মধ্যে স্বামী শুধু নীরস গদ্যকে দেখতেন, কাব্যরূপ দেখতে পেতেন না।

সুজাতার মনে পড়ে, গোড়া থেকেই কত অমিল ছিল দুজনের মধ্যে। সুজাতা ভালোবাসত ঘরদোর সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে। তিনি ভালো-বাসতেন অগোছালো, অপরিচ্ছন্ন হয়ে বাস করতে। সিগারেটের ছাই জুতোর

ধুনো সারা বাড়িতে ছড়িয়ে রাখতে। মদের গন্ধ, আর সেই গন্ধে তাঁর যে সব বন্ধু এসে জুটত, সুজাতা তাদের কাউকে সহ্য করতে পারত না। আর তিনি বলতেন, 'কেন পারবে না। এতে দোষ কিসের। তুমি একালের মেয়ে। তোমার এত শুচিবাই থাকবে কেন?'

সুজাতা বলত, 'যা শুচিতা, তা চিরদিনেরই শুচিতা, যা ভালো, তা একালেও ভালো, সেকালেও ভালো।'

স্বামী হেসে উঠতেন, 'তুমি একখানি আস্ত মনুসংহিতা। আমি চাইলাম রাধা, তুমি হলে রক্ষাচণ্ডী। কবে যে গেরুয়া পরে, রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়ে ত্রিশূল হাতে বেরিয়ে পড়বে, আমার সেই ভয়।' তিনি হাসতেন।

কে জানে তখন থেকেই মনের মধ্যে গেরুয়া রঙ ঝরতে শুরু করেছিল কিনা সুজাতার। তখন থেকেই মন উদাসীন হতে শুরু করেছিল কিনা। বৈরাগ্যের উদাস বাঁশী তখন থেকেই বাজতে শুরু করেছিল হয়তো।

সুজাতার মনে কি সুন্দরের ধারণা ছিল না? অবশ্যই ছিল। ছেলেবেলা থেকেই সে দেবদেবীর মূর্তিকে সুন্দর দেখত, পূজার বেদীকে সুন্দর দেখত, দেবমন্দিরের সঙ্গে তার সৌন্দর্যের বোধ এক হয়ে গিয়েছিল। মায়েরও ফুলের বাগান ছিল। দেশী ফুলের বাগান। যুঁই, শিউলি, টগর, গন্ধরাজ, নানা রঙের নানা আকারের গাঁদা। মা বলতেন, 'সাদা ফুলেই দেবতারা বেশি তুষ্ট হন। সাদা ফুলের গন্ধ বেশি। যে ফুল পুজোয় লাগে সেই ফুলই সুন্দর। ফুল পুজোয় লাগে বলেই সুন্দর।'

সৌন্দর্যের সঙ্গে সাধনা আরাধনার ভাব ছেলেবেলা থেকেই মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল সুজাতার। মাকে কখনো চুলে ফুল পরতে দেখেনি সুজাতা, কখনো ফুল শুঁকতে দেখেনি।

মা বলতেন, 'ফুল শুধু পুজোর জন্যে, দেবতার জন্যে। ফুল মানুষের ভোগের জন্যে নয়। দেবতার প্রসাদী ফুল আশীর্বাদী ফুল মাথা পেতে নিবি। আর কোন অঙ্গে ফুল পরলে মানায় না। আর কোন অঙ্গে ফুল তুললে পাপ হয়। ফুল শুধু উত্তম অঙ্গের জন্যে।'

মায়ের সেই উপদেশ মাতৃস্নেহের মতই তার জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। কিছুতেই সে অন্য চোখে জীবনকে দেখতে পারেনি, অন্য জীবনদর্শনকে অন্তরের মধ্যে নিতে পারেনি সুজাতা।

মা লেখাপড়া জানতেন। মিশনারী স্কুলে কয়েক বছর পড়েছিলেন। তিনি গোঁড়া ছিলেন না। চালচলনে আচার আচরণে অনেক হিন্দুয়ানীকে বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু সংযম আর শুচিতাকে বাদ দেননি।

তাই বলে কি দাম্পত্য জীবনে ওঁরা অসুখী ছিলেন। নাকি সে জীবনে কোন রূপ রঙ রসের স্পর্শ ছিল না? সুজাতার সে কথা মনে হয়নি। বরং পিছু ফিরে তাকালে সুজাতা বাবা-মা'র স্নিগ্ধ মধুর দাম্পত্যজীবনের চিত্রই

বেশি দেখতে পায়। মায়ের ধর্মাচরণকে বাবা ব্যঙ্গ করতেন না, বরং সমর্থন করতেন। তিনি বুঝতে পারতেন মেয়েদের পুতুলেরও দরকার আছে, প্রতিমারও দরকার আছে। তাঁর উচ্চ দর্শনের চূড়া থেকে বাবা বারবার নেমে এসে মায়ের হাত ধরতেন। তাতে তাঁর জাত যেত না। সেই হাত মৃত্যু ছাড়া আর কেউ ছিনিয়ে নিতে পারেনি।

কিন্তু স্বামীর বাড়িতে এসে কী দেখল সুজাতা! একেবারে বিপরীত চিত্র। তাঁর স্বামী ধর্মকে ব্যঙ্গ করেন, শুচিতাকে শুচিবায়ুতা মনে করেন। তাঁর রুচি তাঁর রূপবোধের সঙ্গে সুজাতার কোন মিলই নেই। তিনি এক হাতে অনেকের হাত ধরতে চান। শুধু একটি মেয়ের মুঠি তাঁকে তৃপ্তি দেয় না।

অনেকে সহ্য করে নেয়। কিন্তু সুজাতা সইতে পারল না। হয়তো তারই দোষ।

তবু প্রথম প্রথম সইতে কি চেষ্টা করেনি? চেষ্টা করেনি নিজের বাড়িতেই আলাদা হয়ে থাকতে? নিজের আচার অনুষ্ঠান ধ্যানধারণা নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে বাস করতে? সুজাতার সেই ঘরে শিবের মূর্তি ছিল, বুদ্ধমূর্তি ছিল। লুকিয়ে স্বামীর প্রতিকৃতিও সেখানে রেখেছিল সুজাতা। কেউ জানে না, রেখেছিল। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল তত সেই সুন্দর মূর্তির সঙ্গে আসল স্বামীর ব্যবধান বেড়ে চলল। সুজাতার আর সহ্য হল না।

তিনি বলতেন, 'তুমি শুধু আমাকে পাথরের মূর্তি করে রাখতে চাও। কিন্তু আমি রক্তমাংসের মানুষ।'

সুজাতা বলত, 'তুমি শুধু রক্তমাংসেরই মানুষ। রক্তমাংস ছাড়া আর কিছু চেন না।'

তিনি বলতেন, 'আর তুমি রক্তমাংস বাদ দিয়ে চলতে চাও।'

সুজাতার স্বামীও অবশ্য মাঝে মাঝে রক্তমাংস বাদ দিতে চাইতেন। লতার মত ফুলের মত নদীর মত ঝরনার মত মেয়েকে চাইতেন তিনি। কিন্তু কেউ কি আর কোমলা অবলা হয়ে সব সময় থাকতে পারে? তা থাকতে হলে সেজে থাকতে হয়। সে রূপসজ্জা স্টেজে চলে, শিল্পীর তুলিতে চলে, লেখকের কলমে চলে, কিন্তু বাস্তবজীবনে চলে না। সুজাতা পারেনি। কিছুতেই পটের বিবি হয়ে সৌন্দর্যের মূক প্রতিমা হয়ে বসে থাকতে পারেনি।

অথচ স্বামী যেন তাই পছন্দ করতেন। তাঁর ঘরে নবযৌবনা নারীর নগ্নরূপের ছবি টাঙানো থাকত। যে সব ছবি দেখলে দু হাতে চোখ ঢাকতে ইচ্ছা করে, তিনি সেই ছবিগুলি অনুক্ষণ দেখতেন, অপলকে দেখতেন। গদ্যেই হোক আর ছন্দোবন্ধেই হোক, সাহিত্যের যেসব কথা শুনলে কানে আঙুল দিতে ইচ্ছা করত সুজাতার, তিনি সেই সব শ্লোক সোহাগে সাগ্রহে আবৃত্তি করতেন।

সুজাতার মনে উল্টো প্রতিক্রিয়া হতো। অনুরাগের বদলে বিরাগ আসত। আর স্বামী বলতেন, 'তুমি পাথরের প্রতিমা।'

কিন্তু সেই পাথর যে মাঝে মাঝে ফেটে চৌচির হয়ে যেত তা তিনি লক্ষ্য করতেন না।

মাঝে মাঝে রাগের বশে সুজাতা অস্বাভাবিক কাণ্ড করে বসেছে, আজ সে কথা সে স্বীকার করে। তার ঘরে তো শুধু শিবমূর্তিই ছিল না, খড়্গধারিণী কালীমূর্তিও ছিল, দশপ্রহরণধারিণী দুর্গামূর্তিও ছিল। এখন ভাবলে হাসি পায়, কিন্তু তখন সুজাতা নিজেকে মাঝে মাঝে তাঁদের অংশ বলে মনে করত। আর সেই দশপ্রহরণের দু একটি প্রহরণ নিজের হাতে তুলে নেওয়ার জন্যে তার হাত নিসপিস করত। মাঝে মাঝে নিতও। এখন ভাবলে দুঃখ হয়, লজ্জা হয়, কিন্তু তখন প্রচণ্ড ক্রোধে ত্রিনয়নে রক্তনয়নে বধ্য অসুররূপে সে একজনকেই দেখতে পেত—স্বামীকে। তখন তার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকত না। বিচার-বিবেচনা হিতাহিত বোধ লোপ পেত।

স্বামী মাঝে মাঝে তাকে মনে করিয়ে দিতেন, 'আমি প্রথম রিপুর দাস আর তুমি দ্বিতীয় রিপুর দাসী। আমরা কেউ কর্তা গিন্নী নই, শুধু চাকর-চাকরানী। তাদের সংসার বেশি দিন চলতে পারে না।'

চললও না।

আজ গার্হস্থ্য জীবন ছেড়ে অন্য জীবনের পথে পা বাড়াতে গিয়ে সেই ছেড়ে-আসা ঘর, ফেলে-আসা দিনগুলির কথা বড়ো বেশি করে মনে পড়ছে সুজাতার। দিন-রাতের মধ্যে অনেকবার করে নানা ছলে, নানা সূত্রে মনে পড়ছে। সুজাতা অবশ্য সব ভুলে যেতে চায়। তবু কে যেন মনে করিয়ে দিতে ছাড়ে না। যে পার্ট তার হয়তো একদিন ছিল—আজ আর নেই, কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রম্পটার সেই পার্টই সুজাতার কানে কানে গুঞ্জরণ করে চলেছে। মৌমাছির গুঞ্জরণ নয়, বোলতার ডাক। তবু মাঝে মাঝে তাকে মৌমাছি বলে ভ্রম হচ্ছে কেন? এ কি মায়া? এ কি মমতা? যাওয়ার আগে তারা তার দু পায়ে বেড়ি পরাতে চায়? হাতের বেড়ি ভেঙেছে সুজাতা। পায়ের বেড়ি ছিঁড়তে পারবে না?

স্বামীজী তাকে সহজে অনুমতি দিতে চাননি।

তিনি বলেছেন, 'এখনো তোমার সময় আসেনি। তোমার দেরি আছে।'

কিন্তু আর কত দেরি? আর যে সবুর সয় না সুজাতার। চৌত্রিশ পূর্ণ হয়ে পঁয়ত্রিশে পড়েছে। আর কতকাল সে অপেক্ষা করবে। যে ধর্ম বুড়ো বয়সের সান্ত্বনা, অসহায়ের সম্বল, সেই ধর্ম তো সে চায় না। সে চায় শরীরে শক্তি সামর্থ্য থাকতে তপশ্চর্যা করতে। সে যৌবনে যোগিনী হতে চায়।

কারো সময় আসে, কাউকে বা এগিয়ে গিয়ে সময়কে ডেকে নিয়ে আসতে হয়। সবাইর ভাগ্য এক রকম নয়, রীতিনীতিই বা সবাইর বেলায় এক রকমের

হবে কেন? স্বামীজী বলেছেন, 'চাওয়াটা চাওয়ার মত হওয়া চাই। মানে চাওয়াটা যেন একেবারে না চাওয়ার মত হয়। তুমি যদি রাগ করে সংসার ছেড়ে চলে যাও, তাহলে সেই রাগ তোমার পিছনে পিছনে ছুটবে। সে কছুতেই তোমাকে ছাড়তে চাইবে না।'

রাগ। নিজের রাগের জন্যে লজ্জিত সুজাতা। যে রাগ সংস্কৃত অনুরাগ, প্রাকৃত বাংলায় তার একমাত্র অর্থ শুধু ক্রোধ। সুজাতা মাঝে মাঝে ভাবে আর হাসে। একই শব্দ একজনের বেলায় সংস্কৃত অর্থ বয়ে নিয়ে এল, আর একজনের মনে এল অশুদ্ধ, অসংস্কৃত হয়ে। কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে কি ক্রোধের কোন সম্পর্কই নেই? কাম আর ক্রোধ কি শুধু পাশাপাশি? পিঠা-পিঠি নয়, অঙ্গে অঙ্গে আবদ্ধ নয়? তার মনের অপূর্ণ অনুরাগই কি এমন প্রচণ্ড ক্রোধ হয়ে উঠেছে? সুজাতা মাঝে মাঝে ভাবে। মাঝে মাঝে জীবনটা বড়ো শুকনো বড়ো নীরস মনে হয়। লজ্জা হয়, সত্যিই সে যেন মনে মনে রক্ষাচণ্ডী, রক্ষাকালীর মূর্তি ধরে রয়েছে। সংসারে থেকেও সে যে সংসারের বাইরে রয়ে গেল তার জন্যে মাঝে মাঝে দুঃখ হয় সুজাতার, অনুতাপ আসে, অনুশোচনা হয়। কিন্তু উপায় কী। এই রুক্ষতা শুষ্কতাই তার দিনরাত্রির অভ্যাসের সঙ্গে মিশে গেছে। অভ্যাস নাকি মানুষের দ্বিতীয় প্রকৃতি। সুজাতার বেলায় তা অদ্বিতীয়া। সে সব ছেড়ে বাইরে যাবার জন্যে আজ পা বাড়ায়নি, বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল, সে তাই দু পা হেঁটে আরো বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেখানে সে যদি একটু বিশ্রাম পায়, একটু শান্তি, একটু আশ্রয়। কেউ যদি সেখানে একটু সহায় হয়, কেউ যদি মিষ্টি কথায় বলে, 'বসো এখানে। এই গাছতলায় বসে দুদণ্ড জিরিয়ে নাও।'

এই পৃথিবীর কাছে সুজাতা আর কিছু চায় না। শুধু সেই গাছের ছায়াটুকু চায়। আগে কত তরুকে সে কল্পতরু ভেবে ছুটে গেছে। এখন আর সেই মোহ নেই লোভ নেই, এখন সে ভাবে, শাখাপত্রে ভরা একটি গাছই যথেষ্ট। আহা, শ্যামল সুন্দর একটি গাছকে ভালোবাসতে পারলেও বুঝি জীবন সরস হতো।

স্বামীজী অবশ্য তাকে তত ভরসা দেননি, বরং বারবার ভয়ই দেখিয়েছেন। বলেছেন, 'ওদের আবার নানারকম নিয়মকানুন আছে। তুমি কি মেনে চলতে পারবে?'

'পারব।'

'আমাদের মূল যদিও এক, কাণ্ড যদিও এক, কিন্তু শাখা-প্রশাখা আলাদা। আমরা একজনের কাজে অন্য কেউ ইণ্টারফিয়ার করিনে। সাধারণত আমাদের তাই নিয়ম।'

'আমি নিয়মভঙ্গ করব না স্বামীজী। নিয়মভঙ্গ করতে আপনাকে অনুরোধও করব না।'

শুদ্ধানন্দ বলেছিলেন, 'তোমার জন্যে অবশ্য প্রথমেই আমি গুরুতর এক নিয়মভঙ্গ করেছি। কিন্তু বারবার তো আর তা সম্ভব হবে না।'

সুজাতা বলেছিল, 'আমি তা জানি। আমি সেজন্যে তৈরী হয়ে আছি।'

'আচ্ছা, তা হলে এসো।'

সুজাতা তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করেছিল।

কী সেই নিয়মকানুন সুজাতা জিজ্ঞাসা করেনি। কী হবে সে সব জেনে। আশ্রমের নিয়ম কি সুজাতার নিজের চেয়ে কঠিন? কোন শৃঙ্খলাকে সুজাতা আর শৃঙ্খল বলে ভয় করে না। সে নিজেকে শাস্তি দিতে চায়। সে শাস্তি যত কঠিন হয়, ততই ভালো। সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। তা যত দুঃসাধ্য হয়, ততই ভালো। কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত? হিংসার আর ক্রোধের, ক্ষমাহীনতার আর অসহিষ্ণুতার। 'ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।' মহাভারতেও আছে, 'ক্রোধ সম পাপ দেবী, না দেখি সংসারে।'

লক্ষ টাকা পড়ে থাকলেও সুজাতার তা নিতে ইচ্ছা করবে না। পরম রূপবান গুণবান পুরুষ দেখেও তার চিত্ত চঞ্চল হবে না। কিন্তু ক্রোধ। ক্রোধের হাত থেকে রক্ষাচণ্ডী আজ সত্যিই রক্ষা পেতে চায়। সেই ক্রোধে অপর কারো কোনো ক্ষতি হয় না। সুজাতার নিজের চিত্তই শুধু তাতে অশান্ত হয়ে ওঠে। ষড়রিপুর দরকার হয় না, চিত্তকে আবিল পঙ্কিল করবার পক্ষে একটি রিপুই যথেষ্ট। শুধু নির্মল আয়নাতেই মুখের ছায়া পড়ে। শুধু নির্মল চিত্তই প্রজ্ঞার আলোয় উদ্ভাসিত হয়। সুজাতার মনে হয় এই রিপু জয়ের সাধনাই মানুষের প্রথম সাধনা। হয়তো শেষ সাধনাও। কারণ এর শেষ নেই। এই রিপুই কি সমস্ত অমঙ্গল, অকল্যাণ সমস্ত বিষবৃক্ষের মূল? অথচ তার শাখায় শাখায় পল্লবে পল্লবে পুষ্পে পুষ্পে শোভার অন্ত নেই। শত্রুকে কিছুতেই শত্রু বলে মনে হয় না। পরম মিত্র পরম আত্মীয়ের মত সে যেন সুজাতার সঙ্গে মিশে আছে। তাকে কি সুজাতা বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না? বিচ্ছেদের পথে তার যে যাত্রা শুরু হয়েছে তা কি শুধু স্বামী বিচ্ছেদেই শেষ হবে? তার অহঙ্কার অহংবোধ থেকেও কি সে নিজেকে ছিন্ন করে নিতে পারবে না?

বুঝিয়ে শুনিয়ে কাকুতিমিনতি করে বাবার মত করাল, বউদিকে দাদাকে সম্মত করল সুজাতা।

প্রভাস বোনকে ধরে রাখতে অনেক চেষ্টা করেছিল। না পেরে হাল ছেড়ে দিল, হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'যাচ্ছিস যা। কিন্তু আমি জানি দু দিনের বেশি টিকতে পারবিনে। আতপান্ন আর নিরামিষ খেয়ে দুদিনেই বাপ বাপ বলে চলে আসবি।'

সুজাতা হেসে বলল, 'তুমি বুঝি সেই অভিশাপ দিচ্ছ দাদা!'

প্রভাস বলল, 'অভিশাপ নয় আশীর্বাদ। যত তাড়াতাড়ি তোর মতিভ্রম

ঘোচে ততই মঙ্গল। আজকালকার বুদ্ধিমান শিক্ষিত মানুষ ধর্মচর্চার জন্যে আলাদা কোন জায়গায় যায় না। ইচ্ছা করলে সে নিজেই এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারে। যেমন আমরা শরীরকে বয়ে বেড়াই অথচ টের পাইনে, নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি রুচি নীতি আদর্শকে বহন করি, কিন্তু তা কখনো জাহির করিনে। আজকালকার মানুষের ধর্মের জন্যে আলাদা কোন পোশাক পরতে হয় না। টিকি পৈতা নামাবলীর দরকার করে না। সাধারণ স্বাভাবিক বেশই যথেষ্ট। এখনকার বুদ্ধিমান মানুষের আলাদা ধর্ম-কর্ম নেই। কর্মই তার ধর্ম। এখনকার ধর্ম বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকেছে। এখনকার সভ্য মানুষ ধর্মকে আঙুল তুলে দেখায় না, ধর্মকে সে অনুভব করে। তুই আমাদের ছেড়ে কোন্ মধ্যযুগের মঠে চললি তুইই জানিস। তবে দু চার দিনের মধ্যেই তোকে ফিরে আসতে হবে এও আমি তোকে বলে দিলাম।'

সুজাতা এ সব নিয়ে দাদার সঙ্গে আগে অনেক তর্ক করেছে। কিন্তু আজ যাত্রা করবার মুখে কোন তর্কের মধ্যে এল না। তাতে শুধু সময় নষ্ট হবে, সংশয় বাড়বে। কিন্তু সংশয়ের মধ্যে আর যেতে চায় না সুজাতা, দ্বিধাদ্বন্দ্বে আর দুলতে চায় না। তার ক্ষতবিক্ষত হৃদয় এখন শুধু আশ্রয় চায়। সে আশ্রয় যদি আশ্রমে জোটে তাতেও ক্ষতি নেই।

যাওয়ার সময় বাবাকে প্রণাম করল সুজাতা, দাদাকে প্রণাম করল, বউদিকে প্রণাম করতে যাচ্ছিল। কিন্তু নন্দিতা সে প্রণাম নিল না। তাড়াতাড়ি হাতখানা ধরে ফেলে বলল, 'ছি ছি ছি, ও কি করছ। দু দিন বাদে কতজনে তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে।'

ভাইপোকেও একটু আদর করল সুজাতা। গাল টিপে দিল, চুমো খেল কপালে।

বাবলু বলল, 'পিসীমণি, কবে আসছ?'

সুজাতা একটু হেসে চুপ করে রইল।

বাবলু বলল, 'পরশু?'

সুজাতা এবারও কোন কথা বলল না।

হয়তো তারিখটা ওর বাবাই ওকে কানে কানে বলে দিয়েছে।

প্রশান্তবাবু শান্ত ভাবে বললেন, 'কেন যে এই ছেলেমানুষি করছিস তা তুইই জানিস।'

সুজাতা বলল, 'আমার আরো কত ছেলেমানুষি তুমি সহ্য করেছ বাবা। এটা কি তার চেয়েও বড়?'

প্রশান্তবাবু বললেন, 'আমার কথার যোগ্য উত্তর হল না, বুলু। এখানে তোর কী অসুবিধে হচ্ছিল যদি বলতিস—'

সুজাতা বলল, 'কোন অসুবিধেই হচ্ছিল না বাবা। অসুবিধে কিসের।

তুমি আমাকে কত যত্নে রেখেছ। কিন্তু কতকাল ধরে এক জায়গায় পড়ে আছি। মন টিকছে না বাবা।'

প্রশান্তবাবু তাঁর চেয়ারে চুপ করে অনড় হয়ে বসে রইলেন। মনে হল তিনি ভিতরের কোন একটা উদ্বেল আবেগকে সংবরণ করে নিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত শশাঙ্কের সুমতি হবে। ভুল বুঝতে পেরে নিজেই ও একদিন চলে আসবে। কিন্তু তা তো আর হল না। কোন মানুষ যে চিরকাল একইভাবে কাটায়, একটুও বদলায় না, জীবনে তা আমি এই প্রথম দেখলাম।'

সুজাতা মৃদুস্বরে বলল, 'বাবা, ও সব কথা এখন থাক।'

কিন্তু প্রশান্তবাবু প্রসঙ্গটা অত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে চাইলেন না। বললেন, 'আমি কতবার বলেছি, চল আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে তার কাছে রেখে আসি। অত মিথ্যে মান-অপমান বোধ আমার নেই। তার চেয়ে তোর নিজের সুখশান্তি আমার কাছে অনেক বড়। অনেক বেশি সত্য!'

সুজাতা তেমনি মৃদুস্বরে বলল, 'সব সময় মান-সম্মান বোধ বাদ দিলেই কি সুখশান্তি বাড়ে? তাছাড়া, আমার ও সব প্রবৃত্তি একেবারে চলে গেছে। তা না গেলে আমি তো একাই ফিরে যেতে পারতাম। তোমাদের কাউকেই সঙ্গে যেতে হতো না। ও সব কথা থাক বাবা। বরং আমি যে পথে যাচ্ছি সেই পথে আমি যেন মন স্থির করে চলতে পারি, তুমি আমাকে শুধু সেই আশীর্বাদ করো।'

প্রশান্তবাবু আবার চেয়ারে শক্ত হয়ে মেরুদণ্ড টান করে বসলেন।

সুজাতা বুঝতে পারল ভিতরে ভিতরে বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে। তাঁর বুকটা যত ভেঙে যেতে চায় পিঠটাকে তিনি তত শক্ত করে বসেন।

বউদি সুজাতাকে উদ্ধার করল। হাত ধরে তাকে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'বুলু, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল।'

'বলো।'

'কিছু মনে করবে না তো?'

সুজাতা একটু হাসল, 'মনে করবার কী আছে? তোমার যখন এত জরুরী কথা।'

নন্দিতা একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমার মনে হয় শশাঙ্কবাবুর একটা মত নেওয়া উচিত।'

সুজাতা চুপ করে রইল। তারপর মুখ তুলে আস্তে আস্তে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার অবশ্য ঠাট্টা তামাশারই সম্পর্ক। তবু এ সময় তুমি এমন একটা ঠাট্টা করে বসবে ভাবতে পারিনি বউদি।'

নন্দিতা একটু দুঃখিত হয়ে বলল, 'ঠাট্টা নয় বুলু, আমি সত্যিই

বলছিলাম। তুমি এই সব কাণ্ড করছ তিনি জানলে—'

সুজাতা বলল, 'তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসতেন আর আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতাম। তুমি বুঝি তাই ভেবেছ বউদি?'

নন্দিতা বলল, 'না, ঠিক অতখানি আশা করিনি। তবে তাঁকে কি একবার জানানো উচিত নয়? বিশেষ করে তুমি যখন ধর্মের নাম করেই যাচ্ছ। তোমাদের সম্পর্ক তো এখনো আছে।'

'আইনের চোখে আছে বটে। আর কোন অর্থে নেই।'

'বেশ তো আইনের কথাই না হয় ধরা যাক। তিনি তো ইচ্ছা করলে হাঙ্গামা করতে পারেন।'

সুজাতা বলল, 'যতদূর জানি তিনি তা করবেন না। আর যদি করেনই আইনের পোর্টফলিও নিয়ে তুমি আছ দাদা আছে, তোমরা রুখতে পারবে না?'

নন্দিতা ফের একটু কাল চুপ করে রইল। তারপর একটু হেসে বলল, 'তোমার জায়ের সঙ্গে সেদিন টেলিফোনে আমার কথা হয়েছিল। তিনি বললেন, সেই মন্দিরার নাকি কোথায় বিয়ে হয়ে গেছে। আপদ গেছে। তাহলে তুমি কেন মিছিমিছি—'

সুজাতা বলল, 'কী ধারণা তোমার বউদি। তুমি বুঝি ভেবেছ আমি সেই মন্দিরার জন্যে—। ছি ছি ছি। একজন কাউকে বিয়ে করলে তবু তো হতো। তবু বুঝতাম ঘর-সংসারের দিকে মন গেছে। তুমি জানো না বউদি। তাঁর এক মন্দিরা গেছে, আরো কত মন্দিরা আছে, আরো কত মন্দিরা আসবে তার কিছু ঠিক নেই।'

বেরোবার আগে নিজের ঘরখানার দিকে ফের একবার তাকাল সুজাতা। খাট চেয়ার আলমারি বইয়ের সেলফ সবই এ ঘরে থাকবে, শুধু সে-ই থাকবে না। এই ঘর তাকে অনেক দিন আশ্রয় দিয়েছে। অনেক বিনিদ্র রাত্রির অনেক গোপন কান্নার সাক্ষী এই ঘরখানি। আবার পড়াশুনোর ভিতর দিয়ে আত্মস্থ হবার চেষ্টাও সে এই ঘরে বসেই করেছে।

দুটি সজল চোখ ফিরিয়ে নিল সুজাতা। মায়া কি শুধু এই ঘরখানার জন্যেই?

নন্দিতা বলল, 'স্কুলের কাজটা কি ছেড়ে দিয়ে গেলে বুলু?'

সুজাতা বলল, 'ছেড়ে দেওয়ারই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ওঁরা ছুটি নিতে বললেন।'

'সেই ভালো।'

বাড়ির গাড়িতে কিছুতেই গেল না সুজাতা। লোক পাঠিয়ে ট্যাক্সি ডেকে এনেছে। তাতে উঠে বসল। সঙ্গে বেশি জিনিসপত্র নিল না। একটা সুটকেসে যা জামাকাপড় বইপত্র ধরে শুধু তাই রইল।

বাবা সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও সুজাতার আপত্তি। শেষ পর্যন্ত সঙ্গে কেউ যখন যাবে না, এটুকু পথ কারো যাবার দরকার কি!

॥ ৮ ॥

শহরের ওপরে নয়, শহরতলীতে কল্যাণ আশ্রমের মহিলা বিভাগ। নারকেলডাঙা ছাড়িয়ে কাদাপাড়া। এই পাড়ারই একটি নিরিবিলি অঞ্চলে আশ্রমের কর্তৃপক্ষ বাড়িটি নিয়েছেন। আগে ছিল কোন এক জমিদারের পুরোন বাগানবাড়ি। বিলাসকুঞ্জ। এখন সেই জীর্ণ জাতিভ্রষ্ট বাড়িটির এমন রূপান্তর হয়েছে যে চেনা যায় না। বাড়ির চারদিকে উঁচু প্রাচীর। সামনে আশ্রমের সাইনবোর্ড টাঙানো। ভিতরে স্কুল, শিল্পকুটির, দেবমন্দির, পাঠমন্দির, হস্টেল—সব মিলিয়ে একটি খণ্ডরাজ্য। এ রাজ্য আরো ছড়াবে। আশে পাশে আরো জায়গা কেনা হয়েছে। আরো বাড়ি উঠছে। আরো নতুন নতুন বিভাগ এখানে উঠে আসবে। প্রাচীরের বাইরে দ্বাররক্ষী দুটি দেবদারু, আশেপাশে নারকেলের সারি। একটি গাছের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা কামনা করেছিল সুজাতা, এখানে গাছের অভাব নেই। আশ্রমের বাইরে গাছ ভিতরে গাছ। তার সেই নীরব সবুজ স্নিগ্ধতায় চোখ জুড়িয়ে যায়। আর চোখ জুড়োলেই হৃদয় জুড়োয়। কানের ভিতর দিয়ে প্রিয় নাম যেমন মরমে পেঁছায় চোখের ভিতর দিয়েও তেমনি প্রিয় দৃশ্য হৃদয়কে স্পর্শ করে।

গেটের কাছে গুম্ফবান ভোজপুরী প্রহরী। মহিলা নিবাসে এই বোধ হয় একমাত্র পুরুষ প্রতিনিধি। তার কাছে পরিচয় দিতে হল। শুধু নিজের নাম-ধাম নয়, কার কাছ থেকে এসেছে সেকথাও জানাল সুজাতা।

শুদ্ধানন্দের নামে রুদ্ধ দরজা খুলে গেল। দুটি কমবয়সী কুমারী মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দোরের কাছে এগিয়ে এল। আর ক'জন চঞ্চল উৎসুক চোখে অপার কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল পিছনে।

'আপনিই কুমারী সুজাতা সেন?'

সুজাতা একটু ঢোক গিলে বলল, 'হ্যাঁ।'

'আসুন, আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আপনার সঙ্গে কি আর কেউ এসেছেন?'

সুজাতা বলল, 'না। এখানে নাকি কারো আসবার নিয়ম নেই?'

শ্যামবর্ণ স্নিগ্ধ সুশ্রী মেয়েটি বলল, 'তাই বলে কি কেউ পেঁছে দিয়ে যেতে পারেন না? তা পারেন।'

মেয়েটি বড় চপল। তার দুটি চোখ কৌতুকে উচ্ছল। একুশ-বাইশ বছরের বেশি হবে না বোধ হয় বয়স। ওকে দেখে সুজাতার প্রথমেই মনে হল,

আহা, এ বেচারা কেন এসেছে এখানে? কোন দুঃখ কোন আঘাত এত অল্প বয়সে ওকে সংসারের বাইরে টেনে নিয়ে এল? ও কি সুজাতার মত? সুজাতা ভিতরের দিকে এগোতে লাগল।

'তোমার নাম কি ভাই!'

'আমার নাম শ্যামলী। আমি কালো কিনা তাই। আর ওই যে দেখছেন ফর্সা ফুটফুটে রঙের মেয়েটি, ওকে কিন্তু ধবলী বলে ডাকবেন না। ডাকলে ও ভারি ক্ষেপে যায়।'

সুজাতা হেসে বলল, 'ওর নাম কী?'

শ্যামলী বলল, 'বড্ড সেকেলে নাম। যূথিকা। তাই ও সব সময় মন খারাপ করে বসে থাকে। কালে কালে যদি সন্ন্যাসিনী-টন্ন্যাসিনী হতে পারে তখন তো নামান্তরও হবে জন্মান্তরও হবে। তখন একটা ভালো নাম ও পেতে পারে। তার আগে কোন আশা-ভরসা নেই।'

'কেন, যূথিকা তো বেশ নাম।'

যূথিকা বলল, 'আমাকে সবাই জুঁই বলে ডাকে। আপনিও তাই বলবেন।'

'বেশ মিষ্টি নাম।' সুজাতা হাসল।

শ্যামলী বলল, 'মিষ্টি নাম না মিষ্টি গন্ধ? গন্ধখানা খুব যে মিষ্টি তা নয়। আমরা একই ঘরে থাকব। দু' দিনেই টের পাবেন। ওর দারুন ঘাম। আর ঘামের সে কী বোঁটকা—। যাই বলুন সুজাতাদি, তাকে জুঁইয়ের গন্ধ বলতে পারব না।'

যূথিকা লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাঃ কী হচ্ছে।—ওর কথায় কান দেবেন না সুজাতাদি। ও ভারি অস্থির। ভারি চপল।'

'এত চাপল্য নিয়ে সাধনভজনে মন বসে কী করে?'

যূথিকা বলল, 'বসে কি আর?'

শ্যামলী প্রতিবাদ করে উঠল, 'না, বসে না! ও যেন সবই জানে। ওদের ধারণা কি জানেন সুজাতাদি? ধ্যানাসনে আমার মন কেবল ওঠ-বস করে।'

সুজাতা বলল, 'তাতে লজ্জা কি ভাই? আমাদের সবাইর মনই তাই।'

দোতলাবাড়ি। একতলায় সারি সারি খান পাঁচেক ঘর। ঘরে ঘরে তক্তপোষ পাতা। কোথাও তিনটি, কোথাও দুটি।

সুজাতাকে নিয়ে একটি তিন শয্যার ঘরে ঢুকল শ্যামলী। মাঝখানের সীটটিই খালি আছে।

শ্যামলী বলল, 'আপনি ইচ্ছে করলে পূবদিকের ওই জানলার ধারের সীটটাও নিতে পারেন। আমি এখন যেটায় আছি। কিন্তু আপনার বোধ হয় মাঝখানেই থাকা ভালো। আমাদের দুজনের ঝগড়া-বিবাদ মিটাতে পারবেন।'

সুজাতা হেসে বলল, 'তোমরা ঝগড়া-বিবাদও করো নাকি?'

শ্যামলী মুখ টিপে হেসে বলল, 'করিনে আবার? আপনি ভেবেছেন কি বলুন তো? দুদিন থাকুন, দেখবেন এখানে সব আছে। সুজাতাদি, এখানে সব আছে।'

সুজাতা হেসে শ্যামলীর হাতখানা ধরে বলল, 'তুমিও আছ, সব চেয়ে বড় ভাগ্যের কথা।'

মেয়েদের পরনে লালপেড়ে সাদাখোলের শাড়ি। সবাইর সিঁথি সাদা। কারো গায়েই কোন গয়না-গাঁটি নেই। দু' হাতে দুগাছি চুড়ি সুজাতার এখনো আছে। মনে মনে ভাবল এখনই খুলে রাখতে হবে। মেয়ে হয়ে এরা অন্তত বড় একটা লোভ জয় করেছে—গয়নার লোভ।

বউদির এখনো প্রায় ফি-মাসে নতুন গয়নার দরকার হয়। যে মাসে গয়না হয় না সে মাসে দাম্পত্য কলহ লেগেই থাকে। যুক্তিবাদী দাদা ওই এক জায়গায় ভারি জব্দ।

আজ বুঝি স্কুল ছুটি। ভারি নিরিবিলি নির্জন পরিবেশ। বাইরের উঠানে একটি শ্বেত করবীর গাছ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সবই চুপ-চাপ। সুজাতার মনে হল সত্যিই যেন এক নতুন রাজ্যে এসে পড়েছে। স্থান-মাহাত্ম্য আছে বইকি। নদীর কাছে বসলে মনের এক রকম ভাব হয়, পাহাড়ের কাছে বসলে এক রকম ভাব হয়। আবার থিয়েটার সিনেমায় গেলে সেই মনেরই ভাবান্তর ঘটে। যোগ্যস্থানেই এসে পড়েছে সুজাতা। শুধু মন নিয়ে পড়ে থাকবার এই হল জায়গা। মনোভূমি কর্ষণ করে যাবার এই হল উপযুক্ত স্থান। কিন্তু এখানেও সভ্য জগতের সব আছে। ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান, কিচেন, বাথরুম। এখানেও নিছক কাষ্ঠশয্যা নয়। বিছানা বালিশ নরম তোষক, শুধু সেই তোষকের ওপর একখানি করে ছোট কম্বল পাতা—কৃচ্ছ্রতার প্রতীক।

কিন্তু এই প্রতীকী কৃচ্ছ্রতা নয়, সুজাতা যেন আরো কাঠিন্য আরো ক্লেশ-বরণের জন্যে তৈরী হয়ে এসেছিল। পুরাকালের এমন এক গিরিকন্দরে সে প্রবেশ করতে চায় যেখানে আধুনিক সভ্যতার কিছুই প্রবেশ করেনি। এমন এক গিরিগহ্বর যেখানে শুধু ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ, ঝরণার জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ। যেখানে সঙ্গী নেই, কথা বলবার কেউ নেই। শুধু সেইখানেই কি নিজের হৃদয়ধ্বনিতে নিজে কান পেতে থাকা যায়? কেন যেন নিজেকে ভারি কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে। সুজাতার পরম প্রতিকূল পরিবেশে শ্বাসরোধী অবস্থার মধ্যে অতিকষ্টে প্রাণ-ধারণ করতে ইচ্ছে করে। এতদিন অন্য একজনের হনন পীড়নের চিন্তায় যে আনন্দ পেয়েছে কিন্তু আজকাল ভিতরের বাইরের কৃচ্ছ্রতা দিয়ে নিজেকে নিপীড়িত করবার বড় সাধ হয় তার। অথচ সে তো এমন কোন অপরাধ করেনি এমন কোন পাপ করেনি যে এত তীব্র আত্মগ্লানি তাকে পেয়ে বসল। হাত দিয়ে করেনি, কিন্তু মনে মনে করেছে। হাতের পাপ

আইনের কাছে, মনের পাপ ধর্মের কাছে। সেই ধর্মাধিকরণের প্রতিষ্ঠা নিজের অন্তঃকরণে।

'ওকি সুজাতাদি, বসে পড়লেন যে, উঠুন।'

'কোথায় যাব?'

শ্যামলী বলল, 'বাঃ সবই তো আপনার দেখা বাকি। ঠাকুর-ঘর দেখবেন—' তারপর গলা নামিয়ে একটু হেসে বলল, 'ঠাকুরানীর ঘর দেখবেন।'

সুজাতা বলল, 'ঠাকুরানী কে?'

শ্যামলী বলল, 'আমাদের বড়দিদি। তিনিই এখানকার সব। মেজদি সেজদি ছোড়দিদের কোন ভয়েস নেই।'

সুজাতা হেসে বলল, 'তোমার ভয়েসটি তো বেশ শুনতে পাচ্ছি ভাই।'

'কী যে বলেন সুজাতাদি। এ আবার ভয়েস নাকি? এ তো ফিসফিসানি।'

সুজাতা শ্যামলীর পিছনে পিছনে চলল।

দোতলায় উঠে বারান্দা দিয়ে পূবমুখে একটু হেঁটে গেলে বাঁদিকের সব চেয়ে বড় ঘরখানা বড়দিদির। ঘরের আধখানা জুড়ে সুন্দর বোম্বাই প্যাটার্নের একখানি মেহগনির খাট। পুরু গদি, তার ওপর ধবধবে গেরুয়া চাদর। তারও ওপরে চারুদর্শন একটি মৃগচর্ম।

ঝকঝকে মসৃণ মেঝে। সদ্য চুনকাম করা শুভ্র সুন্দর দেয়াল। জানালায় জানালায় গেরুয়া রঙের পর্দা।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বইপত্রগুলি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এক ধারে টিক টিক করছে একটি টাইমপিস ঘড়ি।

কিন্তু বড়দিদি কোথায়? ইজিচেয়ারে মুণ্ডিতমস্তক এক সন্ন্যাসী অর্ধ-শায়িতভাবে চিন্তামগ্ন। গায়ে একটি গেরুয়া রঙের চাদর জড়ানো।

সুজাতা ফিস ফিস করে বলল, 'বড়দি কোথায়?'

শ্যামলী তার চেয়েও ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'ওই তো।'

এবার অধ্যক্ষা চোখ তুলে তাকালেন।

সুজাতা তার ভুল বুঝতে পারল। যাঁকে সে পুরুষ বলে ভেবেছিল তিনি পুরুষ নন, নারী। কিন্তু পরম রূপবতী, পরম ব্যক্তিত্বময়ী নারী। একটু লম্বাটে ডৌলের মুখ। মাথায় চুল নেই, তবু সে মুখের শ্রী যেন লুপ্ত হয়নি। আয়ত ঘন কালো দুটি চোখ। কী ভাগ্য, ভ্রমরকৃষ্ণ অপরূপ দুটি সুন্দর ভ্রূ ধর্মের অনুশাসন থেকে রক্ষা পেয়েছে। স্নিগ্ধ চিকণ সুগৌর গায়ের রঙ। পাতলা লাল টুকটুকে দুটি ঠোঁট, লিপস্টিকে অত সুন্দর রঙ হয় না। পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে হবে বোধ হয় বয়স। কিন্তু ওঁকে দেখলে বয়সের কথা মনে হয় না।

কোথাও মেদবাহুল্য নেই। সুঠাম সুদীর্ঘ দেহ। তবে লতার মত নয়।

নারীদেহের সেই কমনীয়তা নমনীয়তা নেই। বরং কোথায় যেন এই চেহারার মধ্যে একটু পৌরুষদীপ্ত রূঢ়তা আছে।

সুজাতা এক পলক সেই অ[illegible]রের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

তারপর তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

প্রাপ্য প্রণাম তিনি নিঃশব্দে গ্রহণ করলেন। তারপর অনুচ্চস্বরে বললেন, 'তোমার ঘর দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কোন অসুবিধে হয়নি?'

'না।'

'শ্যামলী বুঝি তোমাকে বলোনি, এ ঘরে জুতো পরে আসতে নেই?'

তিনি হাসলেন। সুগঠিত সুন্দর শুভ্র দাঁতের সারি। তবু সেই হাসির মধ্যে মৃদু তিরস্কার শাসন-অনুশাসন সবই যেন ব্যঞ্জিত হয়ে উঠল।

সুজাতা লজ্জিত হয়ে একটু জিভ কাটল, তারপর তাড়াতাড়ি জুতো জোড়া ঘরের বাইরে রেখে এল।

তিনি ফের একটু হাসলেন, 'কিছু মনে করো না। Cleanliness is next to Godliness এই মটো এখনো আমি ক্লাসে ক্লাসে মেয়েদের লিখে রাখতে বলি। আমাদের বাল্য শিক্ষা শুধু বাল্যকালের জন্যেই নয়, তা যৌবনে বার্ধক্যে সমানভাবে শিখে যেতে হয়। বরং ছেলেবেলায় আমরা যা শুধু কণ্ঠস্থ করি তা হৃদয়স্থ করবার সুযোগ আসে বেলা আরো বাড়লে। বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

বড়দি কারুকাজ-করা চামড়ার মোড়াটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'বোসো।'

শ্যামলীকে হাতের একটু ইশারা করতেই সে বেরিয়ে গেল।

সদ্য পরিচিতা এই ব্যক্তিত্বময়ী কর্তৃত্বময়ী মহিলার কাছে একা একা বসে থাকতে সুজাতার একটু ভয় হল। ঠিক ভয় নয়, অস্বস্তি।

সুজাতাকে বড়দি কী জিজ্ঞাসা করবেন কে জানে। তিনি কি তার ব্যক্তিগত জীবনের কথা জানতে চাইবেন? না কি সুজাতা কেন এল এখানে, কী চায় সে, সেই কৌতূহলী প্রশ্ন তার সামনে তুলে ধরবেন?

ঘরের মধ্যে কোন শব্দ নেই। শুধু ঘড়িটি টিক টিক করছে। দেয়ালে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতার একখানি বাঁধানো প্রতিকৃতি। তাঁর মুখে স্তব্ধ গাম্ভীর্য। নিচে কাঁচের আলমারিতে ধর্ম আর দর্শনের বইগুলি সুন্দর করে সাজানো। ওপরের তাকে কিছু শিল্পপ্রীতির নিদর্শন। শ্বেত পাথরের দুটি একটি মূর্তি, একটি শঙ্খ, কয়েকটি রঙীন ঝিনুক—দুটি ধূপদানি। এসব যেন ব্যবহারের জন্যে নয়, শুধু দেখবার জন্যে।

'তুমি কি স্কুলে পড়াতে?'

হঠাৎ ওঁর প্রশ্ন শুনে একটু চমকে উঠল সুজাতা। বলল, 'হ্যাঁ। অবশ্য কর্পোরেশন স্কুল।'

'তা হোক। পড়াবার অভ্যেস থাকলেই হল। আমাদেরও একটা স্কুল আছে। তুমি ইচ্ছে করলে নিচের ক্লাসগুলিতে পড়াতে পারো।'

'স্বামীজীর কাছে শুনেছি। আমারও তাই ইচ্ছে।'

'আমাদের এখানে একদণ্ডও কেউ বসে থাকতে পারে না। আলস্যের কোন জায়গা আমরা রাখিনি। আরাম-বিরামের কোন স্থান নেই এখানে।'

সুজাতা বলল, 'আমি সব শুনেছি। আপনারা কাজকে মর্যাদা দেন। আপনাদের কাছে কর্মযজ্ঞই হল বড় যজ্ঞ। দাদাও বলেন, কর্মই এখনকার মানুষের ধর্ম।'

বড়দি সোজা হয়ে উঠে বসলেন, তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'না, তা নয়। সব কর্মই মানুষের ধর্ম নয়।'

'ধর্ম নয়?'

'না। অনেক কাজ আছে যা শুধু শরীরের অভ্যাস। দেহরক্ষার জন্যে আমাদের সেসব কাজ করে যেতে হয়। নাওয়া খাওয়া ঘুমোন। এমনি আরো অনেক। সে সব কাজ জীবধর্ম হতে পারে, কিন্তু ধর্ম বলতে আমরা কি সেসব কাজ বুঝি? তা বুঝিনে। জীবধর্মের মত এমন অনেক কাজ আছে যা জীবিকার কাজ, যা শুধু বৃত্তি। নিজের আর পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে সেই অর্থকরী কাজও মানুষের অবশ্য করণীয়। তবু এও ধর্ম নয়।'

'ধর্ম নয়?'

'না। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত এই যে জীবিকার কাজ, কখনো একা কখনো বা যৌথভাবে খাদ্য অন্বেষণ, খাদ্য গ্রহণ—কর্মবাদের দোহাই দিয়ে একেই আমরা ধর্ম বলে জাহির করে খুশি থাকি, নিজেদের ভোলাই। কিন্তু এও ধর্ম নয়। এও অভ্যাস, বন্ধন। এর মধ্যেও মুক্তির স্বাদ নেই। ধর্ম এই বাধ্যতাকে ছাড়িয়ে যায়, আবশ্যিকতাকে অতিক্রম করে ধর্মে আমরা আমাদের স্বার্থের গণ্ডীকে পার হয়ে চলে যাই। এই জন্যেই ধর্ম হল সেই মহৎ কাজ। পার হওয়ার কাজ। পার হওয়া মানে পরপারে পার হওয়া নয়। এই পারে থেকেই ক্ষুদ্রতার গণ্ডী পার হওয়া। আমরা তাকেই বলি পারঙ্গমত্ব। এখনকার এই জড়বাদী কর্মবাদ ক্ষুদ্র জীবধর্মের মধ্যে আমাদের ধরে রাখতে চায়। বুক ফুলিয়ে বলে, এর পরে আর কিছু নেই, এর পারে আর কিছু নেই। যে বলে নেই, তার কাছে সত্যিই নেই; কিন্তু যে জানে আছে তার আছে। ধর্ম আমাদের না থেকে হাঁ-তে নিয়ে যায়। জানবার অনিচ্ছা থেকে জানবার ইচ্ছার দিকে, জিজ্ঞাসার দিকে নিয়ে যায়।'

এসব কথা নতুন নয়। স্বামী শুদ্ধানন্দের কাছেও প্রায় এই ধরনের কথাই

শুনেছে সুজাতা। এ কথা তো আরো অনেক বইয়ের কথা, আরো অনেক মুখের কথারই প্রতিধ্বনি। তবু শুনতে ভালো লাগল। বলবার গুণে তাঁর বক্তব্য আরো মধুর শোনালো। তাছাড়া নারীর বেশবাস ছাড়লেও নারীকণ্ঠ তো ছাড়তে পারেননি বড়দি। সে কণ্ঠে এখনো অপরিসীম মাধুর্য। তার লালিত্যের তুলনা হয় না।

সুজাতার মনে হল, দাদার কথার ঠিক উচিত জবাব দিয়েছেন বড়দি। তার মনে যে জিজ্ঞাসা জেগেছে এই পথেই তার উত্তর মিলবে। যে কোন কর্মই ধর্ম নয়, এই কথাটা সুজাতার মনে বিঁধে রইল। ধর্ম ক্ষুদ্রতা থেকে আমাদের মহত্ত্বের দিকে আকর্ষণ করে, স্বার্থচিন্তা থেকে নিঃস্বার্থতার দিকে নিয়ে যায়—কথাটা নিজের মনেই কয়েকবার আবৃত্তি করল সুজাতা।

আশ্রমের কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সে অন্য ঘরগুলিও দেখল। দেখল লাইব্রেরী ঘর। ধর্ম, দর্শন, ধর্মের ইতিহাস, ধর্মতত্ত্বের বই-ই অবশ্য বেশি। কিছু কিছু কাব্যও আছে যা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। আছে দেশ-বিদেশের মহাপুরুষের জীবনচরিত, ধর্মসাধিকাদের জীবন-আখ্যান।

লাইব্রেরী রুমের লাগা রীডিংরুম। কয়েকটি তরুণী মেয়ে সেখানে বসে গভীর মনোযোগে পড়াশুনো করছে। কারো হাতেই গল্প কবিতা নাটক-নভেল দেখতে পেল না সুজাতা। নিরাভরণা ব্রহ্মচারিণীদের হাতে সব ধর্মগ্রন্থ। সুজাতার মনে হল, হ্যাঁ, এই ঠিক উপযুক্ত সময়। এই তরুণ বয়স থেকেই সকলের মনে ধর্মজিজ্ঞাসা জাগ্রত করে দিতে হয়। অযথা অকাজে দ্বেষে হিংসায় যৌনতাড়নায়, দুঃসহ জ্বালায়, নিষ্ফল দ্রোহে, বিফল আত্মনিগ্রহে জীবনের বহু সময় নষ্ট হয়েছে সুজাতার। এই কিশোরী কুমারী মেয়েদের কখনোই সেই নিষ্করুণ জীবনের মুখোমুখি হতে হবে না। শাড়ির লালপাড়ের মত ওদের সমগ্র জীবন একটি দীপশিখায় ঊর্ধ্বমুখী হয়ে থাকবে। একটি তারে শুধু একটি সুর বাজবে। সে সুর পুণ্যের পবিত্রতার। ওদের সমগ্র জীবন শুধু একটি ধর্ম-সঙ্গীতের মত ধ্বনিত হবে। অন্য বাসনা কামনার কথা ওরা জানবে না, অন্য আকাঙ্ক্ষার অপরিতৃপ্তিও ওদের জীবনভোর বয়ে বেড়াতে হবে না। যে বোঝা অতি কষ্টে সুজাতাকে নামাতে হচ্ছে সেই বোঝা যে কী তা কখনো ওদের বুঝতে হবে না। ওদের শাড়ির শুভ্রতার মতই ওদের জীবনও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক অমলিন অকলঙ্কিত পবিত্রতার আধার হয়ে থাকবে।

তারপর আশ্রমের ঠাকুরঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সুজাতা। এ ঘরও বেশ বড়। একটি বেদীর ওপরে শিবের কল্যাণমূর্তি, আর একটি বেদীতে প্রতিষ্ঠাতার প্রতিকৃতি। শ্বেত শ্মশ্রুধারী, দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসী। সকাল বেলায় সচন্দন পুষ্পবিল্বদলে পুজো-অর্চনা হয়ে গেছে। এখন ঘৃতদীপ জ্বলছে। এক কোণে শঙ্খ ঘণ্টা পুজোর উপকরণ গুছিয়ে রাখা হয়েছে।

পূর্বদিকের দেয়াল ঘেঁষে একখানি খাট। সেখানে সুন্দর করে বিছানা পাতা রয়েছে। বালিশ আছে পাশ বালিশ আছে। মশারি টানাবার ব্যবস্থা আছে। বালিশের ঢাকনি বিছানার চাদর সবই গেরুয়া রঙে রঞ্জিত। মাথার ওপর বৈদ্যুতিক পাখা। তা সত্ত্বেও সুবৃহৎ একখানি হাতপাখা আছে। কাপড়ে মোড়া বর্ডারে অপরূপ সূচিশিল্প। অপরূপ খাটের নিচে চন্দন কাঠের খড়ম। দোরের কাছে পিতলের বালতিতে জল। তার ওপর দামি টার্কিশ তোয়ালে।

সুজাতা একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'এসব কেন!'

শ্যামলী আর যূথিকা ছিল সঙ্গে। দুজনে এ ওর মুখের দিকে তাকাল।

শ্যামলী বলল, 'আপনি কী সুজাতাদি? ঠাকুর কি পা ধোবেন না? তিনি কি ময়লা পা নিয়ে বিছানায় উঠবেন?'

সুজাতা বলল, 'তা বটে।'

একটু ইতস্তত করে যুক্তকর কপালে ছোঁয়াচ্ছিল সুজাতা, শ্যামলী তাকে শুধরে দিয়ে বলল, 'এখানে ওসব সামাজিক শুষ্ক শিষ্টাচার চলবে না। এখানে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের বিধি।'

দাদা যা ভয় দেখিয়েছিল, সুজাতা দেখল এখানে তেমন কিছু নেই। নিরামিষও আছে, আমিষও আছে। যে যা খায়, যে যা ভালোবাসে। আমিষের ব্যবস্থা আছে বলে নিরামিষ কেউ খেতেই চায় না। ভাত আর রুটি দুই-ই চলে। রাত্রে কেউ কেউ রুটি খায়। কিন্তু বেশির ভাগ ব্রহ্মচারিণীরই মাছ-ভাত-অন্ত প্রাণ।

রান্নাবান্নার কাজ পালা করে মেয়েরাই করে। একটি ঝি আছে। তবে বাসনকোসন মেয়েরাই মাজে, ঘরদোরও তারাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। শ্রমশীলতার ওপর এই জোর খুব ভালো লাগল সুজাতার। নিজের সংসারে সে শুয়ে বসে আলসেমি করে কাটায়নি। বাপের বাড়িতে ঝি চাকর আছে। এসব কাজে তাকে হাত না দিলেও চলত। তবু কখনো সে হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। ঘরের কাজ তার ভালো লাগে। মাকে দেখেছে এক হাতে সব করতে। গৃহকর্ম তার মা'র কাছেই শেখা। মা শিখেছিলেন দিদিমার কাছে। কিন্তু এ শিক্ষা মা'র কাজে লেগেছিল, সুজাতার কোন কাজে লাগল না।

প্রায় স্কুল-কলেজের মেয়ে হস্টেলের মতই এখানে জীবনযাত্রা। হস্টেলে স্থায়ীভাবে কোন দিন থাকেনি সুজাতা। তেমন উপলক্ষ ঘটেনি। তবে গেস্ট হিসাবে দু-একদিন থেকেছে বইকি। ভালোই লাগতে লাগল সুজাতার। সব মিলিয়ে জন পনের ষোল আশ্রমবালা এখানে আছে। একটি মালার মত গাঁথা। একই রকমের বেশবাস চালচলন ধরন-ধারণ কথাবার্তা। সব সময় যে উচ্চ-মার্গের আধ্যাত্মিক কথাই এরা বলছে তা নয়। তাদের আলাপ আলোচনার বিষয় অলৌকিক নয়, পারলৌকিক নয়, বরং একান্তই ইহলোক ঘেঁষা। তবে

দুশ্চিন্তা নেই দুর্ভাবনা নেই। এদের উচ্ছলতা তরলতা উল্লাস প্রাণচাঞ্চল্য ভালো লাগল সুজাতার। নিজের ছাত্রীদেরও তো সে ভালোই বাসত। তাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা প্রীতি সে যথেষ্ট পেয়েছে।

আরো দুজন মহিলার সঙ্গে আলাপ হল সুজাতার। রমাদি আর রত্নাদি। একজন সুজাতার চেয়ে বয়সে বড়, আর একজন তার কাছাকাছি বয়স। রমাদি কর্মব্যস্ত, রত্নাদি একটু গুরুগম্ভীর। তাঁরা চট করে সুজাতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চাইলেন না। বরং যেভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন তাতে একটু যেন সন্দিগ্ধতা অপ্রসন্নতাই প্রকাশ পেল।

শ্যামলীর কাছ থেকে শুনে নিল সুজাতা, বড়দির একটা ভারি ধরনের নাম আছে—জ্ঞানপ্রভা। তবে এ নাম ধরে কেউ তাঁকে ডাকে না। এ নামে তাঁর চিঠিপত্র আসে। আর এ নাম তাঁর নিজের কলমের মুখে থাকে—স্বাক্ষরের সময়।

সন্ধ্যার পরে ঠাকুরঘরে পুজো আরতি, সন্দেশ দিয়ে ভোগ। বড়দিই পুরোহিত। এ সময়ে সবাইকে কৃতাঞ্জলি হয়ে দোরের সামনে উপস্থিত থাকতে হবে। সুজাতাও তাই রইল। কিন্তু মনের কুণ্ঠাটুকু গিয়েও যেতে চায় না। অনেকদিন হল এসব অনুষ্ঠান সে ছেড়ে দিয়েছে। ছেলেবেলায় ছিল ষোল আনা পুজারিণী। পারতো তো তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রত্যেকটিকে পুজো করতে চাইত। সেই পুজো পুজো খেলা কবে যে সাঙ্গ হল তা আর মনে নেই। সেই বহু ঈশ্বরবাদ কোথায় মিলিয়ে গেল। তারপর একেশ্বরবাদেরও কত পরিবর্তন বিবর্তন। স্বামী আর দাদা, এই দুই নাস্তিকের পাল্লায় পড়ে বাইরের আচার অনুষ্ঠান কখন যে তার অন্তরের মধ্যে লুকোল, নিজের কাছেও তার প্রয়োজনীয়তা লুপ্ত হল, তা সে নিজেও টের পেল না। শেষের দিকে তার একমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল অধ্যয়ন আর মনন। এঁরা কি তাকে ফের গোড়া থেকে শুরু করতে বলছেন? এই শুরুর কি কখনো শেষ হবে না? এঁদের পাঠ কি চিরকাল প্রথম পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে?

পুজা শেষ হল, আরতি শেষ হল। ঠাকুরের নৈশ ভোজন মুখপ্রক্ষালন হরিতকি লবঙ্গ দিয়ে মুখশুদ্ধি শেষ হল। এবার ঠাকুর ঘুমোতে যাবেন। কিন্তু তার আগে শয্যারচনা দরকার।

বড়দি বললেন, 'সুজাতা, তুমি ঠাকুরের বিছানা পেতে দাও। এদিকে মশার উৎপাত আছে। পাখার হাওয়া দিয়ে মশারিটা খাটিয়ে দিয়ো।'

সুজাতা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এসব আমাকে করতে হবে বড়দি!'

জিজ্ঞাসার ধরনে তিনি ভ্রূ কুঁচকে সুজাতার দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ, তোমাকেই করতে হবে। প্রথম এসেই এ সম্মান কেউ পায় না। তোমার বহু ভাগ্য তাই পেয়েছ। আজ যা বলছি তাই করো। তোমার যদি কিছু বলবার থাকে কাল শুনব।'

বড়দি তাঁর ঘরে চলে গেলেন। আর সবাই সরে গেল দোরের কাছ থেকে।

সুজাতা এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এখানে এই বোধ হয় তার প্রথম পরীক্ষা।

একটু বাদে ধীরে ধীরে খাটের কাছে এগিয়ে গেল সুজাতা। বিছানা ঝাড়ল, পরিপাটি করে বিছানা পাতল। পাখার হাওয়া দিয়ে মশা তাড়াল। তারপর নেটের মশারিটি নামিয়ে চারদিকে গুঁজে দিতে লাগল। আর হঠাৎ অনেক দিন অনেক মাস অনেক বছর আগের একটি রাত্রির কথা তার মনে পড়ল।

এখানে নয়, ভবানীপুরে নয়, সেই বেনেপুকুরের রাত্রি। সেদিনও এমনি পাখার হাওয়া দিয়ে মশারি নামিয়ে চার ধারে সেই মশারির প্রান্ত গুঁজে দিচ্ছিল সুজাতা। কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারেনি। বিছানায় ঘুমের ভান করে শুয়েছিলেন যে পুরুষপ্রবর, তাঁর লুব্ধ হাতখানি সুজাতার কোমর আঁকড়ে ধরেছিল। সেই হাত সুজাতাকে এক-পাও আর এগোতে দেয়নি।

ফের একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল সুজাতা। তারপর ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

স্মৃতির এই বিশ্বাস হননে, চিন্তার এই অশুচিতায় সুজাতার চেয়ে বেশি বিব্রত, বেশি লজ্জিত বেশি পীড়িত এই নিশ্চিন্ত নিরাপদ নিদ্রিত আশ্রমে আর কেই-বা আছে?

॥ ৯ ॥

বউদিদের কাছেই প্রথম খবরটা পেল শশাঙ্ক। বড়দা ও বউদির বিয়ের পঁচিশ বছর আজ পূর্ণ হবে। এই দিনে দাদা প্রতি বছর বড় বউদিকে শাড়ি গয়না উপহার দেন। বউদি কী দেন সেটা উহ্য রাখাই ভালো। তবে দু-তিন বছর অন্তর অন্তর একটি করে ছেলে কি মেয়ে দুজনই দুজনকে উপহার দিয়ে এসেছেন। মাত্র বছর পাঁচেক হল সেই ষষ্ঠীর কৃপা ওদের ঘরে ক্ষান্ত হয়েছে।

ছোট বউদি টের পেয়ে বলেছেন, এবার তোমাদের ম্যারেজ অ্যানিভারসারি অত গোপনে সারলে চলবে না। এবার খুব ঘটা করব, ঢাক-ঢোল পেটাব তবে ছাড়ব।

একই বাড়িতে দুই জায়ের আলাদা আলাদা ঘর-সংসার। মাঝখানে পার্টিসন আছে। ছোট একটি সবুজ রঙের দরজা আছে সেই দেয়ালে। দু-জায়ের মধ্যে যখন কথান্তর মনান্তর ঝগড়াঝাঁটি চলে তখন সশব্দে সেই দরজা বন্ধ হয়ে যায়। দু-দিন যেতে না যেতে আবার খোলেও। মিলনের দৌত্য করে

ছেলেমেয়েরা। তখন আবার দু জায়ের মধ্যে ভাব হয়। হাসি-ঠাট্টা রঙ্গ-কৌতুক চলে। শশাঙ্ক সব খবরই জানে। ও বাড়ি থেকে এ বাড়িতে টুকটাক কথা-বার্তা ভেসে আসে। এমনকি পূব দিকের জানালায় দাঁড়ালে রান্নার গন্ধও পাওয়া যায়।

পাশাপাশি দুটি ভিন্ন প্যাটার্নের জীবন। শশাঙ্ক মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে। দেয়ালের ওধারে বড়দা ছোড়দার পারিবারিক জীবন আর এধারে সে একা। আত্মীয়হীন বান্ধবহীন নিঃসঙ্গ, কিন্তু শশাঙ্ক তো ইচ্ছা করেই এই জীবন বেছে নিয়েছে। কোন স্থায়ী বন্ধনের মধ্যে নিজেকে সে ধরা দেয়নি। নাকি কোন বন্ধনই তাকে ধরে রাখতে পারেনি?

কিন্তু অস্থায়ী বন্ধনের কিছু কিছু জের এখনো আছে। যাদের নাম হতে পারত শশাঙ্ক অথচ হয়নি, মাসে মাসে তাদের কিছু কিছু করে টাকা পাঠাতে হয়। সবাইকে নয়, যারা আজও অনাথা, যাদের আজও প্রয়োজন, তাদের এখনো পঞ্চাশ ষাট শ' টাকা করে পাঠায় শশাঙ্ক। যারা জোর করেছিল ভয় দেখিয়েছিল তাদের নয়, যারা ভিক্ষা চেয়েছিল তাদের জন্যেই এই করুণাকণা। হৃদয়গত সম্পর্ক এখন কয়েকখানা দশ টাকা নোটের মধ্যে এসে শেষ হয়েছে।

কয়েকখানা মনিঅর্ডার ফর্ম নিয়ে বাইরের ঘরেই এসে বসেছিল শশাঙ্ক। নাম ঠিকানা আর টাকার অঙ্ক বসাতে হবে। নিজেকে নিঃসম্পর্কীয় না ভাবলেও পারে শশাঙ্ক। তারই বরং বসুধৈব কুটুম্বকম্।

সবে একখানা ফর্ম টেনে নিয়েছে, বউদিরা এসে হাজির হলেন।

শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি একটা বইয়ের তলায় ফর্মগুলি চাপা দিল। তারপর দুজনকে লম্বা সোফাটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'বসতে আজ্ঞা হোক। রোজ তো রামেশ্বরের মুখ দেখে উঠি। সে আমাকে বেড-টি দিতে আসে। আজও তো এখন পর্যন্ত অন্য কোন ঈশ্বরকে দেখিনি। কিন্তু ভোর হতে না হতেই দুই মহেশ্বরী এসে হাজির। মরি মরি! বল কী দিয়ে বরণ করি। চা করি না কফি করি।'

বড় বউদি অমলা বললেন, 'থাক থাক, আমাদের আর বরণ করে দরকার নেই। যাকে বরণ করবার তাকেই করতে পারলে না, তাকেই ধরে রাখতে পারলে না জীবনভর! তুমি যে কী করলে তা তুমিই জানো ছোট ঠাকুরপো। ভালো কথা, শুনেছ ব্যাপার?'

'কী আবার শুনব। তোমরা যা শোনাও তাই তো শুনি।'

'আর কেউ কিছু বলেনি?'

'না।'

'কেউ কোন খবর দেয়নি? ফোনে টোনেও কেউ কিছু বলেনি?'

অমলা একটু বিস্মিত হলেন যেন।

শশাঙ্ক নিরাসক্তভাবে বলল, 'না।'

অমলা ছোট জায়ের দিকে তাকালেন, 'মনীষা তুই-ই বল। তুই-ই তো সব আগে শুনেছিস। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ তো তোরই বেশি।'

মনীষা বললেন, 'তুমিই বল না দিদি। সব খারাপ খারাপ খবর বুঝি আমাকে দিয়ে বলানো চাই তোমার।'

শশাঙ্ক বউদিদের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা একটু আন্দাজ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঠিক ধরতে পারল না।

তারপর ফের একটু হেসে বলল, 'বলো, বলে ফেল। আমার আর ভালো-মন্দ কী আছে। সমুদ্রে যার শয়ন তার আর শিশিরে কী ভয়। তোমাদের কনিষ্ঠা জা কি দ্বিতীয়বার পতি পরিগ্রহ করেছেন?'

মনীষা একটু হেসে বললেন, 'তাই করাই উচিত ছিল। তাহলেই তোমার সমুচিত শিক্ষা হতো। কিন্তু বোকা বউটা সব ছেড়ে দিয়ে মনের দুঃখে গেরুয়া পরে কোন আশ্রমে না কোথায় গিয়ে উঠেছে। সত্যি, তার কথা ভাবলে দুঃখে বুক ফেটে যায়।'

শেষে আর হাসলেন না মনীষা। তাঁর গলা ভারী হয়ে উঠল।

শশাঙ্ক একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাল। অল্প বয়স থেকেই বউদিদের সামনে সে সিগারেট খায়। নতুন করে আর অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই।

মনীষা বললেন, 'এক কাজ করো ঠাকুরপো। চল আমরা তিনজনে মিলে সেই আশ্রমে গিয়ে চড়াও করি। ছোট বউকে সেখান থেকে উদ্ধার করে আনি।'

শশাঙ্ক সিগারেটের ছাই মেঝেয় ঝাড়তে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল। চীনে মাটির সুদৃশ্য অ্যাসট্রেটা নিয়ে এল পেড়ে। সুজাতা মেঝেয় ছাই ছিটানো পছন্দ করত না।

অমলা বললেন, 'মণি মন্দ কথা বলেনি। চল না ঠাকুরপো, তুমি যদি যাও আমি সঙ্গে যেতে পারি।'

শশাঙ্ক এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর মুখ তুলে হেসে বলল, 'বল কি ছোট বউদি? তাকে উদ্ধার করবে তোমরা? সেই তো আমাদের চোদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করবার জন্যে সন্ন্যাসিনী হয়েছে। শুনেছি বংশে কোন পুরুষ ছেলে যদি সন্ন্যাসী হয় তার পুণ্যে সাতপুরুষ উদ্ধার পেয়ে যায়। মেয়েদের মহিমা তো আরো বেশি। তাছাড়া তারা দ্বিকুল-বতী। তাদের কেউ সন্ন্যাস নিলে পিতৃকুলের সাত-পুরুষ আর পতিকুলের সাত-পুরুষ দুইয়ে মিলে চোদ্দ-পুরুষ—নাকি চোদ্দ আর চোদ্দয় আটাশ পুরুষ ঠিক জানিনে—সেই সুকৃতির ফলে হাতে হাতে স্বর্গ পায়।'

অমলা হেসে বললেন, 'শাস্ত্র-টাস্ত্র সব দেখি জানো। তবু কেন এত অনাচার কর বল তো।'

মনীষা বললেন, 'সত্যি, বেশ হতো কিন্তু। দিদির এই ম্যারেজ অ্যানিভারসারি উপলক্ষে যদি সুজাতাকে আমরা নিয়ে আসতে পারতাম তাহলে দুই বাড়ি মিলিয়ে একটা মহোৎসব করা যেত।'

শশাঙ্ক বলল, 'তোমাকেও কি বাদ যেতে দিতাম? তোমারও একটা বিবাহ ষান্মাসিকী কি সাপ্তাহিকী বানিয়ে নিয়ে—'

'বেশ তো বানিয়ো। আমাকে নিয়ে তুমি যা খুশি করো কোন আপত্তি নেই আমার।'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'বউদি, এসব কথা কি ভালো হচ্ছে? ছোড়দা শুনতে পেলে তোমাকে কিছু বলবে না, কিন্তু আমি দাগী আসামী, আমাকে ফাঁসি দিয়ে ছাড়বে।'

মনীষা একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'তামাশা রাখো। সত্যি তোমার সেখানে যেতে আপত্তিটা কি?'

'ওরে বাবা, সেই মহিলা আশ্রমে? সেখানে পুরুষরা ঢুকতে পায় নাকি?'

অমলা হেসে বললেন, 'জানো দেখি সব। তোমার তো সব জায়গায় গতিবিধি। যাও না একবার ওখানে। দেখি কী রকম বীরপুরুষ।'

শশাঙ্ক হেসে উঠল, 'ওরে বাবা, সন্ন্যাসিনীরা ত্রিশূল নিয়ে তেড়ে আসবে না?'

তারপর হাসি থামিয়ে একটু গম্ভীর সুরে বলল, 'সেই তো ট্র্যাজেডি বউদি। নাকি চূড়ান্ত প্রহসন। আমি বীর নই তবু বীরের পার্ট করতে হচ্ছে। হয়তো যুধিষ্ঠির হওয়ার বায়না নিয়েই জন্মেছিলাম, কিন্তু যাত্রার দলের অধিকারী বললেন, এ যাত্রা তোমাকে কীচকের পার্ট করতে হবে। রঙচঙ মেখে মুখোশ এঁটে নেমে গেলাম। এখন খসাতে গিয়ে দেখি কিছুতেই আর তা খসে না। কখন যে মুখ আর মুখোশ এক হয়ে গেছে টেরও পাইনি। সেই মুখোশ খুলতে গেলে এখন মুণ্ডু ছিঁড়তে হয়। সেই মুণ্ডুপাতের ভার আমি দশজনের হাতে তুলে দিয়েছি বউদি। নিজের হাত, দেখি, অন্য কোন কাজে লাগে কিনা।'

দুই বউদিই উঠে পড়লেন।

অমলা বললেন, 'কাজকর্ম তো নেই, কেবল তত্ত্ব আর তত্ত্ব। ছেলেবেলা থেকে রাশ রাশ বই মুখস্থ করেছ। এখন মুখ খুললেই ছাপার অক্ষর বেরিয়ে আসে। যাই ভাই, আজ আর সময় নেই। ওঁর কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে খেতে বলেছেন। তাঁদের আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হলে চলবে না, এ তো আর আমার বাপের বাড়ির মানুষ না—। তুমি কিন্তু যেয়ো। ফিরতে যত রাতই হোক যেয়ো।'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'এবং যে কোন অবস্থায়—'

অমলা বললেন, 'না না, যে কোন অবস্থায় নয়। বাইরের পাঁচজন ভদ্রলোক আসবেন—।'

'আচ্ছা বউদি, ঠিক আছে। ভয় নেই তোমার। গঙ্গাজলে মুখ ধুয়ে কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক পরে আমি তোমার দ্বারে ষষ্ঠ ভদ্র অতিথি হিসাবে হাজির হব।'

অমলা হেসে বললেন, 'অত বাড়াবাড়ি তোমাকে করতে হবে না। তুমি যেভাবে আছ সেই ভাবেই যেয়ো। তবে যেয়ো কিন্তু ঠাকুরপো। না গেলে সত্যিই ভারি রাগ করব।'

একটু থেমে ফের বললেন, 'সুজাতার খোঁজে আজ আর যেতে পারব না। বাড়িতে কাজ। আজ আর সময় পেয়ে উঠব না। কিন্তু শিগগিরই একদিন যাব। আমরা দুই জায়ে মিলে ছোট জাকে সেধে ভজে যেমন করে পারি নিয়ে আসব। তখন কিন্তু লক্ষ্মী দেওরটির মত থাকতে হবে তোমাকে। বউদিদের শাসন মেনে চলতে হবে। ঢের ছেলেমানুষি হয়েছে। আর কেন। তুমিও তো চল্লিশ পার করে দিয়েছ। দাওনি?'

শশাঙ্ক বলল, 'ধারাপাতের হিসেবে। জীবনধারার হিসেবে নয়।'

ছোট বউদি বললেন, 'বয়সের বুঝি নানা রকম হিসেব থাকে? তোমার আসল বয়স তাহলে কত?'

শশাঙ্ক বলল, 'আঠারো কি উনিশ। আমি তার বেশি আর বাড়িনি। আমার কোন কোন বন্ধু বলেন আমি অ্যাডোলেসেন্সের সীমানা পার হইনি। অনেকেই হয় না। শুধু তারা স্বীকার করে না, আমি করি।'

অমলা বললেন, 'আজ যাই ঠাকুরপো।'

'একটু দাঁড়াও। তোমাকে একটা জিনিস দিই।'

শশাঙ্ক পা বাড়িয়ে পুব দিকের লাইব্রেরী ঘরে ঢুকল। লাইব্রেরী তো নয়, লাম্বার-রুম হয়ে পড়ে আছে ঘরখানা। এলোমেলো ভাঙাচোরা জিনিসপত্রে ঠাসা। গোটা পাঁচেক আলমারি ভরা বই, এক কোণে মাকড়সার জালে জড়ানো ছবি আঁকার ক্যানভাস, এক ধারে সেই যে ছ' মাস আগে মন্দিরার বিয়েতে বইগুলি পাঠিয়েছিল ঠিক একই ভাবে প্যাক করা পড়ে আছে। ওর মধ্যে আছে কালিদাসের শোভন সংস্করণ, বৈষ্ণব পদাবলী, প্রথম যৌবন আর মধ্য যৌবনের রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতানের রবীন্দ্রনাথ, শেলি, কীটস, ব্রাউনিং আর সুইনবার্ন। হ্যাঁ, সুইনবার্নও। কাব্য-রুচিতে শশাঙ্ক কিছুতেই কৈশোর অতিক্রম করতে পারল না। এ যেন মন্দিরাকে নয়, নিজেকেই উপহার দিয়েছিল শশাঙ্ক। সেই উপহার নিজের কাছেই ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে নীল ঢাকনিতে ঢাকা সেতারটাও। এক সময় শশাঙ্কের সঙ্গীতচর্চার একটু শখ হয়েছিল। মন্দিরাকে সাধাসাধি করেছিল শিখবার জন্যে। তারই নিদর্শন। সব ফিরে এসেছে। কে জানে কে ফেরত দিয়েছে! মন্দিরা না তার বাবা? হয়তো দুজনেই। এই প্রত্যাখ্যান কারো কাছ থেকেই অপ্রত্যাশিত নয়। আর তার ভাইপো—বড়দার মেজো ছেলে—বলাইর ব্যবহারও সেদিন সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত

ছিল। সে এসে ঘাড় ফুলিয়ে চোখ-মুখ লাল করে শশাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। যেন অপমানের পুরো প্রতিশোধটা সে তার কাকার ওপর দিয়েই তুলবে।

'ছোট কাকা, তুমি কেন ওদের ওখানে আমাকে পাঠালে? তুমি কি জানো না, ওরা ছোটলোক? ওরা ইতর? ভয়ঙ্কর ইতর?'

শশাঙ্ক হেসে ভাইপোকে শান্ত করতে গিয়েছিল, 'আরে বলরাম, তুমি যে সত্যি সত্যিই একেবারে হলধর হয়ে উঠলে। হয়েছে কী বল না?'

বলাই শান্ত হয়নি। সে আরো চড়া গলায় বলেছিল, 'ছোট কাকা, তোমার ওই অ্যালিটারেশন রাখো। অ্যালিটারেশনে সব ঢাকা যায় না। নিতান্তই তোমার বন্ধু। নইলে এক ঘুষি দিয়ে আমি ওই বুড়ো ডাক্তারের নাক ভেঙে দিয়ে আসতাম। ইতর কোথাকার।'

অপমানিত উদ্ধত রোষদীপ্ত সেই যৌবনের মূর্তি শশাঙ্ক মুগ্ধ চোখে দেখে নিয়েছিল। হ্যাঁ, এই হল যৌবনের আসল রূপ। এ যৌবন দ্বিজ নয়, এক দেহে একবারের বেশি আসে না। এক দেহ থেকে আর এক দেহে, এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে আশ্রয় নেয়। সেও যেন এক বহুচারী ব্যভিচারী পুরুষ।

তারপর বলাই নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল। ও কি সব জানে, নাকি জানে না? ও কি জানে যত্রতত্র অনুগ্রাস ছিটানোই ছোট কাকার একমাত্র দোষ নয়? ও কি সব ক্ষমা করে, নাকি করে না? ও কি জেনে গেল যে-ঘুষি যোগরঞ্জনের নাকে বলাই বসাতে পারেনি, সেই ঘুষিতেই সে তার ছোট কাকার চোখা নাকটা থেঁতলে দিয়ে চলে গেছে? না, যোগরঞ্জনের মত পৌরুষ নেই শশাঙ্কের, নেই বলাইর মত অমন বজ্রমুষ্টির জোর। কারণ শশাঙ্ক দ্বিধাগ্রস্ত; সে এখনো ঠিক করতে পারেনি ঘুষিটা কার নাকের ওপর বাগিয়ে ধরতে হবে, যোগরঞ্জনের না শশাঙ্ক শেখরের।

'কই ঠাকুরপো, হল তোমার?'

'এই হয়েছে বউদি, আসছি।'

একটি আলমারির তাকে কিছু মূর্তির সংগ্রহ আছে শশাঙ্কের। পোড়ামাটির, চীনে মাটির, কালো পাথরের, শ্বেত পাথরের। শিবের, বুদ্ধের, নটরাজের, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীর গড়া হলধর চাষীর, হাতুড়ীধর মজুরের, সেই সঙ্গে লক্ষ্মীর আর গণেশের। জাত বিচার করেনি। শশাঙ্ক শ্রেণী বিচার করেনি, ধর্ম বিচার করেনি। চোখে যা ভালো লেগেছে তাই নিয়ে এসেছে। শুধু ফর্ম, শুধু ফর্মের উপাসনা। 'চেয়ে দেখ মন, কত তোরে নাচায় নয়ন।' বলেছে আর নেচেছে। বিল্বমঙ্গলের মত নিজের হাতে তবু দু চোখ অন্ধ করতে পারেনি।

বউদিকে কী দেওয়া যায়? একটু ভাবতে হল, একটু খুঁজতে হল।

তারপর সেই প্রার্থিত মূর্তিটি হাতে নিয়ে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল শশাঙ্ক।

'এই নাও বউদি তোমাদের বিবাহ-বার্ষিকীর উপহার। বলা তো যায় না, রাত্রে আমি ঠিক ধাতস্থ নাও থাকতে পারি। তাই এখনই দিয়ে রাখলাম। নাও।'

বড় বউদি হাত বাড়িয়ে শ্বেত পাথরের মূর্তিটি তুলে নিলেন। যুগল মূর্তি।

হেসে বললেন, 'এ যে হরপার্বতী।'

শশাঙ্ক একটু হেসে বলল, 'তাই নাকি? আমি তো নাস্তিক মানুষ। দেবদেবীর মূর্তি চিনিনে। আমি তো তোমাদের দুজনের মূর্তি ভেবে কিনে এনেছি।'

কথাটা সত্যি নয় তা অমলাও জানেন। তবু তাঁর চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল। বললেন, 'ঠাকুরপো, তুমি তো সবই বোঝ, কী ভালো কী মন্দ সবই জানো, তবু কেন অমন কর বল তো।'

শশাঙ্ক বলল, 'সেইটাই তো বুঝতে পারিনে বউদি। সেই তো এক হেঁয়ালি।'

মনিঅর্ডারের ফর্ম পূরণ করা খানিকক্ষণের জন্যে পিছিয়ে গেল। চাকরকে শেভ করার জিনিসগুলি এনে দিতে বলল শশাঙ্ক। একটু বাদে আয়নায় দুগালে সাবান মাখা প্রতিচ্ছায়াকে সম্বোধন করে সে নিজের মনে বিড় বিড় করতে লাগল।

'তুমি তাহলে স্বীকার কর শশাঙ্ক, সত্যিই যাত্রার দলের অধিকারী একজন আছে। তুমি তার হুকুমে কখনো গালে রঙ মাখো কখনো চূণকালি মাখো। এতদিন কিন্তু তা স্বীকার করতে না। এতকাল তুমি অন্য কথা বলে এসেছ। কিছুক্ষণের জন্যে, কি কিছুদিনের জন্যে এক একটি নারীর ওপর তুমি তোমার অধিকার খাটিয়েছ আর ভেবেছ, তুমি সর্বেশ্বর, তুমি সর্বাধিকারী। তোমার নিজের ওপর সেই একই রকমের অধিকার তোমার আছে। নিজের চরিত্র তোমার নখদর্পণে। তুমি আর কাউকে চালাতে পার আর না পার, আর কিছু চালাতে পার আর না পার, নিজের মনোরথ তোমার আয়ত্তের মধ্যে। এখন তুমি স্বীকার করছ, তা নয়। এখন তুমি অধিকারীর দোহাই পাড়ছ, এখন তুমি হেঁয়ালির কথা তুলছ। কিন্তু এও নিজের মনকে আঁখিঠারা। কে সেই অধিকারী? নিশ্চয়ই ঈশ্বর নয়। ঈশ্বরকে তুমি ওই ধরনে ওই ধারণায় বাঁধতে পার না। সেখানে তুমি বসিয়েছ বিজ্ঞানকে। জীব-বিজ্ঞান আর সমাজ-বিজ্ঞানকে। হেরিডিটি আর এনভিরনমেণ্টের মধ্যে তুমি তোমার চরিত্রের, তোমার প্রবৃত্তি-প্রবণতার মূল খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছ। কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারনি। কারণ তোমার মন বৈজ্ঞানিকের মন নয়। বিজ্ঞানের অ আ ক খ না শিখেও তুমি বৈজ্ঞানিক। তুমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির গর্ব কর—সেও এক অশিক্ষিত

পটুতার অহংকার। যে অজ্ঞানতা যে মূঢ়তা নিয়ে সুজাতা ভগবানকে মানে সেই মূঢ়তা নিয়ে তুমি বিজ্ঞানকে মানছ। তোমাদের দুজনের মধ্যে আর কোন তফাত নেই। শুধু শব্দের তফাত। ভগবানকে মানা এক যুগের ফ্যাশান ছিল, বিজ্ঞানকে মানা এ যুগের ফ্যাশান। এই পর্যন্ত। তুমি জ্ঞানের সাধনা করনি, বিজ্ঞানের সাধনা করনি, দর্শনের সাধনা করনি। দর্শন মানে তোমার কাছে শুধু দু' চোখ দিয়ে দেখা। যুক্তি দিয়ে দেখা নয়, বুদ্ধি দিয়ে দেখা নয়, হয়তো অনুভূতি দিয়েও দেখা নয়। শুধু ইন্দ্রিয় আর আবেগ দিয়ে দেখা। জ্ঞানের জায়গায় তুমি রূপকে বসিয়েছ। ফর্মকে। যা তোমার দেখতে ভালো লাগে, শুনতে ভালো লাগে তার বাইরে তোমার আর কিছু ভালো লাগে না। চক্ষু কর্ণ শাসিত এই যে তোমার রুচি এ তোমাকে কতটুকু দিতে পারে, কত দূর নিয়ে যেতে পারে? সেই রূপবোধকেও তুমি শুধু নারীরূপের সঙ্গে বেঁধে রেখেছ। আশ্চর্য তোমার সংকীর্ণতা, রক্ষণশীলতা। অথচ নারীর রূপ রূপই নয়, পুরুষের তুলনায় তা অনেক নিকৃষ্ট। শুধু নারীবিদ্বেষী দার্শনিকের নয়, অনেক রূপতাত্ত্বিক জীব-তাত্ত্বিকেরও সেই মত। নারী-রূপের ওপর পুরুষের এই যে পক্ষপাত এ শুধু যৌন-প্রেরণার জন্যে, প্রজননের জন্যে। তুমি অবশ্য তা মান না। তোমার কাছে নারী পরম রূপের আধার। এ বিচার যদি পক্ষপাতদুষ্ট হয় তাতেই বা ক্ষতি কি। আমাদের কোন্ বিচারই বা নিরপেক্ষ? কোন বিচারই বা আপেক্ষিক নয়? তবু শুধু একটি মাত্র রূপকেই বিশ্বরূপের সঙ্গে একাত্ম করে দেখার কোন মানে হয় না। এ তোমার রূপতৃষ্ণা নয়, এ তোমার বিকৃত তৃষ্ণা। তাই তো তৃষ্ণার ওপর মাঝে মাঝে তোমার এমন বিতৃষ্ণা আসে।

'শশাঙ্ক, তুমি বীর নও; ওই যে সেদিনের ছোকরা বলাই, তোমার ভাইপো—ওর যে পৌরুষটুকু আছে তোমার তা নেই। ওর মুঠিতে যে শক্তিটুকু আছে, অন্যায় অবিচার দেখলে ওর চোখে যে আগুনটুকু জ্বলে তোমার তা জ্বলে না। কিন্তু ইচ্ছামত তুমি তোমার নিজের সিগারেটটাও জ্বালাতে পারবে না এ অক্ষমতাকে তুমি ক্ষমা করবে কী করে? সুজাতাকে ধর্মীয় মঠ দখল করেছে করুক। মন্দিরাকে তার স্বামী দখল করেছে করুক, স্থায়ী দখলীস্বত্বে তোমার বিশ্বাস নেই; কিন্তু নিজে তুমি নিজের বেদখলে চলে যাবে এ কিরকম কথা শশাঙ্ক? নিজের চরিত্র তুমি কিছু কিছু হয়তো বুঝতে পেরেছ। তুমি যা তার জন্যে তুমি কিছুটা হেরিডিটিকে দায়ী করতে পার, কিছুটা বা পরিবেশকে। কিন্তু তাতেই কি তুমি নিষ্কৃতি পাও? শুধু দায়ী করাটাই কি সব? দায়িত্ব নেওয়াটা কি তার চেয়েও বড় কথা নয়? তোমার স্বোপার্জিত ধন কি কিছুই নেই। শুধু তুমি কী হয়েছ, কেন হয়েছ তা জানাটাই কি সব? তুমি যা হতে চাও তাই হয়ে উঠতে পারাই কি বড় কথা নয়!

'তুমি যে কী চাও তা জানো না শশাঙ্ক। নিজের ইচ্ছাকে তুমি দেখতে পাও না। তার জন্যে যে ইন্টিগ্রিটি থাকা দরকার, তা তোমার নেই। ফলে নিজের ইচ্ছার জোর হারিয়ে তুমি সেই ইচ্ছাময় কি ইচ্ছাময়ীর অধীন হয়ে পড়েছ। দুদিন বাদে তুমি হাই তুলে বলবে শশাঙ্ক—ইচ্ছাময়ী তারা তুমি যা করাও তাই করি। তুমি তো তরাও তাই তরি। তুমিও বলবে, ত্বয়া হৃষিকেশেন হৃদিসংস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। তুমি কী হতে চাও তা জানো না। তুমি যদি শুধু একটি মেয়ের হৃদয়েশ্বর হয়ে থাকতে চাইতে তা হওয়া তোমার পক্ষে কঠিন ছিল না। কিন্তু তুমি কি শুধু বহুবল্লভ হতে চাও, শুধু বহুবল্লভ? অল্পবিস্তর তা হয়েও তো দেখেছ। কিন্তু তৃপ্তি নেই কেন? কেন তুমি বলতে পার না এই চাওয়াই পরম চাওয়া, এই হওয়াই পরম হওয়া, এই মূল্যেই পরম মূল্য? তুমি রক্ষণশীল নও, তুমি নীতিবাগীশ নও, তবু এ কথা তুমি বলতে পার না।

'যেহেতু তোমার এক ইচ্ছা আর-এক ইচ্ছাকে গ্রাস করে তাই তুমি নিজেকে স্প্লিট পার্সনালিটি বলে ভাবতে ভালোবাসো। শুধু স্প্লিট নয় তুমি স্প্লিণ্টার্সে ভরা। তুমি শুধু দ্বিখণ্ডিত নও, বহুখণ্ডিত নও, তুমি চূর্ণিত বিচূর্ণিত। এ কথাও তুমি ভাবতে ভালোবাসো, বন্ধুমহলে বলতে ভালোবাসো। তোমার মধ্যে সঙ্গতি নেই, সামঞ্জস্য নেই। এই নাস্তিত্ব আর নাস্তিকতা কিন্তু এক নয়। সত্যিকারের যে জড়বাদ তা তরল নয়, বায়বীয় নয়, তা সীসার মত লোহার মতই কঠিন। তোমার চরিত্রের মধ্যে কোথায় সেই লৌহ-কাঠিন্য শশাঙ্ক? কোথাও নেই। তোমার বিশ্বাসে নেই, বোধে নেই, রুচিতে নেই, আদর্শে নেই। তুমি নিজেকে চূর্ণ-বিচূর্ণ বলে ভাবতে ভালোবাসো। কিন্তু এই জ্ঞান এই বিশ্বাস এই বিলাস তোমাকে কোথায় পৌঁছে দেয়? কোথাও না! বরং চেয়ে দেখ, গর্ব করার মত মানুষ যা কিছু গড়েছে তা তার অখণ্ড সত্তার সৃষ্টি। তার শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন তার অটুট সঙ্কল্পের, প্রবল মনোবলের সৃষ্টি। শশাঙ্ক, সেখানে আর মানুষ জড়বাদী নয়, স্থূল অর্থে নয়, সেখানে সে অধ্যাত্মবাদী। তোমার যে সত্তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে আছে তা তোমাকে ফের একটি একটি করে কুড়িয়ে নিতে হবে। সেই সহস্র চূর্ণকে গালিয়ে নিয়ে ফের একটি অখণ্ড পাত্র করে তুলতে হবে। সেই জীবনপাত্র কাঁচেরই হোক, সোনারই হোক, কিছু যায় আসে না। কিন্তু একটি পাত্র হওয়া চাই। তবেই তা হবে আধার। তবেই তুমি কিছু তাতে ধরে রাখতে পারবে, তবেই তুমি কিছু ধরে দিতে পারবে।'

নিজের প্রতিবিম্বকে এই দীর্ঘ উপদেশ দিয়ে শশাঙ্ক বেশ একটু পরিতৃপ্ত হল। তার প্রতিবিম্ব পরম ধৈর্যে অটুট সহিষ্ণুতায় সব কথা শুনেছে। একটুও প্রতিবাদ করেনি। শশাঙ্ক ভাবল এই বিনীত ছাত্রটি তার শ্রদ্ধেয় অভিজ্ঞ অধ্যাপকের কথা নিশ্চয়ই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে।

শশাঙ্ক নিশ্চিন্ত মনে রেজরে নতুন ব্লেড পরিয়ে দাড়ি কামাতে বসল।

আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রীং ক্রীং ক্রীং।

টেলিফোন বেজে উঠেছে।

রামেশ্বর ধারে কাছে কোথাও নেই।

শশাঙ্ককেই উঠে গিয়ে ফোন ধরতে হল।

'হ্যালো কে?'

ফোনের ওপারে নিঃশব্দতা।

'কে? আমি শশাঙ্ক কথা বলছি। শশাঙ্ক সেন।'

'তুমি! আপনি! না, না, আমি তো চাইনি, আমি তো এ নাম্বার চাইনি। রং নাম্বার রং নাম্বার।'

একটি বিব্রত আর্ত কিন্তু বড় মধুর আর পরিচিত নারীকণ্ঠ শশাঙ্কের কানে ধ্বনিত হতে না হতেই থেমে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে ফোনটি রেখে দেওয়ার শব্দও হল।

বিমূঢ় বিমুগ্ধ শশাঙ্কের প্রশ্ন তখনো থামে না, 'মন্দিরা? তুমি কি মন্দিরা? মন্দিরা তুমি?'

ফোন ছেড়ে দিয়ে শশাঙ্ক ফের তার আসনে এসে বসল।

সব ঠিক তেমনই আছে। সেই আয়না। আয়নায় সেই আধখানা কামানো সাবানমাখা গাল। যেন শশাঙ্ক নয়, শশাঙ্কের একটি কার্টুন।

আর আয়নার উল্টোদিকে যেন শশাঙ্ক নয়, শশাঙ্কের এক স্তব্ধ প্রতিমূর্তি। কিন্তু প্রবল এক ভূমিকম্পে ভিতরে ভিতরে চূর্ণ-বিচূর্ণ। একটু টোকা লাগলেই চারদিকে সব ছড়িয়ে পড়বে।

'স্যার আসতে পারি?'

সদর দরজা খোলা ছিল। তার ফাঁকে কয়েকটি ছেলের মুখ দেখা গেল। পুরো চেনা না হলেও চেনা চেনা। শশাঙ্ক বুঝতে পারল তাদেরই কলেজের ছেলে। চেষ্টা করতে হল না, যেন স্বাভাবিকভাবেই সংযত সম্বদ্ধ হয়ে উঠল শশাঙ্ক। হেসে ছাত্রদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, 'এসো। আমি অবশ্য সম্প্রতি নিত্যকর্মপদ্ধতিতে ব্যস্ত। এ পদ্ধতি তোমাদেরও নিশ্চয়ই শুরু হয়ে গেছে। তবে আমার মত এখনো নিত্য নয়, নৈমিত্তিক।'

তিনটি তরুণ ছাত্র পাশাপাশি বসেছে। তারা লজ্জিতভাবে হাসল। ওদের ওই যৌথ লজ্জা উপভোগ করল শশাঙ্ক। দাড়ির কথায় এখনো ওরা ব্রীড়ায় অবনত হয়।

একজন বলল, 'স্যার, আমাদের পার্থের কিন্তু ওসব বালাই নেই। দেখুন না ও কেমন দাড়ি রেখে দিচ্ছে।'

শশাঙ্ক নিজের গালে রেজর চালাতে চালাতে শ্মশ্রুবান ছেলেটির দিকে

তাকিয়ে একটু হাসল, 'উদ্দেশ্যটা কি? রীতি আর রুচির এই উজান স্রোত কেন। চরিত্রে উনিশ শতকী মাহাত্ম্য আনতে চাও?'

যে দাড়ি রেখেছে, সে কোন জবাব দিল না। যারা রাখেনি তাদের একজন বলল, 'অত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ওর নেই। পার্থ শুধু ব্লেডের খরচটা বাঁচাতে চায়।'

দ্বিতীয় সঙ্গী বলল, 'আমার মনে হয় ওর অন্য উদ্দেশ্য আছে। এমনিতে তো বেঁটেখাটো দেখতে। ওর ধারণা গোঁফ-দাড়িতে ওর পৌরুষ বাড়বে।'

শশাঙ্ক বলল, 'পৌরুষ অবশ্য আমরা সবাই বাড়াতে চাই। কেউ দাড়িতে কেউ গাড়ি-বাড়িতে। হ্যাঁ, কী ব্যাপার বল তো। তোমরা এত কষ্ট করে—'

তিনজনের মধ্যে যে মুখপাত্র সে বলল, 'আমাদের যুব উৎসবে যে সেমিনার হচ্ছে—'

শশাঙ্ক একটু হাসল, 'যুব উৎসব! আলাদা করে যুব উৎসবের কি কিছু দরকার আছে? গোটা যৌবনটাই তো একটা উৎসব।'

'স্যার কী বলতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছিনে।'

এবার সেই দাড়িওয়ালা ছেলেটি সতীর্থকে ধমক দিল, 'যখন-তখন তুমি বড় তর্ক করতে ভালোবাসো সুবীর। তুমি কি প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ ধরে ধরে কথার মানে বুঝতে চাও? ওঁর কথার মানে না বুঝবার কী আছে? যৌবন মানে বিকাশের কাল, প্রস্ফুটিত হবার সময়। একে উনি যদি উৎসব বলতে চান তোমার আপত্তি করবার কী আছে?'

সুবীর বলল, 'আপত্তি করছি কে বলল তোমাকে। আমি বলতে চাইছিলাম শুধু উৎসব দিয়ে যৌবনকে বোঝানো যায় না। সেই সঙ্গে দায়িত্ব কর্তব্য—কিন্তু এই নিয়েই কাল আমাদের সেমিনারে আলোচনা হবে। আমাদের জীবনে বিশেষ করে ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা আর নীতি শিক্ষার স্থান। কথা ছিল, আমাদের কলেজ থেকে প্রিন্সিপ্যাল নিজে আসবেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাই আপনাকে—'

শশাঙ্ক বলল, 'আমাকে? তোমরা আর কাউকে পেলে না?'

সুবীর বলল, 'কেন স্যার, আমরা তো জানি আমরা যোগ্য ব্যক্তির কাছেই এসেছি। এসব সম্বন্ধে আপনাদের কাছ থেকে কিছু যদি না শুনি, কার কাছ থেকে শুনব?'

শশাঙ্ক মনে মনে বলল, 'কিন্তু আমার পক্ষে প্রকাণ্ড প্রহসন।'

দরকারী কাজ আছে, তা ছাড়া মন-মেজাজ ভালো নয় বলে আরো একটু এড়াবার চেষ্টা করল শশাঙ্ক। কিন্তু ছাত্রেরা নাছোড়বান্দা।

'আমরা বড় আশা নিয়ে এসেছি—স্যার।'

শশাঙ্ক ভাবল, তোমরা তো আশা নিয়ে এসেছ। কিন্তু আমার নিজের মধ্যে সেই আশার সুর কোথায়। কোথায় সেই উৎসাহের বাণী। আমার কোন উৎসবে যাওয়া আর সাজে না।

শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হল। সুবীররা বলে গেল ওরা আগামী কাল বিকেলে পৌনে পাঁচটায় আসবে। অনুষ্ঠান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। শশাঙ্ক যেন তৈরি হয়ে থাকে। তাকে ওরা তুলে নিয়ে যাবে।

শশাঙ্ক বলেছিল—'তোমাদের আসতে হবে না। আমি নিজেই যাব।'

কিন্তু ছাত্রেরা বিশ্বাস করেনি। তারা বলেছে, 'না স্যার, আমরাই আসব। আমরা যেমন ক্লাস পালাই, আপনাদের তেমনি সভা পালাবার অভ্যাস আছে।'

এত লোক থাকতে শশাঙ্ককে কেন? সে ভালো বলতে পারে বলে? নইলে তার সম্বন্ধে তার সহকর্মীদের মনোভাব সে কি একেবারেই কিছু জানে না? তার ছাত্রেরাও নিশ্চয়ই চোখ-কান বন্ধ করে থাকে না। আড়ালে আবডালে নিশ্চয়ই সমালোচনা করে। তবু যে তারা তার কাছে এসেছে, সে ভালো বক্তৃতা দেয় বলে। তবু যে তারা মন দিয়ে তার ক্লাস করে, তা সে ভালো পড়ায় বলে। রোমাণ্টিক কাব্যকে সে পরম মনোগ্রাহী করে তুলতে পারে বলে। তাহলে সমাজও তাকে অংশত নেয়, অংশত বর্জন করে। সে যে অংশে অংশে বিভক্ত, সমাজও তা জানে, সমাজও তা মানে। সে নিজেকে অখণ্ড মনে করতে চাইলে কি হবে, আসলে সে খণ্ডিত। শুধু দ্বিখণ্ডিত নয়, হয়তো দ্বিশত খণ্ডে, দ্বি-সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত। শুধু এই ব্যাখ্যাতেই তার চরিত্রের অসঙ্গতির মূল খুঁজে পাওয়া যায়। 'ভুলো দোষ গুণ ধরো'। এ অনুনয় না করলেও চলে, যদি তেমন গুণীর মত গুণী হওয়া যায়। তোমার কলঙ্ক হবে চাঁদের কলঙ্ক। তোমার যে সম্পদ আছে, একাগ্রচিত্তে তাই শুধু বাড়িয়ে যাও। তোমার চরিত্রের ত্রুটিবিচ্যুতি স্খলন-পতন কালস্রোতে আপনিই ভাসিয়ে নেবে। পরবর্তী কাল তা নিতান্তই তুচ্ছ বলে মনে করবে। কারণ, তাতে কারো কোন ক্ষতিও হবে না, বৃদ্ধিও হবে না।

উচ্ছৃঙ্খল শশাঙ্ককে আজ নীতি আর শৃঙ্খলার মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্যে ডাকা হয়েছে। যদি উল্টো কথা বলে শশাঙ্ক? যদি সভাপতির আসনে বসে প্রচলিত মরাল কোড ভেঙে চুরমার করে দেয়? কী হবে? চাকরি যাবে? চাকরির ভয় করে না শশাঙ্ক। দু মুঠো অন্নের সংস্থান তার আছে। মান-সম্মানের হানি? যে নগ্ন সে কি আর বাটপাড়কে ভয় করতে যায়।

শশাঙ্ক নীতির বিরুদ্ধে বলবে, ধর্মের বিরুদ্ধে বলবে, যে ধর্ম সুজাতাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। ছিনিয়ে নিয়েছে? কার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে? শশাঙ্কের কাছ থেকে নিশ্চয়ই নয়। শশাঙ্ক তো তাকে ছেড়েই দিয়েছিল। সুজাতা আশ্রমে চলে গেছে শুনে সে তো বউদিদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশাই করেছে, দুঃখবোধ তো করেনি, ফিরিয়ে আনবার কথা তো বলেনি। বলেনি কারণ, নাটকীয়তায় তার বিশ্বাস নেই। গেলেই সে কি আসত? আর এলেই সে কি সুখী হতো? দাম্পত্যজীবনে সুখী হওয়ার সে তো সেই একটিমাত্র পথই ধরে রেখেছে, স্বামীকে একনিষ্ঠ হতে হবে। চিন্তায় কল্পনাতেও

আর কোন মেয়ের ছায়া পর্যন্ত পড়তে পারবে না। এমন অসম্ভব শর্তে শশাঙ্ক রাজী হয় কী করে। তাছাড়া সে বিশ্বাসও করে না। তবু সুজাতা ওভাবে চলে না গেলেই পারত। এ-বাড়ি ছেড়েই বা তার যাওয়ার কি দরকার ছিল? সুজাতা কি ধরে নিতে পারত না, যে-শশাঙ্কের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, যে-শশাঙ্ক তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছিল, এমনকি, ভালো-বাসার অলিখিত শর্তও স্বীকার করেছিল, সেই শশাঙ্কই সুজাতার শশাঙ্ক। আর যেসব শশাঙ্ক আছে তারা অপ্রাসঙ্গিক। তাদের সঙ্গে সুজাতার কোন সম্পর্ক নেই। সুজাতা যদি এ তত্ত্ব মানত তার সঙ্গেও একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারত। হয়তো অন্য অনেকের প্যাটার্নের সঙ্গেই তাদের এই সম্পর্কের প্যাটার্ন মিলত না, কিন্তু কোন-না-কোন একটা প্যাটার্ন তো দাঁড়িয়ে যেতই। আর যে যাই বলুক, যত যুগল-জীবন তত স্বতন্ত্র প্যাটার্ন। বাইরে থেকে দেখতে সব একাকার, কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে, একটু খতিয়ে দেখলে ধরা পড়ে তাদের জীবনযাত্রার নকশা আলাদা আলাদা। প্রতিটি দম্পতির রতিশয্যা হয়তো একই রকমের, কিন্তু যৌথ জীবনের যতি আর মিলে তারা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র। তেমনি একটা প্যাটার্নে ইচ্ছা করলেই এগিয়ে এসে হয়তো ধরা দিতে পারত সুজাতা। যে সুবিধা-সুযোগ শশাঙ্ক নিচ্ছে, সে-ও না হয় তার অংশ নিত। এ ধরনের প্যাটার্নও শশাঙ্কের অজানা নেই। কিন্তু সুজাতা কোন মীমাংসার পথে এগোল না। শুধু যুদ্ধঘোষণা করে দূরে গিয়ে রইল। আজ আরো দূরে গেছে। সেই ধর্মপত্নীর সঙ্গে শশাঙ্কের মত অধার্মিকের কোন মিলই হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু শশাঙ্ক যে দোষে গুণে বিভক্ত, এই তত্ত্ব সুজাতা মেনে নিলেও পারত। যেমন ছাত্রেরা মেনে নিয়েছে, যেমন আরো অনেক মেয়ে মেনে নিয়েছিল। শশাঙ্ক মনে মনে বলল, 'আমরা পুরোপুরি কাউকে দিতে পারিনে, নিতেও পারিনে। শুধু স্বামী-স্ত্রী হিসাবে নয়, প্রণয়ী-প্রণয়িনী হিসাবেই নয়, ভাই হিসাবে, বন্ধু হিসাবে, স্বজন-প্রতিবেশী হিসাবে আমরা সর্বত্র ভগ্নাংশ। শুধু প্রেমের ব্যাপারেই আমাদের হাস্যকর অখণ্ডতার দাবি। সেই দাবি না মানলেই সমাজ-সংসার ছারেখারে গেল। মহাভারত অশুদ্ধ হল।

এই ভুয়ো নীতি-নিষ্ঠার বিরুদ্ধে শশাঙ্ক নিশ্চয়ই লাভাস্রোত বইয়ে দেবে।

দাড়ি কামিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে, চায়ের কাপ আর মনিঅর্ডারের ফর্ম ক'খানা নিয়ে ফের কর্মযোগী হয়ে বসল শশাঙ্ক। হাঁক দিয়ে বলল, 'রামেশ্বর!'

রান্নাঘর থেকে রামেশ্বর স্মিতমুখে এসে দাঁড়াল।

শশাঙ্ক বলল, 'আর এক কাপ চা নিয়ে আয়।'

রামেশ্বর এখন অভিভাবক। 'আর কত চা খাবেন বাবু।'

শশাঙ্ক বলল, 'প্রাণ যত চায়।'

'বেশি চা খাওয়া কিন্তু ভালো না বাবু।'

'যাক, তোকে আর ডাক্তারি করতে হবে না। তোকে যে টাস্ক দিয়েছিলাম, করেছিস!'

'করেছি বাবু। রাত্রে করে রেখেছি।'

'নিয়ে আয় দেখি।'

'এখনই দেখবেন বাবু? এখন যে আমি রান্না চাপিয়েছি।'

'তুই যে কত বড় রাঁধুনী, তা আমি জানি। নুন হয় তো ঝাল হয় না, ঝাল হয় তো নুন দিতে ভুলে যাস। নিয়ে আয় খাতা।'

'আপনার চা?'

'চা পরে হবে। খাতাটা নিয়ে আয়।'

লজ্জিত মুখে খাতা আনতে গেল রামেশ্বর।

অবসর কাটাবার এই এক উপায় খুঁজে নিয়েছে শশাঙ্ক। রামেশ্বরকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। তাস-পাশায় রুচি নেই। তেমন সঙ্গীই বা কোথায়! বন্ধুরা সব অফিসকর্মে আর গৃহধর্মে ব্যস্ত। তারা দাম্পত্যজীবনে মিলন বিরহের মালা গেঁথে চলেছে। শশাঙ্কের মত চিরবিরহী তো কেউ নয়। মন্দিরার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর নতুন বান্ধবী আহরণ আর হয়ে ওঠেনি। আলাপ পরিচয় একটু এগোবার সঙ্গে সঙ্গে হরিণীর মত সব পালায়। শশাঙ্কের অখ্যাতি এতদিনে বোধ হয় সক্রিয় হতে শুরু করেছে। নাকি তারই নিষ্ক্রিয়তা বেড়েছে। সেই উৎসাহ উদ্যম আর নেই। ছুটে গিয়ে কাউকে ধরে আনবার উদ্যম যেন অবসিত। অন্যের মনে আকাঙ্ক্ষাকে উদ্রিক্ত করে তা কিছু দিনের জন্যেও জীইয়ে রাখতে হলে যে অধ্যবসায়ের দরকার, তাতে ঘাটতি পড়তে শুরু করেছে। তাই শশাঙ্ক অধীর হয়, অসহিষ্ণু হয়, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় না। তাই বাধ্য হয়ে 'চাহিয়া দেখ রসের স্রোতে স্রোতে রঙের খেলাখানি।' বাধ্য হয়ে দর্শকের ভূমিকা।

আরো এক বিড়ম্বনা বেড়েছে—অহংবোধ। মান-সম্মান-মর্যাদা বোধ। সেই বোধ যত প্রখর হচ্ছে, তত স্পর্শকাতর হয়ে উঠছে শশাঙ্ক। এক হিসাবে এই স্পর্শকাতরতা তাকে আরো অনেক জটিলতা, আরো অনেক স্ক্যাণ্ডালের হাত থেকে রক্ষা করছে। কিন্তু তাতে ভিতরের আর্তি কি কমেছে? তা প্রত্যক্ষ ছেড়ে পরোক্ষতার দিকে পা বাড়াচ্ছে। সেই প্রথম জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা বাইরে থেকে এখন ভিতরে প্রবিষ্ট। সেই উচ্ছৃঙ্খলতা তার কায় মন আর বাক্যকে আলাদা করে দিয়েছে। তা চিন্তার সঙ্গতি নষ্ট করেছে, আচরণে অসঙ্গতি এনেছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন সত্তাকে শশাঙ্ক এক জায়গায় কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করে, আর পরমুহূর্তে তা ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এখন এই তার সারাদিনের একমাত্র ইন-ডোর গেম।

তবে জীবনস্রোত এক কূল ভাঙছে, আর এক কূল গড়ে তুলছে। কলেজে

অধ্যাপক হিসাবে খ্যাতি বাড়ছে শশাঙ্কের। হৃত প্রতিষ্ঠা খানিকটা উদ্ধারপ্রাপ্ত। রাত থেকে সে দিনে এসেছে। যদিও স্থায়ী অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পায়নি, তবু উপাধ্যক্ষের কাজ তাকেই করতে হয়। এক ঈর্ষান্বিত বন্ধুকে শশাঙ্ক সেদিন বলেছিল, 'এ-খ্যাতির কোন দাম নেই হে। এ যেন সীতার বদলে স্বর্ণসীতা। আর, কোন শব্দের আগে উপ যদি বসাতেই হয়, পতির আগে বসানোই ভালো। সেখানেই এই উপসর্গটি একেবারে পুরো স্বর্গ।'

রামেশ্বর হাতা-খুন্তি ছেড়ে খাতা-পেনসিল নিয়ে এসেছে। আর একখানা ট্রানশ্লেশন বই। চাকরকে বাংলা থেকে ইংরেজী অনুবাদ শেখাচ্ছে শশাঙ্ক। প্রথমেই আছে, 'সদা সত্য কথা কহিও। অহিংসা পরম ধর্ম।'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'এসব কোথায় পেলি?'

রামেশ্বর বলল, 'ট্রানশ্লেশন বইতেই আছে বাবু।'

শশাঙ্ক বলল, 'আমার পকেট মেরে সাফ করে দিচ্ছিস, একবারও স্বীকার করছিসনে, আর লিখছিস, সদা সত্য কথা কহিও!'

রামেশ্বর লজ্জিত হয়ে বলল, 'অজকাল আর চুরি করিনে বাবু। সত্যি বলছি।'

'কেন রে?'

রামেশ্বর বলল, 'আপনি যে আমাকে পড়ান বাবু। আপনি যে আমার গুরু। আমাকে কত ভালোবাসেন আপনি।'

শশাঙ্ক একমুহূর্ত চুপ করে রইল। কিসের একটা আবেগ যেন গলাটা আটকে ধরেছে। হঠাৎ কিছু বলতে দিচ্ছে না।

কিন্তু পরক্ষণেই গলা ঝেড়ে শশাঙ্ক হেসে উঠল, 'ভালোবাসি না ঘোড়ার ডিম করি। যা—ভাগ এখান থেকে। তুই আমাকে স্কুল-মাস্টারের কাজে নামিয়ে এনেছিস। অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল কত কি—যা পালা এখন। খাতা আমি পরে দেখে দিচ্ছি।'

রামেশ্বর চলে গেলে শশাঙ্ক ফের একটুকাল আত্মমগ্ন হয়ে রইল। নীতি যেখানে দণ্ডনীতি সেখানে শশাঙ্কের কাছে তা ব্যর্থ। কিন্তু নীতি যেখানে প্রীতির আধার কি আধেয়, সেখানে? রামেশ্বরকে সে নাকি ভালোবাসে। ওই কুদর্শন ছোঁড়াটাকে অন্তত রূপের জন্যে সে ভালোবাসে না। একি তবে, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সহজ স্বাভাবিক সম্বন্ধ রয়েছে, তাই।

প্রেম শুধু কি তাহলে যৌন প্রেম নয়? স্নেহ দয়া মায়া প্রীতি ভক্তি—মানুষের সমস্ত কোমল হৃদয়বৃত্তির মধ্যেই কি তা পরিব্যাপ্ত!

ক্রীং ক্রীং করে আবার ফোনটা বেজে উঠল।

উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নেওয়ার আগে বুকের মধ্যে সেই উত্তালতাটুকু অনুভব করে নিল শশাঙ্ক। রক্তের মধ্যে যেন আর-এক উৎসব শুরু হয়েছে।

'হ্যালো!'

উৎকর্ণ হয়ে রইল শশাঙ্ক।

কিন্তু না, এবার কোন নারীকণ্ঠ নয়। মোটা ভারী গলার আওয়াজ শশাঙ্কের মধুর প্রত্যাশাকে উপহাস করল।

'শশাঙ্ক? আমি মুরারি দত্ত।'

'মুরারি দা?'

'হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যবশত তাই। তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে তুমি অন্তত আমাকে আশা করনি। আমি তোমাকে হতাশ করেছি।'

'কী যে বলো। ইদানীং তো নির্বান্ধব হয়ে বাস করছি। তবু তুমি একটু খোঁজখবর নিলে।'

'কেন ভাই ছলনা করছ। এ খোঁজখবরে তোমারও মন ভরে না, আমারও মন ভরে না। কিন্তু সেই অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণীদের কোথায় আর পাচ্ছি বল, বুড়ো হয়ে গেছি। পঞ্চাশোর্ধে এখন বনে চলে গেলেই হয়। কিন্তু উপবন যে কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। তারপর খবর কি বলো তোমার? তুমি নাকি সন্ন্যাসী হয়েছ?'

'কে বলল তোমাকে?'

'কার কাছে যেন শুনছিলাম।'

'ভুল শুনেছ।'

'একেবারে ভুল বোধ হয় নয়। অন্তত এপিগ্রামের মত অর্ধসত্য। তোমার অর্ধাঙ্গিনীর খবর আমার কানে গেছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে—'

'তুমি আজকাল বাংলা খবরের কাগজ পড় দেখছি। ওসব যেতে দাও। সে অঙ্গ তো বহু দিন ছিন্ন অঙ্গ। তবু কেন আর তা নিয়ে—'

'কিন্তু তোমাকেও যে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাইনে আজকাল। তুমি নাকি আচার্য হয়েছ!'

'আশ্চর্য!'

'আরে হ্যাঁ, তাই তো শুনছি। দেখছিও তাই। তোমাকে খানদানি পাড়ায় আর দেখা যায় না। মেয়েদের দেখলে মুখ ফিরিয়ে হরিনাম জপ কর, পঞ্চ-মকারের আসল সেট বাদ দিয়ে আর-একটি নিরামিষ সেট—মানে, মুগ মসুর মটর মাষকলাই আর কিঞ্চিৎ মধু—নাকি ধরেছ?'

'কী যে বলো। এসো একদিন।'

'একদিন নয়, আজই তোমাকে গিয়ে কিডন্যাপ করে নিয়ে আসব। তুমি এমন তলে তলে জপতপ করে স্বর্গের পাকা সড়ক তৈরি করবে, আর আমরা রৌরবনরকে পচে মরব, তা তো হতে দেওয়া যায় না।'

'আমিও তা হতে দিতে চাইনে। কিন্তু আজ তো ভাই আমি সময় পেয়ে উঠব না।'

'বেশ, তাহলে কাল। আমার পক্ষেও কালই সুবিধে। কাল শনিবার আছে।'

'কিন্তু কাল যে আমার একটা মিটিং আছে।'

'মহাজনলা। মিটিং আবার কোথায়?'

শশাঙ্ক ঠিকানা বলল।

'বক্তৃতা আছে বুঝি তোমার? বিষয়টা কি?'

'নীতিশাস্ত্র।'

'হাসালে। কোটেশনগুলি নিশ্চয়ই রতিশাস্ত্র থেকে দেবে। সময় কখন?'

'পাঁচটায়।'

'তাহলে আর অসুবিধে কি। বক্তৃতা বড়জোর তুমি এক ঘণ্টা দেবে। তারপর সোজা চলে এসো আমাদের পার্ক স্ট্রীটের ডেরায়। তখন সন্ধ্যার পর থেকে সারা রাতটাই তো আমাদের। আমার অবশ্য বারোটা পর্যন্ত। তারপর বউয়ের কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার জন্যে বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু তোমার তো সে বালাই নেই। তুমি তো সব সাফ করে রেখেছ।'

'দেখা যাক। কথা দিতে পারছিনে মুরারিদা।'

'কেন হে? এখন কথাই তো আমাদের সব। দুটি চোখ আর দুটি ঠোঁট এই শুধু সম্বল। আর সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কালে খেয়েছে। এসো এসো। এক পাত্র সামনে রেখে গল্প করব। মানে তুমি করবে আমি শুনব। তোমার নতুন দু-একটি অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী শুনব।'

'আর অ্যাডভেঞ্চার! আচ্ছা রেখে দিচ্ছি।'

'কথাও তো দিলে। রেখো কিন্তু।'

শশাঙ্ক ফোন ছেড়ে দিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসল।

একই রকম আছেন মুরারিদা। পঞ্চাশ—বিনয় করে বলছেন। পঞ্চাশ এখনো হয়নি। এখনো ঊনপঞ্চাশের ধাক্কার সামনে বুক এগিয়ে দিচ্ছেন। স্ত্রী পুত্র ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী বজায় রেখে সবাইর দাবি মিটিয়ে নিজের ভিন্নতর বাসনা কামনা পূর্ণ করে যাচ্ছেন। শশাঙ্কের মত হননি। ফিল্ম ডিরেক্টর হিসাবে কিছু খ্যাতি এক সময় হয়েছিল। পর পর দু তিনটি ছবি ফপ করায় সে খ্যাতি কিঞ্চিৎ ম্লান। সম্প্রতি আর কোন ছবি-টবি করার সুযোগ আসেনি। এ ছাড়া আর কোন দুঃখ কি ব্যর্থতা বোধ ওঁর মনে নেই। ছবি না করলেও আর্থিক সঙ্কটের মুখে ওঁকে পড়তে হয়নি। পৈতৃক আমলের গোটা দুই বাড়ি আছে। ভাড়া মন্দ ওঠে না। কি একটা ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীর অংশ আছে। তাতেও লভ্য মোটাই থাকে। অনেক দিনের আলাপ। শশাঙ্ককে দেখে প্রথম দিনই বলেছিলেন, 'আপনাকে আমার ছবির নায়ক করতে ইচ্ছে করে। ঘরে আইবুড়ো মেয়ে থাকলে সুশ্রী সমর্থ ছেলে দেখলে বাপের মনে যেমন জামাই করবার সাধ জাগে, আমাদেরও তেমনি। আমরা হিরো পেলে হিরোইন খুঁজি। হিরোইন যদি পুঁজি থাকে হিরোর জন্যে শহর চুঁড়ে বেড়াই।'

ওঁর কোন ছবির হিরো অবশ্য শশাঙ্ক হয়নি। তবু ওঁর সঙ্গে এক ধরনের বন্ধুত্ব হয়েছে। অপরিসীম ভাইটালিটি আছে মানুষটির মধ্যে—শশাঙ্কের যা

অভাব। তাই ওঁকে তার ভালো লাগে। কিন্তু নিজের আইডেন্টিটি হারিয়ে শশাঙ্ক ওঁর সঙ্গে মিশে যেতে পারে না। মিশে যেতে চায়ও না। মুরারি ঠিক অভিন্নহৃদয় নন।

শশাঙ্ক ভাবল, 'আমাদের কোন বন্ধুই বা অভিন্নহৃদয়? অভিন্নহৃদয়েষু—এ একটা পাঠ মাত্র। আসলে ভিন্নতা নিয়েই আমরা বন্ধুত্ব করি, ভিন্নতা সত্ত্বেও বন্ধু হই। অভিন্ন হওয়ার দরকার হয় না, শুধু একটু হৃদয়বান হলেই যথেষ্ট।'

আবার সেই মনিঅর্ডার ফর্ম ক'খানা টেনে নিয়ে বসল শশাঙ্ক। বারবার বাধা পড়ছে। এবার ফর্মগুলি ফিলআপ করে রামেশ্বরকে টাকা দিয়ে পোস্ট অফিসে পাঠাতে হবে। প্রথম নামটি কমলিনী দেবী। দূর সম্পর্কের বিধবা বউদি। এখন প্রৌঢ়া। শশাঙ্কের চেয়ে অন্তত বছর দশেকের বড়। রসশাস্ত্রে প্রথম দীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি। আশ্চর্য, তখন বেশি বয়স শশাঙ্ককে বেশি টানত। তাঁদের মধ্যেই বিস্ময় আর রহস্যের স্বাদ বেশি পেত শশাঙ্ক। কে জানে তখনই বেশি রূপরসিক ছিল শশাঙ্ক, না এখন? তখন বেশি হৃদয়বান ছিল, না এখন? মুরারিদা অবশ্য বলেন, 'ভাই, এর মধ্যে হৃদয়েরও কিছু নেই রূপবোধেরও কিছু নেই। যা আছে তা সোজা সরল সুস্পষ্ট জৈব ব্যাপার।' হয়তো মুরারিদার কথাই সত্যি। তবু মাসে মাসে বেনারসের ঠিকানায় টাকাটা বউদিকে পাঠায় শশাঙ্ক। সেখানে তিনি বোনপো বোনঝিদের সঙ্গে আছেন। তারাও ষষ্ঠীর কৃপায় বিব্রত। বউদির নানারকম অসুখবিসুখ আছে। একটু আফিং চাই, সেজন্যে দুধও চাই। তাই টাকাটা তাঁর দরকার হয়। কিন্তু টাকা পাঠাবার সময় কোন রোমান্টিক স্মৃতিই কি শশাঙ্কের মনে পড়ে? কি হৃদয় কোনরকম আবেগে আপ্লুত হয়? বলা শক্ত। হয় না বলাই ভালো। অনেক সময় নাম আর ঠিকানা নিতান্তই শুষ্ক কয়েকটা অক্ষর। কোন সঙ্কেতের ইশারা দেয় না। কোন নিগূঢ় ব্যঞ্জনা বয়ে আনে না। আনলে ভালো হতো কিন্তু আনে না।

তারপর, টি. বি. হাসপাতালের অমিতা মল্লিক। বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল না ওর সঙ্গে। বছর ছয়েক একসঙ্গে ঘুরেছে বেড়িয়েছে। কিছু চুম্বন আলিঙ্গনের বিনিময়—এই পর্যন্ত। সেই স্মৃতি সে নাকি বুকে করে রেখেছে। শশাঙ্ক বিশ্বাস করে না। কিন্তু মাস মাস কিছু কিছু খরচ দেয়।

তারপর শ্রীমতী সুরমা দাস। অ্যামেচার অভিনেত্রী। এখন পেশা বদল। সেই চেহারা নেই, বয়স নেই। পুঁজিপাটা সব কী করে খুইয়েছে কে জানে। এ লাইনে পুরুষরা খোয়ায়, মেয়েরা সঞ্চয় করে। কিন্তু সুরমার বেলায় অন্যরকম হয়েছে কাণ্ড। ঝানু মেয়ে পাকা মেয়ে। তার বাচ্চা মেয়েটি যে শশাঙ্কেরই, এ ব্লাফ সে অনেকদিন দিয়েছে। কিন্তু শশাঙ্ক কি অত সহজে ভোলে? তার আরো অনেক বন্ধুকে যে পিতৃত্বের গৌরব দিয়েছে সুরমা, তা

কি আর শশাঙ্ক জানে না? কিন্তু সেই মেয়ে যখন স্মল-পক্সে মারা গেল সুরমার তখন সে কি কান্না! আর সে কি অনুতাপ! 'আমি তোমাকে ঠকিয়েছি। মিথ্যে কথা বলেছি। আমার সেই পাপেই মেয়ে চলে গেল।'

সেই সন্তানহারা জননীকে দেখে শশাঙ্কের বড় কষ্ট হয়েছিল। মেয়ের বদলে মেয়ে তাকে সে দিতে পারেনি। কিন্তু টাকাটা পাঠায়। আহা মেয়েটা বেঁচে থাকলে ভারি সুন্দরী হতো। মায়ের দুঃখ দূর করত।

এমনি আরো কত আছে। কোন একজন গল্পলেখককে এসব মালমসলা দিলে এর এক একটি কাহিনী নিয়ে এক একটি পুরোদস্তুর গল্প লিখতে পারত। কিন্তু শশাঙ্কের কাছে এগুলি শুধু স্কেচ। অস্পষ্ট ধূসর রেখাচিত্র। যেন আর একজনের জীবন, আর একজনের স্মৃতি। শশাঙ্কের কাছে সব যেন অবাস্তব হয়ে গেছে।

শুধু মন্দিরা এখনো তা হয়নি। সে কি সদ্যতমা বলে? সকাল বেলায় টেলিফোনে তার গলার স্বরের মত একটি স্বর শুনে শশাঙ্ক উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। নিশ্চয়ই আর কেউ হবে। হয়তো সত্যিই মন্দিরা ফোন করেনি। কিন্তু আশ্চর্য, শশাঙ্ককে অস্থির প্রমত্ত অপ্রকৃতিস্থ করবার পক্ষে সেই স্বর-সাদৃশ্য যথেষ্ট ছিল।

মন্দিরা হয়তো ফোন করেনি। না করাই সম্ভব। সে ফোন করতে যাবে কোন দুঃখে? শশাঙ্ক যতদূর জানে সে সুখে স্বচ্ছন্দে স্বামীর ঘর করছে। এমন অনেক গৃহিণীকেই তো সে চেনে, যারা এখন শশাঙ্ককে দেখলে আর চিনতে পারে না।

মন্দিরা ফোন করেনি। কিন্তু কণ্ঠের সেই সাদৃশ্যটুকু শশাঙ্ককে বারবার উন্মনা করেছে। কোন এক অদৃশ্য শক্তি তাকে বারবার টেলিফোনের কাছে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু কোথায় ফোন করবে? ওর বাপের বাড়িতে? ছি ছি ছি। সেই অপমানের পরেও শশাঙ্ক কি আর ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে? তবু কী করে তাকে দেখা যায়? শুধু দূর থেকে একটিবার তাকে দেখা। দেখা না দিয়ে শুধু দেখে যাওয়া?

কিন্তু শশাঙ্ক কি ক্ষেপেছে? যাকে যেতে দিয়েছে তাকে যেতে দেওয়াই ভালো।

'বাবু, উঠুন এবার। অনেক বেলা হল। এবার চান করতে যান।'

রামেশ্বর এসে তাগিদ দিতে শুরু করল।

ক'দিনের জন্যে বাপের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল মন্দিরা।

মিহির আসেনি। সে অন্য কাজে ব্যস্ত। মন্দিরা একাই এসেছে।

দুদিন বাদে স্বামীর সঙ্গে সে মীরপুর কলিয়ারিতে চলে যাবে। সেখানে কোয়ার্টার্স আছে মিহিরের। এত তাড়াতাড়ি সে যে স্ত্রীকে আলাদাভাবে নিজের কাছে নিয়ে রাখবে তা তার বাবা-মাও ভাবতে পারেননি। মন্দিরাও কিছু বিস্মিত হয়েছে বইকি। মিহিরের মত শান্ত, বাপ-মা'র একান্ত অনুগত ছেলে যে বিয়ের পর ছ'মাস যেতে না যেতেই স্ত্রীকে নিজের কর্মস্থলে নিয়ে যেতে চাইবে তা মন্দিরারও ধারণার বাইরে। তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক তেমন যে সাধারণ নয়, স্বাভাবিক নয় তা কি আর মিহিরের টের পেতে বাকি আছে? তবু সে স্ত্রীকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চাইছে, এতে অবাকই হয়েছে মন্দিরা। অবাক হয়েছে, আবার হয়ওনি। মানুষটি আর পাঁচজনের মত নয়, শুধু চাল-চলনে ধরন-ধারণেই কি তাদের থেকে আলাদা? তার যুক্তি বুদ্ধি সম্মানবোধের ধারাও যেন স্বতন্ত্র।

মন্দিরা বলে দিয়েছে, 'একটা ভুলের ফলে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। আমি বাপ-মা'র বিরুদ্ধে তেমন জেদ করে থাকতে পারিনি বলে, সময়মত মন স্থির করতে পারিনি বলে এই কান্ড ঘটল। তুমি পুরুষ মানুষ, ইচ্ছে করলেই এই ভুল শুধরে নিতে পার।'

মিহির জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী করে?'

মন্দিরা সহজ পথ দেখিয়ে দিয়েছিল, 'বউ পছন্দ হয়নি বলে আমাকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও, তারপর আর একটা বিয়ে কর।'

'কিন্তু এমন একটা মিথ্যে কথা কেন বলব। তোমাকে তো আমার পছন্দ হয়েছে।'

এ কথায় মন্দিরা একটু থমকে গিয়েছিল। অবশ্য কথাটা কতখানি সত্যি আর কতখানিই বা তার মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রয়েছে তা বলা সহজ নয়। তবু যে মানুষ বলে, তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে তার মুখের ওপর হঠাৎ কোন রূঢ় কথা বলা যায়? মন্দিরা তাই একটু হেসে ফেলেছিল।

'আমাকে তোমার পছন্দ হওয়ার তো কোন কারণ নেই। তুমি আমাকে তো এর আগে দেখোনি। বাপ-মা'র ওপর বিরক্ত হয়ে তুমিও বিয়ে করেছ, আমিও তাই। বেশ তো তুমি যদি মিছিমিছি নিজের ওপর দায়িত্ব নিতে না চাও, আমার ওপরই দোষ চাপিয়ে দিয়ো। বলে দিয়ো বউটাই ভালো না, সেই তোমাকে অপছন্দ করে চলে গেছে। তারপরে দেখেশুনে তুমি বরং ফের আর একটা বিয়ে করে নিয়ো।'

ফুলশয্যার রাত্রে সেই অবুঝ কান্নাকাটির পর আস্তে আস্তে সমস্ত

আবেগের আতিশয্য জমে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে মন্দিরার। এমন শান্ত ধীর স্থিরভাবে সে যে কখনো এসব কথা বলতে পারে তা সে নিজেই ভাবতে পারত না। মিহিরের মত শান্ত নিরীহ অথচ ভিতরে ভিতরে পরম নিষ্ঠুর মানুষটির সংস্পর্শই কি তাকে ক'মাসের মধ্যে এমন করে বদলে দিয়েছে?

মন্দিরার কথার জবাবে মিহির হেসে বলেছিল, 'দেখ, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কম। তাই বলে অত বোকাও আমি নই। ঢাক পিটিয়ে বলব, সেদিনের বিয়ে-করা বউ আমাকে অপছন্দ করে চলে গেছে, তারপর কোন মেয়ের বাপ কি আমাকে মেয়ে দিতে ভরসা করবে? না কি কোন মেয়েই দোজবরে স্বামীর কাছে নিজের ইচ্ছায় এগিয়ে আসবে? তাকেও তো ফের ধরে বেঁধে তার বাবা আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে যাবেন। তারপর সেই আনসার্টেনটি। সেই লটারি। পছন্দ হবে কি হবে না, মিল হবে কি হবে না। তার চেয়ে বরং ক'টা দিন সবুর করা ভালো। যাচাইটা একেবারেই হয়ে যাক। তারপরে তো অন্য ব্যবস্থা আছেই।'

মন্দিরা চমকে উঠেছিল, 'অন্য ব্যবস্থা আবার কি?'

মিহির বলেছিল, 'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল না হলে যা হয়। দুজনেরই অন্যত্র যাতায়াত।'

মন্দিরা বলেছিল, 'ছিঃ।'

মানুষটি অমন সেকেলে খোলসে থাকলে কি হবে, সব খোঁজখবরই রাখে। ভদ্রভাষার আড়ালে সব কথাই বলে সারতে পারে। কিন্তু একথা তো আরো একজনের মুখে শুনেছে মন্দিরা। কত সরস করে কত সুন্দর করেই না এ সব কথা বলা যায় তা তো জানতে তার বাকি নেই। কারো কারো মুখের কথা হাতের ছোঁয়ার মত মনে হয়। মনে হয় যেন কথা নয়, সমস্ত অন্তরটাই সেই শব্দগুলির ভিতরে থর থর করে কাঁপছে।

হাত ধরে মিহির তাকে সেদিন সেই ফুলশয্যায় তুলেছিল। বলেছিল, 'শান্ত হয়ে ঘুমোও।'

তারপর নিজেই পিছন ফিরে শুয়েছিল। ঘুমোয়নি যে তা মন্দিরা জানে। ঘুমোয়নি, কিন্তু তাকে বিরক্তও করেনি। আশ্চর্য সংযম, ভদ্রতা আর মনের জোর। ভালোবাসুক আর না বাসুক, এ কথা মন্দিরা স্বীকার করে, অনেক গুণ আছে মিহিরের। এই ক'মাসের মধ্যে বার তিনেক মিহির বাড়ি এসেছে। দুচারদিন করে থেকেও গেছে। এর মধ্যে গুণের পরিচয় তার কম পায়নি মন্দিরা। ভালো না বেসেও হয়তো এমন মানুষের ওপর নির্ভর করে থাকা যায়। আর অন্য দিকে যাকে সে ভালোবাসল তার ওপর একটি দিনও নির্ভর করা যায় না। কোনটা ভালো? নিশ্চয়ই প্রথমটা। তবু অবুঝ মন মাঝে মাঝে অন্য কথা বলে। এই উৎসবহীন আনন্দহীন নীরস জীবন সে কিছুতেই কাম্য বলে মানতে চায় না।

আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে মন্দিরা। রাত্রে শোবার ঘরে তাদের যে ধরনের কথাবার্তাই হোক, বাইরে মিহির তা কাউকে বুঝতে দেয় না। এমনকি ওর অত আদরের বোন বিশাখার কাছেও নতুন বউকে নিয়ে হাসি তামাশা করে। যেন বিয়ে করে খুবই আনন্দ পেয়েছে মিহির, খুবই সুখী হয়েছে। বিয়ে করে সুখী না হওয়াটা যেন পুরুষের পক্ষে পরম অগৌরবের ব্যাপার। বাপ-মা ভাই-বোন বন্ধু-বান্ধব সবাইর কাছেই সুখের ভান করে মিহির। অমন যে সত্যবাদী আদর্শবাদী পুরুষ, তার আচরণে এই মিথ্যাটুকু থেকেই যায়। স্বামীর দেখাদেখি এই ছদ্ম সুখের বেশ মন্দিরাকেও পরতে হয়েছে। শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে নালিশ করার কোন কথাই ওঠে না। বরং মন্দিরার বিরুদ্ধেই অনেক নালিশ তাঁদের মনের মধ্যে জমে আছে তা সে জানে। মন্দিরাও দেওর-ননদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলে, ঠাট্টা তামাশা করে, শ্বশুর-শাশুড়ীর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে। শাশুড়ী ঠাকুরঘরে আজ অবধি তাকে ঢুকতে দেননি, রান্নাঘরে অনিচ্ছার সঙ্গে কোন কোনদিন ঢুকতে দিয়েছেন। তাঁর এই কঠোরতা স্বামীর শাসনে গলেনি, ছেলেমেয়ের অনুনয় অনুরোধ তাঁকে টলাতে পারেনি। তিনি বলেন, 'বউ তোমরা দেখেশুনে এনেছ, তোমরা তাকে নিয়ে সুখে শান্তিতে বাস করো, আদর করো, সোহাগ করো, খাওয়াও পরাও। আমি তো বাধা দিতে যাচ্ছিনে, আমাকে কেন তোমরা টানছ এর মধ্যে?'

মন্দিরাও যতদূর পারে মহিলাটিকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে।

বাপের বাড়িতে আসতে দেওয়াটা ওঁদের পছন্দ নয়। বিশ্বাস তো নেই মন্দিরার ওপর, দেবেন কেন। তবু দু'একবার দু'একদিনের জন্যে আসতে দিতেও হয়েছে। আসবার জন্যে মন্দিরা কাউকে কোন অনুরোধ করেনি, কান্নাকাটিও করেনি। তবু মিহির আর বিশাখার পীড়াপীড়িতে ওঁরা শেষ পর্যন্ত যেতে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন বাড়ির বাইরে যেন মন্দিরা কোথাও না যায়, বাড়ির লোক ছাড়া অনাত্মীয় কারো সঙ্গে যেন কথা না বলে।

বাবা-মা জিজ্ঞাসা করেছেন, দিদি জিজ্ঞাসা করেছে, 'কি রে, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কেমন আছিস?'

মন্দিরা কি বলবে, ভালো নেই?

বলে কি লাভ?

'ওঁরা তোর আদর যত্ন করছেন তো?'

মন্দিরা কি বলবে, করছেন না? বলে কি লাভ?

বোধ হয় মায়ের ইঙ্গিতেই দিদি তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'হ্যাঁরে, তোদের মনের মিল হয়েছে তো?'

'মনের মিল কাকে বলে দিদি?'

'আহা, কচি খুকি, কিছু জানেন না।'

ইন্দিরা গাল টিপে দিয়েছিল তার, 'বল-না, হয়নি?'

মন্দিরা ছন্দা-নন্দার মত সত্যিই খুকি নয়। মনের মিল বলতে দিদি যে কী বোঝাতে চাইছে তা সে জানে। তাই ঘাড় কাত করে বুঝিয়ে দিয়েছিল, 'হয়েছে।'

দিদি নিশ্চিন্ত হয়ে হেসে বলেছিল, 'তবে আর কি।'

মনের মিল মানে দিদির কাছে দেহের মিল। তা হয়েছে। মাসখানেক বাধা দিয়ে মন্দিরা আটকে রেখেছিল স্বামীকে। বলেছিল, 'আমাকে তৈরি হতে দাও, আমাকে সময় দাও।'

কিন্তু কিছুতেই এক মাসের বেশি সময় তাকে মিহির দেয়নি। বেদমন্ত্রের জোরে সে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

অমন যে ভদ্র, অত যে সৎ, সে কেন এমন আচরণ করতে গেল অবাক হয়ে ভাবে মন্দিরা। মিহির প্রথম প্রথম উদাসীন হয়েই তো ছিল। বেশি কিছু সে জিজ্ঞাসা করেনি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেশি কথা সে জানতে চায়নি। মন্দিরা যতটুকু বলেছে ততটুকু শুনেই সে সন্তুষ্ট থেকেছে। নাম ধাম কিছুই সে জানতে চায়নি। মন্দিরা স্বামীর কাছে স্বীকার করেছে, বিয়ের আগে সে এক-জনকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু সে ভালোবাসার যোগ্য মানুষ নয়। তাই মন্দিরা তাকে আর ভালোবাসে না। স্বামীকে খুশী করার জন্যে নয়, অন্তরের আক্ষেপ থেকেই এ কথা বলেছিল মন্দিরা।

মিহির সহানুভূতির সঙ্গে বলেছিল, 'তবে আর কি। তবে আর আমি কিছু জানতে চাইনে। যা অতীতের ব্যাপার আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাইনে।'

একথায় স্বামীর ওপর শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠেছিল মন্দিরার।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই অদ্ভুত ব্যবহার শুরু করল মিহির। হয়তো কোন বন্ধু তাকে বলে দিয়ে থাকবে, ওসব না হলে মেয়েদের মন পাওয়া যায় না। ওসব না হলে বিয়ে বিয়ে বলেই গণ্য হয় না।

মন্দিরার দোষ কি। জোর করতে গিয়ে মিহির যদি অপদস্থ হয়, অপরিতৃপ্ত থাকে তার জন্যে স্ত্রীকে কেন সে দায়ী করবে? কিন্তু করেছে।

মন্দিরার দিকে চেয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে সে বলেছে, 'তুমি একটি কথাও আমাকে সত্যি বলনি। আমার কোন কোন বন্ধুর ব্রথেলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। আমি কোনদিন যাইনি। কিন্তু মনে হচ্ছে আজ আমার সেই অভিজ্ঞতাই হল।'

মন্দিরা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিল, 'কী! কী বললে?'

দ্বিতীয়বার অবশ্য মিহির আর কথাটা বলেনি। কলিয়ারীতে ফিরে গিয়ে সেই অশোভন কথার জন্যে চিঠিতে ক্ষমাও চেয়েছে। কিন্তু গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে কি কোন ফল হয়? তারপর থেকে যতবার মিহির তাকে আদর করতে গেছে, মন্দিরার ওই একই কথা মনে পড়েছে। আর সঙ্গে

সঙ্গে পরম বিতৃষ্ণায় নিজের মধ্যেই নিজে কুঁচকে গিয়েছে মন্দিরা। কার অভিশাপ তাকে এমন অহল্যা-পাষাণী করে তুলল? পাথর, তার সর্বাঙ্গ পাথর দিয়ে গড়া। তাতে রক্তও নেই, মাংসও নেই। শিহরণও নেই স্পন্দনও নেই। মিহির কখনো উত্তপ্ত হয়েছে, কখনো অনুতপ্ত হয়েছে, নতুন আশায় আগ্রহে ফের এগিয়ে এসেছে আবার নতুন ব্যর্থতায় বিরক্ত হয়ে সরে যেতেও দেরি করেনি। কিন্তু কী করতে পারে মন্দিরা!

শুধু কাতর মিনতি করেছে, 'আমাকে সময় দাও, আমাকে ছেড়ে দাও।'

কিন্তু মিহির ছাড়েনি।

পাথরের মানুষ মিহির। পাথরের মতই সঙ্কল্পে অটল। রক্তমাংসের বউ দিয়ে যেন তার দরকার নেই। তার বদলে পাথরের একটি নারীমূর্তি পেলেই তার চলে যায়।

কিন্তু মন্দিরার মনে পড়ে, আজ যা পাথর তা সেদিন আর একজনের কণ্ঠস্বরে, দৃষ্টিতে, ছোঁয়ায় কেমন মোমের মত গলত। সেই উষ্ণ সান্নিধ্য সেই স্পর্শসুখের যেন তুলনা হয় না। সে সম্পর্ক বৈধ নয়, মন্ত্রপূতও নয়, তবু তার মধ্যে যে অপূর্ব মাদকতা, স্বপ্নাচ্ছন্নতা ছিল তা এই টালীগঞ্জের বাড়িতে কোথায়? কিন্তু সে সব কথা মনে করাও এখন অন্যায়। তা ছাড়া, সেই মানুষটি যে খাঁটি নয় সে প্রমাণও তো মন্দিরা হাতে হাতেই পেয়েছে। কী হবে সেই কৃত্রিম মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রতিশ্রুতিতে? সে তো সুখ নয়, সুখের ছলনা। সে তো সত্যিকারের অমৃত নয়, বিষ। আশ্চর্য, তবু সেই বিষের জন্যেই মন যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে।

মন্দিরা ভিতরে ভিতরে ছটফট করে। কিন্তু বাইরে শান্ত। শুধু দিন-গুলি কোনরকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই বাঁচে।

তার অবস্থা দেখে বিশাখা একদিন বলল, 'চুপচাপ বসে থেকে কি হবে বউদি, তুমি বরং পড়াশুনাটা ফের আরম্ভ করে দাও। কোর্সটা শেষ করো।'

বিশাখার দাদাও এ কথা মাঝে মাঝে বলেছে।

মন্দিরা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ওঁরা আমাকে যেতে দেবেন কলেজে? তুমি যদি সে ব্যবস্থা করে দিতে পার তাহলে বেঁচে যাই বিশাখাদি। বাবার মতটা যদি বলে-কয়ে করাতে পার—আমি তো সম্পর্কে বড়, তোমাকে আমি এমন এক বর দেব—'

'কী বর দেবে শুনি?'

বিশাখা হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল।

মন্দিরা বলেছিল, 'আমেরিকা থেকে যিনি তোমাকে মাসে তিনখানা করে চিঠি লেখেন, তিনি হঠাৎ এসে হাজির হবেন। এসে বলবেন, চল যাই।'

বিশাখা বলেছিল, 'না বউদি, অমন বর ফলবে না। ফলিয়ে দরকারও নেই। তিনি সবে গেছেন। তাঁর ফিরতে আরো তিন বছর বাকি।'

মন্দিরা সবই শুনেছে। বিশাখার সেই বন্ধুও প্রফেসর। স্কলারশিপ নিয়ে নিউ ইয়র্কে গেছেন। কিন্তু এই দূরত্ব ওদের মধ্যে কোন দূরত্বই নয়। চিঠিতে চিঠিতে ওরা সেতু বেঁধে চলেছে। ওদের মধ্যে জাতের অমিল আছে কিন্তু বয়সের অমিল নেই। রুচি প্রবৃত্তি বিশ্বাসে ওরা এক, ওরা পরস্পরের প্রতি একনিষ্ঠ। এমন মানুষের জন্যে তিন বছর কেন, সারা জীবন প্রতীক্ষা করে থাকা যায়। কিন্তু মন্দিরার কি সেই ভাগ্য? যাকে সে ভালোবাসল সে ভালো-বাসার যোগ্য হল না। যার জন্যে সে প্রতীক্ষা করে থাকতে চাইল সে বলল, 'তোমার প্রতীক্ষা করে কাজ নেই।'

এমন মানুষের জন্যে এখনো যদি মন পোড়ে, পোড়া কপাল মন্দিরার।

কলেজে ফের ভর্তি হবার অনুমতি পায়নি মন্দিরা। মিহিরের বাবা-মা তো রাজী হনই নি, মিহির নিজেও গররাজী। বলেছে, 'সেসনের মাঝখানে কলেজে গিয়ে আর কি হবে। বাড়িতে পড়াশুনো কর। প্রাইভেট পরীক্ষা দাও।'

আসলে এখানেও সেই অবিশ্বাস, এখানেও পাহারার বন্দোবস্ত। বাপের বাড়ির দুর্গ থেকে শ্বশুরবাড়ির দুর্গে বন্দিনী হয়ে এসেছে মন্দিরা। বাইরে কোথাও বেরোতে পারবে না, কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা বলা বন্ধ। বাপের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ। এ'রা যে নতুন কুটুম্বের সঙ্গে মেলা-মেশা ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করেন না তা ওঁদের ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মন্দিরার বাবা যেন তার শ্বশুরকে সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কেটের জিনিস দিয়ে ঠকিয়েছেন। শ্বশুরের সেই চাপা রাগ বাবার ওপর বেশ আছে। মন্দিরা তা বুঝতে পারে। তাতে শ্বশুরবাড়ির ওপর তার বিরূপতা আর বিতৃষ্ণা আরো বাড়তে থাকে। বাবাও যে তা না বুঝেছেন তা নয়। নতুন কুটুম্বদের মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর ভুল ভেঙেছে। তিনি ফের তাঁর ডিসপেনসারির কাজ আর নার্সিং হোমের স্বপ্ন নিয়ে ব্যস্ত।

বাস্তব আর স্বপ্নের মধ্যে সবাই একটি পথ করে নিয়েছে। কারো পাকা সড়ক কারো বা সুড়ঙ্গ পথ। শ্বশুরমশাই পরের জন্যে জমি কিনে দেন, বাড়ি কিনে দেন, বাড়ি তৈরি করবার ভারও নেন। আর সেই সঙ্গে নিজেও বাড়ি গাড়ি সম্পত্তি বাড়াবার স্বপ্ন দেখেন। তাঁকে দেখে বৃদ্ধ বলে মনে হয় না। উৎসাহ-উদ্দীপনায় তিনি যুবকের মত। শাশুড়ী তাঁর ওই মোটা শরীর নিয়েও বেশ খাটতে পারেন। দিনরাত ধোয়া-মোছা সাজানো-গুছানো নিয়ে ব্যস্ত। ঘরকন্নার কাজে তাঁর নেশা আছে। কারো সাহায্য চানও না, কারো হস্তক্ষেপও পছন্দ করেন না। খুঁটি-নাটি সব ব্যাপারে নিজের আধিপত্য নিয়ে নিজের রাজ্যে তিনি সম্রাজ্ঞী। বিশাখা পড়াশুনো বন্ধুবান্ধব নিয়ে থাকে। তা ছাড়া আছে তার সাপ্তাহিক চিঠি লেখা। বোধ হয় ছ'দিন বসে

বসে ভাবে আর একদিন লেখে। আর নতুন চিঠি না আসা পর্যন্ত আগের চিঠিখানা বার বার করে পড়ে। পুরোন চিঠি কিছুতেই যেন ওর পুরোন মনে হয় না। এই চিঠি লেখার চিঠি পাওয়ার নেশা তো মন্দিরারও ছিল। সেই মত্ততার তুলনা হয় না। তিনি বলতেন, 'চিঠি মাত্রেই মিঠে।' সত্যি, পিওনের মুখে চিঠি কথাটি শুনলে মন্দিরা পাগল হয়ে উঠত। খুলেও দেখত সেই পাগলামি। ছত্রে ছত্রে পাতায় পাতায় উচ্ছ্বাস আর উচ্ছলতা। কখনো বা সূক্ষ্ম কৌতুক, স্নিগ্ধ পরিহাস। সেই চিঠিগুলিই যেন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। তার মধুরতার শেষ নেই। কিন্তু সব চিঠিই বিয়ের আগে পুড়িয়ে দিয়ে এসেছে মন্দিরা। কারো হাতে ধরা পড়বার ভয়ে নয়। রাগে দুঃখে অপমানে। নিজের মনের অরুচি আর বিতৃষ্ণায়। কিন্তু কে জানত, সব বস্তু পুড়ে ছাই হয়েও শেষ হয় না।

চিঠি মন্দিরা এখনো পায়। স্বামীর চিঠি। ভদ্রলোক চিঠি লিখতে পারে না। শুকনো নীরস বলে মনে হয় মন্দিরার। যেন শুধু কর্তব্যবোধে লেখা। বড় চিঠি নয়, ছোট ছোট চিঠি। তারও বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে তত্ত্ব আর উপদেশ। শুধু শেষ লাইনটিতে থাকে—ভালোবাসা নিয়ো। যেন ভালোবাসা ওই একটি লাইনে দেওয়া যায়, নেওয়া যায়। ভালোবাসা যদি সমস্ত চিঠি ভরে ছড়িয়ে না থাকে, সমস্ত জীবনভরে ছেয়ে না যায় তাহলে শুধু ওই শব্দটির কি কোন অর্থ থাকে?

অবশ্য বেশি ভালো যে মিহির তাকে বাসেনি এক হিসাবে তা ভালোই হয়েছে। স্বামীর সেই অগাধ ভালোবাসা সে না পারত নিতে, না পারত সইতে। তার চেয়ে এই ভালো। এই পাঁচজনের কাছে মুখরক্ষা করে, সৌষ্ঠব শোভনতা বজায় রেখে দিন চালাবার মত ভালোবাসাই যথেষ্ট।

এই ভালোবাসার জোরেই মিহির যে তাকে সেই কলিয়ারীতে নিয়ে যেতে চাইবে তা মন্দিরা ভাবেনি। তাই সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

মিহির জবাব দিয়েছে, 'আমি বুঝতে পারছি তোমার এখানে কষ্ট হচ্ছে। তুমি এখানে একা।'

কথাটা তো মিথ্যা নয়। অবস্থাটা মিহিরের ঠিকই চোখে পড়েছে।

মন্দিরা কোন জবাব দিতে পারেনি।

মিহির বলছে, 'তা ছাড়া ওখানে গেলে তোমার একটা নতুন জায়গা দেখাও হবে। অনেকে তো দেখতেও যায়। তা ছাড়া এখানে তুমি যেমন সংসারের বাইরে রয়েছ, সেখানে তা থাকতে হবে না। সেখানে যত অস্থায়ী যত ছোট সংসারই হোক, সে সংসার তোমার সংসারই হবে। আর ইচ্ছে করলে তুমি যখন খুশী চলেও আসতে পারবে। ক'ঘন্টারই বা পথ।'

শুনে মন্দিরার মন একটু নরম হল। সব জেনেও যে মানুষটি তার

সম্বন্ধে এত কথা ভেবেছে, তাকে সুখে রাখবার জন্যে এত রকমের এত ব্যবস্থা করছে, তার সততা আন্তরিকতাকে কী করে মন্দিরা অস্বীকার করে?

তা ছাড়া, যাবে না যে মন্দিরা, করবেই বা কি। শ্বশুরবাড়িতে মৌখিক আদর যত্ন সবই আছে, কিন্তু কী যেন নেই। 'থাকতে এসেছ থাক। না থেকে যাবেই বা কোথায়।' এই যেন ওঁদের ভাব। বাপের বাড়িতে এসেও কি সেই জায়গা মন্দিরা ফিরে পাবে? তা পাবে না। এরই মধ্যে তার সেই ঘরখানা ছন্দা নন্দারা দখল করে নিয়েছে। অবশ্য বাড়িতে ঘরের অভাব নেই। ঘর না হয় আর একখানা সে চাইলেই পাবে। কিন্তু সে ঘর কি আর তার স্থায়ী ঘর হবে? নিজের ঘর হবে? বাবা-মা কি আর তা হতে দেবেন? মন্দিরাই কি আর তা নিতে পারবে? জীবন যেন নদীর স্রোতের মত। নদী মাঝে মাঝে উজান বয়, কিন্তু উৎসে আর ফিরে যায় না। মজে যায়, শুকিয়ে যায়, কিন্তু উৎসে আর ফিরে যায় না।

মিহির তাকে সেই কলিয়ারীর কোয়ার্টারে নিয়ে যাচ্ছে শুনে বাবা মা খুশী হয়েছেন। তাঁদের মনোভাব মন্দিরা আন্দাজ করতে পারে। মেয়ে-জামাই দুজনে এক জায়গায় একসঙ্গে যদি ঘর-সংসার করতে পারে, যেটুকু গরমিল তাদের মধ্যে আছে, তা আর থাকবে না।

বাবা বললেন, 'মিহির খুব বিবেচক ছেলে, বুদ্ধিমান ছেলে। ওকে আমি দেখেই চিনতে পেরেছি।'

মন্দিরা এ কথার কোন প্রতিবাদ করেনি। সত্যি, স্বামীর বিরুদ্ধে বলবার তো তার কিছু নেইও।

ছন্দা নন্দারও খুব উৎসাহ।

'দিদি, আমাদের সেখানে নিয়ে যাবি তো?'

'কলিয়ারী কখনো দেখিনি। এবার দেখতে পাব।'

নন্দা বলল, 'ভাগ্যে জামাইবাবু মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার হয়েছেন।'

ছন্দা বলল, 'আর তোর মত শালী পেয়েছেন। এও কি কম ভাগ্যের কথা?'

নন্দা চটে উঠে বলল, 'কেবল আমাকেই শালী শালী করছিস কেন? তুই বুঝি শালী নয়? বিশালী?'

মন্দিরা এঘরে যায়, ওঘরে যায়, এখানে দাঁড়ায়, ওখানে দাঁড়ায়। যেন অন্য কোন রাজ্যে এসেছে। যে রাজ্য একদিন তার ছিল, এখন আর নেই। যে রাজ্যে সে আর-জন্মে বাস করে গেছে, এ জন্মে আর করে না।

ঠাকুরমার মুখে শুনেছে, তাঁদের আমলে বরের বাড়িকে বলা হতো পরের বাড়ি। আসলে বিয়ের পর বাপের বাড়িই যে পরের বাড়ি হয়ে যায়, এবার এসে বুঝতে পারছে মন্দিরা।

সেদিন ঘুরে ঘুরে এসে ফোনটার সামনে দাঁড়াল। এখন আর কোন বাধা-

নিষেধ নেই ফোনে। সেই ছোট তালাটি অন্তর্হিত। কেউ আর অবৈধ ফোন করবে না, বাবার মনে এখন এ বিশ্বাস এসে গেছে।

তবু আশ্চর্য, সেই ফোনের কাছে দাঁড়িয়ে মন্দিরার হাত কাঁপতে লাগল, বুক কাঁপতে লাগল। লোভে যেন সারা পৃথিবীটা কাঁপছে।

কিন্তু কেন? কি হবে আর ফোন করে? ধারে কাছে কেউ অবশ্য নেই। বাবা ডিসপেনসারিতে বেরিয়ে গেছেন। ছন্দা নন্দা পড়া নিয়ে ব্যস্ত। মা রান্নাঘরে। ফোন যদি করে কেউ শুনতে পাবে না। গোপনে গোপনে মন্দিরাই শুধু একবার সেই গলার স্বরটি শুনবে। হয়তো শেষবারের মত শুনবে। সে তো কলকাতা ছেড়ে চলেই যাচ্ছে। বলা যায় না আর নাও ফিরতে পারে। কয়লার খনিতে কত রকম কত অ্যাকসিডেন্ট-ট্যাকসিডেন্ট হয়। ধরা যাক মন্দিরা পিটের ভিতরে নেমেছে, হঠাৎ খনির ছাদ ধ্বসে পড়ে তাকে চিরজীবনের মত বাঁচিয়ে দিল এমনও তো হতে পারে। তার আগে শেষবারের মত শুধু একটি চেনা গলার স্বর শুনে যাওয়া। দেখা নয়, শুধু শোনা। কিছু বলা নয়, শুধু শোনা। ধরা না দিয়ে নিজের পরিচয় না দিয়ে আড়াল থেকে শুধু একটিবার গলার সেই স্বরটুকুতে দুটি কান ভরে নেওয়া। কী দোষ এতে? কেউ জানবেও না, কেউ শুনবেও না। কেউ বুঝতেও পারবে না, কেউ ধরতেও পারবে না।

তবু প্রথমবারই মন্দিরা শশাঙ্কের নাম্বারটা ডায়াল করল না। ছোট কাকা নিরঞ্জন চ্যাটার্জিকে ফোন করল। তাঁর নাম্বারটা এনগেজড দেখে খুশী হল মন্দিরা। এবার বিবেকে কাছে সে পরিষ্কার। এবার আর একটি ফোন করতে আর দোষ নেই।

কিন্তু মন্দিরা কি জানত সে একটি কথাও বলতে পারবে না? ভয়ে কি উত্তেজনায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসবে? সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ফোন ছেড়ে দিতে হবে?

কিন্তু ছেড়ে দিলেও যেটুকু শুনবার সেটুকু সে শুনে নিয়েছে. যেটুকু বুঝবার সেটুকু তার বুঝতে আর বাকি নেই।

আছে আছে। এখনো সব শেষ হয়ে যায়নি।

সারাদিন সারা রাত কেমন যেন এক আচ্ছন্নতার মধ্যে কাটল।

পরদিন ছন্দা এক অপূর্ব খবর নিয়ে এল, 'দিদি, আজ ইয়ুথ ফেসটিভ্যালে শশাঙ্কবাবুর বক্তৃতা আছে। কাগজে নোটিশ বেরিয়েছে। যাবি শুনতে?'

প্রস্তাবটা এতই অবিশ্বাস্য যে মন্দিরা প্রথমে কোন জবাব দিতে পারল না। তারপর বলল, 'যাঃ।'

ছন্দা বলল, 'যাঃ কেন। চল না। আমি বাবার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে নেব।'

সভায় যেতে তো খুবই ইচ্ছা করে মন্দিরার। গেলে দূর থেকে একবার

দেখে আসতে পারবে আর তাঁর ভাষণও শুনে আসতে পারবে। লুকিয়ে লুকিয়ে টেলিফোনে দু-তিন মিনিট শুধু কথা শোনা নয়, আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা তিনি যতক্ষণ বলেন ততক্ষণ তাঁর কণ্ঠস্বরে কান পেতে থাকা। হয়তো তাঁর একটি কথাও মন্দিরার জন্যে নয়, তাকে উদ্দেশ করেও তিনি কিছু বলবেন না কিন্তু কথাগুলি তো তাঁরই থাকবে। গলার স্বর তো আর অন্য কারো হবে না। দূর থেকে কারো কথা শুনলে তো আর জাত যায় না, কি দূর থেকে কাউকে দেখলেও ধর্ম নষ্ট হয় না। জাত যায় শুধু ছুঁলে।

কাগজটা টেনে নিয়ে সভা-সমিতির নোটিশটা নিজের চোখে একবার দেখল মন্দিরা। সভায় আরো কয়েকজন বক্তা আছেন। সবাই নাম-করা লোক। অধ্যাপক, লেখক। কিন্তু মন্দিরার কাছে শুধু একটি মাত্র নাম ছাড়া এই মুহূর্তে কোন নামেরই কোন অর্থগৌরব নেই। সেই নামাবলী শুধু জায়গা ভরে রেখেছে। মন্দিরার চিত্ত ভরতে পারে শুধু একটি নাম।

ছন্দা বাবার কাছে দরবার করতে গেল। গেলে কি হবে, বাবা মন্দিরাকে বাইরে বড় একটা যেতে দিতে চান না। বলেন, 'এখান থেকে যাওয়া-যাওয়ির দরকার নেই। যেতে হয় শ্বশুরবাড়ি থেকে যাবে।'

মা প্রতিবাদ করে বলেন, 'ও আবার কী কথা। জানো যে সে বাড়ি থেকেও ও কোন জায়গায় নড়তে পারে না। তারাও কোথাও ওকে নিয়ে যায় না, তুমিও কোথাও ওকে বেরোতে দাও না। ওর সাধ নেই আহ্লাদ নেই। ওকে কি তোমরা জাঁতাকলে চেপে মেরে ফেলতে চাও? ওর বয়সের একটা মেয়ে এভাবে বাক্সবন্দী হয়ে থাকতে পারে?'

মা তার হয়ে খুবই লড়াই করেন। শুধু মুখেই ঝগড়া করেন না, মন্দিরা বাপের বাড়ি এলে তিনি নিজে গরজ করে মেয়েদের নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যান, কেনাকাটা করতে বেরোন, দু-একবার সিনেমাতেও নিয়ে গেছেন। মা অমনিতে সিনেমা-টিনেমা দেখতে তত ভালোবাসেন না। একটু অবসর পেলে বইটই পড়ে সময় কাটানোই তাঁর অভ্যাস কিন্তু মন্দিরার কথা ভেবে তিনি এসবও শুরু করেছেন। মায়ের ওপর মমতায় মন ভরে ওঠে মন্দিরার।

বাবার যুক্তি অবশ্য অন্য রকম। তাঁর কথায় দূরদর্শীর সহিষ্ণুতা।

তিনি বলেন, 'অমন ছটফট করছ কেন, দুটো দিন যাক, দুটো দিন সবুর কর। সময়ে সবই হবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর দাপট আর কদিন থাকে। তাঁদের শেষ পর্যন্ত হটে আসতেই হয়। তোমার নিজের শাশুড়ীর কথা মনে নেই? অমন যে তেজস্বিনী ওজস্বিনী মহিলা তাঁকেও তো শেষে নাকের জলে চোখের জলে—।'

মা বিরক্ত হয়ে বলেন, 'থাক। তোমাকে আর সেই পুরোন কাসুন্দি ঘাঁটতে হবে না।'

খানিক বাদে ছন্দা হাসিমুখে ফিরে এল। এসে বলল, 'দিদি, কাজ হাঁসিল করে এনেছি। কী দিবি তাই বল।'

মন্দিরা বলল, 'বাঃ রে দেব আবার কী। বাবা কি মত দিয়েছেন?'

ছন্দা বলল, 'দিয়েছেন মানে অতিকষ্টে আদায় করেছি। তবে একটা ফ্যাঁকড়া আবার বেঁধে গেল।'

'ফ্যাঁকড়া আবার কিসের?'

'মামাবাবু ছিলেন ওখানে। বাবার সঙ্গে বসে বসে গল্প করছিলেন। বাবা বললেন, নিশিদা, আপনিই তাহলে ওদের নিয়ে যান। বক্তৃতার সাবজেক্টটা শুনে মামাবাবু খুব খুশী। উনি তো রাজনীতি-টাজনীতি সব ছেড়ে দিয়ে এখন ধর্মকর্ম নিয়েই আছেন।'

মন্দিরা বলল, 'মামাবাবু এসেছেন নাকি?'

ছন্দা বলল, 'সেই ভোরেই তো এসেছেন। বাবার সঙ্গে গল্প করছেন বসে বসে। এবার নাকি কন্যাকুমারী পর্যন্ত গিয়েছিলেন—সেই গল্প।'

মন্দিরার মন অপ্রসন্ন হল। বেশ তো যত খুশি তিনি বাবার সঙ্গে কন্যাকুমারী কি মীনাক্ষী মন্দিরের গল্প করুন। মন্দিরাদের সঙ্গে আবার আসতে চাইছেন কেন?

ছন্দা দিদির মনোভাব খানিকটা আন্দাজ করে বলল, 'তুই ভাবিসনে দিদি, আমি মামাবাবুকে ভুলিয়ে-টুলিয়ে রাখব। আর তুই সেই ফাঁকে—'

মন্দিরার রাগও হল আবার হাসিও পেল। বোনকে ধমক দিয়ে বলল, 'পাজী। ডেঁপো মেয়ে কোথাকার। সেই ফাঁকে আবার কী রে! আমি কি কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি? আমি যাচ্ছি বক্তৃতা শুনতে। কত গুণী জ্ঞানীরা আসবেন। তাছাড়া আমাদের কলেজও এই ফেস্টিভ্যালে যোগ দিচ্ছে। মীনাক্ষী নিশ্চয়ই আসবে। তার সঙ্গে কতকাল পরে দেখা হবে, আমি সেই জন্যে যাচ্ছি।'

ছন্দা গম্ভীর হবার ভান করে বলল, 'তাই তো! এসব ছাড়া তোর কি আর কোন উদ্দেশ্য আছে? সত্যিই তো।'

মন্দিরা ফের ওকে সহাস্যে ধমক দিল, 'যাঃ পালা এখান থেকে। ফাজিল কোথাকার।'

নিজের এই গোপন প্রণয়ের ব্যাপারে ছন্দাকে সে টানতে চায়নি। বিয়ের আগে মাঝে মাঝে দু-একখানা চিঠিপত্র ওর হাত দিয়ে পোস্ট করেছে। আর কোন সাহায্য চায়নি, আর কোন কথা ওকে জানতেও দেয়নি।

তবু মন্দিরা বুঝতে পারে ছন্দা সবই জেনেছে। ভারি চালাক মেয়ে। মন্দিরার চেয়েও চালাক। ও যদি কোনদিন এসব সমস্যায় পড়ে ঠিক পথ কেটে বেরিয়ে যাবে। মন্দিরার মত ভয় পাবে না, জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে মরবে না। কোন দুঃখকষ্টের ধার ধারবে না ও।

মীনাক্ষী যেমন মন্দিরাকে বারবার বাধা দিয়েছে, শশাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখবার পরামর্শ দিয়েছে, ছন্দা কিন্তু কোনদিন তা করেনি। ও সব সময় দিদির সাহায্য করেছে। ঠাট্টা-তামাশা করেছে আবার সুযোগ করে দিতেও দ্বিধা করেনি। এই দূতী হওয়ার মধ্যেই যেন ওর আনন্দ। দিদির সঙ্গে শশাঙ্কদাকে মিলিয়ে দিতে পারলেই ও খুশি। ন্যায় অন্যায় বৈধ অবৈধের কথা ও ভাবে না। যাতে মজা পাওয়া যায় ও তাতেই মজে। কিন্তু একি শুধু মজা পাওয়ারই ব্যাপার? ভিতরে ভিতরে ছন্দা নিজেও কি শশাঙ্কদাকে পছন্দ করে না? বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠিও ছন্দাই যে সেবার তাঁকে পাঠিয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত ওর কাছ থেকে বের করেছে মন্দিরা। শুধু কৌতূহলের জন্যেই ও কাজটা করেনি। ও চেয়েছিল মন্দিরার সঙ্গে তাঁর দেখা হোক, সেই সঙ্গে ছন্দাও দেখুক।

ওঁকে ভারি পছন্দ করে ছন্দা। আর একদিন বলেছিল, 'দিদি, তুই বড় বোকা। কেন আর একজনকে বিয়ে করতে গেলি? তার চেয়ে কেন পালিয়ে গেলি নে? যাকে ভালোবাসিস তাকেই বিয়ে করলিনে কেন?'

মন্দিরা বোনকে ধমক দিয়ে প্রসঙ্গটা পালটে নিয়েছিল। সংসার সম্বন্ধে এখনো তো কোন কান্ডজ্ঞান হয়নি ছন্দার। ও এখনো ছেলেমানুষ। তাই জানে না, যে যাকে ভালোবাসে সব সময়েই সে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না। সংসারের পথটা অত সোজা নয়।

একটু বাদে নিশিবাবু এসে দাঁড়ালেন মন্দিরাদের দোতলার ঘরে।

ষাট বছরের বৃদ্ধ। গায়ের রঙ কালো, মাথার রঙ শাদা। দেখতে ছোটখাটো মানুষটি। রোদে জলে মজবুত চেহারা।

নিশিবাবু মন্দিরার দিকে চেয়ে হাসলেন, 'এই যে টুকুঠাকরুণ, শাঁখায় সিঁদুরে একেবারে যে লক্ষ্মী ঠাকরুণ হয়ে রয়েছ, ব্যাপার কি?'

খাট থেকে নেমে মন্দিরা ওঁকে প্রণাম করল। নিশিবাবু জাতে কায়স্থ। তবু পা ছুঁয়েই ওঁকে প্রণাম করে ওরা।

নিশিবাবু বললেন, 'থাক থাক, চিরায়ুষ্মতী হও। পাকা চুলে সিঁদুর পর। বেশ বেশ। আমি তাই যোগরঞ্জনকে বলছিলাম, যেই একটু ঘোরাঘুরি করতে বেরিয়েছি অমনি পট করে মেয়ের বিয়েটি দিয়ে দিলে। মাঝখান থেকে আমার খাওয়াটাই বাদ পড়ল।'

মন্দিরার মা ইন্দ্রাণী পিছন থেকে বললেন, 'আহা আপনি যেন কত খান।'

নিশিবাবু বললেন, 'পাওনা খাওয়াটা এবার তোর শ্বশুরবাড়ি গিয়েই খাব, কী বলিস টুকু?'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'মেয়ে তো শ্বশুরবাড়িতেও বেশি দিন আর থাকবে না। সামনের বুধবার জামাই ওকে তার কলিয়ারীতে নিয়ে যাচ্ছে।'

'বেশ বেশ। তাহলে সেখানেই যাব। দোকানের মিষ্টি এনে ভদ্রতা রক্ষা করবি? নাকি রান্নাবান্না করে খাওয়াবি? রাঁধতে শিখেছিস তো?'

মন্দিরা বলল, 'খেয়েই দেখবেন।'

নিশিবাবু বললেন, 'ঠিক বলেছিস। বৃক্ষ তোমার নাম কি। ফলেন পরিচীয়তে। হাত কেমন রাঁধে জিভ তা যাচাই করে। আমিও রাঁধতে নিতান্ত মন্দ পারিনে। প্রথম প্রথম হাত পুড়ত। আজকাল আর পোড়ে না। অবশ্য এখন আর রেঁধে খেতে হয় না, কোথাও না কোথাও জুটে যায়।'

তারপর মন্দিরার মা'র দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'আজ তোমার এখানে বোধহয় দুটি জুটে গেল। যোগরঞ্জন কিছুতেই ছাড়ল না। আজকের দুপুরের অন্ন যে এখানে মাপা আছে ভোরে উঠে বুঝতেই পারিনি।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'আমি বললে তো আপনি খান না। ভগ্নীপতি বললে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান।'

নিশিবাবু বললেন, 'ভগ্নীপতিটি আবার অন্য কথা বলেন। তাঁর ধারণা এ বাড়িতে আমি ভগ্নীকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না।'

ইন্দ্রাণী হেসে বললেন, 'আসলে আপনার পক্ষপাত ভাগ্নীদের ওপর।'

নিশিবাবু বললেন, 'যা বলেছ। এক ভদ্রলোক সেদিন বলেছিলেন, নিশিবাবু, আপনার কি কলকাতা শহর ভরেই ভাগ্নী? আমি বললাম, শুধু কি কলকাতা? সারা বাংলা দেশে তারা ছড়িয়ে আছে। আগে ছিল বোনেরা। এখন ভাগ্নীরাই বোধহয় দলে ভারি। অথচ প্রথম প্রথম যখন মামা ডাকটা কানে আসত, ইন্দ্রাণী, খুব শ্রুতিসুখকর মনে হতো না।'

ইন্দ্রাণী হেসে বললেন, 'তাই নাকি?'

নিশিবাবু বললেন, 'ছেলেবেলা থেকে দলে ঢুকে মাথা মুড়িয়েছিলাম। প্রথম প্রথম ছিলাম ছোট ভাই। দাদারা ছিলেন মাথার ওপর। তারপর নিজেও একদিন দাদা হলাম। দিবানিশি নিশি দাদা নিশি দাদা। তারপর যথা নিয়মে মামা ডাক শুরু হয়ে গেল। বোনদের ছেলেমেয়েরা মামা তো বলবেই। উপায় কি। ভগ্নীপতিদের শালাবাবু যখন হয়েছি ভাগ্নীদের মামাবাবু হতেই হবে।'

নিশিবাবু হাসতে লাগলেন।

উদ্দেশ্যের যত অন্তরায়ই হোন এমন মানুষকে কি বলা যায়, 'আপনি সঙ্গে যাবেন না।' মন্দিরা তা বলতে পারে না। বরং ওঁর সঙ্গ নিতেই ইচ্ছা করে মন্দিরার। ওঁকে দেখলে ওঁর কাছে বসে থাকলে যেন মনের বাসনা-কামনার জ্বালা কিছুক্ষণের জন্যে শান্ত হয়ে যায়। সংসারের সুখ দুঃখের কথা মনে থাকে না। গৃহীদের ঘরে ঘরে এই জন্যেই এই আধাসন্ন্যাসীর আদর। বিয়ে-থা করেননি। নিকটের কি দূরের কোন আত্মীয়তার বন্ধন নেই। মানুষের খুব যে তেমন কাজে লাগেন তাও না। তবু খানিকক্ষণের

জন্যে অপ্রয়োজনের আনন্দ তিনি দিতে পারেন। সান্নিধ্যের উত্তাপে সব গলিয়ে দিতে পারেন, ভুলিয়ে দিতে পারেন।

বাবা বলেন, 'এ ধরনের মানুষ আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এখনকার সমাজ এ'দের বলবে পরগাছা। কিন্তু আমাদের সব বন্ধনই যে একদিন খসে পড়বে এ'রা সেই কথা মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেন।'

মন্দিরা অত তত্ত্বকথা বোঝে না, কিন্তু মানুষটিকে বড় শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে।

এক সময় তার এ কথাও মনে হল, দরকার নেই আলোচনাসভায় গিয়ে। তার চেয়ে মামাবাবুর সঙ্গে বসে বসে গল্প করবে, ওঁর দেশ ভ্রমণের গল্প শুনবে। নীরস নীতিগর্ভ বক্তৃতার চেয়ে সে গল্প ভালোই লাগবে শুনতে।

কিন্তু বেলা চারটে না বাজতেই মন্দিরার মন বেরোবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। গা ধুয়ে নিল, চুল বাঁধল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাজলে কুঙ্কুমে প্রসাধন করল।

ছন্দা ফিস ফিস করে বলল, 'কী দিদি, যাচ্ছিস তো ধর্মসভায়। সাজ-সজ্জার এত ঘটা কিসের রে?'

মন্দিরা বলল, 'যাঃ ফাজিল কোথাকার। সাজ আবার তুই কোথায় দেখলি। তুই আমার যা দেখিস তাতেই তোর চোখ টাটায়।'

ছন্দা বলল, 'বটে! তুই এমনি বাঘিনী? উপকারীকেও খেতে চাইছিস?'

মন্দিরা বোনকে কাছে ডেকে একটু আদর করে হেসে বলল, 'তোর সঙ্গে কথায় পারব না, একজন পারলেও পারতে পারেন।'

যোগরঞ্জন নার্সিংহোমের প্ল্যান করিয়েছেন। কিন্তু প্ল্যানে কোথায় একটু গোলমাল আছে। তাই একডালিয়া রোডে যাবেন ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুর বাড়ি। গাড়িটা মেয়েদের জন্যে তিনি দিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু নিশিবাবু বললেন, 'দরকার নেই, তোমার গাড়ি তুমি নিয়ে যাও। ওরা বড়লোকের মেয়ে কিন্তু ফকিরের ভাগ্নী। আমার সঙ্গে ওরা বাসে-ট্রামে, দরকার হলে পায়ে হেঁটেও যেতে পারে। কি-রে পারিস নে?'

নন্দাও সঙ্গে যাবে বলে বায়না ধরেছিল, কিন্তু ইন্দ্রাণী তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরস্ত করলেন, 'এসব তর্কাতর্কির ব্যাপারে তুই কোন রস পাবিনে। তোকে আমি শিগগিরই সার্কাস দেখিয়ে আনব।'

নন্দা বলল, 'যারা মিটিং-এ যাচ্ছে তারা কিন্তু সার্কাস দেখতে পারবে না মা।'

নিশিবাবু আর ইন্দ্রাণী সমস্বরে বললেন, 'নিশ্চয়ই না।'

খানিকটা পথ এগিয়ে নিশিবাবু বললেন, 'পাকা মাথা নিয়ে আমি তোদের যুবসভায় যাচ্ছি। আমাকে ওরা ঢুকতে দেবে তো রে মন্দিরা?'

মন্দিরা বলল, 'আপনি কি সত্যিই বুড়ো হয়েছেন নাকি মামাবাবু? চুল

পাকলেই বুঝি মানুষ বুড়ো হয়?'

নিশিবাবু হেসে বললেন, 'তা ঠিক। বুড়ো হওয়া সোজা কথা নয়। শুধু চুল পাকলে আর দাঁত পড়লেই হয় না। বুড়ো হতে পারা ভারি কঠিন।'

কিন্তু বাঞ্ছিত মিলনে বহু বিঘ্ন। বণ্ডেল গেটে এসে বাসের জন্যে অনেক দেরি হয়ে গেল। রুটে কি গোলমাল হয়েছে, বাসও নেই, ট্যাক্সিও নেই।

মন্দিরা অধীর হয়ে বলল, 'চলুন ফিরে যাই মামাবাবু। বেরোতে বেরোতে এমনিই আমাদের দেরি হয়ে গেছে। এখনো কতক্ষণ পথে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তার ঠিক নেই। মিটিং শেষ হয়ে গেলে গিয়ে আর লাভ কি হবে।'

নিশিবাবু তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আরে পাগলী শেষ হবে না। শেষ হতে এখনো ঢের বাকি। বাঙালীর সময়। যখন আরম্ভ হবে বলেছে ধরে রাখতে পারিস তার দেড় ঘণ্টা বাদে শুরু হবে।'

ছন্দা বলল, 'রিক্‌শা নিলে কেমন হয় মামাবাবু?'

হিসেবী নিশিবাবু বললেন, 'দুটো রিক্‌শা নিতে হবে তাতে অনেক খরচা, তাছাড়া সময়ও ঢের বেশি লাগবে। তার চেয়ে একটু সবুর কর। বাস এসে যাবে। তোরা দেখি পলকে প্রলয় গণছিস, ব্যাপারটা কি।'

শেষ পর্যন্ত বাস এল। শিয়ালদা নেমে মন্দিরার ব্যস্ততায় ট্যাক্সিই নিলেন নিশিবাবু।

ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের সামনে এসে ট্যাক্সি দাঁড়ালো।

গেটে লাল রঙের কাপড়ের টুকরোয় অলংকৃত অক্ষরে লেখা—উত্তর কলকাতা যুব উৎসব।

সামনে কয়েকটি ছেলে দাঁড়ানো। নিশিবাবু বললেন, 'সভা কি আপনাদের শেষ হয়ে গেল নাকি!'

একটি ছেলে বলল, 'না, শেষ হয়নি। তবে শেষের মুখে। সভাপতির ভাষণ শুধু বাকি।'

মন্দিরা বলল, 'বলিনি আপনাকে?'

নিশিবাবু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'দধির অগ্র ঘোলের শেষ। সভার শেষ-টুকুই তো ভালো রে টুকু।'

ছন্দা জিজ্ঞাসা করল, 'শশাঙ্কবাবুর বক্তৃতা কি হয়ে গেছে?'

আর একটি ছেলে বলল, 'তিনিই তো আজ সভাপতি।'

মন্দিরা আশ্বস্ত হল খুশিও হল। পা বাড়াল ভিতরের দিকে। আর দেরি করে লাভ কি।

নিশিবাবু বললেন, 'ডক্টর শ্রীপতি মুখার্জী সভাপতিত্ব করবেন কথা ছিল না?'

ছেলেটি অভিযোগের সুরে বলল, 'কী করব বলুন। কথা যাঁরা দেন তাঁরা তো আর রাখবার জন্যে দেন না। অনেকেই দূর থেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

কেউ কেউ অসুস্থতার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। শশাঙ্কবাবুরও আসবার ইচ্ছে ছিল না। নানা ওজর আপত্তি, আমরা প্রায় ধরে বেঁধে এনে বসিয়ে দিয়েছি।'

মন্দিরা হলের ভিতরে ঢুকে পিছনের দিকে একটি সারিতে আসন নেবার আগেই মাইকে উদাত্ত মধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল :

'Youth is still lightly moved
to weeping and to laughter
Still honours soaring thought,
and still delights in dreams.'

হল-ভরতি তরুণ-তরুণীদের দল। ডায়াসের ওপরে যাঁরা আছেন তাঁদের বেশির ভাগই উত্তীর্ণ-যৌবন। দূর থেকে তাঁদের কাউকে তেমন করে চিনতে পারল না মন্দিরা। কিন্তু যাঁকে দেখবার জন্যে এসেছিল তাঁকে ঠিকই চিনে নিল। মাইকের সামনে তিনি দাঁড়িয়েছেন। সেই দীর্ঘ উন্নত চেহারা। সুঠাম সুদর্শন গৌরকান্তি পুরুষ। গায়ে ঘি-রঙের সার্জের পাঞ্জাবি, কাঁধে সাদা শাল। কত কাল বাদে মন্দিরা তাঁকে আজ দেখল। পরম সুন্দর পরম মনোহর বেশে দেখে মন্দিরা ভুলে গেল সে আজ শুনতে এসেছে। ভুলে গেল তার দুটি চোখ ছাড়া আরো ইন্দ্রিয় আছে। সভাপতি বলে চললেন—

'হাসি কান্নায় সহজে আন্দোলিত এই যে যৌবন, সমুচ্চ চিন্তায় সশ্রদ্ধ দিব্য স্বপ্নে বিভোর এই যে যৌবন, এর জন্যে আমরা কে না গর্বিত হই? বিগতযৌবন হয়ে আমরা কে না আক্ষেপ করি, কে না সতৃষ্ণভাবে হাত বাড়াই,

'oh, give me back my youth again'

কিন্তু দ্বিতীয়বার একে ফিরে পাবার উপায় নেই। কেউ ফিরিয়ে দিলেও নেওয়া যায় না, সওয়া যায় না, বহন করা যায় না, রাজা যযাতি সে কথা বুঝেছিলেন। এই দ্বিতীয় যৌবন আমরা পাই আমাদের উত্তরপুরুষের মধ্যে, আমাদের পুত্রদের মধ্যে, পুত্রতুল্য ছাত্রদের মধ্যে। তোমরা আমাদের সেই দ্বিতীয় যৌবন। কিন্তু তোমরা নিজেরা অদ্বিতীয়। আমরা একটু দূর থেকে তোমাদের বিদ্রোহ দেখি, ঔদ্ধত্য দেখি, অসহিষ্ণুতা, অবিনয়, অস্থিরতা, অধীরতা সবই লক্ষ্য করি। সব সময় যে অবিচল ভাবে দেখি তা নয়, বিচলিত হই, বিক্ষুব্ধও হই। বিক্ষুব্ধ হই যখন তোমরা আত্মদ্রোহকে বিদ্রোহ বলে ভুল করো, যখন তোমরা উৎকেন্দ্রিকতাকে উচ্ছৃঙ্খলতাকে যৌবনের একমাত্র প্রকাশ বলে মনে করো। যখন তোমরা ভুলে যাও,

A heart in growth with gratitude still teems.

যৌবন শুধু শৌর্যে বৃহৎ নয়, ঔদার্যেও মহৎ। অন্যায় অবিচারকে তীব্র ঘৃণা করবার শক্তি যেমন যৌবনের প্রবল, প্রেমের শক্তিও তারই। প্রশস্ত বক্ষপট যুবকেরই আছে, প্রৌঢ়ের নেই, বৃদ্ধেরও নেই। শ্রদ্ধা সৌজন্য বিনয় শব্দগুলি

পুরোন, কিন্তু অর্থ নিত্যনবীন। অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা অকৃতজ্ঞতা আমাদের কিছুই দেয় না, কিছু নিতেও ভুলিয়ে দেয়।

'তোমরা বলতে পারো আমরা শ্রদ্ধা করব কাকে? আমাদের গুরুজনদের মধ্যে কাকে আমরা সেই গৌরবের আসনে বসাতে পারি? কোথায় সেই মহীরুহ বনস্পতি। শিল্পে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে, শিক্ষা সংস্কৃতির স্তরে স্তরে জীবনচর্যায় কায়মনোবাক্যে অভিন্ন কোথায় সেই আদর্শ পুরুষসিংহ যাকে আমরা শ্রদ্ধার সমুচ্চ সিংহাসনে বসাতে পারি? হয়তো তিনি নেই। কিন্তু একান্ত অভাবের মধ্যেও তাঁর ভাব-রূপ আছে। অপূর্ণতার বেদনাবোধ আছে। সেই বোধই তো আদর্শ। তার মধ্যেই পূর্ণতার অবস্থান। গুরুজনদের স্খলন পতন ত্রুটি কীর্তনে তোমাদের সমস্ত সামর্থ্য যদি নষ্ট হয়ে যায়, সে বড় দুঃখের কারণ হবে। সেই অপচয়ে কারোরই কোন লাভ হবে না। তাছাড়া গুরুজনদের শোধরাবার উপায় তাঁদের ঘাড় ধরে নামিয়ে দেওয়া নয়, হাত ধরে তুলে নেওয়া। তোমাদের সততা ধীরতা ঔদার্য দিয়ে তাঁদের লজ্জিত করা। যিনি প্রণম্য নন, তাঁকেও প্রণাম করে অনেক সময় তুলে দেওয়া যায়। তাঁদের শুভবুদ্ধি কর্মশক্তিকে জাগ্রত করা যায়। ধিক্কারে অপমানে লাঞ্ছনা গঞ্জনায় তাঁদের নামিয়ে আনা অনেক সহজ কাজ কিন্তু মহৎ কাজ নয়। বাপকে তোমরা যদি অযোগ্য বলে মনে করো, তোমাদের সামনে পিতামহ প্রপিতামহের আদর্শ আছে। সেই ইতিহাস তো নিষিদ্ধ বই নয়। দেশে তোমরা যদি আদর্শ খুঁজে না পাও অন্য দেশ আছে, এই যুগে তোমরা যদি আদর্শ খুঁজে না পাও অন্য যুগ আছে। কিন্তু তোমরা সব বাদ দিয়ে যুগান্তর সৃষ্টি করতে পারবে না। তোমরা বাবার বাবা হলে আমরা খুশিই হব। কিন্তু পিতৃহৃদয়টুকু যেন থাকে।'

বক্তা একটু থামলেন। তাঁকে ক্লান্ত মনে করে একটি ছেলে জলভরতি কাঁচের গ্লাস তাঁর সামনে এগিয়ে দিল। তিনি হেসে তা ফিরিয়ে দিয়ে ফের বলতে লাগলেন, 'এবার নীতির কথা। নীতি যেখানে কুসংস্কার, প্রচলিত অর্থহীন দেশাচার লোকাচার যেখানে শুধু দীর্ঘায়ুতার জোরে নীতি আর ধর্মের আসন দখল করে সেখানে নীতি নিশ্চয়ই দুর্নীতি। অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, অর্থহীন বিধি-নিষেধে নারীনিগ্রহ, নারী-পুরুষের সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ককে নানা রকম যুক্তিহীন লোকাচারের কবলে রাখাকেও তো আমরা এক সময়ে নীতিধর্ম বলে জেনে এসেছি। আমি সে নীতির কথা বলছি নে। সে নীতি নিশ্চয়ই আমাদের উন্নীত করে না। অবনতির শেষ ধাপে তা আমাদের নামিয়ে নেয়। কিন্তু এ ছাড়াও অন্য ধরনের নীতি আছে, যা রাজনীতি না হয়েও নীতির রাজা; তার গুরুত্ব মাহাত্ম্য, প্রয়োজনীয়তা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? সেই মূলনীতি আমাদের সমাজবন্ধনে বেঁধে রেখেছে। সততা, সহৃদয়তা, অশাঠ্য, অহিংসাকে আমরা যে মূল্য দিই, সে মূল্য মানব-মূল্য। তা

শেয়ার মার্কেটের মত এ-বেলা ও-বেলা ওঠা-নামা করে না। এই নীতি এক অর্থে সম্প্রদায়গত আনুষ্ঠানিক ধর্মের বহির্ভূত। আবার অন্য দিক থেকে সমস্ত ধর্মের অন্তর্নিহিত মূলভিত্তি। ধর্ম প্রচার না করে, ধর্মশিক্ষাকে শুধু প্রার্থনা-সঙ্গীতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষার নানা স্তরে এই উদার নীতিবোধে কী করে ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করা যায়, দেশের চিন্তাশীল শিক্ষাব্রতীদের তা ভেবে দেখতে হবে। শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্যই যে একমাত্র মূল্য নয়, তা বারবার বলা দরকার।

'আরো একদিক থেকে আমার কাছে নীতি আর শৃঙ্খলার নিগূঢ় আবেদন আছে। তা আমাদের রূপবোধকে তৃপ্ত করে। নৈতিক শৃঙ্খলার মধ্যে একটি সুষম ফর্ম আছে, যা উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে নেই। আমাদের রূপসৃষ্টি রূপ-সম্ভোগ কোন না কোন ফর্ম মেনে চলে। সেই ফর্ম নিশ্চয়ই রিজিড নয়। বারবার তার রূপান্তর হয়। তার রূপের অন্ত নেই। তবু আমরা তাকে রূপ বলে চিনতে পারি, রূপহীনতা থেকে তাকে আলাদা করে দেখি। একে রক্ষণশীলতা মনে করা ভুল। সৃষ্টির মধ্যে যে সংরক্ষণবৃত্তি অন্তর্নিহিত, আমাদের রূপানুভূতি সৌন্দর্যবোধ সেই নীতি আর নিয়মের হাতে হাত না রেখে চলতে পারে না।'

প্রচুর হাততালির মধ্যে বক্তা থামলেন। শশাঙ্কর ভাষণের শেষ অংশ মন্দিরার কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য মনে হল। কিন্তু এই দুরূহতা তার মুগ্ধতার পথে কোন অন্তরায় হল না। উনি কী বলেন তা তো সে শুনতে আসেনি, কেমন করে বলেন তাই দেখতে এসেছে। কিন্তু শুনেছেও। নিশিবাবু পাশে বসে বললেন, 'বেশ তো বলেছেন ভদ্রলোক। নতুন কিছুই বলেননি কিন্তু বলবার ভঙ্গিটি নতুন, ধরনটি মনোরম। চল যাই আলাপ করে আসি।'

ছন্দা মৃদু হেসে মন্দিরার চোখের দিকে তাকাল।

মন্দিরা বলল, 'আলাপ করে আর কী হবে মামাবাবু, চলুন ফিরে যাই।'

শশাঙ্ক কোন দিকে না তাকিয়ে ছাত্রদের জলযোগের আমন্ত্রণ সস্নেহ সৌজন্যে ফিরিয়ে দিয়ে অন্য অতিথিদের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছিল, নিশিবাবু দোরের কাছে তাকে থামালেন। একটু হেসে বললেন, 'নমস্কার। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে এলাম। আমার নাম নিশিকান্ত গুহ। আপনার বক্তৃতাটি বড় ভালো লাগল। যদিও বলবার কথা আছে। কিন্তু সে কথা যাক। সে আর একদিন হবে।'

শশাঙ্ক মৃদু হেসে বলল, 'বেশ তো।'

নিশিবাবু বললেন, 'আমার মনে হয় বক্তার কাছে শ্রোতারও কিছু ঋণ আছে। সেটুকু স্বীকার না করে গেলে অন্যায় হয়। পরিচয় করিয়ে দিই। এরা আমার ভাগ্নী।'

শশাঙ্ক এক পলক মন্দিরাদের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। এক

পলক। তারপর নিশিবাবুর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, 'ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।'

নিশিবাবু মন্দিরাকে বললেন, 'আছে নাকি? কই, তোরা তো বলিসনি আমাকে। আমার কাছে সব গোপন?'

শশাঙ্ক বিদায়-নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আচ্ছা আজ চলি নিশিবাবু। আর একদিন আপনার সঙ্গে আলাপ হবে।'

নিশিবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমিই যাব আপনার কাছে।'

শশাঙ্ক বলল, 'খুব খুশি হব।'

মন্দিরা লক্ষ্য করল, শশাঙ্ক রাস্তায় নামতেই কালোমত আঁটোসাঁটো শক্ত মজবুত চেহারার এক ভদ্রলোক, 'আরে এসো এসো' বলে তাঁকে প্রায় জোর করে গাড়িতে তুলে নিলেন। আর মুহূর্তের মধ্যে সে গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিশিবাবু বললেন, 'চল আমরাও এগোই।'

শশাঙ্কের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তার অনিচ্ছার চেয়ে মুরারিমোহনের ইচ্ছার জোর বেশি। তিনি জোর করে তাকে পাশে বসিয়ে নিজেই ড্রাইভ করতে লাগলেন।

শশাঙ্ক বলল, 'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?'

মুরারিবাবু হেসে বললেন, 'যমের দক্ষিণ দুয়ারে। সেই গেট দিয়ে আমরা নির্বিবাদে বেরিয়ে যাব।'

শশাঙ্ক বলল, 'তুমি এখানে এলে কী করে মুরারিদা?'

'এলাম কী করে মানে? আমার নিজের হাত আছে, রথও একখানা আছে, সেকেণ্ডহ্যাণ্ডই হোক আর যাই হোক। সেই সম্বলে ভাবলাম, আচার্য শশাঙ্কের বক্তৃতাটা শুনেই আসি।'

কলুটোলা দিয়ে সেণ্ট্রাল এভিনিয়ুতে পড়লেন মুরারিবাবু। রাস্তার দিকে চোখ রেখে হেসে বললেন, 'কী স্পীচই একখানা দিলে। গ্রেট স্পীচ। আমি শুনেছি আর একা-একা হেসে মরেছি।'

শশাঙ্ক ক্ষুন্ন হয়ে বলল, 'তুমি ভিতরে ঢুকেছিলে নাকি?'

'আরে, না-না। গাড়িতে বসে বসেই হেসেছি। ভিতরে ঢুকলে হাসবার সঙ্গী পাওয়া যেত, ভাগ্য ভালো হলে সঙ্গিনী। শশাঙ্ক, ওই লম্বামত সুন্দর-পনা মেয়েটি কে হে? তোমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল।'

শশাঙ্ক বলল, 'কেমন করে জানব? আমার দিকে অমন অনেকেই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।'

মুরারিমোহন হেসে বললেন, 'ওরে বাবা! কী গর্ব। দেখ, পুরুষমানুষ যখন তার রূপের গর্ব করে, আমার কাছে সেটা কেমন যেন মেয়েমানুষি বলে মনে হয়।'

শশাঙ্ক বলল, 'কেন বল তো! তোমার নিজের রূপ নেই বলে?'

মুরারিমোহন কাতরতার ভঙ্গি করে বললেন, 'বড় ব্যথা দিলে শশাঙ্ক। বড় আঘাত দিলে। শেলাঘাত। প্রায় শক্তিশেল। দেখ, কানাকে কানা বলতে নেই, খোঁড়ার চরণকমলের প্রশস্তি করতে হয়। সেইটাই সভ্যতা, সহৃদয়তা। ঠিকই বলেছ, তোমার কন্দর্পকান্তির কাছে আমি আলকাতরার পিপে। কিন্তু এই পিপে যত বক্ষ মর্দিত করেছে, যত রাজ্য জয় করেছে, তুমি যতই নয়নমোহন হও শশাঙ্কমোহন, তুমি তার সিকির সিকিও পারনি। আসলে রূপ নয়, পুরুষের চাই শক্তি। শক্তিই তার রূপ। স্রেফ বাহুবল, পশুশক্তি। যে পুরুষের মধ্যে সেই পশুরাজ বাস করে, যার বুকের মধ্যে সেই পশুরাজ গর্জন করে, মেয়েরা একই সঙ্গে তার রানী আর দাসী হতে চায়।'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু পশুরাজ আমাকে এই সন্ধ্যেবেলায় কোথায় নিয়ে চলেছেন? আমার আজ একটু অন্য কাজ রয়েছে মুরারিদা।'

মুরারিবাবু বললেন, 'তোমার কাজের কথা তো আমি জানি। তোমার মন তো সেই মেয়েটার কাছে পড়ে রয়েছে। কিন্তু থাকলেও তো তুমি তাকে এক্ষুনি পাচ্ছ না। ও-ফুলে কাঁটা আছে। সিঁথিতে সিঁদুর দেখলুম যে। আর, পাহারাদার বুড়ো মালিটিকেও দেখলুম। একটি কুঁড়িও ছিল পাশে। কুঁড়ি তবে ফুটে উঠল বলে। ফোট-ফোট করছে।'

মুরারির স্থূলতা শশাঙ্কের রুচিতে বাধে। সে লজ্জিত হয়ে ধমক দিল, 'কী যা-তা বলছ। মদ না ছুঁতেই মাতাল হলে নাকি।'

মুরারিবাবু বললেন, 'তুমি তো জানো, আমি পিপের পর পিপে গিলি, তবু মাতাল হইনে। মাতাল অন্য ব্যাপারে হই।'

পার্ক স্ট্রীটে এসে গাড়ি পার্ক করলেন মুরারিমোহন। সুপরিচিত বড় কোন বারে গেলেন না। ছোট্ট নাতিখ্যাত একটি বারে শশাঙ্ককে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন।

উর্দিপরা দারোয়ান সেলাম ঠুকল। হলঘরের লম্বা টেবিলটায় সারি সারি সুরারসিক পানভোজনে ব্যস্ত। কেউ কেউ মুখের হাসিতে, চোখের ব্যঞ্জনায় মুরারিমোহনকে অভ্যর্থনা জানালেন।

তাঁদের সামনে দিয়ে পুরু পর্দা ঢাকা একটি কেবিনে মুরারি শশাঙ্ককে নিয়ে ঢুকলেন। টেবিলের বিপরীত দিকে বন্ধুর মুখোমুখি বসে হেসে বললেন, 'এই ভালো। এই বেশ কোজি কর্নার। এখানে আচার্য শশাঙ্ককে কোন ছাত্রছাত্রীর মুখোমুখি হতে হবে না। ছাত্রেরাও আজকাল খায় হে। তবে এদিকটায় আসে না।'

বেয়ারা এসে দাঁড়াতে মুরারিবাবু শশাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খাবে?'

'না-না, আমার জন্যে কিছু দরকার নেই।'

'কেন, মনুসংহিতার নিষেধ?'

'মনুসংহিতার নয়। আধুনিক চরক শুশ্রুতদের। ডাক্তারের বারণ।'

'আচ্ছা, একটু বিয়ার খাও। বিয়ার মানে তো চিরোতার জল। আমি একটু শ্বেত অশ্বে আরোহণ করি।'

নিজের জন্যে হোয়াইট হর্সের অর্ডার দিলেন মুরারিবাবু।

বয় সোডার বোতল আনল, একটি প্লেট এনে রাখল। তাতে কাজু বাদাম, ভাজা চিংড়ি। দুটি গ্লাস রেখে দিল সামনে।

মুরারিবাবু চাঁটের প্লেটটি দেখিয়ে বললেন, 'তোমার জন্যে। আমার ও-সব দরকার হয় না। তুমি বলছিলে ডাক্তারের বারণ। ডাক্তারের বারণ না ছাই। আসলে এক ফোঁটা পেটে পড়তে না পড়তেই তুমি বেসামাল হয়ে পড়। নিজেকে কিছুতেই ধরে রাখতে পার না। তোমাকে টেনে তুলতে হয়, সঙ্গে করে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিতে হয়। সেই ভয় থেকেই তুমি সাত্ত্বিক হয়েছ। আসলে ধর্ম বল, নীতি বল, সবই এই ভীতিসঞ্জাত।'

বয় এসে গ্লাস ভর্তি করে দিল। মুরারিবাবু খানিকটা সোডা মিশিয়ে নিলেন। নিজ হাতে তৈরি করে দিলেন বন্ধুর পানীয়।

তারপর গ্লাসে একটু চুমুক দিয়ে মুরারিবাবু হেসে বললেন, 'শুধু মদ কেন, মেয়েদের বেলায়ও তোমার এই ব্যাপার দেখেছি। রাস্তায় সুশ্রী মেয়ে দেখলে আড়চোখে আমরাও তাকাই, সুবিধে পেলে দাঁড়িয়েও দেখি। কিন্তু তুমি একেবারে বসে পড়ো। প্রথমে বসে পড়ো, তারপরে শুয়ে পড়ো। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পতন ও মূর্ছা।'

হো-হো করে হেসে উঠলেন মুরারিবাবু।

পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স, অথচ একগাছি চুলও পাকেনি। শরীরের কোথাও একটুও টোল খায়নি। এদিকে অমিতাচারের চূড়ান্ত করে ছাড়েন। যেমন মদ খেতে পারেন, তেমনি মাংস। সব রকম মাংসেই ওঁর রুচি। সব রকম মেয়েতেই ওঁর স্পৃহা। একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'ভাই, আমরা মধ্যবিত্ত গেরস্থঘরের মানুষ। যখন যা পাই, তাই খাই। পেলে হাতী-গণ্ডারও মারি, না পেলে ছুঁচো-চামচিকে দিয়েও একাদশীর পারণ সারি।'

ওঁর স্থূলতা, প্রাণ-প্রাচুর্যকে ঈর্ষা করে শশাঙ্ক। মুরারিদা'র মুখোমুখি বসলে তার মনে হয়, চারুতা, সূক্ষ্মতা একটা ব্যাধি। ইন্দ্রিয়পরতার সঙ্গে এ-ব্যাধি খাপ খায় না। তার রূপবোধ, রুচিবোধ, ভোগ-সম্ভোগের অন্তরায়। তা এক মুহূর্তে ভোগের পথে এগিয়ে দেয়, পরমুহূর্তে লজ্জা, অনুশোচনা, অনুতাপের অনলে পুড়িয়ে মারে। ডায়াসে দাঁড়িয়ে নীতিনিষ্ঠার সমর্থনে বক্তৃতা দিয়ে নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরাকে দেখে, তার দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে শশাঙ্কের মনে যে কামনার উদ্রেক হয়েছিল, তাকে শিল্পরুচি কি নীতি, কিছু দিয়েই সমর্থন করা যায় না। সে বাসনা একেবারে জৈব।

শশাঙ্ক বহু কষ্টে নিজেকে সেখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। তা সে নিজে জানে। ছিনিয়ে এনে মুরারিদা'র হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে বেঁচেছে। মুরারিদা'র শক্তিকে শশাঙ্ক ঈর্ষা করে। কিন্তু ইচ্ছা করলেই শশাঙ্ক মুরারিদা হতে পারে না। সে যা সে তাই। প্রত্যেকেরই সম্ভোগ আর দুঃখভোগের পদ্ধতি আলাদা।

শশাঙ্কের মনে পড়ল, প্রণব তার সমালোচনা করে সে উচ্ছৃঙ্খল বলে। আর মুরারিদা তার নিন্দা করেন সে যথেষ্ট উচ্ছৃঙ্খল নয় বলে। এই দুই বন্ধুর মধ্যে কারো মনোমত হওয়ারই শশাঙ্কের ক্ষমতা নেই। আসলে রুচি নেই, ইচ্ছা নেই। এখানে শুধু ক্ষমতার প্রশ্ন নয়, মমতার প্রশ্ন। এই মমত্ব-বোধই মানুষের আইডেনটিটি।

মুরারিবাবু তাঁর গ্লাসে চুমুক দিলেন। মদ তো নয়, যেন গোটা জীবনটা গ্লাসের মধ্যে টলটল করছে। আর মুরারিবাবু চেখে চেখে উপভোগ করছেন।

'বাইরে অ্যামপ্লিফায়ার দিয়েছিল। তার দৌলতে শুনলাম তোমার বক্তৃতা। হেসে আর বাঁচিনে।'

শশাঙ্ক তার গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়াল, একটু রূঢ়ভাবে বলল, 'কেন, হাসির কী পেলে!'

'কী পেলাম মানে? আগাগোড়া হাসি, আগাগোড়া হাস্যরস। তোমার অভিনয়নৈপুণ্য আছে বটে। আমি কি সাধে তোমাকে অভিনেতা হতে বলেছিলাম? স্টেজেই হোক, স্ক্রীনেই হোক, নামলে তুমি নাম করতে পারতে হে, খুব নাম করতে পারতে। নাম হতো যশ হতো। উর্বশী-মেনকার মত নারী হতো, গাড়ি-বাড়ি অবশ্য তোমার আছে। তা সংখ্যায় পরিমাণে আরো বাড়ত। তারপর হয়তো কোন রম্ভা কি তিলোত্তমার পায়ে সব জলাঞ্জলি দিয়ে ফকির হয়ে, লেংটি পরে পথে পথে ঘুরতে। দেখ, তারই নাম জীবন। একটি সরল রেখা ধরে চলেছি তো চলেছি, তার নাম জীবন নয়। তা হল জীবনের বিকল্প কোন একটা কিছু।'

শশাঙ্ক রুষ্টস্বরে বলল, 'তুমি যাই বল না কেন, আমি তখন অভিনয় করিনি। আমি যা বিশ্বাস করি, তাই বলেছি।'

মুরারিবাবু হাসলেন, 'My friend, ওটা তোমার make belief, ঠিক বিশ্বাস করো না, যেন বিশ্বাস করো। অমন ইলিউশন প্রত্যেক অভিনেতাকে নিজের জন্যে সৃষ্টি করতে হয়। নইলে এক সীনের বেশি দুটি সীনে সে অভিনয় করতে পারে না। আরো একটি কথা তোমার বক্তৃতায় যোগ করে দেওয়া উচিত ছিল। তা হলে তোমার স্পীচ সম্পূর্ণ হতো।'

'কী কথা?'

'তুমি উপসংহারে বলতে পারতে, Do what I say ; don't do what I do.'

মুরারিবাবু ফের হেসে উঠলেন।

শশাঙ্ক গম্ভীর হয়ে রইল। চট করে কোন জবাব দিতে পারল না।

মুরারিবাবু বললেন, 'তোমার একটা কথাও সত্যি নয়। সব স্তোকবাক্য। নিজেকে আঁখি ঠেরেছ, আর ছাত্রদেরও কিছুক্ষণের জন্যে ভুল বুঝতে দিয়েছ। দ্বিতীয় যৌবন আবার কি হে? যৌবনের দ্বিতীয়, তৃতীয় নেই। সে একমাত্র। সে যখন দেহ ছেড়ে চলে যায়, তখনো তৃষ্ণার রূপ নিয়ে থাকে। চিতায় না ওঠা পর্যন্ত মানুষের যৌনকামনার শেষ হয় বলে তো আমার মনে হয় না। এইটাই প্রকৃতি, জীব-স্বভাব। এর বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে তা হবে অনৈসর্গিক ব্যাপার।'

মুরারিবাবু আর-একটি পেগ নিলেন। তারপর বলতে লাগলেন, 'এ-যৌবন শেয়ারে ভোগ করা যায় না। পুত্রই বল, ছাত্রই বল, পৌত্রই বল, দৌহিত্রই বল, কাউকে ভাগ দেওয়া যায় না। কারো কাছ থেকে ভাগ নেওয়াও যায় না। এ-সুখ অবিভাজ্য। এর দুঃখ আর যন্ত্রণারও কোন অংশীদার নেই। যতদিন তোমার শক্তি আছে, ভোগ করবে, বেপরোয়া হয়ে ভোগ করবে। তারপর যখন অশক্ত হবে, গলিতনখদন্ত হবে, তখন বলবে, হরি হে তুমিই সত্য।'

শশাঙ্ক বলল, 'এই তোমার উপদেশ?'

মুরারিবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, এই একমাত্র পথ। অন্যথায় তোমার অবদমিত বাসনা-কামনা তোমাকে বাঁকা পথে, অলিতে গলিতে ঘুরিয়ে মারবে। তোমাকে ফেটিশ করে তুলবে, তোমার মরবিডিটি দশগুণ বাড়িয়ে দেবে। আরো যে কি করবে না-করবে তার ঠিক নেই। Repression is dangerous, very dangerous; আমার পরামর্শ যদি শোন শশাঙ্ক, এক কাজ করো। একটি রক্ষিতা রেখে নাও। ঘরে যখন স্ত্রী নেই, ফের বিয়ে-থা করতে সাহসও পাচ্ছ না, এই হল শাস্ত্রবিধি, মধুর অভাবে গুড়। আরে তুমি যখন অ্যাফোর্ড করতে পার রাখবে না কেন? একটি কেন, ইচ্ছে করলে দুটিকেও তুমি রাখতে পার। একটি দেশী আর-একটি বিদেশী। আমার সন্ধানে সব দেশী মেয়েই আছে। এই কলকাতায় বসেই তুমি সব দেশের স্বাদ পাবে। বিদেশিনীর মুখ, বিদেশী মুখের ভাষা, তার মুখমদের ছিটা।'

রাত যত বাড়তে লাগল, পেগের সংখ্যা যত বাড়তে লাগল, মুরারিবাবুর মুখের আগল তত খুলে যেতে লাগল।

'শশাঙ্ক, আরো একটা বোকামি করেছ তুমি। যুবকদের কাছে কী করুণ, কী কাতর অনুনয়ই না করেছ, আমাকে তোমরা শ্রদ্ধা কর, প্রণম্য যদি নাও হই, প্রণাম কর। আমি শুনেছি আর মরমে মরে গেছি। লজ্জায় নিজের জিভ কেটেছি। ছি-ছি-ছি, লোকটা বলে কি। শশাঙ্কটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল। আরে শ্রদ্ধা কি ওভাবে কেঁদে-কেটে চেয়ে-চিন্তে পাওয়া যায়। তা গুঁতিয়ে আদায় করে নিতে হয়। আর তা যদি না পার, তা হলে বল,

I don't care । তোরা যদি আমাকে গ্রাহ্য না করিস, আমিও তোদের গ্রাহ্য করিনে। শশাঙ্ক, Unlike you, I have got children. Almost a dozen of them. But I don't believe in posterity. I don't believe and so I don't care. ওদের সঙ্গে আমাদের আপস কিসের? ওদের সঙ্গে আমাদের আমরণ লড়াই। জমি নিয়ে লড়াই, জরু নিয়ে লড়াই, অর্থপ্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি নিয়ে লড়াই। বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী দেব না, ছুঁতে দেব না নিজের ভোগ্যা রমণীর কেশাগ্র নখাগ্র। আমার এই কথা।'

মুরারিবাবু পঞ্চম পেগ চাপালেন। সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট চলছে অবিরাম। চেনস্মোকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি আছে।

'তুমি এই সমাজে যা ইচ্ছা তাই করতে পার। যা খুশি। শুধু বুক ফুলিয়ে বলতে পারা চাই, যা করেছি, বেশ করেছি। শুধু সমাজের মুখের ওপর দুটো বুড়ো আঙুল উঁচু করে দেখিয়ে বলতে পারা চাই, বেশ করেছি। যদি তুমি একবার দ্বিধাগ্রস্ত হলে, যদি তুমি মাঝে মাঝে ভাবতে শুরু করলে, বলতে শুরু করলে—তাই তো কী করলাম, তা হলে লোকে তোমাকে শতধা করে ছাড়বে। তোমার মুখে থু-থু দেবে, তোমার গায়ে ধুলো দেবে। কিন্তু যদি হাজার অন্যায় করেও সমাজের মাথায় কি কাঁধে চড়ে বসতে পার, তোমার পায়ের ধুলো তাদের মুখে পড়বে, বুকে পড়বে, তারা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করবে না। এর নাম সমাজ।'

মুরারিবাবু একটু থেমে গ্লাসে ফের চুমুক দিলেন।

শশাঙ্ক সুরামত্ত বন্ধুকে দেখতে লাগল। মুরারিদা যেন তারই আর-এক সহোদর। অগ্রজ নয়, অনুজ নয়, ঠিক যমজ। মুরারিদা'র এই চিন্তাধারা, এই বাগ্‌ধারা তার তো অপরিচিত নয়। এ ধারায় সে-ও চিন্তা করে, সে-ও কথা বলে। তবু খানিক দূর যেতে যেতে তার চলার পথ আলাদা হয়ে যায়।

ষষ্ঠ পেগে মুরারিবাবু নীতির কথা পাড়লেন। 'নীতি সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ, তা আরো হাস্যকর। সেখানে তোমার বাগাড়ম্বর মাত্রা ছাড়িয়েছে। শক্ত শক্ত শব্দ দিয়ে তুমি নিজের দুর্বল যুক্তি, দুর্বল বিশ্বাসকে ঢাকতে চেয়েছ। কাব্যচর্চার সঙ্গে, শিল্পচর্চার সঙ্গে নীতির কোন সম্পর্ক নেই। দুটো আলাদা জিনিস। যদি এক হতো, প্রত্যেক শিল্পী সৎ আর সাধু হতো। বরং দুর্নীতির মধ্যেই শিল্পের জন্ম। আমাদের রঙ্গজগতে তো তাই দেখি। কারো মদ না খেলে গলায় জোর আসে না, মেয়েমানুষ গলা জড়িয়ে না ধরলে কারো বা গলা ছাড়ে না। আবার এ-সব বাহ্যদোষ যাদের নেই, তাদের হাজার গুহ্যদোষ আছে। তাদের কেউ অনুদার, কেউ ঈর্ষাকাতর, কেউ-বা অস্বাভাবিক অহংকারী। তাদের চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া। রূপসৃষ্টির চর্চা যারা করে, কিছু-না-কিছু বিকৃতি, কিছু-না-কিছু বিরূপতা তাদের মধ্যে থাকবেই। রূপ-সম্ভোগের সঙ্গেই বা নীতির কোন্ সম্পর্ক? প্রকৃতির রূপই হোক, নারীর

রূপই হোক, সেই রূপ দেখতে শিখলেই যে মানুষ সজ্জন হবে, সৎ হবে, মহৎ হবে, আর শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই সে মানুষ হিসেবে ভালো হবে না, এই অসার কথায় আমার বিশ্বাস নেই। আসলে এসব ভিন্ন ভিন্ন কম্পার্টমেণ্টের ব্যাপার। এক কামরায় সততা, মহত্ত্ব আর এক কামরায় দক্ষতা। শিল্পে হোক সাহিত্যে হোক আর হাতুড়ি বাটালিতেই হোক। অনেক সময় কম্পার্টমেণ্টগুলি ওয়াটারটাইট কম্পার্টমেণ্ট। জল অচল। অনেক সময় আমার মনে হয় অশিক্ষিত, অদীক্ষিত, অদক্ষ মানুষই ভালো মানুষ।'

শশাঙ্ক বলল, 'মানে তোমার ভাষায় বোকা মানুষ মানেই ভালোমানুষ।'

মুরারিবাবু বললেন, 'কথাটা উলটে নাও, ভালো মানুষ মাত্রেই বোকা মানুষ। এটা সমাজের ভাষ্য। একথা সমাজ মুখে স্বীকার করে না, আচার ব্যবহারে বুঝিয়ে দেয়।'

বয় বিল নিয়ে এল।

শশাঙ্ক বলল, 'তুমি তো অনেক অমূল্য উপদেশ দিলে। বিলটা বরং আমিই মিটিয়ে দিই।'

মুরারিমোহন পরম ঔদাস্যে বললেন, 'দাও।'

গাড়িতে উঠে শশাঙ্ক বলল, 'তুমি চালাতে পারবে তো মুরারিদা? একটু একটু টলছ মনে হচ্ছে।'

মুরারিমোহন বললেন, 'আরে না না না। ওটা তোমার দৃষ্টিভ্রম। ভিতরটা আমার বেশ অটল আছে। আমার এক ছেলে আজ কী বলছিল জানো?'

'কী বলছিল?'

মুরারিবাবু গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে পশ্চিম দিকে আস্তে আস্তে এগোতে এগোতে বললেন, 'বলছিল, বাবা, তোমার লজ্জা হয় না, কিন্তু আমাদের লজ্জা হয়। তোমার পরিচয়ে পরিচয় দিতে লজ্জা পাই—'

'তুমি কী বললে।'

'কী বললাম মানে? খড়ম নিয়ে তেড়ে উঠলাম। বললাম, হতভাগা শুয়ারকা বাচ্চা। আমাকে বাপ বলে পরিচয় দিতে তোর এতই যদি লজ্জা, আমার নাম তোকে বলতে বলেছে কে! কোন মহর্ষি-টহর্ষির নাম বলে দিলেই পারিস। ছোঁড়াটা থার্ড ক্লাসে না সেকেণ্ড ক্লাসে যেন পড়ে। ঠিক খোঁজ রাখিনে। বোধ হয় ফার্স্ট সেকেণ্ডই হয়। এখনো বিড়ি সিগারেট ধরেনি। তাই এত আস্ফালন! কী হে, ফিরিঙ্গিপাড়ায় যাবে নাকি? ফ্রী স্কুল স্ট্রীট।'

সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন মুরারিমোহন।

শশাঙ্ক বলল, 'না মুরারিদা, আমাকে বরং ছেড়ে দাও। আমি বাড়ি চলে যাই। তোমার তো সেই টালিগঞ্জ। অনেক দূরে যেতে হবে তোমাকে।'

মুরারিমোহন বললেন, 'আরে দূর। সবে দশটা। এখনই রাত্রির কী

হয়েছে। শীতের রাত বলে এত বেশি মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আজ তাহলে ফ্রী স্কুল স্ট্রীট থাক। ওটা আর একদিন হবে। ভয় নেই, তোমার ঘাড় ভাঙব না। রাহা খরচ সব আমার। চল আজ তোমাকে বরং একটু মুক্ত হাওয়ায় ঘুরিয়ে আনি।'

দক্ষিণ মুখে যেতে যেতে হঠাৎ ডানদিকে বাঁক নিলেন মুরারিবাবু। ক্যাথিড্রাল রোড দিয়ে গাড়ি এগোতে লাগল। যেতে যেতে গীর্জার চূড়া চোখে পড়ল শশাঙ্কের। শীতের ধোঁয়াটে অস্পষ্ট আকাশ সেই চূড়ায় বিঁধে রয়েছে। 'বিন্ধতনু নীল রাত্রি পাখা মেলে আছে।' জনৈক আধুনিক কবির একটি পংক্তি। কিন্তু রাত্রির রঙ আজ ঠিক নীল নয়। ধোঁয়াটে ধূসর। ডানদিকে শূন্য মাঠ। নিস্তব্ধ নির্জন। কিসের এক অবর্ণনীয় বিষাদে মন ভরে উঠল শশাঙ্কের। মাঝে মাঝে ওই গীর্জার চূড়া তাকে আকর্ষণ করে। ধর্মমন্দির হিসাবে নয়, উচ্চতার প্রতীক হিসাবে, সৌন্দর্যের সৃষ্টি হিসাবে। সেই রূপলোক তাকে অন্য লোকে নিয়ে যায়। বলতে আপত্তি কি, সেই লোকের সঙ্গে ইহলোকের লাভ-লোকসান বাসনা-কামনার সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। চোখে পড়ে কি পড়ে না। আবার ঠিক পরমুহূর্তে অন্য রূপও তাকে টানে। সেই আকর্ষণ শুধুই রূপানুভূতি, একথা কী করে বলে শশাঙ্ক। নারীর দুটি স্তনচূড়াকেও নির্লোভ নিরাসক্ত অথচ সৌন্দর্যমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে পারলে কেমন হতো বলা যায় না। ভাস্করের হাতে তৈরি প্রস্তরময়ী যে নারী, তার স্তনচূড়ায় সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু সেই প্রস্তর যেই মেদ-মজ্জায় রূপান্তরিত, যেই তার সঙ্গে প্রাণচাঞ্চল্য যুক্ত হল অমনি তা আসক্তিতে ভরে ওঠে কেন? গীর্জার উচ্চচূড়া শশাঙ্ককে যেমন আকর্ষণ করে তেমনি এই কলকাতা শহরের আন্ডার-ওয়ার্লড, তার সংখ্যাহীন অতল গহ্বর তাকে সমানভাবে টানে। সেই গহ্বর যদি একটু হাঁ করে, একটু এগিয়ে আসে শশাঙ্ক তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারে। মুরারিদা আর একটু চাপ দিলেই সে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে যেতে পারত। একটু রঙ, একটু রেখা, নারী দেহের কোন বিশিষ্ট একটি ভঙ্গি তাকে টেনে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রীট গার্ল তার চোখে প্রিন্সেস হয়ে উঠত। এই তো রূপবোধ, এই তো রুচির বড়াই। না, শুধু রূপানুশীলনই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে আরো কিছু দরকার। নিজের মধ্যে সঙ্গতি সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হলে আরো কিছু দরকার। চলতি মরালকোড মেনে চলাই কি নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়?

মুরারিবাবু এক সময় বললেন, 'কি হে শশাঙ্ক, ঘুমোচ্ছ না ঝিমোচ্ছ?'

শশাঙ্ক বলল, 'তুমি কি গঙ্গার দিকে চললে?'

মুরারিবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ওরা তো হর্তুকি-টর্তুকি কিছু দিল না। চল গঙ্গোদকে কুলকুচি করে আসি।'

'আচ্ছা মুরারিদা!'

'বল।'

'কেন তুমি বললে নীতি সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই? মদ্যপান আর প্রমিসকিউটিকে তুমি স্বাস্থ্যনীতিবিরুদ্ধ বলতে পার, কিন্তু দুর্নীতি বলবে কোন অধিকারে?'

'বাঃ বাঃ। এই তো চাই। খোলা হাওয়ায় তোমার মুখ খুলেছে। আমিও তো সেই কথা বলি।'

শশাঙ্ক বলল, 'এই অমিতাচার দুর্নীতির দিকে কাউকে কাউকে টেনে নিতে পারে। কিন্তু কেউ যদি সেই উৎসমুখে চেপে বসে থাকে, সেও ভেসে যাবে এমন কোন কথা নেই। অন্তত যতক্ষণ সে তা না যাচ্ছে ততক্ষণ তুমি তাকে দুর্নীতিপরায়ণ বলতে পার না।'

মুরারিবাবু গঙ্গার ধার দিয়ে আস্তে আস্তে ড্রাইভ করতে লাগলেন। শীত তেমন পড়েনি। তাছাড়া তিনি তো ভিতরে ভিতরে গরম হয়েই আছেন। তবু কোটের বোতামটা এ'টে দিলেন। তারপর হেসে বললেন, 'তুমি কি নিজের সাফাই গাইতে চাইছ? দস্যু বলিল আমার আত্মশ্লাঘা করিবার ইচ্ছা নাই।'

'হ্যাঁ, শশাঙ্ক দস্যুও সেই কথা বলে। আত্মশ্লাঘা না করেও সে বলতে পারে সে কারো সম্পত্তি হরণ করেনি, কাউকে খুন করেনি, জখম করেনি, কোন মেয়েকে পথে বসায়নি, ব্রথেলের পথ দেখিয়ে দেয়নি। স্ত্রীর সঙ্গে তার বনিবনাও হয়নি। অনেকেরই হয় না। তার স্ত্রী খুব ভায়োলেণ্ট। পাছে ফ্যাটাল কিছু ঘটে যায় তাই সে আলাদা থাকবার ব্যবস্থা করেছে। ভরণ-পোষণের খরচ দিতে চেয়েছে। যদি সে আগে মরে যায় সম্পত্তির অংশ সে তাকে কিছু দিয়েও যাবে। মিথ্যে কথা সে যদি কিছু বলে থাকে সে প্রণয় ব্যাপারে, মেয়েদের কাছে। সেখানে মিথ্যা বলবার লাইসেন্স আছে। হিংসা ঈর্ষা যদি সে কাউকে করে থাকে সে প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে। কিন্তু অন্যায়-ভাবে সে কাউকে আঘাত করেনি। সে অ্যাচিলিসের গোড়ালিতে ঘা দেয়নি, দুর্যোধনের দুর্বল উরুতে আঘাত করেনি।'

মুরারিবাবু হেসে বললেন, 'আরে ভাই, রম্ভোরুর দিকে তোমার লক্ষ্য। তুমি দুর্যোধনের উরু দেখতে যাবে কোন দুঃখে?'

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফের সেই পার্ক স্ট্রীট দিয়েই পুব মুখে এগোতে লাগলেন মুরারিমোহন। শশাঙ্ক জানে পার্ক স্ট্রীট তাঁর প্রিয় রাস্তা। পার্ক স্ট্রীট আর পার্ক সার্কাস শুধু এই শব্দ দুটি তাঁর মনকে রোমান্সে আপ্লুত করে। ওখানে মুরারিদার কিছু অ্যাফেয়ার ছিল। এখনো আছে কিনা শশাঙ্ক ঠিক জানে না।

ডাইনে দু-তিনশ বছর আগের পুরোন ভাঙা গ্রেভ ইয়ার্ড তার সমস্ত সুখ দুঃখের ইতিবৃত্ত নিয়ে অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

শশাঙ্কের হঠাৎ মনে হল এই হিমশীতল কবর যেন তার নিজের হৃদয়। সেখানে কোন উত্তাপ নেই, আশা-আকাঙ্ক্ষা বাসনা-কামনা নেই। সমস্ত প্রাণ-চাঞ্চল্য সেখানে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

মুরারিবাবু হঠাৎ বললেন, 'দেখ, আমি তোমার মত ঘুরপাক খাইনে। আমি সোজা পথে চলি। যা জৈব ব্যাপার তাকে আমি জৈব ব্যাপার বলেই জানি। তার মধ্যে জলীয় রোমান্স মিশিয়ে আমি তোমার মত নাকানি চোবানি খাইনে। আমি নীতি দুর্নীতি নিয়ে মাথা ঘামাইনে। পাপপুণ্যকে থোড়াই কেয়ার করি। আমি প্রবৃত্তির প্রভু হতে চাইনে। আমি জানি তা আমি পারব না। তাই আমি প্রবৃত্তির মধুর দাসত্ব মেনে নিয়েছি। কখনো মধুর, কখনো তিক্ত, অম্ল কষায়। লোকে যেমন নিষ্ঠুর খামখেয়ালী মনিবকে মেনে নেয়, দজ্জাল স্ত্রীকে মেনে নেয়, বুড়ো বয়সে ব্লাডপ্রেসার কি ডায়াবেটিসকে মেনে নেয়। আমি তেমনি মেনে নিয়েছি। মেনে নিয়েও, লোকে যদি চায়, সংসারে অনেক কিছু করতে পারে। হ্যাঁ, তোমাদের তথাকথিত সৎ আর মহৎ কাজ করাও অসম্ভব নয়।'

শশাঙ্ক মনে মনে হাসল। তারপর নিজের মনেই বলল, 'মুরারিদা, তুমি কি অতই একমুখো? অতই একরোখা? তাই যদি হতো, তোমার ওই বাচ্চা ছেলের সামান্য সমালোচনা তোমাকে অত বিচলিত করত না। তুমি আমাকে অভিনেতা বলে ব্যঙ্গ করছিলে। তুমি নিজে কী মুরারিদা। অভিনয় আমরা কম বেশি সবাই করি। কেউ ইচ্ছায় করি, কেউ অনিচ্ছায় করি, কখনো জেনে করি, কখনো না জেনে করি। সেই জরাজীর্ণ কতকগুলি মূল্যবোধ আমাদের আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে। আমরা তা মানিনে, মানতে পারিনে। মানা সঙ্গত মনে করিনে। আবার সেই না মানার জন্যে গোপনে গোপনে অনুতাপ করি। আমরা আমাদের দুর্বলতা নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় বড়াই করি, পরদিন সকাল বেলায় লজ্জায় মরে যাই।'

মুরারিবাবু শশাঙ্ককে তার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিলেন। শীতের রাতে পাড়াটা এরই মধ্যে নির্জন হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এই জনশূন্যতা, এই নৈশ নৈশব্দ্য তার ভালো লাগে। এই নিঃশব্দ নিশীথ নিজের মুখোমুখি বসবার সময়। নিজের বুকে কান পেতে নিজের হৃদ্‌স্পন্দন শোনার পরম ক্ষণ।

তবু শশাঙ্ক বন্ধুকে ডাকল, 'এসো না মুরারিদা, শুধু পানই করেছ, ভোজনটা তো আর হয়নি। আমার এখানে ডিনারটা সেরে যাও। যা আছে দুজনের হয়ে যাবে।'

মুরারিবাবু বললেন, 'না ভাই, আজ আর না। ওদিকে আর একজন অপেক্ষা করছে। ঝাঁটা বঁটি হাতে অপেক্ষা করলেও করছে।'

শশাঙ্ক একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তাহলে এসো।'

মুরারিবাবুর গাড়ির শব্দ মিলিয়ে গেল। শশাঙ্ক ভাবল, শুধু তার

জন্যেই কেউ অপেক্ষা করবার নেই।

রামেশ্বর আগেই দোর খুলে দিয়েছিল।

শশাঙ্ক ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে বিকেলের ডাকে কোন চিঠিপত্র এসেছে?'

রামেশ্বর বলল, 'না বাবু, ডাকের চিঠি আসেনি। হাত-চিঠি আছে।'

শশাঙ্ক বলল, 'হাত-চিঠি কে দিল?'

রামেশ্বর একটু মুখ টিপে হাসল, 'সেই মন্দিরা দিদিমণি এসেছিলেন।'

'বলিস কি? একা?'

'না, একা নয়। সঙ্গে আরো দুজন ছিলেন। একজন বুড়ো ভদ্রলোক, আর একজন দিদিমণির বোন।'

'তারপর?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। আপনার বই-পত্তরগুলো নেড়ে চেড়ে দেখলেন। আপনার লাইব্রেরী ঘরখানা একবার ঘুরে এলেন। উনি তো সবই জানেন। কেউ আসে-টাসে কি না, জিজ্ঞেস করলেন। আমি যখন বললাম, কেউ আর আসে না, খুব খুশি।'

রুদ্ধশ্বাসে শশাঙ্ক বলল, 'তারপর?'

'তারপর বসে বসে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেলেন। লিখে খামে বন্ধ করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, বাবুকে দিস।—এই নিন বাবু।'

সাদা খামখানা রামেশ্বর শশাঙ্কের দিকে এগিয়ে দিল।

খামের ওপর কোন নাম-ঠিকানা নেই। শশাঙ্ক খামের মুখ ছিঁড়ে ফেলল। একটুকরো চিঠি। তাতে কোন তারিখ নেই, ঠিকানা নেই। স্বাক্ষর নেই, সম্বোধন নেই। কিন্তু আর সবই আছে।

'আপনি কী নিষ্ঠুর। নাকি অভদ্র। একটি কথাও বললেন না তখন। এত ভয়! যে-ব্যবহার করেছেন, তাতে আর কোন সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। ভাববেন না, সম্পর্ক রাখতে এসেছি। শুধু শেষবারের মত দেখা করতে এসেছিলাম। কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জেনে আপনার কী হবে। যে জানতে চায় না, তাকে জানিয়ে কী লাভ। যে কিছু শুনতে চায় না, তাকে কে শোনাতে যায়।

'আপনার বক্তৃতা শুনতে এসেছিলাম। শুনে গেলাম। মোটেই ভালো লাগল না। আপনি আগাগোড়া অমন বুড়ো মানুষের মত বক্তৃতা দিলেন কেন? আপনি কি সত্যিই বুড়ো হয়েছেন? সভাপতি হলে কি বৃদ্ধ পতি সাজতে হয়? আরো অনেক কথা ছিল। কিন্তু কেন লিখব? লিখে কী হবে?'

শশাঙ্ক এ-সব অভিযোগে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হল না। বরং এই অভিমান আর অভিযোগের মালা যে-কোন বরমাল্যের চেয়ে তার কাছে লোভনীয় মনে হল।

জীর্ণ কবরখানায় ফের জীবনের নাট্যশালা বসেছে। রঙ্গমঞ্চে কুশী-লবের আবির্ভাব হল বলে।

শশাঙ্কের মন ফের আসক্তির সুখে ভরে উঠল।

স্বয়মাগতার মত সুখদা আর কে আছে?

ঘুমোবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তীব্র এক মত্ততার মধ্যে কাটল শশাঙ্কের। মুরারিদা যাই বলুন এ শুধু মদের প্রতিক্রিয়া নয়। দু-এক বোতল বিয়ার হজম করবার শক্তি শশাঙ্কের আছে। তার মত্ততার কারণ অন্যত্র। একখানি অস্বাক্ষরিত চিঠির প্রতিটি অক্ষর তার চোখের সামনে যেন এক নতুন রূপ-লোকের দ্বার খুলে দিয়েছে। সেই রূপলোক আর স্বর্গলোকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অনাহূত হয়েও মন্দিরা এসেছিল, তার ঘরে এসে বসেছিল, শশাঙ্কের প্রতিটি ঘর সে ঘুরে ঘুরে দেখে গেছে, পরম আদরে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে শশাঙ্কের প্রতিটি ব্যবহার করা বস্তু, এই কল্পনা তাকে ফের উজ্জীবিত করে তুলল। তার প্রতিটি স্পর্শ যেন শশাঙ্কের নিজের গায়ে লেগেছে। আর প্রতিটি স্পর্শই যেন রমণীর প্রথম স্পর্শ। শশাঙ্কের মনে রইল না, একটি বিবাহিতা তরুণী পূর্ব সম্পর্কের সূত্রে একবার শুধু দেখা করতে এসেছিল। এ দেখা নিতান্তই ভদ্রতার শিষ্টাচারের সৌজন্যের দেখা হতে পারে। এর মধ্যে এমন কিছু আশা করবার নেই। শশাঙ্কের মনে হল না যে, আশা করাটাই অসংগত। একটি সদ্যবিবাহিতা তরুণী মেয়ে স্বামীর ঘর করতে চলেছে। সেই ঘরেই তার যথাস্থান, সেখানেই তার সুখ সম্মান শান্তি, সেই মত্ততার মুহূর্তে একথা শশাঙ্ক ভাবতে পারল না। বরং তার মনে হল, যে বাসনা দুর্নিবার আকর্ষণে মন্দিরাকে ফের তার কাছে টেনে নিয়ে এসেছে সেই বাসনা শশাঙ্কেরও বাসনা। সেই বাসনায় বাসনায় যে মিল সেই মিলই একান্ত সত্য। সেই মিলনোৎসবের পথে যা কিছু বাধা—আইনের বাধা ন্যায়ের বাধা নীতির বাধা—সব যেন তুচ্ছ করা যায়। আগাছার জঙ্গলের মত সব দুহাতে সরিয়ে সরিয়ে যেন এগোতে পারে শশাঙ্ক। সে তো ছেড়েই দিয়েছিল, সে তো জোর করে ধরে রাখেনি। সে তো বিয়ে করতে নিষেধ করেনি, সে তো নিজে ভুলে গিয়ে ভুলে যাওয়ার পথ আর একজনকে দেখিয়েই দিয়েছে, তবু যদি অভিসারিকা সেই পুরোন পথের গন্ধ চিনে চিনে তার দোরে এসে দাঁড়ায়, তার কাছে এসে হাত পাতে তবে শশাঙ্কের কী দোষ। সে কেন তাকে ফিরিয়ে দেবে?

দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর একটি পলকের জন্যে মন্দিরাকে দেখেছে শশাঙ্ক। না দেখতে দেখতে দেখেছে। সেই একটি দৃষ্টিপাতের সময় এবং দৃষ্টিপাতের পর সমস্ত অসঙ্গতি অশোভনতার সঙ্গে তাকে যে সংগ্রাম করতে হয়েছে তার তুলনা নেই। কিন্তু শশাঙ্ক যা কিছু করুক, যে পথেই যাক, সে

যে একা নয়, সে যে আর নিঃসঙ্গ নয়, তার যে একটি সঙ্গিনী আছে এই বোধ শশাঙ্ককে ভারি তৃপ্তি দিল। দুজনে মিলে যা কিছু করা যায় তার মধ্যেই যেন এক পরম সৌন্দর্য আছে। সমস্ত অন্যায় অসঙ্গতি যেন সেই সৌন্দর্যের কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে যায়।

একটি নারীরূপকে কেন্দ্র করে শশাঙ্কের মন নানা জল্পনা-কল্পনার জাল বুনতে লাগল। বিয়ের পর সাজ-সজ্জায় যে পরিবর্তনটুকু হয়েছে মন্দিরার, শশাঙ্কের মনে হল তাতে তার মধ্যে আরো নতুন রহস্য স্তরে স্তরে জমে উঠেছে। বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই তার দেহে আর মনে যেন আরো পূর্ণতা এসেছে। বিশেষ করে ওর চঞ্চল চপল কিশোরী বোনটির পাশে সবুজ রঙের ক্লোক পরা দীর্ঘাঙ্গী তন্বী মন্দিরাকে পূর্ণযৌবনা নারী বলে মনে হচ্ছিল শশাঙ্কের। একটি পলকে দেখা সেই কাজলকালো আয়ত দুটি চোখের কথাও তার মনে পড়ল। চোখ কি শুধু দেখে? তা দেখায়ও। দুটি চোখ তো শুধু চোখেই নয়, তা মনের প্রতিচ্ছায়া। শশাঙ্ক যদি ভুল না করে থাকে, ভুল করবার তার কথা নয়, তাহলে সেই ঘনপক্ষ্ম দুটি কালো চোখে শশাঙ্ক বাসনার ছায়া দেখতে পেয়েছে। যে বাসনা উদ্রিক্ত হয়েছে অথচ পরিতৃপ্ত হয়নি। বাসনায় বেদনায় লজ্জায় বিষাদে গড়া এমন একটি নারীর কল্পরূপ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল যে পরম আগ্রহে পরম যত্নে রূপের সুবর্ণদীপ হাতে রহস্যলোকের দ্বারের কাছে এসে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। দীপের আলোয় ঘরের শূন্যতা ছাড়া যেন তার আর কিছু চোখে পড়েনি। নতুন ছবির একটি সাবজেক্ট হিসাবে এই মানসচিত্রটি নিজেরই ভালো লাগল শশাঙ্কের। তার মনে হল আবার সে আঁকতে পারবে, অন্তত শুরু করতে পারবে। সৃষ্টির প্রেরণা কোথা থেকে আসে সেটা বড় কথা নয়, সৃষ্টির শতদল তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে ফুটে উঠল কিনা সেইটাই আসল কথা।

অতল রহস্যভরা সেই দুটি চোখের পর মন্দিরার সিঁথির সিঁদুরের কথা মনে পড়ল শশাঙ্কের। আকস্মিক এক একটি রক্তরেখা বাসনাকে যে কী তীব্রভাবে উদ্দীপিত করতে পারে তা শশাঙ্ক আজ যেন নতুন করে অনুভব করেছে। এই রাগরেখাকে মুরারিদা বলেছেন কাঁটার বেড়া। কিন্তু শশাঙ্কের তা মনে হল না। ওই রক্তরাগ যেন একই সঙ্গে নিষেধ আর নিষেধ লঙ্ঘনের আমন্ত্রণ।

মন্দিরার চিঠিখানা আরো একবার পড়ল শশাঙ্ক। প্রতিটি অক্ষর যেন সঙ্কেতে ভরা। রহস্যে মাধুর্যে অভূতপূর্ব। আমন্ত্রণে অভিনব।

পরদিনই অবশ্য মাদকতার ঘোর কাটতে শুরু করল শশাঙ্কের। অবসাদে বিষাদে নৈরাশ্যে মন ভরে উঠতে লাগল। যতবারই সে টেলিফোনটার দিকে এগিয়ে গেল ততবার পিছিয়ে পিছিয়ে এল। না, আর লাভ নেই। যাকে সে ছেড়ে দিয়েছে তাকে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। আর জট পাকিয়ে কোন

লাভ হবে না। তা ছাড়া ফের যদি যোগরঞ্জনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়! গলার স্বর শুনেই তিনি যদি তাকে ধরে ফেলেন, যদি বলেন, 'কী চাই? কাকে চাই? কেন চাই?' শশাঙ্ক নিশ্চিত জানে সঙ্গে সঙ্গে সে জবাব দিতে পারবে না। সে তো আর মুরারিদা নয়। সে যেমন স্পর্শলোলুপ তেমনি স্পর্শকাতর। কিংবা দুটি ভিন্ন ব্যাস বাক্যে স্পর্শকাতর। প্রীতিস্পর্শের জন্যে কাতরতা, অপ্রীতির স্পর্শমাত্রে কাতরতা। মুরারিদার মত মোটা চামড়ার বর্ম তার নেই। থাকলে ভালো হতো। যাদের সেই বর্ম নেই, ঢালও নেই তরোয়ালও নেই, সেই নিধিরাম সর্দারদের এ-পথে আসাই উচিত নয়। তবু কি শশাঙ্ক না এসে পারে? বার বার আসে। শশাঙ্কের মনে হয় যেন দুর্দমনীয় কোন দানবীয় শক্তি তাকে বারংবার এমনি করে পথভ্রষ্ট করে। তার মধ্যে যে সঙ্গতি সামঞ্জস্য শৃঙ্খলাবোধ আছে তা নষ্ট করে দেয়। শশাঙ্ক বার বার নিজেকে উপদেশ দেয়, 'তোমাকে এসব মানায় না। তোমার রুচি তোমার রূপানুভূতি, তোমার সম্মান আর প্রতিষ্ঠা কোন কিছুর সঙ্গে এই প্রবৃত্তি খাপ খায় না।' এই বেখাপ্পা মরচেপড়া তরোয়াল বহনের যন্ত্রণা তাকে কি আজীবন সহ্য করতে হবে?

মুরারিদাকে মাঝে মাঝে ঈর্ষা করে শশাঙ্ক। তাঁর মন দ্বিধাহীন। ফিল্ম লাইনে থাকলেও তিনিও এম.এ. পর্যন্ত পড়েছেন। ছাত্রজীবনে সেরা ছাত্রদের দলেই ছিলেন। পড়াশুনো এখনো ছেড়ে দেননি। নিজের বিষয় নিয়ে তিনি এখনো বইপত্র নাড়াচাড়া করেন। জীবতত্ত্ব যৌনতত্ত্ব দেহতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব তাঁরও চর্চার, চিন্তার বিষয়। তিনি বারবার বলেছেন, 'দেখ শশাঙ্ক, যা শরীরের ব্যাপার তার সঙ্গে মনকে জড়িয়ো না। ও-সব রোমান্স-টোমান্স এনো না। বড় কষ্ট পাবে। ও-সব মন দেয়া-নেয়া অল্প বয়সের জন্যে। কম বয়সেই ও-সব মানায়। তখন একটি মেয়ের মুখে হাসি দেখে চোখে চোখে চেয়ে সুখ, একটু আঁচলের ছোঁয়া লাগল তো পৃথিবী দুলে উঠল। সেই বয়সটাকে বেশি বয়স পর্যন্ত টেনে নিতে নেই। বড় দুঃখ পেতে হয়। ও-সব কান্ডকারখানা দেখে বেশিবয়সীরা হাসে, সমবয়সীরা হাসে, কমবয়সীরাও হাসে। হাসবেই তো। বয়স পেরিয়ে গেলে কি আর calf love মানায়? তখন অন্য প্রক্রিয়া অন্য পদ্ধতি।'

মুবারিদা বলেন, 'ও-সব ভালোবাসাবাসির খেলা একটা বয়সে এসে শেষ করতে হয়। কিন্তু তাই বলে মানুষের ক্রেভিং-এর শেষ হয় না। sex urge অত সহজে মেটে না। তখন প্রকৃতির হুকুম তামিল করে যাওয়াই তোমার কাজ। সেই নিতান্ত নৈসর্গিক ব্যাপারে সমাজ কতকগুলি অনৈসর্গিক বাধা-নিষেধ আরোপ করে রেখেছে। তার নাম দিয়েছে সভ্যতা। সেই বিধিনিষেধ যার সাহস আছে সে হাতে কলমে ভাঙে, হাতুড়ি পিটিয়ে ভাঙে, যার সাহস নেই সে মনে মনে ভাঙে। যে কলাকৌশল, ছলচাতুরি জানে সে চুরি ডাকাতি

করেও সেরে যায়, যে তা জানে না সে ধরা পড়ে। পরের হাতে মার খায়, নিজের হাতেও মার খায়, সবই অজ্ঞানতার মার। ব্যাপারটা যে কী তা যদি আগাগোড়া একবার বোঝা যায় তাহলে এই মারামারির আর প্রশ্ন থাকে না। যেমন খাওয়া শোওয়া ঘুমোন নাক-ঝাড়া থুথু-ফেলা মলমূত্র ত্যাগ করা, এ ব্যাপারটাও তাই। নিতান্তই দৈহিক ব্যাপার। এর সঙ্গে তোমার শিল্প-সাহিত্য কাব্যকলা, দর্শন-বিজ্ঞান চর্চার কোন সম্পর্ক নেই। এর মূলে আছে জীবসৃষ্টি। সেই সৃষ্টি রক্ষার জন্যে প্রকৃতি এক মনোহর মায়ার অবগুণ্ঠন পরেছে। তুমি যদি সেই ঘোমটা না তুলতে চাও, না তুলতেও পার। কিন্তু সেই ঘোমটা মাঝে মাঝে খসে পড়ে বর্ষীয়সীর টাক দেখিয়ে দেবেই। তুমি আঁতকে উঠলেও পার পাবে না। সে তোমার হাত ধরে টানাটানি করবে।'

শশাঙ্ক হেসে বলেছিল, 'তুমি কি কখনো সে টানাটানির পাল্লায় পড়েছ?'

মুরারিদা স্বীকার করেছিলেন, 'পড়েছি বইকি। সবাইকেই পড়তে হয়। মেয়েরা কি কম শয়তান? অথচ ওরা এমন একটা ভাব করে রাখে যেন ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না। মাছ খাওয়া তো দূরের কথা, মাছের গন্ধেই অনেকে নাক সিঁটকায়। যেন সব সেকেলে বামুনের ঘরের বালবিধবা। কিন্তু এ সব বিধবাদের আমি হাড়ে হাড়ে জানি। মজ্জায় মজ্জায় ওরা যে কত বড় মাংসাশী তা আমার জানতে বাকি নেই। অথচ একটু ছুঁতে যাও একেবারে লজ্জাবতী লতা। জাত গেল, জাত গেল। এখনো সেই ভিক্টোরিয়ান যুগের ন্যাকামি ওদের মধ্যে সাড়ে ষোল আনা। মা, অমুকে আমাকে চুমু খেয়েছে, কিছু হবে না তো। মাঝে মাঝে আমার গা জ্বালা করে যাই বলো। অবশ্য দোষ আমাদেরই। আমরাই ওদের জুজুর ভয় দেখিয়ে রেখেছি। এখন সেই ভয় ওরা আমাদের দেখায়। আমরাই অর্থহীন কুসংস্কারে ওদের সুশীলা রক্ষণশীলা করে রেখেছি। এখন রক্ষাচণ্ডীদের হাতের মার আমাদেরই খেতে হয়।'

শশাঙ্ক হেসে বলেছিল, 'চুমু খেলে যে কিছু হয় না, তা আজকাল সব মেয়েই জানে। কিন্তু জানলেই যার-তার সঙ্গে ওরা সে সম্পর্ক রাখবে কেন? ওদেরও নিশ্চয়ই সিলেকসন রিজেকসন আছে। এ ব্যাপারে ওরাও আর্টিস্টের ধর্ম মেনে চলে।'

মুরারিদা বলেছিলেন, 'আর্টিস্ট না কচু। ওরা বড় জোর আর্টিস্টের মডেল হতে পারে। তার চেয়ে বেশি নয়।'

শশাঙ্ক জানে, মুরারিদা ওদের ঘৃণা করেন, অবজ্ঞা করেন আর ভোগ করেন। আর খেঁদি বুঁচিকে তিলোত্তমা না সাজাতে পারলে শশাঙ্কের তৃপ্তি হয় না। হয়তো মুরারিদারই জিত। যেমন জীবনে, তেমনি যৌন-জীবনে ধর্ষণকারী মর্ষণকারী পীড়নকারী পুরুষই পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

তিলোত্তমা সাজানো নিয়েও মুরারিদা কম হাসাহাসি করেন না। তিনি বলেন, ওটাও একটা সাজানো ব্যাপার। তোমার সম্ভোগের এক বিশেষ

পন্থতি। সাজাও, আবার কাজ মিটে গেলে সেই সজ্জা খুলেও ফেলো। বড় করে সাজালেই কি সত্যি সত্যি তাকে বড় করা যায়? জীবনে ক'জনে প্রেয়সীকে সত্যি সত্যি মহীয়সী করে তুলতে পেরেছে বল তো শশাঙ্ক?'

মুরারিদার আলগা মুখ থেকে মাঝে মাঝে এমনি এক একটা মারাত্মক কথা বেরিয়ে পড়ে। আর তার ধাক্কায় শশাঙ্ক ঠিক একেবারে বিপরীত কোটরে গিয়ে পড়ে।

অমনিতে প্রেম আর বাসনার মধ্যে শশাঙ্ক বিশেষ কোন সীমারেখা দেখতে পায় না। অনেক সময়ে এর একটিকে আর একটির নামান্তর বলে তার মনে হয়। একটি আর একটির গায়ে গায়ে মিশে থাকে, একটি আর একটির ছদ্মবেশ পরে। প্রেম আর জৈব কামনার মধ্যে বৈসাদৃশ্য কম, সাদৃশ্যই বেশি। এর কোনটিই দেহ ছাড়া নয়। পবিত্র প্রেমও প্রতিদান চায়। তাও দেহস্পর্শহীন, কামগন্ধহীন হয় না। অন্তত স্বপ্নে কল্পনায় দেহ-সম্পর্ক থেকেই যায়। তবু পার্থক্য আছে। হয়তো গ্রহণের সময় সে পার্থক্য বোঝা যায় না, কিন্তু ত্যাগের সময় তা অনুভূত হয়। শশাঙ্কের মনে হয়, 'আমরা কে কার কাছ থেকে কতটুকু নিতে পারি সে পাথরে নয়, আমরা কার জন্যে কতখানি ছাড়তে পারি সেই কষ্টিপাথরে প্রেমের যাচাই। শুধু যৌন প্রেম নয়, সব রকম হৃদয়গত সম্পর্কের ক্ষেত্রেই এই কথা। সৌখ্য বন্ধুত্ব স্নেহ বাৎসল্য সব সম্পর্কই এই আত্মত্যাগ, আংশিক আত্মবিলোপের দাবি রাখে। নারী-পুরুষের মিলনের যে ভঙ্গি, যে মূর্তি তাও কি এই ত্যাগেরই প্রতীক নয়? আত্মত্যাগের দ্বারা একাত্ম হয়ে যাওয়া? নিজেকে বিলুপ্ত করে আর একজনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, উগ্র অহমিকা আর অহংবোধ থেকে ক্ষণিকের জন্যে হলেও মুক্ত হওয়া? সেই দেহমিলনের চরম ক্ষণে কে বড় কে ছোট, কে পুরুষ কে নারী, কে বিদ্বান কে মূর্খ—কেউ কি মনে করে রাখে? একই সত্তার দুটি খণ্ডাংশ যেন ফের এক সঙ্গে এসে মেশে, এক সঙ্গে ফের জুড়ে যায়। নিতান্ত জৈব মিলনের মধ্যেও দুজনের তৃপ্তি ছাড়া একজনের তৃপ্তি হয় না। দুজনের তৃপ্তিতেই মিলনের সম্পূর্ণতা। ত্যাগ চাই। ত্যাগ আমরা নানাভাবেই করি। টাকা পয়সা খরচ করে স্ত্রীকে কি উপস্ত্রীকে শাড়ি গয়না পরাই, তার অশন বসন বিলাসব্যসনের জন্যে ব্যয় করি। যার যথাসাধ্য, কখনো বা সাধ্যের বাইরেও অর্থের মমতা ত্যাগ করি। কিন্তু তাই কি যথেষ্ট। আরো ত্যাগের জন্যে মন কি আমাদের উৎসুক হয় না? সম্মানে মর্যাদায় যোগ্যতায় ব্যক্তিত্বে প্রেমাস্পদকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা হয় না। তার জন্যে আরো বড় ত্যাগের প্রয়োজন হয়। শুধু অর্থ নয়, অর্থ নয়, আরো শক্তি আরো সামর্থ্য আরো সদিচ্ছা আরো সহানুভূতি আরো স্বত্ব ত্যাগ। প্রিয়াকে আরো উঁচুতে তুলে ধরতে ইচ্ছা হয় না কি? কিন্তু সেই উচ্চাভিলাষ কী করে সম্ভব হবে যদি সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও তুলে নেওয়া না যায়? নিজে উন্নত হলেই তোমার

দ্বারা অন্যের উন্নতি সম্ভব। তুমি যদি প্রিয়কে পেতে চাও, বন্ধুকে পেতে চাও, সেই পাওয়ার যোগ্য হও। নিজের মধ্যে নিজেকে পেতে শেখ।

এমনি উল্টোপাল্টা চিন্তা শশাঙ্ককে বিপর্যস্ত করে। শশাঙ্ক ভাবে, যে যাই মনে করুক, মন্দিরার বিয়ের আগে সে যে সে বিয়ে ভেঙে দেয়নি, মন্দিরার প্রস্তাবে রাজী হয়নি, তার নানা কারণের মধ্যে তার দ্বিধা আর ভীরুতার মধ্যে অস্ফুট অস্পষ্ট ক্ষীণতম একটু সদিচ্ছা হয়তো ছিল। শশাঙ্ক ভেবেছিল মন্দিরা অন্য কোথাও গিয়ে সুখী হয় তো হোক। সেখানে তার নীড়ের স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠুক। বিক্ষিপ্ত উৎকেন্দ্রিক উচ্ছৃঙ্খল শশাঙ্কের গৃহ রচনার শক্তি আর নেই, গৃহসুখে বিশ্বাসও বিলুপ্ত হয়েছে।

তাই তার প্রথম চিঠির জবাব শশাঙ্ক দেয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মন্দিরা যখন নিজে দ্বিতীয় চিঠি হাতে করে নিয়ে এল, ফের চঞ্চল হয়ে উঠল শশাঙ্ক। সেই চিঠির টুকরোসুদ্ধ তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে ভরে রাখবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু তার আর একটি মন বারবার বারণ করতে লাগল, 'না না, আর না। যাকে ছেড়ে দিয়েছ তাকে আর ফের ধরতে যেও না। তাকে দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে। এ খেলা তো অনেক খেলেছ, আর কেন। এবার অন্য খেলা খেল। এবার কাজে মন দাও। সমস্ত রূপ আর রস কি শুধু নারীর মধ্যে? কৃত্যে কৃতিত্বে বিত্তে প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠায় যশে জীবনের বিচিত্র রস পরিব্যাপ্ত। সেই বৃহৎ কর্মক্ষেত্রেই শুধু যৌবন অনন্ত, জীবনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।'

কিন্তু বললে কি হবে। শশাঙ্কের এক মন যখন কথা বলে আর এক মন চুপ করে শোনে। তারপর সেই মন যখন কথা বলে তার কলস্বরে আর কিছুই শোনা যায় না।

বিমনা শশাঙ্ক ভাবে, এই দ্বিমনের কল্পনা আসলে কল্পনাই। মানুষের সম্ভোগের পথ তো একটি নয়। আকাঙ্ক্ষা বহু এবং বিচিত্র। একটির পরিবর্তে আর একটিকে বেছে নিতে ইচ্ছা হয় না। যে কোনটিকেই ছাড়তে মায়া লাগে। অনেক সময় একটিকে আর একটির পরিপূরক ভাবতে ইচ্ছা হয়। শশাঙ্ক ভাবে, 'এই বহু বাসনাই কি আমাদের বহু ব্যক্তিত্ব? আমি প্রতিটি বাসনার মধ্যে ব্যাপ্ত। আমি কাকে রেখে কাকে নির্বাসন দেব?'

চিঠির জবাব দেওয়ার জন্যে শশাঙ্কের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। এবার নিরুত্তর থাকাটা তার আর মনঃপূত হয় না। কিন্তু কী করে জবাব দেবে? মন্দিরা তো ঠিকানা রেখে যায়নি। জবাব হয়তো ও চায় না। যোগাযোগ রাখা হয়তো ওর ইচ্ছা নয়। ছন্দাকে ফোন করে ওর ঠিকানা জানা যায়। কিন্তু যোগরঞ্জন সেই ফোন ধরলেই তো ছন্দপতন হবে। এত ভয় কিসের? শশাঙ্ক নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করে, 'এত ভয় কিসের? তুমি কি জানো না, ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়?'

কিন্তু এ ভয় যেন যোগরঞ্জনকে নয় শশাঙ্কের, এ ভয় তার নিজেকে। নিজের যৎসামান্য সম্ভ্রমবোধকে। এই বোধ নিজের কাছেই অনেক সময় তার দুর্বোধ্য লাগে। তবু এর হাত থেকে যেন তার রেহাই নেই।

সহকর্মী বন্ধু প্রণব সেদিন খুব ঠাট্টা করল, 'কী হল হে শশাঙ্ক? তুমি কি নতুন করে প্রেমেটেমে পড়লে নাকি?'

প্রফেসরদের বসবার ঘরে সেদিন কেউ ছিল না। বন্ধুকে সিগারেট দিল শশাঙ্ক, তারপর লাইটার এগিয়ে ধরে হেসে বলল, 'আমি উঠলাম কবে যে পড়ব?'

প্রণব বলল, 'তা বটে। তবু কি রকম যেন একটু ভাবসাব হয়েছে তোমার। সেই যে তোমাদের সাহিত্যে কী সব বর্ণনা আছে যেন, চোখের কোলে কালি শুকনো ঠোঁট মলিন মুখ। সেই সব লক্ষণ যেন ফের দেখতে পাচ্ছি।'

শশাঙ্ক বলল, 'থাক থাক, ওসব তোমার পক্ষে দেখাও পাপ। কিন্তু তোমার যে দেখাই পাইনে।'

'পাবে কি ভাই, কিছুদিন ধরে বড় ঝামেলাঝক্কির মধ্যে আছি। তুমি ভাগ্যবান মানুষ। এই বয়সেও তোমার প্রেমের বেদনা ছাড়া আর কোন বেদনা নেই। গোলাপের কাঁটা ছাড়া আর কোন কাঁটা নেই। কিন্তু আমাদের জুতোর কাঁটা থেকে শুরু করে গলায় কাঁটা সবই আছে।'

শশাঙ্ক বলল, 'তুমি যদি ইচ্ছে করে কাঁটার মুকুট পরে যীশুখৃষ্ট হও, লোকে কী করবে বল। নইলে অমনিতে তুমিও তো মুক্ত পুরুষ, বিয়ে-থা করোনি, সংসার বন্ধন ছিল না—'

প্রণব চেয়ারটা জানলার ধারে একটু এগিয়ে নিয়ে বসল। আরো দুজন প্রফেসর ঘরে ঢুকে নিজেদের মধ্যে কী যেন আলোচনা শুরু করেছেন। প্রণব তাদের ডিস্টার্ব না করে গলা নামিয়ে বলল, 'বিয়ে না করলেও সংসারের সবই দেখতে হয়। বাড়িতে ছেলেপুলে থাকলে তার হাজার ঝামেলা। অসুখবিসুখ— একটা ওঠে আর একটা পড়ে। এর মধ্যে বউদি আবার সেলস্ এমপোরিয়ামে চাকরি নিয়েছেন।'

'তাই নাকি!'

শশাঙ্কের মনে পড়ল, প্রণবের এই বউদি তাকে একটা শিল্পাশ্রম করবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন।

'হ্যাঁ। আমি বারণ করেছিলাম। কিন্তু শুনলেন না। রঙীন শাড়িটাড়ি পরে যখন অফিসে বেরোন, মনে হয় ঠিক যেন একটি কুমারী মেয়ে। কে বলবে তাঁকে তিন ছেলের মা?'

'তাই নাকি?'

শশাঙ্ক নিজের মনে হাসল। বউদির শাড়ির রঙ তাহলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির

চোখে পড়তে শুরু করেছে।

শশাঙ্ক বলল, 'রঙীন শাড়ি পরতে কোন আপত্তি হল না তাঁর?'

'গোড়ায় আপত্তি ছিল। কিন্তু সেলস্ গার্লের কাজ। ওসব রুক্ষ বেশ-টেশ চলবে কেন। আরো পাঁচটি মেয়ে যা পরে বউদিকেও তাই পরতে হয়। বসেরও তাই ইচ্ছে। Necessity knows no law.'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'Necessity knows only office rules. তারপর? বাড়িতেও কি ওই নতুন পোশাক পরে থাকেন?'

'আরে না না। তা কেন থাকবেন। বাড়িতে এসেই সঙ্গে সঙ্গে শাড়ি পালটে ফেলেন। আমি যেমন ধুতি পাঞ্জাবি ছেড়ে লুঙ্গি পরি। কিন্তু পাড়াটা ভালো না ভাই। বউদির ওই রঙীন শাড়ি পরা নিয়েও নাকি কথা উঠেছে। আমি বলেছি, কান দিয়ো না। বউদিও শক্ত মেয়ে। গ্রাহ্য করেন না কিছু।'

'না করাই উচিত।'

শশাঙ্ক ফের একটু হাসল। প্রণব আর তার বউদির কঠিন জীবন সংগ্রামে তাহলে একটু রঙের ছোঁয়া লেগেছে। কিন্তু শশাঙ্ক এ নিয়ে বন্ধুকে কোন-রকম ঠাট্টা করতে গেল না। ও যা পিউরিটান, ও যা রুচিবাগীশ, হয়তো বা hurt হবে, হয়তো ক্ষেপে উঠবে। শশাঙ্ক ভাবল সর্বত্রই সেই রসের দেবতার খেলা। কোথাও কলস্বরে কোথাও নিম্নস্বরে।

প্রণব বলল, 'তোমার সেদিনের সেই বক্তৃতা শুনতে যেতে পারিনি। ছেলেরা বলেছিল কিন্তু। বললে কী হবে, ভাইপোটির জ্বর। টাইফয়েডের দিকে টার্ন নিয়েছে। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা। বাড়িতে চাকর-বাকর নেই। নিজেই চাকর।'

শশাঙ্ক সিগারেটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে হাসল, 'তা ঠিক। কদাচিৎ আমরা নিজেই নিজের মনিব হতে পারি।'

প্রণব বলল, 'তুমি আজকাল বড্ড বেশি তাত্ত্বিক হয়েছ। ভালো কথা, তোমার সেদিনের বক্তৃতা কিন্তু ছেলেদের খুব ভালো লেগেছে।'

শশাঙ্ক ছেলেমানুষের মতই খুশি হয়ে বলল, 'সত্যি!'

'হ্যাঁ, আমাদের কলেজের দু-তিনটি ছেলে এসে বলে গেল সে কথা। ঘুরে ফিরে তুমিও সেই old values-এর প্রশ্নে এসেছ শশাঙ্ক। আসতেই হবে।'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'It matters little what we say, it matters everything how we say it. হয়তো ধরনটা ওদের ভালো লেগেছে।'

প্রণব মাথা নাড়ল, 'না হে, শুধু ধরন-টরন নয়। বস্তু না থাকলে শুধু ভঙ্গি দিয়ে তুমি কদিন মানুষকে ভোলাবে?'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'তুমি দেখছি এদিক থেকে ঘোরতর বস্তুবাদী।'

প্রণব বলল, 'নিশ্চয়ই বস্তুবাদী। তোমার মত শুধু ফর্মের পূজারী নই।

শুধু ফর্মের নেশা মানুষকে অবক্তব্য কথা বলায়, শুধু ফর্মের নেশা মানুষকে অকর্তব্য কাজ করিয়ে ছাড়ে। রূপসাগরে ডুব দিতে গিয়ে মানুষ কুরূপের সাগরে ডুবে মরে। হাঙ্গর কুমীরের ভোজ্য হয়।'

এ যে কত বড় নির্মম সত্য তা শশাঙ্কের চেয়ে আর বেশি কে জানে। তবু তো নেশা গেল না, আসক্তি গেল না, মায়া গেল না, মোহ গেল না। এক মুহূর্তে গেল না গেল না বলে অনুশোচনা, পরমুহূর্তে গেল গেল বলে আক্ষেপ।

প্রণব বলতে লাগল, 'তুমি কী বলেছ, কী ভেবে বলেছ তুমিই জানো। দু-একটি ছেলে কিন্তু খুব উৎসাহ পেয়েছে, অনুপ্রাণিত হয়েছে। কিছু বক্তব্য না থাকলে এমন হতে পারত না। তোমার বলার চেয়েও ছেলেদের সেই খুশি হওয়া আমার ভালো লেগেছে শশাঙ্ক। ওদের আমি ভালোবাসি, বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি। যুবশক্তি তার সমস্ত ভুলভ্রান্তির ঊর্ধ্বে।'

প্রণব যেন নিজেই অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল। শশাঙ্ক জানে ছাত্রদের মধ্যে ওর জনপ্রিয়তা আছে। ও খেটে পড়ায়। ছাত্রেরা বাড়িতে গেলে ও খুব আনন্দ পায়। সাধ্যমত, অনেক সময় সাধ্যের অতীত, আদর যত্ন করে। পড়াশুনোর ব্যাপারেও ছেলেরা ওর কাছ থেকে খুব সাহায্য পায়। শশাঙ্ক জানে ছেলেরা ওকে ভালোবাসে। শুধু বক্তা হিসাবে ভালোবাসে না, মানুষ হিসাবে ভালোবাসে।

মুরারিদার কথা মনে পড়ল শশাঙ্কের। তাঁর তীব্র সমালোচনার কথা মনে পড়ল। শশাঙ্কের কথা শুনে তিনি নাকি শুধু হেসেছেন। আবার সেই হাস্যকর বাক্যপুঞ্জই কোন কোন শ্রোতার মনকে খুশিতে ভরে দিয়েছে। মুরারিদা সেদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'আমি যা বলছি তাই করো, আমি যা করছি তাই কোরো না।'

বক্তার বাক্য আর কর্মের মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে তিনি তাকে বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছিলেন।

কিন্তু বাক্যের কি সত্যিই তেমন কোন আলাদা শক্তি নেই? শশাঙ্ক অবশ্য শিল্পী নয়, স্রষ্টা নয়। নিতান্তই একজন বক্তা। কলেজের মাস্টার। কিন্তু যাঁরা অসাধারণ তাঁদের বাক্য কি নিজেই এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নয়? তা কি বক্তার দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন-নিরপেক্ষ নয়? যে কোন মহৎ সৃষ্টিই তাই। সে নিজেই যেন এক স্রষ্টা। স্বয়ম্ভূ।

নিজের সেই বক্তৃতা-প্রসঙ্গ আরো একজনের মুখে শুনতে পেল শশাঙ্ক। সপ্তাহখানেক বাদে একদিন সকাল বেলায় নিশিবাবু শশাঙ্কের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। তারই মধ্যে এসেছেন। পুরোন ছাতাটি দেয়ালে সযত্নে ঠেস দিয়ে সামনের চেয়ারটায় আরাম করে বসে নিয়ে বললেন, 'নমস্কার শশাঙ্কবাবু। চিনতে পারছেন? আলাপ করতে এলাম। চিনতে পারছেন তো?'

শশাঙ্ক স্মিতমুখে হেসে প্রতি-প্রশ্ন করে বলল, 'নিশ্চয়ই। একথা বারবার জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'কত লোকের সঙ্গে আপনাদের রোজ দেখা সাক্ষাৎ হয়, সবাইকে মনে করে রাখা সম্ভব হয় না। তাই একটু যাচাই করে নিলাম। আমরা সেইদিনই সন্ধ্যার পর এসেছিলাম। কতক্ষণ বসে রইলাম। দেখা হল না আপনার সঙ্গে।'

শশাঙ্ক বলল, 'আমার দুর্ভাগ্য।'

নিশিবাবু বললেন, 'সেদিন আসা হতো না। মেয়ে দুটোর জ্বালায় অন্য কাজ কর্ম ফেলে আসতেই হল। কাজকর্ম আর কি। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করে বেড়ানো। দুনিয়ার আর সব কাজ থেকে ছুটি নিয়েছি মশাই।'

শশাঙ্ক স্মিতমুখে চুপ করে রইল।

নিশিবাবু বলতে লাগলেন, 'মেয়ে দুটোর জ্বালায় না এসে পারলাম না। মন্দিরার কিছু কেনাকাটা ছিল। মেয়েরা বেরোলে ওসব তো থাকেই। কোন দরকার না থাকলেও ওরা কিছু না কিছু কিনবেই। মেয়েদের আপনি কতটুকু চেনেন জানিনে শশাঙ্কবাবু, কিন্তু আমি যতটুকু দেখেছি ওরা হল জাত বস্তু-বাদিনী। জিনিসপত্তর এত ভালোবাসে যে বলবার নয়। আমার তো ধারণা ওরা না থাকলে আমরা পুরুষরা একেবারে খালি ঘরে থাকতাম। আমি অবশ্য তাই থাকি।' একটু হাসলেন নিশিবাবু।

শশাঙ্ক বলল, 'কেন, আপনার স্ত্রী—'

নিশিবাবু তেমনি হেসেই বললেন, 'স্ত্রী আর কোথায় মশাই? ওসব হয়নি।'

'বিয়ে করেননি?'

'না। সে সময় আর হয়ে উঠল না।'

'কেন?'

'সে আর একদিন বলব। আচ্ছা আজই না হয় একটু বলে রাখি। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করব না এই ছিল প্রতিজ্ঞা। অল্প বয়সের মতিগতি বুঝতেই পারেন। তারপর স্বাধীন হতে হতে বয়েস পেরিয়ে গেল। চুল পেকে গেল। তখন ভাবলাম, আর কেন ফের পরাধীন হই। এই বেশ আছি।'

শশাঙ্ক রামেশ্বরকে ডেকে চা দিতে বলল।

নিশিবাবু বললেন, 'শুধু চা মশাই, আর কিন্তু কিচ্ছু না।'

'কেন?'

'চলে না। আগে যা-তা খেয়ে হজম করেছি। এখন রাজভোগও আর সহ্য হয় না। যাক, আমার গল্প পরে শুনবেন। আগে আপনার কথা শুনি। সেদিন মেয়েদের তো নিয়ে এলাম। কিন্তু আসবার সময় আর বেরোবার সময় মেয়ে দুটো ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, মামাবাবু, এখানে যে এসেছিলাম কাউকে

বলবেন না। আমি বললাম, কেন রে। তোরা যদি আসতেই পারলি আমি বলতে পারব না কেন। ওরা বলল, না মামাবাবু আপনার পায়ে পড়ি। মেয়েদের ব্যাপার ওরাই জানে। আমি আর বেশি পীড়াপীড়ি করলাম না। কাউকে বলিওনি। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো।'

শশাঙ্ক একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'ব্যাপার আর কি?'

নিশিবাবু বললেন, 'মন্দিরা যাওয়ার আগেও পই পই করে নিষেধ করে গেছে, মামাবাবু কাউকে বলবেন না। আপনি যেন আবার বলে দেবেন না· শশাঙ্কবাবু যে, আপনাকে বলেছি। বেশ লাগে মশাই, ওদের এই ছেলেখেলা, ওদের এই রঙ্গকৌতুক মান-অভিমান, ওদের এই গোপন ষড়যন্ত্র দেখতে বেশ লাগে। দূর থেকে দেখি আর হাসি। ওদের সিরিয়াসনেস দেখলে কার হাসি পায় না বলুন তো?'

শশাঙ্ক কিন্তু তেমন করে হাসতে পারল না। ঠোঁটে একটু হাসি টেনে নিয়ে যেন হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়া একটা তুচ্ছ কথার মত জিজ্ঞাসা করল, 'মন্দিরারা কোথায় গেছে?'

নিশিবাবু বললেন, 'কেন, সেদিন যে চিঠি লিখে গেল। তাতে জানায়নি ঠিকানা?'

'না। তাতে কোন ঠিকানা ছিল না।'

নিশিবাবু বললেন, 'ওদের ওই আর এক দোষ। আমার কাছে মেয়েদের যত চিঠি আসে মশাই, তার বারো আনি চিঠিতে কোন ঠিকানা থাকে না। ভাবখানা এমনি যেন প্রত্যেকেই এক একজন স্বনামধন্যা মহারানী। ওদের নাম দেখলেই পোস্টাল ডিপার্টমেণ্ট ওদের চিনে ফেলবে। আর পোস্ট-মাস্টার জেনারেল নিজে হাতে করে ওদের চিঠি বয়ে নিয়ে আসবে। কেউ কেউ বলে, আমরা আগের ঠিকানাতেই তো আছি, আপনার মনে নেই সে ঠিকানা? আমি বলি, আরে অত মুখস্থশক্তিই যদি থাকবে তাহলে তো কেষ্ট-বিষ্টুই হতুম। দিন মশাই, এক টুকরো কাগজ দিন তো। মনে থাকতে থাকতে ওর ঠিকানা লিখে দিই আপনাকে। সে আবার অল্পস্বল্প নয়। দেড়গজী ঠিকানা।'

ঠিকানা লিখে শশাঙ্কর হাতে দিলেন নিশিবাবু।

শশাঙ্ক টেবিলের ওপরে টুকরো কাগজটুকু চাপা দিয়ে রাখল। যেন কোন গরজ নেই দেখবার।

নিশিবাবু বললেন, 'আমাকে অনেক করে বলে গেছে, যাবেন মামাবাবু। কোথায় ঠেলে পাঠালেন একবার গিয়ে দেখে আসবেন। কথার ভঙ্গি দেখুন। ঠেলে পাঠানো আবার কি রে। স্বামীর ঘরে যাচ্ছিস। এমন সুখের ঘর আর আছে নাকি? মেয়েদের স্বর্গ। তবে মশাই ওরা ওইরকম বলে, ডাইনে যদি যায় বলে বাঁয়ে যাচ্ছি। বাঁয়ে গেলে বলে ডাইনে। আজকাল ওরা ঘোমটা পরে না। মুখখানি খোলাই থাকে। তাই বলে ভাববেন না, মনটাকেও ওরা খোলা-

মেলা করে রাখে। ওরে বাবা! আমার তো মনে হয় আজকালকার মেয়েদের লুকোবার বিদ্যে আরো বেড়ে গেছে। ওরা কথা দিয়ে কথা ঢাকে, মুখের হাসি দিয়ে কথা ঢাকে, চোখের জলে সব ভুলিয়ে দেয়। যাদুকরীর জাত মশাই। আপনি পাঁচ বছর বয়সের একটি মেয়ের মনের কথা যদি একবারে বার করতে পারেন, আমি আপনাকে পাঁচ টাকার রসগোল্লা খাওয়াব।'

হঠাৎ শশাঙ্ক বলল, 'আচ্ছা নিশিবাবু, আপনি কোন ছলনাময়ীর পাল্লায় কোনদিন পড়েছেন!'

'আমার এক নাতনী—ঠিক পাঁচ বছর তার বয়স—'

'না না, নাতনীর কথা জিজ্ঞাসা করছিনে। নাতনীর ঠাকুরমা হতে পারতেন এমন কেউ—'

নিশিবাবু একটু যেন লজ্জিত হলেন। বৃদ্ধের মুখে কুমার কিশোরের অপরূপ লজ্জা দেখতে পেল শশাঙ্ক।

নিশিবাবু বললেন, 'শুনলেন তো বিয়ে-থা করিনি।'

'বিয়ে-থার বাইরে—'

নিশিবাবু একটু যেন থমকে গেলেন। গম্ভীর হয়ে গেলেন এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর আগের মতই স্নিগ্ধ হাসিতে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, 'না মশাই, সৌভাগ্যই হোক দুর্ভাগ্যই হোক, ওসব কিছু আমার জীবনে ঘটেনি। কিন্তু ওসব না পেয়েও ঠকেছি বলে তো মনে হয় না। প্রচুর মাতৃস্নেহ পেয়েছি, দিদিদের বোনদের ভালোবাসা পেয়েছি। ছেলেমেয়ে নেই। কিন্তু পরের ছেলেমেয়েরা নিজের বাপের চেয়েও শ্রদ্ধা করেছে, ভালোবেসেছে। আমার কোন অভাব নেই শশাঙ্কবাবু।'

আবেগে আপ্লুত বৃদ্ধের দুটি চোখ একটু কি সিক্ত হয়ে উঠল?

নিশিবাবু বললেন, 'যাক ওসব। আপনার বক্তৃতাটা কিন্তু সেদিন বড় ভালো লেগেছিল। নীতির অমন ব্যাখ্যা—'

কিন্তু নিজের বক্তৃতার সমালোচনায় শশাঙ্কের তখন আর কোন মন ছিল না।

॥ ১১ ॥

কোয়ার্টার যেমন চেয়েছিল মিহির ঠিক সেই রকমই পেয়েছে। সব কাম্য বস্তু মানুষ পায় না, কিন্তু কিছু কিছু পায়। মিহির চেয়েছিল জায়গাটা যেন নির্জন হয়, বেশি প্রতিবেশী না থাকে। আফিসে খাদে সারাদিন তো লোক-জনের ভিড়ের মধ্যেই কাটে। কিন্তু বাকি সময়টুকু যেন নিরিবিলিতে আপন মনে বাস করতে চায় মিহির। জন মানে তো আর জনতা নয়। বরং প্রিয়জনকে আপনজনকে মানুষ যেন জনতার মধ্যে হারিয়ে ফেলে। কলকাতার ট্রামে-বাসে

যাতায়াত করবার সময় দেখেছে মিহির, প্রত্যেকেই মনে করে সেই শুধু ব্যক্তি; আর সব জনতা। আর সেই জনতা তার মিত্র নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী। মানুষকে ভালোবাসবার জন্যেই এই ব্যবধানটুকু দরকার। তার কোন কোন বন্ধু সমষ্টিচেতনার ওপর বড় বেশি জোর দেয়। এই বিরাট মনুষ্যসমাজ গীতার সেই বিশ্বরূপের মত যেন প্রকাণ্ড এক পিণ্ড। একই দেহ, একই মন। শুধু কোটি কোটি চোখ, কোটি কোটি মুখ, কোটি কোটি হাত-পা। মিহির তাদের এই উগ্র সমাজবোধে হাসে। মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যে সেও বিশ্বাস করে। সে ঐক্য একাকার হয়ে যাওয়া নয়। ভিন্ন আকার ভিন্ন প্রকার বজায় রেখেও যে মিল সেই মিলই মিহিরের কাম্য। সেই মিল ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির মিল। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে বন্ধন, সে বন্ধন দড়ির বাঁধন নয়, প্রীতির বন্ধন, সুরের বন্ধন।

একটি চাকরের সাহায্য নিয়ে ঘর-দোর মিহির প্রায় নিজেই গুছিয়ে তুলল। বাবার কর্মতৎপরতার অন্তত কিছুটা সে পেয়েছে। ছাত্র-জীবন কেটেছে অর্থকৃচ্ছ্রতায়। সেই কষ্ট মিহিরকে স্বাবলম্বী হতে শিখিয়েছে। তার কোন কোন বন্ধু শুধু মানসিকভাবে বাঁচে। যেন শুধু তাদের মনই আছে দেহ নেই। মিহির বলে, 'শরীরের যা করবার আছে তাকে তা করতে দাও। সমস্ত শরীরকে মনের মত সূক্ষ্ম চিন্তাযন্ত্র করে তুলো না।'

মিহির নিজের হাতে নিজের বোঝা বইতে পারে, বন্ধুর সুটকেসটাও হাতে তুলে নিতে দ্বিধা করে না। কুলি চাকর না খাটিয়ে নিজের কাজ নিজের হাতে করে সে আনন্দ পায় বেশি। কেউ কেউ মনে করে কার্পণ্য। কেউ বা বলে, 'তুমি কি সমাজকে শ্রমের মর্যাদা শেখাচ্ছ?'

মিহির জবাব দেয়, 'কাউকে কিছু শেখাবার ক্ষমতা আমার নেই, হয়তো অধিকারও নেই। কিন্তু মানুষ সব সময় নিজেকে নিজে শিক্ষা দিতে পারে।'

বিশাখা প্রথমে সঙ্গে আসতে চেয়েছিল। বলেছিল, 'দাদা, আমি যাই তোমার সঙ্গে। তোমার বাসাটা সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়ে আসি, বউদি একা পেরে উঠবে না।'

মিহির রাজী হয়নি। বলেছিল, 'উঁহু, এখন গেলে তোর পড়াশুনোর ক্ষতি হবে। আমরা আগে গুছিয়ে-টুছিয়ে তুলি। তারপর হোস্টেসের চিঠি পেয়ে তুই যাবি।'

বিশাখা বলেছিল, 'বটে! দেখেছ বউদি, বিয়ে করবার সঙ্গে সঙ্গে দাদা কিরকম পর হয়ে গেছে। বিয়ে করবার আগে শাখিকে ছাড়া দাদার একটি দিনও চলত না, ফাই-ফরমায়েস খাটতে খাটতে আমার দিন যেত। এখন দাদার সংসারে আমি আর মেম্বার নই, শুধু গেস্ট।'

মিহির বলেছিল, 'চীফ গেস্ট।'

ভাই-বোনের এই মধুর ছদ্ম কলহে মন্দিরা অংশ নেয়নি, মিহির লক্ষ্য

করেছে। লক্ষ্য করে দুঃখিত হয়েছে আহত হয়েছে। মুহূর্তের জন্যে তার মন বিরূপও হয়ে উঠেছে। কিন্তু একটু বাদে নিজের সেই অসহিষ্ণু বিরূপতাকে দমনও করেছে মিহির। মনে মনে ভেবেছে, আসল কলহে চিত্ত যার আচ্ছন্ন, ছদ্ম কলহে তার আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক। সেই সঙ্গে এও তার মনে হয়েছে, এই যে ছোট ছোট হাসি-কৌতুক ঠাট্টা-পরিহাস, এর সঙ্গে মন্দিরা যদি যোগ দিতে পারত তাহলে মিহিরদের পরিবারের সঙ্গে ওর আত্মীয়তা সহজ হতো। ও নিজেও সুখী হতো, পাঁচজনকেও সুখী করতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরা গোত্রান্তরিতা হয়নি। পুরোহিত ঠাকুর যতই গোত্রান্তরের দক্ষিণা নিন না কেন, তিনি তা করতে পারেননি। তিনি শুধু মন্দিরার পদবী পালটে দিয়েছেন। চাটুয্যেকে মুখুয্যে করেছেন। আসল রূপান্তরের ভার মিহিরকে নিজের হাতে নিতে হবে। তা হয়তো দু-চার ছ' মাসে হবে না। তার জন্যে দু-চার ছ' বছর যদি লেগে যায় উপায় নেই। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে মিহিরকে। শুধু নিষ্ক্রিয় অপেক্ষা নয়, নিজের হাতে পথ তৈরি করে নিতে হবে।

সেই পথ বাঁধার প্রথম প্রয়াস এই ঘরবাঁধা। মিহির জানে সে যে স্ত্রীকে কোয়ার্টারে নিয়ে এসেছে, বাবা মা তা খুব প্রসন্ন মনে নিতে পারেননি।

বাবা পরিষ্কারই বলেছেন, 'কী দরকার ছিল এখনই একটা আলাদা এস্টাবলিশমেণ্টের। আসানসোল তো এখান থেকে ন'শো পঞ্চাশ মাইল দূরে নয়। লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী নয়। তুমি ইচ্ছে করলেই সপ্তাহে সপ্তাহে আসতে পারতে।'

মা বলেছিলেন, 'তোমার বউকে কি আমরা কোন অযত্ন অনাদর করি? খাওয়া-পরায় কষ্ট দিই?'

মিহির হেসে বলেছিল, 'তা কেন দেবে মা? দুর্নামের ভয় নেই?'

মা রাগ করেছিলেন, 'শুধু দুর্নামের ভয়? অন্তরের টান নেই আমার? ছেলে হয়ে এই কথা বললি তুই?'

মিহির প্রতিবাদ করেনি। সে মনে মনে জানে মন্দিরার সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক এ'দের কারোরই হয়নি। স্ত্রীকে ওইভাবে ফেলে রাখলে কোন দিন তা হবেও না।

শুধু নীরস কর্তব্য ওর ওপর চাপিয়ে দিলে তা শুধু দুর্বহ বোঝা হয়েই থাকবে। তার চেয়ে স্বামীকে যদি ভালোবাসতে শেখে মন্দিরা তাহলে আস্তে আস্তে তার বাবা-মাকেও ভালোবাসবে। তখন একটি প্রীতির ধারা সহস্র মুখে উৎসারিত হবে। তার আগে মন্দিরার কাছে সব শুকনো, জলহীন জলাধার।

কিন্তু এ-সব ছাড়াও কলকাতা থেকে মন্দিরাকে সরিয়ে আনবার আরো একটি কারণ আছে। সেই গোপন কারণটুকু মিহির বাবা-মাকে বলেনি, অন্তরঙ্গ

কোন বন্ধুকে বলেনি, এমন কি বিশাখাকেও তা জানায়নি। সব সময় নিজের কাছেও তা স্বীকার করতে কুণ্ঠা হয়েছে মিহিরের। তার ধারণা—তার আশঙ্কা কলকাতায় থাকলে মন্দিরা পূর্বস্মৃতি ভুলতে পারবে না। শুধু কি স্মৃতি? শুধু কি অতীত? মন্দিরা কি সেই সম্পর্ককে তার বর্তমান জীবন পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসেনি? মন্দিরা কি তার পবিত্র দাম্পত্য শয্যাকে সেই চিন্তায় সেই ধ্যানে কলঙ্কিত করেনি? মন্দিরা যখন আনমনা হয়ে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, ডেকে ডেকেও যখন তার সাড়া মেলে না, মিহিরের কি বুঝতে বাকি থাকে তার স্ত্রী কার কাছে আছে? কার কথা ভাবছে? তখন ঈর্ষায় ঘৃণায় তীব্র বিদ্বেষে বুকের মধ্যে নরকের আগুন জ্বলতে থাকে। নিজের ভিতর থেকে সেই কালো কুৎসিৎ কাফ্রী ওথেলো বেরিয়ে আসতে চায়। দুটি হাত নিসপিস করে। অতি কষ্টে সেই হিংস্র বর্বর রোমশ দুখানি হাতকে সভ্যতার শিকল পরিয়ে বেঁধে রাখে মিহির। যুক্তি দিয়ে, বিচার-বিবেচনা দিয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে শান্ত করে।

লোকটি যে কে, তা এতদিনে জানতে পেরেছে মিহির। মন্দিরা বলেনি, মিহির নিজেই খোঁজ নিয়ে বার করেছে। জানতে পেরে আশ্চর্য হয়েছে, আহত হয়েছে, একটা অপরিসীম ঘৃণাও বোধ করেছে মিহির। কমবয়সী চারুদর্শন, মেধাবী মধুর ব্যক্তিত্বের কোন যুবক মন্দিরার প্রণয়ী নয়। শশাঙ্ক সেনের মত একজন প্রৌঢ় নামে-মাত্র-ভদ্রলোক তাকে দখলে রেখেছিলেন। বক্তা হিসাবে শিক্ষিত সংস্কৃতিবান বিদগ্ধ ব্যক্তি হিসাবে তাঁর যত নামই থাকুক, নারীঘটিত দুর্নামেরও তাঁর অন্ত নেই। মন্দিরা শেষ পর্যন্ত তাঁর খপ্পরে গিয়ে পড়েছিল। আশ্চর্য! মিহিরের প্রতিদ্বন্দ্বী যদি তারই সমবয়সী সচ্চরিত্র যুবক হতো তাহলে সমানে সমানে বুঝতে পারত মিহির, সমানে সমানে যুঝতে পারত। এমন কি সেই পবিত্র প্রেমের মর্যাদা রাখতে নিজেকে হয়তো সরিয়েও আনতে পারত। সেই আত্মত্যাগের একটা অর্থ হতো। কিন্তু যেখানে শুধুই বিকৃত কামনার লীলা বহুবল্লভ পুরুষের ছলনা আর চাতুর্যের খেলা, সেখানে নীতি স্বীকার মানে কাপুরুষতা। প্রবল প্রতিরোধই সেখানে পুরুষের কাজ। অবুঝ মেয়েকে যেমন শাসনে রাখতে হয়, অবুঝ স্ত্রীর প্রতিও তেমনি কঠোর হওয়া দরকার। স্বামী তো শুধু সখাই নয়, অল্পবুদ্ধি নারীর শাসক পালকও।

শশাঙ্কের মত একজন কামুক বহুবল্লভ পুরুষ মিহিরের স্ত্রীকে ছুঁয়েছে, আদর করেছে—এই চিন্তা-কল্পনা তাকে পীড়িত করে। ঈর্ষা-বিদ্বেষের চেয়ে ঘৃণাই যেন বেশি জাগিয়ে দেয়। সেই স্পর্শ যেন মন্দিরার অঙ্গে অঙ্গে অদৃশ্য দূষিত ক্ষতচিহ্ন হয়ে রয়েছে। একবার ডাক্তার দিয়ে স্ত্রীকে পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে দরকার হলে চিকিৎসা করাবার কথাও ভেবেছিল মিহির। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতদূর আর এগোয়নি। ঠাণ্ডা মাথায় বৈজ্ঞানিকের যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে মিহির ব্যাপারটাকে আগাগোড়া ভেবে দেখতে চেষ্টা করেছে। যাতে ঈর্ষা আর

বিদ্বেষ তার মাথা খারাপ না করে দেয়, তার সমস্ত কাজকর্ম আর কর্মশক্তি পঙ্গু না করে বসে, সেই জন্যেই এই যুক্তির আশ্রয় দরকার। মিহির তো আর তার বাবা-মা'র মত গোঁড়া অর্থহীন, কখনো বা হৃদয়হীন রক্ষণশীল নয়। পথের কুকুর এসে হাঁড়িতে মুখ দিয়েছে, হাঁড়িটাকে নর্দমায় ফেলে দিয়ে নতুন হাঁড়ি কিনে নিয়ে এসো—এই ছিল যাঁদের বিচার। মিহির কোন মেয়েকে মাটির হাঁড়ি বলে মনে করে না, সোনার হাঁড়িও নয়। নারী নির্জীব বস্তু মাত্র নয়, সে প্রাণময়ী। আর যার প্রাণ আছে তারই দোষত্রুটি ভুল-ভ্রান্তি আছে। সেই ভুল কখনো কঠিন শাসনে, কখনো স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে শুধরে দিতে হয়। এমনি করে নিজের ভাইবোনকে কি শোধরায়নি মিহির, বন্ধুদের শোধরায়নি? তাদের হয়তো ছোটখাটো ভুল ছিল। ভাষার ভুল, ব্যাকরণের ভুল, আচরণের ভুল ছিল। মন্দিরা না হয় আর একটু বেশি ভুল করে ফেলেছে। বেশি? মিহির মাঝে মাঝে ভাবে, 'আমরা নারীর দৈহিক শুচিতার ওপর বড় বেশি গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, বুদ্ধির ভুলে হোক, প্রলোভনে পড়ে হোক, কোন মেয়ে যদি একবার কি একাধিকবার কোন পুরুষকে দেহ দান করল তো তার জাত গেল। এক সময় সমাজ এত রক্ষণশীল ছিল যখন ধর্ষিতা মেয়ে, স্খলিতা মেয়ের কুলে জায়গা হতো না, পরিবারে জায়গা হতো না। তাকে পতিতালয়ে গিয়ে মাথা গুঁজতে হতো। আজকালকার সভ্য মানুষ অনেক সহনশীল হয়েছে। আরো হবে। বিজ্ঞানের প্রসার যত বাড়বে, নিজের কাছে নিজের দেহের রহস্য, মনের রহস্য আরো যত উদ্‌ঘাটিত হবে, তত মানুষের সহনশীলতা বাড়তে থাকবে। মানুষ তখন বুঝতে শিখবে, মহাভারতের মত মহাজীবন কখনো অশুদ্ধ হয় না। এখন যে অর্থে দেহের শুচিতাকে শুচিতা বলা হয়, সেই অর্থ শুনে মানুষ হাসবে। তখন স্বাস্থ্যই হবে শুচিতার একমাত্র লক্ষণ। এই দেহকে দেহ-বিজ্ঞানী, চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর হাতে সঁপে দিয়ে মানুষ নিশ্চিন্ত থাকবে। মরাল কোডের নামে হাস্যকর মরচেপড়া লোকাচার দিয়ে তাকে পদে পদে বেঁধে রাখবে না। আর মনের শুচিতা? তাও ভেবে দেখেছে মিহির। নিজের মনকে চিরে চিরে বিচার করে অন্যের মনকে যাচাই করেছে। এই নিত্যচঞ্চল মন স্থায়ীভাবে কাকে কতটুকু ধরে রাখতে পারে? এই মন কি নদীর চঞ্চল স্রোতের মত নয়? তাতে কত মুখের ছবি পলকে পড়ে পলকে মিলিয়ে যায়। কত ভাবের মূর্তি তাতে রেখাপাত করে, আবার সে রেখা মুছে যেতেও দেরি হয় না। কত সম্পর্কের অদল-বদল হয় সেখানে, কত আবেগ শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কত নতুন আবেগ জন্মলাভ করে। এই ছাব্বিশ বছর বয়সের মধ্যেই মিহির কত সম্পর্কের জন্ম-মৃত্যু দেখল, নিজের মনে কত ধারণার কত আদর্শের রূপান্তর দেখল তার ঠিক নেই। বরং দেহকে ধরাছোঁয়া যায়, মন—মাঝে মাঝে মনে হয় মিহিরের, মন ধরাছোঁয়ার বাইরে। অন্তত বজ্রমুষ্টিতে তাকে ধরবার উপায় নেই। সেই শক্ত মুঠিতে

একজনের কবজী ধরা যায়, ঘাড় ধরা যায়, মনকে ধরার কৌশল আলাদা। এই স্পেশালাইজেশনের যুগে দেহকে চিকিৎসকের হাতে, মানুষের যত অঙ্গ যত প্রত্যঙ্গ তত প্রকারের চিকিৎসকের হাতে, আর মনকে মনোবিজ্ঞানীর হাতে সঁপে দিয়ে নিজের মনে মানুষের নিজের কাজ করে যাওয়া উচিত। মন নিয়ে বেশি মাথা ঘামালে মাথাই শুধু বেশি ঘামবে আর কোন কাজ হবে না। নিজের মন সম্বন্ধে যে কথা, স্ত্রীর মন সম্বন্ধেও তাই। স্ত্রীর মনে কি হচ্ছে না হচ্ছে, সেখানে কার মুখের ছায়া পড়ছে না পড়ছে, নিজের মনকে যদি তাই নিয়েই সর্বদা ব্যাপৃত রাখে মিহির, জীবনে অন্য কাজ করবে কখন? পদোন্নতির কথা ভাবতে হবে না? ম্যানেজারশিপের পড়া পড়তে হবে না? সে কি চিরকালই আন্ডার ম্যানেজার হয়ে থাকবে? দেহের শুচিতার যদি কোন অর্থ না থাকে মনের শুচিতারও কোন অর্থ নেই। ভালোবাসার ব্যাপারে অর্থ নেই। এই মনকে আমরা যতটুকু নিজের মন দিয়ে বুঝতে পারি তাতে মনে হয়, এই মনও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক জটিল দেহযন্ত্র। দেহের যা নিয়ম মনেরও সেই নিয়ম। মনও বস্তুজগতের অধীন। মনও বস্তুনিয়ন্ত্রিত, আদর করে তাকে বড় জোর পরম বস্তু বলা যায়। দেহ অসুস্থ হলে যেমন তাকে সুস্থ করে তোলা যায়, মন অসুস্থ হলেও তেমনি তাকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব। শুচিতা অশুচিতা নয়, স্বাস্থ্য আর অস্বাস্থ্যের প্রশ্ন। মন্দিরার মনের স্বাস্থ্য যদি নষ্ট হয়ে থাকে তা উদ্ধার করবার দায়িত্ব মিহিরের। সেই দায়িত্বকে কঠোর কর্তব্য বলে মনে করলে চলবে না। বরং আট ঘণ্টা ডিউটি দেওয়ার অবসরে তাকে যদি রিক্রিয়েশন বলে মেনে নিতে পারে মিহির, তাতেই কাজের কাজ হবে। এই মন অপরিবর্তনীয় নয়। পরিবেশের অধীন। বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন ব্যক্তির, বিভিন্ন বিষয়, আর বইয়ের সংস্পর্শে এসে একই মনের কত ভাবান্তর রূপান্তর হয় তা কি জানে না মিহির? মন্দিরার মনকেও ঠিক তেমনি করে বদলাতে হবে। নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস আছে মিহিরের। ঈশ্বর-বিশ্বাসের বদলে এই আত্মবিশ্বাস শিক্ষা দেয় বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের কাছ থেকে মানুষ শুধু তথ্যই নেবে না, শুধু দুহাতে ভোগের উপকরণই গ্রহণ করবে না, তার কাছ থেকে নেবে যুক্তি বুদ্ধি, স্থিরতা ধৈর্য। বিজ্ঞানের কাছ থেকে নিতে হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি।

বিয়ের পর থেকে অনেক বিষণ্ণ মুহূর্তে একা একা এ-সব কথা ভেবেছে মিহির। নিজেকে যখন প্রতারিত, প্রবঞ্চিত মনে হয়েছে, নিজের উপলব্ধি যখন নিজের ওপর ধিক্কার এসেছে, মিহির নিজের যুক্তিবুদ্ধির মধ্যেই নিজের সান্ত্বনা খুঁজেছে। কয়লার খনির অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে টর্চ ফেলে ফেলে যেমন এগিয়ে যায় মিহির, তেমনি ঈর্ষাদ্বেষ, চিরাচরিত সংস্কার, আত্মীয়-বন্ধুর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভয়ের তিমিরাচ্ছন্নতার মধ্যে একটি ক্ষীণ যুক্তির দীপশিখা ধরে সে এগোতে চেষ্টা করে। যুক্তি ছাড়া তাকে আর কে পথ দেখাবে? এতদিন তো

আলাদা কোয়ার্টার ছিল না। মেসের ঘরে রুমমেটদের সঙ্গে শরিকিয়ানায় একটি তক্তপোষ, একজোড়া টেবিল-চেয়ার একটি বইয়ের শেলফ আর একটি জানালা ভাগে পড়েছে। মাইনিং-এর বই ছাড়াও লুকিয়ে লুকিয়ে মিহির এমন সব বই জোগাড় করে এনেছে যে-সব বিষয়ে তার কোন দিন কোন কৌতূহল ছিল না। তার টেবিলে তার শেলফে মনোবিজ্ঞান যৌনবিজ্ঞানের বই দেখে অবাক হয়েছে সহকর্মী, সহকক্ষী বন্ধু নীতীশ। ঠাট্টা করে বলেছে, 'ব্যাপার কি। বিয়ের পর থেকে তোমার জ্ঞানতৃষ্ণা যে ক্রমেই বেড়ে চলল?'

জ্ঞানতৃষ্ণা নয়, প্রাণের দায়ে রাত জেগে ও-সব বই পড়েছে মিহির। একটি মেয়ের মনকে বুঝবার জন্যে বইয়ের পর বইয়ের পাতা উলটে গেছে। একটি মেয়ের দেহরহস্যকে জানবার জন্যে বইয়ের পর বই পড়ে চলেছে। পড়তে পড়তে ভুলে গেছে নিজের উদ্দেশ্যের কথা। তখন তার বৈজ্ঞানিক মনের কাছে জানার কৌতূহলই বড় হয়ে উঠেছে। জ্ঞান। জ্ঞানের তুল্য কিছু নেই। যে কোন বস্তুর যে কোন বিষয়ের নিরাসক্ত জ্ঞানের অনুশীলনই ব্রহ্মস্বাদ সহোদর। বিজ্ঞানচর্চার আনন্দে আত্মতৃপ্ত মিহির মনে মনে ভেবেছে, বুড়ো শশাঙ্ক থাকুন তাঁর কাব্যকলা আর কামকলা নিয়ে। বিজ্ঞানী মিহির বিজ্ঞানের বলে পৃথিবী জয় করবে, জ্ঞানের বলে নারীর মন।

নতুন বাসায় জিনিসপত্র মন্দিরা যতটা না গুছিয়ে তুলল, মিহির গুছলো তার অনেক বেশি। টেবিল-চেয়ার তক্তপোষ বইয়ের শেলফ কোথায় কি থাকবে বলে দিল। মশারি টানাবার পেরেক পুঁতল নিজের হাতে। পেরেক তো নয় যেন নতুন ঘর-সংসারের ভিত পত্তন হচ্ছে। একটি নারীর জীবনভূমিতে জয়স্তম্ভ প্রোথিত হচ্ছে নীতিসঙ্গত ন্যায়সঙ্গত অধিকারীর।

'শাখি আর তপুর জন্যে রেডিওটা রেখেই এলাম মন্দিরা। আমরা আর একটা কিনে নেব। ক'দিনের জন্যে তোমার একটু অসুবিধে হবে।'

মন্দিরা বলল, 'না না, অসুবিধে কিসের। রেডিও তো আজকাল আর আমি বেশি শুনিনে।'

'আগে শুনতে?'

মন্দিরা স্বামীর দিকে তাকাল, 'না, আগেও তেমন শুনতাম না।'

'শুধু গান শুনতে? না বক্তৃতাও শুনতে?' হঠাৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেন কথাটা মিহিরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মনে পড়ল সংস্কৃতি সম্বন্ধে শশাঙ্ক সেনের কী একটা টক রেডিওতে সেও একবার শুনেছিল। শুনতে ভালো লেগেছিল তখন। এখন ভালো লাগবে কিনা সন্দেহ। জীবিত মানুষের গুণের বিশল্যকরণী তার দোষের গন্ধমাদন থেকে আলাদা করে আনা বড় কঠিন।

মন্দিরা বলল, 'গানও শুনতাম বক্তৃতাও শুনতাম। হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছ যে?'

'অমনিই। আচ্ছা এই লোকালিটিটা তোমার কেমন লাগছে?'

মন্দিরা একটু হাসল, 'সবে তো এলাম। এখনই কী করে বলব বলো? ভালোই লাগবে।'

মিহির বলল, 'একটু নিরিবিলি তাই না? কলকাতা থেকে এসে বেশ নিরিবিলি মনে হয়। তবে জনমানবশূন্য মনে কোরো না। আলাপ-পরিচয় করে নিলে এখানেও অনেক প্রতিবেশী পাবে। স্টাফ কোয়ার্টার্স তো সব এদিকেই। আর-একজন আন্ডার ম্যানেজার আছেন সুধীরবাবু। তিনিও অল্প দিন আগে বিয়ে করেছেন। বেশ সুখেই আছেন ভদ্রলোক। আমরাও সুখে থাকব, কী বলো।'

ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই। চাকরটিকে ধারে কাছে দেখা যাচ্ছে না। তক্তপোষের ওপর বসে ছিল মন্দিরা। মিহির এগিয়ে এসে স্ত্রীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলল, 'আমরাও সুখী হব।'

ছোট একটু নিঃশ্বাস পড়ল মন্দিরার, মৃদুস্বরে বলল, 'সেইজন্যেই তো এসেছি।'

মিহির একটুকাল চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে স্ত্রীর হাতখানা ছেড়ে দিল। মনে মনে বলল, 'সেইজন্যেই এসেছ। কিন্তু তোমার মুখে হাসি কই? তোমার চলাফেরার মধ্যে, কথা বলার মধ্যে আনন্দ কই? অমন পাথরের প্রতিমা যদি হয়ে থাকো, আমি সে পাথর টুকরো টুকরো করে ভাঙব। আমি তোমাকে সহজে ছাড়ব না।'

পরক্ষণেই লজ্জিত হল মিহির। ছি ছি ছি, এই কি তার স্থিরতা ধীরতার পরিচয়? এত অল্পেই যদি সে বিচলিত হয়, তা হলে সে সুখী হবে কী করে? সুখ কারো কারো কাছে খুবই সহজ সরল। সুপক্ক ফলের মত হাতে এসে পড়ে। কিন্তু এখনকার শিক্ষিত সভ্য মানুষের অত সহজে সুখী হবার অধিকার নেই। অনেক দুরূহ দুর্গম পথ বেয়ে অনেক কাঁটার খোঁচা খেয়ে তবে সে সেই কল্পতরুর গোড়ায় গিয়ে পৌঁছতে পারে। অনেক উঁচু ডালের সেই ফল বহু উদ্যম আর অধ্যবসায়ে তাকে পেড়ে আনতে হয়। সেই স্বোপার্জিত দুঃখলব্ধ সুখের মত তীব্র সুখ আর নেই।

মিহির ভাবে, তার কয়েকজন বন্ধু ভালোবেসে বিয়ে করেছে। আর বিয়ের পরে ভালোবাসা শেষ করেছে। মিহির সেই বাপ-দাদার আমলেই রয়ে গেছে। তার বেলায় আগে বিয়ে পরে ভালোবাসা। আগে বিয়ে পরে কোর্টশিপ। বিয়ের আগে মিহির অন্য কোন মেয়ের এমন ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেনি। এই প্রথম স্ত্রীর কাছে এল মিহির। এসে দেখল, সে পরস্ত্রী। এই পরকে আপন করতে হবে মিহিরের। এর চেয়ে পরম রোমান্স আর কী আছে।

'তিনখানা ঘর আছে আমাদের। একখানা বসবার, দুখানা বেডরুম। বাবা-মা কখনো যদি বেড়াতে আসেন, একখানায় থাকতে পারবেন। কি শাখি তপু

যদি আসে, ওরাও থাকবে। কি তোমার বোনেরা ছন্দা-নন্দারা আসবে বলেছিল—'

মন্দিরা বলল, 'এলে থাকবার জায়গার অভাব হবে না। কিন্তু কেউ কি আর আসবে?'

'আসবে না কেন?'

'আমি চাইনে কেউ এখানে আসে।'

মিহির ফের জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

মন্দিরা স্বামীর দিকে চেয়ে একটু হাসল, 'আমরা তো সেই জন্যে বেছে বেছে এখানে এসেছি। কেউ এখানে আসবে না বলে?'

মিহির তীক্ষ্নদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল। তার সন্ধানী দৃষ্টি খুঁজে বার করতে চায় এই কেউ কথাটির মানে কি?

এই কেউ কোন প্রিয় নামের সর্বনাম?

কিন্তু মনে যাই ভাবুক, মুখের কথাকে মিহিরও হাসিতে মধুর করে তুলল, 'আসবে আসবে। ছন্দা-নন্দারা দেখো সপ্তাহখানেকের মধ্যেই এসে পড়বে। আমিই ওদের আনিয়ে নেব। ওরা তো আর তোমার মত নয়। ওদের কৌতূহল আছে। ওরা এসে এই কোল টাউনটা ঘুরে ঘুরে দেখবে। নতুন জায়গায় এসে কত আনন্দ হবে ওদের। ওরা খাদে নামবে—'

'আমি বুঝি নামব না? আমার বুঝি কোন কৌতূহল নেই?'

'আছে?'

'নিশ্চয়ই। আমাকেও নিয়ে যেয়ো। কিন্তু আর কাউকে নিতে পারবে না। আমাকে একা একা নিয়ে যেতে হবে।'

অনেকদিন পরে—নাকি এই প্রথম মিহির স্ত্রীর গলায় একটু আবদারের সুর শুনল। এগিয়ে এসে হেসে বলল, 'আমিও তো তাই চাই। তোমাকে একা একাই নিয়ে যেতে চাই। কবে যাবে বলো?'

মন্দিরা বলল, 'যেদিন তুমি নিয়ে যাবে।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমার একটা কথা শুনবে? যদি শোন তাহলে যাব। নইলে যাব না।'

'বল।'

'আমাকে খাদের মধ্যে নিয়ে যাবে। নিয়ে সেখানেই ফেলে দিয়ে আসবে। আর তুলে এনো না।'

হঠাৎ কয়লার খনির মতই মিহিরের মনটা কালো আর অন্ধকার সুড়ঙ্গ হয়ে গেল।

ফের একটু কাল চুপ করে রইল মিহির। মন্দিরার মনে এই মৃত্যুর ইচ্ছা কেন? সে কি পণ করে এসেছে কিছুতেই সুখী হবে না? কিছুতেই সুখী হতে দেবে না মিহিরকে? একটি কামুক পুরুষের সঙ্গ-সুখ কি তার কাছে এতই অবিস্মরণীয়?

একটু বাদে মিহির হেসে বলল, 'আমি তুলে না আনলেও তুলে আনবার অনেক লোকজন আছে। কিন্তু মন্দিরা, কেন একথা বলছ? এত দুঃখ কিসের তোমার? আমি যখন সবই জানি, আমার কাছে কিছুই লুকিয়ো না।'

মন্দিরার দুটি চোখ ছল ছল করে উঠল। স্বামীর দিকে জলভরা চোখে তাকিয়ে বললে, 'আমি জানি তুমি সবই জানো। সব জেনেও তুমি আমাকে ভালোবেসেছ, সঙ্গে নিয়ে এসেছ। তোমার মত মহৎ, তোমার মত উদার আমি আর কাউকে দেখিনি। আমি তোমার ভালোবাসার যোগ্য নই।'

'মন্দিরা!'

'আমার কিসের দুঃখ জিজ্ঞেস করছিলে। কিসের দুঃখ শুনবে? চিরকাল আমাকে অযোগ্য থেকে তোমার ভালোবাসা হাত পেতে নিতে হবে। আমি কোন দিন ভালো করে বুঝতে পারব না তুমি আমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসছ না দয়া করছ। তুমি আমাকে ভালোবাসছ না ঘৃণা করছ আর সেই ঘৃণা ঢাকবার জন্যে করুণা করছ আমি বুঝতে পারব না।'

মিহির আলগোছে স্ত্রীর পিঠে হাতখানা রাখল। বেশি আদর করল না, বেশি কাছে টানল না। মন্দিরাকে চোখের জলে ভিজতে দিল। এই অনুশোচনা ভালো, এই অনুতাপ কল্যাণকর। 'তুমি উদার, তুমি মহৎ' এই স্বীকৃতি অবশ্য সবখানি নয়, তবু অনেকখানি। মেয়েদের পুজো তাদের প্রেমেরই অঙ্গ। যে পুরুষ স্ত্রীর কাছে শ্রদ্ধা পায় না সে ভালোবাসাও পায় না। মিহিরের এই মতকে তার কোন কোন বন্ধু দাদার আমলের আদর্শ বলে ঠাট্টা করে। কিন্তু মিহির তো দেখেছে, শুধু সৌখ্যের সমভূমিতে পুরুষ যদি দাঁড়িয়ে থাকতে চায়, মেয়েরা তাকে আরো নিচে নামিয়ে দিয়ে ছাড়ে। মিহিরের কোন কোন বন্ধু ক্লাসমেটকে বিয়ে করেছে। বিয়ে করে শেষ পর্যন্ত সুখী হয়নি। কে জানে তাদের অতি সৌখ্যই হয়তো তার কারণ। সৌখ্যের অতিরিক্ত কিছু না থাকাই হয়তো প্রচ্ছন্ন হেতু।

একটু বাদে মিহির বলল, 'মন্দিরা, তুমি ভুল করছ। আমি তেমন মানুষ নই যে চিরকাল ওসব তুচ্ছ কথা মনে করে রাখব। চিরকাল তো ভালো, আমি কালই ও-সব ভুলে যেতে পারলে বেঁচে যাই। সংসারে মনে করে রাখবার মত আরো কত ভালো ভালো কথা আছে। এসো আমরা সেই সব কথা শুনি। সেই সব কথা বলি। এসো আমরা ভালোবেসে সুখী হই।'

আবেগে অধীর ইঞ্জিনিয়ারের মুখ থেকে কবির মত কথা বেরোতে লাগল। ভাষা যখন প্রেমের ভাষা হয় তখন তা কবির ভাষাই হয়ে ওঠে।

মিহির ভুলে গেল ঘরে আলো জ্বলছে, দরজা খোলা আছে। সে স্ত্রীকে আরো কাছে টেনে নিতে যাচ্ছিল, চাকর এসে রসভঙ্গ করল।

শম্ভু জিভ কেটে দরজার আড়ালে সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাবু, সুধীরবাবু নীতীশবাবুরা দেখা করতে এসেছেন। মেয়েছেলে আছেন সঙ্গে।'

মিহির বলল, 'চল যাচ্ছি।'

মন্দিরাও সরে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। স্বামীর কথার প্রতিধ্বনি করে বলল, 'চল যাচ্ছি।'

মন্দিরা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারবে না। ওর একটু তৈরি হয়ে নিতে হবে।

বাইরের ঘরে এসে অতিথিদের মিহির অভ্যর্থনা জানাল। সুধীর চৌধুরী আর একজন আণ্ডার ম্যানেজার। মিহিরের চেয়ে বছরখানেকের সিনিয়র। বিয়ের ব্যাপারেও তাই। ম্যানেজারশিপের পরীক্ষা দিয়েছিল, পাশ করতে পারেনি। মিহির যতদূর জানে পরীক্ষা ফেলের দুঃখ ছাড়া ওর মনে আর কোন দুঃখ নেই। সহকর্মী বন্ধুরা সুধীরকে ঠাট্টা করেছে, 'দাম্পত্য প্রেমে অমন মশগুল হয়ে থাকলে কি আর পরীক্ষায় পাশ করা যায়?'

সুধীর সহাস্যে এই মধুর অপবাদ মেনে নিয়েছে। কোন প্রতিবাদ করেনি।

সেণ্টার টেবিল ঘিরে কয়েকখানি বেতের চেয়ার পাতা রয়েছে। মিহিরের অতিথিরা তাতে বসল।

সুধীর বলল, 'একটু রাত হলেও আজই নিয়ে এলাম মিহির। চিত্রা আবার কাল-পরশুর মধ্যেই বাপের বাড়ি চলে যাবে। লম্বা মেয়াদের ছুটি।'

সুধীরের স্ত্রী চিত্রা অমনিতেই পুষ্টাঙ্গী। দেখতে বেঁটে খাটো। এবার যেন আরো পরিপুষ্ট হয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মুখ টিপে একটু হাসল মিহির। চিত্রা লজ্জিত হয়ে মুখ নামাল।

মিহির বলল, 'কবে যাচ্ছেন কলকাতায়?'

চিত্রা লজ্জিতভাবে বলল, 'এখনো কিছু ঠিক হয়নি। দাদা এসে নিয়ে যাবেন।'

একটু বাদে ফের মুখ তুলল, 'আপনার স্ত্রী কোথায়? তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।'

মিহির বলল, 'আসছে এক্ষুনি।'

'আপনার স্ত্রী।' কথাটা যেন কানে অনভ্যস্ত লাগে মিহিরের। সুধীরের সন্তানসম্ভবা স্ত্রী যেমন ওই প্রসঙ্গ উঠলেই লজ্জায় চোখ নামায়, অন্যের মুখে নিজের স্ত্রীর প্রসঙ্গ শুনলে মিহিরও তেমনি একটু লজ্জা বোধ করে। চিত্রার মত মধুর লজ্জা নয়। মিহির অনুভব করে তার সেই লজ্জার মধ্যে কোথায় যেন এক অস্বস্তি মিশে রয়েছে। ভাগ্যের এক নির্মম কৌতুক যেন প্রচ্ছন্ন আছে, 'মিহিরের স্ত্রী' এই শব্দটির মধ্যে। শাস্ত্রবিধি, লোকাচার, স্ত্রী-আচার এমন কি আইনের হাত থেকে মিহির মন্দিরাকে পেয়েছে। কিন্তু অন্তরের দিক থেকে পেয়েছে কি?

নীতীশ দত্ত মিহিরের আর এক সহকর্মী। ও আছে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর দিকে। নীতীশ হেসে বলল, 'কী ব্যাপার মিহির, তুমি যে আমাদের দিকে তাকাচ্ছই না। বিবাহিত লোকের সামাজিকতা বুঝি শুধু বিবাহিত লোকের সঙ্গে? বউ নিয়ে আসতে না পারলেও আমি তো বন্ধু একজনকে নিয়ে এসেছি। চল হে সুরদাস, এখানে আমাদের আদর-আপ্যায়নের আশা নেই। চল আমরা আমাদের মেসেই ফিরে যাই।'

নীতীশ আর সুরদাস যে এসেছে তা লক্ষ্য করেছে মিহির। চোখাচোখি হয়েছে, স্মিত হাসির বিনিময়ও হয়েছে। তারপর সুরদাস খবরের কাগজখানা তুলে নিয়ে মুখ ঢেকে বসে আছে। মুখে ব্রণ আছে বলেই বোধ হয়। ব্রণ উঠবার বয়স সুরদাসের পেরিয়ে গেছে, তবু তা ওঠার বিরাম নেই। সুরদাসকে লক্ষ্য না করে উপায় নেই কারো। বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘতম পুরুষ সুরদাস সরকার। ছ ফিট দু ইঞ্চি। নিজের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে সুরদাস খুব সচেতন। যখন স্কুল-কলেজে পড়ত সহপাঠী বন্ধুদের বলত, 'তোরা তো আমার হাঁটুর বয়সী।' শুধু হ্রস্বতার জন্যেই সুরদাস বন্ধুদের অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখে না, জীবন সম্বন্ধে ওদের ধ্যান-ধারণার সঙ্কীর্ণতা নিয়েও ঠাট্টা তামাশা করে।

সুরদাস মিহিরেরও বন্ধু, নীতীশেরও বন্ধু। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে নীতীশের মেসে বেড়াতে আসে। আপাতত ওর বোধ হয় চাকরি নেই। ওর চাকরি কখন যে থাকে, কখন থাকে না তা বন্ধুরা জানতে পারে না। এ সম্বন্ধে বন্ধুদের বেশি কৌতূহল সে সহ্যও করে না। অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছেও নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে আড়াল করে রাখতে ভালোবাসে সুরদাস।

মিহির যুগল বন্ধুর দিকে চেয়ে একটু হাসল, 'মুখখানাকে কেন অমন ঘোমটায় ঢেকে রেখেছ সুরদাস। অবগুণ্ঠন খুলে ফেল। নইলে কথাবার্তা বলি কী করে?'

সুরদাস কাগজখানা ভাঁজ করে সরিয়ে রেখে নীতীশকে সাক্ষী মেনে বলল, 'দেখেছিস নীতু, বিয়ের পর থেকে মিহির কেমন নতুন টার্মিনোলজি মুখস্থ করে ফেলেছে। এখন ঘোমটা খোঁপা শাড়ি গয়না কাজল কুমকুম আলতা এসব ছাড়া ওর মুখে আর কোন কথা শুনতে পাবিনে।'

মিহির একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল, তারপর সুধীরের স্ত্রীর দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'আমার এই বন্ধুটি একটু নারীবিদ্বেষী—'

সুরদাস প্রতিবাদ করে বলল, 'আমার ভুল পরিচয় দিলে আমি আপত্তি করব মিহির। তুমি গৃহী আমি অতিথি। আমি তোমার আশ্রিত। সিগারেট আমার কাছে আছে। এই শীতের দিনে এক কাপ চায়ের আশা রাখি। কিন্তু তাই বলে তুমি আমার নাম ধাম জাত গোত্র সব পালটে দেবে তা আমি সহ্য করব না।'

মিহির বলল, 'সব পালটে দিচ্ছি কি রকম?'

সুরদাস বলল, 'এই যেমন তুমি একটা কথা বললে—নারীবিদ্বেষী। আমি মোটেই নারীবিদ্বেষী নই। জানেন মিসেস চৌধুরী, আমি মোটেই নারীবিদ্বেষী নই। যারা মেয়েদের ওপর অযথা পক্ষপাত দেখিয়ে তাদের আরো দুর্বল করে দেয়, সেই পুরুষদের ওপর আমার বিদ্বেষ। আমার ধারণা, প্রটেকশনের যুগ শেষ হয়েছে; এখন মেয়েদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে দেওয়া উচিত। তবেই তারা পুরোপুরি মানুষ হবে। নইলে লেডীজ সীটের মত মানুষ শব্দটির আগে হীনার্থক ওই একটি বাহুল্য শব্দ—'

এই সময় ভিতর থেকে মন্দিরা এসে বাইরের ঘরে দাঁড়াল।

নীতীশ বলল, 'সুরদাস, তোমার সঙ্গে পরিচয় নেই, ইনি আমাদের হোস্টেস, মিসেস মুখার্জি।'

সুরদাস সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে একটু মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল। একটু নাটকীয় মনে হল তার ভঙ্গিটা। সে যে নারীবিদ্বেষী নয় সেইটুকু জানাবার জন্যেই কি এই আড়ম্বর?

মন্দিরা স্মিতমুখে নমস্কার জানাল। বসবার আর জায়গা ছিল না বলে দাঁড়িয়ে রইল। একটি সেণ্টার টেবিলকে ঘিরে তিনখানি বেতের চেয়ার, চতুর্থখানি কাঠের। নরম চেয়ারগুলি অতিথিদের দিয়ে কাষ্ঠাসনটি মিহির নিজে দখল করে বসেছে।

স্ত্রীর জন্যে মিহির ব্যস্ত হয়ে উঠল। চাকরকে ডেকে বলল, 'শম্ভু, আর একখানা চেয়ার নিয়ে আয়।'

মন্দিরা মৃদুকণ্ঠে বলল, 'থাক না, আর চেয়ার দিয়ে কী হবে।'

সুরদাস মন্দিরার দিকে এতক্ষণ তাকিয়ে কী যেন একটা কথা মনে করবার চেষ্টা করছিল। এবার পূর্বস্মৃতি উদ্ধার করতে পেরে হেসে বলল, 'কী আশ্চর্য, জীবনে এখনো মাঝে মাঝে নাটকীয় ঘটনা ঘটে। আপনার সঙ্গে এখানে ফের দেখা হয়ে যাবে আমি ভাবতেই পারিনি।'

সবাই বিস্মিত। মিহির নিজে শঙ্কিত, স্তব্ধ। মন্দিরা বিবর্ণ, মূক।

নীতীশ বলল, 'কি ব্যাপার সুরদাস, তুমি ওঁকে চিনতে না কি?'

সুরদাস বলল, 'চিনতাম মানে—আমাদের একবার দেখা হয়েছিল। খুব প্রীতিকর পরিবেশে অবশ্য নয়। এই বছরখানেক আগেকার ঘটনা। সিনেমার টিকেট কেটে গঙ্গার দিকে একটু বেড়াতে গেছি। আমাদের বরুণকে মনে আছে তো? নামের গুণেই হোক আর যাই হোক, ওর আবার গঙ্গা গঙ্গা বাতিক আছে। একটু ফাঁক পেলেই গঙ্গা যাত্রা করে। প্রিন্সেপস্ ঘাটে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে একটি প্যাকেট সিগারেট ধ্বংসের পর বরুণকে বললাম, চল এবার ফিরি।'

সুরদাস একটু হাসল, 'কিন্তু ফিরি বললেই তো আর ফেরা যায় না।

একটি বাসেও উঠতে পারিনে। মানুষ তো নয় যেন জীবজন্তু বোঝাই করে চলেছে। ট্যাক্সিগুলিও তাই। একটিও খালি নেই। কোনটিতে একটি মাত্র ভদ্রলোক, কোনটিতে একটি মাত্র মহিলা। ইচ্ছা হল চেঁচিয়ে বলি, আমাদের শেয়ারার করে নিন। ভাগ্যক্রমে কি দুর্ভাগ্যক্রমে বলতে পারো, একটি খালি ট্যাক্সি দক্ষিণ দিক থেকে এসে হাজির। শীতের দিনে বসন্তের দূত। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে থাবা মারলাম, এই ট্যাক্সি। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে আর একজন ভদ্রলোক বললেন, হাতের ইশারা করে আমি ওকে আগে ডেকেছি। ছেড়ে দিন। আমি বললাম, কক্ষনো না। আমি আগে ডেকেছি। বরুণকে নিয়ে আমি উঠে বসলাম গাড়িতে। তখন ভদ্রলোক বললেন, আমার সঙ্গে একটি মহিলা আছেন দেখতে পাচ্ছেন না? আমি বললাম, মহিলা আছেন তো কী হয়েছে? আমার চোখে এসব ব্যাপারে মেয়ে আর পুরুষে কোন ভেদ নেই। আপনার আর্জেন্সি থাকতে পারে, কিন্তু আমার আর্জেন্সি তার চেয়ে কম নয়।'

সুরদাস ফের একটু হাসল, 'তাঁর নাকের ওপর দিয়ে আমরা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে এলাম।'

সুধীর এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলে উঠল, 'আপনি আবার এই নিয়ে গর্ব করছেন? এমন অভদ্রতা করতে পারলেন আপনি?'

সুরদাস সুধীরের দিকে একবার তাকাল। কিন্তু জবাব দিল মন্দিরাকে। কৈফিয়তের ভঙ্গিতে একটু হেসে বলল, 'বরুণও আমাকে সেদিন এমনি করে খুব ধমকেছিল। কিন্তু তখন আমি আমার দোষ স্বীকার করিনি। আজ করছি।'

সুরদাস ফের নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত জোড় করল। হেসে বলল, 'মাঝে মাঝে বেয়াড়া এক একটা ভূত আমার ঘাড়ে চেপে বসে। চলতি রীতিনীতি সৌজন্য শিষ্টাচার তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়াটাই তখন বীরত্ব বলে মনে হয়। তখন যদি জানতাম আপনি ভবিষ্যতে আমার বন্ধুপত্নী আর হোস্টেস হবেন, তাহলে কি আর এমন ভুল করি? কী আহাম্মুকিই করে ফেলেছি। এখন বোধ হয় এক কাপ চাও আর প্রত্যাশা করতে পারব না।'

মন্দিরা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। হেসে অতিথিকে অভয় দিয়ে বলল, 'তা কেন পারবেন না। একটু অপেক্ষা করুন, আপনাদের চা আমি এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।' তারপর চিত্রার দিকে তাকাল মন্দিরা, 'আসুন, আমরা ভিতরে গিয়ে গল্প করি।' স্ত্রীর এই সপ্রতিভতায় খুশিই হল মিহির। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভাবল, মন্দিরার সঙ্গে শশাঙ্ক সেনের ঘনিষ্ঠতার সাক্ষী যে আরো কতজন রয়েছে, তার ঠিক নেই। মন্দিরা আর মিহিরের বিয়ের অনুষ্ঠান যারা দেখেছিল, মন্দিরা আর শশাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দর্শকও হয়তো তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম হবে না। সেদিন মন্দিরার সঙ্গে

যে শশাঙ্কবাবুই ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই মিহিরের। তা না থাকলে মন্দিরার মুখ শঙ্কায় অমন বিবর্ণ হয়ে যেত না। কিন্তু সুরদাস কেন ওকথা বলতে গেল? মন্দিরাকে অপদস্ত করে ওর লাভ কি। না কি মেয়েদের আলাদা কোন সুযোগ-সুবিধা দিতে সে যে রাজী নয় সেই বাহাদুরী দেখাবার জন্যেই কথাটা পেড়েছে সুরদাস? নিশ্চয়ই বন্ধুর মর্যাদাহানির উদ্দেশ্য ওর মনে নেই। তবু কথাটা না বললেই ভালো করত সুরদাস। কে জানে ঘরের অন্য সবাই কে কি ভেবেছে।

কিন্তু মিহির দেখে নিশ্চিন্ত হল, তখন কারো কিছু আর ভাববার অবকাশ নেই। নারীর অধিকার রক্ষায় পুরুষের ভূমিকা নিয়ে তর্ক শুরু হয়ে গেছে সুরদাস, সুধীর আর নীতীশের মধ্যে। সুরদাস একাই একশো না হোক, অন্তত তিনচারজনের সমান। সুধীর আর নীতীশের বক্তব্য, কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েদের এখন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া দরকার। এদেশে ওরা যুগ যুগ ধরে অবজ্ঞাত অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। সেই দীর্ঘদিনের অশিক্ষা কুসংস্কার, সংকীর্ণতার গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসা কি দু-চারদিনের কাজ? শুধু শহর বন্দরের কিছু স্কুল-কলেজের ছাত্রী, কিছু শিক্ষয়িত্রী, অফিস-যাত্রিনী মেয়ে দেখেই সুরদাস যেন ধারণা করে না বসে, দেশে সব মেয়েই দিনের আলো দেখতে পেয়েছে। গ্রাম-গ্রামান্তরের দিকে তাকিয়ে দেখুক সুরদাস, সেখানে মেয়েরা তো দূরের কথা, পুরুষরাও মধ্যযুগের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অশিক্ষায়, অজ্ঞতায়, দারিদ্র্যে ব্যাধিতে পঙ্গু। মানুষ সেখানে নিম্নতর মানুষ, অমানুষের পর্যায়ে নেমে রয়েছে। এমন জায়গায় মেয়েদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা না থাকলে মেয়েরা কোনকালে উঠতেই পারবে না। অমনিতেই প্রকৃতি তাদের দুর্বল করে গড়েছে। শারীরিক শক্তির দিক থেকে, চিন্তা কল্পনা জ্ঞান-বুদ্ধির অনুশীলনের দিক থেকে—একথা অস্বীকার করে লাভ নেই তারা weaker sex; পুরুষ সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের আরো দুর্বল করে রেখেছে। তাতে ক্ষতি হয়েছে পুরুষেরই। তারই অর্ধাঙ্গ অবল অবশ হয়ে রয়েছে। যারই স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে, সেই বুঝতে পারে শরীরের দুর্বল অঙ্গের একটু বেশি পরিচর্যা দরকার। এই পক্ষপাতটুকু না থাকলে পক্ষাঘাত অনিবার্য।

সুরদাস অ্যাসট্রের মধ্যে সিগারেটের টুকরোটি সজোরে গুঁজে দিয়ে মুখ তুলে বলল, 'কে বলেছে তোমাদের, আমি অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়েদের আর উচ্চ-শিক্ষিতা আমাদের সমবয়সী সহপাঠিনী সহধর্মিনীদের একই বিধিবিধানে বাঁধতে চাইছি? অবশ্য সহধর্মিনী আমার এখনো আসেনি। কোনদিন না আসাই সম্ভব। তোমরা সব ব্যাপারকেই একগাছি সাধারণ সুতোয় বাঁধতে চাও, কিন্তু তা বাঁধা যায় না। সুতো দিয়েও বাঁধা যায় না, দড়ি দিয়েও বাঁধা যায় না। সে বাঁধন হয় ছিঁড়ে যায়, না হয় আলগা হয়ে যায়। গণতন্ত্রের আর

সমাজতন্ত্রের একটা বড় দোষ হল, এই অতি সরলীকরণ আর সাধারণীকরণ। বিশেষকে অস্বীকরণ। জ্বর হয়েছে তো পাইকারীভাবে খাওয়াও কুইনাইন মিকশ্চার। মেয়ে দেখেছ তো তাকে দুর্বলা বলে কাঁধে তুলে নাও, আর না হয় দেবী বলে প্রণাম কর। মেয়েদের তোমরা বাংলায় আর সংস্কৃতে বলবে মহাশক্তির অংশ, আর ইংরেজীতে বলবে weaker sex—জানিনে গ্রীক আর হিব্রুতে কী বলে। কারণ ও দুটো ভাষা আমার জানা নেই। আমি সব সময় বিশেষকে স্বীকার করি। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার সমর্থন করি। যে মেয়ে আমার সমান সমান লেখাপড়া শিখেছে, অন্তত শিখেছে বলে দাবি করে, তাকে আমি জীবনযুদ্ধে প্রতিযোগিতায় ডাকব। তাতেই তার যোগ্য সম্মান। সেখানে মেয়ে বলে দয়া করব না। হাতের লেখা মেয়ের বলে পরীক্ষার খাতায় তাকে বেশি নম্বর দেব না, ইণ্টারভিউর সময় মুখখানা সুন্দর বলে, স্বরটুকু মিষ্টি বলে তাকে মাথায় চড়াব না।'

সুরদাস আর একটি সিগারেট ধরাল।

ইতিমধ্যে চা এল, নিমকি এল। শম্ভু বড় একখানি প্লেটে রসগোল্লাগুলি সাজিয়ে রাখল। নীতীশ তার একটি তুলে নিয়ে হেসে বলল, 'এবার সুরদাস সমাদ্দারের বিশেষীকরণের কারণটা আমরা বুঝতে পারছি। এম-এ পড়তে পড়তে সুরদাস যে মেয়েটিকে ভালোবাসল, সে প্রেমে গলা পর্যন্ত ডুবে থেকেও দিব্যি ফার্স্ট ক্লাসটি বাগিয়ে নিল, অথচ সুরদাসের ভাগ্যে মাঝারি ধরনের সেকেণ্ড ক্লাস ছাড়া আর কিছু জুটল না। সুরদাস বলতে পারত, অমিতা, তুমি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছ, সে প্রাপ্তি আমারও। তাহলে সেই প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী-ধারিনী সুরদাসের দাসী হতো। কিন্তু সুরদাস তা বলতে পারল না। ও লজ্জায় গ্লানিতে অনুশোচনায় অপমানে পিছিয়ে এল। চাকরির ব্যাপারেও তাই। দু দু-বার দুটি বান্ধবী ওর হাত থেকে পয়লা নম্বরের চাকরি কেড়ে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংস্রব ত্যাগ করেছে সুরদাস। অথচ একটু ধৈর্য ধরলে অন্তত তাদের একজনের উপার্জনের ভাগ সুরদাস নিজেই পেত। অমন করলে কি হয় ভাই? ওভাবে হয় না। প্রথম প্রথম ছাড়তে হয়, ধৈর্য ধরতে হয়। মিহির, তুমি কী বলো।'

মিহির খানিকটা যন্ত্রের মত বলল, 'তা ঠিক। ধৈর্য ধরতে হয়।'

সুরদাস একটু লজ্জিত হল। বিরক্তির ভঙ্গি দিয়ে সেই লজ্জাটুকুকে ঢাকবার চেষ্টা করে বলল, 'এই hitting below the belt-এ আমি আপত্তি করি। নীতীশ, ব্যক্তিগত রেফারেন্স ছাড়া তুমি কথা বলতে পার না। অথচ যা বল সবই অতিরঞ্জিত। কোনটাই পুরোপুরি সত্যি নয়। আর অর্ধসত্য যা অসত্যও তাই।'

নীতীশ বলল, 'ব্যক্তিত্ববানদের ব্যক্তিগত জীবন ছাড়া আর কিছু আছে নাকি?'

সুরদাস বলল, 'এবার উঠতে হয়। রাত হল। কিন্তু যাঁদের নিয়ে এত ঝগড়া তাঁরা নেপথ্যেই রয়ে গেলেন। আমার সেই পূর্ব জন্মের অপরাধের জন্যে তোমার স্ত্রী বোধ হয় আমার আর মুখদর্শন করবেন না মিহির।'

মিহির স্ত্রীকে এবার ডেকে আনল। হেসে বলল, 'সুরদাস কী বলছে শোন।'

মন্দিরা বলল, 'শুনেছি।'

চিত্রা বলল, 'ভিতর থেকে আমরা সব শুনতে পেয়েছি।'

'পেয়েছেন?' সুরদাস সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের এই আলাপ আলোচনা সম্বন্ধে আপনাদের কী মত?'

চিত্রা একবার মন্দিরার দিকে তাকাল, তারপর সুরদাসের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, 'আপনারা কেউ কিছু বোঝেন না।'

নীতীশ আর সুধীর দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল।

নীতীশ বলল, 'এই Generalisation-এ তোমার কোন আপত্তি আছে সুরদাস?'

সুরদাস বলল, 'না, মোটেই না। আমি সব সময় বিশেষকে মানি। ক্ষেত্র-বিশেষে পরাজয়টাই জয়।'

সুধীর বলল, 'স্বীকার করেছেন তাহলে?'

সুরদাস বলল, 'সানন্দে।'

এবার যুক্তকর হয়ে সেই নাটকীয় ভঙ্গিতে যুগল মহিলাকে অভিবাদন জানাল সুরদাস। তারপর খর্বাকার নীতীশের কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে বলল, 'চল হে, এবার যাওয়া যাক।'

গভীর রাত্রে স্ত্রীর পাশে অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল মিহির। মন্দিরাও কোন কথা বলল না। কেউ কাউকে স্পর্শ করল না।

শুধু পরস্পর পরস্পরের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগল।

খানিকক্ষণ বাদে মিহির হঠাৎ বলল, 'মন্দিরা, একটা কাজ করবে?'

'বলো।'

'তোমাদের মধ্যে যা কিছু হয়েছে সেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত—তোমরা যেখানে যেখানে গেছ, যা যা বলেছ, যা যা করেছ, প্রতিটি দিনের প্রতিটি ক্ষণের বিবরণ আমার কাছে একটু একটু করে বলতে থাকো। এক রাত্রে যদি না কুলোয় আমি হাজার রাত ধরে শুনব। সেই হাজার আরব্য রজনীর কথা আমার সব শুনে রাখা দরকার, তাহলে আমি কোন কিছুতে আর চমকে উঠব না। যে যাই বলুক কোন কিছুই আর আমার কাছে নতুন বলে মনে হবে না। তাদের মুখের ওপর না হোক, আমি নিজের মনে মনে বলতে পারব, আমি সবই জানি। আমি আমার নিজের মনে মনে হাসতে পারব, কিছুই আমার অজানা নেই।'

খানিকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। তারপর মিহিরের বাঁ পাশ থেকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার ক্ষীণ আর্তনাদ করে উঠল, 'আর কিছু বোলো না। আমাকে আর কিছু বলতে বোলো না। তুমি তো জানো না কী কষ্ট হয় এতে।'

আর সেই আর্তস্বর শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল মিহির। তার লজ্জা হল, অনুশোচনা হল, কষ্টের কথা শুনে কষ্ট হল মনে। ছি ছি ছি, ও যা স্বীকার করেছে তার চেয়েও বেশি স্বীকৃতি আদায় করতে কেন চেয়েছিল মিহির? কেন অত নিষ্ঠুর বর্বরতা তাকে পেয়ে বসেছিল? আরব্য রজনীর রূপকথা শুনে কী হবে মিহিরের? তাতে কি আরব্য মরুভূমির উষরতা হ্রাস পাবে? অতীতের দিকে ফিরে ফিরে কেন তাকাতে চাইছে মিহির? পিছু ফিরে দেখে মানুষ বুড়ো বয়সে। পরের অতীত নিয়ে গালগল্প করে, নিজের অতীত নিয়ে হয় অহংকার না হয় অনুশোচনা করে। কিন্তু মিহির তো বুড়ো হয়নি। সে বর্তমানের ভিত্তিভূমিকে শক্ত করে গড়ে তুলবে, দূরপ্রসারী দৃষ্টি তুলে ধরবে ভবিষ্যতের দিকে। মিহির নিজের অতীত থেকে শিক্ষা নেবে, অন্যের অতীতকে গ্রাহ্য করবে না।

পাশ ফিরে স্ত্রীকে বুকে টেনে নিয়ে মিহির বলল, 'আমার ভুল হয়েছিল মন্দিরা। আমি আর কক্ষনো তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করব না।'

তারপর থেকে নিজের প্রতিজ্ঞা রেখে চলল মিহির। মর্নিং শিফ্‌টে ডিউটি পড়েছে। ছটার মধ্যে ঘুম ভাঙে। চা-টা খেয়ে সাড়ে সাতটার মধ্যে বেরিয়ে যায়। প্রথমেই ম্যানেজারের অফিস। তাঁর কাছ থেকে কাজ বুঝে নেয়। কিছু নির্দেশ থাকলে ধৈর্যের সঙ্গে শোনে, কিছু বলবার থাকলে যুক্তির সঙ্গে বলে। তারপর সর্দার আর ওভারম্যানদের যথাস্থানে পাঠিয়ে দেয়।

লেবারাররা ডুলিতে করে খাদে নামতে থাকে। চোখে চোখ পড়লেই সেলাম পায় মিহির। নিজেকে তখন বহু লোকের অধিপতি বলে মনে হয়। পতি হিসাবে মর্যাদা পুরোমাত্রায় আছে কিনা সে প্রশ্ন আর মনে ওঠে না। সব ব্যবস্থা করে নিজের নামতে নামতে প্রায় সাড়ে ন'টা। বাতিঘর থেকে ল্যাম্প আসে। মোটা বেল্টে ক্যাপল্যাম্প ঝোলে। মাথায় সাদা হেলমেট, হাতে লাঠি। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম নিজেকে দুর্গমের অভিযাত্রী বলে মনে হতো। পৃথিবীর অভ্যন্তর নারীর গহন মন থেকেও রহস্যঘন।

যেখানে সূর্যের আলো যায় না সেখানেও মানুষের বুদ্ধির আলো গিয়ে পড়েছে। সেই আলোর প্রতীক যেন মিহিরের ক্যাপল্যাম্প। ললাটের তৃতীয় নেত্র।

খাদে নেমে সর্দারদের কাজ দেখে মিহির, সুপারভাইজারদের কাজের হিসাব নেয়। গাফিলতি দেখলে ধমকাতে হয় কাউকে কাউকে। অনায়াসে ইংরেজী আর হিন্দীর গালাগালগুলি মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না মিহির

তখন কুলীর সর্দার।

উঠে আসতে আসতে বেলা দেড়টা। শীতেও যেন গলদঘর্ম। বাসায় ফিরে মন্দিরাকে অপেক্ষা করতে দেখে ভালোই লাগে। 'একি, তুমি খেয়ে নাওনি?'

মন্দিরা জবাব দেয়, 'না।'

'কেন এত কষ্ট করো। তোমাকে তো বলেছি খেয়ে নিতে।'

মন্দিরা বলে, 'তাই কি কেউ পারে?'

অন্তত মন্দিরা যে পারে না তাতে মিহির খুশীই হয়।

ছোট্ট ডাইনিং টেবিলের দুদিকে মুখোমুখি বসে দুজনে মধ্যাহ্নভোজন সারে। মন্দিরা প্রথম প্রথম একসঙ্গে খেতে রাজী হয়নি। কিন্তু মিহির তাকে জোর করে রাজী করিয়েছে। বলেছে, 'এখানে তো বাবা মা কেউ নেই। এখানে একসঙ্গে খেতে আপত্তি কি।'

কোন কোন দিন শম্ভুই পরিবেশন করে। কোন কোন দিন মন্দিরা তাকে ছুটি দিয়ে দেয়। মাঝখানে থালাভর্তি ভাত থাকে, মাছ তরকারি থাকে। হাতায় করে তুলে মন্দিরা স্বামীকে দেয়, নিজেও নেয়।

এক একদিন হয়তো বলে, 'বাঁ হাতে দিচ্ছি কিছু মনে কোরো না।'

মিহির খেতে খেতে হাসে, 'কেন, বাঁ হাত কি তোমার হাত নয়? তুমি বাঁ হাতেও বরদা।'

মন্দিরা লজ্জিত হয়ে বলে, 'আহা।'

মিহির হয়তো বলে, 'রান্নাটা আজ চমৎকার হয়েছে। বিশেষ করে মাছের ঝোলটা।'

মন্দিরা হেসে বলে, 'মাছের ঝোল কবে তুমি খারাপ বলেছ?'

মিহির বলে, 'তা ঠিক। আমি মাছটা একটু বেশি ভালোবাসি। আমি ঠিক মাংসাশী নই, মৎস্যাশী। তুমি কিন্তু মাংস বেশি ভালোবাস।'

মন্দিরা কেন যেন সে কথা স্বীকার করতে চায় না। একটু প্রতিবাদের সুরে বলে, 'আমি সবই ভালোবাসি।'

মিহির বলে, 'আর সেই সঙ্গে সবাইকে।'

মন্দিরার মুখে কিসের একটু ছায়া পড়ে। কিন্তু জোর করে সেটুকু সরিয়ে দিতে দিতে হেসে বলে, 'তুমি আজকাল বড্ড দুষ্টু হয়েছ। এত কথা শিখলে কোথায়?'

মিহির বলে, 'তা ঠিক। তুলি তো কুলীদের সঙ্গে কয়লা। কথা কী করে বেরিয়ে আসে বল তো?'

মিহির হাসে। হ্যাঁ, এখন তার হাসবার শক্তি হয়েছে। দুষ্টুমির হাসি দিয়ে দুষ্ট ক্ষতকে ঢাকবার ক্ষমতা হয়েছে মিহিরের।

খেয়েদেয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে ফের বেরিয়ে যায় মিহির। কোনদিন ম্যানেজারের অফিস পর্যন্ত গিয়ে থামে। কোনদিন বা খাদে নামে।

নীতীশ মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলে, 'হল কি তোমার? দেখে শুনে মনে হচ্ছে মাইনটা যেন তোমারই। কর তো পরের চাকরি। অত শরীরপাত কেন করছ বল তো?'

মিহির ভাবে, চাকরিটা পরেরই, কিন্তু নিজের বলে ভাবতে না পারলে কি কাজ করা যায়? কাজ তখন বোঝা হয়ে ভূতের মত ঘাড়ে চাপে।

নীতীশ বলে, 'ম্যানেজার তো তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর আমরা সামনে গেলেই পেঁচা।'

বিকালের দিকে মিহির স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়। কোনদিন আণ্ডার ম্যানেজার সুধীরের কোয়ার্টারে, কোনদিন বা ওয়েলফেয়ার অফিসার বিনয় নিয়োগীর কোয়ার্টারে স্ত্রীকে বেড়িয়ে নিয়ে আসে।

একদিন ম্যানেজারও তাদের দুজনকে চায়ে নিমন্ত্রণ করলেন।

ছুটির দিন-টিন পড়লে আসানসোল পর্যন্ত স্ত্রীকে নিয়ে বেড়িয়ে আসে। কোম্পানীর গাড়ি চাইলে হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু মাইল দশেক রাস্তা বাসে যাতায়াত করতে মিহিরের ভালোই লাগে। কোন কোন দিন মিহির জিজ্ঞাসা করে, 'সিনেমায় যাবে? ভালো বাংলা ছবি এসেছে।'

মন্দিরা রাজী হয় না, বলে, 'এখানে কী সিনেমা দেখব। সব পুরোন বই।'

কিন্তু মিহিরের আগ্রহ তো নতুন। ভারি মনঃক্ষুণ্ণ হয় মিহির। তবু তেমন পীড়াপীড়ি করে না। স্ত্রীকে নিয়ে কলিয়ারীর কোয়ার্টারে ফিরে আসে। এক এক সময় অবশ্য তার মনে হয় সে নিজেই মন্দিরাকে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। মন্দিরা নিজে থেকে একবারও বলছে না। কোথাও যেতে চাইছে না, কোন কিছু দেখতে চাইছে না।

একবার খাদে নামবার কথা তুলেছিল মিহির। বলেছিল, 'যাবে নাকি দেখতে? কিভাবে কাজ-টাজ হয় দেখে আসবে।'

মন্দিরা জবাব দিয়েছে, 'এখন থাক। পরে একদিন যাব। শাখিদিরা আসুক, কি ছন্দা-নন্দারা আসুক, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।'

মিহির চুপ করে যায়।

'আমরা দুজনে গেলে বুঝি একসঙ্গে যাওয়া হয় না?'

কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারে না মিহির। চেপে যায়। কত আর সাধাসাধি করবে? কাঙালপণারও একটা সীমা আছে। স্ত্রীর ভালোবাসা এমন বস্তু নয় যে, নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে, মানসম্মান বিসর্জন দিয়ে তা পেতে হবে। মিহিরের ধারণা নিজেকে বিলিয়ে দিয়েও ও বস্তু পাওয়া যায় না। বরং নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখতে পারলে কাম্য বস্তু আপনি এসে ধরা দেয়।

একদিন মন্দিরা নিজেই লক্ষ্মীমেয়ের মত কথাটা তুলল, 'অনেক ঘোরা-ঘুরি হল, এবার পড়াশুনাটা ফের শুরু করে দিই। ভাবছি, সামনের বার

বি-এটা দিয়েই দেব।’

বই-টইগুলি ট্রাঙ্ক থেকে বার করে টেবিল সাজাতে থাকে মন্দিরা।

মিহির খুশী হয়ে বলল, ‘সেই ভালো। তুমিও পড়, আমিও পড়ি। সুধীরের যে বদনাম হয়েছে তেমন বদনাম নিতে আমি চাইনে।’

মন্দিরা বলল, ‘আমার জন্যে তোমাকে কোন বদনাম নিতে হবে না।’

মিহির বলল, ‘তুমি পড়তে থাক, আমি সাধ্যমত তোমাকে হেলপ্ করব।’

মন্দিরা হেসে বলল, ‘আমাকে তুমি কী হেলপ করবে? তুমি যা পড়েছ আর আমি যা পড়ব সব তো আলাদা আলাদা।’

মিহির বলল, ‘বেশ তো, আমি পড়ে নিয়ে পড়াব। তাও কি পারব না? আমার বিদ্যেবুদ্ধি সম্বন্ধে এত হীন ধারণা কেন তোমার?’

মন্দিরা বলল, ‘হীন ধারণা আবার কিসের। তুমি তোমার নিজের পড়া পড়ো। নিজের পরীক্ষার জন্যে তৈরী হও। আমার জন্যে কেন তুমি সময় নষ্ট করতে যাবে?’

মিহির স্ত্রীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে এক পলক তাকিয়ে থেকে একটু হাসল, ‘সময় নষ্ট! আচ্ছা শশাঙ্কবাবুকেই না হয় সময় নষ্ট করার জন্যে ডেকে আনা যাবে।’

মন্দিরা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর ‘যাই কাপড়গুলি তুলে নিয়ে আসি’ বলে স্বামীর সামনে থেকে সরে গেল।

কথাটা বলে ফেলে মিহির নিজেও কম অপ্রস্তুত হয়নি। ওই অবাঞ্ছিত নামটি সে নিজে নিজেও উচ্চারণ করতে চায় না। স্ত্রীর কাছে তো নয়ই। মিহিরের ধারণা তাতে তার নিজেরই অপমান। তাতে সে নিজেই নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবে।

আশ্চর্য, তবু ওই অপ্রীতিকর নামটা তার সমস্ত অস্বস্তিকর অনুষঙ্গ নিয়ে মিহিরের মুখ থেকে সেদিন বেরিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের জন্যে গ্লানি আর অনুশোচনায় কালো হয়ে রইল মিহিরের মন।

এদিকে কয়লা শহরের ধোঁয়া আর ধুলোর মধ্যেও শীতের শেষে বসন্ত ঋতু ঠিক এসে হাজিরা দিয়েছে। হাজিরাবাবুর খাতাকে যেন সেও ভয় করে। শালের বনে মঞ্জরী ফুটেছে। শিমুল পলাশ কৃষ্ণচূড়ার শিরোদেশ লালে লাল। খনির গর্ভে তাল তাল কালো কয়লা, কিন্তু খনি শহরের ওপরে অফিসারদের কোয়ার্টারের ছোট ছোট বাগানে লাল নীল হলুদ বেগুনি—রঙের অন্ত নেই।

কুলীদের ধাওড়ায় কি উল্লাসের বন্যা কিছু কম? দিনের বেলায় ওরা মেয়ে-পুরুষে সমানে খাটে। মেয়েরা আজকাল আর খাদে নামে না। আইনের নিষেধ। ওপরেই তারা খাটে। ঝুড়ি বোঝাই করে কয়লায়। তারপর সেই ঝুড়ি মাথায় করে ওয়াগন বোঝাই করতে যায়। তাদের গায়ের রঙ ময়লা, শাড়ির রঙ ময়লা, ঠোঁট আর দাঁত কালো কুচকুচে। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে ওদের কাজ

দেখতে দেখতে মিহিরের মনে হয়, ওদের মনটা বড় শাদা। ওদের মাথায় কয়লার বোঝা ছাড়া আর কোন বোঝা নেই। মিহিরের সাধ হয়, সে আর মন্দিরাও ওদের সঙ্গে মিশে গিয়ে একসঙ্গে ওইভাবে খাটে। তার পর সন্ধ্যাবেলায় তাড়ি কি মহুয়ার মদ খেয়ে ঢোল আর মাদল বাজিয়ে তারস্বরে গান গায়। এর চেয়ে নিশ্চিন্ত ।নর্ভাবনা : জীবন, এর চেয়ে গার্হস্থ্য সুখ যেন আর নেই।

॥ ১২ ॥

শেষ ঘণ্টা ছিল হিস্ট্রির। ক্লাশ নাইনের মেয়েদের মারাঠা সাম্রাজ্যের পতনের কথা শুনিয়ে সুজাতা নিজের ঘরটুকুতে ফিরে এল। আর কোন রুম-মেট তখনো আসেনি। শ্যামলীও না, যূথিকাও না। ঘর খালি।

আশ্রমের মধ্যে মেয়েদের যে হাইস্কুলটি আছে তাতে সুজাতা শিক্ষিকার পদ পেয়েছে। যখন বাড়িতে ছিল তখন বছরের পর বছর কর্পোরেশন স্কুলেই কেটেছে। সুজাতা নিজেও তো আর নড়াচড়ার চেষ্টা করেনি। শুদ্ধানন্দের কাছে বিদ্যাবুদ্ধির সার্টিফিকেট পেয়ে জ্ঞানপ্রভা তাকে উঁচু ক্লাসেই সাহিত্য আর ইতিহাস পড়াতে দিচ্ছেন। টিচারও তখন একজন শর্ট ছিল। সংসার ছেড়ে এই আশ্রমে পদোন্নতিই হয়েছে সুজাতার। মাস কয়েক পড়িয়েই টিচার হিসাবে সুনাম হয়েছে। ছাত্রীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা জুটেছে।

মাত্র এইটুকু যশ, এইটুকু স্বীকৃতি, এইটুকু প্রাপ্তি জীবনের যে অনেক দুঃখ আর বঞ্চনার জ্বালা ঢেকে দিতে পারে সুজাতা তা ভাবেনি। কল্পনা করেনি আশ্রমবাসিনী এই অনাত্মীয়া কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ সাধ-আহ্লাদের সঙ্গে এমন করে সে জড়িয়ে পড়বে। মাত্র কিছুদিন পূর্বের জীবনকে শুধু পূর্বআশ্রম নয়, পূর্বজন্মের মত সুদূর অস্পষ্ট প্রায় কাল্পনিক ব্যাপার বলে মনে হবে। যাঁদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক ছিল তাঁরা এমন করে দূরে সরে থাকবেন আর যারা অনুক্ষণ কাছে কাছে আছে, সেই আশ্রমবাসিনী কয়েকটি মেয়েই তার এমন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবে, তা ভাবতে পারেনি সুজাতা।

অবশ্য বাবা এসে দুদিন দেখা করে গেছেন। বউদিও এসেছিলেন। কিন্তু কেউ তেমন জোর দিয়ে বলেননি, 'চল যাই। তোকে যেতেই হবে।' সে যে এখানে থাকবে তা যেন তাঁরা ধরেই নিয়েছেন। তাঁদের দিনগুলি এখন সুজাতাকে বাদ দিয়ে চলতেই অভ্যস্ত। মায়া মমতা স্নেহ প্রীতি সবই কি তাহলে অভ্যাসের অনুশীলন! মনে করলে আছে, না করলে নেই!

প্রথম প্রথম আশ্রমের আচার অনুষ্ঠান বিধিনিষেধের বহর দেখে সুজাতার মনে হয়নি এখানে সে বেশি দিন থাকতে পারবে। পদে পদে যদি কড়াকড়ি

করতে হয়, বিরোধ বিদ্বেষই যদি মনের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে তাহলে আর এখানে এসেছে কেন। তার জন্যে তো স[illegible] পড়ে আছে। আছে সেই পারিবারিক জীবন যেখানে মুহূর্তে মুহূর্তে মিলন আর কলহ মনকে চঞ্চল আবেগে আবৃত করে রাখে, একমুহূর্ত স্থির হতে দেয় না। বিস্তীর্ণ মনোভূমিতে নির্মল নিরাসক্ত এমন একটি প্রশান্ত কোণ রচনা করতে দেয় না যেখানে উচ্চ ভাব উচ্চ চিন্তার আসন পাতা যায়। বিবাদে বিরোধেই যদি মত্ত থাকবে সুজাতা তবে এখানে এসেছে কেন? ঢেঁকি কি স্বর্গে এসেও ধান ভানবে?

কিন্তু নিজেকে বার বার বোঝালে কী হবে, মন থেকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি সুজাতা। বরং দিনের পর দিন বিরোধ সংঘাত প্রবল হয়ে উঠছে। আশ্চর্য, নির্দ্বিধ শান্তি, নিঃসংশয় ভক্তির নিরাপদ আশ্রয়ে বাস করবার জন্যেই তো আশ্রমবাসিনী হতে এসেছে সুজাতা; কিন্তু এসে দেখল, সন্দেহ সংশয় সংঘাত সে তো ছেড়ে আসেনি, বরং যেন বাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে এসেছে।

সংঘাত আর কারো সঙ্গে নয়, স্বয়ং জ্ঞানপ্রভার সঙ্গে। কর্তৃপক্ষের যিনি প্রধানতম প্রতিনিধি। সেই প্রথমদিন থেকেই বিরোধ। ঠাকুরের শয্যারচনার আদেশ যে সুজাতা প্রসন্ন মনে নিতে পারেনি তা জ্ঞানপ্রভা বলবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছিলেন। কিন্তু তবু তাঁর হুকুম নড়েনি। শুধু নিজের মান রক্ষা নয়, আশ্রমের শৃঙ্খলা রক্ষা। সেই শৃঙ্খলা যেন জ্ঞানপ্রভার মূর্তি ধরেছে। আশ্রমের নীতি-নিয়ম বিধি-শৃঙ্খলা আর জ্ঞানপ্রভা অভিন্ন। অন্তত তিনি তাই মনে করেন। সে কথা বুঝতে সুজাতার বাকি নেই।

রাত্রির সেই শয্যারচনা সুজাতার নিজের শয্যাকে কণ্টকশয্যা করে তুলেছিল। ঘরে ফিরে এসে সুজাতা ভেবেছিল, এ কী বিড়ম্বনা। যাকে সে ছেড়ে এসেছে সে এমন করে তার মনের মধ্যে জড়িয়ে রইল কী করে! স্বামী হলেও যাকে ভালোবাসা তার অনুচিত, তার আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর, তার স্মৃতি যে মুছেও মুছতে চায় না। শুধু সিঁদুর মুছলেই কি কুমারী হওয়া যায়? বাইরের সিঁথি সাদা রাখলে কী হবে, স্মৃতিরেখা যে ক্ষণে ক্ষণে রক্তমুখী হয়ে ওঠে।

রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি সুজাতার। তন্দ্রার মত এসেছিল শেষ রাত্রে। সেই তন্দ্রা গাঢ় ঘুম হয়ে নেমে এসেছিল আরো পরে।

শ্যামলী না ডাকলে কত বেলা অবধি যে ঘুমোত তার ঠিক নেই।

'খুব ঘুমোচ্ছেন যে সুজাতাদি। বড়দি আপনার খোঁজ নিয়েছিলেন। সকালের পুজোপাঠ হয়ে গেলে আপনি ওঁর ঘরে গিয়ে একবার দেখা করবেন।'

দেখা না করে উপায় নেই। জ্ঞানপ্রভার সামনে বিনীতভাবে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি ইচ্ছা করলে সুজাতাকে দাঁড় করিয়েও রাখতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। পাদমূলের মোড়াটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে

বলেছিলেন, 'বোসো।'

সুজাতা ঠিক নতমুখে বসেনি। তাঁর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করেছিল।

একটু বাদে জ্ঞানপ্রভা বলেছিলেন, 'ঠাকুরের বিছানা পাততে বলায় তুমি অমন আপত্তি করছিলে কেন? তোমার ঔদ্ধত্য দেখে আমি অবাক হয়েছি।'

'ঔদ্ধত্য কেন বলছেন বড়দি? আমি যা বিশ্বাস করি না, তা যদি করতে যাই সে আচরণ কি অসৎ আচরণ হয় না?'

'ঠাকুরকে তুমি বিশ্বাস করো না? ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই তোমার?'

'অবশ্যই আছে। তিনি আমার অন্তরে আছেন। আগে আকাশের মধ্যে তাঁর একটি বাড়ি কল্পনা করতাম, সেই বাড়ির মধ্যে একটি ঘর কল্পনা করতাম। সেই ঘরটি ঠিক আমার বাবার ঘরের মত। বাবার এক সময় গড়গড়া খাওয়ার শখ হয়েছিল। আমি ভাবতাম ভগবানও গড়গড়া টানেন। তবে তাঁর গড়গড়া সোনায় গড়া। আর নলটা আরো বড়। কিন্তু এখন আকাশে সেই বাড়ি নেই, ভগবানের হাতে সেই গড়গড়াও নেই। এখন বাইরে থেকে তিনি আমার অন্তরে এসে ঠাঁই নিয়েছেন। এখন বাইরে তাঁর কোন মূর্তি কল্পনা করা আমার আর দরকার হয় না। আমি তা পারিও না। যদিও বিশ্বশক্তিই তাঁর শক্তি, বিশ্বরূপই তাঁর রূপ, তবু, আমার ধারণার মধ্যে ছাড়া কোথাও তাঁর অস্তিত্ব কল্পনা করতে আমি আর পেরে উঠি না।'

জ্ঞানপ্রভার ঠোঁটে পরিহাসের রেখা ফুটে উঠল, 'এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি শুধু তোমার ধারণাটুকুর মধ্যে আছেন? আর কোথাও নেই? এ বড় অহঙ্কারের কথা সুজাতা। আমাদের ছোট মুখে অত বড় কথা শোভা পায় না।'

সুজাতা বলেছিল, 'মুখ ছোট। কিন্তু মন তো আর ছোট নয় বড়দি। তিনি আমার ধারণাকে যখন আশ্রয় করে থাকেন সে ধারণা অনেক বড়। আমার ধারণা যখন তাঁকে আশ্রয় করে থাকে সে ধারণা অনেক বড়। তখন সব ক্ষুদ্রতা লোপ পায়। তখন বৃহত্ব মহত্ত্ব ছাড়া আর কোন কথা থাকে না।'

জ্ঞানপ্রভা বললেন, 'দেখ, তোমার সঙ্গে দার্শনিক আলোচনা আমি করতে চাইনে। আমি বুঝতে পারছি এসব কার শিক্ষার ফল। কার কাছ থেকে শোনা কথা তুমি আওড়াচ্ছ। কিন্তু ধারণাই যদি সব হবে তবে তুমি তোমার সেই ধারণা ভাবনা নিয়ে নিজের ঘরের কোণে রইলে না কেন? কেন এখানে এলে?'

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে জ্ঞানপ্রভা তার দিকে তাকালেন।

সুজাতাকে এবার চোখ নামিয়ে নিতেই হল। এ বড় কঠিন দৃষ্টি বড়দির, বড় জটিল প্রশ্ন।

কী করে বলে সুজাতা? ওঁকে তো সব কথা বলা হয়নি। ঘর কোথায় যে ঘরে থাকবে সুজাতা? ঘর ভেঙে গিয়েছে বলেই তো সে ঝড়ের মধ্যে যেখানে পারছে সেখানে মাথা গুঁজবার চেষ্টা করছে। সুগম দুর্গম সব পথে

পা বাড়াচ্ছে, দুপাশের চেনা-অচেনা সব বাড়ির কড়া নাড়ছে। শক্ত করে ঘর গড়তে পারেনি বলেই তো মনের মধ্যে তার ভাঙা-গড়ার বিরাম নেই।

'তোমার ধারণা নিয়ে তুমি সেখানে থাকলেই পারতে। এখানে কেন এলে?'

বড়দি আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

সুজাতা একটু ভেবে জবাব দিল, 'কেন এলাম? ঘরে বসে আমি সেই ধারণায় স্থির হয়ে থাকতে পারতাম না বড়দি। শুধু বড় কিছু আছে এই ধারণাটুকুই তো যথেষ্ট নয়। সে ধারণা এই মুহূর্তে থাকে, পর মুহূর্তে থাকে না। বড়োর মধ্যে, অন্তত বড়োর কাছে সব সময় বাস করতে পারা চাই। আমি সেই বাস করবার আশা নিয়ে এখানে এসেছি বড়দি।'

জ্ঞানপ্রভা চুপ করে রইলেন, একটু যেন অভিভূতও হলেন। তাঁর দৃষ্টি আর কণ্ঠ দুইই কোমল হয়ে এল। তিনি আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, 'তোমার সে আশা এখানে এসে পূরণ হবে কিনা সে কথা বলতে পারিনে সুজাতা। বোধ হয় কেউ তা বলতে পারে না। এ জগতে কী যে বড়, কী যে ছোট, সে কথা কে বলবে। কেউ বড়কেও ছোট করে দেখে, কেউ ছোটকেও বড় করে পায়। কেউ "ক" অক্ষরটি দেখলে কৃষ্ণ বলে কেঁদে আকুল হয়, আবার কৃষ্ণ শব্দটি কারো মনে অন্ধকার ছাড়া কোন রূপেরই উদ্রেক করে না।'

জ্ঞানপ্রভা একটু থামলেন। সুজাতার মনে হল নিজের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া চলছে।

তর্কসভা বাইরের ঘর থেকে ভিতরের ঘরে গিয়ে বসেছে।

জ্ঞানপ্রভা বলতে লাগলেন, 'বিশ্বরূপ আর বিশেষ রূপ। অনেক সময় অনেকের কাছেই বিশ্বরূপ শুধু কথার কথা। শুধু শব্দমাত্র। সেই শব্দের মধ্যে কোন রূপ থাকে না, ধ্বনিও থাকে না। রূপ দেখি আমরা বিশেষের মধ্যে, রূপকে অনুভব করি বিশেষের মধ্যে। বাবা-মা ভাই-বোন বন্ধু-বান্ধব, স্বামী-স্ত্রী প্রণয়-প্রণয়িণী—'

সুজাতা লক্ষ্য করল জ্ঞানপ্রভা এখন অবাধ। তাঁর মুখে কোন কথা আটকাচ্ছে না।

'রূপ দেখি আমরা প্রিয়জনের মধ্যে, প্রিয় বস্তুর মধ্যে। শুধু তাঁদের অস্তিত্বই আমাদের অস্তিত্বকে নাড়া দেয়। শুধু তাঁদের সংস্পর্শেই আমি আমার নিজের অস্তিত্বে সচেতন হই, অধিষ্ঠিত হই। আর সবকিছু সম্বন্ধে আমি উদাসীন। তাদের অস্তিত্ব আর নাস্তিত্ব একই কথা। বস্তু আর প্রাণ। তুমি কি দেখনি সুজাতা, অনেক প্রাণকে অনেক প্রাণবান ব্যক্তিকে আমরা নিষ্প্রাণ বস্তুর মত জ্ঞান করি। আমাদের চাকর-বাকর দারোয়ান-বেয়ারা—আরো কত নাম করব যাদের সঙ্গে আমার আত্মার যোগ নেই, যারা আমার

অনাত্মীয় তারাই আমার কাছে জড়, নিষ্প্রাণ বস্তু। শুধু তাই বা কেন, আমার পরম আত্মীয়ও এই মুহূর্তে তাই। আমি তার মধ্যে প্রাণসত্তা দেখতে পেলে বা প্রাণ দিলে তবে সে প্রাণ পায়। সে আমার মধ্যে প্রাণসত্তা দেখতে পেলে তবে আমি প্রাণ পাই। তেমনি বস্তুর মধ্যে যখন আমি প্রাণ আরোপ করি তখন আর সে শুধু বস্তুমাত্র থাকে না।'

সুজাতা বলেছিল, 'কী রকম?'

জ্ঞানপ্রভা একটু হেসেছিলেন, 'তোমার ঘড়িটা, তোমার পেনটা, তোমার ব্যাগটা কি শুধু বস্তু? প্রাণ আর বস্তুর মধ্যে যে সমুদ্রপ্রমাণ ব্যবধান রয়েছে জড়বিজ্ঞান তার মধ্যে লুপ্ত সেতু উদ্ধারের চেষ্টা করছে, কি সেতু স্থাপনের চেষ্টা করছে। কিন্তু মনোবিজ্ঞান কত আগে সে সেতু গড়ে নিয়েছে। যে বস্তুর মধ্যে তুমি নিজে আছ সে বস্তু প্রাণময়। তোমার অংশ পেয়ে সে তখন আর বস্তু নয়, সে ব্যক্তি। আমার ঠাকুরমা ছিলেন—'

জ্ঞানপ্রভা তাঁর গৃহাশ্রমের কথা বড় একটা বলেন না। সেই প্রথম বললেন, 'আমার ঠাকুরমা অল্পবয়সে স্বামীহারা হন। আমার বাবা ছিলেন তখন তাঁর কোলে। সেই একমাত্র সম্বল। ঠাকুরমার আগেই বাবা চলে গেলেন। পাগলের মত হয়ে গেলেন ঠাকুরমা। ঠাকুরঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করলেন। আর সে দোর খোলেন না। কেউ খোলাতে পারে না। তারপর নিজেই একদিন খুলে বেরোলেন। ছেলেকে তিনি ফিরে পাননি। কিন্তু ঠাকুরঘরে যে নাড়ুগোপালের মূর্তি ছিল সেই গোপালকে তিনি ফিরে পেয়েছেন। তাকেই নাওয়ান খাওয়ান ঘুম পাড়ান, তাকেই ছেলে বলে ভাবেন। আমরা হাসতাম। ভাবতাম ঠাকুরমা পাগল হয়ে গেছেন। কিন্তু আরো বড় হওয়ার পর দেখলাম পাগল হননি। তিনি সুস্থই আছেন। সেই কড়ে আঙুল তুল্য গোপাল তাঁকে ফের বিশ্বজগৎ ফিরিয়ে এনে দিয়েছে। বিশ্ববোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। ঠাকুরমা একশো বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি যত লোকের উপকার করেছেন, যত লোককে শোকে দুঃখে সান্ত্বনা দিয়েছেন তাদের সংখ্যা হাজারের চেয়ে ঢের বেশি। কিন্তু মৃত্যুর দিনটিতেও গোপালকে তিনি কাছ-ছাড়া করেননি।'

জ্ঞানপ্রভা একটু থামলেন। হাতঘড়ির দিকে তাকালেন একবার। তারপর ফের আস্তে আস্তে বললেন, 'এখানেও তাই। স্বামী শুদ্ধানন্দ যা পারেন আমরা তা পারিনে। তাঁর পক্ষে যা দরকার হয় না, হয়তো আমাদের পক্ষে তা একান্ত দরকার। তোমার পক্ষে যার দরকার নেই, এই আশ্রমের অশিক্ষিতা অর্ধশিক্ষিতা অনেক মেয়ের পক্ষেই তার দরকার আছে। এদের বাপ মা আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। থাকলেও নানাজনে নানা কারণে তাদের ছেড়ে এসেছে। তাদের আশ্রয় দরকার। ঠাকুর সেই আশ্রয়। তাদের কাউকে সেবা করা চাই যত্ন করা চাই। ঠাকুর সেই যত্নের ধন। শুধু জ্ঞানে বুদ্ধিতে ধ্যানে

ধারণায় নয়, হৃদয়ের আবেগ দিয়ে তাদের কাউকে পাওয়া দরকার। ঠাকুর সেই আবেগের আশ্রয়।'

জ্ঞানপ্রভা ফের একটুকাল কি ভাবলেন। তারপর সুজাতার দিকে চেয়ে এবার আদেশের ভঙ্গিতে বললেন, 'বেশ, তোমাকে ওসব কিছু করতে হবে না। তোমাকে ওসব দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিলাম। তুমি শুধু পড়বে আর পড়াবে। স্কুলের মেয়েদের আশ্রমের মেয়েদের নৈতিক চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রাখবে। তাদের শৃঙ্খলাবোধ শেখাবে। এই শৃঙ্খলাবোধই আমাদের ইণ্টি-গ্রিটি। আমাদের ব্যক্তিত্বের সোপান। আমরা যে যতটুকু জ্ঞানবুদ্ধি আয়ত্ত করি, শৃঙ্খলা ছাড়া তাকে বেঁধে রাখতে পারিনে। শৃঙ্খলা ছাড়া তার ব্যবহার করতেও পারিনে। আর সেই শৃঙ্খলা রাখবার জন্যেই তোমাকে একটা কথা বলব। ভিতরে তুমি যাই বিশ্বাস কর আর না-কর, আশ্রমে যতদিন থাকবে এখানকার নিয়ম-কানুন তোমাকে মেনে চলতে হবে। এখানকার আচার অনুষ্ঠানে তোমাকে যোগ দিতে হবে। আর আশ্রমের বাইরে কি ভিতরে কোন প্রচারকার্য চলবে না। আমরা তা সহ্য করব না।'

দৃপ্তভঙ্গিতে চেয়ারখানিতে শক্ত হয়ে বসলেন জ্ঞানপ্রভা। কে জানে কোন বিদ্রোহের আশঙ্কা তাঁকে এমন অসহিষ্ণু করে তুলেছে।

সেদিন সুজাতা তাঁর মূর্তি দেখে অবাক হয়েছিল। একটু আগে এই বড়দিই কি জ্ঞানের কথা বলছিলেন, ভক্তির কথা বলছিলেন। এই বড়দিই কি বিশেষের মধ্যে বিশ্বরূপকে দেখছিলেন, বস্তুর মধ্যে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করছিলেন? চরিত্রের ইণ্টিগ্রিটি, ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্যের কথা বলছিলেন?

সুজাতার সেদিন নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হয়েছিল। বড়দির কর্তৃত্বের ভয়ে নয়। ষড়রিপুর ভয়ে। ছদ্মবেশী এই রিপুর কাছ থেকে সামাজিক মানুষের পরিত্রাণের বোধ হয় কোন উপায় নেই। এই আশ্রমের সমাজও সমাজ; জলে স্থলে পাহাড়ে পর্বতে যেখানেই দুজন মানুষ পাশাপাশি বাস করবে সেখানেই সমাজ। আর সেখানেই রূপের সঙ্গে রিপু জড়িয়ে রয়েছে। ষড় রিপু। কিন্তু তার প্রকাশ বোধ হয় ছ'শোর চেয়েও বেশি। তার ছদ্মবেশের অন্ত নেই। কোথাও তা শৃঙ্খলার নাম ধরে আসে, কোথাও তা ধর্মনৈতিক, রাজনৈতিক আদর্শের নাম ধরে আসে। মতবাদ মানুষের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে। যে অস্বাভাবিক ক্রোধের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে সুজাতা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে সেই ক্রোধেরও নানা রূপ নানা মূর্তি এখানে সে দেখতে পাচ্ছে। কত গোপন কত প্রচ্ছন্ন সুড়ঙ্গপথেই না তার আনাগোনা। স্বামীর কথা মনে পড়ে সুজাতার। সেখানে তাঁর রূপসৃষ্টি রূপ-সম্ভোগকে দেখেছে যৌন কামনার সঙ্গে জড়ানো। আর এখানে ক্রোধকে দেখছে ধর্মরক্ষা নীতিরক্ষা কর্তব্যরক্ষার সঙ্গে গাঁথা। সেকালের মানুষ আত্মরক্ষার জন্যে গুহাগহ্বরে আশ্রয় নিত। যেখানে সে একা শুধু

সেখানেই সে একাত্ম। যেখানে সে একা শুধু সেখানেই ঐক্য রক্ষা সম্ভব। বহুজনের বহুমনের সংস্পর্শে আসবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষও কি বহুরূপী?

ঠাকুরের সেবা পরিচর্যার হাত থেকে সুজাতাকে রেহাই দিয়েছেন জ্ঞানপ্রভা। দুবেলা পূজা আর আরতির সময় শুধু উপস্থিত থাকলেই চলে। না থাকলেও তিনি সুজাতাকে বড় একটা কিছু বলেন না। কিন্তু ছাত্রীদের নিয়ম-কানুন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই বিরোধ বাধে। সুজাতার সহনশীলতা ভালোর চোখে দেখেন না। তিনি মনে করেন এই শৈথিল্য চারিত্রিক দুর্বলতা এনে দেয়। ছোট ছোট রন্ধ্র দিয়ে বড় বড় পাপ প্রবেশ করে। সুজাতা মোটামুটি তাঁর সঙ্গে একমত। কিন্তু অতখানি কঠোরতা পছন্দ করে না। শাসনের চেয়ে সে স্নেহকে বড় জায়গা দেয়। শাস্তির চেয়ে ক্ষমাকে। কাউকে শাস্তি দেওয়ার কথা উঠলেই নিজের কথা মনে পড়ে সুজাতার। নিজের প্রচণ্ড ক্রোধের কথা মনে পড়ে। সেই ক্রোধ তাকে কী শাস্তিই দিয়েছে—সমস্ত চিত্তকে জিঘাংসায় ভরে তুলেছে, প্রথমে অপরকে তারপর নিজেকে হত্যা করবার প্রবল ইচ্ছায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে সুজাতা, সে কথা মনে পড়ে। সেই হিংসা সেই বিলুপ্তি আর বিনাশের ইচ্ছা কি একেবারে মন থেকে গেছে? যায়নি। সুজাতার সমস্ত ধ্যান ধারণা চিন্তন মননের ফাঁকে ফাঁকে তার সেই হননের ইচ্ছাও মাঝে মাঝে মুখ বাড়ায়। শশাঙ্ক অন্য নারীর সঙ্গে বাস করছে, প্রকাশ্যে না হোক গোপনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, তাদের কাউকে না কাউকে নিয়ে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে, এই কল্পনা এখনো—এতকাল পরেও সুজাতাকে পীড়ন করে। তার মনে পীড়নের ইচ্ছা সৃষ্টি করে। অথচ যে জীবন সুজাতার পক্ষে পূর্ব জীবন, প্রায় পূর্বজন্মের মত, তার অনুস্মৃতিতে কোন লাভ নেই, তা কি সে নিজেই জানে না? তবু তো সেই স্মৃতিতে মনে জ্বালা ধরে, চিত্ত অস্থির হয়, নিজের ধ্যানধারণা কৃত্যকর্তব্যকে কিছুক্ষণের জন্য বিপর্যস্ত করে দেয়।

আজ অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য কারণে সুজাতার মন চঞ্চল হয়ে রয়েছে। তাদের ক্লাস নাইনেরই তিনটি মেয়ের ভাগ্য সম্বন্ধে আজ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। শিখা রেখা আর ললিতা। তিনটি মেয়েই দুষ্টু তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারা ক্লাসে গোলমাল করে, পরীক্ষার সময়েও নাকি ওদের মধ্যে কে একজন নকল করেছিল। বড়দি ওদের ওপর চটে আছেন অনেকদিন থেকেই। কিন্তু এবার নিমিত্তের ভাগী হয়েছে সুজাতা নিজে।

সেদিন ছিল বাংলার ক্লাস। জ্ঞানপ্রভারই লেখা চরিত্রগঠন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়াচ্ছিল সুজাতা। তাতে লেখিকা শৃঙ্খলারক্ষা আর কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। ভাষাটা একটু কঠিন বলে বিষয়টা প্রাঞ্জল করে মেয়েদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল সুজাতা। হঠাৎ পিছন থেকে হাঁচির শব্দ শুরু হল। ওই তিনটি মেয়ে। শিখা রেখা আর ললিতা। হেঁচে

চলেছে তো হেঁচেই চলেছে। হাঁচি আর চাপা হাসি।

সুজাতা চটে গিয়ে বলল, 'অত হাঁচির কী হয়েছে।'

তিনটি কিশোরী মেয়ে উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। একটি বেশ সুন্দরী। বুদ্ধিও আছে। পড়াশুনো করলে রেজাল্ট ভালোই করত। না করেও একেবারে খারাপ করে না।

'অত হাঁচছ কেন? কী হয়েছে তোমাদের?'

শিখা বলল, 'সর্দি লেগেছে দিদিমণি। বড্ড ঠান্ডা লেগে গেছে।'

'তিনজনেরই এক সঙ্গে ঠান্ডা লাগল?' সুজাতা সংশয়ের সুরে জিজ্ঞাসা করল।

কিন্তু পাশের মেয়েটি ফাঁস করে দিল রহস্য।

'না দিদিমণি ঠান্ডা নয়, সর্দিও নয়। ওরা নস্যি দিয়েছে। নস্যি দিয়ে ইচ্ছা করে হাঁচছে। ওরা বলছিল এখানে তো হাঁচি টিকটিকি মানা হয়। বাধা পড়লেই আজ পড়ানো বন্ধ হবে।'

নস্যির কথা শুনে সুজাতার নিজেরও প্রথমে হাসি পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হাসি চেপে গম্ভীরভাবে বলল, 'ছি-ছি-ছি, মেয়েরা আবার নস্যি দেয় নাকি? শুনেছ কোথায় তোমরা? মিলি, ওদের নস্যির কৌটোটা কেড়ে নিয়ে এসো তো। এনে আমার টেবিলের ওপর রাখো।'

কৌটো সত্যিই একটি পাওয়া গেল। আর সুজাতার টেবিলের ওপর সেই সুদৃশ্য কৌটা এসে পৌঁছলও। সাধারণ কৌটো নয়, রুপোর কৌটো। মালিক নিশ্চয়ই খুব শৌখীন।

সুজাতা কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কৌটো কার?'

শিখা বলল, 'রেখার মেজদার।'

সুজাতা বলল, 'এ কৌটো পাবে না। যাঁর কৌটো তাঁকে এসে নিয়ে যেতে বোলো। আর ফের যদি তোমরা এমন দুষ্টুমি করো কঠিন শাস্তি পাবে। শুধু ক্লাস থেকে নয়, স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হবে তোমাদের। নাও বোসো এবার। বসে পড়া শোন।'

তারপর ফের পড়াতে শুরু করেছিল সুজাতা। নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা যে কত দরকার তা মনোজ্ঞভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল। ক্লাসে আর গোলমাল হয়নি।

ক্লাস থেকে বেরিয়ে টিচার্স রুমে ফিরে যাওয়ার সময় জ্ঞানপ্রভার সামনে পড়ে গিয়েছিল সুজাতা।

'তোমার ক্লাসে অত গোলমাল হচ্ছিল কেন? আমি পাশের ঘরে ছিলাম। অত হাঁচি-কাশির শব্দ শুনছিলাম কিসের।'

ব্যাপারটা লঘু করে দেওয়ার জন্যে হেসেছিল সুজাতা, 'আর বলবেন না বড়দি। ওই যে তিনটি দুষ্টু মেয়ে—আজ আবার ওরা নস্যি নিয়ে এসেছিল।

এর আগে একদিন সতীদির ক্লাসে নাকি নাকে কাঠি দিয়ে হেঁচোছিল। আজ আর-এক কাঠি বাড়ল। একেবারে কৌটোসুদ্ধ ধরা পড়েছে।'

'কই দেখি কৌটো।'

তার হাত থেকে কৌটোটা প্রায় কেড়ে নিয়েছিলেন জ্ঞানপ্রভা। তারপর সুজাতার দিকে চেয়ে বলেছিলেন, 'হেসো না, হাসির ব্যাপার নয়। তোমাদের কাছে প্রশ্রয় পেয়ে পেয়েই ওরা এমন বেড়ে উঠেছে।'

তারপর ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে। হেডমিস্ট্রেস এই তিনটি মেয়েকে স্কুল থেকে বহিষ্কৃত করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বলেছেন, 'তোমরা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে চলে যাও। তোমাদের বিরুদ্ধে আমি কিছু লিখব না। কিন্তু এখানেও তোমাদের আর স্থান হবে না।'

অভিভাবকদের কাছ থেকে অনেক অনুরোধ এসেছে। তিনটি মেয়ের মা কাকিমারা এসে অনেক ধরাধরি অনেক অনুনয়বিনয় করে গেছেন। কিন্তু জ্ঞানপ্রভা অনড়।

অনুরোধ এসেছে সুজাতার কাছেও। কেউ কেউ ভাবে, সুজাতা চেষ্টা করলে মেয়েদের রাখতে পারে। ইচ্ছা করলেই বরাভয়ের হাত প্রসারিত করতে পারে সুজাতা। কিন্তু তার যে হাত-পা বাঁধা এ কথা তো বাইরের কেউ জানে না। তিনটি অপরাধিনী বড়দির কাছে যেতে সাহস পায়নি কিন্তু সুজাতার কাছে এসে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছে। চোখের জল ফেলেছে। কিন্তু জ্ঞানপ্রভা তাতে আর্দ্র হননি। তিনি বলেছেন, 'ওই তিনজনের জন্যে আমি স্কুলসুদ্ধ মেয়ের ক্ষতি করতে পারিনে।'

আজ টিচাররা শেষবারের মত অনুরোধ করে দেখবে জ্ঞানপ্রভাকে। তাঁর ঘরেই আজ বৈঠক হবে। তিনি নিজেই এ ব্যবস্থা করেছেন। টিচারদের তিনি সব কথা আজ বুঝিয়ে বলবেন।

একটু বাদে শ্যামলী ব্যস্তভাবে এসে হাজির। 'সুজাতাদি, আপনি এখনো যাননি। ওঁরা সবাই যে চলে গেছেন, আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন ওঁরা।'

সুজাতা বলল, 'যাচ্ছি।'

শ্যামলী গলা নামিয়ে বলল, 'দেখবেন একটু চেষ্টা করে। যদি বাঁচাতে পারেন মেয়ে ক'টাকে। ওরা আমাকেও এসে ধরেছে। কিন্তু আমি কী করতে পারি বলুন। আমার কথায় কি কিছু আর হবে।'

শ্যামলীও টিচার। নিচের ক্লাসগুলিতে পড়ায়।

জ্ঞানপ্রভার ঘরে যাওয়ার জন্যে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগল সুজাতা। যেতে যেতে ছেলেবেলার একটি মধুর স্মৃতি মনে পড়ে গেল। একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে বাবার গড়গড়ায় টান দিয়েছিল সুজাতা। কোথায় যেন ছবি দেখেছিল বেগমসাহেবা গড়গড়া টানছেন। তারও বেগম হবার সাধ হয়েছিল। বাবা দেখতে পেয়ে তার দুগালে ঠাস ঠাস করে চড় মেরেছিলেন।

আবার খানিক বাদে আদরও করেছিলেন খুব। কোলে তুলে নিয়ে চুমোয় চুমোয় তার চোখের জল মুছে দিয়েছিলেন।

বড়দি কি ওদের শুধু চড়ই মারবেন?

জ্ঞানপ্রভার শোবার ঘরের পাশে যে আর একখানি বড় ঘর আছে সেখানে আজ জরুরী বৈঠক বসেছে। সহকারিণী শিক্ষিকাদের স্থান আজ আর প্রতিষ্ঠান-প্রধানার পাদমূলে নয়, তাঁরা আজ জ্ঞানপ্রভার পার্শ্বচরী। মাঝখানে বড় একখানা গোল-টেবিল। তার চারদিকে সবাই ঘিরে বসেছেন। ধর্মসভার সময় কি আশ্রমের গুরুতর কোন বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে আলোচনার সময় যেমন হয় আজও তেমনি ধরনের একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে। এরই মধ্যে জ্ঞানপ্রভার আসনখানি বড় এবং বিশিষ্ট। পুরু গদি-আঁটা চেয়ার। অনেকটা সিংহাসনের আদলে তৈরি। সুজাতাকে ঘুরে গিয়ে একেবারে বড়দির মুখোমুখি বসতে হল। মাত্র ওই চেয়ারখানিই এখন খালি আছে। ওই জায়গাটিতে কেউ বসেনি। সুজাতারও বসবার ইচ্ছা ছিল না। বড়দির দুটি চোখের তীক্ষ্ম দৃষ্টি সেও এড়াতে চায়। আশ্রমের কারো কারো ধারণা যোগাভ্যাসের ফলে বড়দি তাঁর দুটি চোখে অলৌকিক শক্তি অর্জন করেছেন। দৃষ্টি দিয়ে তিনি আর একজনের মর্মভেদ করতে পারেন। সে হয়তো ভস্ম হয়ে উড়ে যায় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পুড়ে খাক হয়ে যায়। দৃষ্টির জোরে তিনি আর একজনের মনের কথা টেনে বার করতে পারেন। সে তখন সত্য কথা বলতে বাধ্য হয়। কিংবা তার তখন সত্য-মিথ্যা জ্ঞান থাকে না। জ্ঞানপ্রভা তাকে দিয়ে যা বলাতে চান সে তাই বলে। তাঁর অভিপ্রেত কথাই তখন তারও কথা হয়ে ওঠে, তা পরম সত্যের আকার নেয়। এই সব প্রবাদ জ্ঞানপ্রভার নামে চলতি আছে। এ-সব কথা কতদূর সত্য সুজাতা তা জানে না। কোন দিন যাচাই করে দেখবার সুযোগ হয়নি। তেমন সুযোগ সে চায়ও না। কিন্তু বড়দি যে অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী আর প্রভাবশালিনী, সুজাতা তা মনে মনে অনুভব করেছে। এখন কিন্তু ওঁর দুটি চোখ স্নিগ্ধ, শান্ত আর সুন্দর। যে চোখ দিয়ে তিনি এখন শুধু আদেশ করেন, শাসন করেন, মানুষকে বিমূঢ় করে বসিয়ে রাখেন, কে জানে সেই দুটি চোখ একদিন কাউকে মুগ্ধ করেছিল কিনা, আরো দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়েছিল কিনা কে জানে।

'সুজাতা, আজও তুমি একটু দেরি করে এলে।'

বড়দি তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

সুজাতা কোন জবাব দিল না। নীরবে অপরাধটুকু স্বীকার করে নিল।

'লাষ্ট আওয়ার তো তোমার অফ ছিল। আমরা শেষ ক্লাসটি পর্যন্ত করে তোমার আগে এসেছি।' বড়দি এবারও একটু হাসলেন।

আজকের বিচার যেন অপরাধিনী তিনটি ছাত্রীর নয়। তাদের টিচার

সুজাতাই যেন প্রথম আর প্রধান আসামী।

'আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল বড়দি।'

সুজাতা মৃদু স্বরে বলল।

'দেরি যে হল তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কেন হল তাই ভাবছিলাম।' বড়দির মুখে তেমনি হাসি, 'তুমি বোধহয় আসবে কি আসবে না স্থির করতে পারছিলে না।'

সুজাতা বিবর্ণমুখে বলল, 'এ কি বলছেন বড়দি। আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন আমি কি না এসে পারি?'

এবার আরো সোজা এবং শক্ত হয়ে বসলেন জ্ঞানপ্রভা। তাঁর মাথা সবচেয়ে উঁচুতে। চুল যে নেই তা যেন এখন আর কারো চোখে পড়ে না, মনে ওঠে না। উচ্চতাই তাঁর শিরোশোভা, অটুট আত্মপ্রত্যয়ই তাঁর মাথার মুকুট।

এখন আর মুখে সেই কৌতুকের হাসিটুকু নেই জ্ঞানপ্রভার। আবার তেমন কোন প্রচ্ছন্ন ক্রোধ কি অপ্রসন্নতাও টের পাওয়া যায় না। তাঁর কণ্ঠ এখন স্বাভাবিক। অনুচ্চ, কিন্তু দৃঢ়। জ্ঞানপ্রভা বলতে লাগলেন, 'তা পারতে না, পারা উচিত নয়। আমরাই যদি ডিসিপ্লিন না মানি, ছাত্রীরা মানবে কেন। আমাদেরই যদি সময়নিষ্ঠা না থাকে, ওদের কাছ থেকে সেই নিষ্ঠা আমরা কী করে আশা করব। ডিসিপ্লিন। আজ much used much quoted এই শব্দটির অর্থ তোমাদের ভেবে দেখবার জন্যে এখানে ডেকেছি। ওই তিনটি মেয়ে—ওই শিখা বিশ্বাস, রেখা দাস আর ললিতা দাশগুপ্ত—ওই তিনটি মেয়ের সম্বন্ধে কথা বলবার জন্যেই আমরা এখানে এসেছি। কিন্তু ওরা উপলক্ষ। ওদের সম্বন্ধে যে ডিসিসন নেবার তা আমি নিয়েছি। আর তা যথাসময়ে ওদের অভিভাবকদের জানিয়েও দিয়েছি।'

জ্ঞানপ্রভা একটু থামলেন। কেউ কোন কৌতূহল প্রকাশ করে কিনা দেখে নিলেন যেন।

সুজাতা লক্ষ্য করল, সিনিয়র টিচারদের মধ্যে কেউ কোন কথা বললেন না। রত্নাদি রমাদি সব একেবারে চুপ। যেন ক্লাস ওয়ান কি ক্লাস টু-এর ছাত্রী হয়ে সব বসে আছেন।

জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ নেই, তবু সুজাতার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল, 'কী ডিসিসন নিয়েছেন?'

একটু অসহিষ্ণু হলেন জ্ঞানপ্রভা। তাঁর মুখ দেখে তা বেশ বোঝা গেল। তবু তিনি শান্তভাবে বললেন, 'বলছি। অধীর হয়ো না। সবই বলছি। বলবার জন্যেই তো ডেকেছি তোমাদের। ওই মেয়ে তিনটির বাড়ি থেকে অনেক ডেপুটেশন এসেছে। তোমাদের কাছে এসেছে, আমার কাছেও এসেছে। অনেক অনুরোধ-উপরোধ, অনেক অনুনয়-বিনয় তোমাদের শুনতে হয়েছে। আবার বাইরে থেকে আমার কঠোরতার কঠোর সমালোচনাও আমার কানে গেছে।

ভেবো না, সন্ন্যাসিনী হয়েছি বলে আমি চোখ-কান বন্ধ করে আছি, কি মুখ বন্ধ করে থাকব। ভেবো না কারো কঠিন সমালোচনা আমাকে কর্তব্য থেকে টলাতে পারবে। তোমরা কেউ কেউ গলে গেছ। ছোট ছোট মেয়েদের কান্নায় কার মন না গলে। আমাদের মতই যাঁরা মায়ের জাত, যাঁরা সত্যি সত্যিই মা হয়েছেন, মায়ের দুঃখ বেদনা লজ্জা গৌরব বহন করেছেন, তাঁদের অনুনয়-বিনয় আমাদের বিচলিত না করেই পারে না।'

রত্নাদি বললেন, 'সত্যি বড়দি, শিখার মা সেদিন সুজাতার হাত দুখানা ধরে যেভাবে বলে গেলেন—'

জ্ঞানপ্রভা বললেন, 'আমি জানি। আমি সব খবরই রাখি। কিন্তু রত্না, এ তো শুধু একটি পরিবারের, এমনকি তিনটি পরিবারের সাময়িক সুখ-দুঃখের ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে একটা গোটা ইনস্টিটিউসন জড়িত। এর সঙ্গে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপল জড়িত। শত শত মেয়ের ভবিষ্যৎ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমরা জানি কুসঙ্গের প্রভাব কত ব্যাপক আর কত গভীর। একটি ছাত্রীর জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে দিতে চাইলেও আমরা তা পেরে উঠি না, কিন্তু কুসঙ্গের প্রভাব তার মনকে কত সহজে অভিভূত করে, কত অনায়াসে টেনে নিয়ে যায়। অনেক যত্ন করে শস্যের চাষ করতে হয়, কিন্তু আগাছা বিনা যত্নে জন্মায়। জন্মায় বলেই কি বুদ্ধিমান চাষী তাকে জমিতে থাকতে দেয়? বাড়তে দেয়? করুণা দেখিয়ে বলে, আহা হয়েছে হোক না, বাড়ছে বাড়ুক না? তা সে কক্ষনো করে না। যত্ন করে যেমন শস্যের চাষ করে, তেমনি সযত্নে বাজে ঘাসগুলিকে নিড়িয়ে ফেলে। উপড়ে দূর করে ফেলে দেয়। একটি প্রতিষ্ঠানকেও তেমনি করে বাঁচতে হয়।'

সুজাতা একটু হাসতে চেষ্টা করল, 'কিন্তু সামান্য একটু নস্যির ব্যাপার—একে আমরা যদি অত বড় করে না দেখে—'

জ্ঞানপ্রভা বললেন, 'নস্যির গুঁড়োটুকুকে তুমি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পার সুজাতা, আমি পারি না। ওই নস্যির গুঁড়োর মধ্যে আমি বিষের গুঁড়ো বিস্ফোরকের গুঁড়ো দেখতে পেয়েছি। আজ যদি তুমি নস্যিকে অ্যালাউ কর কাল সিগারেট আসবে, পরশু মদের বোতল। তুমি ঠেকাবে কী করে?'

সুজাতা হাসল, 'আমরা অতখানি আশঙ্কা নাও করতে পারি বড়দি আপনি ঘাসদূর্বার কথা বলছিলেন। তাকে যত প্রশ্রয়ই আপনি দিন তা কখনো বটগাছ হয় না। ছোট ছোট দোষ-ত্রুটি অন্যায়-অবিবেচনাও নিজের সীমার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। তাদের যতটুকু আয়ু তার চেয়ে তারা বেশি বাঁচে না যতটুকু শক্তি তার চেয়ে বেশি বাড়েও না। আপনি ওই তিনটি মেয়েকে জরিমান করতে পারতেন, একস্কুল মেয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে তাদের কঠিন তিরস্কার করতে পারতেন—'

জ্ঞানপ্রভা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'কী পারতাম না পারতাম তা বি

আমাকে তোমার কাছে শিখতে হবে সুজাতা? আমি ইচ্ছে করলে ওদের ক্ষমা করতেও পারতাম। সে ক্ষমতাও আমার ছিল, আছে।'

সুজাতা বলে উঠল, 'তবে তাই করুন বড়দি। আপনি ওদের এবারের মত ক্ষমাই করুন। ওদের তিনজনের ভার আমি নিচ্ছি। আমি ওদের চোখে চোখে রাখব, স্পেশাল কেয়ার নেব আমি।'

জ্ঞানপ্রভা বললেন, 'না সুজাতা, ডিসিসন আমি নিয়ে ফেলেছি। এই ইনস্টিটিউশন ছেড়ে ওদের চলে যেতেই হবে। তোমরা অবাক হচ্ছ। হয়তো তোমাদের মনে হচ্ছে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিচ্ছি আমি। এই মুহূর্তে তোমাদের চোখের সামনে হয়তো আমি নিষ্ঠুর ক্রূর রণচণ্ডীর মূর্তি ধরে বসে আছি। আমি তা জানি। তবু যা আমি করেছি তা করেছি। হঠাৎ কিছু করে ফেলিনি। বিচার বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে ভেবে চিন্তে করেছি।'

সুজাতা একটু হতাশার ভঙ্গি করে বলল, 'তা হলে আর—'

জ্ঞানপ্রভা মৃদু হাসলেন, 'তা হলেও তোমাদের ডেকেছি কেন এই তো প্রশ্ন? ডেকেছি তোমাদের কারো কারো মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত সহনশীলতা দেখছি বলে। কোন কিছুই মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া ভালো নয়। করুণা, দয়ামায়া এরও একটা মাত্রা আছে। অযোগ্য পাত্রে করুণা বর্ষণ মানে অনেক যোগ্য পাত্রের প্রতি নিষ্করুণ হওয়া। অযোগ্য ক্ষেত্রে দয়ালু হওয়া মানে অনেক যোগ্য ক্ষেত্রে নির্দয় হওয়া, নিস্পৃহ থাকা। দয়ামায়া স্নেহ এই সব বৃত্তিগুলিতেও সংযম দরকার। সংযম শুধু রাগ-দ্বেষেই নয়, আমাদের কোমল বৃত্তিগুলির অনুশীলনেও সংযম চাই। স্নেহান্ধ বাপ ক্রোধান্ধ বাপের চেয়ে ছেলের কম ক্ষতি করেন না। হৃদয়ের এই কোমল বৃত্তিগুলি বড় মায়াবিনী। আমাদের অক্ষমতা, দুর্বলতা, জড়তা, উদাসীনতা দয়ামায়ার মুখোশ পরে আসে। সহনশীলতার এমন একটা আলগা মাহাত্ম্য আছে যাতে আমরা ভুলে যাই। আমরা মহৎ হতে গিয়ে দুর্বল হই। আর সেই ছিদ্রপথে পাপ ঢোকে। সুজাতা, তোমার কিছু বলবার আছে?'

'না বড়দি, আপনি বলুন, আমরা শুনছি।'

সুজাতা মনে মনে ভাবল, সেও তো আগে এই পথেরই পথিক ছিল। সেও তো ভাবত 'কোন অন্যায় সহ্য করব না। সে অন্যায় যদি বাবা করেন তাঁকে অগ্রাহ্য করব। যদি স্বামী করেন তাঁকেও অগ্রাহ্য করব। অশাস্ত্রীয় কোন কাজ অশুচিকর কোন আচরণ অসামাজিক কোন সম্পর্ক সহ্য করব না।'

এ জপমন্ত্র তো সুজাতারও ছিল। কিন্তু আজ? আজ এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরে এই নিঃসঙ্গ নিঃসন্তান নির্বান্ধব দিনগুলি কাটাতে কাটাতে সুজাতার কি মাঝে মাঝে মনে হয় না সে ভুল করেছে? হয়তো সহনশীলতা দিয়েই স্বামীকে সে শোধরাতে পারত। সাময়িক পরাজয় স্বীকার করে হয়তো শেষ বয়সে বিজয়িনী হতো। অনেক মেয়েকেই তাই হতে দেখেছে সুজাতা, শুনেওছে। চূড়ান্ত অমিতাচারী পুরুষও বেশি বয়সে এসে স্ত্রীর কাছে নত-

জ্ঞান হয়েছে। ত্রুটি স্বীকার করেছে। হয়তো অতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো না সুজাতাকে, তার আগেই স্বামী হয়তো এসে ধরা দিত। সুজাতা আজকাল ভাবে, বিদ্রোহে আপাত গৌরব, কিন্তু শেষ শান্তি অ্যাডজাস্টমেন্টে। মেনে নিতে নিতে আর একজনকে হয়তো মেনে নেওয়া শিক্ষা দেওয়া যেত। নিজের সহনশীলতা দিয়ে আর একজনের সহানুভূতি হয়তো আকর্ষণ করতে পারত সুজাতা। তার মনে এই সব বিপরীত চিন্তা এসে আজকাল ভিড় করে। কাউকে বলে না সুজাতা। বলবার কেই বা আছে। কেউ নেই। ছাত্রীদের প্রতি সহকর্মিনীদের প্রতি আরো সদয় আর সহনশীল হয়ে সুজাতা নিজের আচরণ শুধরে নিতে চায়, নিজের ব্যবহার দিয়ে নিজের মতবাদের প্রতিবাদ করে।

'তোমার কিছু বলবার আছে সুজাতা? আমার মনে হচ্ছিল তুমি যেন কিছু বলবে।'

'না বড়দি, আপনি বলুন।'

জ্ঞানপ্রভা বলতে লাগলেন, 'এ তো আমাদের একটা ছোট স্কুল। কিন্তু এই শৈথিল্য আমি আরো বড় বড় ক্ষেত্রেও দেখি। দেখি সমাজের ক্ষেত্রে, দেখি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে।'

রমাদি বললেন, 'আশ্চর্য, আপনি ওসব কথাও ভাবেন নাকি বড়দি।'

জ্ঞানপ্রভা বললেন, 'ভাবি বইকি। সত্যি সত্যিই তো আমরা সমাজ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে পারিনি। চুকিয়ে দিতে চাইওনি। যতক্ষণ আমার চৈতন্য এই জীবদেহকে আশ্রয় করে আছে, আর যতক্ষণ আমি আমার জীবদেহ সম্বন্ধে সচেতন ততক্ষণ আমার সবই আছে—সমাজও আছে সংসারও আছে। হয়তো একজন গৃহস্থ কি গৃহিণীর যেভাবে আছে আমার সেভাবে নেই। কিন্তু আমি যখন একটা স্কুল চালাই আমাকে দেখতে হয় কোন কোন পরিবার থেকে মেয়েরা আসে। তাদের বাপ মা কোন সমাজের মানুষ, কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। তাদের আমি যে সব বই পড়তে দিই তাদের লেখক কারা প্রকাশক কারা, সব দিকে আমাকে নজর রাখতে হয়। দিনের যে মুহূর্তে আমি শুধু নিজের মধ্যে বাস করি শুধু সেই মুহূর্তটিতে আমি গুহাগহ্বরবাসিনী কিন্তু দিনের যে বারো-তের ঘণ্টা কি আরো বেশি আমাকে স্কুল নিয়ে থাকতে হয় স্কুলের ভাবনা ভাবতে হয়, সেই দীর্ঘ সময় আমি সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের সঙ্গে সহস্র বাঁধনে বাঁধা। সংসার-বন্ধন অস্বীকার করেছি, কিন্তু যতক্ষণ আমি স্কুলের একজন টিচার, সমাজের বাঁধন আমার অস্বীকার করবার জো নেই সমাজ আর রাষ্ট্রে গাঁটছড়া বাঁধা। আমরা যদিও চিরকুমারী, গিঁট আমাদেরও আছে।' জ্ঞানপ্রভা একটু হাসলেন, 'কথায় কথায় আমাদের সেক্রেটারিয়েটে ছুটতে হয়, ফোন করতে হয়, চিঠি লিখতে হয়। এডুকেশন বোর্ডের সঙ্গে কখনো ঝগড়া করতে হয়, কখনো আপোস করতে হয়। এখনকার অধ্যাত্ম শক্তিও রাজশক্তির হাত ধরা। আমার কোন কোন কলীগ এ কথা বুঝতে চান না।'

কলীগ বলতে কি বড়দি শুদ্ধানন্দকে বোঝাতে চাইছেন না আর কাউকে? সুজাতা ভাবল।

জ্ঞানপ্রভা বলতে লাগলেন, 'তাই সমাজে রাষ্ট্রে কী হচ্ছে না হচ্ছে আমি মাঝে মাঝে দেখতে চেষ্টা করি। অবশ্য দূর থেকেই দেখি। ঘনিষ্ঠ সংযোগ তো আমার নেই। আমি তা রাখতেও চাইনে। দেখি আর রাগে আমার গা জ্বলে যায়। সহনশীলতার নামে কী অসহনীয় কাণ্ডই না সব হচ্ছে। আমরা চোরাকারবারীদের সহ্য করছি, কালোবাজারীদের সহ্য করছি। আমরা খাদ্যে ভেজাল ওষুধে ভেজাল পাঠ্যপুস্তকে ভেজাল সহ্য করছি। সব এই গণতন্ত্র আর সহনশীলতার নামে। রাজ্য জুড়ে যদি এমন অশুচিতার প্রতাপ চলতে থাকে, সাধারণ একটি মেয়ে স্কুলের শুচিতা আমি কতক্ষণ রাখতে পারব? আমার স্কুল তো একটা দ্বীপের মধ্যে নয়, সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রের মধ্যে তার অবস্থান। সমাজের কল্যাণে রাষ্ট্রের কল্যাণে তার প্রতিষ্ঠা।'

উত্তেজিত জ্ঞানপ্রভা একটু থামলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, 'কিন্তু আমাদের যাঁরা দণ্ডধর তাঁরা যেন ব্যজনধারী হয়ে বসে আছেন। এদিকে গিরিগোবর্ধনের ভার ক্রমেই দুঃসহ হচ্ছে।'

শ্যামলীও একটি চেয়ার নিয়ে এক পাশে বসেছিল। সে বলে উঠল, 'এ-সব কথা তো কোন কোন রাজনৈতিক দল বলে বড়দি। ওরা তো শুনেছি আমাদের দু চোখে দেখতে পারে না। ওরা যা বলে আমাদের কি তাই বলা উচিত?'

একটু তরল সুর শ্যামলীর।

জ্ঞানপ্রভা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। যেন বুঝতে চাইলেন তার বক্রোক্তির লক্ষ্যটা কোনদিকে।

জ্ঞানপ্রভা বললেন, 'আশ্রমে আমি রাজনৈতিক আলোচনা টেনে আনতে চাইনে। আমরা রাজশক্তির অধীন হলেও রাজনীতির চর্চা আমাদের কাজ নয়। ওরা আমাদের দুচোখে দেখতে পারে না তুমি ঠিকই বলেছ। ওরা পারে তো বুলডোজার দিয়ে সব গীর্জা মঠ মন্দির মসজিদ উপড়ে ফেলে দেয়। ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করে সব সমতল শস্যক্ষেত্র বানিয়ে দেয়। কিন্তু এই মত কি শুধু ওদের? এখনকার বুদ্ধিজীবী মাত্রেই তো ওই পথের পথিক। কিন্তু ওঁরা জানেন না চাকা আস্তে আস্তে ঘুরছে, আরো ঘুরবে। এখনকার ফিজিক্স মেটাফিজিক্সের ধার ঘেঁষে চলেছে। এখনকার মেটাফিজিক্স এগিয়ে এসে ফিজিক্সের হাত ধরতে চাইছে। যতক্ষণ জন্ম আর মৃত্যু এই দুই রহস্যদ্বার আছে ততক্ষণ মিস্টিসিজম আছে। অল্প বয়সে না থাকলেও বেশি বয়সে তা আসবে। পঞ্চাশে না আসুক ষাটে আসবে, ষাটে না আসুক সত্তরে আসবে। যে শুধু এক চোখ দিয়ে দেখে, এক কান দিয়ে শোনে, এক যুক্তি ছাড়া আর দ্বিতীয় যুক্তি দেখতে পায় না, তাদের কথা আমি বলছি না; কিন্তু যাঁরা সত্যিই সংবেদনশীল, চিন্তাশীল, কল্পনাশক্তিযুক্ত তাঁরা শুধু জড়বাদে মুক্তি পাবেন

না। তাঁরা একই সঙ্গে জড়বাদীও হবেন অধ্যাত্মবাদীও হবেন। কারণ জীবনই তাই। তা একই সঙ্গে জড় আর চৈতন্যে গ্রথিত। এই বিশ্বের বিস্ময়করতায় তাঁরা চিরকাল বিস্মিত হবেন। তাঁরা সব রহস্যভেদের জন্যে এগিয়ে যাবেন, সেই সঙ্গে এও জানবেন, সব রহস্য ভেদ করা যাবে না।'

জ্ঞানপ্রভা থামলেন।

সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

খানিক বাদে সুজাতা বলল, 'তাহলে ওদের সঙ্গে আপনার কোথায় মিল?'

জ্ঞানপ্রভা বললেন, 'কোথায় মিল? মিল কল্যাণের ক্ষেত্রে। সমস্ত রাজনীতি কূটনীতির ঊর্ধ্বে যেখানে আমি ওদের হিউম্যানিজম দেখতে পাই, যেখানে ওরা সত্যিই শ্রমিকের মুক্তি চায়, শূদ্রের মুক্তি চায়, শ্রেণীগত শাসন-শোষণ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চায়, সেখানে আমার অন্তর সায় দিয়ে ওঠে। তখন আমি বিচার করতে যাই না ওরা অধ্যাত্মবাদী না জড়বাদী। অনেক অধ্যাত্মবাদীও আসলে জড়বাদীর মত ব্যবহার করেন। মানুষকে তাঁরা জড়ের তুল্যই মনে করেন। ওরা যেখানে দারিদ্র্য অশিক্ষা দুর্নীতির হাত থেকে মানুষের মুক্তি চায়, সে জন্যে চেষ্টা করে, সেখানে ওদের সঙ্গে আমার মিল। আর মিল শৃঙ্খলাবোধে আর দণ্ডনীতিতে। ডিসিপ্লিন আর ডিসিপ্লিনারি অ্যাকসনে। ওরা জানে, যে অপরাধী, যে কঠোর দণ্ড পাবার যোগ্য, তাকে দণ্ড না দিলে হাজার হাজার লাখ লাখ নিরপরাধ দণ্ডিত হবে।'

সুজাতা বলল, 'ওরা কিন্তু ভুলও করে বড়দি। ওদের মধ্যে দল উপদলের লড়াই কি কম? যে উপদলের হাতে যখন ক্ষমতা, যে দলপতির হাতে যখন ক্ষমতা, তিনিই কি বলতে থাকেন না—মামেকং শরণং ব্রজ; তিনিই কি তখন অবতারের অহমিকা নিয়ে নেমে আসেন না?'

জ্ঞানপ্রভা সুজাতার দিকে তাকালেন। এবার আর ধমক দিলেন না। আস্তে আস্তে বললেন, 'তা হয়তো আসেন। রাজনীতির যদি কোন অভিশাপ থাকে তা ওই। ক্ষমতাপ্রিয়তা। এই লোভ যে কোন ক্ষমতাবানের মজ্জার সঙ্গে মিশে আছে। তাকে আলাদা করা বড় কঠিন। দলই বল উপদলই বল, দলপতিই বল উপদলপতিই বল, রাজনীতিতে নামলে সবাইকেই শাসন-ক্ষমতা দখল করতে হয়। আর সেই দখলী স্বত্ব বলবৎ রাখবার কলা-কৌশল আয়ত্ত করতে হয়, যে কৌশল রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রায়ই কূটকৌশল। তবু তা যতটা নির্মল হয় ততই ভালো। আমি আদর্শের কথা বলছি। আমি তো বলিনি আমি ওদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করি। আমি তো বলিনি আমি ওদের সর্দৈবানুমতঃ সুহৃদ। আমি ওদের কতকগুলি আদর্শের কথা নিয়ে আলোচনা করছি।'

সুজাতার বেশ লাগছিল। এই সব তর্ক সে দাদার ড্রয়িংরুমে বসে শুনেছে। যোগ দেয়নি। চুপচাপ শুনে গেছে। সেই তর্ক সেই চিন্তার স্পন্দ যে এই আশ্রমের ঘরে এসেও পৌঁচেছে, তাতে সুজাতা প্রত্যাশার অতীত আনন্দ

পেল। তখন রাজনৈতিক আলোচনায় সুজাতার কোন উৎসাহ ছিল না। সে বরং এসব বাজে আলোচনায় তখন উদাসীন ছিল। কিন্তু এই আশ্রমে যেখানে সংসারের আর কোন আবহাওয়াই নেই, সেখানে এই রাজনৈতিক আলোচনার অনুষঙ্গ হঠাৎ যেন দাদার সেই ড্রয়িংরুম, দাদা আর দাদার বন্ধুদের সঙ্গ দিল সুজাতাকে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা মনে পড়ল, মনটা কেমন যেন কাতর হয়ে উঠল। আর সেই কাতরতা কাটাবার জন্যেই যেন সুজাতা ফের বড়দির সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল। সে লক্ষ্য করছিল এখানে আর কারো কথা বলবার সাহস নেই। তর্ক করা তো দূরের কথা।

সুজাতা বলল, 'আমিও সেই প্রিন্সিপলের কথা বলছি বড়দি। দুই দলে সেখানেই তো অমিল। আপনি ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করবেন, তার যে কোন ভাব প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করবেন, আবার খানিক পরিমাণে ডিকটেটরশিপও চাইবেন, তাই কি হয়? আমি কারো ডিকটেটরশিপ মানতে রাজী নই। না ব্যক্তির না দলের।'

সুজাতার কণ্ঠের দৃঢ়তায় ঘরসুদ্ধ টিচাররা চমকে উঠলেন। বড়দি না জানি কথাটাকে কি ভাবে নেবেন। নিজের গায়ে টেনে নেওয়াই সম্ভব।

কিন্তু আশ্চর্য, বড়দির মুখে সেই হাসিটুকু লেগে আছে।

বড়দি অভয় দিয়ে বললেন, 'বল সুজাতা। তোমার কথা শেষ কর।'

সুজাতা বলতে লাগল, 'যে কোন আধিপত্য আমি অপছন্দ করি। তা ধর্মের নামেই হোক, সমাজের নামেই হোক আর রাষ্ট্রের নামেই হোক। আধিপত্য এমনই জিনিস তা হাতে পেলে কেউ তা ছাড়তে চায় না। দলের হাতে পড়লে দল ছাড়ে না, ব্যক্তির হাতে পড়লে ব্যক্তি ছাড়ে না। আমি বলি মেজাজভেদে প্রকৃতিভেদে মানুষ গণতন্ত্রী হয়। আর সেই মেজাজভেদে প্রকৃতিভেদে মানুষ জঙ্গীবাদী হয়। আমি সাম্যবাদী বলব না। কারণ যথার্থ সাম্যবাদের সঙ্গে আমার বিরোধ নেই। সেখানে ক্ষমতারও সমতা আছে। কিন্তু তা এই পৃথিবীর কোথাও নেই। কোন কোন মানুষের মেজাজ বশিষ্ঠের মেজাজ। আবার কেউ কেউ বিশ্বামিত্র। বরং পরশুরামের সঙ্গে তাঁদের তুলনা ভালো চলে। তাঁরা শুধু কুড়ুল দিয়েই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করতে চান। যেন তা করা সম্ভব। তিনি নিজেই যে কত বড় একজন উগ্রস্বভাব ক্ষত্রিয় তিনি তা ভুলে যান। এই বশিষ্ঠেরা দুই ক্যাম্পেই আছেন। আবার পরশুরামেরাও কুঠার কাঁধে দুই দলেই ঘোরাফেরা করেন। পরশুরাম তাঁর দলের আর কাউকে দ্বিতীয় পরশুরাম হতে দিতে চান না। তিনি দলের আর সবাইকে চাকর বানিয়ে রাখেন। সেই জন্যে ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে শূদ্রেরা গিয়ে মেলে। তাদের মিলতে কোন আপত্তি হয় না। যাদের স্বাতন্ত্র্যেরও বালাই নেই, ব্যক্তিত্বেরও বালাই নেই, তারাই স্বৈরতন্ত্রের পরম সমর্থক।'

আর একবার টিচাররা শঙ্কিত হলেন। তাঁরা হয়তো ভাবলেন বড়দি এবার

কথাটা নিশ্চয়ই নিজের গায়ে টেনে নেবেন।

কিন্তু জ্ঞানপ্রভা হাসলেন, 'বুঝতে পেরেছি, তুমি পরশুরামের কেউ নও। তুমি বশিষ্ঠের ধর্মপত্নী অরুন্ধতী।'

বড়দির এই রসিকতায় ঘরসুদ্ধ মেয়েরা হেসে উঠলেন।

জ্ঞানপ্রভার মুখ থেকে এমন নির্মল কৌতুক কদাচিৎ বেরোয়।

সুজাতা আরক্ত হয়ে বলল, 'আমি কারো ধর্মপত্নী নই। আপনি যতই ঠাট্টা করুন, পৃথিবী রসাতলে গেলেও আমি কক্ষনো আর পারসিকিউসনের পক্ষে যাব না। পারসুয়েসনের শক্তিতেই বিশ্বাস করে থাকব।'

আর প্রায় সেই মুহূর্তে যূথিকা এল ঘরে। সে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠে এসেছে। যূথিকা—গায়ের রং ফর্সা বলে যে মেয়েটিকে ধবলী বলে ঠাট্টা করে শ্যামলী। বড় বড় শান্ত দুটি চোখ আছে বলে গবাক্ষী বলে ক্ষেপায়।

জ্ঞানপ্রভা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার! তুমি অমন হাঁপাচ্ছ কেন যূথিকা?'

যূথিকা বলল, 'নিচে দুজন ভদ্রমহিলা এসেছেন। তাঁরা সব অদ্ভুত কথা বলছেন।'

'কি রকম?'

'তাঁরা বললেন, সুজাতা নামে না কি এখানে একটি মেয়ে আছে। তাঁদের বাড়ির বউ। আর তাঁরা নাকি তার জা।'

রত্নাদি বললেন, 'যাঃ, তা কি করে হয়, তুই একটা সত্যি হাবা মেয়ে। কুমারী মেয়ের কি কোন জা ননদ থাকে? তাঁরা নিশ্চয়ই অন্য কারো কথা বলছেন। ভুল করে এই আশ্রমে চলে এসেছেন। এখানে তো বিবাহিতা কোন মেয়ে থাকে না। তুই বলতে পারলিনে সে কথা?'

যূথিকা বলল, 'তাঁরা আরো বললেন শশাঙ্কবাবু নামে একজন ভদ্রলোকও ওঁদের সঙ্গে এসেছেন। পুরুষ বলে তিনি আশ্রমে ঢুকতে পারেননি। গেটের বাইরে গাড়িতে বসে আছেন। সুজাতাদির সঙ্গে তাঁরা দেখা করতে চান।'

ঘরের সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল।

জ্ঞানপ্রভা বললেন, 'ওঁদের কি বলা যায় বল তো সুজাতা! রত্না যা বলছিল তাই কি ঠিক? ওঁরা কি ভুল করেছেন?'

সুজাতা যন্ত্রের মত বলল, 'হ্যাঁ, ওঁরা ভুল করেছেন।'

জ্ঞানপ্রভা যূথিকাকে বলে দিলেন, 'যাও ওঁদের বল গিয়ে এখানে তেমন কেউ থাকেন না। তাঁরা ভুল ঠিকানায় এসেছেন।'

যূথিকা বলল, 'তাঁরা আপনার সঙ্গেও দেখা করতে চাইছেন বড়দি।'

জ্ঞানপ্রভা বললেন, 'তাঁদের গিয়ে বলো আজ দেখা হবে না। দেখা করতে হলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে হবে। আজ আমরা খুব ব্যস্ত।'

যূথিকা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল।

জ্ঞানপ্রভা অন্য টিচারদের বললেন, 'তোমরা এবার যাও।'

কিন্তু সুজাতাকে চোখের ইঙ্গিতে থেকে যেতে বললেন।

সবাই চলে গেলে জ্ঞানপ্রভা সুজাতার মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

'সুজাতা!'

'বলুন!'

'আমি সব জানি। স্বামী শুদ্ধানন্দ আমাকে সব বলেছেন। বলতে তিনি বাধ্য। তেমনি তাঁর কোন কোন অনুরোধ আমাকে রাখতে হয়। কিন্তু এখন কী আমি করতে পারি? তুমি যদি যেতে চাও, বল আমি তার ব্যবস্থা করে দিই। ঠিক এখনই নয়। এখন তো ওঁরা চলে গেলেন। গাড়ির শব্দ শুনলাম। আরো রাত্রে। কি কাল সকালে।'

সুজাতা অসহায় অপরাধিনীর মত বলল, 'না বড়দি, আপনি আমাকে যেতে বলবেন না। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।'

কোথায় সেই ক্ষণপূর্বের স্বাতন্ত্র্যবাদিনী তেজস্বিনী নারী? যেন সুজাতা নয়, শিখা রেখা ললিতার মতই একটি স্কুলের ছাত্রী অপরাধ করে জ্ঞানপ্রভার কাছে মার্জনা চাইছে, আশ্রয় চাইছে। আপাত অপমান অগৌরবের ভয়ই তার কাছে এখন বড়। তার জন্যে সে যথার্থ সম্মান স্বাধীনতা বিলিয়ে দিতেও এখন প্রস্তুত।

জ্ঞানপ্রভা এক মুহূর্ত সুজাতার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মৃদু-স্বরে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি এখন ঘরে যাও। দেখি আমি কী করতে পারি। স্বামী শুদ্ধানন্দের সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ করতে হবে। আমি একা সব ঝুঁকি নিতে পারব না। কিন্তু আমার যতদূর সাধ্য আমি তোমার জন্যে করব। তুমি ঘরে যাও সুজাতা।'

কিন্তু ঘরে গিয়ে সুজাতা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। ছি ছি ছি, এ কী করল সুজাতা। তার নিজের ঘর তো এখানে নয়। সে তো সেই বেনেপুকুরে। এতদিন বাদে সেই ঘর থেকে ফের ডাক এসেছিল। তবু কেন ফিরে যেতে পারল না সুজাতা। কেন মিথ্যা ভয়, সম্মান হারাবার লজ্জা তার দু পায়ে বেড়ি হয়ে জড়িয়ে ধরল। কেন ছিঁড়তে গিয়েও শুকনো লতার বাঁধন সুজাতা ছিঁড়তে পারল না?

যে আশ্রমের নিয়মকানুন সে মানে না, পদে পদে সে যার বিরুদ্ধতা করে, কোন মোহে কিসের লোভে আজ সেখানেই পড়ে রইল সুজাতা? এরপর যদি এখানে থাকতেও পারে, তাকে চিরদিন জ্ঞানপ্রভার দাসী হয়ে থাকতে হবে। আর কি বড়দির সামনে কোনদিন মাথা তুলতে পারবে?

॥ ১৩ ॥

ধর্মতলা স্ট্রীটে মোহন প্রোডাকসনসের অফিসে চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিল শশাঙ্ক। নিমন্ত্রণকর্তা মুরারিমোহন। নিমন্ত্রিত শুধু শশাঙ্ক।

নতুন ছবির কন্ট্রাক্ট পেয়েছেন মুরারিমোহন। এবার নিজের ব্যানারে ছবি তুলছেন। শুরুতে নিজের তহবিল নিয়ে নামতে হবে। তার পরিমাণ হাজার পঞ্চাশেক। সেইজন্যে নতুন কোম্পানী, নতুন অফিস। মুরারিমোহন নিজেই যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠেছেন। শশাঙ্ক দেখে আর অবাক হয়। কী কর্মব্যস্ত মুরারিমোহন। ফোন করছেন, ফোন অ্যাটেন্ড করছেন। পাশের ঘরে স্ক্রিপট লেখার কাজ চলছে। কাহিনী মুরারিবাবুর নিজের। একজন তরুণ লেখককে ঘষামাজার কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। বার বার সেখানে উঠে উঠে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে দু-একজন আর্টিস্ট আসছেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। চুক্তির শর্ত নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কাজ কতদিনের হতে পারে, তার মোটামুটি হিসাব নিচ্ছেন।

অফিস ঘরের পাশেই ছোট একটি অ্যাণ্টি-চেম্বার। বেশ বোঝা যায়, এই ঘরটুকু মুরারিমোহনের নির্জন পানকক্ষ। এ-ঘর তাঁর ভাবনার, দুর্ভাবনার, বিশ্রামের, বিশ্রম্ভালাপের।

অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে শশাঙ্ক এই ঘরে এসেই বসেছে। কিন্তু যাঁর কাছে এল তিনি স্থির হয়ে বসতে পারছেন কই। বার বার এঘর-ওঘর করছেন। পাশের ঘরে গিয়ে একে উপদেশ দিচ্ছেন, ওকে নির্দেশ দিচ্ছেন। কাউকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলছেন, 'আরে এসো এসো।' কাউকে হাঁকিয়ে দিয়ে বলছেন, 'এখন হবে না। পনের দিন বাদে আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

ডিরেক্টর তো নন, ডিকটেটর।

প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ থেকে দূরে নেপথ্যলোকে বসে শশাঙ্ক সব দেখেছে আর শুনেছে।

একটু বাদে মুরারি ফের তাঁর চেয়ারে এসে বসলেন। বন্ধুর দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'তুমি বোধ হয় ইগনোরড্ ফীল করছ। কিন্তু এবার ঘণ্টা-খানেকের জন্যে নিশ্চিন্ত। আর উঠব না।'

কেটলি থেকে বন্ধুর কাপে চা ঢেলে দিতে দিতে মুরারিমোহন বললেন, 'দেখ, খেতে পার কিনা। এখানকার চা মুখে দেওয়া যায় না। তবু তোমার জন্যে একটু বিশেষ ব্যবস্থা করেছি। তাও কি আর বাড়ির মত চা এখানে পাবে? তা পাবে না।'

'বাড়িতে চা বুঝি তোমার খুব ভালো হয়?'

মুরারিমোহন বললেন, 'তা হয়। আমার গৃহিণী চা-টা ভালো করেন, রান্নাটা ভালো করেন, আর সহজে প্রসব করেন। নার্সিং হোম, মানে আধুনিক

আঁতুড়ঘরে গিয়ে কাউকে ট্রাবল দেন না। যার যেটুকু প্রাপ্য তাকে সেটুকু দেওয়া ভালো। Give the devil his due, স্ত্রীকে আমি অবশ্য devil মনে করিনে। দেবী বলেই ভাবি, কখনো বা দেবী বলেই ডাকি।'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'তাই নাকি? নাম ধরে দেবী? না শুধু দেবী?'

মুরারিমোহন বললেন, 'নাম ধরে দেবী বলি চিত্রতারকাদের। স্ত্রীকে কখনো নয়নতারা, কখনো দেবী। দেবী, পরমভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে। সংগে সংগে তর্জন গর্জন শুরু হয়ে যায়—খুব করে গিলে এসেছ বুঝি? কথা শোন। কোন কথার কোন জবাব।'

শশাঙ্কের ঈর্ষা জাগে। মুরারিদা বেশ আছেন। স্বকীয়া পরকীয়া দুই রসেই সমান সিদ্ধ। কী করে ম্যানেজ করেন উনিই জানেন। শশাঙ্ক তো পারল না। দুকুল বজায় রাখতে পারল না। তার কুলবতী কুল ভেঙে আশ্রমে গিয়ে উঠল। সে আর গৃহাশ্রমের কেউ নয়। বউদিদের পাল্লায় পড়ে সেদিন আশ্রমের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল শশাঙ্ক। প্রায় তাড়া খেয়ে ফিরে এসেছে। কেউ দেখাটা পর্যন্ত করেনি। সামান্য ভদ্রতাবোধটুকুও ওদের কারো নেই। বউদিদের কাছে হাস্যাস্পদ হতে হয়েছে শশাঙ্ককে। মুখে যাই বলুন যতই সান্ত্বনা দিন, শশাঙ্কের দুর্দশা দেখে মনে মনে তাঁরা নিশ্চয়ই হেসেছেন। কেন গিয়েছিল শশাঙ্ক? সত্যিই কি কোন প্রত্যাশা নিয়ে গিয়েছিল? সত্যিই কি কাউকে আনতে গিয়েছিল? এখন আর ভেবে ঠিক করা যাবে না। 'আমার সে মন গেছে বহুদূর আমার এ মন ফেলে।' যত মুহূর্ত তত মন। এই মুহূর্তের মন দিয়ে পূর্ব মুহূর্তের মনকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, বোঝাও যায় না। এক মুহূর্ত আগের ইনটেনসিটি কি এই মুহূর্তে আছে? নেই। শশাঙ্ক যখন আর একজন হয়ে নিজেকে দেখে কি নিজেকে আর একজনের চেয়ারে বসিয়ে দেখে, তখন তার মনে হয়, যাকে সে দেখছে, বুঝতে চাইছে, বিচার করতে চাইছে সে ঠিক নীচমনাও নয়, উচ্চমনও নয়—অসংখ্যমনা, বিচিত্রমনা। আর বিচিত্রতর তার কামনা।

মুরারিমোহন বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'কী ভাবছ শশাঙ্ক? তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। তুমি বড্ড বেশি ভাবুক। আর আমি একেবারে উল্টো। এই যে প্রোডাকসনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, খুব বেশি চিন্তা ভাবনার অভ্যাস থাকলে একাজে আমি নামতেই পারতাম না। আমি অজানাকে ভালোবাসি। না ভেবে, না চিন্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভালোবাসি। অজ্ঞাত অপরিচিত মেয়েরা আমাকে ভারি আকর্ষণ করে। তারা যে কোন জাতের যে কোন জায়গার যে কোন চেহারারই হোক না। এই যে একটি থেকে আর একটি আলাদা, তাকাবার ভঙ্গিতে আলাদা, বলার ঢঙে আলাদা, গলার সুরে আলাদা, তাদের এই বৈচিত্র্য আমাকে খুব আনন্দ দেয়। আসলে আমি সেই বৈচিত্র্যটুকুই ভালোবাসি। তোমার বউদিকে কিছুতেই তা বোঝাতে

পারলাম?' মুরারিমোহন একটু হাসলেন, 'আমার স্ত্রীকে তোমার বউদি বলছি, কিছু একটা বলতে হয় বলেই বলছি শশাঙ্ক। যদিও সম্পর্কটা বড়ো পুরোন আর তুমি ওই বস্তাপচা আত্মীয় সম্বোধন পছন্দ কর না, আত্মীয় সম্পর্কগুলি স্বীকারও কর না, তা আমি জানি। তবু সুবিধার জন্যে বউদি বলাই ভালো। বন্ধুর স্ত্রী হলেই তো আর বান্ধবী হয় না। তুমি আমার স্ত্রীর বন্ধু নও।'

শশাঙ্ক একটু হাসল, 'যেন হতে চাইলেই তুমি হতে দিতে!'

মুরারিমোহন শশাঙ্কের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, 'তা বলা যায় না। হয়তো দিতে পারতাম, হয়তো পারতাম না। তোমার মত রূপবান আর কীর্তিমান পুরুষকে নিজের ধর্মপত্নীর কি উপপত্নীর দেওর হতে দিতেও ভয় হয়, বন্ধু হতে দিতেও ভয় হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু খোঁচা খেল শশাঙ্ক। যদিও জানে কৌতুক ছাড়া মুরারিদার মনে এই মুহূর্তে আর কিছু নেই।

এক প্লেট স্যাণ্ডুইচ আনিয়েছেন মুরারিদা, শশাঙ্ক তার একখানি তুলে নিতে নিতে বলল, 'এইখানেই আমাদের ওপর মরালিস্টদের জিত মুরারিদা।'

'কোনখানে?'

'তারা পরস্পরকে বিশ্বাস করে। আমরা যারা ইমমরালিস্ট তারা তা করতে পারে না। ওদের সংঘশক্তি আছে, আচার অনুষ্ঠান আছে, লিটারেচার আছে। আমাদের তা নেই।'

মুরারিমোহন প্রতিবাদ করে বললেন, 'কে বলে নেই! আমাদেরও যা থাকবার তা আছে। আমরা যারা এক পালকের পাখি তারা রুচি রীতি চিন্তা ধারণার দিক থেকে কাছাকাছি থাকি। সেই ব্রাদারহুড কি বড় নয় ব্রাদার? মরালিস্টদের সঙ্গে আমাদের তফাত শুধু এই, ওদের একখানা করে নামাবলী আছে, আমাদের তা নেই। ওদের ওই নামাবলীখানা খুলে নাও, দেখবে ওদেরও গায়ে আমাদের মত ছুলি, দাদ, খোস, পাঁচড়া, গাত্রবিশেষে আরো কত রোগের কত চিহ্ন। একজন মরালিস্ট কি নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশি উদার? কম পাহারাদার? আমি তা বিশ্বাস করিনে।' মুরারিমোহন হেসে সিগারেট ধরালেন।

তত্ত্ব থেকে শশাঙ্ক ব্যক্তিগত আলোচনায় নেমে এল, যা সে ইদানীং কদাচিৎ আসে। 'তুমি কি স্ত্রীকে খুব পাহারা দাও নাকি মুরারিদা?'

মুরারিমোহন স্যাণ্ডউইচে কামড় বসিয়ে বললেন, 'আগে দিতাম। আজকাল আর পাহারা দেওয়ার মত কিছু নেই। দেহখানাকে একেবারে যাচ্ছেতাই করে ফেলেছে। দেখলে নিজের দিদিমা ঠাকুরমার কথা মনে পড়ে। তবু অস্বীকার করব না পাহারা এখনো কিছু কিছু দিই ভাই।'

'এখনো দাও!'

মুরারিমোহন বললেন, 'দিই। গোপন করে হবে কি, স্ত্রীর বেলায় আমি

নিজে আমার ওয়াচ-ডগ। এখনো কোন পরপুরুষের সঙ্গে তাকে কথা বলতে দেখলে ঈর্ষায় জ্বলি, হিংসায় পুড়ে মরি আর সেই জ্বলুনি পুড়ুনি একটু কমলে সহানুভূতির সঙ্গে ভাবি, আমি তাকে সারাজীবন কী পরিমাণ জ্বালিয়েছি। এখন আমাদের দাম্পত্য প্রেম ওই ঈর্ষাটুকুর মধ্যে, হিংসাটুকুর মধ্যেই মুখ লুকিয়ে আছে ভাই। ওটুকু ছাড়লে তো গৃহছাড়া হব।'

শশাঙ্ক চুপ করে রইল। নিজের দাম্পত্য জীবনের কথা তার মনে পড়তে লাগল। স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে সে যেভাবে অপমানিত হয়েছে সে কথা মনে পড়ল। তার আহত লাঞ্ছিত পৌরুষের সেই স্মৃতি বুকের মধ্যে নতুন ক্ষত সৃষ্টি করল। সবাই পারে। সবাই গাছেরও খায় তলারও কুড়ায়। শশাঙ্কই শুধু পারেনি। সে-ই শুধু স্ত্রীকে ঘরছাড়া হতে হাতছাড়া হতে দিয়েছে। কবজীর জোর নেই শশাঙ্কের। কোন জোর নেই। ঘরে স্ত্রী না থাকলে পরকীয়ায় সুখ নেই। তখন পরকীয়া স্বকীয়ারই সামিল। বিবর্ণ, এক-ঘেয়ে। এখন মনে পড়ল শশাঙ্কের, স্ত্রীকে সে ফিরিয়ে আনতেই গিয়েছিল। নিশিবাবুকে দেখে, তাঁর সান্নিধ্যে সাহচর্যে শশাঙ্কের মন ফের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের প্রতি উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিল, আর কেন; যথেষ্ট অপচয় অপব্যয় হয়েছে জীবনের। এবার বাকি জীবনটুকু শশাঙ্ক আত্মগঠনে মন দেবে। বলবে, 'আর কেন মন ভ্রমিছ বাহিরে এবার চল না আপন মন্দিরে।' সেই মনোমন্দির রুদ্ধদ্বার হয়ে পড়ে আছে। সে দ্বার খুলতে হবে এবার। সে মন্দিরে কিসের প্রতিষ্ঠা চায় শশাঙ্ক? অর্থের? যশের? আধিপত্যের? পরম ইন্দ্রিয়পর শশাঙ্কের মন সায় দেয় না। সেই উচ্চ আসনে জ্ঞান আর উপলব্ধির বিগ্রহ ছাড়া আর কিছুকে যেন মানায় না; সারাজীবন অর্থের অন্বেষণই কাম্য এ কথা বলতে লাগে না। যদিও বেশির ভাগ মানুষ তাই করে। সারাজীবন যশের অন্বেষণ করেছি একথা ভাবতে ভালো লাগে না, যদিও জীবনরস তার মধ্যেও আছে। সেই যশে কেউ বা আকাশস্পর্শী হবার স্বপ্ন দেখে, জীবিতকালের বয়ঃসীমা অতিক্রম করবার স্বপ্ন। কারো বা সাধ্য কারো বা সীমানা নিজের অফিস ঘরের চৌহদ্দিটুকুর মধ্যে, পারিবারিক গণ্ডী বন্ধু-চক্র আর পড়শী মহলে। যেটুকুই হোক ওই যশটুকু ছাড়া জীবন বাঁচে না। তবু কি শশাঙ্ক বলতে পারে, সেই যশই একমাত্র আরাধ্য? একমাত্র সুখের আধার, একমাত্র অন্বেষণের বস্তু? পারে না। তাহলে কী বাকি রইল? ক্ষমতা? জনগণের ওপর জনমনের ওপর আধিপত্য? শশাঙ্কের রাজনৈতিক জীবন নেই, রাজনৈতিক চিন্তাও নেই। সেই আধিপত্যে কী যে সুখ তা শশাঙ্ক কল্পনা করতে পারে না। সেই ক্ষমতা লাভের জন্যেও প্রাণপণ করা যায় একথায় তার মন ওঠে না। ব্যক্তিগত জীবনে কিছু ক্ষমতা চাই বইকি। পারিবারিক জীবনে কর্তৃত্ব, ঝি-চাকরের ওপর প্রভুত্ব আর একটু বড় হলে বয়স বাড়লে সহকর্মীদের মধ্যে মোড়ল হওয়ার সুখ—এইটুকু হলেই যেন চলে যায়। সেই

ক্ষমতা কিছু অর্থের মধ্যে, কিছু বা যশের মধ্যে মিশে থাকে। সেই ন্যূনতম ক্ষমতাটুকু চাই বইকি। কিন্তু তাকেই সহস্র গুণ করে বাড়িয়ে যাওয়ায় জীবনের পরম পরিতৃপ্তি, এ কথা ভাবতে শশাঙ্কের মন সায় দেয় না। তাহলে বাকি থাকে প্রেম আর জ্ঞান। শশাঙ্কের মন বলে দুই-ই বরণীয়। সে-ই ভাগ্যবান যে প্রেমের ভাষাও আয়ত্ত করেছে, জ্ঞানের ভাষাও আয়ত্ত করেছে। শশাঙ্ক অস্থিরমতি। শশাঙ্ক বহুচারী, বহুকামী। একবার এগিয়ে এর হাত ধরতে যায়, আর একবার ওর হাতের দিকে হাত বাড়ায়, কেউ ধরা দেয় না। প্রিয়াকে বুকে নিয়ে ভাবে জ্ঞানান্বেষণের কথা। আবার সেই অন্বেষণের পথে নেমে নারীর রূপে ভুলে যায়। সত্যের জন্যে তৃষ্ণা কিন্তু মায়াতে মজে, হিরণ্ময় আবরণটুকুকেই বরণীয় মনে করে। এ জীবনে সেই আবরণ উন্মোচন আর হল না। তবু শশাঙ্কের মনে হয়, সেই রহস্য উন্মোচনই জীবনের লক্ষ্য হলেও হতে পারে। আত্মোপলব্ধি, আত্মান্বেষণ। নামই যদি কিছু একটা দিতেই হয় গালভরা নামই ভালো।

নিশিবাবুকে দেখে এ-সব কথাই কিছুদিন ধরে শশাঙ্কের মনে হয়েছে। যদিও এই যৌনসম্পর্কহীন জীবনকে শশাঙ্ক কাম্য মনে করে না। সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ বলেও ভাবে না। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা নিতান্তই আংশিক অভিজ্ঞতা। নারীকে শুধু মা আর ভগ্নী হিসাবে পেলেই পুরোপুরি পাওয়া হল না, প্রিয়ারূপে পেলেই তবে পরিপূর্ণতা। সেই প্রিয়ার মধ্যে মা-ও আছে, বোনও আছে, সখীও আছে, বান্ধবীও আছে! কিন্তু সেই প্রিয়া কি একজনের মধ্যে আছে না নানাজনের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, শশাঙ্কের কাছে এ সমস্যার কোন সমাধান নেই। যে একজনের মধ্যে অনেককে পায় সে ভাগ্যবান। কিন্তু শশাঙ্ককে অনেকের মধ্যে একজনকে খোঁজার দুর্ভাগ্য বহন করতে হবে।

মুরারীমোহন বললেন, 'কী হল হে শশাঙ্ক! তুমি এমন গুম মেরে গেলে যে? ডাকলাম তোমাকে কথা বলবার জন্যে, মানে কথা শোনবার জন্যে, আর তুমি শুধু নিজের মনে মনে কথা বলছো? Selfish player কোথাকার। বন্ধুকে সামনে বসিয়ে স্বগত চিন্তা! অত্যন্ত গর্হিত শশাঙ্ক, অত্যন্ত গর্হিত। মুরারিমোহন হেসে উঠলেন।

বন্ধুর ধমকে শশাঙ্ক একটু চাঙ্গা হয়ে উঠল। হেসে বলল, 'বলো, তোমার হিত কথাই শুনি।'

মুরারিমোহন বললেন, 'আচ্ছা, আমার সখি লিখিত সুসমাচার তোমাকে পরে শোনাচ্ছি। কী ভাবছিলে বল তো।'

শশাঙ্ক বলল, 'কিছুই ভাবছিলাম না।'

তারপর নিজের অজ্ঞাতে তার চিন্তা-ভাবনার অনেকগুলি অদৃশ্য ধাপ পার হয়ে শশাঙ্ক হঠাৎ বলে ফেলল, 'আচ্ছা, একটা কেস করে দিলে কেমন হয়?'

মুরারিমোহন অবাক হয়ে রইলেন। একটু বাদে বললেন, 'কেস! কিসের কেস?'

শশাঙ্ক বলল, 'ধরো ওই আশ্রমের বিরুদ্ধে একটা কেস করে দিলে হয় না? কোন আশ্রমই হোক আর যেই হোক, কেউ যদি জোর করে একজনের স্ত্রীকে আটকে রাখে তাহলে কি তার বিরুদ্ধে কেস করা চলে না? তুমি তো ল'ও পড়েছিলে। কেবল পরীক্ষাটা দাওনি। তুমি কী বলো?'

মুরারিমোহন বন্ধুর মুখের দিকে একটুকাল আড়চোখে তাকিয়ে থেকে হো-হো করে হেসে উঠলেন। 'তাই বলো শশাঙ্ক, তাই বলো। পরস্ত্রী প্রসঙ্গ তোমাকে আপন স্ত্রীর মুখ মনে করিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণ বসে বসে তুমি সেই মুখই ধ্যান করছিলে। তোমার এ কী অধোগতি শশাঙ্ক! দুর্গা দুর্গা, একী দুর্গতি।'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'দুর্গতি কেন বলছ?'

মুরারিমোহন বললেন, 'দুর্গতি ছাড়া কী। আরে যে ছেড়ে চলে গেছে তাকে যেতে দাও। তাকে দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে। কেড়ে নেওয়ার মত পৃথিবীতে আরো অনেক বস্তু আছে। আমরা কি ফরিয়াদী হওয়ার জন্যে এসেছি শশাঙ্ক? আমাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য লোকের অসংখ্য নালিশ। সেই আমাদের গৌরব। আমরা শান্তশিষ্ট ভালো ছেলের মত ক্লাস-টিচারের কাছে গিয়ে নালিশ করি না, স্যার, হরি আমার দো-রঙা পেনসিলটা নিয়ে গেছে। বরং পারি তো হরি হয়ে হরণ করি। দস্যু হয়ে ডাকাতি করি। আমি তো ভাবতেই পারিনে শশাঙ্ক,—আদালতে তুমি গিয়ে বলবে, ধর্মাবতার, অমুকে আমার রাঙা বউকে ধরে রেখেছে। আপনি ছাড়িয়ে দিন।'

ফের হো হো করে হেসে উঠলেন মুরারিমোহন। তারপর হাসি থামিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'দুদিন সবুর করো শশাঙ্ক, সবুর করো। এতদিনই গেছে আরো ক'টা দিন যাক। তোমার দেবীচৌধুরানী নিজেই পায়ে হেঁটে তোমার দোরে এসে দাঁড়াবে। তার সেই আসাটাই সত্যিকারের আসা। বাপের বাড়ি থেকে আশ্রম বাড়িতে গিয়েছে। আশ্রম বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে আসবে। সবকিছুরই একটা প্রসেস আছে। মামলা মোকদ্দমা করে টেনে হিঁচড়ে তাকে আনতে গেলে তোমার বউ ফের পালাবে আর ফের তোমাকে তার পিছনে পিছনে ছুটতে হবে। নিজের স্ত্রীর পিছনে ছুটলে পরে হাসে। পরস্ত্রীর পিছনে ছুটতে দেখলে তাতেও লোকে হাসে বটে, ঘৃণাও করে, ধিক্কারও দেয়, আবার ভয়ও পায়। গৃহস্থ তখন নিজের ঘরটি আগলায়, স্ত্রীর আঁচলটি ধরে রাখে। ভেবে দেখ, তুমি কোন্ ভূমিকা নেবে।'

শশাঙ্ক বলল, 'এই তোমার সুসমাচার?'

মুরারিমোহন বললেন, 'আপাতত এই। দেখ, আমিও কেমন বক্তৃতা দিতে জানি। তবে তোমার মত নৈতিক বক্তৃতা নয়। এই যা।'

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শশাঙ্ক ফের তত্ত্বের শরণ নিল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা, এইসব আশ্রম-টাশ্রম সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়, মুরারিদা? তোমার কি ভেবে অবাক লাগে না, এই মিড-টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরিতে এখনো এগুলি আছে? শুধু আছে তাই নয়, মাঝে মাঝে নিত্য নতুন গজাচ্ছে? দিনের পর দিন এই পৌত্তলিকতার বাড়াবাড়ি তোমার কাছে কি দুঃসহ মনে হয় না? আধুনিক শহরের বুকে যানবাহন সব বন্ধ করে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এই যে পুতুল পুজোর শোভাযাত্রা—এ যাত্রার অন্ত নেই। ধর্মের নামে এই ধর্মান্ধতা, এই তামাসা আর তামসিক উন্মাদনা তুমি কি সমর্থন করো মুরারিদা?'

মুরারিমোহন বন্ধুর দিকে সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ধরাও। নিজে জ্বলে না উঠে সিগারেট জ্বালো। তারপর আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ভেবে দেখ। তোমাকে কানে কানে বলি, আমি একটা ধর্মমূলক ছবির কনট্রাক্ট পেয়েছি। ডিস্ট্রিবিউটার ঠিক হয়ে গেছে। বার আনি টাকা তিনিই দেবেন। আমার মোহন প্রোডাকসনের ব্যানারেই হবে। জানিনে সেই ছবিটাই আগে আরম্ভ করতে হবে কিনা। এমত অবস্থায় তুমি কি আশা কর আমি ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কথা বলব?'

শশাঙ্ক সিগারেট ধরিয়ে হাসল, 'তুমি তো আর মাইকের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছ না। কানে কানে মনের কথাটা বলতে ক্ষতি কী।'

মুরারিমোহন সিগারেটের ধোঁয়ায় যুগলাঙ্গুরীয় তৈরি করতে লাগলেন তারপর হেসে বললেন, 'মনের কথা? তুমি তো জানো শশাঙ্ক, আমার মন বলে কোন বস্তু নেই। আমার সবটাই দেহ। আমি পুরোপুরি দেহাত্মবাদী দেহই আমার আত্মা। আমি অন্য আত্মার সন্ধান পাইনি। একটা ব্যাপার লক্ষ করে দেখ। আমাদের দেশে নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরীতে যে-সব মহাপুরুষের জন্মেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি করে আশ্রম খুলে গিয়েছেন। তুমি আর আমি ক্ষুদ্র পুরুষ। কিন্তু বিশে না জন্মে যদি উনিশে জন্মাতাম, বলা যায় না, আমরাও হয়তো আশ্রম খুলে বসতাম। কিন্তু এই শতকে জন্মে যাঁরা মহাপুরুষ না হলেও যখন distinguished পুরুষ, তাঁরা আর নতুন আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিকে যাননি। অন্য কিছু করেছেন। এ ঘটনা সিগনিফিক্যান্ট। সাধারণ লোকে লোকোত্তর পুরুষদের অনুসরণ করে। এ তোমাদের গীতারই কথা। আস্তে আস্তে আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রভাব শিক্ষিত মানুষের মন থেকে শিথিল হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার প্রসার বিজ্ঞানের প্রসার যত বাড়বে তত এই লৌকিক ধর্মের প্রভাব কমবে। উৎসবের নামে এই যে কদাচারের রাজত্ব তা হ্রাস পাবে। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতা হাতে পেয়ে রাতারাতি যদি সব উপড়ে ফেলতে যায় তা কিছুতেই পারবে না। মাটির শিকড় মনের মধ্যে গিয়ে শিরা উপশিরা ছড়াবে। দেবদেবীর বদলে দলীয় নেতা আর নেত্রীর

পুজো হবে। তাঁরা সংখ্যায় তেত্রিশ কোটি না হন অন্তত তেত্রিশজন হবেন। ইন্দ্র অগ্নি বরুণ তাঁদের মধ্যেই কি কম? কে না পুজোর জন্যে লালায়িত?'

শশাঙ্ক বলল, 'তাহলে শিক্ষা ছাড়া কোন পথ নেই?'

মুরারিমোহন বললেন, 'তাই ইতিহাসের শিক্ষা। তবে যে কোন গভর্নমেন্ট অল্পস্বল্প নিয়ন্ত্রণের ভার নিজের হাতে নিতে পারেন। তাতে গণতন্ত্রের জাত যায় না।। তাঁরা বলতে পারেন, পুজো-পার্বণ ঘরের জিনিস ঘরে বসে হোক, বাইরে তোলপাড় চলবে না। সব সম্প্রদায়ের ধর্মমতকে প্রশ্রয় দিলেই ধর্মনিরপেক্ষ দেশ গড়ে উঠবে না। ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক হানাহানিরও শেষ হবে না। সাম্প্রদায়িক ধর্মকেই আস্তে আস্তে নাশ করে তার অসাম্প্রদায়িক মূর্তিকে ওপরে তুলে ধরতে হবে। সে মূর্তি একেবারে নিরাকার না হলেও এমন বিপুল স্থূলাকার হবে না। কিন্তু সেখানে মন্ত্রবলে গিয়ে পৌঁছনো যাবে না, যন্ত্রবলেও না। শিক্ষা—বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে সেখানে গিয়ে উঠতে হবে।'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'মুরারিদা, এবার আচার্য কে? আমি না তুমি?'

মুরারিমোহন হেসে উঠলেন, 'তুমি তুমি। তুমি আচার্য আমি উপাচার্য। কিন্তু আমি পতি তুমি উপপতি। জয় তোমারই।'

কিন্তু শশাঙ্কের মন এ কথায় আজ সান্ত্বনা মানতে চাইল না। তার পতিত্বও গেছে উপপতিত্বও গেছে। শশাঙ্কের মনে হল, তার আর কেউ নেই কিছু নেই।

মুরারিমোহন হঠাৎ বললেন, 'ধর্মের কথা গেল, এবার একটু অর্থের কথা বলি শশাঙ্ক, বলব?'

'বলো।'

'একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই বলছি কথাটা। সব জিনিসই সংক্রামক। দ্বিধাও বোধ হয় তাই। তোমার দ্বিধা আমাকে একটু একটু করে ছুঁতে শুরু করেছে। ছোঁয়াচে রোগকে আমি বড় ভয় করি। শুধু যে কোনো কোনো ব্যাধি একমাত্র ছোঁয়াচে তা মনে কোরো না।'

শশাঙ্ক বলল, 'গৌরচন্দ্রিকায় তুমি কি বড় বেশি সময় নিচ্ছ না মুরারিদা?'

মুরারিমোহন বললেন, 'তা একটু নিতে হচ্ছে। দেখ, দুই বন্ধুর মধ্যে কামিনী আসে আসুক কিন্তু কাঞ্চনকে আসতে না দেওয়াই ভালো। সেটা আরো মারাত্মক। নতুন ছবিটার জন্যে আমার কিছু টাকার দরকার হতে পারে। ধরো দশ থেকে পনের, কি বড়জোর বিশ হাজার। আমি যদি অন্য জায়গা থেকে জোগাড় করতে পারি, পারব বলে আশা আছে, তাহলে আর তোমার কাছে হাত পাতব না। যদি না পারি, তাহলে তোমার কাছে হ্যাণ্ডনোট সহ হাত পাতব। দরকার হলে যাতে হ্যাণ্ডকাফ পরাতে পারো তার ব্যবস্থা থাকবে।'

মুরারিমোহন এত টাকা যে একসঙ্গে ধার চেয়ে বসবেন, শশাঙ্ক তা ভাবেনি। কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই অভাবিত, এমন কথা বন্ধুকে সে বুঝতে দিল না।

বরং একটু হেসে বলল, 'তোমার অত ভণিতা করবার দরকার ছিল না। দেখা যাক কী করা যায়?'

মুরারিমোহন বললেন, 'তোমার ব্যস্ত হবার দরকার নেই। ধীরে সুস্থে দিলেই চলবে। একসঙ্গে না হোক কিস্তিতে কিস্তিতে দিলেও হবে।'

শশাঙ্ক বলল, 'আচ্ছা, আমি তোমাকে কাল ফোনে—'

মুরারিমোহন চতুর লোক। খুব বেশি চাপ দিলেন না। বললেন, 'ব্যস্ত হচ্ছ কেন। ফোন করলে আমি করব। ছবি আরম্ভ করে দেওয়ার মত টাকার জোগাড় আমার হয়ে গেছে। যদি পার্টনারশিপে আসতে চাও—।'

শশাঙ্ক বলল, 'না মুরারিদা, ওসব থাক। আমাদের ফ্রেন্ডশিপই যথেষ্ট।'

মুরারিমোহন একটুকাল চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ হেসে উঠে বললেন, 'ধর্ম হল, অর্থ হল। এবার কাম আর মোক্ষ নিয়ে আমাদের আলোচনাটা শেষ হলেই হাতে হাতে একেবারে চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়ে যায়। আমার পাটরানীটি তো বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে আজ আর তোমার আলাপ হল না। তবে আরো তো রানী আছে। আলাপ-টালাপ করবে নাকি দু-একজনের সঙ্গে? ভালো কথা, আমার নতুন হিরোইনের সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি। হেনা এসেছে ও-ঘরে। ডাকব?'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'না ভাই। আজ থাক।'

মুরারিমোহন শশাঙ্কের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বললেন, 'হল কী তোমার? এমন মিইয়ে গেলে কেন বল তো? টাকার কথায় যদি গোসা হয়ে থাকে, তা হলে কথা ফেরত নিচ্ছি।'

শশাঙ্ক বলল, 'আরে না না।'

মুরারিমোহন বললেন, 'তবে?'

'তবে আর কী?'

মুরারিমোহন হেসে উঠলেন, 'তবে কি পূর্ব পাপের জন্যে অনুতাপ? কিন্তু অনুতাপ, নিজেই এক নিকৃষ্ট পাপ। তার মধ্যে কোন মাহাত্ম্য শিষ্টতাও নেই। কিন্তু sin is sweet without its constant remorse.'

শশাঙ্ক বলল, 'কী জানি। আমার তো মনে হয়, remorse আছে বলে তা আরো উপভোগ্য। It is sweeter when it is bitter.'

মুরারিমোহন হেসে তাঁর ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'Almost a holy Sinner—তুমি পরম পাপী শশাঙ্ক। অর্থাৎ যথার্থ পাপরসিক।'

বন্ধুর হাতে একটু চাপ দিয়ে মৃদু হেসে শশাঙ্ক বিদায় নিল।

মোহন প্রোডাকসনের অফিস থেকে বেরিয়ে শশাঙ্ক কয়েক পা হেঁটে মৌলালির মোড়ে এসে দাঁড়াল। ট্রামবাসগুলিতে অফিস-ফেরত যাত্রীদের ভিড়। অনেকেই ঝুলে যাচ্ছে। পা-দানিতে দাঁড়িয়ে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে। ওরই মধ্যে কারো কারো হাতে একটি করে ঝুলন্ত পুঁটলি। হয়তো বাড়ির জন্যে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে। বউকে দেবে, ছেলেমেয়েদের দেবে। এই সহজ সাধারণ সুখের অধিকারী সবাই। কিন্তু অভ্যাসে অভ্যাসে এই সুখবোধ কি থাকে? অভ্যস্ত সুখ কি সুখ? নিস্তরঙ্গ কি ক্ষীণ-তরঙ্গের জীবন! ছোট ছোট সুখদুঃখ নিয়ে গৃহস্থালী। একটি দিন প্রায় আর একটি দিনের পুনরাবৃত্তি। সুখ সম্বন্ধে বেশি সচেতন না থাকাটাই বোধ হয় সুখ। দুঃখ সম্বন্ধে তীব্র অনুভূতিপ্রবণ না হওয়াটাই সুখ। দৈনন্দিন জীবনকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত সহজ করে আনতে পারলেই বোধ হয় সুখের সন্ধান পাওয়া যায়—শশাঙ্ক ভাবল।

রাস্তায় সারি সারি আলো জ্বলে উঠেছে। আগে গ্যাসের আলো জ্বলত, এখন বিদ্যুৎ। আরো উন্নতি কি সম্ভব? আরো দীপ্তি?

আলোকগুলিকে দীর্ঘ একছড়া মালা বলে ভাবা যায়। অন্তত দূর থেকে তাই মনে হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় ছিন্নমালা। 'ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাসনেকো কুড়াতে।' সব সময় এ উপদেশ মন নিতে চায় না। আমরা কখনো ছড়াই কখনো কুড়াই। কখনো উড়াই কখনো কুড়াই।

ট্রামেবাসে উঠবার জো নেই। ট্যাক্সি দুর্লভ। এক মনুষ্যবাহিত রিকশা আছে। গোযান বাষ্পযানের মতই মনুষ্যযান। মাঝে মাঝে ওদের কথা ভেবে শশাঙ্কের হৃদয়ও আর্দ্র হয়। কবে প্রতিটি মানুষ মানুষের মর্যাদা পাবে। একজনকে আর একজনের টানতে হবে না। একজনের কাঁধে আর একজন চড়ে বসবে না। লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকে মুষ্টিমেয় একদল মানুষ জগদ্দল পাথরের মত চেপে থাকবে না। এই সভ্য নগরী, মহানগরী, বিশ্বনগরীর প্রতিটি মানুষ কবে নাগরিকের পূর্ণমর্যাদা পাবে।

শশাঙ্ক যেতে যেতে দেখতে পেল, পরিশ্রান্ত একজন হিন্দুস্থানী রিকশা-ওয়ালা তার নিজের রিকশার ওপর উঠে বসে বিড়ি ধরিয়েছে। ওকে আর ডাকল না শশাঙ্ক। ওর ওই সিংহাসন থেকে ওকে নামিয়ে আনতে মন সরল না। আশেপাশে আরো রিকশাওয়ালা ছিল। আজ আর তাদেরও কাউকে ডাকল না। হেঁটেই চলল। গাড়িটা সার্ভিসে পড়ে আছে তো আছেই। আনবার আর মন নেই শশাঙ্কের। খোঁজ-খবর নেওয়ার গরজ নেই। বেড়াবার শখ, বেড়াবার সুখ যেন চলে গেছে।

সুজাতাকে ডাকতে গিয়েছিল শশাঙ্ক। সে এল না। দোষ দেওয়া যায় না তার। শশাঙ্কই বা তার ডাকে ক'দিন সাড়া দিয়েছে? 'কিন্তু যদি আসতে, তুমি দেখতে পেতে সুজাতা, আমি আর সেই আমি নেই। আমি মঠে যাইনি বটে,

কিন্তু আমারও মনের মধ্যে আস্তে আস্তে এক মঠ গড়ে উঠেছে। সেখানে যে বাস করে সেও উন্মনা বিমনা উদাসীন সন্ন্যাসী। সে পরম নিঃসঙ্গ। সহস্র সঙ্গসুখ পেয়েও মাঝে মাঝে আরো সঙ্গসুখের তৃষ্ণা সত্ত্বেও সে নিঃসঙ্গ। হয়তো এই অতিতৃষ্ণাই তার নিঃসঙ্গতার মূল।'

শশাঙ্ক ডানদিকের ফুটপাত ধরে দক্ষিণমুখে হাঁটতে লাগল। পিছনে মানুষ, পাশে মানুষ, সামনে মানুষ। পথ এখন জনারণ্য। শশাঙ্ক সেই অরণ্যবিহারী। জনের অরণ্য নয়, মনের অরণ্য। শশাঙ্ক সেই বিজনবিহারী।

সুজাতা না এসে ভালোই করেছে, শশাঙ্ক ভাবল। এলে শশাঙ্ক আর তাকে সহ্য করতে পারত না। ফের সেই শুদ্ধাচারের সঙ্গে অনাচার অত্যাচারের সংঘাত লাগত। আবার ছাড়াছাড়ি হতো। তার চেয়ে এই ভালো। জীবনের ব্লাকবোর্ডে একটি কি দুটি সদিচ্ছার চক-খড়ির দাগ। নিজের মনেও ভাবতে ভালো লাগবে শশাঙ্ক গিয়েছিল, শশাঙ্ক যেতে পেরেছিল। আনতে যে পারেনি তাতে কিছু এসে যায় না।

ধর্ম। সেখানে কোন্ ধর্মাচরণ করছে সুজাতা সেই জানে। এখনকার শিক্ষিত নারী-পুরুষ ও ধর্ম মানে না। ও ধরনের ধর্মমন্দিরে যায় না। মুরারিদা ঠিকই বলেছেন : আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রভাব আধুনিক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মন থেকে চলে যাচ্ছে। তরুণ ছাত্রদের তো বটেই, যুবকদের তো বটেই, অনেক প্রৌঢ় বৃদ্ধের সঙ্গেও আলোচনা করে দেখেছে শশাঙ্ক, ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি পরলোক সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন, অজ্ঞেয়বাদী, নিরাসক্ত, নির্বিকার। রাজনৈতিক মত যার যেমনই থাকুক না, সেই পরলোকমনস্কতা চলে গেছে। সবাই এখন ইহলোকসর্বস্ব। আলাপ করে খুশী হয়েছে শশাঙ্ক। সে নিজেও এই দলের। দল ভারি দেখলে কে না খুশী হয়? কার মনে না বল বাড়ে? শশাঙ্কও জড়বাদী। ইহলোকসর্বস্ব। তবু মন মাঝে মাঝে বলে, 'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না।'

সেই নদী নেই, সেই নৌকো নেই, সেই বৈঠা নেই, তবু মন-মাঝি আছে। আর তার সেই না-পারার বোধটুকুও আছে।

এর একটা সহজ ব্যাখ্যা করা যায়, শশাঙ্ক নিজেও তা জানে। এ হল তার উচ্ছৃঙ্খল-জীবনের অন্তিম অবসাদ, অপেক্ষাকৃত অকৃতকার্যতার কর্মহীনতার কৃতিত্বহীনতার গ্লানিভার।

কিন্তু ভারমুক্ত আরো অনেককে তো দেখেছে শশাঙ্ক। তাঁরা জ্ঞানী, গুণী, কর্মী, কৃতী। তবু প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়ে তাঁদেরও মাঝে মাঝে মুখ ভার হয়; এত বন্ধুবান্ধব, স্বজন পরিজন, তবু হৃদয়ভার কোথায় নামাবেন খুঁজে পান না। মেঘলা দিনের মত তাঁদেরও মনের ভার এই কাটে তো, এই কাটে না।

এর মানেটা কী। শশাঙ্ক মাঝে মাঝে ভাবে। আসলে ব্যক্তিগত মানুষের

দুটো জগৎই আছে। একটা বাইতে পারার জগৎ, আর একটা বাইতে না পারার জগৎ। একটা তার আয়ত্তের জগৎ, আর একটা অনায়ত্ত জগৎ। জানার জগৎ আর অজানার জগৎ। না-জানার জগৎ আর না-পাওয়ার জগৎই হল other world. সেই other-worldliness আমাদের সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—শশাঙ্ক ভাবে। এর মধ্যে আধুনিকতা অনাধুনিকতা নেই, এর পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ নেই। আমরা একই সঙ্গে দুটি মানুষ। একই সঙ্গে দুই জগতের অধিবাসী। আমাদের শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ধর্ম সেই জন্যেই একই সঙ্গে লৌকিক এবং অলৌকিক। অতিলৌকিক—দুটি অর্থে। শশাঙ্ক ভাবে।

শিক্ষিত মানুষের মন থেকে ধর্মচিন্তা চলে গেছে। তার জায়গা নিয়েছে রাজনীতি। মঠ মন্দিরের বদলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অফিস। সাম্প্রদায়িক ধর্মের বদলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আর রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা। ধর্মীয় গোঁড়ামি যদি নিন্দনীয় হয়, রাজনৈতিক গোঁড়ামি কম নিন্দনীয় কিসে? বরং অনেক পাপ থেকে ধর্ম মুক্ত, রাজনীতি মুক্ত নয়। ধর্মগুরু যেমন বলেন, 'মামেকং শরণং ব্রজ', রাজনীতির গুরুও তাই বলেন। রাজনীতির সর্বোচ্চ লক্ষ্য লোকহিত, লোকসুখ। শুধু সর্বাধিক সংখ্যকের জন্যে সুখ নয়, সর্ব মানুষের জন্যে সর্বসুখ। এখনকার রাজনীতি সেই প্রতিশ্রুতিই দেয়। ধর্মেরও একদিন ঐ লক্ষ্য ছিল। আজ সে লক্ষ্যভ্রষ্ট। রাজনীতিই কি লক্ষ্যকে আঁকড়ে ধরে আছে? যাঁরা আছেন তাঁদের সংখ্যা লাখে এক। আর বাকি যারা তারা টিকি-পৈতেধারী পান্ডা-পুরুত, কানে ফুঁ-দেওয়া গুরু কি 'সংঘং শরণং গচ্ছামির' ভক্ত ভক্তার দল। রাজনীতি তাদের কাছে শুধু দলনীতি উপদলনীতি। কূপমণ্ডুকের চেয়ে রাজনীতি তাদের বেশি যোগ্যতার অধিকারী করে না।

এই নিয়ে প্রণবের সঙ্গে শশাঙ্কের অনেক তর্ক হয়েছে।

প্রণব বলে, 'রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের অ্যানালজি অনেকখানি চলে। কিন্তু খানিক দূর এসে আর চলে না। ধর্মের কথা না ভেবেও তুমি পারো। কিন্তু রাজনীতির কথা না ভেবে পারো না। রাজনীতি শুধু রাজার নীতি নয়, তাহলে রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তা চলে যেত। রাজনীতি প্রজার নীতি বলেই চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে। ধর্মের পাশাপাশি থাকবে। ধর্ম না থাকলেও থাকবে। কারণ রাজনীতি সামাজিক মানুষের জীবনধর্ম। রাজনীতি প্রতিটি প্রজার মুখের গ্রাসে আছে। রাজনীতি আজ ভাতের হাঁড়ির মধ্যে কাঁকর হয়ে ঢুকেছে।'

শশাঙ্ক হেসে বলেছিল, 'ওই কাঁকরেই তো আমার আপত্তি। রাজনীতি যেখানে অন্ন, পরমান্ন, সেখানে তো আমার আপত্তি নেই। যেমন ধর্ম যেখানে শুধু টিকি পৈতে টুপি দাড়ি প্রদর্শন, সেখানে আমার আপত্তি; যেখানে আত্ম-

দর্শন সেখানে তো আমার আপত্তি নেই।'

প্রণব বলেছিল, 'দেখ, এক রাজনীতি ভাতের হাঁড়ির মধ্যে কাঁকর ঢুকায়। অন্তত ঢুকলে তেমন করে বাধা দিতে পারে না। আর এক রাজনীতি সেই কাঁকর বেছে বার করতে চায়। অন্তত কাঁকর কাঁকর বলে সোরগোল তোলে। তুমি যদি তাও না তুলতে চাও, কি না তুলতে দাও, তুমি আমার যতই বন্ধু হও শশাঙ্ক, তুমি আমার বেদলী। রাজনীতি করব না এও আর এক ধরনের, আমি বলব হীন ধরনের, রাজনীতি। চুপ করে যাওয়ার নীতি আসলে নীতিই নয়, তা দুর্নীতির সামিল। সরে থাকার নীতি আসলে নীতিই নয়, তা ছদ্মবেশী কূটনীতি। তুমি হয় ক্রিয়াশীল হবে, না হয় প্রতিক্রিয়াশীল হবে, মাঝামাঝি কোন পথ নেই।'

প্রণব যে চরমপন্থী তা শশাঙ্ক জানে। শশাঙ্ক ভোট ওদের দলকেই দেয়; ভাবে, বিরোধীদল শক্তিশালী হোক। অন্তত রুখে দাঁড়াবার জন্যে কেউ কেউ থাকুক। কিন্তু ভোট ছাড়া আর কিছু দেয় না।

প্রণব বলে, 'এটা তোমার পাপ। তোমার প্রমিসকিউটিকে বরং সহ্য করি। ওটা তোমার প্রায় বিড়ি-সিগারেট পান-দোক্তা খাওয়ার অভ্যাসের মত। যতক্ষণ তুমি পরের বাড়ির বউ-ঝি নিয়ে প্রকাশ্যে কেলেঙ্কারি না বাধাও ততক্ষণ তোমার ওসব অভ্যাস নিয়ে আমি বেশি মাথা ঘামাই না। কিন্তু তোমার অরাজনৈতিকতা আমার অসহ্য। রাজনৈতিক চিন্তা আর সেই চিন্তার পরিচ্ছন্নতা প্রতিটি শিক্ষিত সভ্য নাগরিকের পবিত্র কাজ। আমি একথা বলছিনে যে, তুমি মিটিং-এ গিয়ে বক্তৃতা দেবে কি কারো বক্তৃতার পর হাততালি দেবে, যদিও তাও অনেক সময় দরকার। তুমি অতখানি সক্রিয় রাজনীতি নাই বা করলে। কিন্তু তোমার চিন্তায় আচরণে তোমার কথায়-বার্তায় লেখায় পড়ায় পড়ানোয় শেখানোয় লক্ষ লক্ষ মানুষের দুঃখ মোচনের কথা তুমি যদি একটুও না ভাবো, তার জন্যে কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত না নাড়ো, তাহলে আমি তোমাকে বুড়ো আঙুল দেখাব তা তুমি যতই বিদ্বান হও পণ্ডিত হও, গুণী হও শিল্পী হও, আর আমার বন্ধু হও।'

মৃদু মৃদু হেসে উত্তেজিত বন্ধুকে আরো উত্তেজিত করে তুলেছিল শশাঙ্ক। তারপর শান্ত ভাবে আস্তে আস্তে বলেছিল, 'দেখ প্রণব, সংসারে কেউ কেউ আর পাঁচজনকে ওই দুটি বুড়ো আঙুল দেখাতেই আসে। তাদের সমস্ত পৌরুষ ওই বুড়ো আঙুল দুটির মধ্যে। গলাবাজিতে, মুখ বাঁকানোয়, ঘাড় বাঁকানোয়, চোখ রাঙানোয় তাদের বীরত্ব। আমরা যখন একটি রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করি রাজনীতি আমরা এড়াতে পারি না একথা কে না জানে। আমাদের দিন-রাত্রির জীবন রাজনীতি শাসিত। অন্তত রাজনীতি প্রভাবিত। সে প্রলেটারিয়েট টোটালিটারিয়ান স্টেটই হোক, আর ডেমোক্রাটিক ওয়েল-ফেয়ার স্টেটই হোক। সেই জন্যেই রাজনীতির ওপর মানুষের স্বাভাবিক

উন্মুখতা। রাজনৈতিক খবর জানবার জন্যে সে উৎকর্ণ। সেই জন্যে খেলার মাঠে যেমন হাজার-হাজার লাখ-লাখ লোকের ভিড়, তেমনি রাজনৈতিক নেতাদের দেখবার জন্যে, তাঁদের কথা শোনবার জন্যে লাখ-লাখ কোটি-কোটি লোকের জমায়েত। কারণ এ খেলা শুধু খেলা নয়, লীলা। ধন প্রাণ নিয়ে খেলা। রাজনীতি তোমাকে হাতে হাতে ফল দেয়। তোমার পেটে ভাত, কটিতে কাপড় জোগায়। না জোগালে সেই জোগানদারদের তুমি টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পার। কারণ পেটের খিদের চেয়ে বড় খিদে নেই।'

প্রণব বলেছিল, 'তুমি কি সেকথা অনুভব করতে পার শশাঙ্ক?'

'তুমি যতখানি পার আমি হয়তো তার চেয়ে কম পারি। কারণ আমি তোমার চেয়ে খাই-দাই ভালো। কিন্তু তুমি মনে কোরো না প্রণব, অনাহারী অর্ধাহারীদের দুঃখ তুমিও ভালো করে বোঝ। মনে কোরো না তুমি তাদের সঙ্গে একাত্ম। তুমিও তাত্ত্বিক আমিও তাত্ত্বিক। সে-তত্ত্ব আলাদা আলাদা, এই যা তফাত। মনে কোরো না রাতারাতি তুমি declassed হতে পেরেছ। তুমিও শৌখিন শ্রমণ, তুমিও শৌখিন শ্রমিক। তুমি বলছিলে নিষ্ক্রিয় থাকাটাও এক নিকৃষ্ট ধরনের রাজনীতি। তাহলে আমি সেই রাজনীতিই করি। আমি অরাজনৈতিক নই। কিন্তু প্রণব, আমি যতই নিষ্ক্রিয় থাকি না আমি আমার কড়ে আঙুল না নেড়ে পারি না, যেমন তুমি তোমার বুড়ো আঙুল না নেড়ে পার না। আমি যদি কয়েকটি ছাত্রকেও ভালো করে পড়াতে পারি, সাহিত্যে তাদের আগ্রহ বাড়াতে পারি, বিদ্যার মূল্য, জ্ঞানের মূল্যের দিকে তাদের চোখ ফেরাতে পারি, সেই আমার কাজ। সেই আমার কড়ে আঙুল নাড়া। কড়ে আঙুলে গিরিগোবর্ধন ধরবার ক্ষমতা তোমাদের আছে প্রণব, আমার নেই। সবাইর তো আর সব ক্ষমতা থাকে না।'

প্রণব মাথা নেড়েছিল, 'তুমি নিজের মনকে আঁখি ঠারছ শশাঙ্ক। তুমি তা পার না। এই সমাজব্যবস্থায় তুমি সেই পরম মূল্যের দিকে মানুষের চোখ ফেরাতে পার না।'

বন্ধুর সঙ্গে মতের মিল হয়নি শশাঙ্কের। বৈষম্য রয়েই গেছে। শশাঙ্ক তার নিজের মতে অটল আছে। অধিকাংশের জন্যেই রাজনীতি, প্রায় সবাইর জন্যেই রাজনীতি। তবু নিজের প্রকৃতিপ্রবণতা অনুসারে সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ একটু দূরে সরে থাকবে। আর সরে থেকেই তারা দেশের কাজ দশের কাজ করবে। তাদের সেই কাজের সঙ্গে হয়তো আজকের সম্বন্ধ থাকবে না, কিন্তু কাল-পরশুর সম্বন্ধ থাকলেও থাকতে পারে। সেই ধৈর্যটুকু রাষ্ট্রকে রাখতে হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধরদের কি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যারা দখল করতে চায় তাদেরও এই সহিষ্ণুতাটুকু চাই।

রাস্তা পার হয়ে জোড়া গীর্জার পাশ দিয়ে ভাবতে ভাবতে হাঁটতে হাঁটতে চলল শশাঙ্ক। এখানেও সে দ্বিধাগ্রস্ত। সত্যি, হয়তো আরো কিছু সক্রিয়

হওয়া তার উচিত ছিল। শুধু রিক্সাওয়ালাদের দুঃখ দেখে হা-হুতাশ করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে 'সেই দিন কবে আসবে; সেই দিন কবে আসবে' বললেই কি সেদিন কখনো আসবে? কি সেই দিন নিয়ে আসার কাজে তার কোন অংশ থাকবে? মাঝে মাঝে ভাবে শশাঙ্ক। কিন্তু ওই ভাবনা তার চিন্তার সীমা অতিক্রম করতে পারে না। তার মেজাজের মধ্যে রাজনীতি নেই। প্রণবরা তাকে যতই টানাটানি করুক। তার কান টানলে কান ছিঁড়ে যাবে তবু মন যাবে না, মাথা যাবে না। অবশ্য যদি কোন ডিকটেটরের হাতে না পড়ে। তখন না গেলে কাটা মাথা গড়াগড়ি যাবে।

তবু কর্মই ধর্ম। Action is better than contemplation, নিজের অন্ধকার গিরিগহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় হল কর্মপথ। একমাত্র যোগ হল কর্মযোগ। চারদিকে এত আলো এত আনন্দ কিন্তু শশাঙ্কের মনোমন্দির অন্ধকার। 'পরে দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।'

শুধু বাইরে আলো জ্বাললে কী হবে!

কোন্ কর্মে ব্রতী হতে পারে শশাঙ্ক? প্রাণ ধারণ প্রাণ পোষণের কাজ ছাড়া প্রত্যেকের জন্যেই আরো একটি কাজ থাকে। নিজের জ্ঞানবুদ্ধি বিচার-বিবেচনা এবং সাধ্য অনুযায়ী লোকহিত। কিন্তু লোকহিত করব বললেই তো করা যায় না। অনেক হিতকর কাজের ভার আজ ব্যক্তির হাত থেকে হাতে চলে গেছে। প্রত্যক্ষে পরোক্ষে কর জুগিয়ে সেই কল্যাণকরকে শশাঙ্ক বড়জোর আরো একটু শক্তিশালী করে তুলতে পারে। অনেক সময় জীবিকার কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাওয়াও কম কথা নয়। সেই মধ্যেই জীবনধর্মের স্বাদ পাওয়া যায়। সে কাজ যদি সমাজের জুতো সেলাইর কাজও হয় তাতেই বা ক্ষতি কি। জীবনে নিপুণ হতে পারলেই মুচির চরিতার্থতা।

গলির মোড়ে হিমাংশুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল শশাঙ্কের। সেও বাড়ির দিকে এগোচ্ছে। শশাঙ্কের চেয়ে সে মাত্র বছর দুয়েকের বড়। কিন্তু এরই মধ্যে তার চুলে পাক ধরেছে। মুখেও প্রবীণতা এসেছে। শশাঙ্ক জানে বড়দার চেয়ে ছোড়দার বিষয়বুদ্ধি বেশি। ইদানীং সেই বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে ঠোকা-ঠোকি হচ্ছে সে খবরও পৌঁছেছে শশাঙ্কের কানে। দুজনেই মুখে বলছে, 'বিষয় না বিষ,' আর ভিতরে ভিতরে তাদের সম্পর্ক বিষাক্ত হচ্ছে।

হাঁড়ি আলাদা। বাড়ি আলাদা। এক বাড়িতেই ঘরগুলি মোটামুটি ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই ভগ্নাংশ নিয়ে অবনিবনাও বেড়েছে। এবার আরো শক্ত ধরনের পাঁচিল দরকার। বেশ উঁচু প্রাচীর। যাতে 'প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু' না হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাতে দিন প্রায়ই ভালো যায় না।

বাড়ি-টাড়ি যেখানে যা আছে সবই ভাগ হবে। শশাঙ্কও এক তৃতীয়াংশের শরিক। সম্পত্তি বণ্টনে তাকেও উপস্থিত থাকতে হবে, অংশ বুঝে নিতে হবে। উকিল আর এটর্নির বাড়িতে ছুটতে হবে। অথচ সেও জানে বিষয় বিষ।

কারবার এতদিন যৌথ ছিল। কিন্তু সেখানেও হিসাব-নিকাশ ভাগ-বাঁটোয়ারায় ফাটল ধরেছে। শশাঙ্ক অবশ্য sleeping partner; ঘুম ভাঙবার পর চোখ রগড়ে যা দেখতে পাচ্ছে তাতে চক্ষুস্থির। ছোড়দা দেখাচ্ছে কারবারে বছরের পর বছর শুধু লোকসানই হচ্ছে, কিন্তু বড়দা তা মানতে রাজী নয়। তার ছেলেরা আরো গররাজী। শশাঙ্কই বা চট করে সে কথা মানে কী করে।

অবশ্য মাঝে মাঝে ভাবে এই কাড়াকাড়ি কার জন্যেই বা। তবু হকের ধন ছেড়ে দেওয়া সহজ কথা নয়। হকের বউ তো হাতছাড়া। এবার কি সম্পত্তিও বেহাত হবে?

হিমাঙ্ক বলল, 'এই ফিরছিস বুঝি? আজ যে এত সকাল-সকাল।'

শশাঙ্ক একটু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, আজ একটু তাড়াতাড়িই ফিরলাম।'

'তোর বউদির কাছে শুনলাম ব্যাপারটা। সেই আশ্রম পর্যন্ত নাকি গিয়েছিলি? অমন আহাম্মুকির কাজ না করলেই হতো।'

এ ব্যাপারে ভাই আর বন্ধুর মতৈক্য কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করল শশাঙ্ক।

হিমাঙ্ক বলল, 'সাধাসাধি যদি করতেই যাবি আগে গেলেই পারতিস। এখন কাল গেলে মাংটামি সার। আরে ঘরের বউ যদি বাইরে চলে যায় তার কি আর জাত-কুল কিছু থাকে। সে আশ্রমেই যাক আর যেখানেই যাক। সেই যে একটা কথা আছে না, 'লেখনী পুস্তিকা জায়া পরহস্তং গতা গতা'। পরের লাইনটা যেন কী?'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'পরের লাইনটা অশ্লীল। কিন্তু শ্লোক-টোক তোমার তো বেশ মনে আছে ছোড়দা।'

হিমাঙ্ক বলল, 'কিছু কিছু আছে বইকি। তোদের মত পণ্ডিত না হতে পারি; কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশনে সংস্কৃতে আমিও লেটার পেয়েছিলাম। চর্চার অভাবে সবই নষ্ট হয়ে গেছে।'

শশাঙ্ক বলল, 'একেবারে নষ্ট হয়নি; একটু মরচে ধরেছে এই যা।'

'তোর তো সব তাতেই ইয়ার্কি, জীবনটা তো ওই করেই কাটালি। তার চেয়ে আর একটা বিয়ে করলেই পারতিস। ইচ্ছে করলে এখনো পারিস।'

শশাঙ্ক বলল, 'ছোট বউদির কোন বোন এখন তো আর আইবুড়ো নেই। তোমার এত গরজ কিসের ছোড়দা?'

হিমাঙ্ক এবার হাসল, 'ফাজিল কোথাকার। যেন আইবুড়ো থাকলেই

আমার শ্বশুর তোর হাতে তাকে দিতেন।'

'তা দিতেন না। তবে আর কারো শ্বশুরকেই বা দেখিয়ে দিচ্ছ কেন? তিনিও তো বলতে পারেন কুয়ো আছে, পুকুর আছে, গঙ্গা আছে—।'

'তোর কেবল ফাজলেমি।'

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

শশাঙ্ক হঠাৎ বলল, 'ফাজলেমি নয়, এবার একটা কাজের কথা বলি ছোড়দা। আমাকে আমাদের ফার্ম থেকে হাজার বিশেক টাকা দিতে হবে।'

শুনে হিমাঙ্ক দুটি চোখ প্রায় গোলাকার করে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকাল 'বিশ হাজার! বলিস কি তুই। ক'লাখ টাকা খাটালে তোর বিশ হাজার টাকা পাওনা হয় তুই একবার হিসেব করে দেখ তো। অঙ্ক তো সেই স্কুলে থাকতে করেছিস তার পরে তো আর ধরিসনি।'

'তবু মিশ্র অমিশ্র আট নিয়ম তো মনে আছে। পাওনাগণ্ডা যদি বুঝিয়ে দাও খুবই বুঝতে পারব। আমি অনেকদিন তোমাদের কাছ থেকে কিছু নিইনি। বেশ, অন্তত হাজার দশেক দাও।'

হিমাঙ্ক বলল, 'দশটি পয়সাও এখন ওখান থেকে বার করবার উপায় নেই। কী যে সব কাণ্ডকারখানা ভিতরে ভিতরে হচ্ছে, তুই তো যাসনে খোঁজও রাখিস নে। খুব গোলমাল শশাঙ্ক, খুব গোলমাল। এখন লেন-দেন সব বন্ধ। ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় শিকেয় উঠেছে। শেষ পর্যন্ত কোর্টে যেতে না হয়। আমার ইচ্ছে নয় দাদার বিরুদ্ধে ওসব করা। কিন্তু যেতে যদি বাধ্য করে যেতেই হবে। অবশ্য আমি আপোষ মীমাংসা শালিসীর চেষ্টাই আগে করব। তখন তোকে ডেকে পাঠাব। তখন যেন না শুনি মদ আর ইয়ে-টিয়ে নিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছিস।'

হিমাঙ্ক একটু চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যারে খোকন, অত টাকা তোর কিসের দরকার পড়ল?'

প্রতিক্রিয়াটা দেখবার জন্যে শশাঙ্ক একটু কৌতুক করেই বলল, 'ধরো আমি যদি ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে খাটাই।'

'ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি! গোল্লায় যাবার আর পথ পেলিনে? কেন, আবার ফিল্ম কেন? তোর তো কোনদিকে আটকাচ্ছে না।'

শশাঙ্ক জবাব দিল, 'আটকাচ্ছে না ঠিকই। তবু ও পথটাও খোলা রাখতে চাইছিলাম। যাক গে।'

শশাঙ্ক নিজের বাড়ির দিকে এগোচ্ছিল, হিমাঙ্ক ডেকে বলল, 'আরে শোন শোন, আর এক কাপ চা খেয়ে যা। তোর ছোট বউদি ভালো মালপো করেছে চেখে যা একটু।'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'ওসব মালপো-টালপো কি আর আমার কপালে আছে ছোড়দা? আচ্ছা, তুমি এগোও, আমি ঘুরে আসি।'

শশাঙ্ক নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়াল। টাকাটা তাহলে বার করা সহজ হবে না। মুরারিদাকে যদি দেয় নিজের একাউন্ট থেকেই দিতে হবে? কিন্তু কোন একাউণ্টেই কি আর অত টাকা আছে?

দোরের কাছে আসতেই দেখা গেল এক ভদ্রলোক তার জন্যে পথ চেয়ে অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। নিশিবাবু। এই মুহূর্তে ওই সত্ত্বগুণের প্রতিনিধিকে দেখে শশাঙ্ক তেমন প্রসন্ন হল না। সব সময় সবাইকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে মন কি তৈরি থাকে?

নিশিবাবু কিন্তু তাকে দেখে হেসে বললেন, 'এই যে মশাই। সেই কখন থেকে বসে আছি। বসে বসে হয়রান। শেষে এসে বাইরে দাঁড়ালাম। আপনাকে প্রায় উইলফোর্সে টেনে এনেছি। রামেশ্বর তো বলেই দিয়েছিল আপনার শিগগির ফেরার আশা নেই।'

শশাঙ্ক ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে একটু শুকনো গলায় বলল, 'চা-টা পেয়েছেন তো?'

নিশিবাবু বললেন, 'তা পেয়েছি। আপনার লোকটি খুব ভদ্র। আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চা করে দিয়েছে। আর আমি তো ওই চা-টাই খাই। চা পেলেই খুশি।'

শশাঙ্ক উল্টোদিকের সোফায় অতিথির মুখোমুখি বসে একটু হেসে বলল, 'আপনি আশুতোষ।'

নিশিবাবু স্বীকার করে বললেন, 'তা যা বলেছেন। সন্তোষ অমৃত অতি উর্ধ্বে অবস্থিত। লভিতে না পারে কভু উদ্বাহুমান। আমি বামন হয়েও সেই চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছি। বললে অহঙ্কার করা হবে, একটু একটু নাগালও পেয়েছি।'

ঈর্ষাকে বিদ্রূপের আবরণ পরাল শশাঙ্ক। হেসে বলল, 'কী করে পেলেন?'

'এই তো এমনি করে।' হাত বাড়িয়ে খপ করে নিশিবাবু শশাঙ্কের হাতখানা ধরে ফেললেন, 'আপনিও তো চাঁদ। কী বলুন, চাঁদ না?'

বাক্‌পটু শশাঙ্ক বুড়োর কাণ্ড দেখে এবার অবাক হয়ে গেল। নিশিবাবু তার হাতখানা তখনো ধরে রয়েছেন। আধময়লা পাঞ্জাবি গায়ে পুরোন ছাতা বগলে করে ঘুরলে কী হবে, স্মার্টনেসে ইনিও তো কম যান না। মিটি মিটি হাসছেন। তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে বাঁধানো দাঁতের আভাস দেখা যাচ্ছে। শশাঙ্কের মনে পড়ল তার এই হাতখানা খানিক আগে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির এক বন্ধুর হাতে ধরা ছিল। সেই বন্ধু তাকে পাপে প্ররোচিত করেছে। পরম পাপী বলে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। সেই হাত একটু বাদেই আবার এমন একজনের হাতে উঠেছে যাঁকে শশাঙ্ক সৎপ্রকৃতির মানুষ বলে জানে, খানিকটা বিশ্বাসও করে।

শশাঙ্ক ভাবল, আমাদের হাত বদলাতেও দেরি হয় না, মন বদলাতেও দেরি

হয় না। আমরা সবাই যেন সেই রূপকথার আংটি। আংটি, তুমি কার? যার হাতে আছি।

কিন্তু শশাঙ্ক যদি আংটি হয় সে এক ধাতুর আংটি নয়, অষ্টধাতুর আংটি। নিজেই নিজের ব্যাখ্যা করল শশাঙ্ক। অবশ্য নিজের মনে। তারপর আস্তে আস্তে হাতখানা নিশিবাবুর হাত থেকে ছাড়িয়ে এনে একটু হেসে বলল, 'কলঙ্কী চাঁদ। তা জানেন তো?'

নিশিবাবু বললেন, 'জানি মশাই জানি। কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ নিয়ে কোলে। বিদ্যাসুন্দর এককালে লুকিয়ে লুকিয়ে আমরাও পড়েছি। তেমন সংসর্গে পড়লে হয়তো আমারও সুন্দরের দশা হতো। কিছুই বলা যায় না। তবে ভাগ্যগুণে অন্য সঙ্গে গিয়ে পড়েছিলাম। যতীশদা বলতেন, তুই দেখতে কালোকুচ্ছিত হলে কী হবে নিশি, নিজেকে মনে করবি তুই মায়ের পায়ের রাঙা জবা। রক্তচন্দনের ছিটে লাগা। খবরদার, রক্ত ছাড়া সে জবায় যেন আর কোন দাগ না লাগে।'

শশাঙ্ক বলল, 'শুধু দাদাদের শাসনেই—'

নিশিবাবু বললেন, 'তাই কি আর হয় মশাই! আত্মশাসন না থাকলে কারো শাসনেই কিছু হয় না। তা ছাড়া নিজেও তো একদিন দাদা হলাম। তখন ভাবলাম, আমার কোন বেচাল দেখলে আমার ছোট ভাইবোনেরা কী ভাববে! তাদের কাছে আমি মুখ দেখাব কী করে। অবশ্য ভগবান রক্ষা করেছেন। তেমন কোন সংকটে আমাকে পড়তে হয়নি। পরীক্ষা দিতে বসতে হয়নি। তাই আমি পাস-ফেলের বাইরে আছি।'

রামেশ্বর দু কাপ চা নিয়ে এল।

নিশিবাবু একটু হেসে বললেন, 'আবার চা? আচ্ছা দাও। অমৃতে অরুচি দেখিয়ে কী হবে। নিজে পাস-ফেলের বাইরে আছি। কিন্তু যারা ফেল করেছে তাদের কষ্ট, যন্ত্রণা যে না দেখেছি তা তো নয়। আর যত দেখেছি, যত বয়স বেড়েছে তত আমার গোঁড়ামি কমেছে। তত সহানুভূতিতে বুক ভরে উঠেছে। কোত্থেকে যে এই মমতা এল কে জানে। নিজে তো এক সময় নির্মম হবার সাধনাই করেছি। বুড়ো বয়সে এ বোধ হয় সেই প্রকৃতির প্রতিশোধ।'

ছল ছল করে উঠল নিশিবাবুর চোখ। সেই সজল চোখ লুকাবার জন্যেই তিনি বোধ হয় মুখ ফেরালেন। ঝুল পকেটে হাত দিলেন। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যেই যেন বললেন, 'আপনার একখানা চিঠি আছে শশাঙ্কবাবু।'

শশাঙ্ক বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমার চিঠি? আপনার কাছে? কে লিখেছে?'

যে নামটি শশাঙ্ক প্রত্যাশা করেছিল সেই নামই ধীরে ধীরে নিশিবাবু উচ্চারণ করলেন, 'মন্দিরা।'

'কি লিখেছে? কই দেখি।' স্থান কাল সব বিস্মৃত হয়ে শশাঙ্ক সাগ্রহে হাত বাড়াল।

কিন্তু নিশিবাবু কোন চিঠি তার হাতে না দিয়ে হেসে বললেন, 'আপনাকে লেখেনি। আপনার কথা আমাকে লিখেছে। লিখেছে, আপনি নাকি তাঁকে ঠিকানা দিয়ে এসেছেন। তিনি তো কই চিঠিপত্র দিলেন না, আমার চিঠির উত্তর দিলেন না। আপনি বুঝি ওকে কোন চিঠি দেননি?'

'না।'

নিশিবাবু বললেন, 'ভালোই করেছেন মশাই। চিঠিপত্র লেখা সব সময় ঠিকও না। তা ছাড়া মিহির বাবাজী ওসব পছন্দ করে কিনা তাও তো আর আপনি জানতে পারেননি।'

শশাঙ্ক অবাক হয়ে বলল, 'মিহির বাবাজী আবার কে?'

নিশিবাবু হেসে বললেন, 'সেই তো সব। মন্দিরার স্বামী। কেন, সেদিন তো নাম-ঠিকানা সব আপনাকে দিয়ে গিয়েছিলাম, আপনি খেয়াল করেননি। বেশ ভালো ছেলে শুনেছি। যোগরঞ্জন তো খুব প্রশংসা করে। আমি অবশ্য আজও দেখিনি। চাক্ষুষ আলাপ-পরিচয়ও হয়নি। তবে চিঠিপত্র আমিও লিখেছি, সেও লিখেছে। খুব বিনীত, খুব ভদ্র। যাকে মাটির মানুষ বলে তাই।'

শশাঙ্ক বলে উঠল, 'মাটির মানুষ কি ভালো মানুষ?'

নিশিবাবু বললেন, 'তা অবশ্য বলা যায় না। মাটিও তো নানা রকমের আছে। বেলে মাটি, আঁটালে মাটি, পোড়া মাটি। শেষ পর্যন্ত অনেক মাটিই অবশ্য পোড়া মাটি হয়ে যায়। তবে যতই বলুন মশাই, এই মাটিই খাঁটি। আর এই মাটিই শেষ কথা।'

শশাঙ্কের মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল, 'চলুন না, দেখে আসি, আপনার মাটির মানুষটিকে।'

নিশিবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'যাবেন? চলুন, চলুন। তাহলে তো খুব ভালোই হয়। ওরা আমাকে প্রতি চিঠিতেই যেতে লিখছে। যাই যাই করি, যাওয়া আর হয় না। আপনি যদি সঙ্গে থাকেন চমৎকার হবে। বেশ গল্প করতে করতে দুজনে মিলে যাওয়া যাবে।'

শশাঙ্ক একটুকাল চুপ করে রইল। মিহিরকে নয়, মন্দিরাকে দেখার ইচ্ছা মনে উগ্র হয়ে উঠেছে। সেদিন সভা থেকে বেরোবার পথে দেখেছিল প্রসাধনের সামান্য পরিবর্তনে যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে মন্দিরা। সিঁদুর কুঙ্কুমে যেন নতুন নারী হয়ে উঠেছে। সেই রূপ শশাঙ্কের চোখে লেগে রয়েছে। তাকে বার বার সতৃষ্ণ করে তুলছে। তাকে আর একটিবার দেখবার জন্যে শশাঙ্ক যে কোন অসাধ্য-সাধন করতে পারে। কিন্তু মুখে শশাঙ্ক ঔদাসীন্যের ভান করে বলল, 'কী যে বলেন, আমি কেন যাব।'

'গেলেনই বা। তাতে দোষটা কিসের। আপনি তো আর অনিমন্ত্রিত যাচ্ছেন না। আপনি আমার বন্ধু হিসেবে যাচ্ছেন। আমি লিখেছিলাম কিনা আপনার

মত গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গেও আমি দুদিনে বন্ধুত্ব করে ফেলেছি। তাই সে লিখেছে—মামাবাবু, আপনি সবান্ধব চলে আসুন। আপনার পায়ে পড়ি দেরি করবেন না। অহঙ্কার করি না মশাই, বন্ধুভাগ্য আমার আছে। সব আমার বন্ধুরা করে। বন্ধুরা করে, ভাগ্নীরা করে, ভাগ্নীজামাইরা করে। অল্প-স্বল্প মাস্টারি করেছি। সেই পুরোন ছাত্রেরা করে। নি-নাইয়ার শতেক নাও। অর্থ বুঝলেন তো? আমাদের পূব অঞ্চলের ভাষা। যার নিজের নৌকো নেই, সবাইর নৌকোয় তার ঠাঁই হয়। এই যে দাঁত বাঁধিয়েছি একটিও পয়সা লাগেনি। চোখের চিকিৎসা চলছে বিনা পয়সায়। আমাকে সবাই দেয়। আমিও দু হাত পেতে তাদের কাছ থেকে নিই। আমি তাদের কীই-বা দিতে পারি। পথের ফকির কীই-বা দিতে পারে বলুন। আমি তাদের মুখের কথা দিয়ে, আমি তাদের বুক দিয়ে ভালোবাসি। তবু যা আমি দিই তার চেয়ে নিই বেশি, পাই বেশি। পাই, আর ভগবানকে ডেকে বলি, অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাওনি। রজনী সেনের গান। শুনেছেন কখনো?'

শশাঙ্ক বলল, 'না।'

নিশিবাবু হেসে বললেন, 'আচ্ছা আপনাকে একদিন গেয়ে শোনাব। চলুন আমার সঙ্গে। গাড়িতেই গাইতে গাইতে যাব। একটু একটু গাইতেও জানি। তালমান অবশ্য কিছু থাকে না। তা নাইবা থাকল।'

নিশিবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

শশাঙ্কও কোন কথা বলল না। সে অবশ্য যাবে না। তার কি মান-সম্মান বোধ নেই! কখনোই যাবে না। এভাবে সে যেতে পারে না। তবে বুড়োর কথাগুলি শুনে যেতে ক্ষতি কি।

নিশিবাবু বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি। মেয়েটা আমাদের দুজনকে একটু দেখতে চায়। দুটো কথা বলতে চায়। একটু যত্নআত্তি করতে চায়। তার সেই আকাঙ্ক্ষাটুকু মিটতে দেওয়া ভালো। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেও কোন কোন মেয়ের বাপের বাড়ির লোকজনের ওপর, পুরোন আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুদের ওপর একটু বেশি টান থেকে যায়। আবার ছেলে-মেয়ে হলে, সংসারে আচ্ছা করে জড়িয়ে পড়লে তখন আর এই মামাবাবুদের কথা মনেও থাকে না মশাই। কত দেখেছি। তবে যে ক'টা দিন টান থাকে সেই ক'টা দিনই আমাদের লাভ। চলুন, মশাই চলুন। আমাদের রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হবে। ওদের ঘরসংসারও দেখে আসতে পারব, আবার ফাঁকতালে কলিয়ারিটাও দেখা হয়ে যাবে।'

শশাঙ্ক একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা ভেবে দেখি।'

॥ ১৪ ॥

সেদিন সকালবেলায় মিহির একটু পড়াশুনো করতে বসেছিল। বিকালের সিফটে ডিউটি। সকালে আজকাল খানিকটা করে সময় পাওয়া যায়। এই সময়টুকু কাজে লাগাতে চেষ্টা করে মিহির। পড়ে। পরীক্ষার্থী ছাত্রের মত বসে বসে পড়ে। ফার্স্টক্লাস ম্যানেজারশিপের পরীক্ষা আসছে। তাতে উৎরে যেতে হবে। ছেলেবেলা থেকে সে ভোরে ওঠে। পড়াশুনোর কাজটা সকালেই সারতে ভালোবাসে। খাদে সকালে ডিউটি পড়লে সে একটু অস্বস্তি বোধ করে। সকালবেলাটা যেন আর পাঁচজনকে নিয়ে কাজ করবার জন্যে নয়, নিরিবিলিতে থাকবার জন্যে ভাববার জন্যে।

পড়াশুনো মন্দিরাও আরম্ভ করে দিয়েছে। মিহিরের টেবিলে যেমন ইউ এন এস, স্ট্যাথাম আর সিনক্লেয়ারের বইগুলি জড়ো হয়েছে, পাশের ঘরের জানলার ধারের টেবিলটায় তেমনি সাহিত্য, দর্শন আর অর্থনীতির বই সাজিয়ে রেখেছে মন্দিরা।

যদিও বিষয় একেবারে আলাদা তবু স্ত্রীকে মাঝে মাঝে সহপাঠিনী বলে ভাবতে ভালো লাগে মিহিরের। কোনদিন কো-এডুকেশন কলেজে সে পড়েনি। ছাত্রজীবনে কোন মেয়ের সঙ্গে তার তেমন আলাপ-পরিচয় হয়নি। যাদের এদিকে ঝোঁক থাকে তারা আলাপ-পরিচয় করে নেয়। মিহিরের এসব দিকে কোন ঝোঁক ছিল না। হয়তো বাড়ির রক্ষণশীল পরিবেশ, বাবার মতামত আর শাসনের প্রভাব। জীবনে উন্নতি করতে হলে, সৎপথে থাকতে হলে পান, বিড়ি, সিগারেট, নস্যি, থিয়েটার-সিনেমার মত মেয়েদেরও বহু দূরে রাখতে হয়, বাবার এই ছিল নির্দেশ আর উপদেশ। এ যুগে এসব উপদেশ হাস্যকর, মিহির বড় হয়ে পরে বুঝেছে। কিন্তু অল্পবয়সে এর বিরুদ্ধতা করবার মত তার মনে কোন ইচ্ছা হয়নি। বাবা সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে বলতেন, কাব্যচর্চায় শাস্ত্র-চর্চা নষ্ট হয়, সঙ্গীতচর্চায় কাব্যচর্চার হানি হয়, মেয়েদের সঙ্গে মিশলে কাব্য শাস্ত্র সঙ্গীত সব যায়। মিশবার কোন সুযোগই ছিল না মিহিরের। আসলে প্রবণতারই অভাব ছিল। নইলে কলকাতা শহরে বাস করে মিশতে কি আর সে পারত না? বন্ধুদের বোনেরা ছিল, বোনের বন্ধুরা ছিল। ইচ্ছা করলেই মিশতে পারত। কিন্তু ইচ্ছা হয়নি। অনিচ্ছা ঔৎসুক্যের অভাব আর নিষিদ্ধতার উঁচু পাঁচিল তার আর মেয়েদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। বয়স হবার পরেও তা যায়নি। পাশ করে বেরিয়ে চাকরিতে ঢুকবার পরেও সেই দেয়াল ভেঙে পড়েনি।

আর হঠাৎ সেই দেয়ালের ওপার থেকে, যেন সম্পূর্ণ এক ভিন্নরাজ্য থেকে মন্দিরা এসে পড়েছে। ওইটুকু মেয়ে, অনেক পণযৌতুক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। ওইটুকু মেয়ে অনেক অভিজ্ঞতাও নিয়ে এসেছে সঙ্গে। মিহির অনুমান করে। অনুমান কেন, এ তো প্রায় জানা ঘটনা। ওপেন সিক্রেট। বিয়ের

আগে মিহির কাউকে ভালোবাসেনি, কিন্তু মন্দিরা ভালোবাসতে বাসতে এসেছে। একথা যখন মনে পড়ে হঠাৎ মিহিরের মন স্ত্রীর ওপর বিরূপ আর বিমুখ হয়ে ওঠে। মনে হয়, সে যেন এক [illegible]কে নিয়ে ঘর করছে। যাকে নিয়ে সে বাস করছে তার প্রকৃতি সে জানে না। যে একবার লুকিয়েছে সে যে আরো কতবার লুকোবে আর কত কী লুকোবে তার কিছু ঠিক নেই।

কিন্তু যখনই মন্দিরাকে সামনে দেখে, তাকে হাসতে দেখে, তাকাতে দেখে, তাকে কথা বলতে শোনে, সেই রূপের বন্যা যেন মিহিরের সব বিরূপতা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এমন কি পিছন থেকে দেখতেও ওকে ভালো লাগে। ওর বাহুমূল দেখতে ভালো লাগে, হার-পরা গ্রীবার অংশটুকু দেখতে ভালো লাগে। দুল-পরা কর্ণমূল দেখতে ভালো লাগে। গয়না পরলে যে মেয়েদের এত সুন্দর দেখায় মিহির তা যেন এই প্রথম দেখল।

ভালো লাগে। কিন্তু মাঝে মাঝে মিহির সচেতন হয়ে ওঠেঃ মিহির টের পায় তাকে মন্দিরার যেন তত ভালো লাগে না। কর্মক্ষেত্রে মিহিরের যতই সুখ্যাতি হোক, ম্যানেজার তাকে যতই প্রশংসা করুন, সহকর্মীরা যতই তাকে শ্রদ্ধা সমীহ আর ঈর্ষা করুন, মিহিরের রূপহীনতাই যেন মন্দিরার কাছে বড়। শুধু কি রূপহীনতা? মন্দিরা বোধ হয় তাকে রসহীন পুরুষ বলেও মনে করে। মিহিরের মনে হয় মাঝে মাঝে। যেন মিহিরের মুখে প্রণয়ভাষণ মানায় না, দু-একটি কবিতার লাইন মানায় না, মিহিরের আদর সোহাগের ধরনটুকু পর্যন্ত যেন বেমানান। মন্দিরার ধরন দেখে মিহিরের মাঝে মাঝে মনে হয়, যে রসিকপ্রবরের হাতে এর আগে মন্দিরা পড়েছিল তিনি এমন কী বস্তু দিয়েছেন, মিহিরের জানতে ইচ্ছা করে। হঠাৎ মনের মধ্যে কিসের একটা বিদ্বেষ বোধ করে মিহির। ভিতরটা জ্বালা করতে থাকে।

তারপর আস্তে আস্তে মন যখন শান্ত হয়ে আসে নিজের কাণ্ড দেখে মিহির নিজেই হাসে। কখনো বা নিজেকে ধমকায়। ছি ছি ছি, এই বুঝি তার পড়াশুনো হচ্ছে? বইয়ের পাতা যেমন খোলা ছিল তেমনি খোলাই পড়ে আছে আর না হয় হাওয়ায় উল্টাচ্ছে। খনিবিদ্যার ধারেকাছেও মিহির নেই। সে ভাবছে স্ত্রীর কথা। এই মুহূর্তে যা একান্ত অবিদ্যা। তার শাস্ত্রচর্চার প্রতিবন্ধক। মিহির নিজেই নিজেকে তখন শাসন করতে থাকে, 'ছি ছি ছি, আমি সুধীরবাবুর চেয়েও কি বেশি স্ত্রৈণ হলাম! আমি যখন মন্দিরাকে ভালোবাসি তখনো তার কথা ভাবি, যখন ভালোবাসি না তখনো তার কথা ভেবে অধীর হই। আমার মন যদি দিনরাত তাকে নিয়েই মগ্ন থাকে, এক চান্সে তো ভালো, আমি তো তিন চান্সেও পাস করতে পারব না।'

মিহির ভাবে, হয় মন্দিরাকে এখান থেকে সরিয়ে ফের কলকাতায় পাঠাতে হবে, না হয় বিশাখাকে এখানে আনিয়ে নিতে হবে। সে মন্দিরাকে সঙ্গ দেবে। কিন্তু তারও তো সামনে পরীক্ষা। সেও আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে

চায় না। প্রত্যেকেই যার যার ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু এতদিন বাদে মিহিরের ক্যারিয়ারটি বোধ হয় নষ্ট হবার জো হয়েছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার মন অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। যেসব কথা ভাবা উচিত নয় তাই আজকাল ভাবছে মিহির। যারা ছোট কথা নিয়ে ভাবে বড় বস্তু তাদের চোখ এড়িয়ে যায়। অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারেও মিহিরের আজকাল চোখ পড়ে। আগে এমন হতো না।

চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস মিহিরের কম, কিন্তু মন্দিরার ওদিকে বেশ ঝোঁক আছে। প্রায় রোজই সে কাউকে না কাউকে চিঠি লেখে। আর রোজ না-হোক দু-একদিন অন্তর অন্তর তার নামে চিঠিও আসে, এর জন্যে মিহিরের হিংসা হওয়া উচিত নয়। চিঠি দিলে চিঠি পাওয়া যায়, না দিলে তো আর পাওয়া যায় না। বন্ধুরা মিহিরকে বলে, 'তুমি মানুষ হিসেবে ভালো কিন্তু করেসপনডেণ্ট হিসেবে যৎপরোনাস্তি খারাপ। চিঠি দিলে ছ' মাসের আগে তুমি জবাবই দাও না।'

মিহির এই অভিযোগ স্বীকার করে। চিঠি লেখাটা তার তেমন আসে না। মন্দিরার আসে। চিঠি লিখতে ও পারেও।

কিন্তু চিঠি লিখতে পারা এক বস্তু। আর চিঠির জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকা আর এক জিনিস।

মিহির লক্ষ্য করে চিঠির জন্যে যেন হাত বাড়িয়ে থাকে মন্দিরা। কখন পিওন এসে চিঠিগুলি তার হাতে দেবে। আর চিঠিগুলি পড়ে কী খুশিই যে হয়, তার মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল দেখায়। মিহিরের মাঝে মাঝে মনে হয়, চিঠির জগৎই যেন তার আসল জগৎ। সেই জগতের বাইরে এই যে ঘর-সংসার এ যেন মন্দিরার প্রবাস। গায়ে পড়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করা, কোন কৌতূহল প্রকাশ তার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা না করে পারে না, 'কার চিঠি এল?'

মন্দিরা কোনদিন ছন্দা-নন্দার কথা বলে, কোনদিন মীনাক্ষীর কথা বলে। কোনদিন বা মা'র কথা, মামাবাবুর কথা বলে, কোনদিন বা অশ্রুতপূর্ব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবের নাম ওর মুখে শোনা যায়। মিহির বুঝতে পারে সময় কাটাবার জন্যে এদের সঙ্গে সে চিঠির সম্পর্ক পাতিয়েছে। নইলে এত চিঠি লিখবার কোন দরকার তার নেই। দরকার নিঃসঙ্গতা দূর করবার। কেন, মিহির কি তাকে সঙ্গ দিতে পারে না? মিহিরের মনে কি সঙ্গের প্রত্যাশা থাকতে পারে না?

ওই সব চিঠির মধ্যে কী আনন্দ পায় মন্দিরা সেই জানে। কী সব খবর তাতে থাকে যা পড়তে পড়তে মন্দিরা নিজের মনে হাসে, মিহির তা অনুমান করতে যায় না। কিন্তু একটি সাধারণ মেয়ের এই সামান্য সুখও অমন উদার কর্মব্যস্ত মানুষটির মনকে মাঝে মাঝে ঈর্ষাকাতর করে তোলে। এসব চিঠি নিশ্চয়ই গোপন প্রেমপত্র নয়। লুকোবার নিশ্চয়ই কিছু এতে নেই। কিন্তু মন্দিরা

কি মাঝে মাঝে তার চিঠির কোন কোন অংশ নিজে থেকে মিহিরকে পড়ে শোনাতে পারে না? বিশাখা যেমন আগে আগে শোনাত? এখন অবশ্য তার নামেও নিউ ইয়র্ক থেকে একান্ত গোপন আর ব্যক্তিগত চিঠি আসে। কিন্তু সে সব চিঠিরও কিছু কিছু অংশ বিশাখা দাদাকে পড়ে শোনায়। হয়তো বা কোন জায়গার ভৌগোলিক বর্ণনা, হয়তো বা নতুন কোন শহর দেখে আসবার অভিজ্ঞতার কথা বিশাখাকে লিখেছে অমিয়। তা তো আর শুনতে বাধা নেই। সেই অংশটুকু যেন যৌথ সম্পদ।

কিন্তু মন্দিরা স্বামীকে এসব ছোটখাটো সুখ সম্পদের ভাগ দিতে রাজি নয়। মন্দিরা বাড়তি কিছু দিতে গররাজি। আইনসঙ্গত স্বামীর যেটুকু ন্যায্য পাওনা শুধু সেইটুকুই যেন মিহির তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারে। কিন্তু তাও কি ষোল আনা আদায় হয়?

একদিন মিহির জিজ্ঞাসা করেছিল, ঠিক জিজ্ঞাসা করতে চায়নি, কেমন এক অসতর্ক মুহূর্তে বেরিয়ে পড়েছিল কথাটা, 'আচ্ছা, শশাঙ্কবাবু চিঠি-টিঠি লেখেন না?'

বলেই হাসি দিয়ে প্রশ্নটির অশোভনতাটুকু ঢাকতে চেষ্টা করেছিল মিহির।

মন্দিরা একটু থমকে গিয়েছিল। একটু বাদে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'না। তোমার কি সন্দেহ হয়!'

মিহির এই তীব্রতা আশা করেনি। তেমনি হেসে বলেছিল, 'না, এতে আর সন্দেহের কি আছে? তুমি লেখ-টেখনি?'

মন্দিরা চোখ নামিয়ে বলেছিল, 'না।'

গলার স্বরের এই পরিবর্তন বলবার ভঙ্গির এই পরিবর্তন মিহিরের দৃষ্টি এড়ায়নি। আজকাল অনেক ছোট ছোট ব্যাপার চোখে পড়ে মিহিরের। কিন্তু চোখ দুটিকে অনুবীক্ষণ করে তুললে তাতে সব সময় মানুষের সুখ বাড়ে না. বরং অস্বস্তি বাড়ে।

মিহির অবশ্য এ ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীকে আর দ্বিতীয়বার জেরা করেনি। কিন্তু মনে কুশাঙ্কুরের মত একটু সংশয় থেকেই গেছে।

মিহির তার কোন কোন বন্ধুর সঙ্গে চিঠিতে মন্দিরাকে আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছিল। বলেছিল, 'আমাকে ওরা চিঠি লেখে, কিন্তু জবাব পায় না। এবার তুমি এসেছ আমার ভাবনা গেল। একেবারে পার্মানেণ্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী। তুমি আমার হয়ে ওদের জবাব দাও। তোমার নিজের জবানীতেও কিছু কিছু লিখে দিয়ো। ওরা খুশী হবে।'

কিন্তু মন্দিরা মিহিরের বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হতে কোন আগ্রহ দেখায়নি। তার নিজের যে-সব বন্ধু আছে তাই যথেষ্ট। স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে সে বন্ধুত্ব করতে চায় না।

এ-সব ছোট ছোট ব্যাপার মিহির লক্ষ্য না করলেও পারে। এসব প্রায় স্ত্রী-

জগতের এলাকায়। নিজের সাধ আহ্লাদ রুচি প্রবণতা নিয়ে মন্দিরা তো একটু আলাদা হবেই। পাশাপাশি বাস করলেও পুরুষের জগৎ আর মেয়েদের জগৎ যে এক নয় সে বোধ মিহিরের আছে। কিন্তু যেখানে তারা মিলতে পারে সেখানেও মন্দিরা মিলতে আসে না। তারা এক সঙ্গে বাস করে কিন্তু এক সাথে বসে গল্প করে না, গুরু হোক তুচ্ছ হোক—কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না। কোন কিছু নিয়ে হাসাহাসি করে না। তাদের একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হয়েছে। মন্দিরার ভালো লাগে না। কোন না কোন অজুহাতে এড়িয়ে যায়।

অথচ মন্দিরার বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযোগ করবার কিছু নেই। সে ঘর-সংসারের কাজ ঠিক মতই করে। স্বামীর সেবা যত্নেও যে কোন ত্রুটি হয় তা নয়। তবু মিহিরের মনে হয় সে সবটুকু পায় না। সব পাওয়া যায় না তা মিহির জানে। কিন্তু যেটুকু পেলে মনে হয় সব পাওয়া হল, অন্তত সেটুকু তো পাওয়া চাই।

ঘর-সংসারের কাজের পরেও মন্দিরা অনেক সময় পায়। এই সময়টা সে বইপত্র নিয়ে কাটায়, না হয় তো চিঠি লেখে। মিহিরের কাছে আসবার কথা যেন তার মনেই হয় না। মিহিরও তো অলস কি বেকার মানুষ নয়। তারও বহু সময় বাইরে কাটে। আট ঘণ্টা ডিউটি দেয়। বাড়িতে এসেও বসে থাকে না। যে সময়টুকু পায় বই-টই নিয়ে বসে। তারও অবসর কম। কিন্তু যে অবসরটুকু আছে সেটুকু প্রীতিতে মাধুর্যে ভরে উঠবে, এটুকু মিহির নিশ্চয়ই আশা করতে পারে। সে আশা পূরণ হয় না।

মাঝে মাঝে ক্লান্তি বোধ করে মিহির। মনে হয় তারা যেন বহুকালের দম্পতি। পরস্পরকে চেনা জানা তাদের শেষ হয়ে গেছে। কোন রহস্যের উন্মোচন যেন আর বাকি নেই। কৌতূহল নেই। ঔৎসুক্য নেই। প্রাণস্পন্দনহীন দুটি মৃত গ্রহ শুধু পাশাপাশি বাস করছে। বিয়ের এক বছর পূর্ণ হতে না হতেই যেন সব শূন্য হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় মিহিরের।

কখনো বা মনে হয়, মন্দিরাকে সে যেন জোর করে বন্দিনী করে রেখেছে। কিন্তু যে বন্দিনী হয়েছে তার চেয়ে যে তাকে বেঁধে রেখেছে, তার দুর্দশা দুর্ভোগ কোন অংশে কম নয়। যাকে মিহির ভালোবেসেছে সারা জীবন তার পাহারাদার হয়ে থাকার দুঃখ কি কম?

মিহির কোন কোন দিন ভাবে, এর চেয়ে বলে দিলে হয়, 'বন্দীশালা খুলে দিলাম। তুমি যেখানে খুশি চলে যেতে পার।'

কিন্তু বলতে পারে না মিহির। কোথায় যেন লাগে। টন টন করে ওঠে বুক।

পাখি হয়তো পিঞ্জরকে ভালোবাসেনি। কিন্তু পিঞ্জর পাখিকে ভালোবেসে ফেলেছে।

বাইরের ঘর থেকে হাসি আর কথার শব্দ ভেসে আসছে।

মিহির কান খাড়া করল।

ও-ঘরে প্রবীর এসেছে, মন্দিরা তার সঙ্গে কথা বলছে। বাইরের কেউ এলে মন্দিরা অপ্রসন্ন হয়ে থাকে না। খুশি হয়ে তার সঙ্গে গল্প করে, হাসে।

মন্দিরা যখন শুধু তার সঙ্গে থাকে তখনই তার ভাবান্তর লক্ষ্য করে মিহির।

প্রবীর বোসকে অবশ্য মিহিরও বেশ পছন্দ করে। গত বছর মাইনিং পাস করে এই কলিয়ারীতে ট্রেনিং নিতে এসেছে। বেশির ভাগ সময় ডিউটি তার মিহিরের সঙ্গেই পড়ে। বেশ হাসিখুশি প্রসন্নচিত্ত। ভবিষ্যত উন্নতির দিকে লক্ষ্য আছে। আত্মবিশ্বাস আছে নিজের ওপর। নিজের শক্তিতে যোগ্যতায় কোন সংশয় নেই। বেশ লাগে মিহিরের। মাত্র ক'বছর আগেও ওই প্রবীরের মতই ছিল মিহির। এক বছর আগেও সহজ সরল ছিল জীবন। নিজের সুখের জন্যে তাকে আর কারো ওপর নির্ভর করতে হতো না। এখন আর একজনের সঙ্গে গিঁট বাঁধতে গিয়ে মিহির জীবনকে জটিল করে ফেলেছে। সে গ্রন্থি যে কত শিথিল মিহির নিজের মনে তা জানে। বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো। তবু তো সে গিঁট ছিঁড়েও ফেলা যায় না, খুলেও ফেলা যায় না। মায়া লাগে।

আবার হাসছে মন্দিরা। ওর উচ্চ প্রাণখোলা হাসি দুর্লভ। মিহির সেই হাসিতে কান পাতল।

প্রবীরের গলা শোনা যাচ্ছে।

'আপনাকে কী বলে ডাকব কিছুতেই মন স্থির করতে পারিনে। ঠিক আমার গোঁফের মত। এক সপ্তাহে রাখি, পরের সপ্তাহে চেঁছে ফেলি। কিসে যে বেশি সুন্দর দেখাবে বুঝতে পারিনে। বলুন-না কিসে বেশি সুন্দর দেখাবে?'

মন্দিরা আবার হেসে উঠেছে, 'আমি কী করে বলব। আপনার মিহিরদাকে জিজ্ঞেস করুন।'

আপনার মিহিরদা। কথাটা বেশ লাগছে শুনতে।

প্রবীর বলল, 'ওরে বাব্‌বা, এসব পরামর্শ কি ওঁর কাছে নেওয়া যায়। উনি হলেন গুরুজন।'

'আর আমি বুঝি গুরুজন নই?'

'কী করে গুরুজন হবেন? আপনার ওজন ভারি হালকা। সেদিন তো বয়সের হিসেবে দেখা গেল আপনি আমার চেয়ে তিন বছর ছ' মাস তের দিনের ছোট। এমন একটি তরলা চপলা কমবয়সী মেয়েকে বউদি বলে ডাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'বেশ, তাহলে মিসেস মুখার্জী বলে ডাকবেন। সবাই যা ডাকে।'

'ইস, বললেই হল। সবাই যা ডাকে! কেউ ডাকে না। অমন একটা ভারি শব্দ

মুখ থেকে বার করতে না করতে হাসতে হাসতে আমার পেট ফেটে যাবে।'

'তাহলে নাম ধরে ডাকবেন।'

'ওরে বাবা। সামনে সিগারেট খেতে পারমিশন দিয়েছেন বলে আপনাকে নাম ধরে ডাকতেও অনুমতি দেবেন মিহিরদা! মাঝখান থেকে আমার শিক্ষা-নবিশীর লীলা অকালে সাঙ্গ হবে।'

মন্দিরা ফের হেসে উঠল।

এ-ঘরে বসে মিহির নিজেও মনে মনে হাসছিল। প্রবীর তো আচ্ছা ফাজিল হয়েছে।

মিহিরের মনে হল, তার কোন কথায় মন্দিরা অমন করে হাসে না। তার মধ্যে কি এমন কিছু আছে যাতে মন্দিরার হাসি বন্ধ হয়ে যায়? মিহিরকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে তার হাসি আর উল্লাসের ধারা আপনা থেকেই শুকিয়ে আসে?

মিহির পড়ার টেবিল থেকে উঠে বাইরের ঘরে এসে বসল। ওদের জানতে দিল না, সে সব শুনেছে।

জিজ্ঞাসা করল, 'কী প্রবীর, কী সব আলোচনা হচ্ছিল তোমাদের?'

প্রবীর ততক্ষণে শান্ত শিষ্ট সভ্য ভদ্রলোক। বাইশ-তেইশ বছরের যুবক। ছিপছিপে চেহারা। রোগাই বলা যায়। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। বেশি ফর্মালিটির ধার ধারে না। পা-জামা আর হাফ-শার্টেই চলে এসেছে অফিসারের কোয়ার্টারে। ঘাড়ে গলায় খানিকটা পাউডার মেখেছে। ঘামাচিগুলি তাতে সব ঢাকা পড়েনি।

'কী আলোচনা হচ্ছিল তোমাদের?'

মিহির হেসে জিজ্ঞাসা করল।

প্রবীর সব অস্বীকার করে বলল, 'আলোচনা কিছু হচ্ছিল না, মিহিরদা। আলোচনা আবার কিসের!'

মিহির মন্দিরার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'ও কি বলছিল এতক্ষণ।'

মন্দিরা বলল, 'ওঁর কাছেই শোন।'

মিহির বলল, 'ও কি আর আমার কাছে সত্যি কথা বলবে? ছেলে হিসেবে ও ব্রিলিয়াণ্ট। কিন্তু সত্যি বলা ওর ধাতে নেই।'

প্রবীর বলল, 'একটা সত্য কিন্তু প্রায়ই অনুভব করি মিহিরদা। বিশেষ করে এই গরমের দিনে সেটা বেশি করে মনে পড়ে।'

'তোমার সত্যোপলব্ধির কথাটা শুনি একবার।'

প্রবীর বলল, 'মাঝে মাঝে ভাবি কী কুক্ষণেই মাইনিং পড়েছিলাম। তার ফলে অদৃষ্টে পাণ্ডবের এই অজ্ঞাতবাস। কী অ্যাটমসফিয়ার আর কী এসোসিয়েশান। ভদ্রলোকের মুখ এখানে ক'টি তা আঙুলে গোনা যায়। দেখে দেখে মুখস্থ হয়ে গেছে।'

মিহির হেসে বলল, 'কেন, আমার তো বেশ লাগে। তোমার বুঝি জায়গাটা ভালো লাগে না? এদিক থেকে মন্দিরার সঙ্গে তোমার মতের মিল হবে।'

'আবার আমাকে কেন জড়াচ্ছ!' মিহিরের দিকে তাকাল মন্দিরা।

প্রবীর বলল, 'আপনি শিগগির ছাড়িয়ে নিজেকে নিয়ে চটপট দু কাপ চা আনতে চলে যান। মিহিরদা আর আপনার নাগাল পাবেন না।'

মিহির হেসে বলল, 'পরামর্শটা মন্দ নয়।'

মন্দিরা জিজ্ঞাসা করল, 'চা না সরবৎ?'

প্রবীর বলল, 'না না, সরবৎ নয়। সকালে সরবৎ নয়। দুপুরটা তেতে উঠলে তখন ওসব ঠাণ্ডা জিনিসের কথা ভাবা যাবে।'

মন্দিরা ভিতরে গেলে মিহির বলল, 'তুমি কি সত্যি নিজের প্রফেশনে অখুশী?'

প্রবীর হেসে বলল, 'তাই কি আর হতে পারি? অমনিই বলছিলাম। কেউ যখন অ্যাটাক্ করে তখন বুক দিয়ে নিজেদের মান মর্যাদা আটকাই।'

মিহির কৌতুক বোধ করে বলল, 'অ্যাটাক্ করে মানে।'

প্রবীর একটু হেসে বলল, 'সেদিন সিমলা স্ট্রীটে এক বিয়ে বাড়িতে পোলাও, মাংস খেতে খেতে বাবার এক বন্ধু ইঞ্জিনিয়ারদের আক্রমণ করেছিলেন।'

'কী ব্যাপার?'

'তিনি বললেন, তোমরা সব ভালো ভালো ছেলে পিওর সায়ান্স না পড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দিকে গিয়ে দেশের সর্বনাশ করছ। কতগুলি মিস্ত্রী আর কারিগর তৈরি হচ্ছে। কী লাভ হবে এতে? তাঁর মতে পিওর সায়ান্সই আসলে সায়ান্স। অ্যাপলায়েড সায়ান্সটা নিচুতলার জিনিস। তাঁর মতে শুধু মিস্ত্রী আর কারিগরেরা দেশের মান মর্যাদা বাড়াতে পারবে না। দেশের মান বাড়াবেন ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টরা, ফিলজফাররা, আর পিওর সায়ান্সের সাইনটিস্টরা। তাঁরা নতুন তত্ত্বের আবিষ্কার করবেন। বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে কিছু দিয়ে যাবেন। অন্তত দিতে চেষ্টা করবেন।'

মিহির বলল, 'আর আমরা?'

প্রবীর বলল, 'আমার সেই কাকাবাবু বলেন, তোমরা শুধু ক্যারিয়ারিস্ট, আর কিছু না। কেবল ভালো চাকরিবাকরি করব, ভালো খাব ভালো পরব এই তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। তার চেয়ে বড় কিছু না। যারা মাঝারি ধরনের ছেলে তারা ওপথে যায় যাক, কিন্তু ওখানে মাথাওয়ালা ভালো ছেলেদের ভিড় দেখলে দুঃখ হয়।'

মিহির একটু গম্ভীরভাবে বলল, 'তুমি কি বললে?'

প্রবীর বলল, 'আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, সে রকম বৈজ্ঞানিক দলে দলে আসেন না। তাঁদের সংখ্যা হাজারে এক। নশ' নিরানব্বইজন লেবরেটরীতে গিয়ে রট করে। কিছু করতে পারে না। থিওরীর দিকে যাদের বিশেষ ন্যাক আছে তারা তো কিছু কিছু প্রতি বছর পিওর সায়ান্সের দিকে যায়ই। রিসার্চের জন্য তারা থাকুক। বাকি সব অ্যাপলায়েড সায়ান্সের দিকে

চলে এলেই ভালো। যত বেশি আসে ততই ভালো। এসব দিকে যত বেশি স্কোপ বাড়বে ততই মঙ্গল। কী বলুন মিহিরদা?'

মিহির খুশি হয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই।'

প্রবীর তার মনের কথা বলেছে।

'তোমার সেই কাকাবাবুকে কনভিনস্ করাতে পারলে?'

প্রবীর হেসে বলল, 'একটুও না। তিনি সেই যে লিবারেল এডুকেশনের মাহাত্ম্য আঁকড়ে ধরে রইলেন সেখান থেকে একটুও নড়লেন না। যাঁদের বয়স হয়ে গেছে, নিজেদের মত আর পথ থেকে তাঁদের ছাড়িয়ে আনা ভারি শক্ত।'

মিহির একটু হেসে বলল, 'আসলে কিন্তু সেটা তাঁদের যৌবনেরই পথ। ওঁরা তাঁদের যৌবনস্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে থাকেন।'

একটু চুপ করে থেকে প্রবীর বলল, 'তাঁর সঙ্গে খুব তর্ক করলাম সেদিন। তারপর ফেরার পথে বাসে আসতে আসতে ভাবলাম, স্পেশালাইজেসনের কিছু কিছু কুফলও আছে।'

'কি রকম?'

প্রবীর বলল, 'মনকে বড় একমুখো করে দেয়। বলতে পারি কুনো করে দেয়। আমার যেসব বন্ধু আর্টস্ নিয়ে পড়েছে, এম-এ পাস করে গেছে, আমি কলেজের প্রথম দু' বছরে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কনটিনেন্টাল নভেল পড়েছি। আধুনিক সাহিত্যও পড়েছি। এখন আর তা পারি না। এখন ওরা আমার চেয়ে ওসব বিষয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। ওরা অনেক বেশি খোঁজ খবর রাখে। কাব্য সাহিত্য পড়ে ওরা আমার চেয়ে ঢের বেশি রস পায়। আমি ততটা পাই না। এর পরে আরো কম পাব। আরো পরে হয়তো একেবারেই পাব না। সময় কোথায় অন্য সাবজেক্টে পড়াশুনো করবার। এর পরে সময় কিছুটা পেলেও হয়তো ইচ্ছা আর রুচি মরে যাবে। শুধু কি সাহিত্য? আরো কত বিষয় থেকে আমার কৌতূহল সরে আসবে তার কি কিছু ঠিক আছে?'

একটু থেমে প্রবীর মৃদু হেসে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল, 'তবু এ যুগে স্পেশালাইজেসন ছাড়া উপায় নেই।'

মন্দিরা এল চা নিয়ে। প্রবীরের দিকে চেয়ে বললে, 'কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল আপনাদের? এবার শুনি।'

প্রবীর কৌতুকের ভঙ্গিতে বলল, 'অতি তুচ্ছ ব্যাপার। অতি তুচ্ছ। আমরা সব বাজে জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম।'

কিন্তু মিহির স্ত্রীকে কোন গুরুতর আলোচনার বাইরে রাখতে চায় না। অনধিকারিণী বলে দূরে সরিয়ে রাখা তার ইচ্ছা নয়। তাহলে তো মন্দিরা দূরেই সরে থাকবে।

মিহির বলল, 'আমাদের আলোচনাটা হচ্ছিল এ যুগের স্পেশালাইজেসনের ফলাফল নিয়ে।'

কিন্তু প্রবীর মিহিরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'আমাকে বলতে দিন মিহিরদা। আমি বলছি।'

তারপর মন্দিরার দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'নানারকম আলোচনা করে আমরা এই ডিসিসনে এসেছি, পৃথিবীতে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। আপনার কি এ সিদ্ধান্তে কোন আপত্তি আছে?'

মন্দিরা হেসে কি যেন জবাব দিতে যাচ্ছিল, দেওয়া হল না, পরিচিত ডাকপিওন দোরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আপনাদের চিঠি।'

চায়ের কাপটি তাড়াতাড়ি হাত থেকে নামিয়ে রেখে মন্দিরাই এগিয়ে গেল চিঠিখানা নিতে। একখানাই মাত্র চিঠি এসেছে আজ। পোস্টকার্ডে লেখা, মিহিরের নামে।

মন্দিরা একটু দেখে স্বামীর দিকে চিঠিখানা এগিয়ে দিতে যাচ্ছিল, মিহির বলল, 'পড় না শুনি।'

মন্দিরা বলল, 'তুমি পরে পড়ে নিয়ো।'

মিহির বলল, 'কেন, তুমিই পড় না। প্রবীরের কাছে আমাদের কোন সংকোচ নেই। ও এখন আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। তাছাড়া পোস্টকার্ডে নিশ্চয়ই এমন কোন কনফিডেনশিয়াল কথা কেউ লেখেননি—'

প্রবীর পাদপূরণ করে বলল, 'লিখলেও নিশ্চয়ই কোডওয়ার্ডে দিয়েছেন। কিন্তু আমি বরং উঠি মিহিরদা।'

কিন্তু মিহির ওর হাত চেপে ধরে বলল, 'বোসো।' তারপর মন্দিরাকে ফের পড়তে বলল চিঠিখানা।

কিন্তু মন্দিরা চিঠিখানা মিহিরের হাতে দিয়ে চায়ের কাপগুলি গুছিয়ে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

মিহিরই মনে মনে পড়ল চিঠিখানা।

'কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। মন্দিরার চিঠিও সেদিন পেলাম। তোমাদের একটা সুখবর দিচ্ছি। আমার নতুন বন্ধু শশাঙ্কবাবু আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে রাজী হয়েছেন। তিনি অবশ্য বলেছেন আসানসোল পর্যন্ত যাবেন। সেখানে তাঁর বন্ধুর বাড়িতে উঠবেন। কিন্তু আমার ধারণা আমি তাঁকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারব। তবে তোমার অনুমোদন চাই। গৃহস্থের বাড়িতে উৎপাত করতে যাব আর তাদের অনুমতি নিয়ে যাব না তা কি হয়? তোমাদের কোন অসুবিধা থাকলে জানিও। পরে যাব। আমি ভালো আছি। যোগরঞ্জনদের বাড়ির সব কুশলে আছে। যোগরঞ্জন নার্সিংহোম প্রায় তুলে

ফেলেছে। ক্ষমতা আছে মানুষটির। আমি তাকে বলেছি 'আমাকে তোমার প্রথম পেশেন্ট হিসাবে ভর্তি করতে হবে।

তোমরা দুজন আমার সস্নেহ আশীর্বাদ নিয়ো।' ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
নিশিকান্ত গুহ

চিঠি পড়ে মিহির চুপ করে বসেছিল; প্রবীর বলল, 'কী হল মিহিরদা?'

মিহির একটু হেসে বলল, 'আমাদের দুজন বন্ধু এখানে বেড়াতে আসতে চাইছেন।'

প্রবীর হেসেই বলল, 'আসতে চাইছেন তো আসতে বলুন। এই পাণ্ডব-বর্জিত জায়গায় লোকজন যত আসে ততই ভালো, অ্যাকোমোডেশনের জন্যে ভাববেন না। আমাদের মেসেও এখন জায়গা আছে। সেখানেও ব্যবস্থা করতে পারব।'

মিহির বলল, 'আচ্ছা দরকার হলে বলব তোমাকে।'

প্রবীর এবার বিদায় নেওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

প্রবীর চলে যাওয়ার পরেও মিহির খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তার চেয়ারটিতে বসে রইল। বাইরে থেকে দেখতে মাটির মানুষ, পাথরের মানুষ মিহির। প্রশান্তির প্রতিমূর্তি। কিন্তু ভিতরেও কি তাই? সেখানে আগ্নেয়গিরি জ্বলে উঠেছে। সেখানে লাভাস্রোতের বিরাম নেই। সেখানে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চিত্তাকাশ চির আচ্ছন্ন।

শশাঙ্কের প্রতি মিহিরের মন চরম বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এমন নির্লজ্জ সম্ভ্রমসম্মানবোধহীন পুরুষ যে পৃথিবীতে থাকতে পারে, তা যেন মিহিরের ধারণার বাইরে ছিল। লোকটি নাকি আবার ভদ্রলোক। কলেজে পড়ান। কলেজের বাইরেও রীতিনীতি শিক্ষা সংস্কৃতি নিয়ে বক্তৃতা দেন। সেই ভদ্র সভ্য বিদ্বান সংস্কৃতিবান মানুষটি বিয়ের পরেও তার ছাত্রীকে নিষ্কৃতি দিচ্ছে না। তার পিছনে পিছনে ছুটেছেন। তার শান্তির নীড়ে এসে হানা দিচ্ছেন।

শশাঙ্কের মত মানুষের কাছে শোভনতা, শিষ্টাচার, আত্মসম্মানজ্ঞান আশা করাই বোধ হয় মিহিরের ভুল। আর কেউ হলে এমন একটা প্রস্তাব তুলতেই পারত না। বিনা নিমন্ত্রণে কারো বাড়িতে আসবার কথা ভাবতেই পারত না। বিনা আমন্ত্রণে সে তার পরম বন্ধুর বাড়িতেও একদিন গিয়ে বাস করেছে, মিহির মনে করতে পারে না। নিশ্চয়ই বন্ধুর কাছ থেকে সে সব কিছুই নিতে পারে। কিন্তু চেয়ে নিতে পারে না, কেড়ে নিতে পারে না। সে আদানপ্রদান এমনভাবে হয় যে, দানের সঙ্গে প্রতিদানের কোন বিভেদ থাকে না।

কিন্তু শশাঙ্ক তো মিহিরের বন্ধু নন। বন্ধুত্ব তো ভালো, তাঁর সঙ্গে মিহিরের আলাপপরিচয় মাত্র নেই। মন্দিরার সঙ্গে তার যে সম্পর্কই থাকুক, মিহির তো তাঁকে চেনে না। আর এ বাড়ির মালিক মিহির, এ গৃহের কর্তা মিহির। শশাঙ্ককে আসতে হলে তার কাছেই আসতে হবে, মন্দিরার কাছে নয়।

মিহিরের কোন সন্দেহ নেই—লোকটি গিয়ে ওই বুড়ো নিশিবাবুকে ধরেছে। গিয়ে বলেছে, 'আমি যাব আপনার সঙ্গে। আমাকে নিয়ে চলুন।'

একা একা সে আসবে সে সাহস নেই। কোন লজ্জায় মুখ দেখাবে? তাই মামাবাবুর নাবালক ভাগ্নে হয়ে তাঁর পিছনে পিছনে আসছে। ভিখিরির মত আসছে মিহিরের দোরে। মিহির মুহূর্তে টেলিগ্রাম করে বলে দিতে পারে, 'Don't come.' অন্তত নিশিবাবুকে জানাতে পারে, 'আপনার ইচ্ছে হয় আপনি আসুন।'

মনে মনে টেলিগ্রামের খসড়া করে ফেলল মিহির। এর প্রতিটি শব্দ সে লিখবে। একটিও বাদ দেবে না। তাতে যত খরচ হয় হবে।

কিন্তু নিশিবাবুর স্বার্থ কী। শশাঙ্ককে যেমন সে দেখেনি, নিশিবাবুকেও তেমনি সে দেখেনি। মন্দিরার কাছে যতদূর শুনেছে নিশিবাবু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানুষ। শশাঙ্ক আর নিশিকান্ত এই দুটি শব্দের অর্থগত মিল আছে, কিন্তু আকৃতিগত প্রকৃতিগত কোন মিলই নাকি ওঁদের মধ্যে নেই। বয়সেও অমিল। তবু মিলটা কী করে সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে?

এত লোক জানে, এত লোক শুনেছে, আর নিশিবাবু শোনেননি? বিশ্বাস হয় না মিহিরের। নিশিবাবু কি এত কালা, এতই কম শোনেন কানে? নাকি শুনেও শোনেন না।

নাকি সব জেনেও ভাগ্নীর আবদার মিটাচ্ছেন নিশিবাবু? ভাগ্নী বলেছে 'আমাকে আকাশের চাঁদ ধরে দাও। ওই নষ্ট চাঁদটিই আমার চাই।'

সেই চাঁদ ধরে আনছেন নিশিবাবু।

মিহির না ডাকলে কী হবে, নিশ্চয়ই মন্দিরা গোপনে গোপনে ওদের ডেকে আনছে। নিজে ডেকে মিহিরকে দিয়ে ডাকিয়ে নিচ্ছে। মিহিরের অনুমতি চাওয়া সেই আড়ালটুকু রাখবার জন্যে। খুব ছলাকলা শিখেছে মন্দিরা। শিখবেই তো। তের চোদ্দ বছর বয়স থেকে ডালে ডালে পাতায় পাতায় হাঁটে যে, সে ছলনায় হাত পাকাবে এ আর এমন বেশি কথা কি।

সন্দেহে সংশয়ে আর বিদ্বেষের বিষে জর্জরিত হতে লাগল মিহির। আর জ্ঞাত পরিচিত সমস্ত মানুষকে এক অদৃশ্য বল্লম দিয়ে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল। সবাই তাকে প্রতারিত করেছে। মন্দিরা, মন্দিরার মা-বাবা, শশাঙ্ক, নিশিবাবু—সবাই। সব তার শত্রুপক্ষ। ঝড় কি ভূমিকম্পে একটি অঞ্চল যেমন সাময়িকভাবে বৃহৎ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, মিহিরও তেমনি বহুক্ষণ ধরে এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে রইল। সেই ক্ষুদ্র দ্বীপের ওপর দিয়ে অন্ধ

বিদ্বেষের ঝড় অবিরাম বয়ে চলতে লাগল।

অন্তঃপ্রকৃতির সেই প্রচণ্ড ঝড় বন্যা অগ্ন্যুৎপাতের কিছু কিছু চিহ্ন মিহিরের মুখে চোখে নিশ্চয়ই ফুটে উঠে থাকবে। কিন্তু তা লক্ষ্য করবার জন্যে বহুক্ষণের মধ্যে কেউ সেখানে এসে উপস্থিত হল না।

তারপর যেন যুগ-যুগান্তর পরে একটি নারীর ভীরু পদধ্বনি শুনতে পেল মিহির, মৃদু কণ্ঠধ্বনি কানে গেল তার।

'নাইতে যাবে না?'

এতক্ষণ তো স্নানযাত্রাই চলছিল মিহিরের। অগ্নিস্নান। মিহির স্ত্রীর দিকে তাকাল না। তার কথায় সাড়া দিল না।

'নাইতে যাও। সাবান তোয়ালে সব বাথরুমে রেখে এসেছি।'

মিহির বলল, 'আজ চান করব না ভেবেছি।'

মন্দিরা স্বামীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'কী যে বল। এই গরমের দিনে মানুষ তিনবার করে চান করে। আর তুমি নাইতেই চাইছ না। কেন তোমার হয়েছে কী।'

'মন্দিরা, তুমি কি নিশিবাবুদের আসতে বলেছিলে? সত্যি করে বল।'

মন্দিরা একটু চুপ করে রইল। তারপর মুখ নিচু করে বলল, 'বলেছিলাম। মামাবাবুকে লিখেছিলাম চিঠি। কিন্তু এখন আবার নিষেধ করে লিখে দিচ্ছি। ওঁদের এসে কাজ নেই। এই নাও।'

চিঠি একেবারে লিখে এনেছে মন্দিরা। পোস্টকার্ডের জবাবে পোস্টকার্ড। চিঠিখানা মন্দিরা স্বামীর দিকে এগিয়ে দিল।

মিহির বলল, 'না করে দিলে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তো না করতে বলিনি।'

মন্দিরা চুপ করে রইল।

'তাছাড়া নিশিবাবু চিঠি দিয়েছেন আমাকে। আমার জবানীতে না লিখে তোমার জবানীতে জবাব দিলে কেন?'

মন্দিরা একটু হাসল, 'একই তো কথা। তুমি কতদিন বলেছ, আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী হও। আজ হলাম। তুমি কতদিন বলেছ, আমার হয়ে দু'একখানা চিঠি লিখে দাও। আজ দিলাম। আমি বোধ হয় ভুল লিখিনি।'

মিহির অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকাল।

এই কিছুক্ষণ আগেও প্রবীরের সঙ্গে যে-মেয়েটি তরলকণ্ঠে হাসাহাসি করেছিল, লঘু কৌতুকে বার বার উচ্ছ্বসিত, উচ্ছলিত হয়ে উঠছিল, বয়সের হিসাবে, স্বভাবের চপলতায়, বিদ্যাবুদ্ধির স্বল্পতার কথা উল্লেখ করে প্রবীর যাকে বার বার একটা কিশোরীর পর্যায়ে, বালিকার পর্যায়ে টেনে নামাচ্ছিল, এ কি সেই মন্দিরা?

'আমি তো তোমাকে ও-সব কথা লিখতে বলিনি মন্দিরা। আমি কাজে ব্যস্ত, পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত, এ সময় এলে আমার অসুবিধা হতে পারে। এ-সব তো তোমাকে আমি লিখতে বলিনি।'

মন্দিরা ফের একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'মামাবাবুকে এ-সব ছাড়া আর কী লেখা যেত?'

মিহির বলল, 'কী লেখা যেত? আচ্ছা, পোস্টকার্ড আছে আর তোমার কাছে? না না, পোস্টকার্ড থাক। একখানা ইনল্যান্ড লেটার বরং নিয়ে এসো।'

মন্দিরা বলল, 'তুমি বরং চান-টান করে নাও। তারপর লেখা যাবে। বেলা প্রায় বারটা বাজল। দেখ ঘড়ি।'

মিহির বলল, 'তা হোক। বলতে আমার পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না। তুমি তো চিঠিপত্র তাড়াতাড়িই লিখতে পার। লিখতে তোমারই বা কতক্ষণ লাগবে।'

স্বামীর একগুঁয়েমির কথা জানে মন্দিরা। সে আর আপত্তি না করে ভিতরে চলে গেল।

মিহির ভাবল, এত ভয় কিসের তার? যতক্ষণ সে সুস্থ, প্রকৃতিস্থ সবল থাকতে পারবে, ততক্ষণ তার কোন ভয় নেই। মানুষ যদি নিজের মনে মনে না মরে, বাইরে থেকে কেউ তাকে মারতে পারে না। সেই আত্মহনন যে কী বস্তু, কিছুক্ষণ ধরে মিহির তা মর্মে মর্মে টের পেয়েছে।

মন্দিরা এল। ইনল্যান্ড লেটার একখানা নিয়ে এসেছে। পোস্টকার্ড বোধ হয় আর নেই ওর কাছে।

মিহির বলল, 'নাও লেখ। নিশিবাবুকে তো শ্রীচরণেষু পাঠই লিখেছ দেখছি।'

মন্দিরা বলল, 'হ্যাঁ, বুড়ো মানুষ। ওঁকে আমরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। পাঠও ওই রকমই লিখি।'

'আচ্ছা লিখে যাও। তোমার জবানীতে যেমন লিখেছিলে, তেমনি লিখে যাও। তবে এবার আমার ডিকটেশন অনুযায়ী।' মিহির একটু হাসল। তারপর বলে যেতে লাগল,

'শ্রীচরণেষু,

মামাবাবু, আপনার চিঠি পেয়ে আমরা খুব আনন্দিত হলাম। আপনারা আসবেন জেনে আরো বেশি খুশি হয়েছি। আমরা কতজনকেই তো আসতে বলছি। বাবা-মাকে, ছন্দা-নন্দাকে, দিদি-জামাইবাবুকে, শ্বশুরবাড়ির সবাইকে আসতে বলেছি। কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত এলেন না। আপনারা যদি আসেন, আমাদের খুব ভালো লাগবে। উনি নিজের হাতে চিঠি দিতে পারলেন না বলে কিছু মনে করবেন না। ওঁর চিঠি লেখায় ভারি আলস্য। কেউ চিঠি লিখলে আমাকে জবাব দেওয়ার জন্যে সাধাসাধি করেন। আপনারা কোন

তারিখে আসছেন, কোন্ ট্রেনে, অবিলম্বে লিখে জানাবেন। আমরা সেই অনুযায়ী স্টেশনে থাকব।

আপনি আমাদের দুজনের প্রণাম গ্রহণ করবেন।' ইতি—

আপনার স্নেহধন্যা
মন্দিরা।

লিখতে লিখতে মন্দিরা বার বার থেমে যাচ্ছিল। বার বার তাকাচ্ছিল মিহিরের দিকে। আপত্তির সুরে বলছিল, 'এ-সব কী হচ্ছে? এ-সব আমাকে দিয়ে কেন লেখাচ্ছ?'

কিন্তু মিহির নাছোড়বান্দা। সবটুকু লিখিয়ে তবে ছাড়ল।

তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'এবার খুশি?'

মন্দিরা চোখ তুলে তাকাল। তার দু' চোখে জল।

'কেন আমাকে দিয়ে এ-সব লেখালে? তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করছ?'

মিহির বলল, 'আমি নিজেকে নিজে পরীক্ষা করছি মন্দিরা।'

'তোমার আবার কিসের পরীক্ষা?'

মিহির হেসে বলল, 'ফার্স্টক্লাস ম্যানেজারশিপের।'

মন্দিরা ফের একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর প্রতিবাদের সুরে বলল, 'না না, এ-চিঠি পাঠিয়ে দরকার নেই। আমি আগে যা লিখেছিলাম, তাই তো ঠিক ছিল।'

মিহির হেসে বলল, 'আগে যা লিখেছিলে, তুমি ভেবেছ, তাই আমার মনের কথা। এখন তোমাকে দিয়ে আমি যা লেখালাম, আমার ধারণা, তাই তোমার মনের কথা। একই কথা মন্দিরা। মনে আছে, বিয়ের সময় আমরা মন্ত্র পড়েছিলাম, আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হোক, তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হোক। আজও না-হয় সেই মন্ত্রই পড়ি। তোমার মন আমার মন হোক।'

মন্দিরা স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। মিহিরের দুর্বোধ্য মনের কথা যদি তার মুখ দেখলে কিছু বোঝা যায়।

'তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করছ, না পরীক্ষা করছ?' মন্দিরা ফের জিজ্ঞাসা করল।

মিহির বলল, 'ঠাট্টাও নয়, পরীক্ষাও নয়। একটা সাধারণ ব্যাপারকে তুমি অমন অসাধারণ করে দেখছ কেন! অমন ভয় পাচ্ছ কেন?'

যেন স্ত্রীকে নয়, মিহির নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করছে।

মন্দিরা বলল, 'ভয় আমি পাচ্ছি না।'

মিহির বলল, 'তবে কি আমিই ভয় পাচ্ছি? আমিও ভয় পাচ্ছি না মন্দিরা। বরং যে-ভদ্রলোককে আমি এর আগে দেখিনি, তাঁকে সামনাসামনি দেখব, আলাপ-পরিচয় করব, ভাবতে ভালোই লাগছে।'

মন্দিরা হঠাৎ বলে ফেলল, 'আলাপ করলে তোমার ভালোই লাগবে।'

কথাটা বলে মন্দিরা লজ্জিত হল।

আর তার সেই লজ্জা দেখে মিহিরের মনে ফের ঈর্ষার সূঁচ বিঁধল।

কিন্তু মিহির তাতে ভ্রূক্ষেপ করল না। হেসে বলল, 'আমারও তাই ধারণা। আলাপ করলে ভালো লাগবে। তিনি সদালাপী বলে শুনেছি। তিনি আসুন। আমাদের আলাপ-পরিচয় হোক। আমি কোন লুকোচুরির মধ্যে থাকতে চাই না। লুকোচুরির মধ্যে কাউকে থাকতে দিতেও চাই না।'

মন্দিরা স্বামীর দিকে তাকাল, 'আমি কি এখনো লুকোচুরি করছি বলে তুমি ভাবো?'

মিহির সে কথার জবাব না দিয়ে বলতে লাগল, 'আমি কোন গোপন সম্পর্ক রাখতে চাইনি। এখনকার সমাজে কোন সম্পর্কই স্থায়ী নয়। এমন যে হিন্দু বিবাহ—মৃত্যু ছাড়া যার গ্রন্থিমোচন হতো না, তাতেও দরকার হলে গিঁট খুলে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। শিগগিরই সে বিল পাশ হয়ে যাবে। তখন তুমিও ব্যাপারটা ভেবে দেখতে পারবে, আমিও ব্যাপারটা ভেবে দেখতে পারব।'

মন্দিরা তাড়াতাড়ি স্বামীর হাত চেপে ধরল, 'দোহাই তোমার, ও-সব কথা বোলো না। তুমি বরং ওঁদের টেলিগ্রাম করে নিষেধ করে দাও।'

মিহির অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'আমাকে শেষ করতে দাও মন্দিরা। আমার কোন মোহ নেই। আমি স্মোক করি না, ড্রিঙ্ক করি না; আমি চুলের ছাঁট, পোশাকের ছাঁটের দিকে লক্ষ্য রাখি না বলে তুমি ভেব না আমি আমার বাবার মত রক্ষণশীল, আমি আমার ঠাকুরদাদার মত গোঁড়া বামুন।'

মন্দিরা বলল, 'তুমি অনেক উদার, তা আমি জানি।'

মিহির বলল, 'আমি যদি ভুল করে থাকি, তা স্বীকার করবার মত সাহস আমার আছে। তা শুধরে নেবার মত ক্ষমতাও আমি রাখি। কিন্তু যতক্ষণ আমরা স্বামী-স্ত্রী, ততক্ষণ আমরা শর্ত মেনে চলব। এইটুকু তুমি যদি স্বীকার কর, তাহলে কিছুতে আমাদের ভয় নেই, আপত্তিও নেই। তখন শশাঙ্কবাবুই আসুন আর যিনিই আসুন, কিছুতেই কিছু এসে যায় না। তিনি অতিথি হিসাবে আসবেন। অতিথির মর্যাদা তিনি যদি রাখেন, গৃহী হয়ে আমিও তাঁকে সম্মান করব। তাঁর অমর্যাদা হতে দেব না। তিনি যদি বন্ধু হিসাবে আসেন, আমিও তাঁর সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করব।'

মন্দিরা কাতরভাবে বলল, 'চল, এখন নাইতে যাবে চল।'

মিহির উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। স্ত্রীর বিবর্ণ মুখ দেখে একটু হেসে বলল, 'ভয় নেই, আমার মাথা গরম হয়নি। কথাগুলিই গরম গরম শোনাচ্ছে। একটু আগে আমি যে কী নরকের আগুনে জ্বলে মরছিলাম, তুমি তা জান না।'

মন্দিরা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

মিহির বলল, 'সে কথা পরে বলব। তার আগে বলে নিই, সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে আমি বেরিয়েও এসেছি।'

মন্দিরা বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার অগ্নিকুণ্ডই বা কিসের আর বেরিয়ে আসাই বা কাকে বলছ।'

মিহির সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'আমি ভাবছি Sex-life-এ unfair হয়ে মানুষ কি জীবনের বাকি অংশ fair থাকতে পারে? আমার জ্ঞানবুদ্ধিতে বলে, পারে না। Sex-life তো মানুষের জীবনের বিচ্ছিন্ন একটা অংশ নয়, একটা water-tight compartment নয়। আমি এক কামরায় অসৎ হব, আর-এক কামরায় সৎ থাকব, তা হতে পারে না। সততা অবিভাজ্য। Sex-life যেন Symbol of life; যেন একটা গোটা জীবনের নির্যাস, সারাংশ। তার রেগুলারিটি ইরেগুলারিটি সমস্ত জীবনের ওপর ছাপ ফেলে। মন্দিরা, তুমি আর যাই কর, কোন গোপন সম্পর্কের মধ্যে যেয়ো না।'

মন্দিরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

তারপর মুখ তুলে আস্তে আস্তে বলল, 'এবার, আমার একটা কথা শুনবে?'

'বল।'

মন্দিরা বলল, 'আমার আগের চিঠিখানাই বরং পোস্ট করে দাও, পরে আমাকে দিয়ে যেখানা লিখিয়েছ, সে চিঠি ছিঁড়ে ফেল। আমি ভেবে দেখলাম, তাই ভালো।'

মিহির বলল, 'আবার ওই কথা! এতক্ষণ তাহলে বললাম কি তোমাকে? আচ্ছা বেশ, এসো লটারি করা যাক। এই আমি দুটো আঙুল তুলে ধরলাম। এর এক আঙুলে আগের চিঠি, আর-এক আঙুলে পরের চিঠি। আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি। এবার তুমি ধর, ধর তাড়াতাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে না ধরলে লটারির খেলা জমে নাকি?'

যেন নতুন খেলায় পেয়ে বসেছে মিহিরকে। কোনদিন যে খেলে না, ক্রীড়া-কৌতুকের ধারে-কাছে যায় না, আজ তার একি খেলা শুরু হল?

মন্দিরা বলল, 'আমার হাত কাঁপছে। আমি পারব না।'

মিহির বলল, 'খুব পারবে। চোখ বুজে ধরে ফেল। ছেলেবেলায় আমি আর বিশাখা এই লটারির খেলা যে কত খেলেছি।'

মন্দিরা কম্পিত হাতে স্বামীর তর্জনীটি ধরল।

মিহির যেন একটু থমকে গেল। পরক্ষণেই হেসে বলল, 'তর্জনী-সঙ্কেত কী বলছে জানো?'

'কী বলছে?'

'পরের চিঠিখানাই ভালো। ওইখানিই পোস্ট করতে হবে।'

মন্দিরার লেখা পোস্টকার্ডখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল মিহির। ইনল্যান্ড লেটারের মুখ আটকে দিয়ে নিশিবাবুর নাম ঠিকানা লিখল ইংরেজীতে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাই, ওই তো সামনেই লেটার বক্স।

ফেলে দিয়ে আসি।'

মন্দিরা বলল, 'ওকি, খালি গায়ে যাচ্ছ যে।'

'যেতে যেতে কোঁচার খুঁট গায়ে জড়িয়ে নেব।'

মন্দিরা বলল, 'ছি-ছি-ছি, না না, তা হয় না। জামাটা পরে যাও।'

মন্দিরা তাড়াতাড়ি ভিতরের ঘর থেকে একটা জামা নিয়ে এল।

মুহূর্তের মধ্যে জামাটা গায়ে চড়িয়ে মিহির বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তার মোড়েই লাল রঙের বড় লেটার বক্সটা। গ্রীষ্মের দুপুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে। ধারে-কাছে কোন লোকজন নেই।

লেটার বক্সের রাক্ষুসে হাঁয়ের মধ্যে চিঠি ফেলতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে মিহিরের হাতটাও কেঁপে উঠল। মন্দিরাকে সে সত্যি কথা বলেনি।

চিঠিটা ছেড়ে দেওয়ার পর মিহির মুহূর্তকাল সেই আগুন-ঝরা রোদের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মুখ ফিরিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে নিজের কাণ্ড দেখে সে নিজেই হাসল। লেখা মানে খেলা। আগাগোড়া কৌতুক। তার আবার সত্যি-মিথ্যা কি?

তাছাড়া লটারিতে সে বিশ্বাস করে নাকি? মোটেই না। মিহির এ-সব কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে।

॥ ১৫ ॥

ট্রেনে উঠবার আগের মুহূর্তেও শশাঙ্ক ভাবতে পারেনি, সে সত্যি সত্যিই নিশিবাবুর সঙ্গী হবে। তার অব্যবস্থিত চিত্ত শেষ পর্যন্ত তার মীরপুর যাওয়া বন্ধ করে দেবে, এই যেন তার আশা ছিল। কিন্তু শশাঙ্ক তার নিজের চিত্তের দিকে একটু যদি লক্ষ করে দেখত তা হলে বুঝতে পারত, তার চিত্ত আপন অভিলষিত পথেই যাত্রা করেছে।

তা যে শশাঙ্ক নিজেও না বোঝে তা নয়। আসলে যাওয়ার দিকেই তার ঝোঁক। মন্দিরার সঙ্গে দেখা করবার পথে কোন অন্তরায়কেই এখন আর সে মানতে চায় না। তার আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে সামান্য একটু যুক্তিকেও সে পরম আপন বলে আঁকড়ে ধরতে চায়।

রামেশ্বর মনিবকে তুলে দেওয়ার জন্যে স্টেশন পর্যন্ত এসেছিল। প্রথম শ্রেণীর কামরায় শশাঙ্ক আর নিশিবাবুকে তুলে দিয়ে, তাঁদের হোল্ডঅল আর স্যুটকেস গুছিয়ে রেখে, কর্তাদের পান সিগারেট ডাব লেমনেড কিছু লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করে, গাড়ি ছাড়ার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে তাড়াতাড়ি নেমে গেছে। ভারি ভয় রামেশ্বরের। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাছে তাকে নিয়েই গাড়ি দৌড় দেয়।

গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার পর শশাঙ্কের একবার মনে হয়েছিল সেও নেমে থাকলে পারত। তা হলে সে যা করতে যাচ্ছে, তার চেয়ে কম আকস্মিক আর বিস্ময়কর ব্যাপার হতো না।

রামেশ্বরকে সে বলে এসেছে, মাত্র দু' দিনের জন্যে সে বাইরে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে তা বলেনি। ভাইপো বলাইকে রেখে এসেছে বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্যে।

মেয়েদের কৌতূহলের অন্ত নেই। শশাঙ্ক যে কলকাতার বাইরে যাচ্ছে, বড় বউদি ছোট বউদি দুজনেরই তা কানে গেছে। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে এত অশান্তি বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যেও তাঁরা জিজ্ঞাসা করতে ছাড়েননি, 'কোথায় যাচ্ছ ছোট ঠাকুরপো?'

শশাঙ্ক জবাব দিয়েছে, 'যে দিকে দু চোখ যায়।'

ছোট বউদি ছদ্ম সহানুভূতির সুরে বলেছেন, 'তাই তো, চোখ তো এখন বাইরের দিকেই ছুটবে। শূন্য খাট পালঙ্ক ছাড়া ঘরে আর কীই বা আছে।'

শশাঙ্ক হেসে চুপ করে থেকেছে। কোন জবাব দেয়নি।

ছোট বউদি পরামর্শ দিয়েছেন, 'এক কাজ কর ঠাকুরপো। গায়ে ভস্ম-টস্ম মেখে তুমিও সন্ন্যাসী হও। তাতে যদি সন্ন্যাসিনীর মন মেলে।'

শশাঙ্ক হেসে জবাব দিয়েছে, 'বউদি, গায়ে ভস্ম মাখলে শুধু সন্ন্যাসিনী কেন, অনেক গৃহস্থকন্যাও এসে শিষ্যা হতে চাইবে।'

'বেশ তো, তাদের ভিতর থেকেই একজনকে বেছে-টেছে একেবারে পরম শিষ্যা করে নিয়ে এসো। তোমার মতলবখানা কি বল তো ঠাকুরপো? সত্যিই কি আমাদের জন্যে একজন নতুন জা আনতে যাচ্ছ নাকি? আমরা কি বরণ-ডালা সাজিয়ে বসে থাকব?'

শশাঙ্ক জবাব দিয়েছে, 'সাজাতে আপত্তি কি। সেই সঙ্গে নিজেদের সাজসজ্জার ঘটাও তো কম হবে না।'

উদ্যোগ পর্ব সেখানেই শেষ হয়নি! বেরোবার আগে মুরারিমোহনকেও ফোন করেছে শশাঙ্ক, 'কই মুরারিদা, তুমি তো টাকাটা নিয়ে যাওয়ার আর কোন ব্যবস্থা করলে না? আমি আপাতত অর্ধেক দিতে রাজী আছি। সেই জন্যেই কি তুমি গররাজী?'

মুরারিবাবু ফোনের ওপার থেকে সাড়া দিয়েছেন, 'আরে, না না। আমি একটি ফুটো পয়সা পেলেও কুড়িয়ে নিই। খেঁদি বুঁচিকেও আদর করি। কামিনী-কাঞ্চনে আমার কোন অনাসক্তি যোগ এখনো দেখা দেয়নি।'

শশাঙ্ক বলেছে, 'তা হলে টাকাটা থাক আমার কাছে। ফিরে এসেই তোমাকে দেব।'

'ফিরে এসে মানে? কোথাও বেরোচ্ছ নাকি?'

'সামান্য।'

'বল কি হে? তোমার রকমসকম দেখে মনে হচ্ছিল, তোমার বাড়ি আর কলেজ—মডার্ন চতুষ্পাঠী ছাড়া তুমি আর কারো ত্রিসীমানা মাড়াবে না। তোমার দৌড় ফুরিয়েছে। সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে মাদুলি কবচ ধারণ করে তুমি এখন গৃহসীমানার মধ্যে পোষ-মানা জীবনযাপন করতে চলেছ।'

'ফিরে এসে তাই হয়তো করব। তবে দু' দিনের জন্যে একটু ঘুরতে যাচ্ছি।'

'ভালো, ভালো, তোমার সুমতি হোক। আমি তোমার সঙ্গী হতে পারতাম। কিন্তু সেই লেখালেখির পালা চলছে। পেপার ওয়ার্ক এখনো শেষ হয়নি। কোথায় যাচ্ছ? অভিসারের পথঘাট একটু জানিয়ে গেলে বাধিত হতাম। নিজে তো আর নড়তে-চড়তে পারিনে, হাত-পা বাঁধা। এখন শুধু শুনেই সুখ। ঘ্রাণে অর্ধভোজন, শ্রবণে সিকি।'

শশাঙ্ক প্রগল্ভ বন্ধুকে আস্থার আওতায় আনেনি। মুরারিদার পেটে কথা থাকে না।

হেসে সব অস্বীকার করেছে, 'আরে না মুরারিদা, অভিসার-টভিসার কোথায়। ওসব এখন গত জন্মের স্মৃতি। চলেছি এক বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি আমাকে বৈরাগ্যশতক শোনাতে শোনাতে নিয়ে চলেছেন। বলা যায় না, বদরিকা আশ্রম পর্যন্তও যেতে পারি।'

মুরারিমোহন হেসে বলেছেন, 'বেশ, বেশ। আশা করি সেখানে আশ্রম-বালাদের অভাব হবে না। ফাউ-টাউ দু-একটি থাকলে গরীব বন্ধুর কথা স্মরণ ক'রো।'

শশাঙ্ক জবাব দিয়েছে, 'আচ্ছা দেখব।'

কিন্তু উদ্যোগ পর্বে যে উল্লাস দেখা গিয়েছিল শশাঙ্কের, ট্রেন ছেড়ে দেবার পর আবার তা নিস্তেজ হতে শুরু করেছে। এই এক রোগ হয়েছে শশাঙ্কের। ইদানীং সেই রোগের প্রবলতা বেড়েছে। শশাঙ্ক যেন একটি গাড়ির চাকার সঙ্গে বাঁধা। সে চাকাকে ভাগ্যচক্র বলতে তার এখনো লজ্জা করে। কিন্তু দুর্নিবার, দুর্বোধ্য, দুর্ভেদ্য আপন স্বভাবচক্র বলতে যেন আপত্তি নেই। সেই চাকার এক দিকে উৎসাহ, আর এক দিকে অবসাদ; এক দিকে আসক্তি, আর এক দিকে নিরাসক্তি; এক দিকে নির্ভেজাল ইন্দ্রিয়সুখের আকাঙ্ক্ষা, আর এক দিকে অতীন্দ্রিয়তার সন্ধিৎসা। কিন্তু চাকার গায়ে তো নাম লেখা নেই। ওপর নিচ দেখতে সব একাকার। তাই শশাঙ্ক কখন ঊর্ধ্বে, কখন নিচে, সব সময় টের পায় না। যখন পায়, তখন আর ছাড়া পায় না।

গাড়ির চাকার শব্দের সঙ্গে নিজের নিঃশব্দ ভাবনাকে মিশিয়ে দিয়ে সময়-সমুদ্র সাঁতরে চলেছিল শশাঙ্ক। সে সাঁতার সুখের সাঁতার নয়।

সত্যি কেন নিশিবাবুর কথায় রাজী হল শশাঙ্ক! কেন তাঁর কাছে লেখা একখানি চিঠিতে মন্দিরার হাতের শুধু অক্ষর ক'টি দেখে সে এমন উল্লসিত

হয়ে উঠল? কেন মনে হল নারীর হস্তাক্ষর সে যেন এই প্রথম দেখেছে। হস্তাক্ষরে হাতছানি সে প্রথম দেখতে পেল। সেই চিঠিখানায় শশাঙ্কের নামও ছিল না। শুধু গন্ধ একটু একটু ছিল। কিন্তু তাই কি যথেষ্ট? সেই গন্ধ চিনে চিনে শশাঙ্কের মত একজন পদস্থ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বিনা নিমন্ত্রণে আর এক ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতে পারে? নিজের মানসম্ভ্রম সব লুটিয়ে দিতে পারে? কেন? না, একটি মেয়েকে সে দূর থেকে দেখবে, আর যদি সম্ভব হয় তার সঙ্গে একটি কি দুটি কথা বলবে। কাঙাল, কাঙাল শশাঙ্ক। নারীমূর্তির কাঙাল, নারী-সান্নিধ্যের কাঙাল, নারী-কণ্ঠস্বরের কাঙাল। কিন্তু তাই কি? যে-কোন নারীই যদি এই মুহূর্তে তাকে তৃপ্ত করতে পারত, তা হলে কলকাতা থেকে এক অখ্যাত কলিয়ারীর উদ্দেশ্যে তাকে যাত্রা করতে হতো না। পকেটে নোটের তাড়া নিয়ে সান্ধ্য অভিসারে এই রাজধানীরই অলিতে গলিতে ঢুকে পড়তে পারত। সেখানে ক্ষণসঙ্গিনীর অভাব হতো না। কিন্তু শশাঙ্ক ঠিক তা চায় না। সে বিশেষ একটি পরিচিতার মধ্যে অপরিচয়ের সীমাহীন বিস্ময়কে আবিষ্কার করতে চায়। স্থূল ইন্দ্রিয়-সম্ভোগকে পৃথিবীর সমস্ত কাব্যসঙ্গীত সৌন্দর্য সুষমায় সাজিয়ে না দিতে পারলে যেন তার চলে না। একটি বিশেষ নারীরূপের ভেলায় সে যেন রূপের সমুদ্র পার হয়ে যেতে চায়। তার এই আকাঙ্ক্ষার কথা শুনে মুরারিদা হাসেন, 'শশাঙ্ক, তোমার মনের বয়স আঠার বছরের পরে আর একটি দিনও বাড়েনি। কিন্তু তোমার দেহ কি সে কথা শুনবে? জগৎ কি সে কথায় কান পাতবে?'

হাতের খবরের কাগজখানা ভাঁজ করে রেখে নিশিবাবু শশাঙ্কের দিকে এগিয়ে এলেন, 'কী মশাই, গাড়িতে উঠে অবধি আপনি একেবারে গম্ভীরানন্দ মহারাজ হয়ে বসে আছেন। কিছু জিজ্ঞেস করলে হাঁ-না করে দায়সারা গোছের জবাব দিচ্ছেন। হল কি আপনার?'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'কী আবার হবে? আপনি কাগজ পড়ছিলেন, আর আমি আত্মচরিত পাঠ করছিলাম।'

নিশিবাবু বললেন, 'সে তো আমরা সবাই করি। একটু বয়স হলে আত্ম-চরিত আমরা কে না পড়ে পারি শশাঙ্কবাবু? যাদের পড়বার অভ্যাস আছে, ও বই তাদের অবশ্যপাঠ্য। তবে সব সময় যে আমরা পড়ি তা নয়, পড়বার ভানও করি। টালিগঞ্জে আমি এখন যে বন্ধুর বাড়িতে আছি সেখানেও আমার একটি ছোট ভাগ্নে জুটেছে। তাকে পড়ানো আর তাড়ানোই এখন আমার কাজ। লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশবর্ষাণি চ তাড়য়েৎ। আমাদের ছোটকুর সেই তাড়নার আমল চলছে। ভারি ফাঁকিবাজ ছেলে। সারাদিন বইয়ের ধারে-কাছেও যেতে চায় না। কিন্তু আমাকে দেখলেই জিওমেট্রি কি জিওগ্রাফিখানা খুলে নিয়ে বসে। মানে, যে বিষয়ে ওর সবচেয়ে অরুচি তাতেই গভীর মনোযোগের ভান করে।'

কাগজখানা ফের চোখের সামনে ধরে তাঁর ছাত্রের পড়বার ধরনটুকু দেখিয়ে দিলেন নিশিবাবু।

তাঁর ভঙ্গি দেখে শশাঙ্ক না হেসে পারল না।

নিশিবাবু তাতে খুব স্বস্তি পেলেন। হেসে বললেন, 'যাক, এতক্ষণে আপনার হাসিমুখ দেখলাম। এমন বোবার মত বসে বসে ফার্স্ট ক্লাসে গিয়েও সুখ নেই। ভাবলাম পথে একা আর বোকা সমান। তাই তো আপনাকে টানাটানি করে সেধে ভজে নিয়ে এলাম।'

এ কথা শুনেও সুখ শশাঙ্কের। সে নিজের ইচ্ছায় আসেনি। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের অনুরোধ এড়াতে না পেরে এসেছে। এই মিথ্যা ছলটুকুও যেন কত মধুর। তার এই ছদ্মবেশই যেন পরম সত্যবেশ।

নিশিবাবু বললেন, 'না-হয় অল্পদিনের আলাপে জোর-জবরদস্তিই চালিয়েছি আপনার উপর। তাই বলে কি সারাটা পথ আপনি আমার ওপর রাগ করতে করতে যাবেন?'

শশাঙ্ক একটু হেসে বলল, 'আপনার ওপর কেন রাগ করব নিশিবাবু?'

'ও, আমার ওপর রাগ করেননি? তা হলে রাগটা কার ওপর করেছেন শশাঙ্কবাবু? আপনার ছাত্রীর ওপর?'

নিশিবাবু হাসলেন।

শশাঙ্ক গম্ভীরভাবে বলল, 'মন্দিরা যে আমার ছাত্রী ছিল তা আপনি জানেন?'

নিশিবাবু হেসে বললেন, 'একটু একটু জানি। মন্দিরা আমাকে বলেছে।'

শশাঙ্ক মনে মনে হাসল। মন্দিরা নিশ্চয়ই বেশি কিছু বলেনি। বললে আজ নিশিবাবু তাকে সঙ্গে নিতেন না।

বর্ধমানে এসে নিশিবাবু নেমে পড়লেন। হেসে বললেন, 'বসুন, কিছু মিষ্টি কিনে নিয়ে আসি মন্দিরার জন্যে। একেবারে খালি হাতে গেলে লোকে ভাববে কি।'

শশাঙ্ককে তখন বলতে হল, 'টাকা নিয়ে যান।'

নিশিবাবু বললেন, 'টাকা আমার কাছে আছে। ভাড়ার টাকা তো লাগল না। টিকিট তো আপনিই কাটলেন। তাও একেবারে ফার্স্ট ক্লাসের। একেই বলে ভাগ্য। একা যদি যেতাম, থার্ড ক্লাসে ঠেলাঠেলি করে যেতে হতো। কিন্তু আপনার সঙ্গে কী আরামেই না যাচ্ছি! বন্ধুদের পয়সায় এমন বেড়ানো আমার মাঝে মাঝে হয়ে যায়। অনেক সময় দূরের পাল্লার সঙ্গ জোটে। নির্লজ্জের মত পরের পয়সায় ভূ-ভারত ঘুরে বেড়াই। কী করব মশাই, তাঁরা নাছোড়বান্দা। না দিয়ে কিছুতেই ছাড়েন না। শেষ পর্যন্ত আমিও হাত পেতে নিই। নিতে নিতে ভাবি, আমি তাঁদের কীই-বা দিতে পারি। আমার নেওয়াটাই যেন দেওয়া। বসুন আপনি। আমি এলাম বলে।'

খানিক বাদে মিষ্টির হাঁড়ি হাতে তিনি ফের কামরার মধ্যে উঠে এলেন। সোৎসাহে বললেন, 'এক সের করে মিহিদানা আর সীতাভোগ নিয়ে এলাম শশাঙ্কবাবু। স্টেশনের ফিরিওয়ালাদের কাছ থেকে কিনিনি। ওরা অনেক সময় বাসী জিনিস দেয়। চেনা দোকানদার আছে। তার কাছ থেকে কিনেছি। সে আমাকে কোনদিন ঠকায় না। চিনে নিতে পারলে খাঁটি মানুষ, খাঁটি জিনিস এখনো পাওয়া যায় মশাই।'

উর্দিপরা খানসামা ট্রেতে করে চা আর খাবার নিয়ে এল। শশাঙ্কের তেমন রুচি ছিল না। নিশিবাবুর জন্যে নিতে হল। খেতে খেতে আর গল্প করতে করতে নিশিবাবু স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে এলেন।

শশাঙ্ক নিজেকে ভুলতে চায়। নিশিবাবুর মধ্যে একজন সদাশয় সরল সজ্জন ভদ্রলোকের স্পর্শ পায় শশাঙ্ক। তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর উপলব্ধির সঙ্গে শশাঙ্কের কোন মিল নেই। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে এক কামরায় একসঙ্গে যেতে এমন কি অসুবিধা?

শশাঙ্ক হঠাৎ বলল, 'আপনি যে গান শোনাতে চেয়েছিলেন। শোনান না এবার।'

বর্ধমান থেকে আরো দুজন ভদ্রলোক এই কামরায় তাঁদের সহযাত্রী হয়েছেন।

নিশিবাবু ইঙ্গিতে তাঁদের দেখিয়ে দিয়ে লজ্জিতভাবে বললেন, 'ওঁরা কি ভাববেন। আচ্ছা, আপনাকে কথা দিচ্ছি, শোনাব। নিশ্চয়ই শোনাব একদিন। আচ্ছা মীরপুরে গিয়েই না-হয় শোনাব। আর কারো সামনে নয়। আমরা দুজন একসঙ্গে যখন বেড়াতে বেরোব তখন।'

রানীগঞ্জ, রানীগঞ্জের পর কালীপাহাড়। কালীপাহাড়ের পর আসানসোল।

নিশিবাবু একসময় বললেন, 'এই যে মশাই, আমরা এসে গেছি। জার্নিটা মন্দ হল না, কী বলেন? ভাগ্য ভালো থাকলে এই রকমই হয়। থার্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জার ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে আসে। এখন মিহির বাবাজীবনরা স্টেশনে কেউ এলে হয়। আমি অবশ্য আগে থেকেই খুঁটিনাটি সব জানিয়ে দিয়েছি। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আসবে। না এলেও অকূল পাথারে পড়ব বলে ভাববেন না। পথ জিজ্ঞেস করতে করতে দিল্লি যাওয়া যায়, আর মীরপুর যেতে পারব না? বিশেষ করে আপনার মত বন্ধু যখন আছেন, গাড়ি-ঘোড়া কিছুরই আর অভাব হবে না।'

প্লাটফর্মে নেমে নিশিবাবু এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। তাঁর সন্ধানের ভঙ্গি দেখে শশাঙ্কের মনে হল, কেউ তাদের নিতে আসেনি। বিনা নিমন্ত্রণে কি সামান্য নিমন্ত্রণে সে যেমন এসেছে, তেমনি বিনা অভ্যর্থনায় তাকে এগিয়ে যেতে হবে। মনে মনে একটু ক্ষুন্ন হল শশাঙ্ক। সে কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি, কোন সামাজিক কি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেনি,

এই মুহূর্তে সে কথা যেন সে ভুলে গেল। নিজেরই একটি গোপন অভিলাষ পূরণের জন্য একটি অর্ধ-গোপন অভিসারের পথে সে যে পা টিপে টিপে এগোচ্ছে, এই মুহূর্তে সে কথা তার মনে পড়ল না। শশাঙ্কের ইচ্ছা, তার নিগূঢ় উদ্দেশ্য তার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাক। বাইরের কেউ যেন তা টের না পায়। কেউ যেন তার প্রাপ্য সম্মান দিতে কার্পণ্য না করে।

আবার পরমুহূর্তে এ কথাও মনে হল, কেউ যে আসেনি, এক হিসাবে ভালোই হয়েছে। শশাঙ্ক যে এসেছিল, নিশিবাবু ছাড়া আর কেউ তার সাক্ষী থাকবে না। সে অলক্ষিতে এসে অলক্ষিতেই চলে যেতে পারবে। আসানসোলে তার উকিল বন্ধু আছে সুরেশ সরকার। তাকে অবশ্য আসবার কথা শশাঙ্ক জানায়নি। তা হলে সে স্টেশনে থাকত। কিন্তু না জানিয়েই তার বাড়িতে গিয়ে উঠতে বাধা নেই শশাঙ্কের। বন্ধুর অতিথি হলে তার আত্মসম্মান এমনভাবে নষ্ট হবে না। মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবার সম্ভাবনায় যেন খুশিই হয়ে উঠল শশাঙ্ক।

নিশিবাবু কুলিকে মালপত্র বুঝিয়ে দিয়ে শশাঙ্কের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার চিঠি বোধ হয় ওরা পায়নি। পেলে না আসবার লোক তো ওরা নয়। অন্তত কাউকে না কাউকে পাঠিয়ে দিত। হয়তো প্লাটফর্মের বাইরে অপেক্ষা করছে। চলুন এগোন যাক।'

নিশিবাবু মিষ্টির হাঁড়িটা নিজের হাতে তুলে নিলেন।

কিন্তু দু-এক পা এগোতে না এগোতেই দুটি যুবক তাঁদের দিকে এগিয়ে এল। একজন কালো রোগা লম্বা চেহারার। আর একজন তার চেয়ে বেঁটে, কিন্তু ফর্সা আর সুদর্শন। অপেক্ষাকৃত কমবয়সী, কিন্তু বেশি চতুর।

সে-ই প্রথমে নিশিবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল। একটু হেসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনিই কি নিশিবাবু, কলকাতা থেকে এসেছেন? মীরপুর যাবেন?'

নিশিবাবু আশ্বস্ত হয়ে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি বুঝি মিহির?'

যুবকটি হেসে বলল, 'না, না। আমার নাম প্রবীর বসু। মিহিরদা আমার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আর আপনার পিছনে বোধ হয় শশাঙ্কবাবু।'

নিশিবাবু হেসে বললেন, 'ঠিকই ধরেছ। আমি তোমাকে মিহির বলে ভুল করতে পারি। কিন্তু আমাকে কেউ শশাঙ্কবাবু বলে ভুল করবে না।'

নিশিবাবু শশাঙ্কের সঙ্গে মিহিরের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শশাঙ্ক বৃদ্ধের বাচালতায় অপ্রসন্ন হল। কে প্রৌঢ়, কে যুবক, এ কথা তাঁকে কে বলতে বলেছে? নিশিবাবু কি সারাটা পথ এমনি ঠিকুজী কোষ্ঠী আউড়ে আউড়ে চলবেন নাকি?

তাঁর দিকে তাকিয়ে সে একটু হেসে বলল, 'নিশিবাবু, আপনি আমার জিনিসগুলি আলাদা করে দিন। আমি সুরেশের ওখানে চলে যাই।'

মিহির বলল, 'সুরেশ কে?'

শশাঙ্ক বলল, 'আমার বন্ধু। এখানকার উকিল। কোর্টের কাছাকাছিই থাকে।'

মিহির শশাঙ্কের দিকে একটু তাকাল। তারপর মৃদু হেসে মৃদুস্বরে বলল, 'বেশ তো, পুরোন বন্ধুর বাড়িতে পরে যাবেন। নতুন বন্ধুর বাড়িতে আগে চলুন।'

কুলিকে সঙ্গে যেতে ইশারা করে মুখ ফিরিয়ে মিহির গেটের দিকে এগিয়ে চলল।

নিশিবাবু শশাঙ্কর পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'আরে মশাই চলুন চলুন। এসেছেন যখন দেখেই যান। আমরা দুই নাছোড়বান্দার হাতে পড়েছি। ওরা আমাদের না নিয়ে ছাড়বে না। উকিল ডাক্তার পরে করবেন। আগে চলুন ইঞ্জিনীয়ারের আস্তানা দেখে আসি। সবাই বলে যুগটা নাকি এখন এদেরই।'

স্টেশনের বাইরে কোম্পানীর গাড়ি অপেক্ষা করছে। নিশিবাবুরই গরজ বেশি। তিনি সবচেয়ে আগে গাড়িতে উঠে বসলেন। প্রবীর গিয়ে বসল ড্রাইভারের পাশে।

উঠবার আগে শশাঙ্ক আর-একবার দ্বিধা প্রকাশ করল, আর-একবার আপত্তি জানিয়ে বলল, 'নিশিবাবুর সঙ্গে আমার চুক্তি ছিল, আসানসোল পর্যন্ত আমি ওঁর সঙ্গী হব। তিনি নিজে চুক্তি ভঙ্গ করছেন। আর আপনাদের সেই বেআইনী কাজে টেনে আনছেন।'

মিহিরও একটু হেসে বলল, 'আপনার উকিল বন্ধু যত পুরোন বন্ধুই হন, আজ তাঁর চেয়ে আপনার ওপর আমাদের দাবি বেশি। আমরা আগে এসে পৌঁছেছি। আর তিনি এখনো পৌঁছতেই পারেননি।'

শশাঙ্ক মিহিরের দিকে তাকাল। নামটা সূর্যের হলেও সূর্যের সঙ্গে কোন সাদৃশ্যই নেই মিহিরের। চেহারার মধ্যে কোন ঔজ্জ্বল্য নেই, দীপ্তি নেই। যৌবনলাবণ্যের অভাব বিশেষভাবেই চোখে পড়ে। মুখখানা কেমন যেন ভোঁতা ভোঁতা। ঘষা আয়নার মত। বুদ্ধিদীপ্ত মনের কোন প্রতিচ্ছবি তাতে ধরা পড়ে না। চোখ দুটিও নিষ্প্রভ। সরল, শান্ত গোবেচারা গোছের মুখ। নিতান্ত নিরীহ মানুষের চোখ। দেখলে কেমন যেন মায়া হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয় না।

শশাঙ্ক গাড়িতে উঠে বসল। পিছনের সীটে তারা তিনজন। ওপাশে নিশিবাবু, মাঝখানে মিহির, এপাশে শশাঙ্ক। মিহিরের সঙ্গে তার প্রায় গায়ে গায়ে ছোঁয়া লাগছে। শশাঙ্ক মনে মনে হাসল। তার প্রতিদ্বন্দ্বী!

কিন্তু এ এক অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুখ নেই। গৌরব তো নেই-ই। মিহির যদি সূর্য হয়, [illegible] সূর্য। ওর যৌবন আছে, কিন্তু যৌবনের শৌর্য বীর্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, রূপলাবণ্য নেই। মিহির

কোন্ গুণপনার অধিকারী, শশাঙ্ক এখনো তার পরিচয় পায়নি। যতটুকু আলাপ হয়েছে, স্বাভাবিক সৌজন্য, ভদ্রতা আর বিনয় ওর আছে। আর সারল্য। অবশ্য মানুষের সারল্য সম্বন্ধে এখন আর নিঃসংশয় হতে পারে না শশাঙ্ক। প্রথম আলাপে নিশিবাবুকে যত সরল মনে হয়েছিল, তিনি কি তত সরল? জীবন সম্বন্ধে—আরো সীমিত অর্থে যৌন জীবন সম্বন্ধে অতই অনভিজ্ঞ? শশাঙ্ক জানে, তিনি তা নন। দৈহিক অভিজ্ঞতা কি আছে না আছে, নিশিবাবু তা বলেননি। কিন্তু বিচিত্র মানসিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তিনি যে পথ অতিক্রম করেছেন, তা মসৃণও নয়, সরল সুগমও নয়, সে-কথা শশাঙ্ক অনুমান করতে পারে। আর মানসিক অভিজ্ঞতাই মানুষের আসল অভিজ্ঞতা। মুরারিদা অবশ্য এ কথা স্বীকার করেন না। কিন্তু মনকে আর একটি সূক্ষ্ম শরীর বলে ধরে নিলে আর আপত্তির কোন কারণ থাকে না। মনও ইন্দ্রিয়। অতীন্দ্রিয় কোন বস্তু নয়। সবচেয়ে ধারণক্ষম উপভোগক্ষম শক্তিশালী ইন্দ্রিয়। এই মন সহজবোধ্য নয়। এমন কি, আপাত সরল মানুষের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও জটিল আর দুর্জ্ঞেয় হতে পারে। শশাঙ্কর বন্ধু সুরেশ যে শশাঙ্ককে কেন নিতে আসেনি, তা কি মিহির অনুমান করতে পেরেছে? আর তা অনুমান করেই সে বলল, সুরেশের চেয়ে তার দাবি শশাঙ্কের ওপর অনেক বেশি? এ কি সারল্য? না প্রচ্ছন্ন শ্লেষ? তীক্ষ্ণাগ্র ব্যঙ্গ? সুরেশকে আগে থেকেই খবর দিয়ে না রেখে শশাঙ্ক নির্বোধের কাজ করেছে। মিহিরের অতিথি হয়ে তার আঁওতার মধ্যে কেন পড়তে যাচ্ছে? শশাঙ্ক কি ইচ্ছা করে ফাঁদে পা দিচ্ছে না? মন্দিরার সঙ্গে শশাঙ্কের সম্পর্কের কথা মিহির কি একেবারেই কিছু জানে না? যদি জানে, তবে তাকে এমন করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে কেন? কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে ওর মনে? অবশ্য এর মধ্যে কোন জটিল মারাত্মক ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা হাস্যকর। কোন গুরুতর কিছু নিশ্চয়ই ঘটবে না। নিজের আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে আর-একজনকে জব্দ করবার মত মানুষ মিহির নয়। তবু থেকে থেকে কিসের একটা অস্বস্তি শশাঙ্কের মনকে আচ্ছন্ন করতে লাগল।

মিহির নিশিবাবুর সঙ্গে ততক্ষণে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। হয়তো শশাঙ্ককে অন্যমনস্ক দেখেই। দ্বিতীয় সঙ্গীর দিকে ঝুঁকেছে মিহির।

বাঁধানো রাস্তা দিয়ে গাড়িখানা শহর ছাড়িয়ে কলিয়ারীর দিকে এগিয়ে চলেছে। শুক্লপক্ষের রাত। জ্যোৎস্নায় প্রায় দিনের আলোর মতই সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

নিশিবাবু এক সময় বললেন, 'জমিগুলি এমন উঁচু-নিচু কেন মিহির? মনে হচ্ছে যেন বাংলা দেশের বাইরে কোন পাহাড়ী এলাকা দিয়ে চলেছি।'

মিহির বলল, 'কয়লা তুলে নেওয়ার জায়গাগুলি বসে গেছে। এর আগে

াপনি বোধ হয় এ-সব কলিয়ারী এলাকায় আসেননি নিশিবাবু।'

'না। এই প্রথম এলাম। অবশ্য জীবনে ঘোরাঘুরি কম করিনি। জীবনে দেখেছিও কম নয়। তবু না-দেখা জিনিসের কি অন্ত আছে।'

নিশিবাবু একটু চুপ করে রইলেন, তারপর হঠাৎ বললেন, 'তোমাকে একটা থা বলি মিহির, কিছু মনে করো না।'

'বলুন।'

'তোমার মুখে বার বার নিশিবাবু নিশিবাবু শুনতে নিজের কানেই কেমন লাগে। মন্দিরা আর তার বোনেরা আমাকে মামাবাবু বলে ডাকে। সেই সুবাদে আমিও তোমার মামাবাবুই হই বাবা।'

মিহির এক মুহূর্ত চুপ করে রইল, তারপর খানিকটা লজ্জিত হয়ে বলল, আমাকে মাফ করবেন মামাবাবু। আমার খেয়াল ছিল না।'

তারপর হঠাৎ সে শশাঙ্কের দিকে ফিরে তাকাল, 'আপনাকে কী বলে ডাকব, বলুন তো? মন্দিরা আপনাকে কী বলে ডাকত, আমি জানিনে।'

শশাঙ্ক চট করে জবাব দিতে পারল না। তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। এ-ও কি মিহিরের সারল্য? না সরলতার ভান? সারল্যের আড়াল থেকে বিদ্রূপ-বর্ষণ? সরল মানুষ অনেক সময় আর কিছু না পেয়ে নিজের সারল্যকেই মারাত্মক অস্ত্র করে তোলে। মিহিরও কি তার সেই অস্ত্রে শান দিচ্ছে?

জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি হল শশাঙ্কের। আর নিশিবাবু সেই সুযোগ নিয়ে বসলেন। শশাঙ্কের অমনঃপূত এক বিশ্রী কাণ্ড করে ফেললেন।

নিশিবাবু একটু হেসে বললেন, 'ঠিক বলেছ মিহির। সম্বোধনের ব্যাপারটা এখান থেকেই ঠিক করে নেওয়া দরকার। তুমি শশাঙ্কবাবুকে শশাঙ্কদা বলেই ডেকো। মিঃ সেন, কি প্রফেসর সেন, কি শশাঙ্কবাবুর চেয়ে তা ঢের ভালো শোনাবে।'

শশাঙ্ক আপত্তি করে বলল, 'না, না, আমাকে কিছু বলে ডাকতে হবে না।'

নিশিবাবু যেন বেশ একটা কৌতুকের ব্যাপার পেয়ে গেছেন। আগের মতই তরল চটুল স্বরে বললেন, 'হবে না কেন শুনি। মিহিরের সঙ্গে এখন তো আমাদের আত্মীয়তা-কুটুম্বিতার সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক ধরে ডাকাই ভালো। মুখের ডাককে শুধু মুখের ডাকই বলে মনে করো না মিহির। অনেক সময় এই ডাকাডাকির ভিতর দিয়ে মানুষ মানুষের কাছে আসে। পরও আপন হয়। ছেলেবেলাটা আমার গ্রামে কেটেছে। সেখানে পাড়া-পড়শীদের কাউকে আমরা দাদা বলে ডাকতাম, কাউকে জেঠা, কাউকে কাকা। মুসলমান হলে চাচা বলতাম। সারাটা গ্রাম আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা থাকত। এখন আর সে-সব নেই।'

শশাঙ্ক বৃদ্ধের স্মৃতিচারণে বাধা দিল না। শুধু আত্মীয় সম্বোধনেই মানুষ আত্মীয় হয় না, তা সে জানে। গ্রামে-বাসে এত তো দাদা-দাদুর ছড়া-ছড়ি, কিন্তু তাতে ভ্রাতৃত্ব বোধ ক'জনের মনে জাগে?

নিশিবাবু বলে চলেছেন, 'রক্তের সম্পর্কে যারা আমার আপন ছিল তারা কে কোথায় সরে গেছে তাদের আর খোঁজও পাইনে। কিন্তু পাতানো সম্পর্ক-গুলি শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছি। বাকি ক'টা দিন এইভাবে কাটিয়ে যেতে পারলে আর কিছু চাইনে।'

নিশিবাবুর একটানা উপদেশ বর্ষণে শশাঙ্ক ক্লান্ত হয়ে উঠছিল। তিনি কি তাকে শোধরাবার গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন?

'ভালো কথা, মন্দিরা কেমন আছে?' নিশিবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন।

শশাঙ্ক সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ণ হল।

মিহির বলল, 'ভালোই আছে। অপেক্ষা করে আছে আপনাদের জন্য।'

নিশিবাবু বললেন, 'তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেই পারতে।'

মিহির একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সবাই মিলে এলে কি চলে?'

নিশিবাবু বললেন, 'তা বটে। আজকাল তো মন্দিরা আবার মহা গিন্নী।'

বৃদ্ধের সারল্য কি শিশুর সারল্যের মত? নাকি সব সারল্যের মধ্যেই কিছু না কিছু ভান আছে? আছে অতিরঞ্জন আর অতিশয়োক্তি? শশাঙ্ক ভাবল কিন্তু নিশিবাবু কি শশাঙ্কেরই মনের কথা বলেননি? সত্যি, মন্দিরাকে স্টেশনে দেখতে পেলে শশাঙ্ক হয়তো মীরপুর পর্যন্ত আর যেত না। শুধু দেখার জন্যেই তো যাওয়া। এখন পাওয়া মানে শুধু দেখা পাওয়া। কী হবে দেখে? কী হবে পেয়ে? এ প্রশ্নের যদি জবাব দিতে পারত শশাঙ্ক তাহলে এমন অসম্মান অপমানের ঝুঁকি নিয়ে এভাবে এত দূরে ছুটে আসত না। শশাঙ্ক একজনকে দেখতে যাচ্ছে আর নিজেকে দেখতে দেখতে যাচ্ছে। অবাক কাণ্ড। সেখানে কী এমন দেখবে? একটি মেয়ের দৈহিক গড়নের মধ্যে কী এমন অপার্থিব বস্তু পাবে শশাঙ্ক? সেই দেহরূপ তার অ-দৃষ্ট, অস্পৃষ্ট অনাঘ্রাত, অনাস্বাদিত, তা তো নয়। তবু মনে হচ্ছে শশাঙ্ক যেন সত্যিই অভিনব কিছু প্রাপ্তির আশায় এগিয়ে চলেছে। সে যে এমন করে যেতে পারছে এই পারাটাই যেন যৌবন। এই কাণ্ডজ্ঞানহীন অপরিণামদর্শিতা, এই নির্বিচারে বিনা বিবেচনায় ঝাঁপিয়ে পড়া আর উদ্দীপ্ত বাসনার দীপ্ত যৌবন যেন অভিন্ন। আসলে শশাঙ্ক হয়তো কাউকে চায় না, নিজের প্যাশনের মধ্যে নিজেকে পেতে চায়। সেই বিচ্ছুরিত বাসনাবহ্নির মধ্যে নিজের জ্বলন্ত প্রোজ্জ্বল মূর্তিকে দেখতে চায়। শশাঙ্ক জানে এরই নাম মত্ততা। মাদকদ্রব্যে লোক যেমন মত্ত

হয় এও তেমনি। অবয়বের একটি বিশেষ গড়ন, তার দৃশ্যরূপ কণ্ঠস্বর কি স্পর্শানুভূতির মত্ততা! এ ছাড়া আর কি। তবু মনে হয় আরো কিছু আছে। অন্তত এক ফোঁটা অলৌকিক রহস্য ধরা রয়েছে ওই দেহাধারের মধ্যে। সমস্ত চুলচেরা বিশ্লেষণকে যা এড়িয়ে যায়। কিংবা এমনও হতে পারে সে রহস্য শশাঙ্কের মনেরই সৃষ্টি। কিন্তু সেই সৃষ্টি বিনা অবলম্বনে সম্ভব নয়। সেই স্বপ্নলোকে কল্পলোকে প্রয়াণের জন্য একটি বাহ্য দেহরূপের দরকার। রূপলোকের সেই চাবি একটি দেহরূপিণীর কাছে।

মুরারিদা অবশ্য এসব হেসে উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, 'শশাঙ্ক, তুমি সুখকে আমসত্ত্ব করে খেতে ভালোবাসো। দেহজ-সুখকে কখনো কাব্যের, কখনো তত্ত্বের মোড়কে মুড়ে না নিলে তোমার চলে না। ভোগসম্ভোগের জন্য আমার মদের দরকার হয়, তোমার কাব্যের। তোমার আর আমার মধ্যে শুধু এইটুকুই তফাত। সাদা চোখে ওদের দেখে কেউ আমরা মুগ্ধ হইনে। আমিও না তুমিও না। তাই আমি মদ টেনে টেনে চোখ লাল করি, আর তুমি কবিতা আউড়ে আউড়ে চোখে কাজল পরো। ফলে ওদের সত্যিকারের রূপ আমরা কেউ দেখতে পাইনে, কি দেখতে চাইনে। আমাদের রূপবোধের সঙ্গে সেই রূপ মেলে না। সে রূপের মধ্যে সঙ্গতি নেই সামঞ্জস্য নেই সুষমা নেই। তা চির বৈপরীত্যে চির self-contradiction-এ ভরা।'

শশাঙ্ক তা জানে। সামঞ্জস্য আছে শুধু শিল্পীর সৃষ্টিতে। ভাস্করের হাতের ধাতুমূর্তিতে, পটে আঁকা ছবিতে, ছন্দে গাঁথা লাবণ্য প্রতিমায়। আর কোথাও তার অস্তিত্ব নেই। তবু শুধু শিল্পীর সৃষ্টিতে মন ভরে না, জীবন ভরে না। বার বার রক্তমাংসের জান্তব সৃষ্টি তাকে আকর্ষণ করে। সমস্ত স্থূলতা রূঢ়তা অসঙ্গতি সত্ত্বেও শশাঙ্ক তাতে মুগ্ধ হয়। কত অশোভন অসংগত অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটে। সেই ঘটনার ওপর শশাঙ্কের আর কোন হাত থাকে না।

মুরারিদা বলেন, 'শশাঙ্ক, এই জৈব ব্যাপার জীবজন্তুর মতই মিটিয়ে দাও। এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ো না। মাথা ঘামাবার মত সংসারে অনেক বড় বড় ব্যাপার আছে। তুমি আজকাল সরাসরি ভোগের চেয়ে ভোগের কথা ভাবতে ভালোবাসো। আর তাকেই তুমি বল শুচিতা আর সুরুচি। আমার কাছে এর চেয়ে অরুচিকর আর কিছুই নেই। ভোগের চেয়ে ভোগের জল্পনা-কল্পনায় তুমি বেশি মত্ত। আস্ত একটি মেয়েমানুষের চেয়ে তুমি যেন তার শুধু চোখের চাওয়া, মুখের হাসি, নখের আগা, চুলের ডগা, আঁচলের ছোঁয়া পেলেই খুশী। দিনের পর দিন তুমি ফেটিশ হয়ে যাচ্ছ। এরপর কবে শুনব মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগ কি চুলের কাঁটা বুকে করে পড়ে আছ।'

মুরারিদা অবশ্য মূর্তিমান অতিরঞ্জন। চলনে বলনে সব ব্যাপারেই বাড়া-

বাড়ি করতে ভালোবাসেন।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি শশাঙ্ক ফেটিশ হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যক্ষ সম্ভোগের ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে সে শুধু একটু ছোঁয়া, একটু হাসি, একটু স্বর, একটু সুরে তৃপ্ত থাকতে চাইছে? তাই কি? তা যে নয় শশাঙ্ক তা জানে। যেখানে পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব সেখানে সে পুরোপুরিই পেতে চায়। যেখানে তা সম্ভব নয়, সেখানে অংশের মধ্যে পূর্ণতার স্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। এ যদি দোষ হয়, বিকৃতি হয়, এ বিকৃতি কারই বা নেই? শশাঙ্ক ভাবে, 'যাকে আমি পূর্ণ বলছি তাই যে পূর্ণ একথা কে বললে? কোন কোন সময় পুরো দেহটাও এক টুকরো অংশমাত্র, ভগ্নাংশ। সে প্রাপ্তিও প্রতীকী প্রাপ্তি। ক্ষণে প্রাপ্তি ক্ষণে অপ্রাপ্তি, ক্ষণে তৃপ্তি ক্ষণে অতৃপ্তি। আবার উল্টোটাও ঘটে। বাসনার তীব্রতা অংশকে পূর্ণতা দেয়। অংশ তখন আর অংশ থাকে না। সমগ্র হয়ে ওঠে। অন্তত সমগ্রতার ইশারা তার মধ্যে থাকে। ভোগের উপকরণ যেমন এক নয়, তার প্রকরণও তেমনি বিভিন্ন। শুধু একটি প্রকরণে চিরতৃপ্ত এমন কে আছে শশাঙ্ক জানে না।

'শশাঙ্কবাবু, এই আমার কোয়ার্টার। আমরা এসে গেছি। এখানে নামতে হবে।'

মিহিরের গলা শুনে শশাঙ্ক একটু চমকে উঠল। এতক্ষণ মিহির নিশিবাবুকে কোল ইণ্ডাস্ট্রির নানা তথ্য শোনাচ্ছিল। কত হাজার টন কয়লা এই খাদ থেকে ওঠে, কত কুলি খাটে, ক'টা শিফটে কাজ হয়—নিশিবাবুর কৌতূহলের অন্ত নেই। এই বয়সেও তার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল।

আত্মচিন্তার সমুদ্রতল থেকে শশাঙ্ক মাঝে মাঝে মাথা তুলছিল, কান পাতছিল ওদের আলোচনায়, কিন্তু কিছুতেই ঠিক যোগ দিতে পারছিল না। শশাঙ্ককে অন্যমনস্ক দেখে নিশিবাবুরাও তাকে আলাপে অংশ নিতে ডাকেননি।

এক সময় মিহির বলল, 'শশাঙ্কবাবু, আমরা এসে গেছি।'

গাড়ি থেকে নেমেই উদাত্ত কণ্ঠে নিশিবাবু ডাকতে শুরু করলেন, 'মন্দিরা! মন্দিরা!'

আর দূরবর্তিনী কাছে আসতে আসতে মধুর কণ্ঠে সাড়া দিয়েছে, 'যাই মামাবাবু।'

॥ ১৬ ॥

চাকরের সাহায্যে প্রবীর আর মিহির গাড়ি থেকে মালপত্র নামিয়ে নিল। নিশিবাবুর পিছনে পিছনে এগিয়ে গেল শশাঙ্ক।

মন্দিরা শশাঙ্কের চোখ এড়িয়ে নিশিবাবুর দিকে চেয়ে বলল, 'আসুন।'

সামনেই বসবার ঘর। নিশিবাবু তার ভিতরে ঢুকবার আগে মিষ্টির হাঁড়িটি মন্দিরার হাতে দিলেন।

মন্দিরা বলল, 'এসব আবার কেন আনলেন মামাবাবু।'

নিশিবাবু হেসে বললেন, 'কেন আনলাম? উদ্দেশ্যটা বড় জটিল। তুই খাবি, মিহির খাবে। আর অতিথি বলে আমাদের পাতেও কি অল্পস্বল্প না দিয়ে পারবি?'

নিশিবাবু সস্নেহে মন্দিরার পিঠে হাত রাখলেন, 'কেমন আছিস? একটু যেন রোগা হয়ে গেছিস!'

'কই রোগা হয়েছি মামাবাবু?' মন্দিরা মিষ্টির হাঁড়িটি নামিয়ে রেখে নিশিবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

নিশিবাবু বললেন, 'থাক থাক। সতীলক্ষ্মী হও। চিরায়ুষ্মতী হও। আমার মায়ের মত হও। তুই হয়তো ভাবছিস, বুড়ো মামাবাবুর মা হতে আমার বয়ে গেছে। তা নয় রে। আমার মা যে-সে মেয়ে ছিলেন না। লেখাপড়া বেশি জানতেন না, কিন্তু আর সব গুণই ছিল। সারা গাঁয়ের মানুষ তাঁর সুখ্যাতি করত। রূপও ছিল। বেশ সুন্দর ছিলেন দেখতে। আমিই সেই সুন্দরের কোলে বান্দর হয়ে জন্মেছি।'

মন্দিরা হেসে বলল, 'আপনার বুঝি সে জন্যে খুব দুঃখ মামাবাবু?'

আর সঙ্গে সঙ্গে সে শশাঙ্কের দিকে তাকাল। রূপের অভাবের দুঃখ যাকে ভোগ করতে হয়নি তাকে প্রসন্ন হাসি আর মুগ্ধ চোখ দিয়ে মন্দিরা যেন অভিনন্দন জানাল।

শশাঙ্ক লক্ষ্য করল, মন্দিরা তার দিকে এই প্রথম তাকিয়েছে। এতক্ষণ দৃষ্টি এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিল। অতিথিকে এই তার প্রথম স্বীকৃতি আর অভ্যর্থনা।

নিশিবাবু বললেন, 'দুঃখ বইকি। সেই দুঃখেই তো বিয়ে-থা করলাম না রে। বিয়ে করলে তোর মামীমা ভালোও বাসত না, দু' চোখে দেখতেও পারত না।'

মন্দিরা মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল, 'তাই বুঝি ভাবেন আপনি?'

মিহির আর প্রবীর এসে ঘরে ঢুকল।

মিহির বলল, 'ও'দের সুটকেস আর বেডিং ভিতরের ঘরে নিয়েই রাখা যাক, কী বলো?'

স্ত্রীর দিকে তাকাল মিহির।

মন্দিরা বলল, 'বেশ তো।'

দু' হাতে দুটো স্যুটকেস নিয়ে মিহির ভিতরে যাচ্ছে, শশাঙ্ক বাধা দিয়ে বলল, 'ওকি, আপনি কেন টানাটানি করছেন? লোকজন তো আছে।'

প্রবীর বলল, 'মিহিরদা, আমাকে দিন না।'

কিন্তু মিহির শশাঙ্কের স্যুটকেসটা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'রেখে দাও।'

মন্দিরার মুখখানা যে আরক্ত হয়ে উঠল শশাঙ্কের তা চোখ এড়াল না।

মন্দিরা স্যুটকেস হাতে স্বামীর পিছনে পিছনে যাচ্ছিল, নিশিবাবু হঠাৎ বললেন, 'দাঁড়াও। মন্দিরা, তোমার একটা আচরণে আমি মহা অসন্তুষ্ট হয়েছি।'

সবাই অবাক হয়ে নিশিবাবুর দিকে তাকাল।

মন্দিরা বলল, 'কী হল মামাবাবু?'

নিশিবাবু বললেন, 'তুমি আমাকে প্রণাম করলে, শশাঙ্কবাবুকে প্রণাম করলে না? উনি না তোমার মাস্টারমশাই? শিক্ষাগুরু? আমার মা বলতেন, 'নিশি, যাঁর কাছ থেকে একটি অক্ষরও শিখবি, তিনিও গুরু। তাঁকেও গুরু বলে সারাজীবন মান্য করবি। করো, প্রণাম করো, মাস্টারমশাইকে প্রণাম করো।'

মন্দিরা লজ্জিতভাবে স্যুটকেসটি নামিয়ে রেখে শশাঙ্কের পা ছুঁয়ে এসে প্রণাম করল।

শশাঙ্ক ততক্ষণে বেতের চেয়ারখানিতে বসে পড়েছে। মনে হল প্রণাম করতে একটু বেশি সময় নিল মন্দিরা। পায়ে হাত দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা সরিয়ে নিল না।

কিন্তু শশাঙ্কের পা দু'খানা যেন অসাড় হয়ে গেছে। পদমূল কম স্পর্শ-কাতর নয়। কিন্তু কোথায় সেই তড়িৎ-প্রবাহ।

নিশিবাবু যেন পণ করেছেন, শশাঙ্কের মন থেকে সমস্ত কামনা-বাসনা নিষ্কাশিত করে দেবেন।

মিহির স্যুটকেসটা নিয়ে ভিতরের ঘরে চলে যাচ্ছিল। এই প্রণাম নিবেদনের সে সাক্ষী থাকতে চায় না।

কিন্তু নিশিবাবু তাকেও যেতে দিলেন না, ডেকে বললেন, 'দাঁড়াও মিহির, দাঁড়াও, পালাচ্ছ কেন।'

মিহির বলল, 'আমি দাঁড়িয়ে থেকে কী করব মামাবাবু।'

নিশিবাবুর জবাবটা প্রবীর কেড়ে নিল। হেসে বলল, 'বুঝতে পারছেন না মিহিরদা? আপনারও একটা প্রণাম পাওনা আছে যে। শিক্ষাগুরু পেলেন আর পরম গুরু পাবেন না, মামাবাবুর বিধানে অমন পক্ষপাত নেই।'

প্রবীরের কথার ভঙ্গিতে ঘরের সবাই হেসে উঠল। নিশিবাবুই হাসলেন বেশি। হাসতে হাসতে বললেন, "ঠিক বলেছ প্রবীর। আমি যতদূর পারি

নিরপেক্ষ থাকতে চেষ্টা করি। যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে বলি। যার যা প্রাপ্য তাকে তা নিতে বলি। ছাত্র-ছাত্রী তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে প্রণাম নিতে সঙ্কোচ করবেন না শশাঙ্কবাবু। প্রণাম নিতে নিতে আমরা প্রণম্য হই। অন্তত মুহূর্তের জন্যে হলেও হই। আর প্রণাম যে দেয় সে অনেকটা লিফটম্যানের কাজ করে। অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে খানিকটা ওপরে তুলে দেয়। এ সব আপনারই কথা শশাঙ্কবাবু। মনে আছে, সেই যুব-সম্মেলনের বক্তৃতায় আপনি সেদিন এই ধরনের কথাই বলেছিলেন?'

শশাঙ্ক কোন জবাব দিল না।

মিহির আর মন্দিরা দুজনেই ততক্ষণে ভিতরে চলে গেছে।

শশাঙ্ককে নিরুত্তর দেখে নিশিবাবু তর্কযুদ্ধে প্রবীরকে ডাকলেন। হেসে বললেন, 'তোমরা বোধ হয় এসব প্রণাম-ট্রনাম সেকেলে বলে বাতিল করে দিয়েছ প্রবীর।'

প্রবীর বলল, 'তা অনেকটা উঠে গেছে মামাবাবু। প্রণামটাকে আমরা পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। শ্রদ্ধেয় যেসব গুরুজন সেই গণ্ডির বাইরে, তাঁদের আমরা অন্য রীতিতে শ্রদ্ধা জানাই। যেখানে-সেখানে হরধনু হবার দরকার দেখিনে।'

'তোমার রীতি আমার জানা আছে।' নিশিবাবু দুখানি হাত নিজের চিবুক পর্যন্ত তুলে উচ্চারণে একটু বিকৃতি এনে বললেন, 'নমস্কার।'

তারপর একটু হেসে বললেন, 'এই তো? তোমাদের ছেলেছোকরাদের ওই ধরনের নমস্কার দেখলে আমি মুখ ফিরিয়ে নিই। চোখে সহ্য হয় না।'

প্রবীর হেসে বলল, 'কেন মামাবাবু?'

নিশিবাবু বললেন, 'তোমাদের ওই নমস্কারের মধ্যে নম্রতাও নেই, শিষ্টতাও নেই, আন্তরিকতাও নেই। এর চেয়ে সাহেবদের হ্যাণ্ডশেক ঢের ভালো। তাতে অন্তত করস্পর্শ পাওয়া যায়। ধরাছোঁয়ার বাইরে তোমাদের ওই খাটো লেংথের শর্টকাট নমস্কার, আর যাই হোক, শ্রদ্ধার দান নয়।'

প্রবীর একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর হেসে বলল, 'আপনি আমাদের নমস্কারের ধরনকে যথেষ্টই তিরস্কার করলেন মামাবাবু। কিন্তু নমস্কারই হোক আর প্রণামই হোক, শ্রদ্ধাটা তো হাতে-পায়ের মধ্যে নেই। শ্রদ্ধা মানুষের মনে। এমনও হতে পারে আপনি যাঁর পায়ে দুবেলা মাথা নোয়াচ্ছেন তাঁকে একফোঁটাও শ্রদ্ধা করেন না, একবিন্দুও ভালোবাসেন না। আবার আমি আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম না করেও আপনাকে যে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, তা বুঝিয়ে দিতে পারি। আসলে আমরা অনাবশ্যক হিউমিলিটি পছন্দ করিনে, নম্রতাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলে ধরিনে। তাই বলে যে আমরা আমাদের বাবা দাদা আর মামাবাবুকে সম্মান করিনে, এ কথা মনে করবেন না।'

শশাঙ্ক লক্ষ্য করল, নিশিবাবু অবাক হয়ে প্রবীরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

চট করে কোন জবাব দিতে পারছেন না। শশাঙ্ক নিজেও কি পারত? শশাঙ্ক ভাবল, এরই নাম বোধ হয় যৌবন। লাবণ্যের সঙ্গে তেজ, শৌর্যের সঙ্গে রূঢ়তা ঔদ্ধত্য এই বয়সে আপনিই এসে দেখা দেয়। আর বয়স পেরিয়ে গেলে তাকে ডাকাডাকি করেও আনা যায় না। তখন যৌবনের অনেক বিদ্রোহকেই মনে হয় অহেতুক অকিঞ্চিৎকরের বিরুদ্ধে দ্রোহ। তার অনেক আস্ফালনকেই হাস্যকর মনে হয়। তবু যৌবন তার স্থূলতা রূঢ়তা সত্ত্বেও যৌবন। জীবনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঋতুরাজ। শশাঙ্ক কি তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে?

একটু বাদে মিহির ভিতরের ঘর থেকে বাইরে এল। মন্দিরা এখন অন্তঃপুর-বাসিনী। ঘরনীর কাজ ঘরের মধ্যে।

মিহির বলল, 'প্রবীর এসেই বুঝি খুব তর্ক জুড়ে দিয়েছে। তোমার উকিল হওয়া উচিত ছিল প্রবীর। তুমি ইঞ্জিনীয়ারিং লাইনে কেন এলে?'

প্রবীর হেসে বলল, 'না এলে কি ভাত জুটত মিহিরদা? মেঠো বক্তৃতায় শ্রোতা জোটে, কিন্তু পয়সাওয়ালা মক্কেল জোটে না। আমি এবার উঠি। অনেকক্ষণ এসেছি। এবার এগোই মেসের দিকে।'

মিহির বলল, 'সে কী, তুমি তো আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে খাবে। আগেই বলে রেখেছি।'

প্রবীর হেসে বলল, 'নিমন্ত্রণটা বাতিল করে দিয়ে যাচ্ছিনে। হাতমুখটুক ধুয়ে আবার ঘুরে আসছি।'

মিহির বলল, 'এসো। তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে, কিন্তু মুখ বুজে খাবে। বেশি বকবক করলে—'

প্রবীর তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'বড় গোছের একটা মাছের মুড়ো আমার মুখের মধ্যে গুঁজে দেবেন।'

স্মিতমুখে প্রবীর উঠে দাঁড়াল, 'ঘুরে আসি মামাবাবু। এসে ফের অনেকক্ষণ ধরে জ্বালাব। নমস্কার যে প্রণামের চেয়ে ঢের ভালো, শেষ পর্যন্ত তাতে আপনি convinced হয়ে বলবেন, বাবা তোমার খুরে নমস্কার।'

নিশিবাবু উঠে দাঁড়িয়ে সস্নেহে তার পিঠ চাপড়ে দিলেন।

তারপর যুক্তকরে প্রবীর শশাঙ্ককে নমস্কার জানিয়ে তখনকার মত বিদায় নিল।

মিহির শশাঙ্কের দিকে চেয়ে বলল, 'এবার আপনারাও হাতমুখ ধুয়ে নিন। না কি তার আগে এক কাপ করে চা হয়ে যাবে?'

শশাঙ্ক বলল, 'না না।'

নিশিবাবু বললেন, 'না না কেন মশাই, হয়ে যাক এক কাপ করে চা। জামাইজনের কাছে এসেছি, এত লজ্জা কিসের। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে জামাই লজ্জিত হয়ে থাকবে এই বিধি আছে। কিন্তু শ্বশুরের সম্বন্ধে মনুসংহিতায়

কোন অনুশাসন নেই। তিনি মেয়ের বাড়িতে এসে যা খুশি খেতে পারেন, যা খুশি চাইতে পারেন। কী বলো মিহির।'

মিহির বলল, 'তা পারেন বই কি।'

নিশিবাবু বললেন, 'মন্দিরাকে বোলো ও যেন আমাদের জন্যে পঞ্চান্ন ব্যঞ্জন তৈরি করবে বলে রান্নাঘরে গিয়ে আটকে না থাকে। আমরা ওর হাতের দু'এক পদ খেয়েই ঢেঁকুর তুলব আর ভুঁড়িতে হাত বুলাব। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি কাজ-কর্ম সেরে ও এসে আমাদের কাছে বসুক। পাঁচটা কথা বলি। তাতেই আমাদের সুখ।'

মিহির বলল, 'বেশ তো, আপনারা যা বলবেন তাই হবে। ইচ্ছে করলে ভিতরে গিয়েও বসতে পারেন। ও আপনার সঙ্গে গল্প করবে আর কাজ করবে।'

শশাঙ্ক লক্ষ্য করল অন্তঃপুরে যাওয়ার ছাড়পত্র মিহির মামাবাবুকে দিচ্ছে, শশাঙ্ককে দিচ্ছে না। শশাঙ্ক যদি যায় সে ছাড়পত্র নিয়ে যাবে না, কারো অনুমতির অপেক্ষা রাখবে না। মন্দিরার দু'চোখের উল্লাসে যে গোপন অভিনন্দন সে দেখতে পেয়েছে, তার দীর্ঘায়িত প্রণামে যে আত্মনিবেদনের ইশারা পেয়েছে তাই যথেষ্ট।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজের মনোভাবে লজ্জিত হল শশাঙ্ক। ছি ছি ছি, মিহিরের অতিথি হয়ে এসে, তার বাড়িতে বসে সে এসব কী ভেবে চলেছে! নীতির প্রশ্ন নয়, রুচির প্রশ্ন নয়, শোভনতার প্রশ্ন। মনে মনে শশাঙ্ক যা খুশি ভাবে ভাবুক, কিন্তু আচরণে যেন এমন কিছু না করে বসে যাতে ফর্মের হানি হয়, যাতে বিশেষ একটি শিল্পরূপ নষ্ট হয়ে যায়। আর, সব রকমের রূপই হল প্লাস্টিক আর্ট। দৃশ্যরূপ। সেই রূপ নিখুঁত হলেই হল। রূপ যখন শুধু ভাবনার মধ্যে থাকে তা অপরিচ্ছন্ন। তার উৎসমুখ ঘোলাটে হতে পারে। সৃষ্টির শতদল মনের কোন পাঁকে ফোটে কে জানে! কিন্তু একবার যখন তুমি তাকে ফুটতে দিলে, একবার যখন তুমি তার বহিঃপ্রকাশ ঘটালে, তখন যেন ফর্মে কোন ত্রুটি না হয়, তখন যেন পর্ণে পর্ণে পঙ্কের ছিটা না লাগে। দলগুলি যেন ছিন্ন দল না হয়, কি সৌরভহীন। তা হলে শিল্পী হিসাবে রূপস্রষ্টা, রূপরসিক হিসাবে তোমার সব গৌরব ধুলোয় লুটাবে।

একটু বাদে চা এল। গৃহকর্তা কি গৃহভৃত্যের হাতে পাঠায়নি, মন্দিরা নিজেই এসেছে চা নিয়ে। কিন্তু ও যেন পণ করেছে, অতিথিকে শুধু সেবা করবে, খাদ্য পানীয় পরিবেশন করবে, তার সঙ্গে কোন কথা বলবে না।

চায়ের কাপ নিতে নিতে উপযাচক হয়ে শশাঙ্কই প্রথমে কথা বললে, 'কেমন আছ?'

আরো সংক্ষিপ্ত জবাব, 'ভালো।'

তারপরই ঘুরে গিয়ে মন্দিরা নিশিবাবুর কাছে দাঁড়াল, 'এই সঙ্গে আপনাকে দুটি সীতাভোগ দিই মামাবাবু?'

নিশিবাবু বললেন, 'আরে না না। ওসব মিষ্টিটিষ্টি আর সহ্য হয় না। বুড়ো বয়সে ডায়বেটিসে ধরেছে।'

'তবে আনলেন কেন?'

'আনলাম তোদের জন্যে।'

মন্দিরা এবার শশাঙ্কের দিকে এগিয়ে গেল, 'আপনাকে দিই?'

শশাঙ্ক বলল, 'না। চায়ের সঙ্গে মিষ্টি আমি খাইনে।'

'তা জানি। তবু—।'

শশাঙ্ক তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তবু যা দিয়েছ, তাই যথেষ্ট।'

মন্দিরা নিঃশব্দে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফের গিয়ে বসল নিশিবাবুর পাশে। বলল, 'মামাবাবু, আপনাকে আবার ও রোগে ধরল কবে?'

নিশিবাবু বললেন, 'ঠিক ধরেনি। ধরি ধরি করছে। কিন্তু ধরা দিলে তো? তোর মামাবাবু না খেয়ে মরবে, তবু খেয়ে মরবে না। তারপর আছিস কেমন বল?'

'কেমন দেখছেন?'

'ভালোই তো দেখছি। বেশ গিন্নীবান্নী হয়েছিস। বুদ্ধিশুদ্ধি স্থির হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

মামা-ভাগ্নিকে আলাপরত রেখে শশাঙ্ক বাইরে এসে সিগারেট ধরাল।

সারাদিন বেশ গরম গেছে। রাত্রেও গরম কম নয়। এই গরমের দিনে এ অঞ্চলে কেউ বেড়াতে আসে না। তবু শশাঙ্ক এসেছে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম তাকে বেশি কাতর করতে পারে না। সে মাত্র একটি যন্ত্রণায় কাতরায়।

জ্যোৎস্নায় নেয়ে এই কয়লা শহরেরও যেন রূপ খুলে গেছে। চারদিকে শান্ত স্তব্ধতা। হেডগীয়ারের চূড়া শশাঙ্ককে ফের গির্জার চূড়ার কথা মনে করিয়ে দিল। দিগন্তে স্তব্ধ কয়েকটি ঝাউগাছ যেন শশাঙ্কের মতই মূক দর্শক। কিন্তু ভিতরে শশাঙ্কের মতই কি অগ্নিপ্রবাহ বা অগ্নিপ্রদাহ চলছে? বোধ হয় না।

মিহির এসে পাশে দাঁড়াল, 'আপনি একা একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বসুন।'

মিহির নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এসেছে। 'বসুন।'

সাধারণ আতিথেয়তা। তবু একটু অবাক লাগল।

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'একা একা দাঁড়িয়েছিলাম, আপনি একা একা বসবার ব্যবস্থা করে দিয়ে যাচ্ছেন।'

মিহির বলল, 'তা কেন। যদি বলেন আর কাউকে পাঠিয়ে দিতে পারি। ও অবশ্য এখন রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। আর খানিকক্ষণ পরে আসতে পারবে।'

শশাঙ্ক ফের একটু অস্বস্তি বোধ করল। কিন্তু হেসে বলল, 'আমি ওর কথা বলছিনে, আপনার কথা বলছি। আপনি তো বসতে পারেন। আপনি তো আর রান্না নিয়ে ব্যস্ত নন। না কি যোগান দিতে হবে গিয়ে?'

মিহির বলল, 'যোগান ঠিক রান্নাঘরে দিতে হবে না। তবে গৃহকর্ম আমারও একটু আছে।'

'কি রকম?'

মিহির একটু হাসল, 'শোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাদের। নতুন চাকরটি আনাড়ী। তাই নিজেকেই এ-সব দেখতে হয়। বাইরে আমাদের মাত্র একখানা ঘর। তাও ছোট। দুখানা তক্তপোশ কোনরকমে পড়বে। চেয়ারগুলি সরিয়ে তাই এখন পাততে যাচ্ছি। আপনার খুব অসুবিধে হবে।'

শশাঙ্ক বলল, 'অসুবিধে যে কার বেশি, তা ঠিক বুঝতে পারছিনে। মনে হয়, উৎপাতটা আপনার ওপরই বেশি হচ্ছে। তক্তপোশ টানাটানির জন্যে যদি আর কাউকে দরকার হয়, বলবেন, আমরাও এসে হাত লাগাব।'

মিহির বলল, 'না, তার দরকার হবে না। আজ একটু অসুবিধে হলেও কাল অন্য ব্যবস্থা করতে পারব।'

শশাঙ্ক বলল, 'কালকের জন্যে ভাববেন না। কাল আমি ভোরেই আসানসোল চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়? সেই সুরেশবাবুর বাড়িতে?'

বলবার ভঙ্গির মধ্যে একটু যেন খোঁচা আছে লুকোন। মিহির কি বিশ্বাস করেনি আসানসোলে সত্যিই শশাঙ্কের বন্ধু আছে—একজন নয়, একাধিক?

শশাঙ্ক বলল, 'হ্যাঁ। আপাতত সেখানেই যাব।'

'কিন্তু কাল তো আপনার যাওয়া হতে পারে না।'

'কেন?'

'কাল ভেবেছি. আমরা একটি ঘরোয়া বৈঠক করব। শিল্প সাহিত্য ভালোবাসেন, এই কয়লার খনিতেও এমন কেউ কেউ আছেন। তাঁরা আপনার কথা শুনতে আসবেন।'

মিহির কি ঠাট্টা করছে?

'আমি যে কথক, এ কথা আপনাকে কে বলল।'

মিহির বলল, 'আমি শুনেছি। রেডিওতে বক্তৃতা শুনেছি আপনার। সামনাসামনি শুনবার সৌভাগ্য হয়নি। ভেবেছিলাম এবার হবে।'

এই বিনয় কি নির্দোষ? শ্লেষহীন? ব্যঙ্গ-বিদ্রুপমুক্ত?

শশাঙ্ক বলল, 'এবার তো সময় হবে না। আলাপ-পরিচয় তো হয়ে রইল। কিছু কিছু কথাও আমাদের মধ্যে হল। কথকতা না-হয় আর একবার এসে হবে।'

মিহির একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বেশ। কিন্তু কলিয়ারীটা একবার দেখে যাবেন। খাদে নামবেন তো একবার। সকালের দিকেই ব্যবস্থাটা করা যাবে।'

শশাঙ্ক বলল, 'হোস্ট হিসাবে আপনি যদি দেখিয়ে খুশী হন, দেখব।

আমার নিজের তত উৎসাহ নেই।'

'কেন বলুন তো?'

'দু-একবার দেখে কীই-বা হয়? এ-সব টেকনিক্যাল ব্যাপার কতটুকু বোঝা যায়, মনে রাখা যায়? শুধু দেখেছি, এইটুকু বলবার জন্যে আপনাকে কষ্ট দেব, সে বয়স আর নেই।'

মিহির বলল, 'কষ্ট কিসের? বরং আনন্দই পাব। মন্দিরাও এখন পর্যন্ত দেখেনি।'

শশাঙ্ক বলল, 'আশ্চর্য, এখনো দেখেনি? ওর তো দেখা উচিত ছিল। আপনি দেখাতে পারেননি, তাই বলুন।' শশাঙ্ক একটু হাসল।

মিহির বলল, 'পারিনি। তাই তো আপনাদের সাহায্য চাইছি। সবাই মিলে একসঙ্গে দেখবে বলেই ও বোধ হয় অপেক্ষা করে আছে। বোধ হয় তাতেই ও বেশি আনন্দ পাবে।'

শশাঙ্ক ফের মিহিরের মুখের দিকে তাকাল। ও কি কিছু জানে? কী জানে, কতটুকু জানে? কিন্তু মিহিরের মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না। মিহিরের মুখ তার মনের কথার প্রতিবিম্ব নয়। তার ভাবলেশহীন অভিব্যঞ্জনা-হীন অসুন্দর মুখাবয়ব মনের কথা গোপন করবার জন্যে।

পঞ্চান্ন ব্যঞ্জন না হলেও পাঁচ-ছটি ব্যঞ্জন ঠিকই রেঁধেছে মন্দিরা। ডাল, একটি নিরামিষ তরকারি, মাছ, মাংস, চাটনি।

খেতে খেতে নিশিবাবু খুবই সুখ্যাতি করতে লাগলেন। 'বেশ রেঁধেছিস তো, বেশ, বেশ। রাঁধতে যখন শিখেছিস, আর কোন ভয় নেই। একেবারে পাকা গিন্নী। এখন গৃহলক্ষ্মীর আসন একেবারে অচল, অনড়।'

প্রবীর বসেছিল তাঁর পাশে। বলল, 'কেন, মামাবাবু? রান্নার ওপর কেন এত জোর দিচ্ছেন? জানেন না, একালের মেয়েরা শুধু চুল বাঁধে, রাঁধে না?'

নিশিবাবু বললেন, 'সেইজন্যেই তো একালের ছেলেদের অমন ডিসপেপটিক চেহারা। হোটেলে রেস্তরাঁয় অখাদ্য-কুখাদ্য খায়। আর বদহজমে ভোগে।'

শশাঙ্ক আর মিহির বসেছিল পাশাপাশি। মামাবাবু চেয়ার-টেবিলে খাওয়াটা তেমন পছন্দ করেন না বলেই হয়তো মেঝেয় আসন পেতে দিয়েছে মন্দিরা।

শশাঙ্ক লক্ষ্য করল, তার মত মিহিরও নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছে। এই ভোজের আসরে কিছু বলা উচিত। কিন্তু বাক্‌পটু শশাঙ্ক ঠিক যেন এই মুহূর্তে উপযুক্ত কথাটি খুঁজে পাচ্ছে না।

ভোজনের পর শয়নের ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থায় মন্দিরার চেয়ে মিহিরই বেশি উদ্যোগী দেখা গেল। তক্তপোশ পাতল, বিছানা পাতল, মশারি খাটাল। মন্দিরাও এসে যোগ দিল তার সঙ্গে। কিন্তু তার ভূমিকা যেন একটু গৌণ।

নিশিবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ ওদের এই কর্মব্যস্ততা

দেখলেন, তারপরে হঠাৎ একফাঁকে বলে উঠলেন, 'বাঃ বেশ লাগছে কিন্তু। কর্তা-গিন্নী দুজনকে দেখতে বেশ লাগছে, কী বলুন শশাঙ্কবাবু?'

শশাঙ্কের জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে নিশিবাবু ফের বললেন, 'সস্ত্রীকং ধর্মমাচরেৎ। মিহির বাবাজী এখন অতিথিসেবার পুণ্য কর্মে লেগেছে।'

প্রবীর খানিক আগে বিদায় নিয়েছিল। একটু বাদে মিহির আর মন্দিরাও নিজেদের ঘরে চলে গেল।

মিহির বলল, 'কিছু যদি লাগে বলবেন। কিছু যদি দরকার হয়, ডাকবেন আমাদের। কোন সংকোচ করবেন না।'

শশাঙ্ক বলল, 'সংকোচের কোন সুযোগ কি আপনি দিচ্ছেন?'

মিহির চলে গেল। যেন সংকোচের সুযোগ দিয়ে গেল।

মন্দিরা এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সরে গিয়ে নিশিবাবুর খাটের পাশে দাঁড়াল, 'মামাবাবু, আর কী লাগবে বলুন।'

নিশিবাবু বললেন, 'আবার কী লাগবে। জল-টল সবই তো দিয়েছিস। যা, এবার শুতে যা। আর রাত করিসনে।'

একটু বাদে ওদের ঘরে খিল দেওয়ার শব্দ শোনা গেল।

শুয়ে শুয়ে নিশিবাবুর আরো হয়তো খানিকক্ষণ গল্প করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শশাঙ্ক কোন সাড়া দিল না। মশারির মধ্যে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। তারপর খানিকক্ষণ বাদে নিশিবাবুর নাক ডাকতে লাগল।

অনেক রাত পর্যন্ত শশাঙ্কের ঘুম এল না।

ঘড়ির টিক টিক শব্দ শুনতে শুনতে শশাঙ্কের এক সময় মনে হল, নিশিবাবুর বিছানাখানাই বোধ হয় বেশি আরামের।

ভোরে শশাঙ্কের ঘুম ভাঙল। ঠিক আপনা থেকেই যে ভাঙল তা নয়, নিশিবাবুই ডেকে ডেকে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন। বললেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। আর কত ঘুমোবেন মশাই, এবার উঠুন। চলুন একটু ঘুরেটুরে আসি।'

শশাঙ্ক মনে মনে বিরক্ত হল। ভাবল, এই বুড়ো ভদ্রলোক সব সময় সুবিবেচনার পরিচয় দেন না। নিজের অভ্যাসকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে পারলেই তিনি যেন খুশী। ভোরে ওঠার অভ্যাস শশাঙ্কের নেই। তা ছাড়া কাল অনেক রাত অবধি সে জেগে ছিল। যে সামান্য সময়টুকু ঘুমিয়েছে তাও তেমন নির্বিঘ্নে নিদ্রা হয়নি। শশাঙ্কের মনে হল সারারাত ধরে যেন সে স্বপ্ন দেখেছে। সে স্বপ্ন সুখস্বপ্ন নয়। কিসের একটা ভয় অস্বস্তি আতঙ্ক যেন সেই স্বপ্নের সঙ্গে মিশে ছিল। কিন্তু ভোরে উঠে কিছুই মনে করতে পারছে না শশাঙ্ক। সে আর-এক ধরনের অস্বস্তি।

মনের বিরক্তি গোপন করে শশাঙ্ক বলল, 'আপনি ঘুরে আসুন নিশিবাবু। আমি আর একটু ঘুমিয়ে নিই। রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি।'

নিশিবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'তা হলে তো বড় অন্যায় হয়ে গেল শশাঙ্কবাবু। আপনার কাঁচা ঘুম ভেঙে দিলাম। কিছু মনে করবেন না। রাত্রে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম এসে যায়। আর যত রাত্রেই ঘুমোই না, সাড়ে চারটায় কি বড়জোর পাঁচটার মধ্যে সে ঘুম ভাঙবেই। তারপর আর এক মুহূর্তও বিছানায় পড়ে থাকতে পারিনে। মনে হয় পিঠে যেন কেউ বেত মারে। আমি কখন উঠেছি জানেন? সেই সাড়ে চারটায়। তখনো অন্ধকার কাটেনি। উঠে বাথরুমে গেলাম, হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম। তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। ভাবলাম আপনাকে ডাকি। দুজনে মিলে একটু ঘুরেটুরে আসি। তবু তো আজ একটু দেরি হয়ে গেল। সূর্যোদয় দেখাটা হল না। লোকে পাহাড়ে সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখে। কিন্তু আমি তো মশাই যে কোন জায়গা থেকেই সূর্যোদয় দেখে আনন্দ পাই।'

নিশিবাবু বলে চলেছেন তো বলেই চলেছেন। বুড়ো মানুষের স্বভাবই এই। তাঁরা একবার কথা শুরু করলে আর থামতে চান না। আসলে কথা যে তাঁরা অন্যকে শোনাবার জন্যে বলেন তা নয়, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের কণ্ঠস্বর শুনতে ভালোবাসেন। শশাঙ্ক নিজের মনেই হাসল। নিশিবাবু যতই বিচক্ষণ আর অভিজ্ঞ হন না, তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিবরণ অন্যের কৌতূহলের উদ্রেক নাও করতে পারে, নিশিবাবুর সে ধারণা নেই।

শশাঙ্ক নিঃশব্দে পাশ ফিরল।

কিন্তু পরক্ষণেই আর একজনের লঘু পায়ের শব্দে, কোমল কণ্ঠস্বরে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

'এ কি মামাবাবু, আপনি এখনই বেরোচ্ছেন।'

'হ্যাঁ মা, একটু ঘুরে আসি। বহু দিনের অভ্যাস। সকালে একবার না ঘুরে আসতে পারলে ভালো লাগে না।'

'ঠিক আমার বাবার মত। তাঁরও ঝড় হোক বৃষ্টি হোক, একবার করে বেরোন চাই।'

'আমরা সেকেলে মানুষ। সকালে ওঠাকে ধর্মাচরণের মত মনে করি। আর তোরা একালের ছেলেমেয়েরা দেরি করে ওঠাকে ভাবিস আভিজাত্য।'

'আমাকে দোষ দেবেন না মামাবাবু। আমি আজকাল ভোরেই উঠি। অবশ্য আপনার মত অত ভোরে নয়। তবু বেশি দেরি হয় না আমার।'

'বেশ বেশ। আর মিহির?'

মন্দিরা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'উনিও ভোরেই ওঠেন।'

নিশিবাবু বললেন, 'শুনে খুব ভালো লাগল। আমাদের দলে এখনো কেউ কেউ আছে দেখছি। ঠাকুর-দেবতা মানিস আর না মানিস, এই যে সূর্যকে দেখে প্রতিদিন যাত্রা শুরু করা এর একটা মূল্য আছে।'

মন্দিরা একটু হেসে বলল, 'মামাবাবু, ঠিক এই কথাগুলি বাবার মুখেও

শুনেছি। বাবাও সূর্যোদয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনায় পঞ্চমুখ।'

নিশিবাবু সস্নেহে মন্দিরার গালে মৃদু চড় দিলেন। তারপর হেসে বললেন, 'খুব দুষ্টু হয়েছিস।'

ঘরে নয়, ঘরের বাইরে গিয়েই নিশিবাবু কথা বলছিলেন মন্দিরার সঙ্গে। অনুচ্চস্বরেই দুজনের আলাপ চলছিল। শশাঙ্কের মনে হল পাছে তার ঘুমের ব্যাঘাত হয়, সেই জন্যেই নিশিবাবুর এই সতর্কতা। কিন্তু ঘুমন্ত মানুষের ঘুম একবার ভেঙে দিয়ে এই সুবিবেচনার কোন মানে হয় না। ও'দের আলাপের প্রতিটি শব্দ শশাঙ্কের কানে যেতে লাগল। যেটুকু গেল না, সেটুকু শুনবার জন্যে সে উৎকর্ণ হয়ে রইল।

একটু বাদে নিশিবাবু আর একজনকে আহ্বান জানালেন, 'এই যে মিহির, এসো এসো। হাতমুখটুক ধুয়ে নিয়েছ?'

'হ্যাঁ মামাবাবু।'

'তা হলে চল একটু ঘুরে আসি। মন্দিরা তুইও চল।'

'আমরা সবাই মিলে চলে যাব? শশাঙ্কবাবু বোধ হয় এখনো ওঠেননি।' মিহিরের গলা।

নিশিবাবু বললেন, 'ওঁর উঠতে দেরি হবে। উনি বোধ হয় আরো একটু ঘুমিয়ে নেবেন।'

মন্দিরা বলল, 'হ্যাঁ, ওঁর বেলায় ওঠা অভ্যাস। এক কাপ করে চা খেয়ে গেলে ভালো হতো না মামাবাবু?'

'আরে না না, চা খেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। তাহলে আর আমাদের প্রাতঃভ্রমণ হবে না, হবে মধ্যাহ্নভ্রমণ।'

মিহির বলল, 'কিন্তু শশাঙ্কবাবু যদি এর মধ্যে জেগে ওঠেন, ওঁর জন্যে চা-টার ব্যবস্থা করে যাও মন্দিরা।'

নিশিবাবু বললেন, 'ইস্, মিহিরের মত আদর্শ গৃহী আর দুটি নেই। ওসবের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না মিহির। তোমার গৃহিণীই ওসব ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করে যাবেন। তা ছাড়া আমরা তো ফিরে এলাম বলে। বড়জোর পনের মিনিট কি বিশ মিনিট। ফিরে এসে হয়তো দেখব, শশাঙ্ক-বাবু তখনো নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন।'

এর পর সদলবলে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লেন নিশিবাবু।

শশাঙ্কের মনে হল, বুড়ো জেনেশুনেই একটু যেন কৌতুক করে গেলেন তার সঙ্গে। শশাঙ্ক তাঁর ভ্রমণসঙ্গী হতে রাজি হয়নি, তাই শোধ নেওয়ার জন্যে মিহির আর মন্দিরাকে নিলেন সঙ্গে। একজন কাউকে তাঁর পেলেই হল। অমনিতে একক-জীবন। কিন্তু শশাঙ্ক লক্ষ্য করেছে—বেশিক্ষণ যেন একা থাকতে পারেন না নিশিবাবু। কাউকে না কাউকে সঙ্গে রাখতে ভালোবাসেন। নইলে কথা বলবেন কার সঙ্গে। উপদেশ বর্ষণ করবেন কার ওপর?

নিশিবাবু না হয় গেলেন, কিন্তু মন্দিরা কি থেকে যেতে পারত না? কোন ওজর আপত্তি দেখিয়ে থেকে যাওয়াটা কি তার পক্ষে একান্তই অসম্ভব ছিল? একান্তে দুটি কথা বললে তা কি খুবই দোষের হতো? না কি ভয় করে মন্দিরার। স্বামীকে ভয়, সংসারের শান্তিভঙ্গের ভয়? মানসম্মান ক্ষুণ্ণ হবার ভয়? এত ভয় মন্দিরার? তাহলে ফের সে শশাঙ্কের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কেন? দেখা না পেয়ে কেন চিঠি লিখে রেখে এসেছিল? নিশিবাবুর চিঠির মধ্যে পরোক্ষে তাকে আসতেই বা অনুরোধ করেছিল কেন?

অবুঝ কমবয়সী তরুণ যুবকের মতই শশাঙ্কের মন ঈর্ষাক্লিষ্ট এবং অভিমানক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সে নিজের সংকল্পের কথা ভুলে গেল। শশাঙ্ক যে মন্দিরাকে শুধু দেখতেই এসেছে এবং দেখা ছাড়া তার আর কোন উদ্দেশ্য নেই, আর কোনরকম ঘনিষ্ঠতা সম্ভবও নয়, এই মুহূর্তে শশাঙ্কের সে কথা মনে রইল না। অশান্ত বিক্ষুব্ধ চিত্তে সে ভাবতে লাগল, মিছিমিছিই সে এখানে এসেছে। এসে নিজেকে অন্যের চোখে কৌতুকের পাত্র করে তুলেছে। হয়তো মন্দিরার চোখেও। অতিথির প্রতি তার যা কর্তব্য তা মন্দিরা করেছে। পাঁচ রকম রেঁধে খাইয়েছে। বিছানা ঝেড়ে পুছে পেতে দিয়েছে। কিন্তু সবাইর সাক্ষাতে হোক, অসাক্ষাতে হোক একটি বারও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার সঙ্গে কথা বলেনি, একবারও জিজ্ঞাসা করেনি 'আপনি কেমন আছেন?' বরং স্বামী-সংসার নিয়ে সে যে ভালোই আছে তাই দেখাবার জন্যেই যেন শশাঙ্ককে ডেকে নিয়ে এসেছে মন্দিরা। এ দৃশ্যে বুড়ো নিশিবাবু খুশী হতে পারেন। তিনি মামাবাবু, কিন্তু মন্দিরার সঙ্গে শশাঙ্কের তো আর সে সম্পর্ক নয়। সে বরং ঈর্ষায় জ্বলবে, বিদ্বেষে পুড়বে, তবু কিছু না পেয়ে বলবে না, 'পেয়েছি।'

পেলাম না বলে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে সে বৈরাগী হতে চায় না। বরং না পাওয়ার দহন জ্বালার মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করতে চায়। সেই যন্ত্রণাই যেন জীবন। সেই জ্বালা আর যৌবন যেন অভিন্ন।

ভাঙা ঘুম আর জোড়া লাগল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শশাঙ্ক উঠে পড়ল।

টিপয়ের ওপর জলের গ্লাসটি রয়েছে। ঢাকনিতে ঢাকা গ্লাসটি এখনো জলে ভরা। রাত্রে আর জল খায়নি শশাঙ্ক। শোবার আগে জল-খাবার তেমন অভ্যাস তার নেই।

পাশের তক্তপোশে নিশিবাবুর মশারি খুলে ফেলা হয়েছে। বিছানা গুটানো। তাঁর জলের গ্লাসও অন্তর্হিত।

শশাঙ্কের হঠাৎ চোখে পড়ল জলের গ্লাসের তলা থেকে একটুকরো কাগজ যেন মুখ বাড়িয়ে রয়েছে। এই টুকরো কাগজটি কি ছিল? থাকতেও পারে। শশাঙ্ক লক্ষ্য করেনি। কি খেয়াল হল, গ্লাসটি সরিয়ে রেখে সে

কাগজের টুকরোটির ভাঁজ খুলে ফেলল। তাতে মাত্র একটি লাইন লেখা আছে—'খাদে দেখা হবে।'

মেয়েলী অক্ষরে ওই চিরকুটটি যে কার তা অনুমান করা কঠিন নয়। তবু ওই সামান্য একটি পংক্তি শশাঙ্কের মানসিক আবহাওয়াকে বদলে দিল। তার মনে ক্লান্তি অবসাদ নৈরাশ্যের চিহ্ন মাত্র রইল না। এখানে এসে যত সেবাযত্ন আতিথেয়তা সে পেয়েছে, ওই একটি নিষিদ্ধ গোপন পংক্তির কাছে তা যেন তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ হয়ে গেছে। এই সামান্য সঙ্কেত শশাঙ্ককে যেন অজ্ঞাত রাজ্যের ইশারা দিয়েছে। সেখানে রহস্যের শেষ নেই, সুখের অন্ত নেই। আর সেই অলৌকিক রহস্য যেন সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত মধু দিয়ে ভরা।

একটু বাদে শম্ভু এসে ঘরে ঢুকল। 'এই যে, বাবু উঠে পড়েছেন। বিছানা তুলে ফেলব এবার?'

শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি চিঠির টুকরোটি মুঠির মধ্যে লুকিয়ে ফেলে বলল, 'হ্যাঁ, তুলে দাও।'

শশাঙ্ক এবার মুখ হাত ধুতে চলে গেল।

আরো কিছুক্ষণ পরে নিশিবাবু মিহির আর মন্দিরাকে নিয়ে ফিরে এলেন। তিনি কথা রেখেছেন। আধ ঘণ্টার বেশি দেরি করেননি।

নিশিবাবু বললেন, 'সে কি মশাই, আপনি যে এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন? আমি তো ভাবিইনি, আপনাকে দশটার আগে কেউ টেনে তুলতে পারবে।'

মিহির একটু হেসে বলল, 'না, আজ আর উনি অতক্ষণ ঘুমুতে পারতেন না। দশটার মধ্যে আমরা খাদে নেমে যাব। শশাঙ্কবাবু আজ বিকেলেই চলে যেতে চাইছেন। চলুন কলিয়ারীটা সকালেই আমরা দেখে আসি মামাবাবু।'

নিশিবাবু তাঁর তক্তপোশখানার ওপর বসেছিলেন। মিহিরের কথার জবাবে বললেন, 'কিছু দেখবার নামে আমি তো এক পায়ে খাড়া। যখন দেখাবে তখনি দেখব। কিন্তু শশাঙ্কবাবু আজই চলে যাবেন সে কি কথা? আপনার তো এমন কিছু তাড়া নেই। কলেজ থেকে তো দিন পাঁচেকের ছুটি নিয়ে এসেছেন। তবে এমন ছটফট করছেন কেন?'

শশাঙ্ক একটু হেসে বলল, 'আমার স্বভাবের মধ্যে অমন একটা ছটফটানি আছে। আপনার মত স্থির হয়ে থাকতে পারলে বাঁচতাম। আপনি থেকে যান নিশিবাবু। ধীরে সুস্থে ক'দিন বিশ্রাম করে যান।'

নিশিবাবু বললেন, 'আর আপনি?'

শশাঙ্ক একটু হেসে বলল, 'আমি তো অতিথি। অতিথির এক তিথির বেশি থাকতে নেই।'

মন্দিরা ঘরে ঢুকল। একবার শশাঙ্কের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। তার দৃষ্টিতে কি একটু কৌতুকের আভাস ফুটে বেরোচ্ছে? কিন্তু

শুধু দৃষ্টিই। শশাঙ্কের সঙ্গে একটি কথা বলবার গরজও যেন তার নেই। সে মুখ ফিরিয়ে নিশিবাবুকে বলল, 'মামাবাবু, চলুন ও ঘরে আপনাদের চা দিয়েছি।'

এবার আর পংক্তি ভোজন নয়। ছোট্ট খাবার ঘরখানার টেবিলে দুদিকে চেয়ার পাতা রয়েছে।

নিশিবাবু বললেন, 'বাঃ এ যে একেবারে দারুণ ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা। ডিমের পোচ, রুটি, মর্তমান কলা। মর্তমানকে আমরা বলি সবরি কলা জানেন শশাঙ্কবাবু? তবু মর্তমানই ভালো। খেতে খেতে মনে হয়, হ্যাঁ, শরীরে বর্তমান আছি বটে। শুরুতেই এই রাজকীয় আয়োজন, দিনটা আজ ভালো-মন্দ খেতে খেতেই কাটবে মনে হচ্ছে। যা আদর-আপ্যায়ন শুরু করেছে মিহির, তাতে কে যে জামাই, কে যে শ্বশুর বুঝে ওঠা শক্ত। এত সব কাণ্ড কখন করলি বল তো মন্দিরা? আবার লুচি বেলতে শুরু করেছিস। না না, ওসব থাক।'

'এমন কী আর করেছি। আপনার সব তাতেই বাড়াবাড়ি মামাবাবু।'

নিশিবাবু হেসে বললেন, 'বাড়াবাড়ি আমার না তোর? যা শুরু করেছিস তাতে এক তিথি তো ভালো, দশ তিথির মধ্যেও তো আমি এখন থেকে নড়তে চাই না।'

মন্দিরা বলল, 'নড়তে আপনাকে দিচ্ছে কে?'

খেতে খেতে নিশিবাবু বললেন, 'আরে তোমার সেই বাক্যবীর প্রবীর ছেলেটি কোথায় হে মিহির? ওকে আজ ডাকোনি?'

মিহির বলল, 'ওর মর্নিং সিফ্‌টে ডিউটি পড়েছে মামাবাবু। ওর সঙ্গে আমাদের খাদে দেখা হবে।'

নিশিবাবু বললেন, 'বেশ ছেলেটি। আমার সঙ্গে খুব তর্ক করে গেলেও ওকে আমার ভালো লেগেছে।'

মিহির বলল, 'আপনি নিজে ভালো মামাবাবু। তাই যাকে দেখেন তাকেই ভালো লাগে।'

নিশিবাবু বললেন, 'না মিহির, অতটা উদারপন্থী এখনো হতে পারিনি। এখনো আমার পছন্দ অপছন্দ বেশ কড়া। তবে আগেকার মত অতটা গোঁড়ামি আর নেই। বয়স সব নরম করে দেয়। দশনং গলিতং পলিতং মুণ্ডম।'

নিশিবাবু একটু হাসলেন, 'বুড়ো বয়সের অনেক অভিশাপ আছে। চোখ যায়, কান যায়, নানা রোগ ব্যাধি এসে ঘিরে ধরে। স্বাস্থ্যবান যুবকরা ধারে কাছেও আসতে চায় না। কিন্তু বুড়ো বয়সের একটি আশীর্বাদও আছে। এই বয়স মানুষকে সব বুঝতে দেয়। অবশ্য যদি আমি বুঝতে চাই। আর যদি পণ করি আমি অবুঝ থেকেই মরে যাব, আমি অবুঝ থেকেই সবুজ থাকব, তাহলে আর আমাকে কে বোঝাবে? যে জেগে ঘুমায় তাকে জাগাবে কে?'

নিশিবাবু কাকে লক্ষ্য করে এসব কথা বলছেন? মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছিল শশাঙ্কের। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল। তার বিরক্তির শেষ ছিল না। ভদ্রলোক চায়ের টেবিলে মোহমুদ্গর খুলে বসেছেন। ডিম খাচ্ছেন রুটি খাচ্ছেন কলা খাচ্ছেন আর বৈরাগ্য বারিধির জল ছিটোচ্ছেন।

কিন্তু শত মুদ্গরেও শশাঙ্কের মোহ ভাঙবার নয়। সে মোহিনী মোহময়ীর দিকে বার বার তাকাচ্ছিল। তার মাথার আঁচল মাঝে মাঝে খুলে পড়ছে, কোন কোন বার সে তুলে দিচ্ছে। আবার কখনো বা তুলতে ভুলে যাচ্ছে। শশাঙ্ক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। যেন তার প্রতিটি ভঙ্গিতে সঙ্কেত, প্রতি পদক্ষেপে অপরূপ ব্যঞ্জনা। রূপমুগ্ধ শশাঙ্ক লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল।

মিহির এক সময় বলল, 'মন্দিরা, তোমার রান্না-বান্নাটা আজ সংক্ষেপ করতে হবে। নিজে যা পার করে নাও। আর বাকিটা শম্ভুকে বুঝিয়ে দিয়ে যাও। ও করবে।'

মন্দিরা বলল, 'কেন?'

'বা রে, খাদে যাবে না আমাদের সঙ্গে?'

মন্দিরা চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি গিয়ে কী করব।'

মিহির একটু হেসে বলল, 'রোজ আমি গিয়ে যা করি তা নিশ্চয়ই করবে না। কাজকর্ম করতে হবে না, কাজকর্মের তদারক করতেও হবে না। শুধু দেখবে। শশাঙ্কবাবু কাল বলছিলেন আমি তোমাকে এতদিন দেখাতে পারিনি বলেই তুমি দেখনি। আজ দেখা যাক, সবাই মিলে তোমাকে যদি দেখানো যায়।'

নিরীহ মিহিরের কথাগুলি কি একেবারে অহিংস? না কি তার স্নিগ্ধ শান্ত পত্নীপ্রেমের আড়ালে প্রচ্ছন্ন পরিহাসের শরশয্যা পাতা? সংশয়ক্লিষ্ট শশাঙ্ক ভাবল, তাই যদি হয় তাহলে খাদে নেমেই বা কী হবে? সেখানেও তো পার্শ্বরক্ষী হিসাবে মিহির থাকবে, নিশিবাবু থাকবেন, সেই প্রবীর ছোকরাটিও লেগে থাকবে জোঁকের মত। সেখানেও কি নিরালায় মন্দিরাকে একটি-দুটি কথা বলতে পারবে শশাঙ্ক? শুধু কথা। শুধু ক্ষণিকের নির্জন সান্নিধ্য আর তিলেকের বাক্-বিনিময়। আর কিছু নয়। আর কিছু এখন চাইবার নেই, চাইতে নেই তা শশাঙ্ক জানে। তার জন্যে তাকে নিশিবাবুর মত মোহমুদ্গর আওড়াতে হয় না।

ন'টা বাজতে না বাজতে নিশিবাবু তাগিদ দিতে শুরু করলেন, 'শশাঙ্কবাবু, তৈরি হয়ে নিন। মিহির বলছে দেড় ঘণ্টা দু'ঘণ্টার মধ্যেই আমরা সব সেরে আসতে পারব। সকাল সকাল গিয়ে সকাল সকাল ফিরে আসাই ভালো। তৈরি হয়ে নে মন্দিরা। তোর তো সাজতে-গুজতে আড়াই ঘণ্টা।'

মন্দিরা প্রতিবাদ করে বলল, 'না মামাবাবু, আমার কখনো অত সময় লাগে না। তা ছাড়া নিয়ে যাচ্ছেন তো কয়লার খাদে। সাজবার আবার কী আছে।'

নিশিবাবু বললেন, 'তা ঠিক। বেশি দামি শাড়ি-টাড়ি না পরাই ভালো। আসবি তো কালি-ঝুলি মেখে।'

বেশি সাজল না মন্দিরা। কিন্তু বাসন্তী রঙের শাড়িখানা পরে নিল। এ রঙে শশাঙ্কের মনের রঙ মিশে আছে।

খাদের মুখে ছোট একটি অফিস। দেয়ালে প্রোগ্রেসের চার্ট। হাফ শার্ট পরা, জন তিনেক পূর্ণ বয়স্ক ভদ্রলোক সেখানে বসে গল্প করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে মিহির শশাঙ্কদের পরিচয় করিয়ে দিল। অবতরণের আগে যা যা করণীয় তাও শেষ করল মিহির। ভিজিটরদের খাতায় প্রত্যেকের নাম-ধাম উঠল। কতজন নামছে তাদের সংখ্যা। কখন নামছে ঘণ্টা-মিনিটে তার হিসাব। যদি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে, ভিকটিমদের যেন সনাক্ত করা যায়।

মাথায় হেলমেট, হাতে একখানি করে লাঠি আর একটি করে টর্চ। শশাঙ্ক যেন অভিযাত্রীর দল নিয়ে চলেছে। অভিযান আর অভিসার এক সঙ্গে মেশা। অন্ধকার কেজের মধ্যে সবাই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছে। একটি কোমলাঙ্গী যে তার একান্ত সন্নিহিতা তা অনুভব করতে করতে শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করল, 'এই পাতালপুরীর খাঁচাকে আপনারা কী বলেন মিহিরবাবু?'

অন্ধকারের মধ্যে মিহিরের গলা শোনা গেল, 'ইংরেজীতে কেজ বলা হয়। কুলিরা ডুলি বলে। আমরাও তাদের ভাষাই ব্যবহার করি। আমরাও কুলি ছাড়া আর কি।'

শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কতটা নিচে নামছি!'

মিহির হেসে বলল, 'ঘাবড়াবেন না শশাঙ্কবাবু। আমাদের এই খাদের ডেপথ্ খুব বেশি নয়। মাত্র সাড়ে পাঁচশ ফিট নিচে নামছি আমরা।'

শশাঙ্ক আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না, তার মনে সংশয় গভীর হল। মিহির হঠাৎ ও কথা বলল কেন! ও কি কিছু জানে? ও কি কিছু সন্দেহ করেছে? এই পাতালপুরীতে ওরই তো একান্ত আধিপত্য। ওর কোয়ার্টার থেকে খাদের মুখ পর্যন্ত আসতে আসতে যত কুলি আর কুলির সর্দারের সঙ্গে দেখা হয়েছে, সবাই মিহিরকে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে এসেছে। এখানে মিহিরের প্রতাপ যে কত বেশি তাই দেখাবার জন্যেই সে যেন অতিথিদের ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছা করলে এই অন্ধকারের রাজ্যে যে কোন রকম নির্মম প্রতিশোধ নিতে পারে মিহির। এমন কি জীবন্ত সমাধি দেওয়াও বিচিত্র নয়।

পরমুহূর্তে নিজের বালকোচিত ভীরুতায় শশাঙ্ক নিজেই হাসল। মিহিরের মুখের একটি মাত্র শব্দকে ঘিরে কি অর্থহীন আশঙ্কার জালই না সে বুনে চলেছে। নিশিবাবু সামান্য কিছু অনুমান করে থাকলেও করতে পারেন। কিন্তু মিহির নিশ্চয়ই কিছু জানে না। জানলে কি আর শশাঙ্ককে সে নিজের বাড়িতে ঢুকতে দেয়? ডেকে এনে এমন আদরযত্ন করে? স্বামীকে

সব কথা জানতে দেবে, মন্দিরা নিশ্চয়ই অমন কাঁচা মেয়ে নয়।

ইতিমধ্যে নিশিবাবু কলিয়ারী সম্বন্ধে আরো অনেক জ্ঞান আহরণ করে চলেছেন। সাধারণত এ অঞ্চলের কলিয়ারী কত ফিট গভীর, মাসে গড়ে কত কয়লা ওঠে, এই ডুলিতে করে দৈনিক কত কুলি ওঠা-নামা করে, নিশিবাবুর তথ্যান্বেষণের শেষ নেই।

নিচে গ্যালারিতে নেমেও তাঁর সেই অন্বেষণ সমানে চলতে লাগল।

কে ওভার ম্যান, কে সর্দার, কার পদগৌরব বেশি, কার কম, কার কি কাজ সব জানা চাই নিশিবাবুর।

খানিক এগিয়ে যেতে প্রবীরও দলের সঙ্গে এসে যোগ দিল। হেসে বলল, 'এই যে আপনারা সব এসে পড়েছেন। কেমন লাগছে? রাজকন্যার এই পাতালপুরী কেমন লাগছে!'

প্রবীর মন্দিরার দিকে তাকাল।

মন্দিরা কোন জবাব দিল না।

তার হয়ে শশাঙ্ক বলল, 'সে তো তুমি বলবে। অন্য দিনের তুলনায় পাতালপুরী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কিনা সে তো তোমাদেরই আগে চোখে পড়বার কথা।'

মিহির এসব রসিকতার মধ্যে গেল না। প্রবীরকে দেখে শশাঙ্কের দুর্বোধ্য ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, 'ব্লাস্টিং এফিশিয়েন্সি কি রকম বাড়ছে প্রবীর?'

প্রবীর বলল, 'আর বলেন কেন মিহিরদা? এরা না করে ডিরেক্ট ইনিসিয়েসন না করে ইনভার্স ইনিসিয়েশন।'

মিহির একজন সট ফায়ারারকে বলল, 'সাহেবের কথা অনুযায়ী কাজ করবে।'

লোকটি ঘাড় নেড়ে বলল, 'জরুর।'

নিশিবাবু বললেন, 'ডিরেক্ট ইনিসিয়েশন কাকে বলে?'

কিন্তু শশাঙ্কের কান সেদিকে নেই। সে আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছে মন্দিরা ক্রমেই পিছিয়ে পড়েছে। তার পা যেন চলছে না। তাই শশাঙ্ককে থামতে হল, অপেক্ষা করতে হল মন্দিরার জন্যে। খানিকবাদে আবার তারা এসে দলের সঙ্গে যোগ দিল।

মিহির কয়েকবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়েওছে। তারপর এক সময় সেও পিছনের দিকে তাকানো বন্ধ করল। বৃদ্ধ নিশিবাবুর কৌতূহল মিটানো ছাড়া তার যেন অন্য কাজ নেই। নাকি শেষ পর্যন্ত মিহিরও শশাঙ্ক আর মন্দিরাকে কথা বলবার সুযোগ দিয়ে এগিয়ে গেল। ওরা যখন কথা বলতেই এসেছে বলে নিক। মন্দিরার সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে শশাঙ্কের এবার একটু লজ্জা হল। তার এগিয়ে যাওয়া উচিত। একটি তরুণী নারীর ক্ষণসান্নিধ্যের চেয়ে তার আত্মসম্মান এবং অন্য সঙ্গীদের চোখে শ্রদ্ধা আর

বিশ্বাস অনেক বড়। একথা মনে মনে ভাবল শশাঙ্ক, কিন্তু ভাবাই সার। কিছুতেই এগিয়ে যেতে পারল না, কিসের এক আকর্ষণ তাকে কেবলি পিছনে টানতে লাগল।

যে কুলির সর্দার মিহিরের সঙ্গে সঙ্গে আসছিল তাদের মিহির বিদায় দিল : 'যাও, তুমি তোমার কাজ করো গিয়ে। ভিজিটারদের আমিই সব দেখাতে পারব। তোমাদের সঙ্গে থাকবার দরকার নেই।'

প্রবীর কিছুক্ষণ শশাঙ্ক আর মন্দিরার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল, কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে মিহির তাকেও নিজের পাশে ডেকে নিল।

শশাঙ্ক বুঝতে পারল সবাই তাকে সুযোগ দিচ্ছে। কথা বলবার সুযোগ। কেউ দয়ায় কেউ সৌজন্যে কেউ বা স্নিগ্ধ কৌতুকের হাসিতে। শশাঙ্ক যখন কথা বলতেই চায়, প্রাণভরে কথা বলুক। কেউ আটকাবে না, কেউ বাধা দেবে না।

কিন্তু এই পাতালপুরীর পথে শশাঙ্ক তার সঙ্গিনীকে নিয়ে শুধু নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে। তার মুখে কোন কথা নেই। এত কথা সে বলতে পারে, এত কথা তার বলবার আছে কিন্তু এই মুহূর্তে একটিও উপযুক্ত শব্দ তার মুখ ফুটে বেরোচ্ছে না।

পথ অন্ধকার নয়। গ্যালারির যেখানে যেখানে কাজ হচ্ছে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে সেখানে। কুলিরা সাবল দিয়ে নিরুদ্বেগে কয়লা কেটে চলেছে। তাদের কারো মনে ধরা পড়বার ভয় নেই। অপমানের ভয় নেই, ব্যঙ্গবিদ্রূপে বিদ্ধ হবার ভয় নেই। কোথাও বা ওয়াগনে কয়লা বোঝাই হচ্ছে। রেল-লাইনের মত সরু লাইন পাতা। সবাই কর্মব্যস্ত। স্বকর্মে মগ্ন। সবাই নির্ভয় নিঃশঙ্ক। কিসের একটা অজ্ঞাত ভয়ে শুধু শশাঙ্কেরই বুক দুরুদুরু করছে।

সামনে খানিকটা জল। পাশ কাটিয়ে সেটুকু পার হল শশাঙ্ক। হাত ধরে মন্দিরাকে পার হতে সাহায্যও করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অগ্রবর্তী দল অদৃশ্য হল।

মন্দিরাকে পাশে নিয়ে আরো খানিকক্ষণ হেঁটে চলল শশাঙ্ক। তারপর হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে এক সময় জিজ্ঞাসা করল, 'এ কি, আমরা এ কোথায় এলাম? এদিকে তো কোন পথ নেই।'

মন্দিরা শঙ্কিতস্বরে বলল, 'না, পথ তো দেখছিনে।'

'ওঁরা কোন পথে গেলেন?'

'কী করে বলব? অনেকক্ষণ ধরেই মনে হয় আমরা অন্যপথে হাঁটছি।'

শশাঙ্ক লক্ষ্য করল, খাদের এদিকটায় কোন আলো নেই, লোকজনের সাড়া নেই, এদিকে কাজকর্ম সব বন্ধ। আর এখানে সেখানে খানিকটা করে জল জমে রয়েছে।

হঠাৎ তার খেয়াল হল পথ হারিয়ে নিশ্চয়ই তারা কোন নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়েছে। কে জানে এখান থেকে বিষাক্ত গ্যাস বেরোবে কিনা, কি ছাদ ধসে পড়বে মাথার ওপর! সম্বলের মধ্যে একটি টর্চ আর একখানি লাঠি। কিন্তু এই পুঞ্জ পুঞ্জ কয়লার স্তূপ, পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের মধ্যে আত্মরক্ষার জন্যে ওই এক ফোঁটা আলো, এক ছিটে প্রহরণ সত্যিই কোন কাজে আসবে?

শশাঙ্ক বলল, 'মন্দিরা, এ আমরা কোথায় এলাম? এখান থেকে বেরোব কী করে? সামনে দেখছি কিসের একটা বেড়া? বোধ হয় ওদিকটা আরো ডেনজার জোন। চল ফিরে যাই। যেদিক দিয়ে এসেছিলাম সেদিক দিয়ে বেরোতে চেষ্টা করি।'

মন্দিরা বলল, 'কী হবে ফিরে?'

'কী হবে ফিরে মানে?'

মন্দিরা একটু হাসল, 'ফিরে যে কী হবে আপনি কি তা জানেন না? আপনি ফিরে যান। আপনার প্রাণের দাম আছে। আমার কোন দাম নেই। আমি ফিরে যাবার জন্যে আসিনি।'

শশাঙ্ক গভীর আবেগে বলল, 'মন্দিরা, তোমাকে ফেলে আমি নিজের প্রাণ নিয়ে পালাব একথা তুমি ভাবতে পারলে কী করে?'

'তুমি সব পারো। তোমার মত নিষ্ঠুর আর কেউ নেই।'

বলতে বলতে মন্দিরা সেই নিষ্ঠুর নির্মম পুরুষটিকে পরম ভয়ে পরম সোহাগে গভীর আবেগে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল।

আর হাতের টর্চ নিবিয়ে সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে এক অজ্ঞাত আতঙ্ক বুকে নিয়ে শঙ্কিতা নারীকে চুম্বন করল শশাঙ্ক। এর আগে দিনের আলোয়, চাঁদের আলোয়, কখনো পোষমানা বিদ্যুতের আলোয়, প্রদোষের অস্ফুট আলো-আঁধারে নারীর অধর-চুম্বনের অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। কিন্তু পায়ের নিচে অশুচি, অস্বস্তিকর ক্ষীণ জলস্রোত, মাথার ওপরে কয়লার স্তূপ ভেঙে পড়বার আশঙ্কা নিয়ে ঈষৎ মৃত্যুভয়ের অন্ধকারে চুম্বন এই প্রথম। শশাঙ্কের মনে হল, এই শেষ।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিল শশাঙ্ক। তারপর শক্ত করে মন্দিরার হাত নিজের মুঠির মধ্যে ধরে নিয়ে বলল, 'চল যেভাবেই পারি এখান থেকে বেরোতে হবে।'

কিন্তু বেরোতে হবে বললেই সহজে বেরোন যায় না। এই পাতাল-পুরীর অলিগলি তার চেনা নেই। তাছাড়া শশাঙ্ক ভয়ও পেয়েছে। সে ভয় বালকের ভয়, শিশুর ভয়। অজ্ঞতা অনভিজ্ঞতা অপরিচয়ের আতঙ্ক।

ঘুরে ঘুরে পরিশ্রান্ত শশাঙ্ক শেষে বলল, 'মন্দিরা, এই অন্ধকার গোলক-ধাঁধা থেকে আমরা নিজেরা বোধ হয় কখনোই বেরোতে পারব না। ওদের কাউকে ডাকি।'

মন্দিরা বলল, 'না না, ডেকে কাজ নেই। যেভাবে পারি আমরা নিজেরাই বেরোব। আর যদি না পারি তাতেই বা কি। দুজনে তো আছি।'

কিন্তু শশাঙ্ক তার নিষেধ না শুনে মিহিরের নাম ধরে ডাকতে লাগল। কিছুক্ষণ আগে যার ওপর সে পরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, পরিত্রাতা হিসাবে তাকেই বার বার আহ্বান করতে তার কিছুমাত্র সংকোচ হল না।

খানিকবাদে মানুষের সাড়া মিলল। অবাঙালী কুলিদের গলাও যে এত মধুর, শশাঙ্ক তা এর আগে শোনেনি।

আরো কিছুক্ষণ বাদে দলবল নিয়ে মিহির এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। সে দলে নিশিবাবু আছেন, প্রবীর আছে, কুলিরা আছে। হাফপ্যাণ্ট পরা অপরিচিত আরো দু'তিনজন বাঙালী ভদ্রলোকেরও দেখা মিলল। প্রত্যেকের হাতে টর্চ আর লাঠি।

মুহূর্তের জন্যে যেন ভ্রম হল শশাঙ্কের। এরা কি তাদের উদ্ধার করতে এসেছে না পলাতক আসামীদের বেঁধে নিতে এসেছে?

নিশিবাবু বললেন, 'আশ্চর্য দিশেহারা মানুষ মশাই আপনি। কী করে পথ হারালেন বলুন তো। আমরা তো ভেবে অস্থির। খুঁজে খুঁজে হয়রান।'

মিহির বলল, 'মামাবাবু, চলুন এবার আমাদের ওপরে উঠতে হবে।'

শশাঙ্ক লক্ষ্য করল, তার মুখ কয়লার মত কালো, পাথরের মত কঠিন।

শশাঙ্ক টর্চের আলোয় ঘড়ি দেখল।

মাত্র আধ ঘণ্টা তারা বিভ্রান্তভাবে ঘুরেছে। কিন্তু এই তমিস্রার রাজ্যে প্রতিটি মিনিটকে মনে হচ্ছিল এক একটি যুগ। সময়কে মনে হচ্ছিল অন্তহীন।

নিশিবাবু এবার আর মন্দিরাকে পিছনে থাকতে দিলেন না। কাছে ডেকে নিয়ে তার পিঠে হাত রাখলেন। তারপর মিহিরের পিছনে পিছনে এগোতে লাগলেন।

॥ ১৭ ॥

খাদের মধ্যে মিহিরের মুখে যে কাঠিন্য আর গাম্ভীর্য লক্ষ্য করেছিল শশাঙ্ক, উপরে উঠেও তার কোন পরিবর্তন হল না। শশাঙ্ক লক্ষ্য করল মিহির যেন আরো মিতভাষী আরো গম্ভীর হয়ে উঠল। যা দু-একটা কথা বলল সবই নিশিবাবুর সঙ্গে। মন্দিরার সঙ্গে তার যেন কোন সম্পর্ক নেই শশাঙ্ক যেন অপরিচিত।

নিশিবাবু তিনজনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন মন্দিরাকে বললেন, 'তুই তো আচ্ছা বোকা মেয়ে। আমরা বলি কানা গরুর জোলা পথ। তুই কী করে অমন ভিন্ন একটা গ্যালারির মধ্যে ঢুকে পড়লি?'

শশাঙ্ক ভাবল, নিশিবাবু কলিয়ারীর পরিভাষাও কিছু কিছু আয়ত্ত করে ফেলেছেন।

মন্দিরা বলল, 'কী করব বলুন। আপনারা তিনজনে গল্প করতে করতে কোথায় চলে গেলেন। খানিক বাদেই দেখি আপনারা কেউ নেই। তখন আমরা—শশাঙ্ক লক্ষ্য করল মিহির মন্দিরার দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল; একটু যেন হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। কিন্তু আশ্চর্য সংযম। মুখ ফুটে একটি কথাও বলল না মিহির। কিন্তু সে যে স্ত্রীর কোন কথা বিশ্বাস করেনি তার হাসিতে দৃষ্টিতে তা অপরিস্ফুট রইল না।

শশাঙ্ককে কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করেনি। তবু সে নিজেই একটু হেসে বলল, 'সত্যি মিহিরবাবু, আপনাদের দেখতে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে অদ্ভুত এক জায়গায় গিয়ে পড়েছিলাম। সেখানে একেবারেই নিখোঁজ হয়ে যেতে পারতাম।'

মিহির বলল, 'বেড়াতে যাবার পক্ষে জায়গাটা খুব ভালো বাছাই করেননি। বিপদ আপদ ঘটতে পারত। ওখানকার ডিপিলারিং হয়ে গেছে। রুফটা খুব নরম। যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারত। বেড়াটা কেন ডিঙাতে গেলেন?'

এবার একটু কঠিন ধমক লাগাল মিহির। টেকনিক্যাল ভুলের জন্য ধমক। কুপথ্য খেলে ডাক্তার যেমন রোগীকে ধমকান, মক্কেলের মূঢ়তায় উকিল যেমন মক্কেলকে ধমকান, অনেকটা সেই ধরনের ধমক। এর সঙ্গে মিহিরের যেন কোন স্বার্থসম্বন্ধ নেই।

শশাঙ্ক বলল, 'বেড়া তো ছিল না।'

মিহির বলল, 'নিশ্চয়ই ছিল। না থেকেই পারে না।'

শশাঙ্ক মিহিরের রূঢ়তা হজম করে নিয়ে বলল, 'আমি তা হলে লক্ষ্য করিনি।'

নিশিবাবু একটু হেসে বললেন, 'তা নাও করতে পারেন। মাঝে মাঝে আপনার অমন লক্ষ্য না করবার, দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাবার অভ্যাস আছে শশাঙ্কবাবু। অভ্যাসটা ভালো নয়। এতে শুধু যে নিজেরই ঘোরতর অনিষ্ট হয় তা নয়, আপনি আরো অনেকের অনিষ্টের নিমিত্তের ভাগী হতে পারেন। এই ধরুন না, কলিয়ারীর মধ্যে যদি একটা বিপদ আপদ হয়ে যেত—। অবশ্য হয়নি কিছুই ভগবান রক্ষা করেছেন। কিন্তু বলা তো যায় না, তাই একটু সতর্ক সাবধান মত চলাফেরা করতে হয়। বিশেষ করে অজানা অচেনা জায়গায় এসে। আমি তো মশাই গাইড ছাড়া এক-পাও নড়িনে।' তারপর তিনি হেসে মন্দিরার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি মেয়ে তো মোটেই বুদ্ধিমতীর কাজ করনি। আমাদের এমন একজন expert guide থাকতে তুমি আনাড়ী লোকের পিছনে পিছনে হাঁটছিলে।'

মন্দিরা চুপ করে রইল। শশাঙ্কও কোন জবাব দিল না। সত্যিই সে ভারি আনাড়ীর পরিচয় দিয়েছে। বিপদে পড়ে বীরের মত ব্যবহার করা তার উচিত ছিল। কিন্তু তা সে করতে পারেনি। বক্ষে লগ্না নারীকে সে পূর্ণবয়স্ক পুরুষের মত উপভোগ করতে পারেনি। বালকের মত মৃত্যুভয়ে ছুটোছুটি করেছে। জান্তব প্যাশন আর জান্তব প্রাণভয় একই সঙ্গে তাকে আক্রমণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত ভয়ের কাছে প্যাশন হার মানল। সত্যি সত্যি যদি মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করতে পারত তা হলে দীর্ঘকাল পরে একটি দুর্লভ নিষিদ্ধ চুম্বনের স্বাদ কী অপরূপই না হয়ে উঠত!

কিন্তু অধরসুধা আস্বাদনে শুধু কি মৃত্যুভয়ই তাকে বাধা দিয়েছে? শুধু জৈব জান্তব ভয়?

শশাঙ্কের মন এ কল্পনায় তৃপ্ত হল না। এর পিছনে কিছু সৌন্দর্যবোধ নীতিবোধের অস্তিত্ব কল্পনা করে সে খুশী হল।

প্রবীর ওপরে আসেনি। ডিউটি শেষ হয়নি বলে খাদেই রয়ে গেছে।

সারাটা পথ মিহির গম্ভীর হয়ে ছিল। বাড়িতে পৌঁছেও তার সেই গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন হল না।

শম্ভুকে একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে, তোর রান্নাবান্না হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ বাবু। সব রেঁধেছি।'

মিহির একটু হাসল, 'তুই তো একেবারে গ্রান্ড হোটেলের বাবুর্চি।'

তারপর শশাঙ্কের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল—'আপনার আজ খেতে-টেতে অসুবিধে হবে শশাঙ্কবাবু।'

'কেন বলুন তো।'

'আমাদের শম্ভুর হাতের রান্না তো। শম্ভু, এক কাজ করো। ওঁকে তেল-গামছা এনে দাও। ওঁর আবার খেয়েদেয়ে তাড়াতাড়ি আসানসোল যেতে হবে। ওঁর এক বন্ধুর সঙ্গে জরুরী অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।'

শশাঙ্কের মোটেই তাড়া ছিল না। কিন্তু তাকে অপমান করবার মিহিরের এ যে একটা বিশেষ ভঙ্গি তা তার বুঝতে দেরি হল না। একমুহূর্ত সে স্তব্ধ হয়ে রইল। পরমুহূর্তে সে নিজের মনেই হাসল। নিরীহ অসহায় স্বামীর এই ক্ষীণ প্রতিশোধস্পৃহাকে উপেক্ষা করাই ভালো।

শশাঙ্ক মুখে একটু হাসি টেনে নিশিবাবুর দিকে চেয়ে বলল, 'মিহির-বাবুর স্মরণশক্তি কিন্তু বেশ প্রখর। আমার অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের কথা তিনি মনে করে রেখেছেন।'

মিহির বলল, 'কেন, আপনি কি ভুলে গিয়েছিলেন নাকি? অবশ্য আপনার যদি দেরি করে গেলে চলে আমাদের আর আপত্তি কি! তা হলে বসুন, গল্প-টল্প করুন। এমন তো কিছু বেলা হয়নি।'

শশাঙ্ক বলল, 'না না, আমি চলেই যাই।'

একবার ভাবল, স্নানাহার না করেই এখান থেকে বিদায় নেবে শশাঙ্ক। কিন্তু তা হলে বড় বেশি বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া একটি দুর্বল নাটকীয় দৃশ্য উপস্থাপিত করে কোন লাভ নেই।

শশাঙ্ক বলল, 'তা হলে আপনিও তৈরি হয়ে নিন, নিশিবাবু। স্নান-টান সেরে নিয়ে—'

মিহির বলল, 'মামাবাবু একটু পরে তৈরি হলেও পারবেন শশাঙ্কবাবু। ওঁর তো আর অ্যাপয়েন্টমেণ্ট রাখবার তাগিদ নেই। উনি না হয় দু-একটা দিন পরেই যাবেন। আপনার কোন অসুবিধে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমাদের কোম্পানীর গাড়ি আপনাকে আসানসোলে পৌঁছে দেবে। যদি বলেন, আপনার বন্ধুর বাড়ি পর্যন্ত যাবে, আর যদি যেতে যেতে মত বদলান তা হলে স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাবে। ড্রাইভারকে সবই বলা আছে।'

মন্দিরা আড়াল থেকে সবই শুনছিল। এবার সামনে এসে দাঁড়াল। স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'ওঁর যে এত তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার তা কি উনি তোমার কাছে বলেছেন!'

তার এই সাহস দেখে খুশী হল শশাঙ্ক। তার পক্ষে বলবার মত অন্তত একজন এখানে আছে। আর সে-ই তো সব। সেই তো জয়শ্রী।

মিহির স্ত্রীর দিকে একবার স্থির কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু একটু পরেই হেসে মৃদু স্বরে বলল, 'বলেছেন বৈকি মন্দিরা। না বললে কি আমি অনর্থক এত তোড়জোড় করছি। আমি তো আর যাব না, শশাঙ্কবাবুই যাবেন। ইচ্ছে করলে তুমি অবশ্য স্টেশন পর্যন্ত ওঁকে এগিয়েও দিয়ে আসতে পার। কিন্তু যাওয়াটা যখন ওঁর একান্তই দরকার, না গেলে যখন ওঁর ক্ষতির আশঙ্কা আছে, তুমি ওঁকে কী করে আটকে রাখবে বলো।'

নিশিবাবু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার মিহিরের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'কী যে ছেলেমানুষি তোমরা কর মিহির। এর আবার আটকা-আটকির কী আছে। শশাঙ্কবাবুর যখন ইচ্ছে তখন আসবেন, যখন যেতে হয় তখন যাবেন। যা মন্দিরা ভিতরে যা। গিয়ে খাবার-দাবার ব্যবস্থা কর। আমিও মাথায় একঘটি জল ঢেলে নিয়ে শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে দুটো খেয়ে নিই।' তারপর মন্দিরার দিকে চেয়ে বললেন, 'এক পশলা বুঝি এর মধ্যে তোদের হয়ে গেল। দাম্পত্য কলহটা অবশ্য মধুর। শাস্ত্রে বলে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। কিন্তু আমরা দু-দুজন গুরুজন বসে আছি। আমাদের সামনে একটু লজ্জা শরম-টরম দেখাবি, তা নয় তো একেবারে রণরঙ্গিনী মূর্তি। ফের যদি আদব-কায়দায় ত্রুটি দেখি, তোমাকে আচ্ছা করে বকুনি লাগাব মেয়ে। তা কিন্তু বলে রাখছি। যাও ভিতরে যাও এবার।'

নিতান্তই সীন ক্রিয়েট করবে না বলে শশাঙ্ককে স্নান করতেও হল, কিছু খেয়ে নিতেও হল। যদিও মন্দিরাই পরিবেশন করছিল, আর নিশিবাবুও তার

পাশে খেতে বসেছিলেন, কিন্তু খাবার রুচি তার আর ছিল না। আজ আর মিহির তাদের সংগে খেতে বসেনি, স্নানও করেনি। অন্য কাজ আছে বলে শশাঙ্কদের খাওয়ার সময় সে একটু দূরেই সরে রইল।

নিশিবাবু বললেন, 'এ কি মশাই, সবই যে পাতে ফেলে রাখলেন। কিছুই খেলেন না।'

শম্ভু কাছেই ছিল। সে একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'রান্নাবান্না কি ভালো হয়নি বাবু? নুন ঝাল ঠিক হয়নি?'

শশাঙ্ক মুখ তুলে বলল, 'না না, বেশ হয়েছে। চমৎকার হয়েছে।'

খাওয়া-দাওয়ার পর নিশিবাবু শশাঙ্ককে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন, 'ওরা আমাকে আজ যেতে দিতে চাইছে না। তা ছাড়া আমি নিজেও ভেবেছি একটু ঘুরেটুরে যাব। একবার পথে বেরিয়ে পড়লে সহজে ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করে না। এই জন্যেই বুঝি কপালে ঘর-টর কিছু জুটল না। ভেবেছিলুম দুজনে একসংগে এসেছি আবার একসংগেই ফিরব। কিন্তু হয়ে গেল অন্য-রকম। কলকাতায় গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ হবে।'

শশাঙ্ক বলল, 'নিশ্চয়ই। আপনি যাবেন আমার ওখানে।'

নিশিবাবু বললেন, 'সে আপনি বললেও যাব, না বললেও যাব। আমার স্বভাবই ওই মশাই। একবার আলাপ-পরিচয় হয়ে গেলে চিনে জোঁকের মত লেগে থাকি। সহজে সংগ ছাড়িনে।'

শশাঙ্ক এ কথার উত্তরে কোন কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করল।

একটু চুপ করে থেকে নিশিবাবু ফের হাসলেন, 'মিহির বাবাজী একটু চটেছে বলে মনে হচ্ছে। যতই ধীর স্থির ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ হোক, বয়সের ধর্ম যাবে কোথায়। যতই বলুন, ও বয়সে রক্ত একটু গরম হয়ই। যাকগে, আমি ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে রেখে যাব।'

তারপর একটু হেসে নিশিবাবু বললেন, 'ছেলে-ছোকরা মানুষ। ওদের মনে যাতে খটকা লাগে, যাতে কোন অশান্তি হয় এমন কিছু আমাদের করা উচিত নয়।'

এবার শশাঙ্ক আত্মরক্ষার জন্যে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। 'আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছিনে। অশান্তি আসবে কেন।'

নিশিবাবু একমুহূর্ত যেন অবাক হয়ে শশাঙ্কের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, 'না এলেই ভালো শশাঙ্কবাবু, না এলেই ভালো। ভগবান যেন আমাকে কোন অনর্থ অঘটনের নিমিত্তের ভাগী না করেন। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনাদের সবাইর মঙ্গল হোক, আপনারা সবাই সুখে-শান্তিতে থাকুন তাই আমি চাই।'

অস্থানে অসময়ে বন্ধুর মুখের এই মঙ্গল-কামনা শশাঙ্কের ভালো লাগল না। ফেরার পথে নিশিবাবু যে তাঁর সংগী থাকবেন না এ কথা ভেবে

শশাঙ্ক যেন একটু তৃপ্তিই বোধ করল। এই বুড়ো ভদ্রলোক সারাটা পথ তাকে উপদেশ দিতে দিতে চলতেন তা মোটেই সহনীয় হতো না শশাঙ্কের।

বিদায় নেওয়ার আগে মন্দিরা আর একবারের জন্যে শশাঙ্কের সামনে এল। একবার চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। তারপর মৃদু স্বরে বলল, 'গিয়ে চিঠি দেবেন তো?'

শশাঙ্ক বলল, 'দেবো।'

তারপর মিহিরের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, 'চিঠিপত্র দিলে জবাব দেবেন মিহিরবাবু।'

এইবার মিহিরের অবাক হবার পালা। তাকে নিরুত্তর দেখে শশাঙ্ক ফের একটু হাসল, 'আপনার আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ।'

মিহির শুকনো মুখে বলল, 'ওসব থাক।'

শশাঙ্ক বলল, 'না না, ওসব বাদ দিলে অনুষ্ঠানের অঙ্গহানি হবে। আর একটি কথা। কলকাতায় গিয়ে দয়া করে একবার রিটার্ন ভিজিট দেবেন। সস্ত্রীক গেলে খুবই খুশী হব। আমরা অবশ্য আপনার মত এমন রাজকীয় অভ্যর্থনা করতে পারব না। গরীব মানুষ। তবে সাধ্যমত আদরযত্নের ত্রুটি হবে না। যাবেন কিন্তু। ড্রাইভার তৈরী!'

'হাঁ বাবু।'

শম্ভু আগেই স্যুটকেস আর বিছানা তুলে দিয়েছিল। তার হাতে বকশিশ হিসাবে একখানা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে শশাঙ্ক সদর্পে গাড়িতে উঠল। গাড়িখানা যেন মিহিরের কোম্পানীর নয়, শশাঙ্কের নিজেরই।

পিছনের সীটে হেলান দিয়ে এবার বেশ একটু আরাম করে বসল শশাঙ্ক। গায়ের জ্বালা এবার খানিকটা মিটেছে। সে যে নিরীহ আশ্রমমৃগ নয়, অপমানের উত্তরে সে যে অপমান করতে জানে, আঘাতের উত্তরে প্রত্যাঘাত করতে সে যে অশক্ত নয়, তার প্রমাণ সে দিয়ে আসতে পেরেছে। এই দেমাকটুকু না দেখিয়ে এলে মন্দিরার কাছে তার মান থাকত না। শশাঙ্ক নিজের মনেই একটু হাসল।

আসানসোলে বন্ধুর বাড়িতে শেষ পর্যন্ত গেল না শশাঙ্ক। গেলে অবশ্য খানিকক্ষণ গল্পটল্প করতে পারত। সুরেশ তার অনেকদিনের বন্ধু। দেখা হলে নিশ্চয়ই আদর যত্ন করে বাড়িতে ডেকে নিত। তার অভ্যর্থনার মধ্যে নিশ্চয়ই শ্লেষ ব্যঙ্গের মিশ্রণ থাকত না। কিন্তু এই পথটুকু একা একা আসতে আসতে শশাঙ্ক ফের বিমনা হয়ে পড়ল। বন্ধুর বাড়িতে যাওয়ার উৎসাহ ক্ষীণ হয়ে এল। সোজা স্টেশনে গিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনেই উঠে বসল শশাঙ্ক। পালাতে পারলে যেন বাঁচে। কলকাতায় পেঁছিতে পারলে যেন বেঁচে যায়। কলিয়ারীতে যা কিছু ঘটে গেল তা যেন তার ইচ্ছা ছিল না। ফের মন্দিরার সঙ্গে এমন করে জড়িয়ে পড়া যেন তার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে ছিল। শশাঙ্ক

শুধু মন্দিরাকে একবার দেখতে এসেছিল। আরো কেন ঘনিষ্ঠ হতে গেল? অবশ্য শশাঙ্ক যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। মন্দিরা তাকে এখনো ভালোবাসে, মন্দিরা তার জন্যে যে কোন কিছু করতে রাজি আছে তার প্রমাণ পেয়েছে শশাঙ্ক। এই পারস্পরিকতার এক তীব্র সুখ আছে। কোন কোন সময় মনে হয়, এই সুখের জন্যে বুঝি সব দেওয়া যায়। এই প্রাপ্তির জন্যে যেন সব ছেড়ে দেওয়া চলে। কিন্তু তা যে চলে না, খানিক বাদেই তা বোঝা যায়। যা চেয়েছিল শশাঙ্ক তা পাওয়ার পর অপ্রাপ্ত অন্য বস্তুর গুরুত্ব বড় হয়ে ওঠে। তখন মনে হয় শ্রদ্ধা বড়, বিশ্বাস বড়; মানুষের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক বন্ধুত্ব আরো বেশি প্রার্থনার যোগ্য। শশাঙ্কের মনে হল, নিশিবাবু যেটুকু অনুমান করেছেন তাতে তাকে আগের মত শ্রদ্ধা আর প্রীতির চোখে না দেখাই তার পক্ষে সম্ভব। শ্লেষের উত্তরে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করে মিহিরকে যতই সে মূক করে রেখে আসুক, শশাঙ্কের ওপর সে চিরদিন বিদ্বিষ্ট হয়ে থাকবে। কোনদিনই হয়তো তার সঙ্গে সৌখ্য সদ্ভাব আর প্রতিষ্ঠিত হবে না। যে অপমানের ভিতর দিয়ে মিহিরের বাড়ি থেকে শশাঙ্ককে বিদায় নিতে হয়েছে তা কি কখনোই সে ভুলতে পারবে? কিন্তু অন্যরকমও হতে পারত। শশাঙ্ক যদি নিজেকে নির্লোভ নিরাসক্ত রাখতে পারত তা হলে মিহিরকেও সে বন্ধু হিসাবে পেত। যে শ্রদ্ধা যে সম্মান নিশিবাবু মিহিরের কাছ থেকে পেয়েছেন, শশাঙ্কও সেই গৌরবের ভাগী হতো। কিন্তু একটু সান্নিধ্য, একটি চুম্বনের জন্যে শশাঙ্ক সেই সম্মানিত আসন ত্যাগ করে এসেছে।

এখন আর এই অনুশোচনার কোন মানে হয় না। এতে তার অস্বস্তি বাড়বে। এই অনুতাপ তার দৈনন্দিন কাজকে পণ্ড করবে, অস্তিত্বকে অসহনীয় করে তুলবে। তার চেয়ে মীরপুর কলিয়ারীর কথা একেবারে ভুলে যাওয়া ভালো। অবাঞ্ছিত কিছুই ঘটেনি তেমন মনে করতে পারলেই অনেক অঘটনকে জীবন থেকে মুছে ফেলা যায়।

কলকাতায় এসে শশাঙ্ক ঠিক আগের মানুষ হয়ে গেল। ছুটি ফুরাবার আগেই জয়েন করল কলেজে। সহকর্মী বন্ধু প্রণব হেসে বলল, 'একি, তুমি যে এত তাড়াতাড়ি চলে এলে! ছুটি ফুরোবার আগে কলেজে আসা কোনদিন তো তোমার কুষ্ঠীতে লেখে না। তুমি বরং এক সপ্তাহ ছুটি নিলে আরো এক সপ্তাহ ফাউ নাও।'

শশাঙ্ক বলল, 'তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করব ভেবেছি। দেখি তোমাদের মত কর্মবীর হতে পারি কিনা।'

প্রণব বলল, 'ঠাট্টা করা হচ্ছে। ইচ্ছা করলে তুমি অনেক কিছু করতে পার। এ কথা এখনো বলি শশাঙ্ক। বন্ধুদের মধ্যে তোমাকে নিয়ে যখন আলোচনা হয় আমরা প্রায়ই বলাবলি করি।'

'কী বলো!'

'বলি, শশাঙ্ক তার সমস্ত গুণ-যোগ্যতা যেন একটিমাত্র লক্ষ্যের জন্যে উৎসর্গ করে রেখেছে। শুধু নারী নারী আর নারী। শশাঙ্ক যদি অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দিত, তার উদ্যম সামর্থ্যকে অন্য কাজে লাগাত, সে যা হয়েছে তার চেয়ে বড় কিছু হতে পারত।'

এর আগে এসব হিতোপদেশকে শশাঙ্ক হেসে উড়িয়ে দিত। আজকাল আর তা পারে না। গম্ভীর হয়ে ভাবে, হিসাব করতে চেষ্টা করে, এই বহু-কামিতা তাকে কী দিয়েছে, কোন সম্পদই বা ছিনিয়ে নিয়েছে। অবশ্য তার বিশেষ একটি প্রবণতার সঙ্গে প্রণবরা যে তাকে অভিন্ন করে দেখে তাতে শশাঙ্কের সায় নেই। তার আরো অনেক আকাঙ্ক্ষা আছে, আর সেই সব আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টাও আছে। যেমন সাধারণ পাঁচজনের থাকে। কোন কি কৃতিত্বে তার সেই অপরিস্ফুট ইচ্ছা হয়তো তেমন রূপ নিতে পারেনি। ক'জনেই বা পারে? পারেনি বলেই বন্ধুরা তাকে একটি আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার কম বেশি একটি সাফল্যের সঙ্গে শশাঙ্ককে এক করে দেখে। শশাঙ্ক নিজেও অনেক সময় বন্ধুদের সেই সমালোচনার চোখ ধার দেয়, তাদের দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে বিচার করে। অথচ শশাঙ্ক ভিতরে ভিতরে জানে ওরা ভাবে তা ঠিক নয়। শশাঙ্ক তার একটি প্রবৃত্তি মাত্র নয়। সে প্রবৃত্তি -র মধ্যে যতই তীব্র আর উগ্র হোক না, কিন্তু শশাঙ্ক যে শুধু নারী-সঙ্গ-সুখে উৎসুক একটি পুরুষ মাত্র নয়, তার পৌরুষের পরিচয় যে আরো নানা ক্ষেত্রে থাকতে পারে তার প্রমাণ যেন আজও যথাযোগ্যভাবে দেওয়া হয়নি। অথচ দিতে ইচ্ছা করে শশাঙ্কের। অন্তত আর কোন একটি মূল্যে বন্ধুদের চোখে সম্মানিত হতে ইচ্ছা করে। কিন্তু শুধু ইচ্ছা থাকলেই তো হয় না, তার জন্যে নিরলস পরিশ্রম চাই। সাধনা চাই। সেই সাধনার আসন থেকে তাকে কে বার বার ভ্রষ্ট করে? তীব্র মাত্রার যৌন-বাসনা। শশাঙ্ক মাঝে মাঝে স্তব্ধ হয়ে ভাবে।

তার ভাবনার কথা শুনে মুরারিদা হেসে মাথা নাড়েন—'শশাঙ্ক, তুমি উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছ। কাজ করবার সময় কাজ করবে। ফুর্তি করবার সময় ফুর্তি করবে। ভুলেও কখনো অনুতাপ করবে না। জীবনে সাকসেস্‌ফুল হবার এই হল সেরা মন্ত্র।'

মুরারিদার কথা মাঝে মাঝে সঙ্গত মনে হয় শশাঙ্কের। হয়তো সঙ্গতৃষ্ণা নয়, সান্নিধ্যকামনা নয়, শ্রমবিমুখতাই তাকে এমন পঙ্গু করে রেখেছে; তাকে সফল হতে দেয়নি, তাকে পিছনের সারিতে ঠেলে দিয়েছে। নিষ্ক্রিয় শশাঙ্ক যেন আলস্যের সুখ-শয্যায় শায়িত থেকে কর্মবীরের সিদ্ধি পেতে চায়। তা কি কখনো হয়? স্বকর্মে নিষ্ঠার আগ্রহ, অবিচ্ছিন্ন অনলস পরিশ্রমের শক্তি যদি আয়ত্ত করতে পারত শশাঙ্ক তা হলে তার এই ইন্দ্রিয়পরতা সামান্য একটি

মুদ্রাদোষ হয়ে থাকত, কিছুতেই গুণরাশিনাশী মহদ্দোষে পরিণত হতো না। যাকে সে রূপানুভূতি বলে পরিতৃপ্ত হয় সেই রূপসম্ভোগের সঙ্গে নিষ্ক্রিয়তার অলসতার কি কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে? সম্ভোগের মধ্যে কি যথেষ্ট সক্রিয়তা নেই? সৃষ্টির মধ্যে যেমন আছে? সম্ভোগের বাসনা কি শুধু পুরুষের আলস্যের, চিত্তবিনোদনের, অবসর যাপনের শয্যাসঙ্গিনী? তা কি সঙ্গে সঙ্গে কর্মোদ্যম সৃষ্টিশীলতায় রূপান্তরিতাও নয়?

মুরারিমোহন একদিন ফোন করলেন। শশাঙ্কের গলা শুনে উল্লসিত হয়ে বললেন, 'আরে স্বয়ং তুমি যে। আমি ভেবেছিলাম তোমার রামেশ্বর ফোন ধরে বলবে কামেশ্বর এখনো ফেরেননি। ব্যাপার কি মহারাজ! এত তাড়াতাড়ি যে মৃগয়া শেষ করে এলে?'

শশাঙ্ক বলল, 'মৃগয়া আবার কোথায়?'

মুরারিমোহন বললেন 'তোমার ওই এক দোষ। তুমি বড় অসরল বন্ধু। আমি কায়মনোবাক্যে এক। তুমি বিভিন্ন। আমি যা করি কবুল করি, তুমি তা কিছুতেই করতে পার না। এ যাত্রায় কোথায় কোন কীর্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করে এলে বল। আমরা কান খাড়া করে তোমার বীরত্ব গাথা শুনি। শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হই। আমাদের তো শুনেই সুখ।'

শশাঙ্ক বলল, 'শোনাবার মত কিছু হয়নি মুরারিদা। তোমার কথা বল তোমার কাজকর্ম কেমন এগোচ্ছে। তোমার স্ক্রিপট কি শেষ হল? ফ্লোরে কবে যাচ্ছ?'

মুরারিবাবু বললেন, 'এখনো যাই যাই করছি। কিন্তু যেতে পারছি কই। ভালো কথা মনে করিয়ে দিলে। তুমি যে আমাকে কিছু দেবে বলেছিলে তা কি এখন দিতে পারবে? আতুড়ে নিয়মো নাস্তি। এমন অবস্থায় পড়েছি তোমার কাছেও হাত পাততে হল।'

শশাঙ্ক একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা কালই তোমাকে চেক পাঠিয়ে দেব।'

মুরারিবাবু বললেন, 'আহা পাঠাবার কষ্ট কেন করবে। আমিই তো যেতে পারতাম। আর তুমি যদি এই উপলক্ষে দয়া করে আমার স্টুডিয়োতে আর একবার পায়ের ধুলো দাও তাহলে খুবই খুশী হব। কাজকর্ম সেরে বেরিয়ে এসে দুজনে মিলে ঘুরব বেড়াব। দু-এক পাত্র টানব। মুখোমুখি বসে সুখ দুঃখের কথা বলব। এই বয়সে তার চেয়ে বড় সুখ আর কী আছে বলো।'

শশাঙ্ক বন্ধুর আমন্ত্রণ এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'আচ্ছা ওসব সুবিধে মত আর একদিন হবে মুরারিদা। আর একদিন যাব।'

পরদিন শশাঙ্ক দশ হাজার টাকার একখানি ক্রস চেক পাঠিয়ে দিল মুরারিমোহনকে। পাঠিয়ে দিয়ে ভাবল, টাকাটা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত জলেই গেল। মুরারিদা যে অদূর ভবিষ্যতে টাকাটা ফেরত দেবেন এমন আশা শশাঙ্কের

নেই। তব্ কথা যখন দিয়েছে দিতেই হবে। ম্রারিদা তার [illegible] বন্ধ্ নন। খ্ব একটা ঘনিষ্ঠতা শশাঙ্ক যে তাঁর সঙ্গে অন্ভব করে তাও নয়। যে কোন অজ্হাতে অক্ষমতা জানাতে পারত শশাঙ্ক। আর সত্যি সত্যি এক কথায় এত টাকা অনিশ্চিতের গহ্বরে ফেলে দেওয়ার সঙ্গতি তো তার নেই। তব্ বন্ধ্র কাছে প্রতিশ্র্তি ভাঙতে শশাঙ্ক সংকোচ বোধ করল। বেশি বয়সে বন্ধ্র সংখ্যা অমনিতেই ক্ষীণ হয়ে আসে। উত্তাপ মন্দীভূত হয়। শশাঙ্কের বন্ধ্ কোথায়? বরং নিন্দ্কের দল ভারি। বন্ধ্রাও নিন্দ্ক। বন্ধ্রাই বরং বেশি নিন্দ্ক। তার চরিত্রের যে দিকটা সবাইর কাছে নিন্দনীয়, এমন কি যে উপসর্গের জন্যে শশাঙ্ক নিজেও মাঝে মাঝে পীড়িত বোধ করে, চিন্তিত হয়, একমাত্র ম্রারিদাই লঘ্হাস্যে তার সেই চিন্তা দ্র করেন। তিন তুড়িতে সব উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'কিছ্ নয় শশাঙ্ক, ও সব কিছ্ নয়। মাথা ঘামাবার মত বস্তুই ওটা নয়। ও সব একেবারেই জৈব ব্যাপার। যারা ম্র্খ তারা ওই বাহ্যবস্তু নিয়ে খেদ করে, যারা ভণ্ড তারা খেদের ভান করে।'

শশাঙ্ক এসব কথা শ্নতে চায়। শ্নে ভরসা পায়। যেন নিজের কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি শোনে। তাই চড়া দামেও ম্রারিদার বন্ধ্ত্ব শশাঙ্ক কিনে নেয়।

কিন্তু টাকাই পাঠাল। ম্রারিমোহনের সঙ্গে এবার আর দেখা করল না শশাঙ্ক। কথা নয়, শ্ধ্ গল্পগ্জব নয়, এবার কিছ্ কাজ খ্ঁজবার তার ইচ্ছা হয়েছে। কাজ অবশ্য সে করে। পড়ানোটা কি কাজ নয়? যে সম্পত্তিট্কু তার আছে তাতে চাকরি না করলেও তার চলত। কিন্তু খানিকটা সময় শশাঙ্ক কর্মমগ্ন হয়ে থাকতে চায়। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেই মগ্নতার ব্যাপ্তি আর গভীরতা বাড়াবার স্পৃহা জাগে শশাঙ্কের। একমাত্র কাজের ভিতর দিয়েই মান্ষ নিজেকে বিস্মৃত এবং অন্যের কাছে স্মরণীয় হতে পারে।

সংসার চালাবার জন্যে প্রণব মাঝে মাঝে নোটবই লেখে। নিজের বিষয় ছাড়া অন্যের বিষয়েও সে পদচারণা করে, কি করতে বাধ্য হয়। শশাঙ্কের সে দায় নেই। তব্ প্রণব একবার তার একজন প্রকাশকের পক্ষ থেকে অন্রোধ নিয়ে এসেছিল। বাংলা ভাষায় ইংরাজী সাহিত্যের একটি ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস রচনার ফরমায়েশ। এমন বই বাজারে আরো আছে। কিন্তু না হয় আরো একখানা বাড়ল। বলা যায় না প্রতিযোগিতায় শশাঙ্ক জিতেও যেতে পারে। প্রাঞ্জলতায় সরসতায় সে বই যদি ছাত্রদের অভিভাবকদেরও পাঠযোগ্য হয় তাতে প্রকাশকের ডবল লাভ।

কিন্তু শশাঙ্ক সেবার বন্ধ্র প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল। হেসে বলেছিল, 'তুমি মনে মনে পণ করেছ প্রণব, ধরে বেঁধে আমাকে লেখক করবেই। আমারও ধন্র্ভাঙ্গা পণ—কলম ধরব না। যারা জীবনকে ভোগ করতে পারে না তারাই লেখে। ও এক ধরনের পরোক্ষ সম্ভোগ। আমি প্রত্যক্ষ স্খের সন্ধানী।

সেই সুখ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে আহরণ করব। কলম নামক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে আমার দরকার নেই।'

সেই ফিরিয়ে দেওয়া ফরমায়েশী কাজ এখন আর আছে কিনা শশাঙ্ক খোঁজ নিতে গেল না। কিন্তু হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে সেই সহজ-পাঠ্য ইতিহাস রচনার কথাই তুলে নিল। আর কিছুর জন্যে নয়, শুধু সময় কাটাবার জন্যে। সৃষ্টি নয়, সৃষ্টির ভাষ্য নয়, শুধু ইতিবৃত্ত রচনা। এ রচনা যেন তার কৈফিয়ত হিসাবে একটি ভূমিকার প্রয়োজন। সেই ভূমিকা লিখতে গিয়ে বাংলার সাহিত্যে সমাজে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের উৎস সন্ধানে এবং স্বরূপ বর্ণনে প্রবৃত্ত হল শশাঙ্ক। এই প্রবৃত্তি তাকে আনন্দ দিল। এ সন্ধান সহজ নয়। প্রচুর উপকরণ চাই। প্রকরণ সম্বন্ধে মন স্থির করতে পারা চাই। নিষ্ঠা-হীন অস্থিরচিত্ত শশাঙ্কের তাতে সময় লাগল। কিন্তু ভালোও লাগল। নতুন উদ্যমের মধ্যে নতুন জীবনের স্বাদ পেতে লাগল শশাঙ্ক।

দুরন্ত শিশুকে অনেক চেষ্টায় ঘুম পাড়াতে হয়। আর নিজের ঘুমন্ত চিত্তকে যখন বহু সাধ্যসাধনায় কোনরকমে জাগিয়ে তুলেছে শশাঙ্ক, বহু চেষ্টায় কর্মমুখী করেছে—মন্দিরার চিঠি এল ধ্যান ভাঙাতে, ব্রত ভঙ্গ করতে। শশাঙ্ক এসে মন্দিরাকে চিঠি দেয়নি। চিঠি দেওয়া মানেই ফের ধরা দেওয়া। কিন্তু শশাঙ্ক আর জটিলতা বাড়াতে চায় না। কয়লার খাদের অন্ধকারে যে ঘটনাটুকু ঘটে গেছে সূর্যের আলোয় তা মিলিয়ে যাক। তাকে আর মনে করতে চায় না শশাঙ্ক, আর তার জের টেনে চলতে চায় না। নিশিবাবুর পরামর্শই সঙ্গত। ওদের জীবন থেকে নিজেকে শশাঙ্কের সরিয়ে নিয়ে আসাই ভালো। ওরা ধীরে ধীরে একটি শান্তির নীড় গড়ে তুলুক। ওরা সুখী হোক। শশাঙ্ক বাজপাখীর মত দ্বিতীয়বার আর ছোঁ মারবে না। সে ভুলবার মত বস্তু পেয়েছে। তা ছাড়া শশাঙ্কের যা স্বভাব তাতে মনে রাখাই তার পক্ষে শক্ত, ভুলে যাওয়া সহজ। ইতিমধ্যে অনেকের মুখটুকুও যে আর মনে পড়ে না। মন্দিরার বেলাতেও এমনিই হবে। ধীরে ধীরে সব ভুলে যাবে শশাঙ্ক। মন্দিরা ভুলবে আরো তাড়াতাড়ি। স্বামী আর সন্তানের মধ্যে সে নিজের নতুন প্রতিষ্ঠা পাবে। পাবে নবজন্মের স্বাদ। পূর্ব জীবনকে মনে করাবার জন্যে আর স্মারকলিপি পাঠিয়ে কাজ নেই শশাঙ্কের।

কিন্তু চিঠি না লিখলেও চিঠি এলে খুলতে হয়। মন্দিরার চিঠি খুলে ফেলল শশাঙ্ক। হাতের লেখা মোটেই বদলায়নি মন্দিরার, তার উচ্ছলতা অধীরতারও যেন তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি, শশাঙ্ক লক্ষ্য করল।

মন্দিরা লিখেছে, 'আপনি চিঠি দেবেন বলে গেলেন—কই দিলেন না তো। যদি না-ই দেবেন কথা দিলেন কেন? যদি ভুলেই যাবেন ফের এসেছিলেন কেন? কেন ফের আগুন জেবলে দিয়ে চলে গেলেন! আমি যে পুড়ে মরে যাচ্ছি।

আমার সত্যি সত্যি মরে যেতে ইচ্ছা করে। মরবার কত পথের কথা ভাবি। কখনো মনে হয় শাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিই। কখনো ভাবি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ি। মরবার কত রাস্তাই তো খোলা কিন্তু যেতে পারিনে কেন। আমার ভয় হয় আমি বুঝি এখানে দম বন্ধ হয়ে মরে যাব। তার আগে এখান থেকে মুক্তি পাব না। মরে না গেলে আপনার দেখা পাব না।

আপনি চলে যাবার পরদিনই মামাবাবু চলে গেছেন। আমি ভেবেছিলাম তাঁর সঙ্গে যাব। কিন্তু তিনি বললেন তিনি কলকাতায় যাবেন না। আরো অনেক জায়গা ঘুরে তবে নাকি যাবেন। সোজা কলকাতায় গেলেও কি তিনি আমায় নিয়ে যেতেন? যেতেন না। যিনি দেবার তিনিও নিয়ে যেতে দিতেন না। সবাই মিলে আমাকে শাস্তি দিতে চান, আপনিও সেই দলে। আপনি দলপতি।

আমার ইচ্ছা করে আমিও শাস্তি দিই। আমি মরে গেলে কি সেই শাস্তি কেউ পাবে? মরে গেলে দুঃখ হবে আপনার? মোটেই না। আপনি যা নিষ্ঠুর! আপনার মায়ামমতা নেই। তবু তো ভুলতে পারি না। ইতি মন্দিরা'

চিঠি পড়ে শশাঙ্ক খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। সেই পুরোন মান-অভিমান আর যুক্তিহীন আবেগে আর্দ্র একটি মেয়ের চিঠি। কিন্তু শশাঙ্ককে তার সংকল্প থেকে ভাসিয়ে নিতে পারে এমনই যেন তার শক্তি। তবু শশাঙ্ক শক্ত হয়ে বসে রইল। ভাবল এ চিঠির জবাব দেবে না, কিছুতেই জবাব দেবে না। কিন্তু পরক্ষণেই তার ভয় হল যদি বিপরীত কান্ড কিছু করে বসে মন্দিরা। তার চেয়ে চিঠি দেওয়াই ভালো। বুঝিয়ে শুনিয়ে ওকে শান্ত করাই ভালো।

কিন্তু লিখতে গিয়ে যেন লেখার আনন্দে মেতে উঠল। কাকে লিখছে সে কথা ভুলে গেল। আসলে মন্দিরা যেন উপলক্ষ। শশাঙ্ক নিজেই নিজের পাঠক।

লিখেই ক্ষান্ত হল না শশাঙ্ক। ডাকে দিয়ে তবে তার চিত্ত শান্ত হল।

অনেক পরে খেয়াল হল এ চিঠি দেওয়া তার উচিত হয়নি। কারো হাতে পড়লে অনর্থ না হোক অন্য অর্থ হতে পারে।

কিন্তু ছুঁড়ে দেওয়া তীরের মত ডাকে দেওয়া চিঠি ফিরিয়ে আনবার কোন উপায় নেই।

সেদিন আরো দুখানা চিঠি এসেছিল মিহিরের নামে। একখানা বিকাশের লেখা, আর-একখানা সহপাঠী বন্ধু সুরজিতের। দুজনেই ইনল্যান্ড লেটারের উল্টোপিঠে নিজের নাম-ঠিকানা লিখে দিয়েছে। কিন্তু মন্দিরার নামে যে খামের চিঠিখানা এসেছে, তাতে প্রেরকের কোনো নিশানা নেই। তবু শশাঙ্কের হাতের লেখাটা অনুমান করতে মিহিরের দেরি হল না। আজকাল তার

অনুমানের শক্তি যেন আরো বেড়ে গেছে। অনুভূতি তীব্রতর হয়ে উঠেছে। মিহির ভাবে, বোধ হয় তা না হওয়াই ভালো ছিল। তা হলে দুঃখের মাত্রা কম হতো।

রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিল মন্দিরা। কিন্তু পিওনের সাড়া পাওয়ার প্রায় সংগে সংগে বাইরের ঘরে চলে এল।

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কোন চিঠি এসেছে?'

চিঠিখানা আড়াল করে মিহির একটু কৌতুকের সুরে বলল, 'কই, না তো।'

মন্দিরা হতাশ হয়ে বলল, 'কোন চিঠিই আসেনি?'

'আসবে না কেন? এই দুখানা এসেছে।'

নিজের নামের চিঠি দুখানা মিহির স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিল।

মন্দিরা তা দেখে বলল, 'ও চিঠি তো তোমার।'

মিহিরের মুখে তখনো হাসি, 'আমার চিঠি কি তোমার চিঠি নয়?'

মন্দিরা বলল, 'না। চিঠি যার-যার আলাদা আলাদা। তোমার চিঠি আমি দেখতে চাইনে। আমার চিঠি যদি এসে থাকে দিয়ে দাও। আমায় লুকিও না।'

মন্দিরার দৃষ্টিতে সংশয়। তার গলার স্বরের রুক্ষতাও মিহিরের কানে লাগল।

হঠাৎ সে বলে বসল, 'লুকোবার পালা বুঝি শুধু তোমার একার?'

'তার মানে?'

'তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে চিঠি লিখবে, লুকিয়ে লুকিয়ে সে-চিঠির জবাব আনাবে, খাদের মধ্যে নেমে লুকোচুরি খেলবে, তাই বলছিলাম, লুকোবার অধিকার শুধু তোমারই আছে। আর কারো নেই।'

মন্দিরা ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল, 'কী যা-তা বলছ। লুকোচুরি আবার খেললাম কখন?'

মিহির বলল, 'সেই শুরু থেকেই খেলছ।'

এমন খোঁচা দিয়ে কথা বলবার অভ্যাস মিহিরের আগে ছিল না। আজকাল কারণে-অকারণে তিক্ততা বেরিয়ে আসে। অসহিষ্ণুতা চাপতে গিয়েও যেন চাপতে পারে না মিহির। বিশেষ করে খাদের ভিতরের সেই ঘটনার পর থেকে মিহির স্ত্রীকে যেন কিছুতেই আর সহ্য করতে পারছে না। পারত, যদি মন্দিরা তার অপরাধ স্বীকার করত, যদি ক্ষমা চাইত। কিন্তু মন্দিরা সব অস্বীকার করেই যেন জিতে যেতে চায়। তার মধ্যে লজ্জা কি অনুশোচনার কোন চিহ্নই দেখতে পায় না মিহির। শশাঙ্কও ঠিক সেই জাতের পুরুষ। নিজে অন্যায় করে মিহিরকে শ্লেষ-ব্যঙ্গে বিদ্ধ করে গেছে। সেই অপমানের জ্বালা ভোলা তার পক্ষে সহজ নয়। মানুষ এমন হীন, এমন নির্লজ্জও হতে পারে, সেই বিস্ময়েই মিহির সেদিন অবাক হয়েছিল। সে ভদ্রভাবেই সেদিন শশাঙ্কের চলে যাবার

ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কোন অশোভন আচরণ করেনি, রুক্ষ কথায় অপমান করেনি, আর শশাঙ্ক তার বিনিময়ে চরম অভদ্রতা করেছে। অতিথি হয়ে এসে নিজেরও মর্যাদা নষ্ট করেছে, গৃহীরও সম্মান রাখেনি।

মন্দিরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'আমার চিঠিটা ফেলে দাও, আমি চলে যাই। কাজ আছে আমার।'

মিহির অবাধ্য স্ত্রীর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে রইল। তার-পর মুখে একটু হাসি টেনে বলল, 'কাজ থাকলে তুমি সে-কাজ করে এসো মন্দিরা। যে-চিঠি তোমার এসেছে, তা কোন কাজের চিঠি নয়। এ-চিঠি না পড়লেও তোমার চলবে।'

মন্দিরাকে একবার দেখিয়ে চিঠিখানা মিহির ফের তার বুকপকেটে রেখে দিল। তারপর বেরোবার জন্যে পা বাড়াল। যেন কিছুই ঘটেনি।

কিন্তু মন্দিরা সঙ্গে সঙ্গে এসে সামনে দাঁড়াল। স্বামীর পথ আটকে বলল, 'শোন, আমার চিঠি আমাকে দিয়ে যাও। নইলে যেতে পারবে না।'

মিহির হয়তো খানিক বাদেই চিঠিখানা ফিরিয়ে দিত। কিন্তু স্ত্রীর রূঢ়তায় সে-ও ক্রুদ্ধ হয়ে ফিরে তাকাল। 'যেতে পারবে না' কথাটি আবদারের সুরে বলেনি মন্দিরা, মধুর কোমল কাকুতি-মিনতি করেনি। যেন জোরজবরদস্তি করেই সে মিহিরের কাছ থেকে চিঠিখানা ছিনিয়ে নেবে। অপরাধিনী নারীর এই নির্লজ্জ স্পর্ধা মিহিরের কাছে দুঃসহ মনে হল। তবু মিহির ঝগড়া করল না, চেঁচামেচি করল না। আগের মতই শান্তভাবে বলল, 'এ-চিঠি তোমাকে আমি পড়তে দিতে পারিনে মন্দিরা।'

মন্দিরা বলল, 'আমার নিজের চিঠিখানা পড়বারও অধিকার আমার নেই?'

মিহির বলল, 'নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সে অধিকার তুমি নিজেই নষ্ট করেছ। তুমি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখনি। তুমিও না, শশাঙ্কবাবুও না।'

এমন সরাসরি আক্রমণে মন্দিরা একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ প্রবল প্রতিবাদের সুরে বলল, 'সব তোমার মনগড়া বানানো কথা। এতই যদি তোমার অবিশ্বাস, তা হলে তাঁকে আসতে বলেছিলে কেন?'

মিহির বলল, 'আমি বলেছিলাম, না, তিনি সেধে সেধে এসেছেন?'

মন্দিরা বলল, 'আমি তো তাঁকে আসতে বারণ করে দিতে যাচ্ছিলাম। জানতাম এমন অশান্তি হবে। তোমার এমন উদারতা দেখাবারই বা কী দরকার ছিল, আবার এখনই বা কেন এমন বাড়ি তোলপাড় করে তুলছ? তা ছাড়া, চিঠিখানা যে কার, তুমি তা জানো না। আর কারো জরুরী চিঠিও তো হতে পারে।'

মিহির বলল, 'চিঠিখানা যে কার, তা আমি তোমার চোখ দেখে বুঝতে পেরেছি। এ-চিঠিতে এমন কোন জরুরী কথা থাকতে পারে না, যা তোমার জানা দরকার।'

মন্দিরা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বেশ। তোমার ভদ্রতার দৌড় দেখে নিলাম।'

মিহির একটু হাসল, 'তা ঠিক। এতদিন সে দৌড় তোমরা দেখিয়েছ।'

মন্দিরা আর সেখানে দাঁড়াল না।

মিহির একবার ভাবল, চিঠিখানা মন্দিরাকে ফিরিয়ে দেয়। কী আর হবে। একখানা চিঠি বইতো নয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে পড়ল, শশাঙ্ক তার সৌজন্যের কী অপব্যবহারই না করেছে। বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র মর্যাদা রাখেনি। সে যে ইচ্ছা করেই মন্দিরাকে নিয়ে অন্য গ্যালারিতে চলে গিয়েছিল, তাতে মিহিরের কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ নিয়ে তো হৈচৈ করা যায় না। তাতে আর পাঁচজন হাসবে। তবু মিহির যে সবই বুঝতে পেরেছে, আভাসে-ইঙ্গিতে সে কথা শশাঙ্ককে বুঝিয়ে দিতে সে দ্বিধা করেনি। যেভাবে শশাঙ্কের বিদায় নিতে হয়েছে, তাতে আর কেউ হলে লজ্জায় মরে যেত—ফের কোন রকম যোগাযোগ রাখবার কথা ভাবতেই পারত না। কিন্তু মানুষটি নিতান্ত নির্লজ্জ। চামড়া যে মোটা, তাতে সন্দেহ নেই। চক্ষুলজ্জা বলে বোধ হয় কোন বস্তুই লোকটির নেই। এমন মানুষের সঙ্গে মন্দিরা কোন রকম সংস্পর্শ রাখে, মিহির নিশ্চয়ই তা হতে দিতে পারে না। সে নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝাল, এ তার ঈর্ষা নয়, অনুদারতা নয়। আধুনিক শিক্ষিত সমাজে বিবাহিত মেয়েদেরও নিশ্চয়ই পুরুষ বন্ধু থাকবে। কিন্তু বন্ধু যেন শুধু বন্ধুই হয় তা যেন সৌহার্দ্যের সীমা লঙ্ঘন না করে। যখন করে, তখন তা আর বন্ধু নয়, ব্যাভিচার।

শেষ পর্যন্ত শশাঙ্কের চিঠিখানা মন্দিরাকে না দেওয়াই ঠিক করল মিহির এই সামান্য নিষ্ঠুরতায় এক ধরনের উল্লাস বোধ করল। মন্দিরা একটু ছটফট করুক। খানিকটা কষ্ট পাক। তার কৌতূহল অতৃপ্ত থাকুক।

মিহির স্ত্রীর দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, 'মন্দিরা, জীবনে তুমি অনেক চিঠি পড়েছ। একখানা চিঠি না-পড়া থাকুক। তার মধ্যেও রোমান্স কম নেই ভয় নেই, এ-চিঠি আমিও পড়ব না।'

মন্দিরা হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না।

তাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই মিহির বেরিয়ে পড়ল।

মিহিরের কথার নড়চড় হল না।

চিঠিখানা সে খুললও না, পড়লও না। একবার ভাবল, চিঠিটা সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। আবার কি ভেবে অফিসে গিয়ে নিজের ড্রয়ারে বন্ধ করে রাখল। ভাবল, ঝোঁকের মাথায় কিছু করা ঠিক নয়। যদি মন্দিরা তেমন কাকুতিমিনতি করে, চিঠিখানা তাকে ফিরিয়ে দেবে মিহির। অন্যের চিঠি আটকে রাখা যে অসঙ্গত, সে জ্ঞান তার আছে। কিন্তু যে চিঠি পড়লে মন্দিরার অকল্যাণ হতে পারে, অশান্তি আরো বেড়ে যেতে পারে, সে-চিঠি

তাকে পড়তে দেওয়া কতখানি সমীচীন? চিঠির ব্যাপারটা সারাদিন থেকে থেকে মিহিরের মনকে খোঁচা দিতে লাগল।

অনেক বড় বড় ব্যাপারে অল্প সময়ের মধ্যে মিহির কর্তব্য স্থির করে ফেলে। আবার কোন কোন সময় নিতান্ত সামান্য বিষয়ে মনস্থির করতে তার বহু সময় লেগে যায়। অনেক সময় তাকে মনে হয় খুব যুক্তিবাদী। যুক্তি ছাড়া সে যেন এক পা-ও চলতে পারে না। আবার একেক সময় এমন অদ্ভুত অদ্ভুত সব কান্ড করে বসে, তা দেখে তার আত্মীয়-বন্ধুরা তো বিস্মিত হয়ই, মিহির নিজেও কম অবাক হয় না। তখন তার মনে হয়, সে নিজেও আসলে ভাবপ্রবণ, আবেগপ্রবণ মানুষ। যুক্তির একটা মোড়ক ওপরে আছে বটে, কিন্তু তা নিতান্তই কাগজের মোড়ক। তা কখন যে ছিঁড়ে যাবে, তার ঠিক নেই।

শশাঙ্কের আসার ব্যাপারটাই ধরা যাক।

আর কেউ হলে সব জেনেশুনে শশাঙ্ককে নিজের বাড়িতে ঢুকতে দিত না। কিন্তু মিহির ভেবেছিল, সে ও-সব গ্রাহ্য করে না। এ-সব ব্যাপারে সে অনেক উদারতা দেখাতে জানে। তা ছাড়া পূর্ব-পরিচিতই হোক, আর অপরিচিতই হোক, কোন ভদ্রলোক এসে মিহিরের স্ত্রীর সঙ্গে দুটো কথা বললেই যে জাত যাবে, তা সে মনে করে না। মিহির কি অতই দুর্বল, অতই অশক্ত? বরং তার শক্তিসামর্থ্য যে কোন অংশে কম নয়, তার প্রমাণ শশাঙ্কের সামনে তুলে ধরবার তার ইচ্ছা হয়েছিল। মিহির ভেবেছিল, অত ভয় কিসের? স্ত্রী কি ঘটি-বাটি চেয়ার-টেবিলের মত অস্থাবর সম্পত্তি যে, তাকে সর্বদা পাহারা দিয়ে আগলে রাখতে হবে? সিন্দুকে তালাবন্ধ করে না রাখলে তাকে রাখা যাবে না? তেমন করে ধরে রাখতে গেলে মানুষ সত্যিই জড় পদার্থ হয়ে ওঠে। ছেলেবেলায় রূপকথার কোন এক গল্পে মিহির পড়েছিল, ডাইনীর যাদুমন্ত্রে মানুষ গাছ হয়ে রয়েছে, পাথর হয়ে রয়েছে। সেই পাথুরে স্ত্রী দিয়ে মিহির কী করবে? সে তো কোন প্রস্তরময়ীকে চায় না, প্রাণময়ীকে চায়। ডাইনীর যাদুমন্ত্রে মানুষ পাথর হয়, আর মানুষের সাধনায় সেই পাথরে প্রাণস্পন্দন জাগে। মিহির ভেবেছিল, পুলিসের পাহারা বসিয়ে নয়, হাতে হাতকড়ি পরিয়ে নয়, বরং সমস্ত শাসন-বাঁধন খুলে দিয়ে আপন ঔদার্যে স্ত্রীর হৃদয় সে জয় করবে। অখ্যাতির কলঙ্ক-লাগা শশাঙ্ককেও সে অতিথির সম্মান দিতে কার্পণ্য করেনি। মিহির ভেবেছিল, মানুষটির মধ্যে গুণও তো আছে। মিহির সেই গুণীকে শ্রদ্ধা জানাবে, মানীকে মান দেবে। সৌজন্যে ভদ্রতায় মহত্ত্বে তাঁকে লজ্জা দেবে। নিজে বড় হতে না পারলে ক্ষুদ্রতাকে জয় করা যায় না। ক্ষুদ্রতাকে নাশ করার অস্ত্র ক্ষুদ্রতা নয়, মহত্ত্ব, ঔদার্য। সে অস্ত্রের দু দিকে ধার। তাতে অন্যের ক্ষুদ্রতাও কাটে, নিজের ক্ষুদ্রতাও বিনষ্ট হয়। মিহির ভেবেছিল, শশাঙ্ককে সে আর-একবার সুযোগ দেবে। নিজের সৌজন্যে শিষ্টতায় শশাঙ্ককে লজ্জিত করবে। কিন্তু তা হল কই! শশাঙ্ক বাড়িতে পা দেওয়ার

সংগে সংগেই মিহির বুঝতে পারল, সে শুধু মন্দিরাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাকে দেখবার জন্যে তার সংগে গোপনে দুটো কথা বলবার জন্যে লোকটির আগ্রহের অন্ত নেই।

শশাঙ্কের কান্ড দেখে মিহিরের হাসিও পেয়েছিল আবার দুঃখও হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, শশাঙ্কের মত মানুষ আসলে হিংসার পাত্র নয়। করুণার পাত্র, অনুকম্পার পাত্র। চল্লিশ পার হয়েও যে মানুষ মেয়ে ছাড়া আর কিছু চেনে না, নারীসান্নিধ্য ছাড়া যার আর কিছু কাম্য নেই, জীবন মানে যে শুধু যৌবনজীবনই বোঝে, তাকে করুণা ছাড়া আর কী করা যায়? মিহিরের বুঝতে দেরি হয়নি, শশাঙ্ক নানা ছলছুতোয় শুধু মন্দিরার কাছে থাকতে চাইছে। তার সংগে কথা বলতে চাইছে। এমন ভিজিটর মিহির জীবনে এই প্রথম দেখল, যে মাইন দেখতে এসে পাঁচশ ফিট নিচে নেমে শুধু মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রীকে দেখে বেড়াচ্ছে। ঈর্ষার চেয়ে মিহিরের মনে কৌতুকই যেন বড় হয়ে উঠেছিল। নিজের মনেই হেসেছিল মিহির। দেখ দেখ, লোকটির কান্ড দেখ। সম্মানিত অতিথির মর্যাদা পেয়েও ছিঁচকে চোরের স্বভাব দেখ।

ওরা দুজন কেবলি পিছনে পড়ছে দেখে মিহিরের মনে মাঝে মাঝে যে অস্বস্তির কাঁটা বেঁধেনি তা নয়। কিন্তু নিশিবাবুর ব্যবহারে সে অস্বস্তি দূর হতেও দেরি হয়নি। ঈর্ষার বিষ, সন্দেহ সংশয়ের জ্বালা মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেছে মিহির। এই বুড়ো ভদ্রলোককেও তো সে প্রথমে সন্দেহ করেছিল। তাঁর উদ্দেশ্য মিহিরের কাছে পরিস্ফুট হয়নি। কিন্তু নিশিবাবুর সংগে আলাপ হওয়ার পর তাঁর সারল্যে ঔদার্যে সহিষ্ণুতায় সে মুগ্ধ হয়েছে। কোন কোন বিষয়ে নিশিবাবু বিচক্ষণ। তিনি শুধু পাকা চুল-দাড়িতেই বৃদ্ধ হননি, বয়সের সংগে সংগে সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও তাঁর বেড়েছে। তাঁর মূল্যবোধ অবিচল। বয়সের ব্যবধান যুগের ব্যবধান সত্ত্বেও তাঁর সংগে মিহির এক ধরনের ঐক্য বোধ করেছে। শশাঙ্কের সংগে অবশ্য কোন গভীর বিষয় নিয়ে মিহিরের কোন আলোচনা হয়নি। কিন্তু তার চালচলন যেটুকু দেখেছে তাতে কোনরকম মিলই যে শশাঙ্কের সংগে তার আছে তা তার মনে হয়নি। তত্ত্ব তো শুধু পুঁথির বস্তু নয়, শুধু মুখস্থ করে রাখবার বস্তু নয়, তা জীবনে প্রয়োগ করার জন্যে। যে দর্শন ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগে না মিহিরের ধারণা তা কারো জীবনদর্শন হতে পারে না। নিশিবাবুর সংগে নিজের মতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছে মিহির। জোর-জবরদস্তিতে তাঁরও বিশ্বাস নেই। তিনিও ধৈর্য আর সহিষ্ণুতাকে অমোঘ অস্ত্র বলে মনে করেন। অস্ত্র নয়, মন্ত্র। শুধু সেই মন্ত্রেই মানুষের মনকে বদলানো যায়। নিশিবাবুও অপেক্ষায় প্রতীক্ষায় বিশ্বাসী। তাঁরও ধারণা সবুরে মেওয়া ফলে। শেষ পর্যন্ত ধীরতার স্থিরতার এবং দৃঢ়তার জয় হয়। এসব কথা শুনতে শুনতে খাদের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছিল মিহির। কিন্তু নিশিবাবু শুধুই যে কথা বলছিলেন তা নয়, মিহিরের কথা

নেবার দিকেও তাঁর আগ্রহ ছিল। বৃদ্ধের মধ্যে বালকের এই ঔৎসুক্যের যেন শেষ নেই। কলিয়ারীর যা তিনি জানেন না তা জানবার জন্যে তাঁর ঔৎসুক্যের যেন শেষ নেই। কলিয়ারীর ব্যাপারটা মোটামুটি মিহিরের কাছ থেকে সব জেনে নিয়ে তবে তিনি ছাড়লেন।

মিহির বলেছিল, 'এই বয়সেও আপনার এত আগ্রহ দেখে অবাক হতে হয় মামাবাবু।'

নিশিবাবু হেসে বলেছিলেন, 'অবাক হবার কী আছে মিহির। আমরা বুড়োরা বক বক করি, ছেলেদের কাছে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলি। আর কথায় কথায় উপদেশ দিই। সেই অযাচিত উপদেশ তারা এক কান দিয়ে শোনে, আর-এক কান দিয়ে বের করে দেয়। আমি এখন থেকে ভেবেছি আর অমন কাজ করব না। আমি তোমাদের কাছ থেকে উপদেশ নেব।' নিশিবাবু হেসেছিলেন।

মিহির বলেছিল, 'কিন্তু আমরা যারা বয়সে ছোট, অভিজ্ঞতায় ছোট, তাদের কাছ থেকে আপনাদের মত মানুষের কী নেওয়ার আছে মামাবাবু।'

নিশিবাবু জবাব দিয়েছিলেন, 'নেবার নেই? অনেক নেবার আছে মিহির। তোমাদের সরসতা পবিত্রতা আনন্দ-উচ্ছ্বাস যখন চোখ মেলে দেখি, মনে হয় না যে আমি বুড়ো হয়েছি। মনে হয় যেন আমিও তোমাদের মধ্যেই আছি।'

নিশিবাবু যে অন্তরের বিশ্বাস থেকে কথাগুলি বলছেন তাতে মিহিরের কোন সংশয় ছিল না। স্ত্রীর চৌকিদারী না করে কিছু সময়ের জন্যে সে যে নিশিবাবুর মত একজন মানুষের সঙ্গে খানিকটা সময় কাটাতে পেরেছে তাতেই বরং বেশি আনন্দ পেয়েছে মিহির। সে পরিবেশের প্রভাবে বিশ্বাসী। সজ্জনের সঙ্গ মানুষের মনকে নির্মল করে। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। সদুপদেশ শ্রবণে সৎ আলোচনায় মিহিরের যেন ক্লান্তি নেই। সেসব আলোচনা যত পুরোনই হোক মিহিরের তাতে ধৈর্যচ্যুতি হয় না। এই শ্রদ্ধা আর আনুগত্যের জন্যে সে স্কুলের মাস্টার মশাইদের, কলেজের অধ্যাপকদের স্নেহভাজন হয়েছিল। এই নিয়ে দু-একজন সহপাঠী বন্ধু তাকে ঠাট্টা করত, 'তোমার বিনয় আর ভক্তির জ্বালায় আমরা অস্থির হয়ে গেলাম। বেশি নম্বর পাবার তুমি আচ্ছা এক ফন্দী বার করেছ।'

মিহির বলত, 'ওঁরা যা বলছেন শুনতে ক্ষতি কি। নেবার সময় আমি তো বিচার করেই নেব। কিন্তু আগেই যদি আমি ধরে রাখি ওঁদের কাছ থেকে নেবার মত কিছু নেই তাহলে আমি হয়তো ঠকে যেতেও পারি।'

শশাঙ্ক আর মন্দিরা যখন খাদের মধ্যে নিখোঁজ হয়েছিল, মিহির ভিতরে ভিতরে বিচলিত হলেও বাইরে চাঞ্চল্য দেখায়নি। বরং ঔদাস্যের সুরে বলেছিল, 'চলুন মামাবাবু, আমরা এগিয়ে যাই। পথ যদি ওঁরা হারিয়ে থাকেন ওঁরা নিজেরাই তা খুঁজে নিতে পারবেন।'

কিন্তু প্রবীর তাতে রাজি হয়নি। নিশিবাবুও বলেছিলেন, 'না না, মিহির, শেষে একটা বিপদ-আপদ হবে। শশাঙ্কবাবুর ওপর ভরসা করা কোন কাজের কথা নয়।'

প্রবীরই ডাকাডাকি করে লোকজন জড়ো করেছিল। এই হারিয়ে যাওয়া যে মোটেই আকস্মিক নয়, ওদের দুজনের মুখ দেখে তাতে মিহিরের সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এই নিয়ে হৈচৈ করতে তার সংকোচ হয়েছিল। তাতে লাভ কিছু হবে না বরং লোকসানের মাত্রা বাড়বে।

কিন্তু নির্বিবাদে সমস্ত অন্যায় সহ্য করবার মানুষও মিহির নয়। শশাঙ্ককে সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে ছেড়েছে।

তার দৃঢ়তায় নিশিবাবুও খুশি হয়েছিলেন।

পরদিন বিদায় নেওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন, 'তোমার সঙ্গে পরিচয় ছিল না মিহির। কিন্তু দুদিনের আলাপ-পরিচয়েই আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। তুমি অযথা বিচলিত হও না, তুচ্ছ কারণে মনে অশান্তি আনো না, অথচ যেখানে প্রতিবাদ করবার সেখানে প্রতিবাদ কর, যেখানে প্রতিকার দরকার সেখানে করতে জানো—এই তো চাই।'

মিহির একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'শশাঙ্কবাবু আপনার সঙ্গে এসেছেন। তবু কোন বিশেষ কারণে বাধ্য হয়ে তাঁকে অমন করে বিদায় করতে হল। আপনি কিছু মনে করবেন না। তবে একটা কথা বলি মামাবাবু। ওঁর মত মানুষকে আপনার সঙ্গে দেখে আমি অবাক হয়েছি! আপনাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব কী করে হল।'

নিশিবাবু একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'মিহির, তোমার কাছে এই তিরস্কার আমার পাওনা ছিল। এখন মনে হচ্ছে বুঝতে ভুল হয়েছিল আমার। ভদ্রলোকের অনেক গুণ আছে। আমি তাতে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তাছাড়া তিনি নিজেকে শোধরাবেন সে আশাও আমার ছিল। অবশ্য খাদের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলা ওঁর ইচ্ছাকৃত নাও হতে পারে। আমি সে কথা বলছিনে। তবু ওঁর অনেক চাল-চলনই আমার ভালো লাগেনি। তিনি যদি নিজেকে না শোধরান, তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না।'

মিহির একথার কোন জবাব দেয়নি।

নিশিবাবু একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে আমি তোমাদের কোন অনিষ্ট চিন্তা করিনি। আমি একটা ভুল ধারণা নিয়ে—সে যাক গে। সে কথা যদি কখনো দরকার হয় পরে বলব। কিন্তু না জেনে না বুঝে যদি তোমাদের কোন অশান্তির কারণ ঘটিয়ে থাকি তার শাস্তি এড়াতে পারব না মিহির। মানুষের বাইরের শাস্তিই সব সময় বড় শাস্তি নয়।'

মিহির লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'এসব কী বলছেন মামাবাবু। আপনার মনে কোনরকম গ্লানি আসতে পারে এমন কিছু তো হয়নি। যাই কিছু ঘটুক

আপনি যে আমাদের হিতৈষী তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

নিশিবাবু জবাব দিয়েছিলেন, 'তোমার এই বিশ্বাসই আমার বড় পুরস্কার বাবা। যদি কখনো কোন দরকার হয় আমাকে খবর দিয়ো। আমার যেটুকু সাধ্য নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে করব।'

মিহির বলেছিল, 'মামাবাবু, আপনার স্নেহ আর আশীর্বাদই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

যাওয়ার সময় নিশিবাবু মিহিরের সামনেই মন্দিরাকে বহু উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। সে যেন স্বামীর নির্দেশ মত চলে। বাজে চিন্তায় মনকে অশান্ত না করে তোলে। মনের চাঞ্চল্যকে যেন প্রশ্রয় না দেয়। স্বামী-স্ত্রী দুজনের জীবন তো আলাদা নয়, অভিন্ন। একজনকে দুঃখ দিয়ে আর একজন কিছুতেই সুখী হতে পারে না। ধৈর্য সহিষ্ণুতা পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা এসব ছাড়া কি সুখ হয় সংসারে? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিশিবাবু কিছুই বলতে বাকি রাখেননি। শেষে মন্দিরার পিঠে হাত রেখে তিনি হেসে বলেছিলেন, 'আমাদের তো আর ওসব পাঠ কিছু হল না। সংসারধর্মের বাইরেই তো রয়ে গেলাম আমরা। কিন্তু তোরা আছিস ভিতরে। তোরা সংসার পাতবি আর আমরা সেই সুখের খেলা চেয়ে চেয়ে দেখব। তারপর আরো কত কি হবে। নাতি নাতনীরা আসবে। তাদের নিয়ে আনন্দ আহ্লাদ করব। নতুন খেলার সাথী পাব। এই তো সংসার। যুগ-যুগান্ত ধরে এই ধারাই তো চলে আসছে। সেই একই ধারা। তবু নিত্য নতুন। সেই একই খেলা। তবু নিত্য নতুন।'

খানিকটা তদ্‌গতভাবে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়েছিলেন নিশিবাবু। যেন যুগ-যুগান্তরের সংসারলীলা তাতে লেখা রয়েছে।

কিন্তু এসব শুনেও কি সেই সহজ সুখের দিকে মন্দিরার মন আকৃষ্ট হয়েছিল? তা যদি হতো তাহলে শশাঙ্কের সঙ্গে সে আগের সম্পর্ক রাখতে চাইত না। ভয়ে হোক, লজ্জায় হোক, পরিণামের কথা ভেবে হোক, মন্দিরা নিজের মনকে ফেরাবার চেষ্টা করত। কিন্তু মিহির জানে সে চেষ্টা মন্দিরার নেই। সে যেন ভুলতে চায় না। লজ্জা অপমান গ্লানির ভিতর দিয়েও সব মনে করে রাখতে চায়।

কিন্তু তার এই চাওয়াকে তো প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। মিহির ভেবে দেখেছে, মন্দিরার এই চাওয়ার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। এর পরিমাণ দুঃখদায়ক, অশান্তিময়। মিহির এখন ভাবে তার ঔদার্যে বিপরীত ফল হয়েছে। তার উদারতাকে নিশ্চয়ই ওরা দুর্বলতা বলে ধরে নিয়েছে। সে যে দুর্বল নয় তার প্রমাণ দেওয়া দরকার। এক প্রক্রিয়া সব জায়গায় চলে না। মিহির বোধহয় উদারতা দেখিয়ে ভুল করেছে। মন্দিরার মত মেয়েকে ফিরাতে হলে শক্ত হওয়া চাই। শশাঙ্কের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ রাখতে না দেওয়াই এখন সঙ্গত। মনে করবার মত কিছু না পেলে মন্দিরা আস্তে আস্তে সব ভুলে যাবে। কিন্তু

প্রতিনিয়তই যদি স্মারকলিপি আসতে থাকে তা হলে কোনদিনই আর মন্দিরা পূর্ব জীবনকে ভুলতে পারবে না, কি তার অশুভ আকর্ষণ এড়াতে পারবে না।

মিহির ডিউটি থেকে ফিরে এলে মন্দিরা সেই একই কথা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তাহলে আমার সব চিঠিপত্র এমনি করে আটকে রাখবে?'

মিহির একটু হেসে বলল, 'না, সব চিঠি আটকাব না। শুধু কোন কোন চিঠি তোমাকে দিতে পারব না। শোন, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।'

মন্দিরা অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'আমার ভালোর জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবে না।'

মিহির বলল, 'আমাদের দুজনের ভালোর জন্যেই ভাবছি।'

মন্দিরা এবার কোন জবাব দিল না।

এর পর আর চিঠির তাগিদ দিল না মন্দিরা। কিন্তু মিহিরের সঙ্গে তার খিটিমিটি লেগেই রইল। এমনও হতে লাগল, দিনের পর দিন সে কথা বন্ধ করে থাকে। মিহির ডেকে তার সাড়া পায় না। কাছে আসতে বললে সে আসে না। শুধু ঘর-সংসারের যে কাজটুকু নিতান্তই না করলে নয় সেইটুকুই করে। কিন্তু তার এই দিন যাপনের মধ্যে কোন আনন্দ নেই। রাত্রি যাপন আরো নিরানন্দের। মন্দিরা ঘুমাবার জন্যে আলাদা বিছানা পাতে। যেন কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই।

মিহির নিশ্চল নির্বিকার। এই জীবনই যেন সব চেয়ে স্বাভাবিক জীবন। সে আগের মতই অফিসে যায়। কাজ করে। অবসর সময়ে সহকর্মীদের সঙ্গে গল্প করে। তারপর বাড়িতে এসে পরীক্ষার জন্যে তৈরী হয়। সেও দেখতে চায় মন্দিরা কতদিন এভাবে থাকতে পারে। তার জেদের সীমা কোনখানে গিয়ে থামে।

তারপর মন্দিরা একদিন নিজেই অতিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আমাকে চিরকাল এইভাবে কয়েদীর মত রাখতে চাও?'

মিহির জবাব দেয়, 'আমি তোমাকে সংসারের কর্ত্রী করে নিয়ে এসেছি। তুমি যদি নিজে কয়েদী হয়ে থাকো আমি কী করতে পারি?'

মন্দিরা বলল, 'আমাকে কয়েকদিনের জন্যে ছুটি দাও। আমি কলকাতায় চলে যাই। বাবার কাছে গিয়ে থাকি।'

মিহির বলল, 'আমার পরীক্ষাটা হয়ে যাক। তখন যেয়ো। আমরা এক সঙ্গে যাব।'

'মানে তুমি আর আমাকে আলাদা ভাবে ছেড়ে দিতে চাও না। দিয়ে বিশ্বাস করতে পার না?'

'যদি না পারি সে দোষ আমার নয়। তুমি আমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখনি।'

'তুমি আমাকে অবিশ্বাসও করবে, আবার জোর করে ধরে রাখবে, এই কি তোমার ইচ্ছা?'

'ঠিক তাই। যতদিন না তোমার স্বভাব বদলায়।'

'একটা চাকর তুমি আমার জন্যে মোতায়েন রেখেছ। আমি জানি সে পাহারাদারের কাজ করে। সব সময় সে আমাকে চোখে চোখে রাখে। ঘরের স্ত্রীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে তোমার লজ্জা করে না?'

মিহির বললে, 'যদি না করে তা এমন কিছু দোষের নয়। তুমি আরো নির্লজ্জের মত ব্যবহার করেছ।' একটু পরেই মিহির হেসে নরম সুরে বললে, 'তুমি ভুল করছ মন্দিরা। শম্ভু তোমার পাহারাদার নয়, সে তোমার হুকুম তামিলের জন্যেই রয়েছে। তুমি যা বলবে সে তাই করবে। তুমি মিছিমিছি চাকরকে পাহারাদার ভাবছ, নিজের সংসারকে জেল মনে করছ, আর আমাকে বোধ হয় জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পোস্টে বসিয়েছ।'

মিহির হেসেছিল। কিন্তু মন্দিরা হাসেনি।

মন্দিরা আর একদিন বলল, 'আমি বাবাকে টেলিগ্রাম করে দেব। আমার শরীর খারাপ। তিনি যেন এসে আমাকে নিয়ে যান।'

মিহির জবাব দিল, 'আমার অমতে তিনি তোমাকে নিয়ে যেতে পারবেন না। সে কথা আমিও না হয় তাঁকে টেলিগ্রামেই জানাব। তাতে কথাটার ওজন বাড়বে।'

মন্দিরা স্বামীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল। তার সেই চোখে ঘৃণা আর বিদ্বেষ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।

মিহির স্তব্ধ হয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বেরোবার আগে ফের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মন্দিরা, এখনো ভেবে দেখ তুমি কিসের জন্যে এমন করছ। কেন ইচ্ছে করে সব নষ্ট করে দিচ্ছ।'

কিন্তু স্বামীর সব কথা শুনবার জন্যে মন্দিরা অপেক্ষা করেনি। মিহিরের কথা শেষ হবার আগেই সে তার সামনে থেকে সরে গিয়েছিল।

॥ ১৮ ॥

স্বামীর ওপর মন্দিরার বিরূপতা ক্রমে বেড়ে চলল। মিহির যে তার একখানা চিঠি আটকে রেখেছে সেই অপরাধের কথা মন্দিরা কিছুতেই ভুলতে পারল না। শুধু কি একখানা চিঠি! নিশ্চয়ই আরো অনেক চিঠি লিখেছে শশাঙ্ক, আর প্রত্যেকটি চিঠিই মিহির গোপন করে সরিয়ে রেখেছে। মন্দিরাকে পড়তে দেয়নি। তাকে দেয়নি; কিন্তু নিজে নিশ্চয়ই খুলে খুলে পড়েছে। মিহিরের কোন কথা এখন আর জানতে বাকি নেই। এক হিসাবে ভালোই

হয়েছে। আর ভয় করবার কিছু নেই, লুকোবার কিছু নেই মন্দিরার।

কিন্তু এ কেমন মানুষ মিহির? সব জেনেও সে মন্দিরাকে কেন ধরে রেখেছে? কেন চলে যেতে দিচ্ছে না? মন্দিরা যে আর একজন পুরুষকে ভালোবাসে একথা জানা সত্ত্বেও তাকে নিজের ঘরে আটকে রাখতে তার বাধছে না! এ কি তার প্রেম, না জেদ? বাবা যেমন সব জেনেও জোর করে মন্দিরার বিয়ে দিয়েছেন, স্বামীও তেমনি, সব জেনেও জোর করে তাকে ধরে রেখেছে। সবই তার ভালোর জন্যে। কিন্তু নিজের ভালোমন্দ বুঝবার বয়স কি মন্দিরার হয়নি? সে যাকে ভালোবাসে তার সঙ্গে মিলিত না হয়ে, যাকে ভালোবাসে না তার সঙ্গে সারা জীবন ঘর করাই কি সব চেয়ে ভালো? লোকে অবশ্য তাতে ভালো বলবে। কিন্তু সেই লক্ষ্মী মেয়ে, ভালো মেয়ে হয়ে মন্দিরার লাভটা কি? সারা জীবন ভালোবাসার অভিনয় করাটাই কি ভালো?

মন্দিরা মাঝে মাঝে স্বামীর দিকে তাকায় আর ভাবে, ওই মানুষটির কোন কষ্ট নেই। দিব্যি ভোরে ওঠে। সকালে ডিউটি না থাকলে বেড়াতে বেরোয়। ফিরে এসে চা-টা খেয়ে স্কুল-কলেজের ছেলের মত পড়তে বসে। চাকর যায় বাজারে। কোন কোন দিন মিহির নিজেও যায় সঙ্গে। সময়মত নায়-খায়। তারপর ডিউটিতে চলে যায়। ফিরে এসে আবার সেই রুটিন-বাঁধা জীবন। কেউ যদি এল তার সঙ্গে গল্পে মেতে গেল। অতিথি নিজে থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত মিহির তাকে বলবে না, 'আমার কাজ আছে।' শুধু একজন অতিথিকেই সে নিজে থেকে জোর করে বিদায় দিয়েছে। দরকারী কাজ থাকলেও মিহির বসে বসে গল্প করবে। তারপর যে সময়টুকু নষ্ট হয়েছে, রাত জেগে তা পুষিয়ে নেবে। মন্দিরা দেখেছে, ভালোবাসা না পেলেও এই মানুষটির কোন কষ্ট নেই। তার পড়াশুনো, অফিস যাওয়া, নাওয়া-খাওয়া ঘুমোন কিছুই আটকে থাকে না। কিন্তু মন্দিরার যে পদে পদে আটকায়। পদে পদে দম বন্ধ হয়ে আসে। স্ত্রী তাকে ভালোবাসে না জেনেও তাকে নিয়ে ঘর করতে মিহিরের লজ্জা নেই। ঘর-সংসারের কাজ করে দেবার জন্যে যেন স্ত্রীলোক একজন কেউ থাকলেই হল। কিন্তু মন্দিরার যে অস্বস্তিতে গা গুলিয়ে ওঠে। যাকে ভালোবাসে না, সারা জীবন তার সঙ্গে থাকতে হবে, একথা ভাবতেই অন্তরাত্মা শুকিয়ে আসে। মিহির যেন জোড়াতালি দেবার পক্ষপাতী। লোকে দেখুক, তারা কেমন দিব্যি স্বামী-স্ত্রী সেজে ঘর-সংসার করছে। গ্রীনরুম যতই নোংরা হোক না কেন, সেখানে যতই ঝগড়াঝাটি, মন কষাকষি চলুক, সাজ-সজ্জায় আলোর ছটায় স্টেজটা যেন ঝকমক ঝকমক করে। প্রেমের পাঠ মুখস্থ যেন, একটুও আটকে যায় না। কিন্তু মন্দিরা তো তা চায় না। সংসার করতে এসে সে তো সংসারের অভিনয় করতে চায় না। সুখের ভান নয়, সে সত্যি সত্যি সুখী হতে চায়। সেই সুখের পথে এত বাধা কেন?

না কি মিহির ভেবেছে এমনি করেই মন্দিরাকে সে শাস্তি দেবে? সে

নিজেও ভালোবাসবে না, কাউকে ভালোবাসতে দেবেও না। সারা জীবন তাকে তৃষ্ণার্ত করে রাখবে। মরুভূমির মধ্যে এক ফোঁটা জলের জন্যে মন্দিরা ছটফট করে মরবে। অথচ মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারবে না। বলতে গেলে লজ্জা। সেই লজ্জার ভয়ে মন্দিরাকে মুখ বুজে থাকতে হবে, জীবনভোর শুকিয়ে মরতে হবে। আনন্দ নেই, আহ্লাদ নেই, জীবনের কোন বর্ণ গন্ধ স্বাদ নেই। শুধু শুষ্ক কর্তব্য। রুচির বিরুদ্ধে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই কর্তব্য করতে করতে মরে থাকাই হবে মন্দিরার বেঁচে থাকা। ভালো হয়ে থাকা। বাবা আর মামাবাবু সবাই তাকে সেই উপদেশই দিচ্ছেন, ভালো হও। নিজের মনের সাধ-আকাঙ্ক্ষাকে চেপে মেরে ফেলে সতীসাধ্বী হয়ে থাকো। কিন্তু আমি মনে মনে একজনকে চাইব, আর একজনের ঘর করব, আমার দেহমনের ওপর তাকে প্রভুত্ব করতে দেব, এরই নাম কি সতীত্ব? আমি একবার ভুল করেছি, ভয়ে লজ্জায় আমার যা করা উচিত ছিল আমি তা করতে পারিনি। তাই বলে কি সেই ভুলের জের আমি সারা জীবন টেনে চলব? তারই নাম সতীত্ব? সব ভুল শোধরানো যায় আর এ ভুল বুঝি শোধরানো যায় না? শোধরাতে গেলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

এসব কথা শুধু মন্দিরার ভাবনার মধ্যেই থাকে না, চিঠির পাতাতেও ফুটে বেরোয়। বন্ধু মীনাক্ষীকে চিঠি লেখে মন্দিরা। কোন চিঠি তাকে দেয়, কোন চিঠি বা দেয় না।

মাঝে মাঝে স্বামীর কাছে গিয়ে বলে, 'এ চিঠি আমার বন্ধু মিনুকে পাঠাচ্ছি। তুমি ইচ্ছে করলে দেখে সেনসর করে দিতে পার।'

মিহির হেসে বলে, 'আমার আরো অনেক কাজ আছে। তা ছাড়া ও-চিঠিতে কী যে তুমি লিখবে তা আমি জানি। সবই তো আমার নিন্দামন্দে ভরা।'

'না, আমি তোমার নিন্দাই কেবল করিনে। তুমি অনেক ভালো। আমার তুলনায় হয়তো অনেক বেশি ভালো। কিন্তু সবাই কি ভালোমানুষকে ভালোবাসতে পারে!'

এ কথা শুনে মিহিরের মুখ কালো হয়ে গেল। এক মুহূর্ত সে যেন কোন কথা বলতে পারল না। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, 'তা ঠিক মন্দিরা। সবাই পারে না। কেউ কেউ অতিরিক্ত ঝাল টক তেতো খাওয়াটাকেই বড় বাহাদুরি মনে করে। স্বাভাবিক খাদ্য তাদের জিভে সয় না।'

শুনতে শুনতে স্বামীর সামনে থেকে সরে আসে মন্দিরা। বাধা না দিলে মিহির বোধ হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীতিকথা বলে যেতে পারে। স্বামী তো নয়, যেন দাদামশাই। বুড়ো শিব। বয়সে বুড়ো নয়, কিন্তু চলনে বলনে বুড়ো। সেই বুড়োমিই তো আসল বুড়োমি। কোষ্ঠী মিলিয়ে বয়স কে দেখতে যায়? শশাঙ্কদাকে দেখলে কি তার বয়সের কথা মনে পড়ে? অন্তত মন্দিরার তো পড়ে না। তিনি যেন প্রতি মুহূর্তে বয়সকে অস্বীকার করেন। অনেকের কাছে

এই অস্বীকৃতি পরম অপরাধ। বয়োধর্মকে না মানার নাম রুচিবিকৃতি। কিন্তু মন্দিরার মন এ কথায় সায় দেয় না। সে বয়স মানে না, স্বভাব মানে না, পরিণাম মানে না, শুধু মনের মিল মানে। মন্দিরার মন বলে, 'আমি যা চাই, তাই আমাকে দাও। শুধু চাওয়া উচিত নয় বলে উপদেশ দিও না। কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ আমাকে যাচাই করে নিতে দাও। আমি জিতি তো জিতব, ঠকি তো ঠকব। বাঁচি তো বাঁচব, মরি তো মরব। তবু সে জীবন আমার জীবন হবে। তোমাদের জীবনের কপিবুক হবে না।'

মীনাক্ষীর চিঠিও সেই আদর্শলিপি। সেও লেখে, মন দিয়ে স্বামীর ঘর করাটাই এখন মন্দিরার কর্তব্য। ভুল? কিসের ভুল? ভুল মন্দিরা বিয়ের আগে করেছিল। বিয়ে করে ভুল করেনি। বিয়ের পরে নিজেকে শুধরে নেওয়ার সে সুযোগ পাচ্ছে। এই সুযোগ যেন কিছুতে আর না হারায়। মন্দিরা যাকে ভালোবাসা বলছে সে তার মোহ, মোহ ছাড়া কিছু নয়, নইলে অত যাঁর বয়স, অত যাঁর কুকীর্তি, স্বাভাবিক রুচির কোন মেয়ে তাঁকে ভালোবাসতে পারে না। মীনাক্ষীও তো মেয়ে। সেও তো দূর থেকে শশাঙ্কবাবুকে দেখেছে। কই, তার মন তো কখনো চঞ্চল হয়নি। তা হলে মন্দিরার মনই বা উতলা হবে কেন!

বন্ধুর যুক্তি দেখে মন্দিরা মনে মনে হাসে। অদ্ভুত তর্ক। যেন সবাইর মন এক সুরে বাঁধা। যেন সবাইর মন একই বস্তুতে মুগ্ধ হয়। তা ছাড়া মীনাক্ষী যে অত নিন্দা করে শশাঙ্কের, সে কি মানুষটির সঙ্গে মিশে দেখেছে, দিনের পর দিন কাছে বসে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখেছে। তাঁকে ভালোবেসে দেখেছে? মীনাক্ষী অবশ্য তার ভালোবাসাকে ভালোবাসা বলে না। বলে 'মোহ', বলে রুচিবিকৃতি। কিন্তু মন্দিরার মাঝে মাঝে প্রমাণ করে দিতে ইচ্ছা করে— তা নয়। সে ভালোবাসার জন্যে সব ছাড়তে পারে। সব ঝুঁকি নিতে পারে। সবাইর কাছে সেই প্রমাণ দেওয়ার জন্যে তার মন ছটফট করে। মন্দিরা মীনাক্ষীকে লেখে, তুই তো ভালোবেসে কাউকে দেখিসনি, তাই অমন করে লিখতে পারছিস।

মীনাক্ষী একথার জবাবে লেখে, 'আমার আর দেখে কাজ নেই! তোকে দেখেই আমার আক্কেল হয়ে গেছে।'

মীনাক্ষী ফার্স্ট ক্লাস অনার্স নিয়ে পাস করেছে। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু একটি ছেলের কথাও সে কখনো লেখে না। যেন কোন ছেলে পড়ে না তার সঙ্গে। সে শুধু প্রফেসরদের বক্তৃতা শুনতে চায় আর বাকি সময় লাইব্রেরীতে বই নিয়ে কাটায়। ভালো করে পাস করবে, তারপর ভালো কলেজের লেকচারার হবে, এই ওর একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা। আর কোন সাধ-আহ্লাদের কথা মীনাক্ষী লেখে না। আর যা আছে তা যেন তার চিন্তাভাবনার বাইরে। মীনাক্ষী বলে, 'যখন ওসব হবে তখন হবে। এখন অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার সময় নেই।'

মন্দিরার জীবন যদি অমন হতো, বেশ হতো। সেও মন দিয়ে লেখাপড়া শিখত, বিয়ের পরে নিজের ভাগ্য আর সামাজিক রীতিনীতি মেনে নিয়ে সুখী হতে পারত। সংসারের আরো দশটি ভালো মেয়ের মত সেও লক্ষ্মী মেয়ে লক্ষ্মী বউ বলে আত্মীয়স্বজনের সুখ্যাতি আদায় করত। কিন্তু অল্প বয়স থেকে কে যে তার রক্তের মধ্যে বাসনার আগুন জেবলে দিয়েছে, সে আগুন যেন আর নিবতে জানে না। সে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এমন সর্বনাশ করল—তার সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি স্থিরতা ধীরতা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এমন সর্বনাশ করল কে? কে এমন সর্বনাশী করে তাকে গড়ে তুলল? মা বলবেন, 'ভগবান। কী সৃষ্টিছাড়াই মেয়ে তুই হয়েছিস। ভগবান যে কোন্-ক্ষণেই তোকে গড়েছিলেন।' কিন্তু ভগবানকে তো মন্দিরা চোখে দেখতে পায় না. চোখ মেলেও দেখতে পায় না, চোখ বুজেও দেখতে পায় না। যাকে দেখে দেবতার মত সুদর্শন সে কি ভগবানের প্রতিভূ? না কি ছদ্মবেশী শয়তান? শয়তান। শয়তান ছাড়া কি! তার জন্যেই তো মন্দিরার জীবনে এমন অশান্তি। বিয়ের আগেও অশান্তি, বিয়ের পরেও অশান্তি। সেই শয়তানের জন্যেই তো মন্দিরার জীবনের সুখ শান্তি এমন করে নষ্ট হয়ে গেল। সে তার মনে অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়ে দূরে সরে রইল। ধরা দিয়েও ধরা দিল না। শয়তান ছাড়া কি! কিন্তু জীবনের সেই দুষ্টগ্রহকে যত নিন্দাই করুক, যত অভিশাপই দিক, তাকে ভালো না বেসেও যেন উপায় নেই মন্দিরার। ওই দুষ্ট দুশ্চরিত্র মানুষটি স্পর্শ করলে তার সর্বাঙ্গ যেভাবে সাড়া দেয়, সহস্র ধারায় আনন্দের বন্যা ছোটে, ওই সৎ ভালোমানুষ স্বামীর স্পর্শে তা তো হয় না। শয়তান তাকে যত কষ্ট দিয়েছে, তত আনন্দও দিয়েছে। যত পুড়িয়েছে, তত প্রস্ফুটিতও করেছে। কিন্তু স্বামীর স্পর্শে চিত্ত আপনা থেকেই কেন এমন সংকুচিত হয়ে আসে মন্দিরার! এমন একজন সজ্জন, উদার-হৃদয় আদর্শবাদী পুরুষের স্পর্শও কেন তাকে উৎসুক উন্মুখ উল্লসিত করে তোলে না?

মাঝে মাঝে মন্দিরার মনে হয়, মিহির যদি তার স্বামী না হয়ে অন্য কোন গুরুজন হতো, দাদা, সেজকাকা, ছোটমামার মত কেউ একজন, মন্দিরা তাকে সমস্ত মন দিয়ে শ্রদ্ধা করত, সেবা করত, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করত। তার কাছে মন্দিরার স্নেহের চেয়ে বেশি কিছু দাবি থাকত না; সেও মন্দিরার কাছে শ্রদ্ধাভক্তি ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা করত না। কিন্তু মিহির যে সব চায়। সে সর্বেশ্বর হৃদয়েশ্বর হতে চায়। স্বামী যখন, চাইবার তার নিশ্চয়ই অধিকার আছে। মন্দিরাও তো দিতে পারলেই ধন্য হতো। কিন্তু দিতে পারে কই? না কি মিহিরই নিতে জানে না? কার দোষ কে জানে!

আর একজন কিন্তু দিতেও এসেছিল, নিতেও এসেছিল। কিন্তু কেন সে এমন চুপি চুপি চোরের মত এল? আর তাড়া খেয়ে চোরের মত চুপি চুপি

সরে গেল? কেন ডাকাতের মত মন্দিরাকে কেড়ে নিয়ে গেল না? কেন আর একজনের মুখের ওপর জোর করে বলতে পারল না, 'তুমি বিয়ে করেছ বলে মন্দিরা তোমার নয়, আমি তাকে ভালোবেসেছি বলে, ভালোবাসার বাসনা চিরজাগ্রত রেখেছি বলে মন্দিরা আমার!' মন্দিরাকে যদি কেউ বলবার সুযোগ দিত তাহলে সে নিশ্চয়ই একথা বলত। কিন্তু মন্দিরা তো পুরুষ নয়, মেয়ে। পুরুষ হতে হতে হয়নি। শুধু পুরুষের আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে পুষে রেখেছে। আর মনের মত পুরুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেই পুরুষ এই দুই পুরুষের মধ্যে কেউ নয়। না শশাঙ্ক, না মিহির। দুজনেই ভীরু, দুজনেই কাপুরুষ। যেন একই টাকার এ-পিঠ ও-পিঠ। দুজনেই শান্তশিষ্টভাবে ভদ্রতার মুখোশ পরে চলতে চায়। কেউ দুর্জয় দুর্বার দস্যু হতে জানে না। কিন্তু উপায় কি। পুরুষের মত পুরুষ চাই বললেই তো আর গোঁফওয়ালা লম্বা-চওড়া কোন পালোয়ানের বুকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না, কি সেই পুরাণ ইতিহাস রূপকথার বীরপুরুষদের ধ্যান করেও জীবন কাটানো যায় না। যে আধখানা পুরুষ, সিকিখানা পুরুষ কাছাকাছি আসে তার মধ্যেই সেই পুরো একজন পুরুষকে কল্পনা করে নিতে হয়। তাতেও যদি সাধ না মেটে নিজেকেই নিতে হয় পুরুষের ভূমিকা। মন্দিরা মাঝে মাঝে তাই করে। মাঝে মাঝে নিজেকে পুরুষ বলে ভাবে। ছেলেবেলায় নিজের দেহকে পুরুষের সাজে সাজাত, এখন মনকে সাজায়, মনে মনে বলে, 'আমি ভেবেছিলাম, তুমি আমাকে লুঠ করে নেবে। তুমি তো পারলে না। আমি তোমাকে লুঠ করব। আমি ভেবেছিলাম, তুমি দস্যুর মত হবে। ভালো-মন্দ নিন্দা-প্রশংসার কোন ধার ধারবে না। কিন্তু তুমি তেমন বেপরোয়া হতে পারলে না। আমি হব। আমি তোমাকে নিয়ে অজানা রাজ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যাব।'

কে জানে, চিঠিতে হয়তো তিনি সেই নিরুদ্দেশ যাত্রার জন্যেই ডাক দিয়েছিলেন। কোন সংকেত ছিল চিঠিতে, মিলনের কোন উপায়, কোন দিনক্ষণের নির্দেশ ছিল, কিছুই আর এখন তা জানবার জো নেই। সেই চিঠি মিহির গোপন করে রেখেছে। চিরকাল এমনি করবে। শশাঙ্কের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, চিঠিপত্র লেখা চিরদিনের জন্যে জোর করে বন্ধ করে দেবে। মুখোশের আড়াল থেকে এবার ধীরে ধীরে তার নিজ মূর্তি বেরিয়ে আসছে। হিংসুটে, কুটিলস্বভাব পুরুষের মূর্তি।

মন্দিরা যত সেই চিঠি গোপনের কথা ভাবে ভিতরে ভিতরে তত তার আক্রোশ বেড়ে ওঠে। যেন মিহিরের ওই একটি অপরাধের আর তুলনা নেই। নিজের দোষ ত্রুটির কথা মন্দিরার আর মনে পড়ে না। স্বামীর একটি ত্রুটিই বড় হয়ে, নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি হয়ে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। স্বামীর সঙ্গ, সান্নিধ্য, কখনো বা তার আত্মমগ্নতা দুঃসহ মনে হয়। যেন পরম অবাঞ্ছিত এক মানুষের সঙ্গে চিরজীবনের মত কে মন্দিরাকে বেঁধে

দিয়েছে। এই বাঁধন, এই লোহার বাঁধন কি ভেঙে ফেলা যায় না?

মন্দিরা এক এক দিন ঘর ভরে সেই হারানো চিঠি খোঁজে, যেন হারানো প্রাণ। মিহির যখন কলিয়ারীতে চলে যায়, শম্ভু কাজকর্ম সেরে পড়ে পড়ে ঘুমোয়, আর না হয় পাশের বাড়ির চাকরের সঙ্গে বসে আড্ডা দেয়, গুনগুন করে সিনেমার গান গায়, মন্দিরা মিহিরের টেবিলের বইগুলির ভাঁজে ভাঁজে, ড্রয়ারে, স্যুটকেসে তন্ন তন্ন করে সেই চিঠি খোঁজে। জানে সে চিঠি বাড়িতে নেই, সে চিঠি মন্দিরা কোন কালেই পাবে না। তবু খোঁজার মধ্যে একটা নেশা আছে। নৈরাশ্যের মধ্যে যে জ্বালা আছে সেই জ্বালায় জ্বলতে ভালো লাগে মন্দিরার, পুড়তে ভালো লাগে। মিহির সবই খুলে রেখে যায়। তার ড্রয়ার, স্যুটকেস, বাক্সে কোনদিনই চাবি দেয় না। দেবে কেন? তার তো গোপন করবার কিছু নেই। শুধু মন্দিরার একটি পরম গোপন ধন সে চুরি করে নিয়েছে। সেই চোরের বাক্স-ড্রয়ার তল্লাসী করে জিনিসপত্র তছনছ করে ফেলতে উল্লাস লাগে মন্দিরার। ঘরের জিনিসপত্র উলটে-পালটে আবার নিজেই ফের গোছাতে বসে। ঘর যেন তার কাছে খেলাঘরের সমান।

সেদিন মিহিরের কাছে মন্দিরা ধরা পড়ে গেল। মিহিরের সেদিন অত তাড়াতাড়ি আসবার কথা ছিল না। কিন্তু সেদিন একটু অসময়েই ফিরে এল। হেসে বলল, 'শরীরটা ভালো লাগছে না। তাই ঘণ্টাখানেক আগেই চলে এলাম। একটু শুয়ে-বসে আরাম করে নিই, চা করো তো। এ কি, আজ আবার তুমি আমার ড্রয়ার ঘাটছিলে নাকি?'

মিহির হেসেই জিজ্ঞাসা করল।

মন্দিরা সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করে বলল, 'না, তোমার ড্রয়ার আমি ধরিনি।'

মিহির বলল, 'ধরা পড়ে গেছ আর বলছ ধরিনি। কী খুঁজছিলে বল তো।'

মন্দিরা স্বামীর কৌতুকে যোগ না দিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, 'কিছু না।'

মিহির বলল, 'আমি জানি তুমি কী খুঁজছিলে।'

'কী খুঁজছিলাম?'

'সেই চিঠি।'

মন্দিরা এবার স্বীকার করে বলল, 'যদি জানোই তাহলে দিয়ে দাও আমার চিঠি। কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? ইঁদুরকে জাঁতাকলে ফেলে লোকে যেমন কষ্ট দেয়, মজা পায়, তুমি আমাকে নিয়ে তেমনি মজার খেলা খেলছ। তাই না?'

মিহির স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল। তারপর শান্তভাবে বলল, 'মন্দিরা, আমি খেলাধুলো জানিনে। ওসব তোমাদের মনোপলি বিজনেস। চিঠিটা যেভাবে ছিল সেইভাবেই রয়েছে। আমি তা ছিঁড়েও

ফেলিনি, পড়েও দেখিনি।'

'তা হলে আমার চিঠি আমাকে ফিরিয়ে দাও।'

মিহির বলল, 'দেখ। এখন নয়, পরে।'

'কতদিন পরে?'

'ধরো পাঁচ বছর পরে। তখন এ চিঠির জন্যে তোমার কোন কষ্টও থাকবে না, আনন্দও থাকবে না। তখন এ চিঠি আমরা দু'জনে একসঙ্গে বসে হাসতে হাসতে পড়তে পারব।'

মন্দিরা বলল, 'আমি তা কোনদিনই পারব না। আর তোমাকেও তা পারতে দেব না।'

মিহির মৃদু কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলল, 'পারতেই হবে।' তারপর নিজের পড়বার টেবিলে গিয়ে বসল।

মন্দিরা অবশ্য এর পর চা করতে গেল। কিন্তু মিহিরের ভাব দেখে মনে হল না, চা খাওয়ার কোন স্পৃহা আর তার আছে।

আরো দিনকয়েক বাদে মিহির একদিন বলল, 'মন্দিরা, বাড়ির চিঠি পেলাম, মার শরীর ভালো যাচ্ছে না। তোমার এবার সেখানে যাওয়া উচিত।'

মন্দিরা ভাবল, কেবল উচিত আর উচিত নয়। আনন্দ নেই আহ্লাদ নেই, প্রীতি নেই ভালোবাসা নেই। কেবল should not আর ought notএর এথিক্স। মন্দিরা কিছু মানতে চায় না। বিধি-নিষেধের শাসন মানতে মানতে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। আর নয়। যেখানে শাসন নেই, অনুশাসন নেই, সেই যদৃচ্ছ বেপরোয়া জীবনের মধ্যে মন্দিরা এবার মুক্তি চায়।

একটু চুপ করে থেকে মন্দিরা স্বামীর কথার জবাব দিলে, 'আমি গিয়ে কী করব। আমার সেবা তিনি নেবেন না, আমার ছোঁয়া তিনি খাবেন না। আমার সেখানে গিয়ে লাভ কি। আমি সেখানে অমন অস্পৃশ্যা হয়ে থাকতে পারব না।'

মিহির একটু হেসে বলল, 'অস্পৃশ্যা হয়ে থাকবে কেন। মা নিশ্চয়ই আর আগের মত নেই। তিনি যাই করুন না, তোমার কর্তব্য তুমি করবে।'

মন্দিরা বলল, 'আমি অমন একতরফা জোরজবরদস্তি কর্তব্যে বিশ্বাস করিনে। আমার যা করতে ভালো লাগবে আমি তাই করব। আমি যা করে আনন্দ পাব আমি তাই করব।'

মিহির বলল, 'অনেক সময় কুকাজেও তোমার আনন্দ হতে পারে। যেমন কুখাদ্যে কারো কারো রুচি হয়। তা রুচি নয়, কুরুচি। তা ছাড়া তুমি আমাদের পরিবারের একজন। বাড়ির কারোর অসুখ-বিসুখ হলে তুমি তাকে দেখবে না!' স্ত্রীর দিকে চেয়ে মিহির একটু হাসল, তারপর কোমল গলায় আদরের সুরে বলল, 'বাবা-মার যা বয়স, ওই বয়সে সবাই একটু সেবা-টেবা চান। সেবা-শুশ্রূষায় তুমি সহজেই তাঁদের মন গলাতে পারবে। তা ছাড়া ওখানে তো

শুধু মা-ই নেই, বাবা আছেন, বিশাখা তপন সবাই আছে। ওখানে গেলে তোমার ভালোই লাগবে।'

মন্দিরা ভাবল, তখনো তো সবাই ছিল। কিন্তু ভালো কি লেগেছে? আমারও ভালো লাগেনি, তাদেরও ভালো লাগেনি। এখন কী এমন হাওয়া বদলেছে যে, সব উলটে যাবে? আমি যাব না। যেখানে ভালো লাগে না আমি সেখানে যাব না। এখানে একজনের শাসন, সেখানে দশজনের শাসন। অত শাসন, অত বাঁধনের মধ্যে আমি কিছুতেই যাব না।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে মন্দিরা বলল, 'আমি সব বুঝতে পারি। ওসব অসুখ-বিসুখের কথা তোমার ছল।'

মিহির কঠিন স্বরে বলল, 'ছল! আমি কখনো ছলনা করিনি মন্দিরা।'

মন্দিরা বলল, 'আগে না করলেও এখন করছ। এখন তুমি সব করতে পার। আসলে এখানে আর আমাকে তোমার ভালো লাগছে না। এখানে আমাকে আর তোমার রাখতে ইচ্ছা করছে না। তাই ঠেলে পাঠাচ্ছ সেই টালিগঞ্জে। তোমার বাবা-মার কাছে।'

মিহির দৃঢ়স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, সেখানে তোমার যাওয়া উচিত, সেখানে তোমাকে যেতে হবে।'

'কেন যেতে হবে শুনি? আমি কি একটা মাটির ঢেলা না পাথরের নুড়ি? জুতোর ঠোক্করে তুমি যেখানেই আমাকে ঠেলে দেবে সেখানেই আমাকে যেতে হবে? আমি তা যাব না। হয় আমি এখানে থাকব, না হয় আমার বাবার কাছে চলে যাব।'

মিহির বলল, 'তোমার যেখানে ইচ্ছে সেখানেই তুমি যেতে পার না।'

'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বুঝি তুমি আটকে রাখতে পার?'

এবার মিহিরও ধৈর্য হারাল। কঠিন স্বরে বলল, 'দরকার হলে তাই রাখতে হবে। তোমার মত মেয়েকে সেইভাবেই রাখতে হয়।'

কিন্তু ঝগড়া করা মিহিরের স্বভাব নয়। বেশিক্ষণ কথা কাটাকাটি করতে সে পারেও না। একটু বাদেই স্ত্রীর সামনে থেকে সে সরে গেল।

সরে গেলেও নিশ্চিন্ত হতে পারল না মন্দিরা। স্বামীকে তার চিনতে বাকি নেই। যা সে মুখে পারে না তা সে কাজে করে। এই মানুষটির রাগ চোখে-মুখে খুব কমই ফুটে ওঠে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তা সে সযত্নে পুষে রাখে। সেই অন্তর্দাহকে সে নিজেও ভোলে না, আর কাউকেও ভুলতে দেয় না। জেদ আর আক্রোশে নিঃশব্দে সে নিজের কাজ করে যায়। যা সে করবে বলে মনে করে তার থেকে তাকে কিছুতেই টলানো যায় না। মন্দিরা জানে মিহির ঠিক তার বাবাকে চিঠি লিখবে। তারপর সেখানে তাকে পাঠিয়ে দেবে। আবার খেয়াল হলে আরো এক জায়গায়। জেল থেকে জেলে কয়েদীরা যেমন বদলি হয়, মন্দিরাও জীবনভোর তেমন বদলি হতে হতে চলবে। কিন্তু

তার ভাগ্য বদলাবে না। যেখানেই যাক, জেল জেলই থেকে যাবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে, রুচির বিরুদ্ধে তাকে এক নীরস আনন্দহীন জীবন বয়ে বেড়াতে হবে। সুখে না থেকেও বলতে হবে সুখে আছি। ভাবতে হবে সুখে আছি। আজীবন একটা মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে যেতে হবে। কেন? কিসের জন্যে? কার জন্যে জীবনভোর সে এই দুঃখ ভোগ করতে যাবে, যখন সুখের সন্ধান সে পেয়েছে? বাবা সব জেনেও তাকে জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন শাস্তি দেবার জন্যে। মিহির সব জেনেও তাকে বিয়ে করেছে, নিশ্চয়ই শাস্তি দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। যে-সে শাস্তি নয়, সারা জীবনের কারাদণ্ড। তিলে তিলে জ্বলে মরবার, পুড়ে মরবার শাস্তি। কেন এমন করে মরবে মন্দিরা, বাঁচবার উপায় যখন রয়েছে?

ঘরকে যতই কারাগার বলে মনে হতে লাগল মন্দিরার ততই পালাবার ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসল। 'পালাও পালাও, এই সুযোগ হাতছাড়া কোরো না।' কে যেন ভিতর থেকে বার বার কানে কানে বলতে লাগল, 'পালাও, পালাও।' রান্নাবান্না ঘরসংসার সাজানো-গুছানোর ফাঁকে ফাঁকে সেই একই শব্দ বার বার গুঞ্জিত হতে লাগল, 'পালাও, পালাও।'

বিয়ের আগেও মন্দিরা একবার পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু তখন পারেনি, তখন তার সাহসে কুলোয়নি। সেখানে আরো কড়া পাহারা ছিল। উঁচু দেওয়াল ডিঙাবার জো ছিল না। প্রভুভক্ত দারোয়ানের চোখ এড়াবার উপায় ছিল না। কোন পথ ছিল না নিষ্কৃতির। কিন্তু এখানে পথ যেন ঘরের মাঝখানে চলে এসেছে। এখানে পথ যেন হাত ধরে টান দিচ্ছে মন্দিরার। এখানকার পথ কিছুতেই তাকে আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দিচ্ছে না।

বিকালের শিফটে ডিউটি পড়েছে মিহিরের। আট-নয় ঘণ্টার মধ্যে সে আর বাড়ি ফেরে না। খাদের কাজ শেষ হলে অফিসে যায়। সেখানেও ঘণ্টা-খানেক কাটিয়ে তারপর আসে। চাকর শম্ভু কাজকর্ম সেরে আড্ডা দিতে বেরোয়। বাড়ি একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেই পথ চোখে পড়ে। আর সেই পথ দেখে মন্দিরার পা কাঁপে, বুক টিপটিপ করে। পথই যেন প্রণয়ী।

সরু পথের ওপারে খানিকটা ফাঁকা মাঠ। তার ওপারে বাঁধানো রাস্তা। সে রাস্তায় বাস চলে। তার চাকার ঘর্ঘর শব্দ ঘর থেকেও শোনা যায়। সে শব্দে বুক কাঁপে মন্দিরার। কিন্তু সে কম্পন শুধু যেন ভয়ের নয়—দুরন্ত লোভের, অনাস্বাদিত সুখের, দুর্জ্ঞেয় রহস্যের, দুর্নিবার বাসনার। পথের দৃশ্য তাকে টানে, রথের শব্দ তাকে টানে, আর আড়াল থেকে কে যেন তার কানে কানে অহর্নিশ বলে, 'চলে এসো, চলে এসো।'

তবু একদিনে হল না, দুদিনে হল না, তৃতীয় দিনের চেষ্টায় মন্দিরা পথে পা বাড়াতে পারল। তখনো পা কাঁপছে, বুক কাঁপছে, যেন সমস্ত দুনিয়াই

থরথর করে কাঁপছে। তবু ঘরের চেয়ে বাইরের আকর্ষণই তার কাছে বড় হয়ে উঠল। স্থির শান্ত নিশ্চিত গৃহাশ্রয়ের চেয়ে সেই অনিশ্চিত পথ আর পথের সেই চঞ্চল দুরন্ত রক্তবর্ণের বাসখানিই তাকে আকর্ষণ করে নিল।

রোদে চারদিক ঝলসে যাচ্ছে। স্তব্ধ দুপুর। পথে কোন চেনা মুখ তো ভালো, কারো মুখই চোখে পড়ল না। কি পাছে চোখে পড়ে তাই কোন দিকে তাকাল না মন্দিরা।

শুধু বাস-স্টপের কাছাকাছি এসে কে একজন চেনা চেনা ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কি মিসেস মুখার্জি, কোথায় চলেছেন?'

মন্দিরা বলল, 'বাসে—'

'বাসে করে কোথায় যাবেন? আসানসোল পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ।'

'একা একাই চলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য, ব্যাগটা নিজেই বয়ে নিচ্ছেন? বাড়িতে লোকজন কেউ নেই নাকি? দিন আমাকে। আমি তুলে দিচ্ছি।'

মন্দিরা বলল, 'এমন কিছু ভারি না। আমি নিজেই নিতে পারব।'

ভারি হবে কী করে। বিশেষ কিছু তো সঙ্গে আনেনি মন্দিরা। শাড়ি গয়না টাকা-পয়সা সবই রেখে এসেছে। শুধু পাথেয় আর দু-একখানা পরিধেয় ছাড়া কিছুই আনেনি। বোঝা বাড়িয়ে কী হবে। সে যা চায় তাই যদি পায় জিনিসপত্রের তার অভাব হবে না।

ঘরের চাবি দিয়ে এসেছে প্রতিবেশিনীর কাছে। কিছু বলে আসেনি, কিছু লিখে আসেনি।

শুধু চলে আসা দিয়ে সব মুছে দিয়ে এসেছে।

॥ ১৯ ॥

প্রিন্সিপ্যাল সেদিন ক'জন বন্ধুকে চা খেতে ডেকেছিলেন। সহকর্মীরাও ছিলেন। নিমন্ত্রণ সেরে শশাঙ্ক সন্ধ্যার পর সোজা বাড়িতেই চলে এল। আজকাল আর নৈশ বিহারে তার মন নেই। সন্ধ্যার পর এখন সে বড় একটা বেরোয় না। চুপচাপ নিজের টেবিলে এসে বসে থাকে। কখনো পড়ে কখনো এটা ওটা লেখার চেষ্টা করে। কিছুই হয় না। নিজের মনঃপূত হয় না। তার সেই ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস লেখার উদ্যোগ আর এগোয়নি। খানিকটা লিখে ফেলে রেখেছে, খানিকটা লিখে ছিঁড়ে ফেলেছে। আরো বহু রচনার ইতিহাসই এই। ফেলে রাখা আর ছিঁড়ে ফেলা। সারা জীবনের

ইতিহাসই এই। সবাই ভাবে আকৈশোর শশাঙ্ক মেয়েদের নিয়ে খেলেছে। আসলে খেলেছে সে নিজের সঙ্গে। নিজের জীবন নিয়ে জুয়া খেলেছে। তার মত পরম জুয়াড়ী আর কে!

আজও ড্রয়িংরুমের পাশে একতলার ছোট ঘরখানায় শশাঙ্ক এসে আলো জেবলে বসল। ঘরখানা ফের অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। র‍্যাকের বইগুলি এলো-মেলো ছড়ানো ছিটানো। মেঝেয় কাগজ আর ম্যাগাজিনগুলি লুটোপুটি খাচ্ছে। বস্তুরও যেন হাত পা আছে। শশাঙ্কের মত তার ঘরের আসবাবপত্রগুলিও যেন স্বেচ্ছাচারী। টেবিলের নিচে পরম সুদৃশ্য একটি বেতের ঝুড়ি। সে ঝুড়ি ছেঁড়া কাগজে বোঝাই। সবই দামি কাগজ। দামি কালিতে লেখা লেখাও সুন্দর। তবু সবই ওই ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে। শশাঙ্কের বহু চিন্তা, বহু ইচ্ছা ওই কাগজের ঝুড়িতে জায়গা করে নিয়েছে। ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে শশাঙ্ক নিজের মনেই হাসল, 'আমি আর আমার এই বাস্‌কেটটি এক।'

প্রিন্সিপ্যালের বাড়িতে বৈকালিক চায়ের আসরে অনেকের সঙ্গেই দেখা হল। তাঁরা কেউ ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি নন। প্রত্যেকেরই দেখাবার মত কিছু না কিছু আছে। কেউ বিজ্ঞানী, কেউ চিকিৎসা বিজ্ঞানী, কেউ গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, কেউ বা পাঠ্য বইয়ের বোধিনী লিখে অর্থ করেছেন। একজন স্কুল মাস্টারের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি আর কিছু করেননি। গাড়ি না, বাড়ি না, শুধু চারটি ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছেন। তারা সবাই পড়াশুনোয় ভালো, স্বভাব চরিত্রে সৎ। কেউ কেউ স্কলারশিপ পেয়ে পাস করেছে। সমাজকে সেই তাঁর দান। কিন্তু শশাঙ্কের ক্রেডিটে কী আছে। শশাঙ্ক নিজের দিকে তাকিয়ে হাসল—'আমার ক্রেডিটে শুধু চুম্বন আলিঙ্গনের স্মৃতি। তার সংখ্যা হয়তো কয়েক লক্ষ হবে। রঙীন ফিতেয় বাঁধা ড্রয়ারবোঝাই মেয়েদের চিঠি। তার সংখ্যা কয়েক হাজার হবে। আর তাদের প্রীতি-উপহার ধূপদানি দোয়াতদানি আতরদানি ছাইদানি। তাদের হৃদয় দানের ঐতিহাসিক নজীর। নীলামে দিলে এর দামও নিতান্ত কম হবে না। আমিই বা কম কিসে।' শশাঙ্ক হাসল— 'আমি জানি অনেক জ্ঞানীগুণী কৃতী ব্যক্তিরই অবৈধ প্রণয় সম্পর্ক রয়েছে। কিংবা জীবনের কোন না কোন সময়ে ছিল। ওঁদের কেউ কেউ আমার মতই মরবিড, আমার চেয়েও মরবিড। আমি জানি। যদিও সে কথা মরলেও স্বীকার করবেন না। আর আত্মজীবনী লেখার সময় দেয়ালগুলি সব চূণকামে ঢেকে দেবেন। একটি কলঙ্ক রেখাও যেন কোথাও ফুটে না বেরোয়। এই হিপক্রেসির নামই সভ্যতা শালীনতা সাহিত্য সংস্কৃতি।'

শশাঙ্ক তার সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ফের একটু হাসল।

'তবু ওঁদের জমার ঘরে অনেক আছে। কারো টাকার অঙ্ক, কারো ক্ষমতার অহংকার। কারো যশ। সেই যশ কারো শুধু নিজের পাড়াটুকুর মধ্যে, কারো বা দেশে-বিদেশে বিস্তৃত। কারো যশ দূরকালে বিস্তৃত। কারো বা জীবন-

কালের মেয়াদ। কারো বা শুধুই নিজের যৌবনকালে সীমাবদ্ধ। তবু তো যশ। তবু তো জীবনের একটি ভিন্ন রসাস্বাদন। যশ আর অর্থ ছাড়াও আরো কত গভীর স্বাদ আছে। সে স্বাদ জ্ঞানে। জ্ঞানার্জনে। কারো কারো জমার ঘরে সেই প্রচুর স্বোপার্জিত ধন আছে। কিছু বা অপচয় আছে যৌন-কামনার জোগানদানে। তাতে কিছু এসে যায় না। তাঁদের খরচের ঘরের চেয়ে জমার ঘর ভারী। আর আমি? আমার জমা কিছু নেই, শুধু খরচের খাতা খুলে বসে আছি। সারাজীবন আমি শুধু এক বিশাল মোমবাতি হয়ে জ্বলেছি। আমার জীবনপাত্র শুধু রতির আরতিপাত্র। আমি অবশ্য বলতে পারি এই পাত্রের দামই বা কম কিসে? ধরা যাক জীবনভোর আমি কিছুই করিনি, কিছু অর্জন করিনি, কিছু সর্জন করিনি, আমি শুধু ভোগ করেছি সম্ভোগ করেছি বোধ করেছি অনুভব করেছি। সে সব করা কি কিছু করা নয়? সবই অকর্মক ক্রিয়া? অকর্মক তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি শুধু গায়ের জোরে গলার জোরে তাকে সকর্মক করে তুলতে পারব না। আমি যতই স্বাতন্ত্র্যবাদী হই, একটি স্বতন্ত্র মূল্যের স্বতন্ত্র পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারব না। যদিও আমার লোভ এখনো আছে। স্তবন্ত্র বিশ্ব রচনার লোভ। সে বিশ্ব শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিশ্ব। সে বিশ্বে শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতির জয় গান। সে বিশ্ব শুধু পুরুষের আলস্য আর নারীর লাস্য দিয়ে গড়া। সে বিশ্বকে বিশ্ববাসীরা অস্বীকার করে। আমার স্বীকৃতির মধ্যেই শুধু তার অস্তিত্ব। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার সাধ হয় সে বিশ্ব সবাইর স্বীকৃতি পাক। সর্বজনের অনুমোদন। কিন্তু তা সম্ভব হয় না। যদি তা হতোও, সেই গোপন বিশ্ব যদি দিনের আলোয় প্রকাশিত হতো তাহলে আমি হয়তো সবচেয়ে আগে সেই বিশ্বকে অস্বীকার করতাম। নতুনতর গোপনতর বিশ্বসৃষ্টির প্রয়াসী হতাম।'

টেবল ল্যাম্পটি সামনে রেখে বাসনাবিলাসী শশাঙ্ক, ভাবনাবিলাসী শশাঙ্ক নিজের চিন্তাস্রোতে ভেসে চলল। দুস্তর সমুদ্রে ওই ল্যাম্পটি যেন লাইট হাউস। অকর্মণ্যতার অতলান্ত অন্ধকারে শশাঙ্ক যে ভাবতে পারে অনুভব করতে পারে, কিছু কিছু উপলব্ধি করতে পারে সেইটুকুই তার ক্ষীণ আলোর রেখা।

'আমি অকর্মণ্য। জীবিকার জন্য ছেলেদের কাছে বক্তৃতা করি। মাঝে মাঝে ভাড়াটে বক্তা হয়ে এখানে সেখানে বক্তৃতা দিতে বেরোই, কিছু হাততালি কিছু ফুলের মালা কুড়িয়ে নিয়ে আসি। সেই কি যথেষ্ট? আমার আরো অনেক কাজ করবার ছিল। করবার ইচ্ছা ছিল। সে ইচ্ছা এখনো আছে। কিন্তু আমার সব ইচ্ছা আমি ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছি। মুরারিদা মাঝে মাঝে বলেন দিনরাত তাঁর মদে ডুবে থাকতে ইচ্ছা করে। আমার সে ইচ্ছা করে না। তবু আমি মদে ডুবে আছি। ইন্দ্রিয় সুখের মদ, আলস্যের সুরাসার। যে কোন মদের চেয়ে তা ক্ষতিকর। অলস মস্তিষ্ক নাকি শয়তানের কর্মক্ষেত্র।

শয়তানের না হোক কামদেবের লীলাক্ষেত্র, তাতে আমি নিঃসন্দেহ। আমি যখন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি সান্নিধ্যতৃষ্ণা আমাকে ব্যাকুল করে তোলে না, রতিস্পৃহা থেকে আমি তখন বিরত থাকি। যখনই আমি কর্মহীন তখনই কামের অধীন। কাম মানুষকে কর্মে উদ্দীপিত করে, কর্মে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু কাম আমাকে কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনে ফুলশয্যায় বন্দী করে রেখেছে। 'সন্ধ্যায় মুদ্রিত দল পদ্মের কোরকে' আমি আবদ্ধ ভ্রমর। সারা গায়ে আমি স্বর্ণরেণু মেখে বসে আছি। কিন্তু আমার বেরোবার সাধ্য নেই। জ্ঞানের ঊর্ধ্বাকাশে আমি পাখা মেলতে পারব না, কর্মের বিস্তৃত ক্ষেত্রে আমার সঞ্চরণের সাধ্য নেই। আমার ঐকান্তিক ইন্দ্রিয়চর্চার এই হল ফলশ্রুতি।'

শশাঙ্ক যে ভাষায় প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেয়, ঘরের কোণে নিজের মনে তার ভাবনার ভাষাও প্রায় সেই রূপ নিল। সে নিজেই যেন তার লক্ষ লক্ষ শ্রোতা।

শশাঙ্ক নিজের মনে বলল, 'আমি কর্মচোর। আমি আমার স্বকর্মকে চুরি করেছি। আমি পরস্বের দিকে হাত বাড়াইনি, নিজের সর্বস্ব হরণ করেছি। আশ্চর্য, অথচ আমি জানি, কর্মভীরু আমি জানি, এই যৌনকামনা মানুষকে অনেক সময় কর্মবীর করে। কে না জানে অঙ্গনারা বীরের অঙ্কশায়িনী হয়? পুরুষের সেই বীরত্ব জ্ঞানে আর কর্মে। কৃত্যে কৃতিত্বে। বীর পুরুষ যখন ভোগী পুরুষ হয় সম্ভোগী পুরুষ হয়, তার সেই সম্ভোগ লালসা সমাজ গণ্ডূষে গণ্ডূষে পান করে। কিন্তু সেই লালসা যদি তাকে অকৃতী অকর্মণ্য করে তোলে, নিন্দায় ধিক্কারে তার নিমজ্জন চিরদিনের জন্য। আমি আমার ইন্দ্রিয়পরতা দিয়ে অন্য কারো ক্ষতি করিনি। কোন মেয়েকে পথে বসাইনি ঘরছাড়া করিনি। শুধু নিজেকে ছন্নছাড়া করেছি। ক'জন মেয়ে মুরারিদার জন্যে আত্মহত্যা করেছে, ক'জন অনূঢ় রয়েছে, মুরারিদা তাই নিয়ে গর্ব করতে পারেন, আমি করিনে। আমি কোন সম্পর্ককে অমন স্থায়ী সুতোয় বাঁধতে রাজী নই। না শারীরিক অর্থে না মানসিক অর্থে। রঙীন সুতোকে চির-স্থায়ী করতে গেলে তা দড়ি হয়ে ওঠে। কয়েক বছরের বিবাহিত জীবনে আমি তা দেখেছি। যদিও অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তির নামই জীবন, তবু স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সে অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি আমি চাইনে। আমি ক্ষণিকেরবাদী। আমি ক্ষণ বসন্তের জয়মাল্য পরতে এসেছি। সে মালাও ক্ষণিকের। আমি শুধু ক্ষণিকের জন্যে একজনকে মোহগ্রস্ত করতে পারি, ক্ষণিকের জন্যে মুগ্ধ হই। কখনো বা আরো একটু বেশিক্ষণের জন্যে। যেখানে ভোগস্পৃহার দীর্ঘায়ুতা বেশি সেখানেই দুঃখ আর বিড়ম্বনা। মন্দিরার বেলায় আমি সেই বিড়ম্বনাকে বরণ করেছি। বালকের মত কাজ করেছি। আসক্তি আমাকে সেই মূঢ়তার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে। কোন দরকার ছিল না। আমি শুধু নারীর ফর্ম ভালোবাসি। সেই ফর্ম একটি বিশেষ রূপের মধ্যে নেই। তাই পৃথিবীতে

যত রূপ আমার তত কামনা। যত ফুল তত স্পৃহা। এই রূপের জন্যে মুরারিদার যেমন রক্ত মাংসের পুরো দেহটাই দরকার, আমি সব সময় সেই দরকার বোধ করিনে। অনেক সময় দেহ-গন্ধই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কাম-গন্ধ আমি ধ্বনিতে পাই দৃশ্যে পাই রেখায় পাই, লেখায় পাই, ভাবে পাই ব্যঞ্জনায় পাই। এই জন্যেই রূপ আমার কাছে কখনো কখনো ভাব-রূপ। মুরারিদা বলবেন, এ তোমার মেয়েলিপনা। ভীরুতা, ক্ষীণ পুরুষত্বের লক্ষণ। হয়তো তাই। কিন্তু আমার কাম এমন পরোক্ষ বলেই তা এমন পরিব্যাপ্ত। আর সেই জন্যেই আমি সব সময় কামী। মুরারিদার মত এবং আরো অনেকের মত আমি কখনো কামী কখনো কর্মী নই। আমি অনুক্ষণ শুধু মনসিজের অনুগামী।'

দোরের বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়ানোর শব্দ হল। উৎকর্ণ হয়ে উঠল শশাঙ্ক। কে এল এত রাত্রে? একটু বাদে কলিং বেল বেজে উঠল। কে এল?

শশাঙ্ককে উঠতে হল না। রামেশ্বরই গিয়ে দোর খুলে দিল। তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে বলল, 'মন্দিরা দিদিমণি এসেছেন। যাই ট্যাক্সি-ওয়ালাকে বিদায় করে দিয়ে আসি।'

আলাদা টাকা চাইলে না রামেশ্বর। দৈনিক সংসার চালাবার যে খরচ ওর কাছে থাকে সেই টাকা থেকেই ট্যাক্সির ভাড়া দিতে গেল।

সুন্দরী তরুণী অতিথিকে দেখে রামেশ্বরই যেন বেশি খুশি হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত ভাড়াটা বোধ হয় মন্দিরাই দিল।

দোরের কাছে তাই নিয়ে রামেশ্বরের একটু অনুযোগ শোনা গেল। 'এ কি দিদিমণি, আপনি কেন দিচ্ছেন। টাকা তো আমার কাছেই ছিল।'

মন্দিরার কোন কথা শোনা গেল না। কিন্তু পায়ের সাড়া মিলল।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল মন্দিরা। নিজের ঘরখানার দিকে আর একবার তাকাল শশাঙ্ক। সেই অগোছালো অপরিচ্ছন্ন ঘর, আর অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্ন-ভিন্ন ঘরের মালিক।

এক মুহূর্ত বিস্মিত হয়ে থেকে মন্দিরার দিকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিল শশাঙ্ক। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'আশ্চর্য, তুমি!'

যে ঝড় শশাঙ্কের ভিতরে বয়ে চলেছে তারই ঝাপটা কি মন্দিরার মুখে এসেও লেগেছে? কোন ঝোড়ো হাওয়াই কি ঠেলে নিয়ে এসেছে মন্দিরাকে? ওর চোখে মুখে তারই চিহ্ন?

মন্দিরাও শশাঙ্ককে এতক্ষণ দেখছিল। একটু হেসে বলল, 'হ্যাঁ আমিই। অবাক হয়ে গেছেন?'

শশাঙ্ক বলল, 'তা একটু হয়েছি। তোমার সঙ্গে আর কে এসেছেন?'

'আর আবার কে? ট্যাক্সি ড্রাইভার ছিল। ভাড়া নিয়ে চলে গেছে।'

'কোত্থেকে আসছ?'

মন্দিরা বলল, 'বাবারে বাবা। এ তো আচ্ছা পেপার-সেটারের পাল্লায় পড়েছি। এখন আসছি হাওড়া স্টেশন থেকে। তার আগে মীরপুর থেকে পালিয়েছি।'

'পালিয়ে?'

'হ্যাঁ। আপনি পালিয়ে পালিয়ে যেতে পারেন, আর আমি আসতে পারিনে?'

'তুমি ঠাট্টা করছ?'

মন্দিরা বলল, 'মোটেই ঠাট্টা নয়, আমি সত্যি চলে এসেছি। আর টিঁকতে পারলাম না।'

শশাঙ্ক একটু ভীত একটু বিব্রতভাবে বলল, 'কিন্তু কেন?'

মন্দিরা অবাক হল। তারপর অভিমানের সুরে বলল, 'কেন? আপনি জানেন না, কেন?' তারপর একটু হাসল মন্দিরা, 'আপনার জন্যে। ফের একসঙ্গে পালাব বলে।'

এই রোমান্সের ক্ষুধা তো শশাঙ্কেরও রক্তে। সেও তো নিজেকে মাঝে মাঝে এক অবাস্তব কাহিনীর নায়ক বলে কল্পনা করে। কল্পনা করে আনন্দ পায়। এই বস্তুজগতের নিয়মকানুন মেনে চলা, এর ভার বহন করা তার পক্ষে অসাধ্য বলে ভাবে। কিন্তু রোমান্স যখন সত্যিই রিয়াল হয়ে দেখা দিল তখন শশাঙ্কের মনে হল এও তার সহনাতীত। ধারণযোগ্য নয়, বিশ্বাসগ্রাহ্য নয়।

'তুমি কি সত্যি সত্যি মিহিরবাবুকে না বলে চলে এসেছ?'

মন্দিরা বলল, 'বলে এলে কি আসতে দিত?'

'তাহলে তো একটি টেলিগ্রাম করে দিতে হয়।'

মন্দিরা বলল, 'টেলিগ্রাম! টেলিগ্রাম আমরা কেন করতে যাব? এতক্ষণ কত জায়গায় কত টেলিগ্রাম ছুটোছুটি করছে। আমার বাবার কাছে, তার বাবার কাছে। থানায় থানায়।'

শশাঙ্ক একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি কি আমার চিঠি পাওনি?'

'পেয়েছি। কিন্তু হাতে পাইনি। পড়তে পারিনি। আমার চিঠি কেড়ে নিয়েছে। আপনি ক'খানা চিঠি লিখেছেন?'

'একখানাই।'

মন্দিরা একটু নিরাশ হয়ে বলল, 'মাত্র একখানা? আমি ভেবেছিলাম না জানি কত। আরো কেন লিখলেন না? আরো লিখলে ভালো হতো। আরো পড়ত আরো জানত। কিন্তু আমাদের তাতে কিছুই এসে যেত না। আমরা এখন সবাইর নাগালের বাইরে। আমরা আর কার ধার ধারি?'

মন্দিরার এই উল্লাস হঠাৎ যেন অস্বাভাবিক বলে মনে হল শশাঙ্কের। ও কি মদ খেয়েছে, না অভিনয় করছে? অভিনয় হলে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু সত্য হলে সহ্য করা যায় না। ওইটুকু মেয়ে বিনা কারণে, বিনা ঝগড়া-বিবাদে শুধু বাসনার তাড়নায় খেলাঘরের মত স্বামীর ঘর পায়ে ঠেলে চলে এসেছে

এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। অলৌকিক অস্বাভাবিক কিছু দেখলে শশাঙ্কের কাম অবদমিত হয়, ভয় আর শঙ্কা রাজত্ব করে। কামে যেমন কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায় ভয়ও তেমনি কামকে বিলুপ্ত করে। সেই ভয় প্রৌঢ়কে বালক করে, কামের মতই প্রবীণকে তার সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা ভুলিয়ে দেয়। শশাঙ্কের কামও জান্তব, ভয়ও জান্তব।

খাদের মধ্যে শুধু পথ হারাবার ভয়ে নয়, প্রাণ হারাবার ভয়েও ভীত শশাঙ্ক শিশুর মত আচরণ করেছে। পরে তাই নিয়ে সে নিজেও হেসেছে। কিন্তু পরে, অনেক পরে। ঠিক সেই মুহূর্তে নয়।

আজ আবার আর এক ধরনের ভয় মিলনের বাধা ঘটাল। যে বাসনার আগুনে শশাঙ্ক সারাজীবন জ্বলেছে, কতজনকে জ্বালিয়েছে, রীতিনীতি রুচি শুচিতার প্রশ্ন তোলেনি, সেই বাসনার মশাল জেবলেই যখন আর একটি মেয়ে তার ঘরের মধ্যে ছুটে এল তখন ফের কামার্ত শশাঙ্ক ভয়ার্ত হয়ে উঠল। মন্দিরার কৈশোর থেকে এই বাসনা তার দেহে মনে শশাঙ্ক নিজেই জ্বালিয়েছে। আজ সেই জ্বলন্ত প্রলয়শিখা তাকে গ্রাস করতে এসেছে। ভয়ে মনে মনে পিছিয়ে গেল শশাঙ্ক। কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে সরবার কি আর জায়গা আছে?

রামেশ্বর প্লেটে করে খাবার নিয়ে এল। বলল, 'আপনার জন্যেও আনব? নাকি শুধু চা খাবেন!'

শশাঙ্ক তাকে তাড়া দিয়ে বলল, 'যা এখান থেকে।'

ভয়ে নয়, লজ্জায় একটু হাসল রামেশ্বর। 'যাচ্ছি বাবু। আপনারা গল্প করুন।'

রামেশ্বর পর্দা সরিয়ে বাইরে চলে গেল।

শশাঙ্ক স্থির হয়ে চুপ করে তার চেয়ারে বসে রইল। বাঞ্ছিতা তরুণী নারী উপযাচিকা হয়ে ঘরে এসেছে। সুখদা স্বয়মাগতা হয়ে এসেছে মন্দিরা। অন্য সময় হলে অন্য কেউ হলে শশাঙ্ক এমন স্থির হয়ে বসে থাকতে পারত না। স্পর্শলোলুপ শশাঙ্ক তার হাত ধরত। বাধা দিলে তাকে জড়িয়ে ধরত। কিন্তু এই মুহূর্তে মন্দিরা যখন স্বেচ্ছায় এসে ধরা দিয়েছে, শশাঙ্কের আর যেন তাকে ধরবার আগ্রহ নেই, ছোঁবার ইচ্ছা কোথায় চলে গেছে কে জানে। সমস্ত ব্যাপারটা এখনো অবিশ্বাস্য, কিছুটা বা হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে শশাঙ্কের। মন্দিরা যেন সত্যিই স্বামীর ঘর থেকে পালিয়ে আসেনি স্কুল থেকে পালিয়েছে একটি তের-চোদ্দ বছরের মেয়ে। আর শশাঙ্কের যেন বয়সের গাছপাথর নেই। পাহাড়ের জরাভার নিয়ে অচল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'ও কি, কিছু খাচ্ছ না যে? খাও।' শশাঙ্ক অনেকক্ষণ পরে কথা বলল।

মন্দিরা এতক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। এবার মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমি তো খাব না। আগে বলুন আমার সঙ্গে কেন আপনি অমন

ব্যবহার করছেন?'

'বাঃ রে, কী ব্যবহার করছি।'

'কথা বলছেন না, কাছে ডাকছেন না, যেন চিনতেই পারছেন না আমাকে।'

'শোন, ওইভাবে চলে এসে তুমি ভালো কাজ করনি।'

প্রত্যাখ্যানে অপমানে মন্দিরার উগ্রতা আরো বেড়ে গেল। সে তীব্রস্বরে বলতে লাগল, 'ভালো কাজ? আপনি জীবনভর খুব ভালো কাজ করেছেন? মীরপুরেও খুব ভালো কাজ করতে গিয়েছিলেন? আপনার বুঝি ইচ্ছে আমি যেমন বাপের বাড়িতে ছিলাম স্বামীর বাড়িতেও তেমনি করে পড়ে থাকি, আর আপনি আগের মতই পালিয়ে পালিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে—।' শশাঙ্ক বাধা দিয়ে বলল, 'তুমি কি বলছ মন্দিরা?' 'আমি তা কিছুতেই হতে দেব না। আমি ঘরে একজন বাইরে একজনকে চাইনে। আমি শুধু একজনকেই চাই। আমি এখানে থাকবার জন্যে এসেছি, এখানেই থাকব।'

আশ্চর্য, তবু শশাঙ্ক ভুল বুঝল। তার মনে হল এ যেন প্রেমের জোর নয়, গায়ের জোর। মন্দিরা যেন সেই জবরদস্তি খাটাবার জন্যে এসেছে।

স্থূলতা রূঢ়তা কুশ্রীতা কর্কশতা সমস্ত পরিবেশকে যেন নষ্ট করে দিয়েছে। শশাঙ্কের মনে হল সেই সুজাতাই যেন মন্দিরার ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে শশাঙ্ক শান্তভাবে মন্দিরাকে বোঝাতে লাগল। প্রণয়ের লেশমাত্রও সেই মুহূর্তে তার মনে ছিল না। যেন শরিকের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা চলছে।

'শোন, তুমি চলে আসতে চাও এসো। কিন্তু এভাবে আসাটা তো ঠিক নয়। এতে নানারকম ঝামেলা আছে, হাঙ্গামা আছে। ধর আমরা যদি ফের বিয়েও করি—'

মন্দিরা বলল, 'যদি করি মানে? বিয়ে করতে আপনি বাধ্য।'

যেন পিস্তলের গুলী বিঁধল শশাঙ্কের গলায়। মুহূর্ত কাল তার মুখ থেকে কোন কথা বেরোল না। যেন উনিশ কুড়ি বছরের ভদ্রঘরের কোন শিক্ষিতা মেয়ে নয়, যেন কোন চতুরা গণিকা শশাঙ্কের সঙ্গে দর কষাকষি করতে এসেছে।

শশাঙ্ক একটু হেসে বলল, 'বেশ, মেনে নিলাম তোমার কথা। না হয় ব্যাপারটা বাধ্যতামূলকই হল। যদিও জানিনে কেন তা হবে। কিন্তু তার জন্যেও তো উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে তোমাদের লিগাল সেপারেশন চাইতে হবে. সেসব তো রাতারাতি হতে পারে না। তার জন্যে সময় দরকার। তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।'

মন্দিরা অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'বেশ, এখানে অপেক্ষা করব। এই বাড়িতেই অপেক্ষা করব। আমি এখান থেকে এক পাও নড়ব না।'

শশাঙ্ক শান্তভাবে বলল, 'তা সম্ভব নয় মন্দিরা। এখনই এ ভাবে এ

বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়। পাশেই দাদা বউদিরা আছেন। আশেপাশে পাড়া-পড়শীরা রয়েছে।'

মন্দিরা বলল, 'বেশ তো, যেখানে আর কেউ নেই, চলুন সেখানে পালিয়ে যাই। চলুন, আজই চলুন।'

শশাঙ্ক চুপ করে রইল। এমন দিন গেছে যখন এর চেয়ে লোভনীয় আমন্ত্রণ শশাঙ্কের কাছে আর ছিল না। শশাঙ্ক তখন ভাবত সুখী হবার জন্যে, অন্তত সাময়িকভাবে সুখী হওয়ার জন্যে একটি সুশ্রী তরুণী নারীই যথেষ্ট। যে কোন নারীকেই যেন বলা যায়, 'শুধু একা পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য তুমি।' বলা হয়তো যায় কিন্তু সর্বক্ষণের জন্যে সারাজীবনের জন্যে বলা যায় না। বলতে পারলে ভালো হতো। যারা তা পারে তারা ভাগ্যবান, তারা কোন একজনকে ওই কথাটুকু বলে আরও দশ রকম কাজে নিজেকে নিযুক্ত করে। কিন্তু শশাঙ্ক যা বলতে চায় তাই অনুভব করতে চায়। সেই সর্বাত্মকতার অনুভূতি ক্ষণিকের অনুভূতি হতে বাধ্য। তার উক্তিও তাই ক্ষণজীবী।

মন্দিরাকে নিয়ে পালাতে পারলে মন্দ হতো না। শশাঙ্কের স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, সংসারে আর কোনরকম বাধা নেই। পালাতে বাধা কিসের? না, কোন নৈতিক বাধা নয়। অন্যরকমের বাধা। শশাঙ্ক জানে আজ যদি মন্দিরাকে নিয়ে সে পালায়, কাল মন্দিরার কাছ থেকে তার পালাতে ইচ্ছা করবে। আর ঈর্ষায় অসূয়ায় একাধিপত্যের আকাঙ্ক্ষায় পরশুদিন মন্দিরা সুজাতা হয়ে উঠবে।

পালাতে বাধা কিসের? সংসার সমাজ থেকে পালাতে পারে শশাঙ্ক, নিজের কাছ থেকে পালাবে কী করে? নিজের একটি কামনাকে নিয়ে যে পালাবে শশাঙ্ক, দশদিক থেকে আরো দশটি বাসনা তাকে টানাটানি করতে থাকবে। তারা নারী নয়। তারা খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা, জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে কৃতী হবার আকাঙ্ক্ষা। অসংখ্য ক্রেভিং।

শশাঙ্ক ভাবল, সেই শতধা বিভক্ত, শতধা চূর্ণিত অসংখ্য আমি কী করে এক হতে পারি? প্রেমে? ভালোবাসায়? আমার মধ্যে সেই অগাধ ভালোবাসা কই যাতে আমি ডুবে যেতে পারি, যার অতলতা দিয়ে আমি একজনকে ডুবিয়ে রাখতে পারি? না, সে সাধ্য আমার নেই। জীবনে আমি পল্লবগ্রাহী। প্রেমে আমি শুধু করপল্লবটুকু ক্ষণিকের জন্যে গ্রহণ করতে পারি। তার চেয়ে বেশি কিছু পারিনে। আমার মধ্যে যে প্রেমিক ছিল তার মৃত্যু হয়েছে। কোন দিন তার জন্ম হয়েছিল কিনা এখন সন্দেহ হয়। এখন আমি শুধু রূপদর্শক। সেই রূপ আমাকে সারফেসে ভাসিয়ে রাখে, জীবনের গভীরে নামতে দেয় না, আমি শুধু হিরণ্ময় পাত্র দেখে মুগ্ধ হই, সেই সোনার ঢাকনি সরাবার দিকে আমার লক্ষ্য নেই। আমি ডুবতে চাইনে, কিংবা হয়তো চাই, কিন্তু ডুবতে জানিনে, ডুবতে পারিনে, আমি কুটোর মত ভেসে থাকতে চাই, কুটোর মতই

একদিন কালস্রোতে ভেসে যাব। কিন্তু আমার সঙ্গে তুমি অকূলে ভাসতে এসো না মন্দিরা, তুমি দুঃখের সমুদ্রে ডুবে মরবে।

স্তব্ধ শশাঙ্ককে চকিত করে মন্দিরা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, 'আমি তাহলে যাচ্ছি।' শশাঙ্কও সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল, 'সে কি, এত রাত্রে তুমি কোথায় যাবে?'

মন্দিরা বলল, 'আমি আর কক্ষনো আসব না। কিন্তু কেন এখন থাকতে দিচ্ছেন না।'

'না মন্দিরা। এখানে রাত্রে তোমাকে থাকতে দিতে পারব না। তুমি দিনের বেলায় এসো।'

মন্দিরা বলল, 'আমি আর কক্ষনো আসব না। কিন্তু কেন এখন থাকতে দিতে পারবেন না শুনি? আপনার মত মানুষেরও মান-সম্মানের এত ভয়?'

শশাঙ্ক একটু হাসল, 'না মন্দিরা। আমার সে ভয় নেই। আমি দু'কান-কাটা। আমি শুধু তোমার কথা ভাবছি।'

মন্দিরা তীব্র উত্তেজনায় বলল, 'মিথ্যে কথা। তুমি কারো জন্যে কিছু ভাবতে পার না। তুমি শুধু নিজের সুখসুবিধার কথা ভাব। তুমি স্বার্থপর, হীন প্রতারক। তুমি ভুলিয়ে অন্যের সর্বনাশ করে তারপর আর তাকে চিনতে পার না। এতদিনে তোমাকে চিনলাম।'

তুমি! শশাঙ্কই এতদিন মন্দিরাকে সমবয়সী বন্ধুর মত তুমি বলবার অনুমতি দিয়েছিল। অনুরোধ করেছিল। মন্দিরা সংকোচে পারেনি। কখনো আপনি বলেছে কখনো তুমি। সেই মিশ্রিত সম্বোধন আরো মধুর লেগেছে শশাঙ্কের। আজ কোন লজ্জা নেই, সংকোচ নেই। আজ একেবারে নির্ভেজাল ভূমিতে নেমেছে মন্দিরা। কিন্তু এই তুমি যেন গ্রাম্য ঝগড়াটে স্ত্রীলোকের তুই-তোকারির সামিল।

শশাঙ্ক একটু হেসে বলল, 'চিনেছ? আমি কিন্তু এখনো চিনতে পারিনি, না তোমাকে না আমাকে। চল, তোমাকে তোমার বাবার কাছে দিয়ে আসি। সেখান থেকে মিহিরবাবুকে কাল একটা টেলিগ্রাম করে দিয়ো। তাঁকে বললেই হবে তুমি রাগ করে বাপের বাড়িতে চলে এসেছ, রাগ পড়লে স্বামীর ঘরে ফিরে যাবে। আমি তোমার সেই ফিরে যাওয়ার রাস্তা খোলা রাখতে চাই।'

দুঃখে ক্ষোভে বিদ্বেষে হিংস্রতায় ফেটে পড়ল মন্দিরা। অর্ধচিৎকারের স্বরে বলল, 'কিন্তু আমি তা চাই না, চাই না, চাই না। আমি কারো কাছে কিছু চাই না। আমি চললাম। খবরদার আপনি আমার সঙ্গে আসবেন না। যেখানে যাই আমি একাই যেতে পারব।'

কিন্তু সত্যি সত্যিই কি একা মন্দিরাকে ও ভাবে ছেড়ে দেওয়া যায়? এই রাত্রে? ওই উন্মত্তা নারীকে?

মন্দিরার নিষেধ সত্ত্বেও শশাঙ্ক তার সঙ্গে সঙ্গে এল। গ্যারেজ থেকে গাড়ি

বার করল। ড্রাইভার নেই। চাকরি পেয়েই বিয়ে করবে বলে ছুটি নিয়ে চলে গেছে।

প্রায় জোর করেই মন্দিরাকে গাড়িতে তুলল শশাঙ্ক। পাশে বসাল। তারপর ড্রাইভ করে নিয়ে চলল।

এর আগে অনেক মেয়েকে অনেকভাবে লিফট দিয়েছে শশাঙ্ক। কিন্তু এমন লিফট জীবনে বোধ হয় এই প্রথম।

শশাঙ্কের মনে পড়ল, একদিন মন্দিরার বাবা তার হাত থেকে মেয়েকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আজ শশাঙ্ক ওকে নিজের কাছ থেকে নিজে কেড়ে নিয়ে চলেছে।

কেড়ে নেওয়া? নিজের মনেই হাসল শশাঙ্ক। যেন সে এসব ব্যাপারে বিশ্বাস করে! নরনারীর দেহসম্পর্কের ক্ষেত্রে নীতি আর নিষ্ঠার প্রশ্নে যেন তার কোন আস্থা আছে! শশাঙ্ক কিছু মানে না। কিন্তু সে না মানলেও আর পাঁচজনে মানে। হয়তো মন্দিরা মানে। হয়তো এখানে রাত্রিবাসের জন্যে দিনে ওর অনুশোচনা হতো। হয়তো এর জন্যে শশাঙ্ককে কোনদিন ক্ষমা করতে পারত না।

মন্দিরা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল।

সি আই টি রোডে পড়ে শশাঙ্ক ডান দিকে টার্ন নিতেই মন্দিরা হঠাৎ বলে উঠল, 'না, বাবার কাছে নয়। আমি বেদিয়াডাঙ্গায় যাব না।'

শশাঙ্ক অবাক হয়ে বলল, 'তবে কোথায় যাবে?'

'বেলেঘাটায়।'

'সেখানে কে আছেন?'

'নিরঞ্জনকাকা। আমি তাঁর কাছে যাব।'

নিরঞ্জনকাকাকে অবশ্য শশাঙ্ক চেনে না। কিন্তু মন্দিরা বোধ হয় সরাসরি ওর জাঁদরেল বাবার কাছে গিয়ে উঠতে ভয় পাচ্ছে। শশাঙ্ককে দেখলে যোগরঞ্জনও হয়তো আস্তিন গুটিয়ে আসবেন। কিছু বলা যায় না। এক রাত্রে দুটি নাটক শশাঙ্কের দেখবার ইচ্ছা নেই। তার চেয়ে অচেনা কাকার কাছে ওকে দিয়ে আসাই ভালো। তিনি ধীরেসুস্থে অগ্রজের চরণমূলে ভাইঝিকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে উত্তর দিকে ছুটল শশাঙ্ক। ভাবল মীরপুরে তার না যাওয়াই ভালো ছিল। একটি চুম্বনের জন্যে যে এমন অশান্তির সৃষ্টি হবে, তা কে জানত?

ব্রীজ পেরিয়ে বেলেঘাটা মেইন রোড দিয়ে গাড়ি রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোডে পড়ল। ঠিকানাটা মন্দিরাই এক সময় জানিয়ে দিল শশাঙ্ককে। কিন্তু জানাবার ইচ্ছা যেন আর ছিল না। কোন ঠিকানায় পৌঁছবার আগ্রহ আর নেই

মন্দিরার। মুহূর্তের মধ্যে তার সব আশ্রয় ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মন্দিরাও চিরকালের জন্যে গড়ঠিকানা হয়ে কূলহীন সমুদ্রে ভেসে যেতে পারলে যেন বেঁচে যেত। পথের মাঝখানে অনেকবার গাড়ি থামিয়ে অন্ধকারের মধ্যে নেমে পড়বার ইচ্ছা হল মন্দিরার। ব্রীজের ওপর দিয়ে যেতে যেতে গাড়ির দরজা খুলে খালের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার ইচ্ছা হল। কিন্তু কিছুই সম্ভব হল না। পরম শত্রু তার পাশে বসে রয়েছে। মন্দিরা যা কিছু করতে যাবে তাতেই সে বাধা দেবে। সে তাকে বাঁচতেও দেবে না, মরতেও দেবে না। সুখে শান্তিতে ঘর-সংসারও করতে দেবে না, আবার নতুন সংসার বাঁধতেও দেবে না। শত্রু, পরম শত্রু। শুধু হৃদয় নিয়ে খেলাই তার কাজ। প্রথমে খেলায় মেতে ওঠা, তারপর সেই খেলা ভেঙে ফেলা, ভাঙা পুতুলটাকে যেখানে সেখানে ছুঁড়ে ফেলায় তার আনন্দ। এই ছেলেখেলা সে জীবনভর করেছে, বাকি জীবনও তাই করতে চায়। নিশ্চয়ই নতুন পুতুল নিয়ে নতুন খেলায় মেতেছে শশাঙ্ক। মন্দিরা তার কাছে পুরোন হয়ে গেছে, বাসি হয়ে গেছে। তাই তার কাছে মন্দিরার আর কোন আদর নেই। তাই নামাবলী গায়ে দিয়ে শশাঙ্ক রাতারাতি সাধু হয়ে বসেছে। সব ভান, সব ভড়ং। মন্দিরার কিছুই বুঝতে বাকি নেই।

শশাঙ্কের পাশে বসে মন্দিরা তার বিরুদ্ধে হাতের মুঠি পাকাল, মনে মনে বলল, 'কিন্তু তুমিও জেনে রেখ, আমি পুতুল নই। তুমি অনেক পুতুল নিয়ে খেলেছ কিন্তু আমাকে নিয়ে খেলতে এসে ভালো কাজ করনি। সে খেলা অত সহজে আমি সাঙ্গ করতে দেব না। আমি তো মরেইছি, তোমাকেও বাঁচতে দেব না। আমার এ-কূলও গেছে, ও-কূলও গেছে কিন্তু তোমারও যাতে কিছু না থাকে আমি তাই করে ছাড়ব।'

লাইটপোস্টের ধারে একটি তিনতলা বাড়ির সামনে এসে শশাঙ্ক গাড়ি থামাল।

'এই বাড়ি?'

'হ্যাঁ। আপনি আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে যান। আমি ঠিক যেতে পারব। আপনি অনেক দয়া করেছেন। আর কিছু আপনাকে করতে হবে না।'

শশাঙ্ক একটু হাসল, 'তাই কি হয়? আমার আরো কিছু কাজ বাকি আছে। তোমার কাকাকে ডেকে তাঁর হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারব।'

মন্দিরার ঠোঁটে বিদ্রূপের ঝিলিক খেলে গেল। 'নিশ্চিন্ত হয়ে? কিন্তু কাকা যদি আপনাকে পুলিসের হাতে দেন?'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'পুলিসের হাতে? তোমার কাকাই হন, জ্যেঠাই হন, কেউ তা দিতে পারেন না। একমাত্র তোমারই সেই হস্তান্তরের ক্ষমতা আছে।'

কলিং বেল টিপতে দারোয়ান এসে কলাপসিবল গেট খুলে দিল।

মন্দিরাই এগিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'নিরঞ্জনকাকা আছেন?'

দারোয়ান বলল, 'হ্যাঁ মাইজী, বাবু বাড়িতেই আছেন। উকিলবাবুর সঙ্গে বাতচিত্ করছেন। চলিয়ে।'

লন পেরিয়ে দারোয়ানের সঙ্গে মন্দিরা নিরঞ্জনকাকার ড্রয়িংরুমে গিয়ে ঢুকল। তার ইচ্ছা ছিল না শশাঙ্ক তার সঙ্গে সঙ্গে আর আসে। কিন্তু মানুষটির তো আর লজ্জা শরম নেই। নিষেধ করলেও নিষেধ শুনবে না।

সোফায় বসে নিরঞ্জনকাকা মোটাসোটা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করছিলেন, মন্দিরাদের দেখে তাঁরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন।

নিরঞ্জন একটু অবাক হয়ে বললেন, 'মন্দিরা, তুই? এত রাত্রে কোত্থেকে এলি? আর ইনি?'

মন্দিরা বলল, 'বলছি কাকা। কাকিমা কোথায়?'

অপরিচিত এক ভদ্রলোক রয়েছেন ঘরে। তাঁর সামনে কি সব কথা বলা যায়?

পরক্ষণে নিরঞ্জনকাকাও যেন সে কথা বুঝতে পারলেন।

একটু হেসে বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, সব শুনব এখন। বোস। পরিচয় করিয়ে দিই। আমার বন্ধু পুলিসকোর্টের উকিল শৈলেন সরকার। আমার ভাইঝি মন্দিরা। তুমি চিনতে পারবে শৈলেন। যোগরঞ্জনদার মেয়ে। আমার জ্যেঠতুতো ভাই ডাক্তার যোগরঞ্জন চ্যাটার্জি। তাঁর বাড়িতে তুমি গিয়েছ আমার সঙ্গে। অবশ্য অনেক আগের কথা। তখন তোমার এত পসারও হয়নি, অত বড় ভুঁড়িও হয়নি।'

শৈলেনবাবুর মুখে পাইপ ছিল। একটু সরিয়ে হেসে বললেন, 'ভুঁড়ি কারো দেখা যায়, কারো দেখা যায় না। ব্যাঙ্কের কাউন্টারে দাঁড়ালে তোমার ভুঁড়িটি দেখা যাবে। আচ্ছা, চলি নিরঞ্জন। কারখানায় ফের কোন ট্রাবল হলে খবর দিয়ো।'

নিরঞ্জন বললেন, 'আর ট্রাবল! ট্রাবল তো লেগেই আছে। আজকাল কি আর শান্তিতে কেউ বিজনেস করতে পারে!'

শৈলেনবাবু চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ শশাঙ্কের দিকে একটু ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'এ'র সঙ্গে তো পরিচয় হল না।'

মন্দিরা ইচ্ছা করেই শশাঙ্কের কোন পরিচয় দেয়নি। পরিচয় দেবার কীইবা আছে? যে পরিচয় ছিল, তাই যখন লোকটি অস্বীকার করল, সে অজ্ঞাত অপরিচিতই থেকে যাক।

শশাঙ্কই এগিয়ে এসে আত্মপরিচয় দিল। নাম বলল। বৃত্তির কথাটাও অনুক্ত রাখল না।

শৈলেনবাবু একটু হাসলেন। নমস্কারের ভঙ্গিতে যুক্তকর কপালে

ঠেকালেন, 'ও আপনি! আপনি তো স্বনামধন্য মশাই। তাই নামটা চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। আলাপ করে আনন্দ হল। আশা করি আবার দেখা-সাক্ষাৎ হবে। চলি নিরঞ্জন। আমার ড্রাইভারের এতক্ষণ এক ঘুম হয়ে গেল। লোকটি বসে বসে ঘুমোয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। আমার মনে হয়, গাড়ি চালাতে চালাতেও ঘুমোয়। কোনদিন যে আমাকে সুদ্ধ চিরনিদ্রার কবলে ফেলে দেবে তার ঠিক নেই।'

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন। সুদর্শন নিরঞ্জনকাকার এই বেঁটে মোটা ভুঁড়িওয়ালা বন্ধুটিকে মন্দিরার তেমন ভালো লাগেনি। ওঁর তাকাবার ভঙ্গিটিও কেমন যেন অন্তর্ভেদী। এই বয়সে নানা-বয়সী পুরুষের দৃষ্টিই দেখেছে মন্দিরা। কিন্তু ওঁর দৃষ্টিতে কোন মোহ নেই। শুধু কেমন একটা সবজান্তা ভাব আছে। শৈলেনবাবুর চতুর দৃষ্টি যেন বলতে চায়, 'আমি তোমাদের সব টের পেয়েছি। আমি সব জানি।'

ভদ্রলোক বিদায় নিলে একটু স্বস্তি বোধ করল মন্দিরা।

নিরঞ্জন ততক্ষণে শশাঙ্কের সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিয়েছেন।

'আপনার সঙ্গে কী করে দেখা হল। ও তো শুনছিলাম আসানসোলের কাছে কোন এক কলিয়ারিতে ওর স্বামীর কাছে আছে। আমার তো সময় হয় না। ওর কাকিমাই টেলিফোনে সব খোঁজখবর নেয়। তার কাছেই সব শুনি। তুই কলকাতায় কবে এলি রে?'

পাছে মন্দিরা অন্যরকম কিছু বলে বসে তাই শশাঙ্কই আগে জবাব দিল, 'আজই এসেছে। বোধ হয় স্বামীর সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে. একেবারে আমার ওখানে গিয়ে হাজির।'

মন্দিরা লক্ষ্য করল, নিরঞ্জনকাকার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'সামান্য কথান্তরের জন্যে ওকে একেবারে আসানসোল থেকে কলকাতায় চলে আসতে হল? তা ছাড়া আপনার ওখানেই বা উঠতে গেল কেন? সরাসরি দাদার কাছে চলে যেতে পারত, আমার এখানে আসতে পারত। আরো আত্মীয়স্বজন ছিল। এত জায়গা থাকতে কেন—'

শশাঙ্ক একটু হেসে বলল, 'কেন তা কী করে বলব। খেয়াল—'

মন্দিরা মনে মনে বলল, 'খেয়াল! বলতে লজ্জা করে না? এখন তুমি আমার খেয়ালের ওপর সব দোষ চাপিয়ে নিজে সরে দাঁড়াতে চাইছ? আমি ত দেব না, আমি তা কিছুতেই দেব না।'

নিরঞ্জন বললেন, 'এমন খামখেয়াল তো ভালো নয়। আচ্ছা, ঠিক আছে ধন্যবাদ শশাঙ্কবাবু। আপনি অনেক কষ্ট করলেন। আপনার ঠিকানাটা—'

শশাঙ্ক এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার ঠিকানা বের করা এমন কিছু কঠিন হবে না। মন্দিরা জানে। ফোন গাইডেও পাবেন।'

শশাঙ্ক বেরিয়ে গেল।

নিরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা গিয়ে গেট পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে এলেন।

মন্দিরা চুপ করে তার জায়গাটিতে বসে রইল। কী যে হয়েছে, ভবিষ্যতেই বা কী হবে তা যেন কিছুতেই সে ভাবতে পারছে না। শুধু এইটুকু সে বুঝতে পারছে, তার আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। উপায় থাকলেও সে ইচ্ছা নেই। ভালোবাসবার মত তার আর কেউ রইল না। এখন থেকে একা একা নিঃসঙ্গভাবে তাকে বাস করতে হবে! কী করে তা পারবে মন্দিরা? সেই তের চৌদ্দ বছর বয়স থেকে সে শুধু ভালোবাসার মধ্যেই আছে। ভালোবাসার সমুদ্র ছাড়া সে আর কোথাও সাঁতার কাটেনি। ভালোবাসার স্বপ্ন ছাড়া সে আর কোন স্বপ্ন দেখেনি। আজ মুহূর্তের মধ্যে সেই বিশাল সুখসিন্ধু শুকিয়ে গেছে। শুষ্ক তপ্ত মরুভূমিতে সারাজীবন সে কী করে কাটাবে? কী করে বাঁচবে?

একটু বাদে নিরঞ্জন এসে তার পাশে বসলেন। হেসে বললেন, 'তারপর কী ব্যাপার বল তো? তোর কাকিমার শরীরটা ভালো না। হার্ট ট্রাবলে কষ্ট পাচ্ছে। প্রেসারও বেড়েছে। সন্ধ্যার সময় ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছেন। চল ওপরে। তাকে ডেকে তুলি এবার।'

মন্দিরা বলল, 'না কাকা, তাহলে আর তাঁকে ডেকে দরকার নেই।'

নিরঞ্জন বললেন, 'তাই কি হয়? এ রোগ তার নিত্যকার পোষা রোগ। ভয়ের কিছু নেই।' তারপর মন্দিরার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে সস্নেহে হেসে বললেন, 'ইস্, শাঁখা সিন্দুর পরে একেবারে গিন্নী হয়ে বসেছিস। কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা। তোর সেই বিয়ের দিন দেখা হয়েছিল মনে আছে? বিলেত থেকে সেদিনই ফিরলাম। আর ফিরে এসেই তোর বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে গেলাম।'

মন্দিরা বলল, 'কেন মনে থাকবে না? আপনি সেদিন আমাকে একটি ঘড়ি দিয়েছিলেন।'

'আছে সেই ঘড়ি?'

'থাকবে না কেন? সেই ঘড়িই তো আমার হাতে।'

হাতখানা উঁচু করে দেখাল মন্দিরা। সেই অশুভ বিয়ের দিনটির কথা তার ফের মনে পড়ল। সেদিন শুভ উৎসবের আয়োজন কম ছিল না। কিন্তু মন্দিরার মনে সেই উৎসবের রঙ লাগেনি, বাতি জ্বলেনি। তবু তারই মধ্যে অমন আশাতীত ভাবে নিরঞ্জন কাকার নিমন্ত্রণ রাখতে আসা, দামী ঘড়ি উপহার দেওয়া মন্দিরার মনকে যে ক্ষণিকের জন্যে প্রসন্ন করে তুলেছিল সে কথা তার খুবই মনে আছে। আর আছে ছেলেবেলার স্মৃতি। বহু আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বাল্যে কৈশোরে কাউকে কাউকে যেন বেশি ভালো লেগে যায়। যদি অন্য পক্ষ থেকে দারুণ কোন আঘাত না আসে তাহলে সেই পক্ষপাত সারাজীবন থাকে।

ছেলেবেলায় নিরঞ্জন কাকাকে রূপকথার দেশের মানুষ বলে মনে হতো মন্দিরার। যিনি ঘন ঘন বিদেশে যান, বিদেশের গল্প বলেন, বড়লোক হয়েও যাঁর মনে কোন অহংকার নেই, সম্পর্কে কাকা এবং বয়সে অনেক বড় হয়েও যিনি সমবয়সী বন্ধুর মতই ব্যবহার করেন, তাঁর স্নেহ আর প্রীতি মন্দিরার মনে স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। তাছাড়া বাবার অতিরিক্ত বিধিনিষেধ আর কড়াশাসনের নিগড়ে বন্দিনী মন্দিরার কল্পনাপ্রবণ মন কাকার প্রশ্রয় আর ঔদার্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছিল। সেই কাকা একটু দূর সম্পর্কের বলে অন্য পাড়ার এবং ভিন্ন ধরনের মানুষ বলে যেন মাধুর্য আরো বেড়ে গিয়েছিল। মন্দিরার জীবনে শশাঙ্ক আসবার আগে এই নিরঞ্জন কাকাই ছিলেন পরম রহস্যময় আকর্ষণীয় পুরুষ। তারপর শশাঙ্ক এসে সব ঢেকে দিল, ভুলিয়ে দিল। এখন সে নিষ্ঠুরের মত বলছে, 'সব ভুলে যাও। সব মিথ্যে, ছেলেখেলা। খেলা ভুলে এখন ঘরসংসারে মন দাও।'

কিন্তু খেলাঘরই যার মনে ইমারত হয়ে গড়ে উঠেছে, সে কি আর অন্য কোন ঘরে মন বসাতে পারে? যে পারে পারুক, মন্দিরা তো পারল না। কিন্তু না পেরে লাভ কি হল? অপাত্রে, বিশ্বাসের অযোগ্য, নির্ভরতার অযোগ্য পাত্রে সমস্ত মন প্রাণ সঁপে দিয়ে সব হারিয়ে কী পেল মন্দিরা? শুধু বঞ্চনা আর অপমান। এই অপমানের শোধ কি সে নিতে পারবে না? কোন মতেই দিতে পারবে না বঞ্চনার শাস্তি? কিন্তু কোন উপায় নেই। রুদ্ধ আক্রোশে হতাশায় নিরাশ্বাসে জ্বলে মরা ছাড়া কোন উপায় নেই তার।

নিরঞ্জনের সঙ্গে মন্দিরা দোতলার ঘরে গেল। খাট আলমারিতে সাজানো ওঁদের শোবার ঘর। সুলতা কাকিমা আগেই উঠে কাশছেন।

মোটাসোটা ভারিক্কি ধরনের ভদ্রমহিলা নিরঞ্জনের চেহারার ঠিক বিপরীত। নিরঞ্জন ছিপছিপে লম্বা। শ্যামবর্ণ, সুঠাম চেহারা। সুলতা ফর্সা আর সুশ্রী হলেও মেদবাহুল্য তাঁর সেই শ্রীকে অনেকখানি গ্রাস করেছে। দেখলেই বোঝা যায়, ভদ্রমহিলা অসুস্থ। ওষুধে-পথ্যে তাকটি একটি ছোটখাটো ডিসপেনসারি।

পাশাপাশি দুখানা খাট। একটি খাটের বিছানা চাঁপা রঙের চাদরে ঢাকা। আর একটি খাটে মশারি তুলে ফেলে সুলতা বিছানার ওপরে বসে রয়েছেন।

নিরঞ্জন বললেন, 'তুমি আবার উঠলে কেন?'

সুলতা বললেন, 'প্রমদা ডেকে তুলল। ঘুম আগেই ভেঙে গিয়েছিল।'

নিরঞ্জন বললেন, 'চিনতে পারছ মন্দিরাকে?'

সুলতা গম্ভীরভাবে বললেন, 'চিনব না কেন?'

মন্দিরা এগিয়ে এসে প্রণাম করে বলল, 'ভালো আছেন কাকিমা?'

সুলতা বললেন, 'আর ভালো। তুমি এত রাত্রে কোত্থেকে এলে?'

নিরঞ্জন বললেন, 'সব বলছি তোমাকে। আগে ওকে কিছু খেতেটেতে দাও।'

সুলতা মৃদু হাসলেন, 'সে কি তোমাকে বলে দিতে হবে?'

রাত্রে বিশেষ কিছু খেল না মন্দিরা। খাওয়ার ইচ্ছা তার ছিল না। তবু কাকিমার জবরদস্তিতে দুধ মিষ্টি কিছু মুখে দিতেই হল।

মন্দিরা এভাবে এসে পড়ায় সুলতা কাকিমা যে তেমন প্রসন্ন হননি, এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে তিনি সন্দেহের চোখেই দেখছেন তা বুঝতে তার বাকি ছিল না। কিন্তু বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনি তাকে বিব্রত করে তুললেন না। জবাবদিহির দায় হতে অন্তত সে রাত্রের মত তিনি মন্দিরাকে রেহাই দিলেন। তারপর শান্তভাবে বললেন, 'আর রাত জেগে কাজ নেই। যাও, এবার শোও গিয়ে। প্রমদা পাশের ঘরে তোমার বিছানা করে রেখে এসেছে।'

শোবার আগে নিরঞ্জনকাকার সঙ্গে আর একবার দেখা হল মন্দিরার।

তিনিও বললেন, 'যা, এবার শুয়ে পড় গিয়ে। বড়দাকে আজ আর কিছু জানিয়ে কাজ নেই। কাল টেলিফোনে বললেই হবে।'

মন্দিরা বলল, 'না কাকা, তাঁকে কিছু জানাবেন না।'

নিরঞ্জন মন্দিরাকে তার ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'সে কি রে! তাঁকে কিছু না জানালে চলে? তাঁকেও জানাতে হবে। তোর স্বামীকেও জানাতে হবে।'

মন্দিরা বলল, 'না কাকা, কাউকে কিছু জানাবার দরকার নেই। আমি আপনার এখানে থাকব। আমি আর ফিরে যাব না।'

নিরঞ্জন ফের একটু হাসলেন, 'ফিরে যাবিনে কি রে। তুই কি খুন করে এসেছিস না কি চুরি ডাকাতি করে এসেছিস? এত ভয় কিসের?'

ভয় যে কিসের তা নিরঞ্জন কাকার জানবার কথা নয়। খুন কি চুরি-ডাকাতি না করলেও যে অনেক সময় ফিরে যাওয়া যায় না তা তিনি বুঝবেন কী করে?

নিরঞ্জন বললেন, 'বড়জোর একটু ঝগড়াঝাটি করে এসেছিস। শশাঙ্কবাবু তো তাই বললেন। কোন স্বামীস্ত্রী আছে যারা ঝগড়া করে না? আমার এক বন্ধু বলে, যারা ঝগড়া করে না তারা স্বামীস্ত্রীই নয়। তোর ওই রোগা কাকিমাকে দেখলি তো?' গলা খাটো করলেন নিরঞ্জন, 'সারা বছর রোগে ভোগে। কোঁকানি আর যায় না। গলা সরে কি না সরে। কিন্তু ঝগড়া লাগলে? ওরে বাবা, তখন উৎসাহে বসেন রোগী শয্যার উপরে।'

যাওয়ার আগে ফের একবার ভরসা দিয়ে গেলেন নিরঞ্জন কাকা। বললেন, 'নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমো। তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তোকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। তবে যত তাড়াতাড়ি তুই তোর নিজের জায়গায় ফিরে যেতে পারিস ততই তো ভালো।'

ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে মশারির মধ্যে নিজেকে লুকাল মন্দিরা। যেন আরো ঘনতর কোন আবরণে নিজেকে ঢাকতে পারলে বাঁচে। নিজের জায়গায়

ফিরে যাওয়া। সে জায়গা কোথায়? সে জায়গা তো মন্দিরা ছেড়ে এসেছে। স্বেচ্ছায় নিজের অধিকার ত্যাগ করে এসেছে। আর কি সেখানে ফিরে যাওয়া যায়? কোন লজ্জায় ফিরে যাবে? সেই নিরানন্দপুরীতে ফিরে গিয়ে লাভই বা কি। কী লাভ সারাজীবন সেই অপমানের অন্ন খুঁটে খুঁটে খেয়ে? মিহির তাকে দুমুঠো খেতে দেবে নিশ্চয়ই। কিন্তু কুকুরকে লোকে যেভাবে দেয় তেমনি করে দেবে। চিরকাল ঘৃণা করবে, অবজ্ঞা করবে। চিরকাল তার করুণা ভিক্ষা করে বেঁচে থাকতে হবে মন্দিরাকে। তেমন করে বেঁচে লাভ কি? কী লাভ নিজের ঘরে ভিখারিণী হয়ে থেকে?

মন্দিরা ঝগড়া করে এসেছে? শশাঙ্ক অবশ্য নিজের সুবিধার জন্য তাই বলে গিয়েছে নিরঞ্জন কাকাকে। আসল কারণ যে কী শশাঙ্ক তা জানে। জেনেও মিথ্যা কথা বলেছে। সেই মিথ্যা তার দায়িত্ব এড়াবার উপায়। সমস্ত দায় থেকে নিষ্কৃতি পাবার ফন্দি। কিন্তু নিরঞ্জন কাকা সেই কথা বিশ্বাস করেছেন। আর সেই বিশ্বাসের ফলে কথাটা যেন সম্পূর্ণ সত্যি হয়ে উঠেছে। মন্দিরা এখন ভাবল, মিহিরও যদি কথাটাকে সেইভাবে বিশ্বাস করে নেয় তাহলে মন্দ হয় না। তাহলে মন্দিরা ফিরে যেতেও পারে। সে যাওয়ায় অবশ্য আনন্দ থাকবে না, গৌরবও থাকবে না, তবু তো আশ্রয় একটু জুটবে। আর সেই নিরাপদ দুর্গ থেকে শত্রুর ওপর সে প্রতিশোধ নেবে। সেই প্রতিশোধের আকার কেমন হবে, তীব্রতা কেমন হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা এল না মন্দিরার। শুধু তার মন বলতে লাগল, যে তাকে বারবার অপমান করেছে, ঘরে ডেকে এনে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছে, যে তার ঘর ভেঙেছে, হৃদয় ভেঙেছে তার ওপর মন্দিরা যেন অন্তত একবার চরম প্রতিশোধ নিতে পারে।

এপাশ ওপাশ করতে করতে অনেক রাত্রে ঘুম এল মন্দিরার। ঘুমের মধ্যে ফিরে ফিরে সেই শশাঙ্ককেই স্বপ্ন দেখল। যে শশাঙ্ক তাকে প্রতারণা করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে সে শশাঙ্ক নয়, যে শশাঙ্ক তার নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গী, যে শশাঙ্ক তার পরম বন্ধু আর প্রণয়ী, মন্দিরা তার অকম্পিত, সবল হাতে হাত রাখল। তারপর এক সঙ্গে কত যে দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়াল তার ঠিক নেই। সে রাজ্য রূপকথার রাজ্যের চেয়েও অপরূপ। সে রাজ্যে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা বিধিনিষেধ নেই, লজ্জা ভয় শাসন তিরস্কারের আশঙ্কা নেই, সেখানে যাকে চাওয়া যায়, তাকেই পাওয়া যায়, সেখানে যাকে ধরতে চায় মন্দিরা, সেই আগে থেকে ধরা দিয়ে বসে থাকে।

পরদিন বেশ একটু বেলাতেই ঘুম ভাঙল। আর ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপের রাজ্য পরীর রাজ্য নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। তীব্র বেদনাবোধ আর গভীর হতাশ্বাসের মধ্যে জেগে রইল মন্দিরা। প্রথমে তার মনে হয়েছিল সে বুঝি নিজের বাড়িতেই শুয়ে আছে। সেই কলিয়ারীর কোয়ার্টারে নিজের অধিকৃত ঘরে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার সব কথা মনে পড়ল। মন্দিরার মনে

পড়ল সে ঘর ছেড়ে এসেছে। আর যার জন্যে ছেড়েছে সেও তাকে গ্রহণ করেনি। মন্দিরার মনে হল তার কোথাও স্থান হবে না। আর তার এই অপরাধও কেউ ক্ষমা করবে না। তার বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎও অন্ধকার।

কিন্তু নিরঞ্জনের ব্যবহার দেখে একটু ভরসা পেল মন্দিরা। কাকিমা মুখ-ভার করে থাকলেও কাকা তার সঙ্গে সহজভাবেই কথা বললেন। চায়ের টেবিলে হাসলেন, গল্প করলেন। যেন গুরুতর কিছুই হয়নি। যেন সত্যিই সামান্য ঝগড়া করেই মন্দিরা স্বামীর ঘর থেকে চলে এসেছে। আবার ফিরে যেতেও কোন বাধা নেই। মন্দিরা ভাবল, নিরঞ্জন কাকার মত সবাই যদি এমন সহজভাবে ব্যাপারটাকে দেখেন তাহলে হয়তো তার কলঙ্ক ঢাকা পড়বে, কেলেঙ্কারির কথাটা কেউ আর জানতে পারবে না। মন্দিরা এযাত্রার মত বেঁচে যাবে। এখন আর মন্দিরা কারো ভালোবাসা চায় না। শুধু তার দুষ্কৃতিটুকু ঢেকে রাখতে চায়। ঠিক আগের মতই মাথা গুঁজবার জন্যে একটু নিরাপদ আশ্রয় চায়।

চা-টা খেয়ে নিরঞ্জন তাঁর ট্যানারীতে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বললেন, 'আজ নয়, আর একদিন তোকে বেড়াতে নিয়ে যাব।' তারপর হেসে বললেন, 'আর কোন দুষ্টুমি-টুষ্টুমি যেন কোরো না। লক্ষ্মী মেয়ের মত বসে বইটই পড়, কি কাকিমার সঙ্গে গল্পগুজব কর। দাদাকে ফ্যাকটরী থেকেই একটা ফোন করে দেব। আর মিহিরকে টেলিগ্রাম করতে হবে।'

মন্দিরা বলল, 'না না, কাউকে কিছু জানাতে হবে না।'

কিন্তু মনে মনে ভাবল, নিরঞ্জন কাকা যদি সব ব্যাপারের এমন একটা সহজ সমাধান করে দেন তাহলে ভালোই হয়। স্নেহময় কাকার ওপর হঠাৎ বড় নির্ভর করতে ইচ্ছা করল মন্দিরার। একটি ট্যানারীর মালিক যেন দুনিয়ার মালিকের মত সর্বশক্তিমান। মন্দিরার নিরঞ্জন কাকা সবই করতে পারেন। তিনি সবই করবেন।

দুপুরের একটু আগেই নিরঞ্জন ট্যানারী থেকে ফিরে এলেন। তিনি একা আসেননি। পথে যোগরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাঁরা একই সঙ্গে এসেছেন।

দুজনের মুখই ভার। গাম্ভীর্যে থমথম করছে।

সেই মুখ দেখে মন্দিরার বুক দুরু দুরু করে উঠল।

পথে তাঁদের কী কথা হয়েছে, কী তাঁরা ঠিক করেছেন কে জানে। এখন কে তার পক্ষে কে বিপক্ষে, তাই বা কে বলবে।

যোগরঞ্জন তাকে কোণের দিকের একটি ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। সে ঘরে আর কেউ রইল না। এমনকি নিরঞ্জনকে পর্যন্ত থাকতে দিলেন না তিনি।

সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে যোগরঞ্জন মেয়ের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

বাবার এই দৃষ্টি মন্দিরার অপরিচিত নয়। তার মনে পড়ল ঠিক ওই একই রকম দৃষ্টিতে একই বজ্রমুষ্টিতে তিনি শশাঙ্কের বাড়ি থেকে মন্দিরাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। বাবার সেই নিষ্ঠুর কঠিন স্বভাব একটুও বদলায়নি। কিন্তু মন্দিরার কি কোন বদল হয়নি? প্রথম সাক্ষাতে তার যে ভয় হয়েছিল এখন আর তার সেই ভয় নেই। ওই একজোড়া রক্তচক্ষু তার চোখে এখন সয়ে গেছে। ওই চোখের দৃষ্টি দেখে মন্দিরার রক্তস্রোত আর বন্ধ হবে না। একবার তিনি জোর করে তার বিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার তো আর তা পারবেন না। মন্দিরার অমতে কিছু করবার ক্ষমতা আর তাঁর নেই।

যোগরঞ্জন একটু বাদে বললেন, 'মিহির খানিক আগে কলকাতায় এসে পৌঁছেছে। আমাকে ফোন করেছিল। ফোনে প্রায় সবই বলল। তুই শশাঙ্কের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিস।'

মন্দিরা বলল, 'মিথ্যে কথা। আমি সেখান থেকে কারো সঙ্গে আসিনি।'

যোগরঞ্জন মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ! একটি কথাও সে মিথ্যে বলেনি। মিথ্যে বলবার ছেলে সে নয়। মিথ্যে তুইই বলছিস।'

মন্দিরা চুপ করে রইল। কোন আশাই আর নেই। ভাবল, এই তার স্বামীর উদারতা, ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা। মন্দিরা চলে আসবার সঙ্গে সঙ্গে বাবার কাছে নালিশ করে দিয়েছে। ভুল শোধরাবার সময়টুকু পর্যন্ত মন্দিরাকে দেয়নি।

যোগরঞ্জন এবার নিরঞ্জনকে ঘরে ডাকলেন, তারপর মেয়ের সামনেই ভাইকে বললেন, 'নিরু, শোন। ওর মত মেয়েকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে আমার আর প্রবৃত্তি হয় না। আমি তা নেবও না, নিলে ধৈর্য রাখতে পারব না। হয়তো একটা বিপরীত কাণ্ড কিছু ঘটে যাবে। ওর মা অবশ্য এসব শুনে কাঁদাকাটি করছে। কিন্তু মেয়েরা তো শুধু কেঁদেই খালাস। তাদের তো আর কিছু দেখতেও হয় না, ভাবতেও হয় না। আমাকে বাকি মেয়েগুলির কথা ভাবতে হবে। তাদের বিয়ে-থা দিতে হবে। আমি ওকে বাড়িতে নিতে পারব না।'

একটু থামলেন যোগরঞ্জন। একটুকাল কি যেন ভাবলেন, তারপর ফের বললেন, 'তুই দেখ মিহিরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে যদি তার ওখানে দিয়ে আসতে পারিস, যদি অবশ্য তারা নিতে রাজী হয়। না হলে কী পরিণাম হবে জানিনে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।'

নিরঞ্জন একটু হেসে বললেন, 'তুমি এখনই অমন মাথা গরম করছ কেন দাদা। অত ঘাবড়াবারই বা কী হয়েছে। একটা ছেলেমানুষি কাণ্ড হঠাৎ করে ফেলেছে বলে মেয়ে আমাদের পচে গেছে না কি? আর তো কোথাও যায়নি, এসে আমার এখানেই তো উঠেছে। তুমি ব্যাপারটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও। যাও, এবার হাতমুখ ধুয়ে এসো। মন্দিরা, তোর বাবাকে বাথরুমটা দেখিয়ে

দে তো। এসো একসঙ্গে বসে দুটি খেয়ে নিই। তারপর ভরা পেটে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে।'

কিন্তু যোগরঞ্জন খাওয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না। ছোট ভাইয়ের মত ব্যাপারটাকে অমন লঘু করে তিনি দেখতে পারলেন না। যেমন এসেছিলেন তেমনি উত্তেজিতভাবে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

॥ ২০ ॥

মিহির যে এত তাড়াতাড়ি কলকাতায় আসবে, তা সে নিজেও ভাবতে পারেনি।

রাত আটটায় অফিস থেকে ফিরে স্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে সে অবশ্য একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। মন্দিরা সাধারণত এত রাত অবধি বাইরে কোথাও থাকে না। পাড়া-পড়শীর বাড়িতে যাওয়ার অভ্যাস তার নেই। অনেকের সঙ্গে মিহির ওর আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কারো সঙ্গেই মন্দিরার ঘনিষ্ঠতা হয়নি। মেয়েদের মধ্যে কত সহজে, কত অল্প সময়ে অন্তরঙ্গতা জমে ওঠে। পুরুষের তুলনায় এদিক থেকে মেয়েরা বেশি সামাজিক। কিন্তু মিহির লক্ষ্য করেছে, মীরপুরে এসে মন্দিরা কারো সঙ্গে তেমন আলাপ পরিচয় করতে চায়নি। এখানকার আবহাওয়া, পরিবেশ, লোকজন, কিছুই যেন তাকে আকর্ষণ করেনি। আকৃষ্ট হব না, আকর্ষণ করব না বলে সে যেন পণ করে বসেছিল।

কোথায় গেল মন্দিরা? কোথায় যেতে পারে, প্রথমে ভেবে পায়নি মিহির। কিন্তু ভেবে পায়নি, এ কথা বোধহয় ঠিক নয়। পেতে চায়নি। মন্দিরাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে প্রথমেই যে ক্রূর অশুভ আশঙ্কা তার মনে জেগে উঠেছিল, তাকে আমল দিতে চায়নি। নানাভাবে তাকে সে চাপা দিতে চেয়েছে। কিন্তু চাপা কি সহজে দেওয়া যায়? সে দৃঢ়মূল শঙ্কাকে উন্মূলিত করা কি সত্যিই সম্ভব?

প্রথমে মিহির চাকর শম্ভুর কাছেই সন্ধান নিতে চেষ্টা করল।

'তোর বউদি কোথায় গেছে রে শম্ভু?'

শম্ভু লজ্জিত হয়ে বলল, 'জানিনে তো বাবু। বলে যাননি। পরেশবাবুর বাড়িতে চাবি দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি এলে তাঁরা সেই চাবি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারপর থেকে ভাবছি, বউদি এই আসেন, এই আসেন। কিন্তু কই, এখনো তো এলেন না। আমি রান্না সব শেষ করে রেখেছি বাবু। ডাল, তরকারি, মাছের ঝোল, সব রেঁধে রেখেছি।'

'আর রান্না। কে খাবে তোর রান্না।' মিহির মনে মনে বলল।

আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল মিহির। বারান্দায় চেয়ারখানা টেনে নিয়ে চুপ করে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। সেই অন্ধকারেও একটি পথের রেখা যেন চোখে পড়ছে। আশা পথ। এখনো সেই পথ বেয়ে চলে আসতে পারে মন্দিরা। যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। কিন্তু মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটতে লাগল। কেউ এল না।

তবু আরো কিছুক্ষণ শান্ত আর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল মিহির। কিন্তু ভিতরটা ছটফট করতে লাগল। সেই দুর্নিবার চাঞ্চল্য তার অস্তিত্বকে দুঃসহ করে তুলল।

এখন বেরিয়ে গিয়ে প্রতিবেশীদের বাড়িতে বাড়িতে খবর নেওয়া যায়। কড়া নেড়ে নেড়ে জিজ্ঞাসা করতে হয়, 'আমার বউ কি আপনাদের বাড়িতে এসেছে!'

সঙ্গে সঙ্গে কৌতুক আর কৌতূহলে মেশানো একটি কি দুটি মুখ জানলা খুলে মিহিরের দিকে উঁকি মারবে। তার করুণ মুখের ওপর দিয়ে অনুকম্পার দৃষ্টি বুলিয়ে নেবে। তারপর একটি নিশ্চিত জবাব শুনতে পাবে মিহির, 'কই না, আসেনি তো।'

হয়তো পাল্টা প্রশ্নও শুনতে হতে পারে, 'বউ হারিয়েছে নাকি মশাই, কখন হারালো?'

না। যা হারাবার তা হারাক। মিহির ঘরে ঘরে অনুকম্পা কুড়াতে যেতে পারবে না। তাছাড়া, গিয়ে কী হবে। কলিয়ারীর কোথাও সে নেই। মিহির এ কথা নিশ্চিত জানে। জেনেও না-জানার ভান করে লাভ কি।

আশায় আশায়, আশায় নিরাশায় আরো ঘণ্টাখানেক কাটল। এর মধ্যে শম্ভু চা দেবার প্রস্তাব নিয়ে এসে দু-দুবার তাড়া খেয়ে গেল।

কিন্তু নটা বেজে যাবার পর আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না মিহির। বাড়িতে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটলে, স্বজন-পরিজনদের কারো মৃত্যু হলে মানুষ যেমন হঠাৎ বড় অসহায় বোধ করে, মিহির তেমনি বিহ্বল হয়ে পড়ল। এই মুহূর্তে কাকে ডাকা যায়? অন্তরের শঙ্কা, লজ্জা, ভয়ের কথা, কাকে বলা যায়? কোন সহকর্মী, সুহৃদকে এখানে ডেকে আনতে পারে মিহির? হঠাৎ কোন নাম, কোন মুখ মনে পড়ল না। একটু ভাবতে প্রবীরের কথাটাই তার মনে হল। বয়সে আর চাকরির দিক থেকে জুনিয়র হলেও ইদানীং এই ছেলেটির সঙ্গেই তার অন্তরঙ্গতা হয়েছে। বাড়িতে যাতায়াত সেই বেশি করে। মন্দিরার সঙ্গেও তারই যা একটু ঠাট্টা-তামাসার সম্পর্ক আছে।

মিহির শম্ভুকে ডেকে বলল, 'প্রবীরবাবুর মেস চিনিস?'

'চিনি বাবু।'

'প্রবীরবাবুকে একটা খবর দিয়ে আয় তো। বলবি, বিশেষ দরকারে আমি ডেকেছি। এক্ষুনি যেন তোর সঙ্গে চলে আসেন।'

শম্ভু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল।

চাকরকে বাইরে পাঠিয়ে মিহির নিজের ঘরে তল্লাসী করতে লাগল। টেবিলে, দেরাজে, খাটের ওপরে, বালিশের তলায়, মন্দিরা কিছু লিখে রেখে গেছে কিনা খুঁজতে লাগল। না, কোথাও কিছু নেই, কোথাও কোন নিদর্শন নেই। কিন্তু তার ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস, বিছানা-পত্র, গয়নার বাক্স, টয়লেটের টুকি-টাকি সবই পড়ে আছে। তবে কি সত্যিই মন্দিরা কোথাও যায়নি? একেবারে চলে যাবার জন্যে যায়নি? খানিকক্ষণ বাদে তবে কি সে ফিরে আসবে? কিন্তু অন্তরের মধ্যে তেমন কোন আশার বাণী শুনতে পেল না মিহির। অশুভ তীব্র যন্ত্রণায় কুট আশঙ্কাই তার মন জুড়ে রইল।

সহকর্মী পরেশবাবু একটু বাদে নিজেই এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন, 'আপনাকে একটা খবর দিতে এলাম মিহিরবাবু, মিসেস মুখার্জি কি ফিরেছেন?'

মিহির বলল, 'না'।

'তাহলে তিনি বোধহয় আজ আর ফিরবেন না।'

'কী করে জানলেন?'

'আমাদের চন্দর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তিনি চন্দকে ভালো করে চিনতে পারেননি। কিন্তু চন্দ ঠিকই চিনেছে। চন্দ বলল, মিসেস মুখার্জি দুটোর সময় আসানসোলের বাসে উঠে পড়লেন। আসানসোল থেকে ফেরার বাস তো এখন নেই। তিনি নিশ্চয়ই ওখানেই রয়ে গেছেন। আপনাদের জানা-শোনা কেউ আছে নাকি আসানসোলে?'

মিহির অস্ফুটস্বরে বলল, 'না'।

পরেশবাবু বললেন, 'আমাদের অ্যাকাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টের ননী সান্যাল আবার এক অদ্ভুত কথা বলল!'

শুনবার ইচ্ছা ছিল না মিহিরের। তবু জিজ্ঞাসা করল, 'কী কথা?'

পরেশবাবু বললেন, 'সে নাকি মিসেস মুখার্জিকে কলকাতার ট্রেন ধরতে দেখেছে। সঙ্গে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, হয়তো আত্মীয়স্বজন কেউ হবেন। যাক গে, আপনি ভাববেন না, মিহিরবাবু। আজকালকার মেয়েরা একা-একা কত হিল্লী-দিল্লী করে। কত দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ায়। আর মিসেস মুখার্জি কলকাতা পর্যন্ত যেতে পারবেন না? নিশ্চয়ই পারবেন।'

মিহিরের একবার ইচ্ছা হল, রূঢ়ভাবে প্রতিবেশীকে বলে দেয়, 'আপনি এবার আসতে পারেন।'

কিন্তু স্পষ্ট বলতে হল না। মিহিরের মুখ দেখে তিনি নিজেই বিদায় নিলেন।

মিহিরের বুঝতে বাকি রইল না, ভদ্রলোক তাকে সহানুভূতি জানাবার জন্যে আসেননি। যার বউ ঘর ছেড়ে পালায়, লোকে তাকে সহানুভূতি জানায় না।

তাকে দেখে কৌতুক বোধ করে। তার যত বিদ্যা-বুদ্ধি, সততা-মহত্ত্ব, কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তিই থাক, সে সমাজের আর দশজনের অনুকম্পাভাজন হয়। পুরুষকে হতমান করবার, সমাজে হাস্যাস্পদ করবার এই একটি ক্ষমতা আছে স্ত্রীর, তার ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া। তাকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করে তার পৌরুষকে নস্যাৎ করে দিয়ে যাওয়া! কিন্তু মিহির কি এতই অযোগ্য, বিনা কারণে মুখ বুজে সে এই মার খাবে? প্রতিবাদ করবে না? প্রতিকারের জন্যে হাত তুলবে না? মিহির কি এতই অধম কাপুরুষ, অপমানিত অসম্মানিত হয়ে ঘরের কোণে সে শুধু মুখ লুকিয়ে বসে থাকবে? যারা তাকে অপমান করে গেল, তাদের ওপর বিন্দুমাত্র শোধ নেবে না?

খানিক বাদে বেশ একটু ব্যস্ত হয়েই প্রবীর এসে ঘরে ঢুকল, 'কী হয়েছে মিহিরদা?'

প্রবীরের মুখ দেখে মিহির বুঝতে পারল, কী হয়েছে তার জানতে কিছু বাকি নেই। শম্ভু পথে নিশ্চয়ই সব বলতে বলতে এসেছে। তবু লজ্জাকর কথাটা কেউ মুখ ফুটে বলতে চায় না। আর-একজনের মুখ থেকে শুনবার জন্যে অপেক্ষা করে।

জেনেছেই যখন, জানুক। মিহির মরীয়া হয়ে বলে ফেলল, 'শুনেছ বোধ হয়, মন্দিরাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

মিহিরের সামনের চেয়ারটায় বসেছিল প্রবীর। বারেকের জন্যে মুখ নামাল।

বেশ বোঝা গেল, মিহিরের জন্যে তার কষ্ট হচ্ছে। সত্যিকারের বন্ধু পৃথিবীতে এখনো তা হলে দু-একজন আছে। এখনো সহৃদয়তা, সহানুভূতি একেবারে দুর্লভ নয়।

একটু বাদেই প্রবীর মুখ তুলে হাসল।

প্রীতিভরা ঈষৎ ধমকের সুরে বলল, 'কী যে বলেন মিহিরদা, পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে না আবার কি? একি আপনার ঘড়ি না পেন যে, পিকপকেটিং হয়ে গেছে? আমি শুনেছি, বউদি নিজে পায়ে হেঁটে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ট্রেনে উঠেছেন। এতক্ষণে বাপের বাড়ি পেঁছেও গেছেন।'

মিহির একটু যেন আশ্বস্ত হল। প্রবীরের দিকে তাকিয়ে বলল. 'বাপের বাড়ি? তোমার ধারণা, সে বাপের বাড়ি গেছে?'

প্রবীর বলল, 'ধারণা মানে নিশ্চিত ধারণা। মোল্লার দৌড় মসজিদ তক। আর মেয়েরা মানে মিসেস মোল্লারা স্বামীর সঙ্গে আড়ি করে বাপের বাড়ি ছাড়া আর কোথায় যেতে পারে বলুন? আমি তো যার কাছে শুনেছি, তাকেই এ কথা বলেছি।'

মিহির ভাবল, এরই মধ্যে বলাবলি শুরু হয়ে গেছে। মন্দিরা পালিয়ে গেছে, এ-খবর কলিয়ারীর কারোরই বোধ হয় আর জানতে বাকী নেই। শুধু

মিহিরই জানত না। তবু প্রবীরের ব্যবহারটুকু ভালো লাগল মিহিরের। সে যে তার পারিবারিক কলঙ্ককে গোপন রাখবার চেষ্টা করেছে, প্রবীরের এই সদিচ্ছা আর সৌহার্দ্য তাকে স্পর্শ করল।

মিহির বলল, 'তা হলে এত রাত্রে আর আসানসোলে যাব না!'

প্রবীর বলল, 'আমার তো মনে হয় না, আসানসোলে গিয়ে কোন লাভ আছে; এখন গেলে মিছিমিছি কষ্টই সার হবে। তার চেয়ে আজ রাত্রে নিশ্চিন্তে একটা ঘুম দিয়ে কাল ভোরে উঠে ফার্স্ট ট্রেনে চলে যাবেন। শ্বশুর-বাড়িতে গিয়ে দেখবেন, মান-অভিমান ধুয়ে মুছে গেছে। দিব্যি বউদির হাতের চায়ের কাপটি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। চায়ের কাপে ঝড় নয়, ঝড়ের পরে চায়ের কাপ।'

প্রবীর হয়তো একটু প্রগল্‌ভ। সিনিয়রের মর্যাদা রেখে সব সময় কথা বলে না। কিন্তু বন্ধুত্বের অধিকার মিহিরই তো ওকে দিয়েছে। এই মুহূর্তে বন্ধুকেই তার দরকার।

ব্যাপারটা গুরুতর কিছু নয়, সামান্য দাম্পত্য কলহ বলে প্রবীর ঘটনাকে ধরে নিয়েছে; এতে মিহির আশ্বস্ত হল এবং খানিকটা খুশিও হল। মিহিরের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল, সে যে কুট আশঙ্কা করেছিল, তা হয়তো সত্যি নয়। হয়তো মন্দিরা রাগ করে, জেদ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। সে জেদ ভাঙতে আর কতক্ষণ। কিন্তু এমনভাবে যাওয়া কি মন্দিরার উচিত হয়েছে? সে কি জানে না, এর নানারকমের ব্যাখ্যা হতে পারে? সে-ব্যাখ্যা কারো পক্ষেই গৌরবের নয়?

প্রবীর আরো কিছুক্ষণ রইল। মিহির তাকে খেয়ে যেতে অনুরোধ করল।

প্রবীর বলল, 'আপত্তি নেই মিহিরদা। আমার মেসের ভাত অবশ্য নষ্ট হবে। তা হোক। আমাদের ঠাকুরের চেয়ে শ্রীমান শম্ভুর শ্রীহস্তের রান্না অনেক ভালো। তাছাড়া, বউদির ভাগের যে-সব মাছ-তরকারি আছে, আমি তার ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী।'

খেতে খেতে নানা কথা নিয়ে গল্প চলল।

মিহির লক্ষ্য করল, প্রবীর মন্দিরার প্রসঙ্গটা আর তুলতেই চাইল না। ও-সমস্যার যেন সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। খেলাধুলা, এখানকার অফিসারদের মধ্যে দলাদলি, এত ব্যাপারে যে প্রবীরের ঔৎসুক্য আছে, এর আগে তা যেন তেমন খেয়াল করেনি মিহির। মাঝে মাঝে সে বুঝতে চেষ্টা করল—প্রবীরের এই উৎসাহ কতখানি অকৃত্রিম, কতখানিই বা তাকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা।

মিহির বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, থানায় একবার খবর দিয়ে রাখব কি না।'

প্রবীর যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'থানা! থানা-পুলিস আবার কিসের

জন্যে মিহিরদা?'

মিহির বলল, 'আমি ভেবেছিলাম—মানে যদি কোন অ্যাকসিডেন্ট-ট্যাকসিডেন্ট ঘটে থাকে, বলা তো যায় না।'

প্রবীর হেসে বলল, 'কিছু ভাববেন না আপনি। দুর্ঘটনা ঘটাবার মেয়ে মন্দিরা বউদি নন। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে যান। নাকি ভালো ছেলের মতো এখন গিয়ে ফের পড়তে বসবেন! আমরা স্কুল-কলেজেও আপনার মতো পড়তে পারিনি মিহিরদা। যাকে বলে একেবারে পয়লা নম্বরের পড়ুয়া আপনি।'

আরো কিছুক্ষণ গল্প-গুজবে কাটিয়ে প্রবীর বিদায় নিল।

কিন্তু সে রাত্রে পয়লা নম্বরের পড়ুয়ারও পড়ায় মন বসল না।

ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে মিহিরের হঠাৎ খেয়াল হল, আজই তাদের বিয়ের তারিখ। মিহির ভাবল, বেছে বেছে এই দিনটিই কি মন্দিরা গৃহত্যাগের জন্যে স্থির করে রেখেছিল! এ কি তার ইচ্ছাকৃত। নাকি বিয়ের তারিখ মন্দিরা ভুলে গিয়েছিল। মনে করে রাখবার মতো কোন গুরুত্ব দেয়নি বলেই মনে পড়েনি? মিহিরও অবশ্য ভুলে গিয়েছিল। দিনকয়েক আগে একবার তার মনে হয়েছিল, এই দিনটিতে ছোটখাটো একটি উৎসবের মতো করবে। জনকয়েক বন্ধুকে খেতে বলবে। একটু গান-বাজনার আয়োজন হবে। মন্দিরার জন্যে একখানা শাড়ি-টাড়ি কিছু নিয়ে আসবে—ভেবে রেখেছিল মিহির। কিন্তু মন্দিরার মনের ভাব লক্ষ্য করে আর এগোয়নি। অন্তরে যেখানে উৎসব নেই, সেখানে বাইরে ঘটা করে কী হবে। যদি উৎসবের দিন কখনো আসে, সেদিন উৎসব করবে মিহির। সেদিনই হবে তাদের সত্যিকারের বিবাহ-বার্ষিকী। শুধু বিবাহ-বার্ষিকী নয়, প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠান। মিহিরের মনে পড়ল, এক বছর আগে এই দিনটিতে আচার-অনুষ্ঠানের কী ঘটাটাই না হয়েছিল। কত বেদমন্ত্র পাঠ, স্ত্রী-আচার, পুরোন প্রথা আর নিয়মকানুন বেঁধে বিবাহকে তারা সিদ্ধ করে নিয়েছিল। তবু সে বিয়ে সিদ্ধ হল না। হবে কী করে। মিহির মন্ত্র পড়েছিল অর্ধ-বিদ্রূপের ভঙ্গিতে, আর মন্দিরা বোধ হয় মন্ত্র একেবারেই পড়েনি। তাই তাদের বেলায় মন্ত্র সম্পূর্ণ শক্তিহীন আর ব্যর্থ হয়ে গেছে। তবু বেছে বেছে এই দিনটিতেই মন্দিরার চলে যাওয়া মিহিরের কাছে অত্যন্ত ক্রূর আর নিষ্ঠুর বলে মনে হল। হোক তাদের বিয়ে জোড়া-তালির বিয়ে, তবু বিয়েই তো। এই এক বছর ধরে তারা একসঙ্গে ঘর-সংসারও করেছে। এতদিন একসঙ্গে বাস করলে প্রেম না হোক একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তো গড়ে উঠতে পারত। মিহির সেজন্যে চেষ্টা কম করেনি। কিন্তু মন্দিরা যেন কিছু গড়বার জন্যে আসেনি। পরম আক্রোশে সব চুরমার করে ভেঙে দেবার জন্যেই সে এসেছিল। ভেঙে দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু তাই যদি গিয়ে থাকে, মন্দিরাকে সহজে ছেড়ে দেবে না মিহির। শোধ নেবে.

নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেবে। যে স্ত্রী তার সমস্ত মান-মর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে, তাকে কি সহজে নিষ্কৃতি দেবে মিহির? সে কি ক্ষমার যোগ্য?

সারারাত কিসের একটা তীব্র জ্বালায় ছটফট করতে লাগল মিহির। ভালোবাসার তার দরকার নেই। ভালোবাসা না পেলেও তার চলে। কিন্তু সাধারণ ভদ্রতা, যে চুক্তি তারা দুজনে মেনে নিয়েছে, সেই চুক্তির প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা আনুগত্য কি আশা করতে পারে না মিহির? চুক্তি যদি ভাঙবার ইচ্ছা ছিল মন্দিরার, বলে-কয়ে জানিয়ে-শুনিয়েই না হয় ভাঙত। এমন লুকোচুরির কী দরকার ছিল? পালিয়ে গিয়ে সারা কলিয়ারীতে মিহিরকে অপদস্থ করবার কী দরকার ছিল?

নীতি-নিয়মের পরম পক্ষপাতী মিহিরের মনে পড়ল না, দুর্নিবার রিপু যখন কিছু ভাঙে এমনি করেই ভাঙে, চুলচেরা হিসাব করে সে ভাঙতে যায় না। উন্মত্ত আবেগে সে যা সামনে পায়, তাই চুরমার করতে করতে এগিয়ে চলে। অমঙ্গলের কোন বাঁধা পথ নেই। তা রীতি রুচি সুবিচার দাক্ষিণ্যের ধার ধারে না।

পরদিন অন্যদিনের মতই ভোরে ঘুম ভাঙল মিহিরের। কিন্তু অন্যদিনের মত সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়ল না। উঠবার আর যেন কোন সার্থকতা নেই। উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে কৌতুকপূর্ণ বিদ্রূপ আর পরিহাস-উপহাসের অসংখ্য মুখ সে দেখতে পাবে। মুখে মুখে একটি মাত্র অনুচ্চারিত মন্তব্য—'এই তোমার পৌরুষ! স্ত্রীকে ঘরে ধরে রাখতে পার না, এই তোমার কব্জির জোর!'

তবু উঠে লাভ নেই, বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতেও পারল না মিহির। বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীর মত তার এই নিভৃত নিরাপদ শয্যাটিও যেন বিশ্রামহন্ত্রী কণ্টকশয্যা হয়ে উঠেছে।

মুখহাত ধুয়ে এক কাপ চা খেয়ে মিহির প্রথমে অফিসে গেল। খাদে অবশ্য বিকালে ডিউটি। কিন্তু আজ আর ডিউটিতে যাবে না এই কথাটুকু ম্যানেজারকে জানাবার জন্যেও যেতে হল। পথে অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। কুলীরা সেলাম জানাল। অধঃস্তন কর্মীরা নমস্কার জানাল। সহকর্মীরা কুশল-প্রশ্ন করল। মিহির যা আশঙ্কা করেছিল, তা হল না। 'তোমার স্ত্রী কোথায়?'—বলে কেউ তাকে বিদ্রূপে বিদ্ধ করল না। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। কেউ খাদে নামতে যাচ্ছে। কেউ থলি নিয়ে বাজারের দিকে চলেছে। কেউ বা ছেলেমেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে। এই ছোট উপনগরীটুকুতেও সহস্র কর্মধারা ছুটে চলেছে। প্রত্যেকেই স্বকর্মে মগ্ন, স্বক্ষেত্রে পরিতৃপ্ত। মিহিরের ঘরে স্ত্রী আছে কি নেই, তা নিয়ে খুব কম লোকেরই কৌতূহল প্রকাশের অবসর আছে। তবু প্রত্যেকের দৃষ্টি মিহিরকে বিদ্ধ করতে লাগল। প্রত্যেকের মুখে একটি মাত্র অনুচ্চারিত প্রশ্নই শুনতে পেল মিহির। যেখানে

কয়েকজন লোকের জটলা দেখল, সেখানেই তার মনে হল, তারা মিহিরের ঘরের কথা নিয়েই বলাবলি করছে।

ম্যানেজারের ঘরে যেতে তিনি অভ্যর্থনা জানালেন, 'আসুন আসুন, মিহিরবাবু। কী ব্যাপার। আপনার ডিউটি তো বিকেলে। সকালেই হাজির দেখছি যে।'

মিহির তাঁর সামনের চেয়ারে বসে বলল, 'বিকেলে আসব না। ভাবছি, দিন কয়েকের ছুটি নেব।'

ম্যানেজার বললেন, 'ছুটি! ছুটির কথা তো আপনার মুখে বড় একটা শুনতে পাইনে। বেশ তো, নেবেন ছুটি। ছুটি নিয়ে কোথায় যাবেন? কলকাতায়?'

মিহির বলল, 'যেতে পারি।'

ম্যানেজার বললেন, 'যান যান। ঘুরে আসুন। ছুটির জন্যে এত কষ্ট করে এ পর্যন্ত আসবার কী দরকার ছিল। একটা অ্যাপলিকেশন পাঠিয়ে দিলেই পারতেন।'

মিহির ভাবল, আসল কথাটা ম্যানেজার মুখে আনছেন না। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি তাঁর হাসি তাঁর কথা বলবার ধরনে মিহিরের টের পেতে বাকি নেই, ম্যানেজার সব জানেন। তাঁর এই অকৃপণ দাক্ষিণ্য উদার সৌজন্য সবই সেই অনুকম্পাসঞ্জাত।

ম্যানেজারকে নমস্কার জানিয়ে মিহির নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। দেখে খুশি হল, কেউ তখনো আসেনি। কারো মুখোমুখি হতে হল না। এর চেয়ে বড় স্বস্তি এই মুহূর্তে মিহিরের কাম্য নয়।

ছুটির দরখাস্ত করবার জন্যে শাদা কাগজ চাই। মিহির ড্রয়ার খুলল। কিন্তু অন্য কিছু চোখে পড়বার আগে মন্দিরার নামে লেখা সেই খামখানার দিকে চোখ পড়ল মিহিরের। এই চিঠি শুধু মন্দিরার কাছ থেকে লুকোয়নি মিহির, নিজের কাছ থেকেও লুকিয়েছিল। এর অস্তিত্বের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল মিহির। আজ সেই অস্তিত্ব ফের অগ্নিময় হয়ে উঠল। আজ আর কোন দ্বিধা করল না মিহির। দ্রুত নিষ্ঠুর হাতে খামের মুখ ছিঁড়ে রঙীন কাগজের ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল। অন্যের গোপন প্রেমপত্র পড়া জীবনে এই তার প্রথম। এর আগে কলেজে পড়বার সময় দু-একজন সহপাঠী বন্ধু তাদের বান্ধবীদের লেখা চিঠি মিহিরকে পড়তে দিয়েছে কি পড়ে শুনাতে চেয়েছে। মিহির রাজী হয়নি। তার ধারণা, এর চেয়ে অশোভন রুচিবিগর্হিত কাজ আর নেই। এ ধরনের চিঠিতে একজন শুধু আর একজনের সঙ্গে কথা বলে। হৃদয়ের গোপন ভাণ্ডার উন্মোচিত করে দেয়। সেই রুদ্ধ দ্বারের কাছে তৃতীয় ব্যক্তির কান পাতবার অধিকার নেই। কিন্তু শশাঙ্কের চিঠির বেলায় তো সে প্রশ্ন আসে না। শশাঙ্ক নিজেই অনধিকারী। মিহির ছত্রে ছত্রে সেই

নির্লজ্জ স্পর্ধিত অশালীন অনধিকার-চর্চা শাসকের বিচারকের তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখে যেতে লাগল।—

'মন্দিরা,

তোমার চিঠি পেয়েই জবাব দিতে বসেছি। তোমার চিঠিতে এমন মত্ততা এমন উদ্দীপনা আছে যে, আমার মত [illegible]ও উদ্যমী করে তোলে। আমারও ছুটতে ইচ্ছা করে, সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করে, জয় করতে ইচ্ছা করে। সেই জয়মাল্য [illegible] গলায় পরিয়ে দিতে আমারও অভিলাষ হয়। কিন্তু আমার সব উৎসাহ শুধু মুহূর্তের আয়ু সম্বল করে আসে। আতসবাজির মত এক মুহূর্তে জ্বলে ওঠে, পরমুহূর্তে ছাই হয়ে যায়। আমি এক নিবে-যাওয়া অঙ্গার-শলাকা। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে অনির্বাণ চিরদ্যুতিমান বিদ্যুতের স্পর্শ কামনা করি। বিদ্যুতের উজ্জ্বল রূপের দিকে অপলকে সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকি। সেই রূপবহ্নিতে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই। অগ্নিস্নানে যদি নবজন্ম লাভ করি, মুহূর্তের জন্যেও যদি সেই ভাস্বরতা ফিরে পাই।

'কিন্তু আশা কি মেটে? মুহূর্তের জন্যে আমি যে নবত্বের স্বাদ পাই, তা কি শুধু বিস্মৃতি বিভ্রম আর মত্ততা? তার মধ্যে আরো কিছুই কি নেই? আমি একেবারে নির্ব্বোধ নই। তাই একেবারে নেই বলতে পারিনে। আমি দেখেছি, আর-একজনের স্বীকৃতির মধ্যে আমি যেন নতুন করে বাঁচি। আর-একজনের প্রাপ্তির মধ্যে আমি যেন নিজেকে নতুন করে ফিরে পাই। কিন্তু হারাতেও সময় লাগে না। আমি এই মুহূর্তে আত্মহারা, পরমুহূর্তে হৃতসর্বস্ব।

'তুমি লিখেছ, তুমি কারাগারে বন্দিনী। সেই বন্দীদশা আমিও মুহূর্তে মুহূর্তে অনুভব করি। শুধু একটু তফাৎ আছে। তোমার কারাধ্যক্ষ তোমার স্বামী। আমার কারাধ্যক্ষ আমি নিজে। আমরা দুজনেই [illegible]। তবু কে কাকে মুক্তি দিতে পারি বলো? সেই মুক্তির জন্যে শুধু বার বার হাত বাড়াতে পারি। কিন্তু তা যে কখনো করায়ত্ত হবে, এমন আশা অন্তত আমি করিনে। কিন্তু তোমার করতে বাধা নেই। তুমি যৌবনধন্যা। উৎসাহে উদ্যমে নির্ভীকতায় শক্তিতে সামর্থ্যে অনন্যা তুমি।

'তুমি মৃত্যুর কথা বলেছ। মরবে ভয় দেখিয়েছ। ভয় দেখানো ছাড়া কি! আগুনে পুড়ে বিষ খেয়ে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে কেউ যখন মরে, তখন আর পাঁচজনকে দেখিয়ে দেখিয়ে মরে। আমিও আত্মঘাতী। তবে তুমি যেসব পন্থার কথা লিখেছ, তার কোন পথে নয়। আমি কাউকে দেখিয়ে দেখিয়ে মরিনে। মৃত্যুকে দেখতে দেখতে মরি। প্রতিমুহূর্তে অপমৃত্যুর যন্ত্রণা অনুভব করতে করতে মরি। তোমার চেয়ে মৃত্যুবিলাস আমার কম নয়। তবু তো বেঁচে আছি।

'তুমিও বেঁচে থাকবে। কারণ, বাঁচাটা আরো মনোরম, আরো সাঙ্কেতিক, আরো রহস্যময়। মৃত্যু শুধু নীলবর্ণ, জীবন বিচিত্রবর্ণ। তাই মরতে মরতেও সেই বর্ণাঢ্য জীবন আমি আঁকড়ে ধরে আছি। ভোগের জীবন, সম্ভোগের জীবন, পাপের জীবন, তাপের জীবন, অনুশোচনার জীবন। জীবনে রূপের অন্ত নেই, স্বাদের অন্ত নেই। অন্তিমশয্যায় শুয়েও আমি তাই জীবনের মহিমা দেখতে পাই। আর আমার যারা সংস্পর্শে আসে, তাদের সেই জীবনের উপভোগ সম্ভোগের ক্ষেত্রে ডেকে আনি।

'তোমাকেও আমি তাই বাঁচতেই বলি মন্দিরা। পরিপূর্ণভাবে বাঁচতে বলি। সেই বাঁচার মন্ত্র আমি বলে দিতে পারব না।

'কোন কোন সময় মৃত্যুবিলাসীর কাছে জীবনকে বিড়ম্বনা বলে মনে হয়; আবার কোন কোন সময় অনুভব করি, বাঁচাটাই এক মন্ত্র। শ্রবণ মনন হৃদয়-মুগ্ধকর পরম মধুর মন্ত্রধ্বনি।

'মন্দিরা, তুমি সেই ধ্বনির মত নিত্য গুঞ্জরিত হও।

শশাঙ্ক।'

পড়া শেষ করে চিঠিখানা খামের মধ্যে ফের ভরে রাখল মিহির। মনে মনে ভাবল, পাকা খেলোয়াড়। চতুর দক্ষ প্রণয়-ব্যবসায়ী। সাধারণ প্রেমপত্র লোকটি লিখতে যাবে কেন। লিখলে বিদগ্ধজনের মতই লিখবে। যাকে দগ্ধ করতে হয়, তাকে ঠিকই দগ্ধ করবে।

এ চিঠি যদি কোন গল্প-উপন্যাসের হতো, কি যদি অন্য কোন মেয়েকে, অন্য কারো স্ত্রীকে লেখা হতো, মিহির এ চিঠির সাহিত্য-রস উপভোগ করতে পারত। কিন্তু স্ত্রীর প্রণয়ীর এই গোপনপত্রে মিহির কটু স্বাদ ছাড়া আর কিছুই পেল না।

মিহিরের সন্দেহ রইল না, এমন চিঠি শশাঙ্ক অনেক লিখেছে। ক'খানা আর হাতে পড়েছে মিহিরের? মন্দিরা তার হাতে পড়তে দিয়েছে? চিঠিতে চিঠিতেই মন্দিরাকে হয়তো ঘর থেকে ডেকে নিয়েছে শশাঙ্ক। মন্ত্র আর কোথাও নয়, মন্ত্র তার কলমের মধ্যে। মারণ উচাটন [illegible] মন্ত্র। মন্ত্রবলে যে-জীবনের মধ্যে শশাঙ্ক মন্দিরাকে টেনে নিয়েছে, সে-জীবন অসঙ্গত উচ্ছৃঙ্খল জীবন।

ফিরে এসে মিহির এবার অসঙ্কোচে মন্দিরার ট্রাঙ্ক-বাক্সের তালা ভাঙল, গোপন জায়গা থেকে টেনে বার করল লুকানো চিঠির তাড়া আর ফোটোর অ্যালবাম। মিহিরের বুক পুড়ে যেতে লাগল। তবু কোন কিছু হাতছাড়া করল না, ফেলে দিল না। সযত্নে সব সঞ্চয় করে রাখল।

মিহিরের এবার মনে হল, ননী সান্যাল মিথ্যা দেখেনি। শশাঙ্কই মন্দিরাকে আসানসোল পর্যন্ত এগিয়ে নিতে এসেছিল। অসম্ভব কিছু নয়। যে তস্কর

একবার আসতে পারে, সে কি আর দ্বিতীয়বার এসে হানা দিতে পারে না?

ট্রেনে যেতে যেতে মিহিরের অনুমান নিশ্চিত বিশ্বাসের রূপ নিল।

বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার ধৈর্য রইল না। হাওড়া স্টেশনে নেমেই মিহির ফোন করল শ্বশুরবাড়িতে। যোগরঞ্জনই সে ফোন ধরেছিলেন। মিহির যেই শুনল মন্দিরা তাঁদের ওখানে যায়নি, সেই মুহূর্তে অসংশয়ে অসংকোচে শ্বশুরকে জানিয়ে দিল, তাঁর মেয়ে শশাঙ্কের সঙ্গে চলে এসেছে।

মন্দিরা যেন এখন আর মিহিরের স্ত্রী নয়, শুধু যোগরঞ্জনেরই মেয়ে। সমস্ত লজ্জা, অগৌরব এবং অপরাধের অংশীদার ওই কুলত্যাগিনীর জনক। মিহির অসম্পৃক্ত, অসংবদ্ধ; তার সঙ্গে কারো কোন আত্মীয়তা নেই।

মালপত্র ক্যারিয়ারে তুলে দিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে মিহির বলল, 'আনোয়ার শা রোড। টালিগঞ্জ।'

আনোয়ার শা রোড—এই শব্দ ক'টি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিহির যেন একটি হারানো জগৎ ফিরে পেল। বাবা, মা, ভাইবোনেদের জগৎ। অফুরন্ত স্নেহপ্রীতি শ্রদ্ধার জগৎ। আছে, এখনো অনেক আছে, শুধু স্ত্রীই নেই। সে কি কোনদিনই ছিল? বিবাহবিধির জোরে একটি স্ত্রীলোককে নিজের ঘরে ধরে রেখেছিল মিহির। সেই বিধিনিষেধের ডোর ছিঁড়ে সে চলে গেছে। পাখি ফাঁক পেলেই খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে যায়, পোষ-না-মানা কুকুর যেমন শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ে, এ-ও তেমনি। একটি স্ত্রী-পশু তার পাশব আবেগ আর অশাসিত সংস্কার নিয়ে মিহিরের ঘর থেকে চলে গেছে। সে ভবিষ্যতের কথা ভাবেনি, বর্তমানের মানসম্মানের দিকে তাকায়নি, আর কারো সুখ-দুঃখের কথা বিবেচনা করে দেখেনি, শুধু আপন ইন্দ্রিয় সুখের অন্বেষণে, জৈবিক তাড়নায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। এই জীববিশেষের জন্যে মিহিরের দুঃখ করা উচিত নয়। ক্ষোভ আর আক্ষেপ অপুরুষোচিত। কোন কৌতুকরসিক যেন বলেছিলেন, পুরুষ সবাইকে সভ্য করে তুলবে, কিন্তু সর্বশক্তি নিয়োগ করে স্ত্রীজাতিকে সভ্যতার আওতায় আনবে সে সর্বশেষ দিনে। এই মুহূর্তে মিহিরের মনে হল, কথাটির মধ্যে শুধু কৌতুক নয়, সত্যও আছে। নারী অশাসিত, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ আর সংস্কারের সাক্ষী। এইজন্যেই সে যুগ যুগ ধরে পুরুষের হাতে নিয়ন্ত্রিত।

কিন্তু বিশ্বের নারীপ্রকৃতিকে সাধারণ সংজ্ঞায় বাঁধবার চেষ্টা করলে কী হবে, শত চেষ্টাতেও একটি তরুণী সুন্দরী মেয়েকে মিহির যে বাহুডোরে বেঁধে রাখতে পারেনি, সেই লজ্জা, দুঃখ, আক্ষেপ আর পরাজয়ের গ্লানিতে মিহির বারবার আক্রান্ত আর আচ্ছন্ন হতে লাগল। ভালোবাসার মর্যাদা দিল না মন্দিরা। পালিয়ে চলে গেল। মিহির কি তাকে জোর করে ধরে রাখতে চেয়েছিল? সে তাকে হৃদয় দিয়েই আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিল। মানুষের

হৃদয়ের যে অনুভূতি পশুতে বোঝে, পাখিতে বোঝে, হয়তো বা তরু-লতাকেও বোঝানো যায়, সেই হৃদয় একটি নারীর হৃদয়কে নাড়া দিল না, প্রেম, প্রীতি না হোক, একটি কৃতজ্ঞতার উৎস সৃষ্টি করতে পারল না। কী করে পারবে? রক্তে-মাংসে গড়া মিহির একটি নারী-মূর্তিকে শুধু ঘরে এনে রেখেছিল। সেই মূর্তির মধ্যে শুধু জৈব সত্তা ছিল। হৃদয়বত্তা, প্রাণবত্তা বলে কিছু ছিল না। আশ্চর্য, তবু সেই তুচ্ছ বস্তুটির জন্যে মিহিরের প্রাণ এমন করে পুড়ে যাচ্ছে কেন? মনে হচ্ছে যেন জগৎ-সংসার সব জ্বলে যাচ্ছে। মিহিরের মনে হল, মৃত্যুর চেয়েও মর্মন্তুদ ভালোবেসে ভালোবাসা না পাওয়া, ভালোবেসে উপহাস্য হওয়া। ভালোবাসা—এই রক্ত-মাংসের দেহ, যার আধার আর রক্ত-মাংসের অতীত কোন কল্পনায় গড়া, মনগড়া মন যার আধেয়। ভালোবাসা! একান্তভাবেই যৌন-পরিতৃপ্তি তার ভিত্তি, তবু মাটি ছাড়িয়ে গিয়ে এক ঊর্ধ্বতর রহস্যলোকে বারবার যার মৌন অভিযান। হয়তো ব্যর্থ অভিযান।

দোরের সামনে ট্যাক্সি দাঁড়াতেই পরিত্যক্ত স্নেহবন্ধনহীন নিঃসম্পর্কিত মিহিরকে পৃথিবী আবার ফের সহস্র আত্মীয়তার বাঁধনে বেঁধে ফেলল।

প্রথমে তপন এল ছুটে, 'ও মা, দেখ এসে। দাদা এসেছে, দাদা।'

আসবার তো কথা ছিল না মিহিরের। চিঠি দেয়নি, পত্র দেয়নি। কেউ জানেও না যে আসবে। বাড়ির ছেলে বাড়ি এসেছে। আসা তো নয় যেন আবির্ভাব।

পড়া ছেড়ে বিশাখা ছুটে এল, রান্না ছেড়ে মা। বাবা কিছু ছেড়ে আসেননি তামাক খাচ্ছিলেন। গড়গড়া হাতেই চলে এসেছেন। পরনে লুঙ্গি। গলায় পৈতে। খালি গা। মুখে হাসি। যেন প্রথম পুত্রমুখ দেখলেন।

বিশাখারই প্রথম চোখে পড়ল, দাদা একাই এসেছে। সঙ্গে কেউ নেই পাশে কেউ নেই।

'ও মা, বউদি কোথায়?'

মিহির বড় ব্যস্ত। ট্যাক্সি থেকে জিনিসপত্র নামাতে হবে। তার ভাড়া মিটিয়ে দিতে হবে। বোনের কথার জবাব দেওয়ার সময় কই মিহিরের।

দাদার বাক্স-বিছানা তপন টেনে নিল।

মিহির তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে স্কুলে যাসনি?'

তপন বলল, 'আমাদের আজ ছুটি। ফাউন্ডারের ডেথ অ্যানিভারসারি

মিহির একটু হাসল, 'একেবারে ডেথ? ঘরে বসে শোক করছিস বুঝি

তপন বলল, 'দারুণ শোক। দিদির কিন্তু ও-সব কিছু না। ইচ্ছে কা ডুব দিয়েছে।'

মিহির বলল, 'ডুব দিয়েছে? না কি শোকসাগরে ভাসছে?'

মনোরমা ধমক দিলেন, 'কী সব অলক্ষুণে কথা বলছিস এই ভর-দুপু বেলায়? হ্যাঁরে, বউ কোথায়?'

মিহির এবার গম্ভীরভাবে বলল, 'চল, বলছি।'

তপন, বিশাখা, দুজনেই শুনবার জন্যে কৌতূহলী। মনোরমার কৌতূহল কম নয়। তিনিও ওদের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকলেন। কেবল মিহিরের বাবা মুকুন্দবাবু বাইরে গড়গড়া টানতে লাগলেন। যেন তাম্রকূট ছাড়া এই মুহূর্তে তাঁর কোন ব্যাপারে আসক্তি নেই। কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে তিনিও মন্দিরার খবর শুনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন।

মনোরমা ছেলের দিকে তাকিয়ে ফের জিজ্ঞাসা করলেন, 'বউ কোথায়! তাকে কোথায় রেখে এলি?'

মিহির বলল, 'বলছি মা। সবই বলছি।'

তারপর ভাইবোনের দিকে চেয়ে বলল, 'তোরা একটু বাইরে যা তো।'

বিশাখা তপুকে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় দোরটা ভেজিয়েও দিল। তবু মিহিরের মনে হল, ওরা বোধ হয় বেশিদূর যায়নি।

মিহির নিঃশব্দে জামার বোতাম খুলতে লাগল। ঝোঁকের মাথায়, আক্রোশের মুখে, টেলিফোনের আড়াল থেকে শ্বশুরকে যা বলে এসেছে, মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্ত্রীর সম্বন্ধে সে কথা মিহির কী করে মুখে আনে? একটি সতী-সাধ্বী নারীর সামনে আর-একটি অসতী মেয়ের কলঙ্কের কথা কী করে উচ্চারণ করে মিহির?

মনোরমা ছেলের দিকে আরো দু'পা এগিয়ে এলেন, 'উঃ আমার নিঃশ্বাস আটকে আসছে। বল সে কোথায়?'

মিহির বলল, 'কোথায় তা জানিনে মা।'

'জানিনে মানে? কী হয়েছে তার?'

'তা-ও জানিনে। সে নেই।'

'নেই মানে?' মনোরমা ছেলেকে আঁকড়ে ধরলেন।

তারপর কাঁদো কাঁদো সুরে বললেন, 'ওরে বাবা, আমার কী হবে গো। একথা আগে বলিসনি কেন? ওরে আমি কি তোর এমনই শত্তুর, একটা খবর পর্যন্ত দিলিনে? কী হয়েছিল তার?'

মাতৃস্নেহও এই মুহূর্তে পরম অসহ্য লাগল মিহিরের। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সরে গিয়ে, নীরস রুক্ষস্বরে বলল, 'অমন কোরো না মা। সে মরে যায়নি। চলে গেছে। পালিয়ে গেছে।'

মনোরমা এবার আর কাঁদলেন না। কিন্তু বিকৃত কণ্ঠে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, 'ওমা, কী হবে গো। আমি কোথায় যাব। ঘরের বউ আবার পালিয়ে যায় কী করে। বাপের জন্মেও তো এ কথা শুনিনি।'

মুকুন্দবাবু ভেজানো দোর ঠেলে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকলেন। স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, 'বাপের আমলে যা শোনোনি, ছেলের আমলে তা শোন। আরো কত শুনতে হবে। শোনার এখনই কী হয়েছে?'

তারপর ছেলের দিকে ফিরে তাকালেন মুকুন্দবাবু, জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবে গেল? কার সঙ্গে গেল?'

মিহির বলল, 'বাবা, এ-ব্যাপারের মধ্যে আপনি আসবেন না।'

'আসব না?' মুকুন্দবাবু দরজায় খিল এঁটে দিয়ে ফের এসে ঘরে দাঁড়ালেন। তারপর চাপা কিন্তু রুষ্ট ক্ষুব্ধস্বরে বলতে লাগলেন, 'আমার কুলে কালি পড়ল, আমার ছেলের বউ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল আমার। আর, এ-ব্যাপারে আমি আসব না, আসবে কি ওই সেখেদের বাড়ির অছিমুদ্দীন? হারামজাদার বেটা হারামজাদা।'

দাঁতে দাঁত ঘষলেন মুকুন্দবাবু।

তিনপুরুষ জড়িয়ে এই গালাগাল যে অছিমুদ্দীনের উদ্দেশ্যে নয়, মিহিরের বুঝতে বাকী রইল না। হারামজাদা কথাটা বাবার বাঁধা গালি। অনেককাল থেকেই অক্ষয় অব্যয় হয়ে মুখের সঙ্গে লেগে রয়েছে। সামান্য উত্তেজনার কারণ ঘটলে এ-গালাগাল তিনি অন্যকেও দেন, কিন্তু শব্দটা নিজের ছেলের উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করেন বেশি। স্নেহের বশেও যে না করেন তা নয়।

কিন্তু এই মুহূর্তে বিন্দুমাত্র স্নেহ কি ছেলের ওপর তাঁর আছে? মিহিরের মনে হল নেই, কিছুমাত্র নেই। তিনি শুধু তাঁর কুলের পবিত্রতার কথা ভাবলেন। ছেলের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন না, তাঁর অন্তরের অনুভূতিকে অন্তর দিয়ে বুঝতে চাইছেন না। মন্দিরা তার ঘর ভেঙে দিয়ে চলে গেছে। আর বাবা মুগুরের আঘাতে রুচি, সম্ভ্রম, শালীনতাবোধকে চুরমার করে দিচ্ছেন। মিহিরের দুঃখের করুণ নাট্যকে করে তুলছেন কৌতুক-নাট্য, বিষাদের চিত্রকে ব্যঙ্গচিত্রে বিকৃত করে দিচ্ছেন। আর এঁদের কাছেই সান্ত্বনার জন্যে, আশ্রয়ের জন্যে মিহির ছুটে এসেছিল। শূন্য হৃদয় নিয়ে পারিবারিক স্নেহবন্ধনে ধরা দিতে এসেছিল মিহির। আসলে রক্তের সম্বন্ধ একটা ছিল। এই মুহূর্তে মিহিরের মনে হল, কিছু নয় কিছু নয়, সব মিথ্যে। পরিণতবয়সে মানুষের রুচির বন্ধন, ভাবের বন্ধন, শিক্ষা-সংস্কৃতি-আদর্শের বন্ধন—সব মিলিয়ে রসের বন্ধনের আকর্ষণ রক্তের বন্ধনের চেয়েও বোধ হয় বেশি।

মুকুন্দবাবু মনের ভুলে গড়গড়ায় ফের দু-একটা টান দিলেন। বিরক্ত হয়ে সেটা রেখে দিলেন। কলকের আগুন নিবে গেছে।

মুহূর্তের মধ্যে মনে হল, মুকুন্দবাবু নিজেও যেন নিবে গিয়েছেন। একটু চুপ করে থেকে নিজের মনেই বিড়বিড় করে তিনি ফের বলতে লাগলেন, 'আমি জানতাম। ও-বউ যে ঘরে থাকবার নয়, আমি জানতাম। আমার কাছে যতদিন ছিল, আমি চোখে চোখে রেখেছিলাম। আমার চোখ এড়িয়ে কিছু করবার তার উপায় ছিল না। কোন দিকে তাকাবার জো ছিল না। যদি থাকত আমার কাছে শাসনে থাকত। শেষ পর্যন্ত শুধরেও যেত। আমার কাছে থাকলে এমন সর্বনাশ করে চলে যেতে পারত না।'

মনোরমা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'যাক। যে যাবার সে গেছে। এখন তুমি খোকাকে ছেড়ে দাও। ও নেয়ে খেয়ে নিক। মুখখানা শুকিয়ে কতটুকু হয়ে গেছে।'

মিহিরের প্রবল আপত্তি আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মা এসে তার গালে মুখে হাত বুলাতে লাগলেন।

মুকুন্দবাবু ফের স্ত্রীকে ধমক দিলেন। 'রাখো। তুমি তো আছ শুধু তোমার নাওয়া-খাওয়া নিয়ে। ওইটুকুই জগৎ। তার বাইরে তোমার কোন চিন্তাও নেই, ভাবনাও নেই, বিচার-বিবেচনাও নেই।' তারপর ফের তিনি ছেলের দিকে তাকালেন, 'আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে তুই তাকে খোলা মাঠে ছেড়ে দিলি। থাকবে কেন? ও-বউ থাকবে কেন আমি তাই শুনি? দোর যেমন আগলে রাখতে হয়, ঘরের বউ-ঝিকেও তেমনি আগলে রাখতে হয়। সব খুলে দিলে কি আর চলে বাবা? চলে না। কিন্তু যোগো ডাক্তারকেও আমি দেখে নেব। আমিও তাকে সহজে ছাড়ব না।'

যোগরঞ্জনের দেওয়া আসবাবপত্রে এখনো তাদের দু-তিনখানা ঘর সাজানো রয়েছে। শ্বশুরের দেওয়া খাটের ওপর বসেই বাবা কথা বলছেন। মিহির তা লক্ষ্য করল। যৌতুক সামগ্রী সবই আছে। শুধু যার জন্যে মিহির সব পেয়েছিল, সে-ই নেই।

'শ্বশুরমশাইকে আবার এর মধ্যে টানছেন কেন বাবা! তাঁর কি দোষ?'

'শ্বশুরমশাই!' ফের ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন মুকুন্দবাবু, 'খবরদার, ওই বাটপাড়কে আমার সামনে কক্ষনো আর শ্বশুরমশাই বলবিনে। আমার আড়ালে প্রাণ যা চায়, বলিস। শ্বশুর বলতে চাস বলিস, বাবা বলতে চাস বলিস। কিন্তু আমার সামনে কিছু না। ওদের সঙ্গে আর কোন কুটুম্বিতা নেই আমাদের। দোষ নেই? ওই ডাক্তারের দোষই তো সবচেয়ে বেশি। রুগীদের যেমন ভেজাল ওষুধ দিয়ে ঠকায়, আমাকেও তেমনি ঠকিয়েছে। ঠক, জোচ্চোর। মাস্টারের সঙ্গে নষ্ট মেয়েটাকে আমাদের ঘাড়ে যে লুকিয়ে-চুরিয়ে গছিয়ে দিয়ে গেলি, তোর পাঁচটা প্রাণে একটা কথা কইল না! এখন? সেই কুলনাশিনী যে সবাইর গালে চুনকালি মাখিয়ে সরে পড়ল, এখন কে কাকে মুখ দেখাবে? বাইরে কি আর মুখ দেখাবার জো রইল?'

দুঃখে ক্ষোভে লজ্জায় মুকুন্দবাবু এতক্ষণে মাথা নিচু করে নিজেই মুখ লুকালেন।

এবার মনোরমা উঁচু গলায় বললেন, 'কেন? আমাদের মুখ না দেখাবার কী হয়েছে? আমার ছেলের তো কোন দোষ নেই। ওর কিসের লজ্জা। ওর আমি ফের বিয়ে দেব। এই মাসের মধ্যেই বিয়ে দেব। নতুন বউ নিয়ে আবার তুই তোর কাজের জায়গায় চলে যাবি। এক বউ গেছে, আর-এক বউ আসবে। অভাগার ঘোড়া মরে, ভাগ্যবানের বউ মরে।'

মিহির ভাবল, এঁরা কী নিষ্ঠুর। সব সমস্যার সমাধান এঁরা কতই না সহজে করে ফেলেছেন। বর্বর হওয়াই যদি সহজ হওয়া হয়, তেমন সহজ হতে মিহির চায় না।

'কিন্তু সত্যিই কি সে মরেছে?' মিহির একটু হাসল।

মনোরমা বললেন, 'মরা ছাড়া কি? মরারও বাড়া। পচা গলা। তুমি কি ভেবেছ, ওই বউকে সেধে-ভজে তুমি আবার বাড়িতে নিয়ে আসবে? অমন কথা মনেও জায়গা দিয়ো না বাপু। আমরা প্রত্যেকের কাছে বলব সে মরে গেছে। তুইও তাই বলবি। কলেরা-টলেরা যা হোক একটা কিছুর নাম করে দিবি। বিশি আর তপুকেও তাই শিখিয়ে দিতে হবে। এমন অঘটন ঘটলে লোকে নাকি তাই বলে। আমাকেও যে এ-সব বলতে হবে, কোনদিন ভাবিনি বাপু। কী পাপই ঘরে এসেছিল।'

মিহির বলল, 'মা, তোমরা শুধু একজনেরই দোষ দিচ্ছ। একটা অল্পবুদ্ধি মেয়ে, অল্পবয়সী মেয়ে, তার ঘাড়েই সব দোষ চাপাচ্ছ।'

মনোরমা বললেন, 'তবে আর কাকে দোষ দেব? নিজের কপালের দোষ। তা তো আছেই। ভাগ্যের দোষ আর কে খণ্ডাবে বাবা। নইলে তোমার মত ছেলেরও এমন দুর্ভোগ হয়। দুঃখে আর বাঁচিনে।'

মিহির অধীর হয়ে বলল, 'না, ভাগ্যের দোষ নয়। এর পিছনে যে মানুষটি আছে, যে তার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি, যোগ্যতা একটি নির্বোধ সরল মেয়েকে সিডিউস করার কাজে লাগিয়েছে, তাকে কেন তোমরা নিন্দা করছ না? তাকে কেন ধিক্কার দিচ্ছ না?'

মুকুন্দবাবু ছেলের দিকে ফিরে তাকালেন। তাঁর শান্ত নিরীহ ছেলের বুকে এমন ঘৃণা, এমন বিদ্বেষ, এমন ক্রোধ, এমন দীপ্তি তিনি যেন আর কখনো দেখেননি। ছেলে আর ছেলেমানুষ নয়। প্রতারিত, বঞ্চিত, অপমানিত, প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় উদ্দীপিত একজন পূর্ণবয়স্ক পূর্ণাঙ্গ পুরুষকে তিনি পুত্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন।

আর সেই দীপ্তি যেন তাঁর নিজের মধ্যেও সঞ্চারিত হল। যেন নতুন যৌবন ফিরে পেলেন মুকুন্দবাবু। ছেলের দিকে তাকিয়ে এবার সস্নেহে সগর্বে বললেন, 'হারামজাদা! শুধু মুখের ধিক্কারে কী হবে? যদি হাতে হাতে যোগ্য শাস্তি দিতে পারিস, তবেই বুঝব বাপের বেটা।'

মিহির স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'বাবা, আপনার আদেশ আমার মনে থাকবে।'

মনোরমা সভয়ে এসে ছেলের হাত ধরলেন, 'চল বাবা, তুই নাইতে যাবি চল। নেয়ে খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নে বাপু। এই কি আমাদের মাথা গরম করবার সময়?' তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে মৃদু গঞ্জনার স্বরে বললেন, 'তুমিও যেমন। দিলে তো ছেলেটাকে ক্ষেপিয়ে। এখন খুন-খারাবি রক্তারক্তি কাণ্ড

হলে তোমার ভালো লাগবে! ছি ছি ছি। এতখানি বয়স হল, কোন আক্কেল বুদ্ধি হল না। হবে কি, তোমরা পুরুষ মাত্রেই এক-একটি গোঁয়ার। গোঁয়ার্তুমি ছাড়া তোমরা আর কিছু জানো না। কিন্তু সব সময় কি আর গোঁয়ার্তুমিতে কাজ হয়? চল বাবা, তুই আমার সঙ্গে চল। ইস্, কত বেলা হয়ে গেল দেখ দেখি।'

খেতে বসেও মুকুন্দবাবু ওই প্রসঙ্গ তুলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মনোরমা চোখ টিপে স্বামীকে নিষেধ করলেন। ইঙ্গিতে তপু আর বিশাখাকে দেখিয়ে দিলেন। ওদের সামনে ও-সব কথা না তোলাই ভালো।

মুকুন্দবাবু ঢোঁক গিলে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোদের এই মীরপুরে মাছ-টাছ কেমন পাওয়া যায় রে?' তারপর নিজেই একটু হেসে বললেন, 'ভালো মানুষকে জিজ্ঞেস করছি। তুই কি আর হাট-বাজারের কোন খবর রাখিস যে বলবি?'

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে মনোরমা ছেলেকে বললেন, 'যা এবার শুয়ে দুদণ্ড ঘুমোগে তো। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, কতকাল যেন ঘুমোসনি। ছি-ছি-ছি, এমন করে নাকি? তুই না পুরুষ মানুষ! লোকে পাগল বলবে যে।'

বিশাখা এসে বিছানা পেতে দিল। শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া যৌতুকে এ ঘরও বোঝাই। খাট চেয়ার ড্রেসিং টেবিল—সবই আছে। শুধু একজনই নেই। সে যদি মরে যেত, তার জন্যে পবিত্র মানস-সৌধ নির্মাণ করে রাখত মিহির। কিন্তু সে তো মরে যায়নি, প্রেমের মৃত্যু ঘটিয়েছে। মিহির যা দিতে চেয়েছিল, তার কিছুই নেয়নি। সব ফেলে গেছে। এমন কি গয়নাগাটিও মেয়েরা যা সবচেয়ে ভালোবাসে, তারও কিছু নিয়ে যায়নি। শুধু প্রেম— প্রেমই হোক আর জৈব বাসনাই হোক, তারই আকর্ষণে সে বেরিয়ে পড়েছে। মিহির তার জন্যে হঠাৎ এক উগ্র অভীপ্সা অনুভব করল। এ বাসনা পুরুষোচিত নয়। যে মেয়ে তার অনাদর করেছে, তাকে অসম্মান করেছে, তার ক্ষমা সহিষ্ণুতা উদার প্রীতিধারার কোন মূল্য দেয়নি, তার কথা চিন্তা করা নিজের অহংবোধকে পায়ের তলে নিষ্পেষিত করার নামান্তর। তবু মিহিরের মাঝে মাঝে মনে হয়, যে ভালোবাসা সে পেল না তা যেন কী পরম বস্তু। যার ভালবাসা সে পেল না, তার মূল্য না-যেন কতই বেশি। মন্দিরার মতো সামান্য একটি মেয়ে যেন হারিয়ে গিয়ে অসামান্য হয়ে উঠেছে। যাকে দেখিনি সে বড় সুন্দরী, যাকে পাইনি তার যেন মহিমার সীমা নেই। সেই অজিতাকে জয় করার নামই পৌরুষ। প্রেমে পার, শাসনে পার, ক্ষমায় পার, শৌর্যে পার তাকে ফিরিয়ে এনে বেঁধে রাখতে পারলে তবে তোমার পৌরুষের অহংকার পরিতৃপ্ত। কিন্তু কী করে বেঁধে আনবে মিহির। সে যে আর একজনের কাছে বাঁধা পড়ে রয়েছে। মিহিরের মন ফের প্রবল ঈর্ষায় আর বিদ্বেষে জ্বলে উঠল। সেই বাঁধন ছিঁড়তে হবে, মন্দিরার মন থেকে সেই মোহ ভাঙতে

হবে, দুশ্চরিত্র পুরুষ যে আসলে দুর্বল পুরুষ, মন্দিরার কাছে তার প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু কী করে প্রমাণ দেবে মিহির? ক্ষমা দিয়ে পারেনি, উদারতা দিয়ে পারেনি, ভালোবাসা দিয়ে তার হৃদয়ের ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে পারেনি, এখন শুধু একটি পথই তার সামনে খোলা আছে—প্রতিশোধের পথ, প্রতিহিংসার পথ। কিন্তু এই সভ্য সমাজে সে পথ বাইরে তেমন করে খোলা কই? খোলা নেই। তাই মনের মধ্যে সরীসৃপের সুড়ঙ্গ। মিহির নিজের মনেই হাসল। স্ত্রীকে কেড়ে নিয়েছে বলে শশাঙ্ককে সে এই সমাজে ডুয়েল লড়তে ডাকতে পারে না। এখন ওসমান আর জগৎসিংহের অসিযুদ্ধ অচল, মসিযুদ্ধ হাস্যকর। তাছাড়া যুদ্ধে নামলেও মিহির শশাঙ্কের সঙ্গে পেরে উঠবে কিনা সন্দেহ। ধর্মবলের চেয়ে সেখানে দেহবল জয়ী হবে। তাতে মিহিরের কোন সন্দেহ নেই। মিহির শশাঙ্কের সঙ্গে অর্থে পারবে না, সামর্থ্যে পারবে না। তবে কিসে যুঝবে? কিছু টাকা খরচ করে ভাড়াটে গুণ্ডা তার পিছনে লেলিয়ে দেওয়া যায়। ভাবতেই লজ্জায় মন সঙ্কুচিত হয়ে গেল মিহিরের। ছি ছি ছি, অমন হীন প্রবৃত্তি যেন তার না হয়। সংগ্রাম যদি করতেই হয়, ন্যায়ের জন্যে ন্যায়ের পথে মিহির যেন সংগ্রাম করে। জন্ম-জন্ম নারী-সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হলেও মিহির যেন নীচ না হয়, হীন না হয়—একটি মানবীর জন্যে মিহির যেন কিছুতেই মনুষ্যত্বের অবমাননা না করে বসে।

বিশাখা যে কখন এসে পাশে বসেছিল মিহির টের পায়নি। যখন উঠে চলে যাচ্ছে তখন টের পেল। কিন্তু বোনকে যেতে দিল না মিহির। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ওর হাতখানা ধরে ফেলল; হেসে বলল, 'চলে যাচ্ছিস যে।'

বিশাখা বলল, 'কী করব? তুমি পাশ ফিরে শুয়ে আছ তো শুয়েই আছ। একটি কথাও বলছ না।'

'বাঃ রে, ঘুমুচ্ছিলাম যে।'

'বিদ্যে বেড়েছে বুঝি দাদা? আজকাল কথায় কথায় মিথ্যে কথা! তুমি জেগে জেগে ঘুমুচ্ছিলে।'

'তবে সত্যি কথা বলি শোন। ঘুমুচ্ছিলাম না, ভাবছিলাম। সেও এক ধরনের ঘুমের মতই। ঘুমও আমাদের আচ্ছন্ন করে, চিন্তাও আমাদের আচ্ছন্ন করে।'

বিশাখা বলল, 'কী দরকার তোমার অত আচ্ছন্ন হয়ে? অত ভাববার কী আছে?'

মিহির একটু হাসল, 'ভাববার কিছু নেই?'

বিশাখা জোর দিয়ে বলল, 'কিছু না।'

মিহির তেমনি হেসে বলল, 'বেশ, তাহলে ভাবব না। তোর কথা শুনি। কেমন পড়াশুনো হচ্ছে?'

'করে যাচ্ছি সাধ্যমত। হচ্ছে একরকম।'

'বেশ। কিছু হচ্ছে না, কিছু হচ্ছে না বলে বিনয়ে যে একেবারে ভেঙে পাড়সনি, আমি তাতেই খুশি।'

বিশাখা হেসে বলল, 'বিনয়টা তোমার মনোপলি দাদা। ওতে আমি ভাগ বসাতে চাইনে।'

মিহির বলল, 'বেশ। এই তো কেবল পড়ার খবর। এবার লেখার খবর বল।'

বিশাখা বিশালাক্ষী হয়ে বলল, 'ও মা, লেখা আবার কিসের?'

'লেখা মানে, চিঠি লেখা। কেমন চলছে লেখালেখি।'

বিশাখা লজ্জিতভাবে মুখ নিচু করল।

মিহির সস্নেহে বোনের চিবুকটি তুলে ধরে বলল, 'যাক, অত সেনসিটিভ ক্রীপার তোমার হতে হবে না। বল না, পত্রাবলী কি রকম আসছে যাচ্ছে? আমার বন্ধুকে তো তুই কেড়ে নিয়েছিস। অমিয় আমার কাছে তো চিঠিপত্র লেখেই না। যা লিখবার তোর কাছেই লেখে। সবাই আমার কাছ থেকে কেবল কেড়েই নেয়।'

ভাইবোন দুজনেই একমুহূর্ত ফের চুপ করে রইল। কেউ কারো দিকে না তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে রইল।

তারপর ফের মিহির চোখ তুলে হেসে বলল, 'বল না।'

বিশাখা বলল, 'নতুন কী বলব দাদা। চিঠি দিচ্ছিও, পাচ্ছিও। কিন্তু ওসব এখন যাক। ওসব আজ আর বলতে ভালো লাগছে না।'

ওর আনত সুন্দর চোখ দুটি কি একটু ছল ছল করে উঠল? ওঠে তো উঠুক। মিহির কোন কথা বলল না। বোনের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে ধরে রাখল। ভাবল, এই সহানুভূতির দরকার আছে জীবনে। দুর্দিনে নারীর ওই দু-ফোঁটা অশ্রু অনেক দুঃখের আগুন নিবিয়ে দেয়। সে-অশ্রু মায়েরই হোক, জায়ারই হোক, আর সহোদরারই হোক।

নিজের ভালোবাসার কথা বলতে বিশাখার যে কেন ভালো লাগছে না, তা মিহির জানে। তার সার্থক প্রেমের ধারাটিকে দাদার ব্যর্থ প্রণয়ের পাশাপাশি আর ধরে দিতে চায় না বিশাখা। কিন্তু মিহির যে আজ সব শুনতে চায়। যেখানে সার্থকতা, যেখানে পরিপূর্ণতা, যেখানে দানে প্রতিদানে জীবন মধুর—মিহির সেই সহজ সুন্দর সুরধারায় অবগাহন করতে চায়। বঞ্চিত বিড়ম্বিত হৃদয়ের জ্বালা মিটাবার আর কি পথ আছে!

কিন্তু বিশাখা আজ নিজের কথা কিছুতেই বলল না; দাদার কথাই বার বার শুনতে চাইল।

'এখন কী করবে ভাবছ?'

মিহির একটু হাসল, 'মা তো বলছেন, কালই বিয়ে করতে। তুই কি বলিস? পরশু?'

বিশাখা বলল, 'আমি তা বলিনে দাদা। কাল নয়, পরশুও নয়। বিয়ে অমন রাতারাতি কেউ করতে পারে না। মেয়েও পারে না, পুরুষেও পারে না। তার জন্যে সময় লাগে। তাকে ভোলার জন্যে যে সময়টুকু দরকার, সেটুকু তোমাকে দিতে বলি। অনর্থক বাড়াবাড়ি করতে বলিনে। তাতে দু বছর লাগে দু বছর, তিন বছর লাগে, তিন বছর। কিন্তু ভুলতে হবে।'

মিহির বলল, 'ভুলতেই হবে?'

বিশাখা বলল, 'নিশ্চয়ই। মনে করে রেখে লাভ কি। তুমি আসা অবধি ভাবছি। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমাদের তার খোঁজ করা উচিত। তুমি আর আমি দুজনে মিলে বউদির খোঁজ করব। নিজেরা পারি নিজেরা খুঁজব। না পারলে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সাহায্য নেব। আমাদের তপু তো নিজেই ডিটেকটিভ হতে চায়। এতদিনে সে একটা কেসের মত কেস পেয়েছে।' বিশাখা একটু হাসল।—'লুকিয়ে লুকিয়ে কেবল ওইসব বই পড়বে।'

মূল কথায় ফিরে এসে বিশাখা ফের গম্ভীর হল, 'পরে ভেবে দেখলাম দাদা, খুঁজে লাভ নেই।'

মিহির বলল, 'লাভ নেই! তুইও কি মা'র মত বাবার মত—'

বিশাখা বলল, 'না, ওঁদের মতে আমার মত নেই। আমি ঠিক ওঁদের চোখ দিয়ে ব্যাপারটাকে দেখছিনে। যদিও দেখার ফলটা একই রকম হচ্ছে। দেখ দাদা, বিয়ের আগে আমরা যখন বউদির কলঙ্কের কথা শুনলাম, আমরা এগিয়ে গিয়ে ভাবলাম, এ কলঙ্ক আমরা মানব না। গ্রাহ্য করব না। অনেক কুমারী মেয়ের নামে এসব রটে। তার খানিকটা সত্যি, খানিকটা মিথ্যে। কিন্তু তা শুধু কলঙ্কই। তা ক্ষণিক, অস্থায়ী। কিন্তু বিয়ের পরে আমাদের ভুল ভাঙল। আমরা যাকে কলঙ্ক ভেবেছিলাম, দেখলাম, সেইটাই আসলে সত্যি। সেইটাই তার ভালোবাসা।'

মিহিরের পৌরুষ আবার আহত হল। উদ্দীপ্ত হয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল মিহির, 'ভালোবাসা? ওই বিকৃত রুচিকে তুই ভালোবাসা বলিস?'

বিশাখা বলল, 'বলি দাদা। নইলে ভুলবার তার যথেষ্ট সময় ছিল। তুমি তাকে সবই দিয়েছিলে। তবু সে যখন ভুলল না, তবু সে যখন সেই আগের সম্পর্কের সূত্র ধরে চলে গেল, তখন আমাদের সরে দাঁড়ানো উচিত। তখন let her live and love.'

কিন্তু বোনের এই কথা মিহিরের মনঃপূত হল না। মনে মনে বলল, 'বিশাখা, তুমি ও কথা বলতে পারো। তুমি তো আর বঞ্চিত স্বামী নও। তুমি তো আর সব দিয়ে খালি হাতে ফিরে আসনি। প্রাপ্তির আনন্দে তোমার মন ভরে রয়েছে। তাই তুমি উদার হতে পার। অনুচিত ভালোবাসাকেও তুমি সমর্থন করতে পার। কিন্তু আমি তা পারি না। আমি তাদের বাঁচতে দেব,

কিন্তু ভালোবাসতে দেব না। আমি তাদের সুখী হতে দেব না। যেমন করে পারি সেই সুখের পথে বাধা দেব।'

বিশাখা যেন দাদার মনের কথা বুঝতে পেরে বলল, 'অবশ্য এখনই ব্যাপারটা মেনে নেওয়া তোমার পক্ষে শক্ত। কিন্তু ছুটোছুটি করেও তো কোন লাভ নেই। আর যাই করো, তুমি নিজে তাকে সেধে আনতে যেয়ো না। সে নিজের ইচ্ছায় যদি কখনো ফিরে আসে, তখন ভেবে দেখা যাবে। কিন্তু তুমি আর কখনো এগিয়ে যেতে পারবে না। তাতে কোন লাভ হবে না।'

মিহির মা আর বোনের মধ্যে একই নিষ্ঠুরা নারীকে দেখতে পেল। মনে মনে ভাবল, 'মেয়েরাই মেয়েদের ওপর বেশি নিষ্ঠুর। পুরুষরা মেয়েদের মারাত্মক দোষও ক্ষমা করে। কিন্তু মেয়েরা তা পারে না।'

ক্ষমা হয়তো মিহির আবারও করবে। যদি তেমন করে আসে, ভুল স্বীকার করে, ত্রুটি স্বীকার করে—মিহির নিশ্চয়ই স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেবে না।

কিন্তু ক্ষমা করবার আগে শোধ নিতে হবে। মন্দিরার ওপর নয়। যে এই সমস্ত দুঃখের মূলে, তার ওপর।

প্রতিশোধের স্পৃহায় মিহির জ্বলতে লাগল। কিন্তু পন্থা সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পেল না।

॥ ২১ ॥

থার্ড ক্লাসের মেয়েদের শরৎকাল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখতে দিয়ে এসেছে সুজাতা। আশ্রমের আঙিনায় শিউলি গাছটা দেখে শরতের কথা তার মনে পড়েছে। খুব ফুল ফোটে গাছটায়। সন্ধ্যাবেলায় কী উগ্র গন্ধ এই ফুলে। সকালবেলায় তা মৃদু হয়ে আসে। গাছের তলাটা সাদা হয়ে যায়। ছোট ছোট মেয়েরা ফুল কুড়াতে আসে। সুজাতার মনে পড়ে একদিন সেও অমনি ফুল কুড়াত।

টেবিল ক্যালেণ্ডারে তারিখ রোজ বদলায় সুজাতা। মাস অন্তে দেয়াল-পঞ্জীর পাতা ছেঁড়ে। তাই বলে কি সময়ের পরিবর্তন অনুভব করে? চোখে পড়ে ঋতুর পরিবর্তন? হঠাৎ এক একদিন যেন টের পাওয়া যায়। চোখে পড়ে চাঁদ উঠেছে, কি সূর্য আছে আকাশে, আবির্ভাব হয়েছে নতুন ঋতুর।

স্কুল থেকে ফিরে এসে আবার একটা কথা মনে পড়ায় সুজাতা সকালের কাগজখানার খোঁজ করল। রুমমেট জ্যোৎস্নাকে বলল, 'নিয়ে আয় তো কাগজ-খানা।'

'আজকের কাগজ দেখেছ নাকি সুজাতা।'

স্কুলে যাওয়ার সময় রত্নাদি হঠাৎ কেন যেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

সুজাতা বলেছিল, 'কেন, কী আছে কাগজে?'

রত্নাদি সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'না, কিছু না।'

সুজাতার ঔৎসুক্য তখনকার মত সেখানেই শেষ হয়েছিল।

রাজনৈতিক হোক আর অরাজনৈতিক হোক, এই পৃথিবীর দৈনন্দিন ঘটনাবলীর দিকে সুজাতার ঔদাসীন্য যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে, জানবার তেমন একটা আগ্রহ যেন আর বোধ করে না সুজাতা। অনেকদিন থেকেই বাইরের ঘটনার দিকে তার উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসছিল। আশ্রমে এসে তা প্রায় নিঃশেষ হবার জো হয়েছে।

এই আশ্রম যেন কোন মধ্যযুগের আশ্রয়। কিংবা যে কোন যুগে একে সরিয়ে নেওয়া যায়। এই মহিলা আশ্রম উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। কিন্তু বর্তমান-কালের বেড়া দিয়ে ঘেরা নয়। নিত্য পূজা পাঠ উপাসনার ফাঁকে ফাঁকে আশ্রম-বাসিনীদের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি, তাদের কথান্তর মনান্তর মিলনকলহ নিয়ে দিন কাটে। বাইরের রাজ্যে ভাঙা-গড়া, বজ্রপাত, ইন্দ্রপতন, বিদ্রোহ বিপ্লবের তরঙ্গ এই আশ্রমকে যেন স্পর্শও করতে পারে না।

সুজাতার মন, সুজাতার জীবনও যেন এমনি একটি প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গ। আশ্রমবাসের আগে থেকেই সুজাতা এই ঔদাসীন্য অর্জন করেছে। কাগজের খবরের দিকে তার কোন আকর্ষণ নেই। দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, কিছুটা ধর্ম-সাহিত্য, মহাপুরুষ, মহামানবীদের জীবনচরিত তাকে আনন্দ দেয়। যেখানে মানুষের চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণা শিলাস্তূপের মত জমাট বেঁধে রয়েছে বুঝুক না বুঝুক সুজাতা সেই স্তূপের সামনে এসে নিজের স্বল্প বিদ্যা-বুদ্ধির মৃৎ-প্রদীপটি তুলে ধরতে চায়। বড় বড় শিরোনামাওয়ালা কাগজের বড় বড় ঘটনা সুজাতার মনকে কদাচিৎ স্পর্শ করে। সেই ঘটনার জগৎ যেন মায়ার জগৎ। তার কোন পারমার্থিক অস্তিত্ব সুজাতার জীবনে নেই।

সুজাতা জানে আশ্রমের সবাই তার মত নয়। খবরের কাগজের দিকে কারো কারো বেশ আগ্রহ আছে। ইংরেজী বাংলা দুখানা দৈনিক আসে আশ্রমে। ইংরেজী কাগজের পাঠিকা অল্প। তা প্রায় জ্ঞানপ্রভার ঘরেই থাকে। বাংলা কাগজ-খানা নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। রাজনৈতিক খবরের জন্যই যে সবাই উৎসুক হয়ে থাকে তা নয়। কেউ বা সিনেমার পাতাটা আগে খোলে, কেউ বা খেলার পাতা উল্টায়, ক্রীড়াবীরদের ছবি দেখে, কেউ বা আইন আদালতের বিবরণ পড়ে।

স্কুলে গিয়েও দু-একজন টিচারের মুখে সুজাতা ওই একই প্রশ্ন শুনেছিল, 'আজকের কাগজ দেখেছেন?'

সুজাতা দেখেনি। কিন্তু কী আছে আজকের কাগজে জিজ্ঞাসা করে সদুত্তর পায়নি। এ জিজ্ঞাসা যেন ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মতই কঠিন।

সুজাতার নিস্পৃহ মনেও সেই থেকে কিছু কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়ে রয়েছে।

জ্যোৎস্না কাগজখানা শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেতে নিয়ে এল। কিন্তু কী চেহারাই হয়েছে কাগজের। ও-বেলার কাগজ এ-বেলায় এসে একেবারে বাসির বাসি হয়ে রয়েছে। ওপরের পৃষ্ঠাটা ভিতরে, ভিতরের পৃষ্ঠাটা ওপরে দেখে জ্যোৎস্নাকে একটু বকতে যাচ্ছিল সুজাতা, হঠাৎ লাল পেনসিলে দাগ দেওয়া খবরটির দিকে চোখ পড়ল তারপর সুজাতার দুটি চোখ অপলক হয়ে রইল।

হ্যাঁ, খবরটি আইন আদালতের স্তম্ভেই। খবরটি রুচিসম্মত নয়। আশ্রম-বাসিনী কোন নারীর পাঠের অযোগ্য। তবু কে যেন যত্ন করে পড়েছে। যাতে আরো কেউ কেউ পড়ে সেই উদ্দেশ্যে লাল রঙে চিহ্নিত করেও রেখেছে।

খবরটি একটি ব্যভিচারের মামলার। সম্মানিত একজন প্রবীণ অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। বাদী স্বভাবতই স্বামী। তরুণী স্ত্রী বিয়ের আগে অধ্যাপকের ছাত্রী ছিল। তখন থেকেই তাঁদের মেলামেশা অন্ত-রঙ্গতার সংবাদটি কোর্ট রিপোর্টার পাঠকদের দিয়ে রেখেছেন। তিনি ছাত্রীর নাম গোপন করেছেন, তার স্বামীর নাম গোপন করেছেন, কলেজের নাম গোপন করেছেন, কিন্তু অধ্যাপকের নামটি অপ্রকাশ্য রাখেননি। তাঁর নাম শশাঙ্কশেখর সেন।

কাগজটি ভাঁজ করে সরিয়ে রাখল সুজাতা। তারপর নিজের তক্তপোষের ওপর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

শশাঙ্ক যে সুজাতার স্বামী একথা পুরোন আশ্রমবাসিনীরা যে জেনে ফেলেছেন তা সুজাতা জানে। শশাঙ্ক তার দুই বউদিকে নিয়ে এই আশ্রমে সুজাতার খোঁজ করতে এসেছিল, দেখা না পেয়ে ফিরে গেছে, কুমারী মেয়ে সেজে সুজাতা যে এখানে আত্মগোপন করে রয়েছে তাও চাপা থাকেনি। শুধু জ্ঞানপ্রভা নন, আরো কেউ কেউ সে কথা জানেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জ্ঞান-প্রভা তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, শুদ্ধানন্দের সংগে পরামর্শ করেই কথা দিয়েছিলেন, সুজাতা যদি ইচ্ছা করে এখান থেকে চলে না যায়, আশ্রমের বিধি-নিষেধ অমান্য না করে, তাহলে কর্তৃপক্ষ এখানে তাকে থাকতে দেবেন।

সুজাতা যায়নি। তাই আছে। কেন আছে ভেবে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায় সুজাতা। এখানকার অনেক নিয়ম-কানুন, সাধনভজনের ধারার সংগেই তো সুজাতার মনের মিল নেই। তেমন কোন আকর্ষণও নেই এখানে। তবু কেন আছে? অনেকখানি হীনতা স্বীকার করে মানসম্মান খুইয়ে এখানে কেন রয়েছে সুজাতা? নিজেকেই নিজে বার বার প্রশ্ন করেছে। কোন স্পষ্ট জবাব পায়নি। থাকাটা যেন একটা অভ্যাস। বেঁচে থাকাটাও তাই। সুজাতা ভেবেছে যেখানেই যাক, কোথায়ই বা পুরোপুরি মানিয়ে থাকতে পারবে? স্বামীর ঘরে মানাতে পারল না, ফিরে এল বাপের বাড়িতে। গিয়ে দেখল সেখানেও সেই আগের জায়গাটি আর নেই। এল এই আশ্রমে। এখানেও বেমানান। আর কত দোরে দোরে ঘুরবে সুজাতা! ঘুরে ঘুরে যদি দেখতে পায় কোথাও মানানসই জায়গা

নেই, তখন? তখন কোথায় যাবে? যখন কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকে না তখন ফিরে আসতে হয়। ফিরে আসতে হয় নিজের ঘরে। নিজের মনো-মন্দিরে। বার বার বলতে হয়, 'মন চল নিজ নিকেতনে।' ফেরার চেষ্টা যতটুকু করতে পেরেছে সুজাতা তাতে সে বুঝে দেখেছে নিজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারাটাই আসল মানিয়ে নেওয়া। সেই আত্মসংহতি যদি বজায় থাকে তাহলে বাইরের ছোটখাটো বিরোধিতা প্রতিকূলতা তুচ্ছ হয়ে যায়। তখন আর পাঁচজনের হাতে গড়া নিয়ম-কানুন মানলেও কিছু এসে যায় না, না মানলেও কিছু এসে যায় না। কারণ তখন একই বস্তুকে বাইরে থেকে মানলেও ভিতর থেকে অমান্য করবার শক্তি বেড়ে ওঠে। কিংবা খেয়ালই থাকে না, মান্য করছি কি করছি না। বাইরের সত্তাটা তুচ্ছ হয়ে যায়। বাহ্য জগৎ তখন নিতান্তই কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি বলে মনে হয়। সেই অভ্যস্ততার সঙ্গে যেন সুজাতার নিগূঢ় সত্তার কোন যোগ নেই

কিন্তু এই ধারণায় তো অনুক্ষণ বাস করা যায় না। যদি যেত তাহলে তো তরেই যেত সুজাতা। সেই উত্তরণ শুধু কোন কোন দুর্লভ ক্ষণের জন্যে। পর-মুহূর্তে আবার এই ধূলার ধরণীতে অবতরণ। লোভ-মোহ দ্বেষ-বিদ্বেষে আশ্লিষ্ট হয়ে থাকা। তখন এই বাহ্য-জগৎই একমাত্র জগৎ। এছাড়া অন্য কিছুর কল্পনা অলীক কল্পনা মাত্র।

ইচ্ছা করলে সুজাতা এই আশ্রম ছেড়ে যেতে পারত বইকি।

শশাঙ্ককে একবার না হয় ফিরিয়ে দিয়েছিল, নিজে কেন গেল না সুজাতা? গিয়ে কেন জিজ্ঞাসা করল না, কী জন্যে তুমি এসেছিলে? এসেছিলে যদি আরো একবার এলে না কেন? অন্য মেয়ের বেলায় তোমার অধ্যবসায় কিছুতেই নিঃশেষ হতে চায় না, আর আমার বেলায় একবারেই কি সব শেষ হয়ে গেল?

একথা জিজ্ঞাসা করতে পারত বইকি সুজাতা। সামনে যদি নাও যেতে পারত টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করতে পারত, চিঠিতে জিজ্ঞাসা করতে পারত, জায়েদের কাছে খোঁজখবর নিতে পারত, পারত সবই। কিন্তু এগোতে গিয়েও এগোতে পারেনি সুজাতা। জ্ঞানপ্রভার মত সে তো আর সন্ন্যাস নেয়নি, ইচ্ছা করলেই সে পূর্বজীবনে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু ইচ্ছাটাই যে বেশি দূর যায় না। খানিকদূর এগিয়ে আবার ফিরে আসে। এই ইচ্ছা—এও যেন এক অভ্যাস। ইচ্ছাও যেমন সত্য, অনিচ্ছাও তেমনি সত্য। আসক্তি যেমন সত্য অনাসক্তিও তেমনি। বছরের পর বছর স্বতন্ত্রভাবে বাস করে, স্বতন্ত্র জীবন যাপন করবার পর এখন স্বামীসহবাসের কল্পনা, সুজাতার মনে সত্যিই এক অস্বস্তি আর আশঙ্কার ভাব জাগিয়ে দেয়। যে স্বামীকে নিয়ে প্রথম যৌবনে সে কাড়াকাড়ি মারামারি বাকি রাখেনি আজ এগারো বারো বছর ধরে বিচ্ছিন্নভাবে কাটাবার পর তাকে সম্পূর্ণভাবে পেলেও তার কাছে ফিরে যাবার কথা সুজাতা

যেন ভবতেই পারে না। এখানে অনেক চিরকুমারী আছেন যাঁরা আর বিয়ে করবেন না। তাঁরা গল্প উপন্যাসও পড়েন, পুরুষের কথা নিয়ে, নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক নিয়ে নিজেদের মধ্যে সরস আলাপ-আলোচনাও করেন, কিন্তু এগিয়ে গিয়ে সত্যি সত্যি কোন রক্ত-মাংসের পুরুষের হাত ধরতে সাহস পান না। কেউ হাত ধরতে এলেও হয়তো সভয়ে পিছিয়ে যান। এখানে পুরুষ মানে মহাপুরুষ। বিমূর্ত পুরুষ, জগদীশ্বর। সুজাতারও যেন তাই হয়েছে। সে স্বামীকে ক্বচিৎ কখনো স্মৃতিতে স্বপ্নে কল্পনায় পেতে ভালোবাসে। বিবাহিত জীবনের দুর্লভ মধুর মুহূর্তগুলিতে হয়তো বা স্মৃতির তুলি বুলায়, কিন্তু সেই শরীরী, শরীরসর্বস্ব পুরুষের কাছে ফিরে যেতে আর ভরসা পায় না সুজাতা। গিয়ে কি হবে। সে তো আর সেই সুজাতা নেই। সে অহল্যা পাষাণী হয়ে গেছে। পুরুষের স্পর্শের জন্যে আর তার চিত্ত আকুল হয় না। মিলনের প্রতীক্ষায় সারা দেহ আর উন্মুখ হয়ে থাকে না। বরং মনে হয়, কেউ ছুঁতে এলেই এখন যেন সুড়সুড়ি লাগবে। অস্বস্তির আর সীমা থাকবে না।

আগে সুজাতার মনে হতো যৌন কামনাকে দমন করা না যেন কতই কঠিন। এখন আর তা মনে হয় না। এখন মনে হয় অবস্থার চাপে, পরিবেশের প্রভাবে ও-সব আকাঙ্ক্ষা আপনিই দমিত হয়ে যায়। আছে কি নেই টের পাওয়া যায় না। তাই বলে কি সব আকাঙ্ক্ষা মরে? তা মরে না। প্রথম রিপুটিকে আর পাঁচটি রিপু নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়। কেউ খেতে ভালো-বাসে, কেউ পরতে ভালোবাসে, কেউ বা ঝগড়া-ঝাঁটি করতে ভালোবাসে। ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষাটা নানা ভাবে ছড়িয়ে যায়। কি পুরুষের কি মেয়ের। লক্ষ্য করে দেখেছে সুজাতা। এখানেও জাঁকজমক ঐশ্বর্য আড়ম্বরের অভাব নেই। এই সর্বত্যাগী বৈরাগ্যের ক্ষেত্রে সিল্কের গেরুয়া, পাউডারের পদরজ, সোনার খড়ম তাই রয়ে গেছে। শুধু এক অভ্যাসের বদলে আর এক অভ্যাস। এক রিপুর বদলে আর এক রিপুর দাসত্ব।

তবু অভ্যাসের পরিবর্তনই কি জন্মান্তর? জীবনান্তর? পূর্ব জীবনের সঙ্গে আশ্রমবাসীর কতটুকু যোগ থাকা উচিত তাই নিয়ে কয়েক মাস আগে এই আশ্রমে একবার ঝড় উঠেছিল। পূর্বজীবনের সঙ্গে যোগ যত অল্প থাকে ততই ভালো। সে জীবনের অভ্যাস সংস্কার স্মৃতি যত ক্ষীণ হয়ে আসে ততই মঙ্গল। সেই জীবন যদি এই জীবনে বার বার এসে হানা দেয় তাহলে সাধনার পথে নানা ব্যাঘাতের আশঙ্কা। এই এখানকার ধারণা। যাঁরা সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী তাঁরা পূর্ব জীবনকে মুছে ফেলেছেন। যারা কম বয়সী ব্রহ্মচারিণী তারা তা একেবারে ফেলে দিতে পারেনি। কিন্তু তাদের বেলাতেও কড়া-কড়ির অনুশাসন। সেই শাসনে সেবার বাঁধা পড়েছিল শান্তি নামে মেয়েটি। সুজাতার পাশের ঘরেই থাকত। বাপের অসুখের খবর পেয়ে সে উতলা হয়ে

উঠেছিল। কিন্তু জ্ঞানপ্রভা তাকে সঙ্গে সঙ্গে যেতে অনুমতি দিতে পারেননি, তাঁর উঁচুতেও যাঁরা আছেন তাঁদের অনুমতির অপেক্ষা করেছেন। তাছাড়া ভালো করে খোঁজ-খবর না নিয়ে জ্ঞানপ্রভা শুক্তিকে ছাড়েনই বা কী করে। শ্যামলী তো আত্মীয়-স্বজনের অসুখের অজুহাত দেখিয়ে অমনি করেই কয়েকবার বাইরে গেছে। পরে জ্ঞানপ্রভা খবর পয়েছেন অসুখ-বিসুখ সব মিথ্যা। একটি সুখের জন্যেই শ্যামলীর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ফিরে গিয়ে বিয়ে করে সুখী হয়েছে।

শুক্তি যখন বাইরে যাবার অনুমতি পেল, তার আগেই তার বাবা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। কারো অনুমতির অপেক্ষা রাখেননি।

শুক্তির কান্নায় সেদিন সারা আশ্রম বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সুজাতার মত আর কেউ জ্ঞানপ্রভার সঙ্গে তর্ক করতে সাহস পায়নি।

সুজাতা বলেছিল, 'আপনি কি মনে করেন সত্যিই কারো আগের জীবন আর তার কয়েক বছর পরের জীবনের মধ্যে জন্মান্তরের ব্যবধান আছে? দুদিন আগে যাদের সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠতা ছিল, দুদিন পরে শুধু আর এক জায়গায় এসে বাস করছে বলে, কয়েকটা অভ্যাস বদলেছে বলেই সে একেবারে আর এক মানুষ হয়ে গেছে? তার মায়া মমতাও থাকতে নেই, কর্তব্য অকর্তব্যও থাকতে নেই?'

সুজাতার উত্তেজনা দেখে জ্ঞানপ্রভা একটু হেসেছিলেন। তারপর শান্ত-ভাবে বলেছিলেন, 'আর এক মানুষই হয়ে যায় সুজাতা। নিজের জীবনের দিকে যদি একবার তাকাও তাহলেই তা বুঝতে পারবে। আমরা শুধু যে মৃত্যুর সময়ই মায়ামমতা কাটিয়ে যাই তাই নয়, যখন সন্ন্যাস নিই তখনই যে মায়ামমতা কাটাতে চাই তাই নয়, আমরা সাধারণ জীবনেও ছাড়তে ছাড়তে সরতে সরতে আসি। সেইজন্যেই এর নাম সংসার। আমরাও সরি, সংসারও সরে। আমাদের কত শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক মুছে যায়, কত গভীর ভালোবাসা ক্ষীণ হয়ে আসে। এই ত্যাগ আমাদের স্বভাবের মধ্যেই আছে।'

সুজাতা কোন প্রতিবাদ করে কিনা একটু দেখে নিয়ে জ্ঞানপ্রভা বলে-ছিলেন, 'কিন্তু যখনই আমাদের এই স্বভাবধর্মকে আমরা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ আদর্শে নিয়োগ করি, তখনই রব ওঠে—নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর। কিন্তু এ পথে যারা আসে তারা তো এই নিষ্ঠুরতার শর্ত মেনে নিয়েই আসে। নীতি নিয়ম মানতে হবে সে কথা জেনেই আসে। শুধু এখানকার নীতি নিয়ম কেন, যে কোন জায়গার আইনকানুন রীতিনীতিই তোমার ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আশাআকাঙ্ক্ষার কাছে নির্মম বলে মনে হতে পারে। যা বহু ব্যক্তির জন্যে তার মধ্যে খানিকটা নৈর্ব্যক্তিকতা থাকবেই। তা আছে বলেই নীতিকে আমরা নীতি বলি, নিয়মকে নিয়ম। প্রতিটি মানুষের মুখ চেয়ে তার ইচ্ছা অনিচ্ছার আবদার মেনে নীতিকে যদি বদলাতে হতো, তাহলে অবস্থাটা কী

হতো একবার ভেবে দেখ দেখি। শুক্তির জন্যে অবশ্য আমারও দুঃখ হচ্ছে। আমি যা পারি তার জন্যে করবও। কিন্তু—'

শুক্তি আর ফিরে আসেনি। শ্যামলীর মত সেও আশ্রম ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু জ্ঞানপ্রভা তাঁর যুক্তিতে অটল হয়ে রয়েছেন।

সুজাতা মনকে আশ্বাস দিল, সত্যিই তো। সে তো সব ছেড়েই এসেছে। শশাঙ্কের সঙ্গে তার তো আর কোন সম্পর্কই এখন আর নেই। আইনের বাঁধন এখনো আছে, কিন্তু হৃদয়গত বন্ধন তো আর নেই। তবে তার মন কেন চঞ্চল হবে, কেন বিক্ষুব্ধ হবে? কেন নিজের মনকে শাসিত, নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যাবে না?

আশ্রমের নিত্যকর্মস্রোতে নিজেকে আজ একটু বেশি করেই সঁপে দিল সুজাতা। সান্ধ্য উপাসনায় যোগ দিল। পাঠাগারে গিয়ে তরুণী আশ্রমবাসিনীদের জন্যে বই বেছে দিতে লাগল। তারপর নিজেও বসে গেল পড়তে। পাঠ। পাঠে একাগ্রতা দরকার। নইলে অক্ষরের ব্যূহ ভেদ করা যায় না। মাতৃভাষার চির-পরিচিত অক্ষরগুলিও অপরিচিত অনায়ত্ত দুর্বোধ্য সংকেত নিয়ে বসে থাকে। শুধু ধর্ম দর্শন নয়, যে কোন বিষয়ই একাগ্রতার দাবি করে। সুজাতার মনে হয়, এই একাগ্রতার মধ্যেই মুক্তি। জ্ঞানে বিচরণই যেন ব্রহ্মে বিচরণ। ব্রহ্মজ্ঞান যে কী তা জানে না সুজাতা। কিন্তু মাঝে মাঝে তার মনে হয় জ্ঞানই ব্রহ্ম। যে কোন বিষয়ে তন্ময়তাই যেন ব্রহ্মময়তা। স্কুলের ক্লাসে যখন সাধারণ ইতিহাস ভূগোল পড়ায় সুজাতা, পড়াতে পড়াতে তন্ময় হয়ে নিষ্ঠাবতী ছাত্রীর আগ্রহ ঔৎসুক্য লক্ষ্য করে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় সুজাতা, তখন সেই আনন্দের সঙ্গে কোন উচ্চতর আনন্দের গুণগত পার্থক্য অনুভব তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

কিন্তু আজ সুজাতার মনোযোগ বার বার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। বহু-পঠিত এবং বহু প্রিয় দর্শনশাস্ত্রও তাকে আকর্ষণ করতে পারছিল না।

শোবার আগে জ্ঞানপ্রভা তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। ঘরে আর কেউ ছিল না, নিজেই উঠে দোর ভেজিয়ে দিয়ে এলেন। সামনের চেয়ারটায় সুজাতাকে বসতে বললেন তিনি, তারপর মৃদু শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছ সুজাতা? তোমাকে একটা কথা বলব বলে ডেকেছি।'

এই রূপবতী, ব্যক্তিত্বময়ী বিদুষী নারীকে সুজাতা শ্রদ্ধা না করে পারে না। ওঁর বাইরের রুক্ষ আচরণের অন্তরালে একটি গোপন স্নিগ্ধ কোমল হৃদয় প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাও মাঝে মাঝে টের পাওয়া যায়। সেবার ইচ্ছা করলেই অসত্য-ভাষিণী সুজাতাকে তিনি আশ্রম থেকে সরিয়ে দিতে পারতেন। সুজাতার আরো অনেক অবাধ্যতার অজুহাতও জমা ছিল। কিন্তু তা তিনি করেননি। জ্ঞানপ্রভা অসহিষ্ণু। নিজের সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না। মানুষের কর্তৃত্বের সঙ্গে কৃতিত্বের সঙ্গে এই অসহিষ্ণুতা কী করে যেন মিশে থাকে,

সুজাতা লক্ষ্য করে দেখেছে। জীবনের সবক্ষেত্রেই তা সত্য। এ দোষ জ্ঞান-প্রভার একার নয়। তাঁর অসহিষ্ণুতা সুজাতাকে বার বার আঘাত করেছে, কিন্তু আশ্রয়হীন করেনি। শত্রুতা করেনি।

সবাই বলেন জ্ঞানপ্রভা তাঁর এই দৃঢ়তা ব্যক্তিত্ব কর্মশক্তি আর বুদ্ধিমত্তা নিয়ে জীবনের অন্য কোন ক্ষেত্রে হয়তো আরো সফল হতে পারতেন। আরো বেশি নামযশ গৌরবের অধিকারিণী হতেন। ঘরে থাকলে ঐশ্বর্যময়ী অন্নপূর্ণা হতেন হয়তো। কিন্তু সেই পূর্ণতার দিকে জ্ঞানপ্রভা যাননি। কেন যাননি কে জানে? এই আশ্রমের স্কুলের হেডমিস্ট্রেস হয়ে থেকে, কিছু ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী আর অর্ধশিক্ষিতা নারীদের ওপর শাসনদণ্ড চালিয়ে কী পেয়েছেন জ্ঞানপ্রভা, কে জানে? এ পথে কেনই বা এসেছেন তাও সঠিক জানা যায় না। নানা কিংবদন্তী তাই শোনা যায়। কেউ বলে অচরিতার্থ প্রেম, কেউ বলে, অতি চরিতার্থতা। কেউ বলে সংসারজীবনে স্বাভাবিক বীতস্পৃহা, স্বভাবগত অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা। সেই জিজ্ঞাসার কী জবাব পেয়েছেন কে জানে। পেলেও সে কথা কেউ কাউকে বলে না, বলতে পারে না, কারণ বলে বুঝাতে পারে না। সেই উপলব্ধি একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাইরে থেকে দেখলে জ্ঞান-প্রভাকে মোটেই ভক্তিমতী মনে হয় না, মিস্টিক বলেও মনে হয় না। পূজার আসনে যখন তিনি বসেন তখন যেন তেজস্বিনী, বিদ্রোহিনী। মোটেই পূজারিণী নন। সেখানেও যেন তিনি প্রধান শিক্ষিকা। কী করে পূজা করতে হয় নিয়মনিষ্ঠা মানতে হয়, তাই সবাইকে শিক্ষা দিচ্ছেন।

জ্ঞানপ্রভাও নিঃসঙ্গ। সহকারিণীরা তাঁর সঙ্গিনী নন। সহকর্মীদের মধ্যে সহমর্মী কেউ আছেন কি না কে জানে। দেখে অন্তত তা মনে হয় না। দুর্ভেদ্য দুর্গের অধিবাসিনী জ্ঞানপ্রভা। শুধু একদিন সেই দুর্গের একটি-দুটি জানালা খুলে গিয়েছিল। সেদিন এই ঘরেই জ্ঞানপ্রভার সামনে মুখোমুখি বসেছিল সুজাতা। বাইরে অশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছিল। হাওয়া বইছিল জোরে। জানলা দরজা খোলা রাখবার জো ছিল না।

কথায় কথায় সুজাতা সেদিন বলেছিল, 'আমি যা চেয়েছিলাম তা পাইনি। শুধু খুঁজেই চলেছি। কিন্তু আপনি বোধ হয় পেয়েছেন বড়দি।'

জ্ঞানপ্রভা মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'পাওয়া কি অত সহজ? কী পেতে চাই তাই তো জানিনে। কী চাইতে হয় তাই তো জানিনে। সারা জীবনটাই যেন এক প্রকাণ্ড চাওয়া। শুধু প্রকাণ্ড নয়, অসংখ্য চাওয়া। সেই সংখ্যাহীনতার ভিতর থেকে একটি চাওয়াকে বেছে নেওয়াই সব চেয়ে কঠিন কাজ। পাওয়ার চেয়ে মনে হয় চাইতে পারাটাই বড়। তখন মনে হয় চাওয়া আর পাওয়ায় তফাত নেই। সাধনা আর সিদ্ধি অভিন্ন।'

সেদিন জ্ঞানপ্রভা স্বীকার করেছিলেন তাঁরও সময় বহু তুচ্ছ কাজে অপচিত হয়। তিনিও নিজের সাধ অনুযায়ী পড়বার সময় পান না, ভাববার সময়

পান না, ধ্যানমগ্নতার আনন্দ তাঁর জীবনেও দুর্লভ। তিনিও মাঝে মাঝে ভাবেন, এই আশ্রমও তো আর-এক ঘর-সংসার। এই সংসার চালানোই কি তাঁর কাজ? মেয়েদের পিছনে চৌকিদারী খবরদারী করাই কি তাঁর পরম কর্ম?

সুজাতা সেদিন অবাক হয়ে ভেবেছিল বড়দির মনেও তাহলে দ্বন্দ্ব আছে। অন্তর থাকলেই অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বে কেউ বা ছটফট করে, কেউ বা মুখ বুজে অন্তরের গভীরে তাকে সহ্য করে, অনুভব করে।

কিন্তু আজ এই গভীর রাত্রে জ্ঞানপ্রভা সুজাতাকে অন্য কাজে ডেকেছেন। প্রসঙ্গের ভিন্নতায় তাঁর মুখ, মূর্তি, মেজাজও যেন ভিন্নরকমের।

জ্ঞানপ্রভা বললেন, 'কাগজে কী একটা খবর বেরিয়েছে তাই নিয়ে আশ্রমে, স্কুলে টিচারদের মধ্যে নানারকম গুঞ্জন চলছে। আমি চাইনে ওসব খবর এখানে কেউ পড়ুক, ওসব নিয়ে এখানে কেউ আলোচনা করুক। রমা রত্নাকে আমি সে কথা বলে দিয়েছি। তুমি কি জানো সুজাতা কে কাগজটাকে ওভাবে দাগিয়েছে? ওই বিশ্রী খবরটাকে কে ওইভাবে সবাইর চোখের সামনে তুলে ধরেছে? এই কুরুচিকর প্রবৃত্তি কার?'

সুজাতা বলল, 'না বড়দি।'

জ্ঞানপ্রভা বললেন, 'তাকে খুঁজে বার করতে পার?'

'না বড়দি। অন্তত ও কাজের ভার আপনি আমাকে দেবেন না।'

জ্ঞানপ্রভা বললেন, 'বেশ, সে ভার কাউকে নিতে হবে না। আমি পারব। কাগজটা আমি নিজের কাছে এনে রেখেছি। ওসব খবর কেউ যাতে আর না পড়তে পারে আমি তার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তোমাকেও একটা কথা বলবার আছে সুজাতা।'

'বলুন।'

জ্ঞানপ্রভা সুজাতার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর শান্ত কিন্তু দৃঢ়স্বরে বললেন, 'ওই বিশ্রী একটা মামলার সঙ্গে তুমি যদি কোনরকমে জড়িয়ে পড়, যদি তোমার নামগন্ধটুকুও পাওয়া যায় তাহলেও আশ্রমের বায়ু দূষিত হবে।'

সুজাতা বলল, 'সে কথা আমি জানি বড়দি।'

জ্ঞানপ্রভা বললেন, 'তাই এখানে থেকে আইন আদালত আসামী ফরিয়াদী কারো সঙ্গেই তোমার কোন যোগাযোগ রাখলে চলবে না।'

সুজাতা একই কথার পুনরাবৃত্তি করল, 'আমি তা জানি বড়দি।'

'কিন্তু তুমি কি তা থাকতে পারবে?'

সুজাতা বলল, 'যদি না পারি তাহলে তো অন্য ব্যবস্থা করতেই হবে।'

জ্ঞানপ্রভা বললেন, 'হ্যাঁ, সেই কথাটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট। যাও, এবার শোও গিয়ে। বিশ্রাম কর গিয়ে। রাত হল।'

শেষ কথা ক'টিতে একটু স্নেহের আভাস ব্যঞ্জিত হল জ্ঞানপ্রভার। কিন্তু

ওই পর্যন্তই। জ্ঞানপ্রভা কখনোই সুজাতাকে তার দুর্ভাগ্যের জন্য সমবেদনা দেখাননি, তার অতীত জীবন সম্বন্ধে স্ত্রীসুলভ কৌতূহলও প্রকাশ করেননি। রমাদি রত্নাদির হাত কিন্তু এড়াতে পারেনি সুজাতা। তাঁরা এতদিনে তার অনেক কথাই জেনে নিয়েছেন। হয়তো বা কাউকে কাউকে জানতেও দিয়েছেন।

বিশ্রামের জন্যে একতলায় নিজের ঘরে চলে এল সুজাতা। আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। পাশের তক্তপোষে জ্যোৎস্না অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু সুজাতার ঘুম এল না।

সুজাতা ভেবে পেল না তার মনের এই চাঞ্চল্য কিসের জন্যে। ঘরসংসার আর স্বামীর সঙ্গে তার তো কোন সংশ্রব নেই। সে সব যেন অন্য জীবনের অন্য জন্মের স্বপ্ন! দুঃস্বপ্ন। তবু এখনো কেন মনের শান্ত সরসীতে সেই স্বপ্নের ছায়া পড়ে। দুঃস্বপ্ন এসে অতর্কিতে হানা দেয়?

শশাঙ্কের বিরুদ্ধে নারী হরণের মামলাই চলুক, আর নরহত্যার মামলাই চলুক তাতে সুজাতার কী এসে যায়? কেন তার জন্যে সুজাতার এই কাতরতা? শশাঙ্কের মঙ্গল অমঙ্গলের জন্যে নয়। নিজের সুনাম সম্মানের জন্যে। আইনের দৃষ্টিতে শশাঙ্ক তো এখনো সুজাতার স্বামী। এখানে অনেকেই সে কথা জানে। যারা জানে তারা সুজাতার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে মনে মনে হাসবে, 'এই স্ত্রীলোকটির স্বামী আজ আদালতে আসামী।'

সুজাতা যতদূরেই থাকুক সেই কলঙ্কের ছোঁয়া কি তার একেবারেই গায়ে লাগবে না?

জ্ঞানপ্রভা যতই সতর্ক আর কঠোর হন আইন আদালতের কথা রমাদি রত্নাদিরা পড়বেনই। এখানে পড়তে না পারেন, অন্য কোথাও গিয়ে পড়বেন। পড়বেন আর নিজেদের মধ্যে রসিয়ে রসিয়ে আলোচনাও করবেন। সেই আলোচনার লক্ষ্য হবে সুজাতা। শশাঙ্ককে তো এখানে কেউ দেখতে পাবে না। তার দিকেই সবাই আঙুল বাড়িয়ে দেবে।

আদালতে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে এলেই কি সুজাতা রেহাই পাবে? সেও তো আর এক কেলেঙ্কারীর ব্যাপার। ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিজের হাতে নিজে ছিঁড়ে দিয়ে এল। কেউ জানতেও পারল না। তার গোপনতা তার কাছেই রইল। তার বদলে হাটের মাঝখানে গিয়ে টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি—সে কি সুজাতা পারবে? না কি তাতে মান থাকবে?

কিন্তু কেন এমন হল? মানুষটি চিরকাল একই রকম রয়ে গেল? একটুও বদলাল না? এমন বিশ্রী মামলায় তার নিজের মানসম্মানই বা কোথায় থাকবে? অল্পবয়সে নির্বোধ সুজাতা, রাগে দুঃখে দিশাহারা সুজাতা, গোপনে গিয়ে কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল। তার জন্যে শশাঙ্ক তাকে চূড়ান্ত শাস্তি দিয়েছে। আর আজ যে সেই নালিশ আদালতে গিয়ে উঠল? কাগজে কাগজে ছাপা হয়ে বেরোল। এখন? এখন

কে কাকে শাস্তি দেয়? কে কার কথা গোপন রাখে?

ছি ছি ছি। মানুষটি একটুও বদলাল না, স্বভাব একটুও শুধরাল না। আক্ষেপটা যেন নতুন করে বুকে এসে বাজল সুজাতার। সারাজীবন কেবল কুসঙ্গ করে বেড়াল। এমন একজন ভালো সঙ্গী কি পেল না যে দুটো ভালো কথা বলে, সুপরামর্শ দেয়?

গোড়া থেকে সুজাতার কথা যদি শুনে চলত তাহলে এসব হতো না। কিন্তু সারাজীবন স্ত্রীকে কেবল ঠাট্টা করে, উপেক্ষা করে আর ঘৃণা করেই কাটাল মানুষটি। নিজের স্ত্রী ছাড়া আর সব মেয়েকে ভালোবাসল, যাকে দেখল তার পিছনে ছুটল। এখন যে সমাজ তাকে ঠেলে নোংরা নর্দমায় ফেলে দিল, এখন কে তাকে টেনে তুলবে?

কাছে থাকলে সুজাতা কি পারত তুলতে? সুজাতা কি আরো চেষ্টা করতে পারত? আরো নিষ্ঠা, আরো উদ্যম, আরো অধ্যবসায় নিয়ে চেষ্টা করলে কি হতো না?

কে জানে হতো কি না? এখন তো আর সময় নেই।

সেবার এতকাল বাদে দেখা করতে কেন এসেছিল? দেখা যদি করত সুজাতা, কী হতো? ঘটনার মোড় ফিরতো? জীবনের মোড় বদলাতো?

কে জানে?

এখন আর তা জানবার সময় নেই। জেনে লাভও নেই।

সুজাতা পাশ ফিরে ঘুমাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম এল না।

॥ ২২ ॥

শুনানীর তারিখ পড়েছে পুজোর ছুটির পরে। এখনো মাসখানেক সময় আছে। এখনো আগাগোড়া ব্যাপারটা ভেবে দেখে কর্তব্য স্থির করতে পারে শশাঙ্ক। এখনো দাদারা যা বলছেন, প্রণবদের মত হিতৈষী বন্ধুরা যা বলছে, মিহিরের কাছে গিয়ে অনুরোধ-উপরোধ করে এই মিথ্যা মামলাটা সে যাতে তুলে নেয়, তার চেষ্টা করে দেখতে পারে।

মিথ্যা। হ্যাঁ, শশাঙ্ক জানে ব্যাপারটা মিথ্যা। কিন্তু তার পক্ষের-বিপক্ষের সবাই জানে, অভিযোগটা পুরোপুরি সত্য। শশাঙ্কের মত কদাচারী মানুষ ব্যভিচার ছাড়া আর কী করতে পারে। শশাঙ্কের নিজের উকিলরাও সে-কথা বিশ্বাস করেন। মুরারিদা তো করেনই। তিনি বছরখানেক কি বছর দেড়েক ল' পড়েছিলেন। সেই বিদ্যা আর সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞতার জোরে তিনিই এখন শশাঙ্কের সারথি হয়েছেন। দেখা হলেই হেসে বলেছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।' বলছেন, 'মামেকং শরণং ব্রজ।'

সারথি তো পার্থসারথি। কিন্তু শশাঙ্ক নিজে পাণ্ডব পক্ষ কি কৌরব পক্ষ ভালো করে বুঝে উঠতে পারছে না। রাজ্যসুদ্ধ লোক তাকে দুর্বৃত্ত দুরাচারীর দলে ঠেলে দিয়েছে। মুরারিদা হেসে সব উড়িয়ে দিয়ে বলছেন, 'তোমাকে আরো দুরাত্মা হতে হবে। না হলে ওই সদাচারীদের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে তুমি এ'টে উঠতে পারবে না।'

মুরারিদা একমাত্র বন্ধু, যিনি মিটমাটের পক্ষপাতী নন।

তিনি বলছেন, 'কী এমন দায় পড়েছে তোমার, তুমি দাঁতে কুটো নিয়ে ওই রোগাটে গোঁয়ার ইঞ্জিনীয়ার ছোঁড়াটার পায়ে ধরতে যাবে? তোমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। খুব স্ট্রং কেস তোমার। দুদিন যেতে দাও, ওই মিহিরই বাপ-বাপ করে এসে তোমার পায়ে পড়বে। মামলা চালাবার খরচ ওই মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারের মাইনের টাকায় কুলোবে না। তা ছাড়া আমাদের উকিলরা শহরের সেরা ঝানু উকিল। তাঁরা দিনকে রাত করতে পারেন রাতকে দিন। তাঁরা ডজনে ডজনে খুনী আর জালিয়াত, কালোবাজারী, চোরাকারবারীদের খালাস করে এনেছেন। তাঁরা আজকের পরিত্রাতা নন। বলতে গেলে সেই ত্রেতা যুগ থেকে ত্রাণ করে আসছেন।'

শশাঙ্ক বলেছিল, 'মুরারিদা, আমিও কি ওই খুনী-জালিয়াতদের দলে?'

মুরারিদা হেসে বলেছিলেন, 'মোটেই ওদের দলে নও। তা তুমিও জানো, আমিও জানি। অ্যাডালটারি মোটেই ও-ধরনের অপরাধ নয়। আমার মতে তো কোন অপরাধই নয়। আসলে একটা কৌতুক আর মজার ব্যাপার। আমরা যেমন লুকোচুরি খেলে মজা পাই, সেই মজা। কিন্তু তার চেয়েও বড় মজা আমাদের এই আশেপাশের লোকগুলি একটা তুচ্ছ ব্যাপারকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কি রকম একটা সাংঘাতিক বালির পাহাড় গড়ে তুলেছে।'

শশাঙ্ক বলেছিল, 'তুমি তাই মনে কর?'

মুরারিমোহন বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই। আর তোমাকেও তাই মনে করতে বলি। যারা তোমার গায়ে ধুলো দিচ্ছে, তারা দিনরাত নিজেরাই নিজেদের চোখে ধুলো দেয়। নিজেরাই নিজেদের মনকে আঁখি ঠারে। কিন্তু ওদের দেওয়া ধুলো ওদের কোঁচার খুঁটেই তোমাকে মুছে ফেলতে হবে। তারপর আড়ালে এসে অঞ্চলবতীদের সোনার আঁচলে মুছে নেবে। কিন্তু তার বদলে তুমি যদি শত্রুর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়, তাতে তোমার কলঙ্ক ঘুচবে না, শরতের চাঁদ, কলঙ্ক বাড়বে।'

মুরারিদা আপসের পক্ষপাতী নন। উকিলরাও তাঁর পক্ষে।

শশাঙ্কও ভাবে মিহিরের কাছে ক্ষমা চাওয়া মানে মিথ্যাকে সত্য বলে স্বীকার করা। নিজেকে দীন হীন দুর্বল বলে প্রমাণ করা। চরিত্রের সেই দৌর্বল্যই আসল দৌর্বল্য। কে কয় পেগ মদ খেল, কে ক'টি নারী সম্ভোগ করল, সে দুর্বলতা সত্যিকারের দুর্বলতা নয়।

পড়বার ঘরে শশাঙ্ক চুপ করে বসে ভাবছিল। আসলে তার ভাবতেই ভালো লাগে, কল্পনা করতেই ভালো লাগে। কিছু করতে না হলেই তার পক্ষে ভালো হয়। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় আনাড়ীর মত এমন এক-একটা কাণ্ড করে বসে যে, তা আর বলবার নয়। করে ফেলবার পরে ফিরে দেখে, সেগুলি হয় অপকর্ম, না-হয় অকর্মক ক্রিয়া।

মামলাটা অবশ্য এখনো প্রাথমিক স্তরেই আছে। এখনো চেষ্টা-চরিত্র করলে হয়তো চুনকামের আস্তরণে একে ঢেকে ফেলা যায়। কোর্টে এমন কত মামলা ওঠে, দু-চারদিন যেতে-না-যেতেই সব বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যায়। তাদের আর কোন সাড়া-শব্দও শোনা যায় না।

কিন্তু মামলাটা বড় খারাপ ধরনের ব্যাপার। থানা-পুলিস, আইন-আদালতের সঙ্গে জড়ানো ভদ্রলোকের কাজ নয়। শশাঙ্ক এ-সব দিকে নির্বিরোধ মানুষ। দাদারা তাকে বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে ঠকাচ্ছেন জেনেও সে তাই কোন মামলার মধ্যে যায় না। ভাবে, ফেলে-ছড়েও যা থাকে, তাই যথেষ্ট! কে খাবে?

উকিল বন্ধুরা বলে, 'তোমার অত ভয় কিসের? লড়ব তো আমরা।'

শশাঙ্ক মাথা নেড়ে বলে, 'থাক। দরকার হলে তোমাদের ডাকব।'

তার এই বৈরাগ্য দেখে মুরারিবাবু হেসে বলেন, 'বেশ আছ তুমি শশাঙ্ক। আমাদের কামিনী কাঞ্চন দুই-ই চাই। তুমি একের মধ্যেই সব পেয়েছ।'

সব পেয়েছে, না সব হারিয়েছে, বলা শক্ত। শশাঙ্কের কখনো কখনো মনে হয়, 'পেয়েছি'। কখনো বা মনে হয়, 'হারিয়েছি'। এখন মনে হয়, হারিয়েছেই বেশি। সংসারী হয়েও সংসার হল না শশাঙ্কের। যে-বয়সে লোকে পুত্র-কন্যা-পরিবৃত হয়ে থাকে, সেই বয়সে সে একক। যে জীবন-সঙ্গিনী হয়ে এসেছিল শশাঙ্ক তাকে দূর করে তাড়িয়েছে। আরো যারা আসতে চেয়েছিল, তাদের কাউকেই ঢুকতে দেয়নি। সর্বশেষে প্রত্যাখ্যান করেছে মন্দিরাকে। তার ভালোর জন্যেই করেছে। আশ্চর্য, তবু এই মন্দিরার জন্যেই তাকে আদালতে যেতে হল।

মাত্র মাসখানেক আগের ঘটনা। বি-এ ক্লাসের ছাত্রদের দু-তিন দিন ধরে শেলীর স্কাইলার্ক পড়াচ্ছিল শশাঙ্ক। সেদিন কবিতাটি শেষ করে কলেজ থেকে বাড়িতে ফিরে আসবার পরও মনের মধ্যে গুনগুন করছিল, 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts', প্রণব ছিল সঙ্গে। হেসে বলেছিল, 'কী ব্যাপার। কিসের মন্ত্র আওড়াচ্ছ?' বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেখে খাকির কোট-পরা এক পত্রবাহক। 'বাবু, আপনার নামে সমন আছে। কাল এসে ঘুরে গেছি।'

'সমন আবার কিসের?'

হাত বাড়িয়ে ব্রাউন রঙের লেফাফাখানা নিল শশাঙ্ক। খাতায় সই করে প্রাপ্তি স্বীকার করল।

এমন নতুন ধরনের প্রেমপত্র কে লিখল তাকে?

খুলে পড়বার পর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

প্রণব বলেছিল, 'ব্যাপার কি?'

সমনের কথাটা সেদিন বন্ধুকে বলতে পারেনি শশাঙ্ক। অত ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রণব। শশাঙ্কের জীবনের অনেক গোপন কথাই সে জানে। তবু মিহির যে তার বিরুদ্ধে কোর্টে পিটিশন করেছে, আর সেই পিটিশন দেখে ম্যাজিস্ট্রেট সমন জারি করেছেন, কথাটা প্রণবকে জানাতে দ্বিধান্বিত হয়েছে শশাঙ্ক। জানে তো প্রণব কিরকম মরালিস্ট মানুষ। ব্যাপারটা যে মিথ্যা, তা সে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। সত্য বলেই ধরে নেবে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘৃণা করবে, তীব্র ঘৃণা করবে। এ কথা শশাঙ্কের তখন মনে আসেনি যে, ওই রক্ষণশীল প্রণবের ঘৃণায় তার কিছুই এসে যায় না। আর ব্যাপারটা সত্যিই হোক, মিথ্যেই হোক, শশাঙ্কের কাছে তার প্রভেদ সামান্যই। মিহির তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছে, তা একচুলের জন্যে সত্যি হতে হতে হয়নি। এক মিনিট এদিক-ওদিক হলে, মুডের একটু রকমফের ঘটলে মন্দিরার সঙ্গে তার পূর্ণদেহ-সম্মেলন হয়ে যেতে পারত। তাতেও কিছু এসে যেত না। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের সমন পাবার পর শশাঙ্ক দেখল, অনেক কিছুতেই তার এসে যায়। বন্ধুরা, সহকর্মীরা তার সম্বন্ধে কে কি ভাবে, তা নিয়ে শশাঙ্কের মাথা ঘামানোর যেন আর শেষ নেই। অথচ শশাঙ্ক দাবি করে, মূল্যবিচারের মাপকাঠি তার স্বতন্ত্র। কিন্তু সংকটকালে কার্যক্ষেত্রে এসে দেখছে সেই কাঠিকে সেও ভয় করে, সেই কাঠিতে সেও নিজেকে মাপে। এই ভীরুতার জন্যে লজ্জা হয় শশাঙ্কের। এই দুর্বলতার জন্যে সে নিজেকে নিজে বার বার ধিক্কার দেয়। শশাঙ্কের বড় সাধ সে ডাকাত হয়। সে কালাপাহাড়ের মত সব ভেঙেচুরে সেই চূর্ণ স্তূপের ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। কিন্তু সেই দুর্বার পৌরুষ তার রক্তের মধ্যে নেই। সে মারণ-অস্ত্র নিয়ে মশাল জেবলে হৈ-হৈ করে ডাকাতি করতে যেতে পারে না, তার দুর্বল অন্তর-প্রকৃতি তার হাতে শুধু একগাছি সিঁধকাঠি তুলে দিয়েছে। তাই নিয়ে সে গভীর রাতে নীতিবিদদের ঘরে, রক্ষণশীলদের আস্তানায় ভিত খুঁড়তে যায়। কোন কোন রাত্রে চুরি করে পালিয়ে আসে। কিন্তু গৃহস্থ একটু কাশি দিলেই, একটু হাঁক-ডাক করলেই ধরা পড়বার ভয়ে থর থর করে কাঁপে। এবার সে চুরি করেনি। কিন্তু চোরের মত গৃহস্থের আঙিনায় তাকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। গৃহস্থ ধরে ফেলেছে তাকে। চুরিটা আসলে চুরি নয়, লুকোচুরি, এ-বক্তৃতায় সে ভুলবে না। নিজেকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করে তার পরানো হাতকড়ি খুলে ফেলতে হবে। নিজের কাপুরুষতার জন্যে শশাঙ্ক নিজেকে কম ধিক্কার দেয় না। কিন্তু ধিক্কার দিলেই তো আর স্বভাব বদলায় না। অতীত্য হি গুণান্ সর্বান্ স্বভাবো মূর্ধ্নি বর্ততে।

প্রণবকে জানায়নি, কিন্তু মুরারিকে জানিয়েছিল শশাঙ্ক। দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় একটি বিনিদ্র রাত কাটিয়ে শশাঙ্ক ছুটে গিয়েছিল বন্ধুর বাড়িতে। আশ্চর্য, উকিলের কথা তার মনে পড়েনি। সহায় সম্বল হিসাবে প্রথমে বন্ধুর মুখই তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।

মুরারিমোহন তখন বাইরের ঘরে আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন। অর্থী-প্রার্থীতে ঘর ভরতি। আর রাজরাজেশ্বরের মূর্তিতে মুরারিমোহন উঁচু আসনে বসে কাউকে ধমকাচ্ছেন, কাউকে উপদেশ দিচ্ছেন, কাউকে দু-এক নম্বর পার্ট দেওয়ার চেষ্টা করে দেখবেন বলে আশ্বাস দিচ্ছেন। দু-তিনটি সুশ্রী তরুণীও ঘরের মধ্যে আছে। কিন্তু তখন আর শশাঙ্কের সেদিকে চোখ পড়ল না।

মুরারি আসন থেকে উঠে এসে বন্ধুর হাত ধরলেন, 'আরে, এসো এসো। এত সকালে যে। তোমার কি আজকাল সকাল সকাল ঘুম ভাঙে।'

শশাঙ্ক বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে মুরারিদা।'

মুরারিমোহন বললেন, 'মনের কথা আমারই কি কম জমেছে ভাই? কিন্তু কতগুলি বাজে কাজের চাপে বাক্যহারা হয়ে বসে আছি। আচ্ছা, তোমরা একটু বোসো। আমি আসছি।'

অভিনয় যশঃপ্রার্থী আর প্রার্থিনীদের প্রতীক্ষায় রেখে মুরারিমোহন পাশের ছোট্ট নিরিবিলি ঘরটিতে ঢুকলেন।

চেয়ার টেনে বসলেন মুখোমুখি। তারপর একটু হেসে বললেন, 'মনে হচ্ছে রাত্রে ঘুমোওনি। উস্‌কোখুস্‌কো, উদ্‌ভ্রান্ত, এ কী চেহারা? নতুন প্রেম নাকি?'

চট করে বিপদের কথাটা বলতে শশাঙ্কের বাধল। বিরস মুখে বলল, 'তুমি তো ওই সব নিয়েই আছ।'

মুরারিমোহন বললেন, 'নারে ভাই, তা আর থাকতে পারছিনে। ইচ্ছে অবশ্য তাই। তোমার মত রসের সমুদ্রে আকণ্ঠ ডুবে থাকি। কিন্তু রুজি-রোজগারের চাপে সব রসকস শুকিয়ে গেল। তারপর আছে বন্ধুদের উৎপাত। যে-যেখানে আছে, সবাই একখানি করে চিরকুট পাঠাচ্ছে—ভাই মুরারি, অমুক শ্রীমানকে কি অমুক শ্রীমতীকে পারো তো একটু চান্স দিয়ো। শ্রীমতীদের জন্যে সুপারিশই বেশি আসে। জানে আমার নারীঘটিত দুর্বলতা বেশি। সেই সুযোগ নিতে চায় আর কি। কিন্তু দুর্বলতা থাকলে কী করব বলো। আমি তো যাকে দেখি, তাকে দেখেই মুগ্ধ হই। সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা কামের কাজল পরি। আমার পরী আর অপ্সরী না হলেও চলে।'

মুরারি বন্ধুর সামনে সিগারেট-কেস খুলে ধরে বললেন, 'কিন্তু আমার চোখ নিয়ে তো কথা নয়। আমাকে দেখতে হবে সহস্রলোচনের পক্ষ থেকে, দেখতে হবে ক্যামেরার চোখ দিয়ে। রক্ষাকালীর দুহিতারা এসে যদি বলে, আমাকে হিরোইনের পার্টটি দিন, আমি দাঁড়াই কোথায় বল তো। আর কাঁধের

ক্যামেরাটাই বা কোথায় নামিয়ে রাখি।'

রসিকতা উপভোগের সময় শশাঙ্কর তখন ছিল না। সে আগের কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করল, 'তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে মুরারিদা।'

মুরারিমোহন এবার একটু নার্ভাসের মত হাসলেন, 'তোমার সেই টাকাটা কি—'

শশাঙ্ক অধীর হয়ে বলল, 'না-না, টাকার কথা নয়। অন্য ব্যাপার। আমি বড় বিপদে পড়েছি।'

মুরারিমোহন এবার গম্ভীরভাবে ধৈর্য ধরে সব শুনলেন। আদালতের সমনখানা একবার দেখলেন। তারপর হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, 'আরে ছোঃ ছোঃ, এ আবার একটা বিপদ নাকি? বিশেষ করে তোমার মত সম্পন্ন লোকের পক্ষে এমন দু-একটা মামলা-মোকদ্দমা ঝুলে না থাকলে মানায় না কি? শুধু কি মেয়েরাই কণ্ঠলগ্না হয়ে থাকবে?'

শশাঙ্ক ম্লানমুখে বলল, 'তুমি ঠাট্টা করছ। এই কি তোমার ঠাট্টা করবার সময়?'

মুরারিমোহন বন্ধুর কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'ঠাট্টা আমরা নিজেদের মধ্যে করছি। কিন্তু যারা গাট্টা মারতে এসেছে, তাদের আমরা গাট্টা মেরেই শোধ তুলব। মিহির লোকটা তো কম পাজী নয়। আসলে তোমাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা। এর শোধ নিতে হবে শশাঙ্ক। তোমাকে নিষ্কলঙ্ক করে তোমার রাইভালের বিরুদ্ধে ডিফেমেশন সুট আনতে হবে। সহজে ছাড়লে চলবে না।'

শশাঙ্ক বলল, 'পরের কথা পরে। এখন কী করা যায়, তাই বলো।'

মুরারিবাবু বললেন, 'এখন অনেক কর্তব্য আছে। সবচেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে না থাকা। সুন্দরী মেয়ে দেখে তোমার যতই মাথা ঘুরে যাক, মামলা-মোকদ্দমায় পড়ে মাথাটাকে রিভলভিং স্টেজের মত ঘুরতে দিলে চলবে না। ঠিক মাথা ঠিক রাখতে হবে, সোজা রাখতে হবে। আরো কি করতে হবে না হবে পরে বলছি। তার আগে একটু চা-টা খাইয়ে তোমাকে চাঙ্গা করে নিই। বিয়োনো বউ আর মিয়োনো মুড়ির মত চুপসে গেলে তো এখন চলবে না ভাই। একটু বোসো। গিন্নীকে খবর দিই। আর রক্ষাকালীর কন্যাদের কাল কি পরশু আসতে বলে দিয়ে আসি।'

মুরারিমোহন উঠে ভিতরের দিকে চলে গেলেন। পুরোন আমলের বাড়ি। সদর অন্দর দুই মহলই আছে। বিশেষ কোন উপলক্ষ ছাড়া শশাঙ্ক বন্ধুর ভিতরের বাড়িতে যায় না। মুরারি এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক। নিজের যতই বার-টান থাকুক, ঘরের দিকেও তাঁর খুব কড়া নজর। পারিবারিক শুচিতা রক্ষার ব্যাপারে সচেতন। শশাঙ্ক ভাবল, সুজাতা যদি মুরারিদার স্ত্রী হতো তার সাধ্য ছিল না বাড়ির বাইরে যায়। কাঁদো কাটো, মাথা কোটো কপাল কোটো

সব ঘরের মধ্যে বসে করো। ঘর থেকে পা বাড়ালেই পা ভাঙব। পুরুষের কাছে এমন জবরদস্তিই বোধ হয় চায় মেয়েরা। তারা নিগ্রহ চায়, নিগৃহীতা হতে চায়। দাঁতের নখের ক্ষতচিহ্নই তাদের অলঙ্কার, রক্তচিহ্নই তাদের শিরোভূষণ।

একটু বাদে মুরারিবাবুর স্ত্রী এসে সামনে দাঁড়ালেন। পিছনে স্বয়ং মুরারিমোহন। স্ত্রীর কোলে শিশুপুত্র। তারা এখনো দু-বছর না তিন বছর বাদে বাদে আসে শশাঙ্ক ঠিক জানে না।

ছোটখাটো রোগাটে চেহারা। শাঁখা সিঁদুরে আটপৌরে বেশ। মুখে হাসি।

'কেমন আছেন? নমস্কার।'

শশাঙ্ক প্রতি নমস্কার জানিয়ে বলল, 'ভালো। আপনি?'

'আমার কি আর খারাপ থাকবার জো আছে? আমি যদি শুয়ে পড়ি এদের দেখবে কে। দেখুন না, নাক দিয়ে কি রকম জল পড়ছে।' কোলের ছেলের সর্দিভরা নাকের দিকে স্নিগ্ধচোখে তাকালেন প্রৌঢ়া জননী।

মুরারিমোহন একটু ধমকের সুরে বললেন, 'থাক থাক। কার সর্দি হয়েছে, কার কান পেকেছে সে বিবরণ তোমাকে এখন না দিলেও চলবে। আমাদের জরুরী কথা আছে। তুমি যাও, চা আর খাবার-টাবার যদি থাকে নিয়ে এসো তো।'

তারপর বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি জানো না শশাঙ্ক, তোমার বউদির রান্নার হাত কী চমৎকার—ক্রমে চমৎকারতর হচ্ছে। যত চুল পাকছে, ততই যেন হাত পাকছে।'

'থাক আর খোসামোদ করতে হবে না।'

মুরারিমোহন বললেন, 'খেতে খেতে মনে হয়, আহাহা, সাতজন্মের একজন রাঁধুনীকে বিয়ে করেছি। আরো সাতজন্ম যেন এমন একজন রাঁধুনীকে পাই।'

'আহা। তোমার সংসারে আমি বুঝি শুধু রান্নাই করি।'

মুরারিমোহন হেসে বললেন, 'শুধু রান্না করলে কি আর চলে? গরীবের সংসারে আরো অনেক কিছুই করতে হয়। আমি তো আর আমার বন্ধু শশাঙ্কশেখর নই। চমৎকার কাপড় কাচতে পারে তোমার বউদি। আর ধুতি পাঞ্জাবি এমন ইস্ত্রি করে! আহাহা, মনে হয় এমন একজন ধোপানীকে যেন জন্ম জন্ম পাই। যাও, এবার ভিতরে যাও। চিঁড়ে হোক মুড়ি হোক ভাঁড়ারে যা আছে পাঠিয়ে দাও। আর লজ্জা করতে হবে না। একটু সুখ্যাতি শুনলে তোমার বউদি একেবারে সেই সেকালের কিশোরী হয়ে ওঠেন। নামেও মুকুলমালা, লজ্জায়ও মুকুলমালিকা। ওগো, লজ্জাবতী, এবার উইংসের পাশ দিয়ে অন্দর মহলে প্রস্থান করো। আমাদের দুই বন্ধুর জরুরী গোপন কথা আছে।'

মুকুলমালা চলে গেলেন।

বন্ধুর দাম্পত্য প্রেম দেখে ঈর্ষান্বিত হল শশাঙ্ক। এই বহুচারী মানুষটি শুধু বহু সন্তান দিয়েই স্ত্রীকে বেঁধে রাখেননি, প্রচুর ভালোও বেসেছেন। সেই ভালোবাসা ছাড়া এমন নিবিড় মধুর সম্পর্ক বোধ হয় সম্ভব নয়। কেউ কেউ পারে। দুই কুলই রাখতে পারে। শশাঙ্ক পারল না।

মুরারিমোহন শশাঙ্কের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'একটু তোয়াজ করে নিলাম। অমন মাঝে মাঝে করতে হয়। আর্টিস্টদের মতো স্ত্রীজাতিও তোয়াজে তুষ্ট। যে লোক একেবারেই অভিনয় করতে পারে না তাকেও বলতে হয়, তুমি নটসূর্য। যে লেখক কোন-রকমে বানান করে করে লেখে তাকেও বলতে হয় তুমি সরস্বতীর বরপুত্র, সোনার কলম হাতে নিয়ে জন্মেছ। এই মধুর মিথ্যায় সারা জগৎ-সংসার ছেয়ে আছে শশাঙ্ক। কখনো মিথ্যা ছাড়া সত্য কথা বলো না।'

শশাঙ্ক বলল, 'মিথ্যা কি সবসময় মধুর? আমার মত মিথ্যে মামলায় যদি জড়িয়ে পড়তে হতো মুরারিদা, তাহলে একথা বলতে না।'

মুরারিমোহন হেসে একটু আড়চোখে তাকালেন, 'সত্যিই কি মিথ্যে?'

আর সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্কের সমস্ত মন বিস্বিষ্ট হয়ে উঠল। এই রসিকতা, এই সহজ বন্ধুবাৎসল্য কিছুই আর তার কাছে উপভোগ্য লাগল না। মুরারিদা তাকে বিশ্বাস করছেন না! অথচ সৌহার্দ্য বন্ধুত্ব প্রীতি প্রেম সমস্ত হৃদয়াবেগের ভিত্তিভূমি এই পারস্পরিক বিশ্বাস আর নির্ভরতা। শশাঙ্কের সেই মুহূর্তে মনে হল সে আর কিছুই চায় না, শুধু একটি বিশ্বস্ত হৃদয় চায়।

শশাঙ্ক বলল, 'মুরারিদা, আমি তাহলে উঠি।'

মুরারিমোহন বললেন, 'উঠবে মানে? এখন উঠলে চলবে কী করে। অনেক পরামর্শ আছে। এখন দাবার চালের মতো প্রতিটি চাল হিসেব করে চালতে হবে। এখন আর মান অভিমানের সময় নেই ভাই। এখন প্রেম মানে শুধু এক ফোঁটা চোখের জল, এক ঝিলিক হাসি, আর দু-লাইনের কবিতা নয়। এখন প্রেম মানে ফৌজদারী মামলা, সাক্ষীসাবুদ উকিল মোক্তার, প্রতি-পক্ষের সঙ্গে কখনো মুষ্টিযুদ্ধ, কখনো মুষলযুদ্ধ। কোন ভয় নেই শশাঙ্ক। আমি আছি। আমি একাই এক অক্ষৌহিণী।'

মুরারিদা বৃথা আস্ফালন করেননি। চা জলখাবার খেয়ে শশাঙ্ককে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। উকিলের বাড়ি গেলেন। তাঁকে কেস বুঝিয়ে দিলেন। শশাঙ্ককে কিছুই করতে হয়নি। শুধু পকেট থেকে টাকা বার করেছে। আর মনে মনে বন্ধুর তারিফ করেছে।

কোর্টেও মুরারিই জামীন হয়েছেন শশাঙ্কের। শশাঙ্ক ভদ্রতা করে বলেছিল, 'তোমার যদি কোন দ্বিধা থাকে—'

ম্রারিমোহন [illegible], 'দ্বিধা মানে? আমি এক-ধার মান্ষ। তোমাদের মতো পোয়েটও নই ফিলজফারও নই। দ্বিধা ত্রিধা-র ধার ধারিনে। যাকে চাই তাকে সবখানিই চাই। সবখানি না পাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিই না। আবার যার ওপর রাগ হয় তাকে জোর এক ঘা—স্থান বিশেষে একটি চড়, একটি চাপড় কি একটি চাঁটি দিয়ে চলে আসি। তুমি যদি খ্ন করেও আসতে আমি তোমার জামিনদার হতাম। আর এ তো নিতান্ত তুচ্ছ একটা পরদার-হরণের মামলা।'

সেদিনও গাড়িতে পাশাপাশি বসে কথা হচ্ছিল। কানের কাছে ম্খ এগিয়ে গলা নামিয়ে ম্রারিমোহন বলেছিলেন, 'কিন্তু ব্যাপারখানা কি বল তো শশাঙ্ক। ওরা অকুস্থল করেছে তোমার নিজের বাড়িতে। মানে তুমি নিজের শোয়ার ঘরে পরস্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছ এই ওদের নালিশ। কখন কোন শ্ভদিনে শ্ভক্ষণে এই স্মতি হয়েছিল তোমার! সাবাস সাবাস। আমার তো ভাই ইচ্ছে থাকলেও সে স্যোগ-স্বিধে নেই। নিজের ঘরে গিয়ে নিজের বউ ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাইনে। আর কাউকে দেখলেই তোমার বউদি চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় করে তোলে। ছেলেমেয়েরা তার সঙ্গে যোগ দেয়। তুমি সেদিন ওই যে হরিণীটিকে দেখলে, সময় হলে সেই একেবারে রায়বাঘিনী হয়ে দাঁড়ায়। সব মেয়েই জাত অভিনেত্রী। আমি মাঝে মাঝে তোমার বউদিকে বলি, আর ঘরে কেন, দয়া করে চল এখন স্ট্ডিওতে। অ্যাকটিং ফ্যাকটিং সেখানেই যা হয় করবে। হ্যাঁ, তোমার ব্যাপারটা কি বল তো দেখি।'

খাদের ব্যাপারটা বলতে গিয়ে শশাঙ্কের বাধল। ম্রারিদা যেমন সব বলতে পারেন, শশাঙ্ক তা পারে না। ম্খে আটকায়। কিন্তু আর সবই বলল। মন্দিরার সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা, চিঠি লেখালেখির কথা, মন্দিরার হঠাৎ গ্হত্যাগের কথা, শশাঙ্কের ঘরে এসে তার নাটকীয় উক্তি, নাটকীয় আচরণ এবং হঠাৎ হিতৈষী অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে আর এক অভিভাবকের হাতে মন্দিরাকে তার পেঁাছে দিয়ে আসা, সবই সবিস্তারে বন্ধ্কে জানাল শশাঙ্ক। যেসব ডিটেল বাদ গেল ম্রারিমোহন খ্ঁটিয়ে খ্ঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে সব জেনে নিলেন। দার্ণ উৎসাহ, দার্ণ কৌত্হল তাঁর এসব ব্যাপারে।

পথে চৌরঙ্গী অঞ্চলের এক রেস্তরাঁয় গিয়ে তিনি চা-টা খেয়ে নিলেন। তারপর শশাঙ্ককে তার বাড়ির দরজায় নামিয়ে দেওয়ার আগে বললেন, 'কাজটা ভালো করনি ভাই। যদি সত্যি কথা বলে থাকো, তাহলে বোকার মত কাজ করেছ।'

শশাঙ্ক অবাক হয়ে বলল, 'কেন, বোকামি কিসে হল?'

ম্রারিমোহন প্রায় ধমকের ভঙ্গিতে বললেন, 'বোকামি নয়? চ্ড়ান্ত বোকামি। আরে, যে মেয়ে রক্তমাংসের ক্ষিদে নিয়ে তোমার ঘরে এল. তাকে তুমি মোচাঘণ্ট খাইয়ে হরতুকি দিলে ম্খশ্দ্ধি করবার জন্যে? যে লাল

টুকটুককে বেনারসী পরতে চায় তাকে তুমি নামাবলী উপহার দিলে? এমন মতিভ্রম তোমার কী করে হল। ওই রুচিবাই আর শুচিবাই তোমার সর্বনাশ করে ছাড়বে।'

শশাঙ্ক একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'কিন্তু আমি তো তার ভালোর জন্যেই—'

মুরারিমোহন হেসে বললেন, 'ভালোর জন্যে না কচু। কিসের জন্যে তা আমি বুঝি শশাঙ্ক। আমরা কারো ভালোর জন্যে কিছু করিনে, এমনকি নিজের ভালোর জন্যেও কিছু করতে পারিনে। আমরা শুধু আমাদের প্রবৃত্তির আঁচল ধরে চলি। সেই প্রবৃত্তি নানা রঙের ঘোমটায় নিজের মুখ ঢাকে। সে কখনো সদাচারিণী হিতৈষিণী, কখনো অঙ্কশায়িনী, কখনো পদসেবিকা, কখনো কণ্ঠলগ্না। কখনো বরাঙ্গনা, কখনো বারাঙ্গনা। বড় ডিফেকটিক মূর্তি তার। আমাদের প্রবৃত্তি ঠিক আমাদের মতো। কখনই কায়মনোবাক্যে এক নয়। তুমি যে হাতের মুঠিতে অমন একটি ডগডগে সোমত্ত মেয়েকে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছ সে তোমার কোন সুপ্রবৃত্তির জন্যে নয়, অপ্রবৃত্তির জন্যে।'

শশাঙ্ক প্রতিবাদ করে উঠল, কিন্তু বলিষ্ঠ কণ্ঠের প্রতিবাদ নয়, আর্ত-কণ্ঠের প্রতিবাদ—'আমার কোন good intention-ই এর মধ্যে ছিল না? শুধু অপ্রবৃত্তি?'

মুরারিমোহন একেবারে নির্দ্বিধায় বললেন, 'শুধু অপ্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি আর অপ্রবৃত্তি। তোমাদের ওসব ধোঁয়াটে প্রেম-ট্রেম আমি বুঝিনে ভাই। স্বীকারও করিনে। আমি শুধু প্যাশনকে জানি। জানি বললে, বড়াই করা হয়। জানিনে। শুধু তাকে রক্তের মধ্যে টের পাই, শিরায় শিরায় টের পাই। কিন্তু তার স্বরূপ জানিনে। এইটুকু বুঝি, it is whimsical, very whimsical। সেই প্যাশন নিজের খুশিমতো আসে, নিজের খুশিমতো বিনা নোটিশে চলে যায়। আজ যে মেয়েকে দেখে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়, কাল তাকে দেখে আমার নড়বার আর কোন বাসনা হয় না। দু পায়ে যেন গোসা নামে। আমি অশক্ত অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। প্যাশন এমনই এক অপূর্ব বস্তু।

মৃদু হেসে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মুরারিমোহন। নিজের ব্যাখ্যায় নিজেই পরিতৃপ্ত। তারপর হঠাৎ তত্ত্ব থেকে তথ্যে নেমে এলেন, 'হ্যাঁ, ওই মেয়েটাকে কিন্তু হাতছাড়া করা চলবে না। ওকে হাতের মুঠোয় রাখতে হবে। জেনে রেখো, ওর হাতে আমাদের জীবনকাঠি, মরণকাঠি। ওই একফোঁটা মেয়ে বলে তুচ্ছ কোরো না শশাঙ্ক। ছোট সাপও সাপ। তার দাঁতেও নিদারুণ বিষ। ছোট নদীও নদী। বন্যার সময় ফুলে ফেঁপে উঠে দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তুচ্ছ কোরো না।'

বিমূঢ়, ভীত, শঙ্কিত শশাঙ্ক শুধু বলতে পারল, 'তা হলে কী করব?'

মুরারিমোহন হেসে বললেন, 'কী সুবোধ বালক! ভাজা মাছখানাও এখন তোমাকে উল্টে দিতে হবে। কী করবে আবার? নতুন করে কোর্টশিপ করবে। তবে নিজের খুশিতে নয়, উকিলের বুদ্ধি নিয়ে। এখন আর তুমি স্বাধীন নও। জামিনে খালাস আছ। কোর্ট যখনই ডাকবে, তখনই হাজিরা দিতে হবে। তুমি এখন নজরবন্দী। বিশেষ করে নিজের উকিলের হাতে। তাঁর কথামত যদি না চল, তোমার উকিল তোমার পকেটও সাবাড় করবে, আবার বাঁদরের মতো তোমাকে মুখও খিঁচাবে। এখন তোমার প্রতিটি চালচলন আইনজীবীর অঙ্গুলি-হেলনে হেলবে দুলবে। তুমি যেমন দুলতে ভালোবাসো, তেমনি দোলা খাও শশাঙ্ক।'

গাড়ি থেকে নেমে দোরের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন মুরারি-মোহন। বন্ধুকে সাদরে একটু ঠেলে দিয়ে হেসে বললেন, 'এবার চলি।'

শশাঙ্ক একটু ক্ষুন্ন হয়ে বলল, 'তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে আগা-গোড়া সমস্তটাই যেন একটা মজার ব্যাপার।'

মুরারিমোহন বললেন, 'মজা ছাড়া কি। খুন না করেও তুমি যদি অমন খুনী আসামীর মত মুখ চুন করে থাকো, আমার হাসি পাবেই। কী এমন হয়েছে বল দেখি। কলা চুরির দায়ে তোমাকে তো আর কেউ ফাঁসি দেবে না। কলা চুরির দায়েও দেবে না, কলাবউ চুরির দায়েও দেবে না। চলি ভাই। দরকার হলেই খবর দিয়ো।'

যিনি ভয় দেখান, তিনিই ভরসা দেন। অদ্ভুত লোক মুরারিমোহন। বন্ধু মহলে শক্ত নার্ভের লোক বলে সুখ্যাতি আছে। কেউ কেউ বলে, নানারকমের দুষ্কর্ম করে নার্ভকে শক্ত করে নিয়েছেন। সেই অপকর্ম শুধু সেক্সঘটিত নয়।

শশাঙ্কের ইচ্ছা করে মুরারিদার মতো অমন বেপরোয়া হতে। মারাত্মক রকমের ভিসাস হতে, ভিলেন হতে মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে শশাঙ্কের। কিন্তু ইচ্ছা করলেই তো তা হওয়া যায় না। সে যে ধাতুতে গড়া, তার মধ্যে শক্ত কিছু নেই। তা পরম নরম, কোমল কমনীয়, ফ্লেক্সিবল। তার সূক্ষ্ম রূপানুভূতি কী করে যে স্থূল আসক্তির সেবাদাসী হল, তা ভেবে পায় না শশাঙ্ক। মাঝে মাঝে লজ্জায় মরে যায়, অনুশোচনায় ছটফট করে। সেই আসক্তি পরম দুর্দৈবের মতো আজ তাকে মিথ্যা মামলার ফাঁসে জড়িয়েছে। এই ফাঁস কেটে কি বেরোতে পারবে শশাঙ্ক? এই ফাঁস তাকে ফাঁসি দেবে না ঠিকই, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির করে তুলবে। স্নায়বিক মৃত্যুই আসলে চরম মৃত্যু। মানের মৃত্যু প্রাণের মৃত্যুর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। শশাঙ্কের মনে হয়, যারা তাকে চেনে, তারা প্রত্যেকে তাকে দেখে মুখ টিপে হাসছে। সামনে দাঁড়িয়ে হো-হো করে হাসছেন শুধু মুরারিদা। বাকি সবাইর চোরা চাউনি, পিছন থেকে ছোরামারা হাসি। ছাত্রেরা হাসছে, সহকর্মীরা হাসছে,

সবাই মজা দেখছে। চোখ বুজলেই উপহাসে, পরিহাসে ভরা কতকগুলি বিকৃত বৈরী মুখ দেখতে পায় শশাঙ্ক। প্রতিটি মুখ অসৌজন্য, অনুদারতা, অবিশ্বাসে ভরা।

মন্দিরার মতিগতির কথা ভেবেও শশাঙ্ক অশান্তি ভোগ করছে। সে কী করবে না করবে, কোর্টে কী বলবে না বলবে, সবই অনিশ্চিত। মুরারিদা অবশ্য হাসতে হাসতেই ভয় দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু শশাঙ্ক জানে, সে ভয় একেবারে অমূলক নয়।

এর মধ্যে মন্দিরাকে দুদিন ফোন করবার চেষ্টা করেছে শশাঙ্ক। পায়নি। একদিন এনগেজড ছিল ফোনটা। আর-একদিন এক ভদ্রলোক ফোন ধরে, শশাঙ্কের পরিচয় নিয়ে বললেন, 'মন্দিরা ব্যস্ত আছে। এখন তাকে ডেকে দেওয়া সম্ভব হবে না।'

নিশ্চয়ই মন্দিরার সেই কাকা। এখন সর্বেসর্বা মুরুব্বি হয়ে বসেছেন। শশাঙ্ক নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছে। কী দরকার ছিল অত ভালো-মানুষিতার? কী দরকার ছিল মেয়েটাকে তার বড়লোক কাকার হাতে গছিয়ে দেবার? এখন কি সেখান থেকে মন্দিরাকে ফের বার করে আনতে পারবে শশাঙ্ক? না কি মন্দিরাই বিশ্বাস করে আর আসতে চাইবে? অথচ শশাঙ্কের এখন মন্দিরাকে চাই-ই।

সেই ট্যানার না চামার লোকটির ফোন নাম্বার শশাঙ্কের মনে থাকে না। গাইড খুলে নাম্বারটা বার করতে যাচ্ছিল, একটি ফোন এল।

মন্দিরাও হতে পারে।

শশাঙ্ক উৎসুক হয়ে রিসিভারটা তুলে ধরল।

'কে?'

'স্যার, আমরা বীরপাড়ার অভ্যুদয় সঙ্ঘ থেকে বলছি।'

'বলুন।'

'আগামী রবিবার আমাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আপনার প্রিসাইড করবার কথা ছিল। আপনি দয়া করে রাজী হয়েছিলেন। কিছু মনে করবেন না স্যার। আমরা সেটা ক্যানসেল করলাম। আমাদের মধ্যে নানা রকমের লোক আছে তো। কেউ কেউ আপত্তি করছে। কিছু মনে করবেন না স্যার।'

'বাঁচালেন।' বলে সশব্দে ফোন রেখে দিল শশাঙ্ক।

কিন্তু বাঁচল কি?

পথের সামান্য একজন তুচ্ছ লোকের হাতেও তার মৃত্যুবাণ আছে, কে জানত?

শশাঙ্ক মনে মনে বলল, 'এখন থেকে এই রকমই হবে।'

ফোনের কাছ থেকে সরে এসে [illegible] গিয়ে শুয়ে পড়ল।

এক অপরিচিত পল্লীর অখ্যাত যুবসমিতির অশ্রদ্ধা তাকে ধরাশায়ী করেছে।

॥ ২৩ ॥

মামলা আরম্ভ হওয়ার পর আসামীর মতো ফরিয়াদীর মনও অশান্তি অস্থিরতায় ভরে উঠেছিল। যে স্ত্রী স্বেচ্ছায় অন্যের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে তার জন্যে কোর্টে গিয়ে মামলা করাটা মিহিরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন কেউ সমর্থন করেনি। বন্ধুরাও মিহিরের এই মূঢ়তাকে নিন্দা করেছে। বিয়ে করার সময় তবু ছোট বোন বিশাখাকে দলে পেয়েছিল মিহির। এখন সেও বেদলী। বউ পালিয়ে গেছে একথা ঢোল পিটিয়ে সবাইকে জানাবার কী মানে হয়? কী লাভ অনর্থক লোক হাসিয়ে?

সবচেয়ে বেশি গালাগাল সহ্য করতে হয়েছে মিহিরকে বাবার কাছে। মিহির আদালতে দরখাস্ত করেছে শুনে, মুকুন্দবাবু তো লাঠি নিয়ে ছেলেকে প্রায় মারতে গিয়েছিলেন, 'হারামজাদার বেটা হারামজাদা! তোর কি কোন আক্কেল-বুদ্ধি হবে না? কোন কাণ্ডজ্ঞান হবে না পাঁঠা? গাঁটের কড়ি খরচ করে বৃথাই তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছি। গাধা একেবারে গাধা।'

পরিচিত কোন জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে মিহিরকে অভিন্ন করে তুলতে বাবা বাকি রাখবেন না, তা সে জানে। বাবাকে তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করবার যথেষ্ট সময় দিয়ে মিহির শান্তভাবে বলেছে, 'আপনি অত রাগ করছেন কেন বাবা?'

মুকুন্দবাবু বলেছিলেন, 'রাগ করব না? প্রথমে আমাদের নিষেধ শুনলিনে। জেনে শুনে একটা নষ্ট মেয়েকে ঘরে আনলি। জাত মান নষ্ট করলি। এখনো গৃহদেবতা শালগ্রাম শিলা আমার বাড়িতে। ভোগের অন্ন রান্না হয়। তুই গ্রাহ্য করলিনে। যাই হোক, ভগবান শেষ পর্যন্ত মুখ চাইলেন।'

মিহির বাধা দিয়ে বলেছিল, 'বাবা!' মুকুন্দবাবু বলেছিলেন, 'আমাকে শেষ করতে দাও।'

'শাপে বর হয়েছে। সে যেখানে যাবার চলে গেছে। উচ্ছন্নে যাক, জাহান্নমে যাক, যেখানে খুশি সেখানে যাক। তুই কেন হন্যে হয়ে তার জন্যে আদালতে যাবি? মামলায় যদি জিতিসই তাতেই বা তোর কী লাভ? যে হাঁড়ি অন্য জাতে ছুঁয়েছে তাতে কি আর দেবতার ভোগের অন্ন রান্না করা যায়?'

মানুষ যে মাটির হাঁড়ি নয়, তার জাত যে অত সহজে যায় না একথা বাবাকে বুঝিয়ে লাভ নেই। অনেকবার বোঝাতে চেষ্টা করেছে মিহির, পারেনি। বাবা তাঁর নিজের কতকগুলি নির্দিষ্ট বিশ্বাস আর সংস্কারের জগতে অচল অনড় হয়ে বাস করছেন। সেখান থেকে তাঁকে আর নড়ানো যাবে না।

বাবা তাকে বার বার শাসিয়েছেন, 'যা, উকিলের কাছে গিয়ে বল, মামলা তুলে নেবার জন্যে ফের একখানা দরখাস্ত করুক। আক্কেলসেলামী যা গেছে, গেছে। সে টাকা আমি দেব। কিন্তু তুমি গোঁয়ারের মত যা খুশি তাই করবে তা আমি

হতে দেব না। ভদ্রলোকের বাড়ির একটা আব্রু আছে, মান সম্মান আছে। আমারও সোমত্ত মেয়ে আছে ঘরে। দু'দিন বাদে তার বিয়ে দিতে হবে। তুমি ভেবেছ কি? তোমার খেয়াল-খুশিমত চললেই আমরা সব উদ্ধার হয়ে যাব?

মিহির এসব কথার কোন জবাব দেয়নি। নিঃশব্দে বাবার সামনে থেকে সরে এসেছে। খোঁচা খেয়ে চুপ করে থাকবার অভ্যাস তার আছে। আত্মীয় বন্ধুরা বলে, মিহির ভারি ধৈর্যশীল। তার যথেষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা। বলে আর আড়ালে গিয়ে হয়তো হাসে। অনুকম্পা করে। কারণ মিহির জানে, মাটির মতো যে সহ্য করে, লোকে তাকে বীর মনে করে না, পুরুষই মনে করে না, বীরপুরুষ তো দূরের কথা। এ সমাজে—এ সমাজে কেন, সব সমাজেই মানুষ পৌরুষের সঙ্গে দ্রোহ আর বিদ্রোহকে অভিন্ন করে দেখে। আঘাত করার মধ্যে পৌরুষ, আঘাত সহ্য করার মধ্যে নয়। সহ্য করবে নারী, সহ্য করবে পৃথিবী। পুরুষ ঝড় হয়ে বজ্র হয়ে তার ওপর ভেঙে পড়বে। মিহির তা জানে। তার স্বভাবের মৃদুতা, সহিষ্ণুতা, ধীরতাকে অনেকেই যে পৌরুষের ক্ষীণতা বলে মনে করে, তা তার বুঝতে বাকী নেই। মন্দিরাও হয়তো তাই মনে করেছে। মিহির ভাবে, 'সে আমার মধ্যে দুর্ধর্ষ, দুর্বার হিংস্র অত্যাচারী পুরুষের রূপ দেখতে পায়নি। তাই সে আমাকে অমন করে অসম্মানিত অপদস্ত করে চলে যেতে পেরেছে। সে আমার চোখে ধুলো, মুখে কালি ছিটিয়ে দিয়ে গেছে। আমি এর শোধ নেব।'

শোধ যে নেবে সে কথা প্রথম দিন থেকেই ভেবেছিল মিহির। কিন্তু প্রতিশোধের পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। পথের ইশারা দেখিয়ে দিলেন মন্দিরার কাকা নিরঞ্জন চ্যাটার্জী। তিনি বললেন, 'আপনি কোর্টে গেলেই পারেন।'

অবশ্য মিহিরের বাবা ওঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেননি। বাড়িতে পেয়ে অপমানই করেছিলেন। নিরঞ্জনবাবু মিহিরকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে সেই অপমানের শোধ তুললেন। বাবার মত স্থূল রূঢ় ভাষা তিনি বলতে জানেন না, বললেনও না। কিন্তু মুখে হাসি টেনে ধীর শান্ত ভাবে তিনি যে ক'টি কথা বললেন তার জ্বালা কম নয়।

মিহির ভাবল, 'আশ্চর্য, সত্যিই তো একটি সহজ সরল পথ রয়ে গেছে। এ পথটির কথা তো তার মনে হয়নি। থানা-পুলিস আইন-আদালত অবশ্য সভ্য জীবনেরই অঙ্গ। তবু মানুষ চট করে ওর মধ্যে যেতে চায় না। মিহির এর আগে থানায় একবারও যায়নি, তবে কোর্টে দু-একবার তাকে যেতে হয়েছে। জমির সীমানা নিয়ে বাবা একবার দেওয়ানী মামলা করেছিলেন প্রতিবেশীর সঙ্গে। উকিলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কি খবর দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে মিহির আদালতের আঙিনায় যাতায়াত করেছে। তখন সে কলেজের ছাত্র। সে স্মৃতি মিহিরের কাছে প্রীতিকর ছিল না। [illegible] আর যাওয়ার কোন উপলক্ষ হয়নি।

এবার ঘটল। আদালতের পথ দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই মিহির অবশ্য সেদিকে ছোটেনি। কলকাতায় কয়েকদিন কাটিয়ে মীরপুরের সেই কলিয়ারীতেই ফিরে গিয়েছে। অফিসে জয়েন করেছে। রুটিনবাঁধা কাজ করেছে। আর মাঝে মাঝে প্রতীক্ষা করেছে যদি ওপক্ষ থেকে কেউ আসে, এসে ক্ষমা চায়। কিন্তু কেউ আসেনি। মিহির ক্ষমা করবার জন্যে তৈরী হয়ে বসে আছে। কিন্তু তার কাছে ক্ষমা চাইবার কেউ নেই। মিহির ভালোবাসার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। কিন্তু তার ভালোবাসা নেবার কেউ নেই। সে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই যেন তাকে ভুলে গেছে। শুধু মা মাঝে মাঝে বিয়ের তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখছেন। তিনি নাকি এরই মধ্যে বিশাখাকে নিয়ে মেয়ে দেখতে শুরু করেছেন। মিহির তার জবাবে পরিহাস করে লিখেছিল, 'কী হবে মা ফের বিয়ে করে? যাকে বিয়ে করে আনব সেও যদি পালায়?'

মা রাগ করে লিখেছিলেন, 'ছি ছি ছি। সব মেয়েই কি সমান? তা ছাড়া তুই পুরুষ মানুষ নয়? ব্যাটাছেলে নয়? অত ভয় কিসের তোর?'

তা ঠিক। পৌরুষের বিন্দুমাত্র পরিচয়ও মিহির দিতে পারেনি। তাই সে সরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাকে সরিয়ে দিয়েছে। হয়তো মন্দিরার এখন সুবিধাই হয়েছে। শশাঙ্কের সঙ্গে মেলামেশায় তার আর কোন বাধা নেই। যে উদারচরিত কাকা একজন পেয়েছে মন্দিরা, হয়তো নিজের হাতেই তিনি ওদের সুযোগ করে দিচ্ছেন। যাঁরা ধনী, সমাজে যাঁদের সম্পত্তি প্রতিপত্তি আছে, চলতি মরালকোডের ধার তাঁরা ধারেন না। শহরের বড়লোকের বড় ঘরের গোপন কাহিনী মাঝে মাঝে যে মিহিরের কানে আসেনি তা নয়। কিন্তু সে কান পাতেনি। এখন পূর্বশ্রুত অনেক কথাই মিহিরের মনে পড়তে শুরু করেছে। সামাজিক বিধিনিষেধ শুধু অল্পবিত্তদের জন্যে। যাঁরা বিত্তবান তাঁরা এক হাতে বিধি গড়েন আর এক হাতে ভাঙেন। অন্যের বেলায় যাঁরা কড়া, নিজেদের বেলায় তাঁদের শৈথিল্যের শেষ নেই। এই সমাজের রীতিনীতি, তার স্তরভেদের সঙ্গে সঙ্গে প্রকারভেদের কথা মিহির সব জানে। কিছুই তার অনুমানের বাইরে নয়। এই নির্জনবাস তার অনুমান শক্তিকে যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। দুঃস্বপ্নের জন্যে ঘুমের অপেক্ষা করতে হয় না। মিহির বিনা ঘুমেই দিবাস্বপ্ন দেখে। দেখতে পায়, সন্ধ্যার পর শশাঙ্ক আর মন্দিরা গাড়িতে করে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ তাদের বাধা দেবার নেই। খোলা মাঠ আছে, মাঠের খোলা হাওয়া আছে। বড় বড় হোটেলের দোরগুলি তাদের কাছে উন্মুক্ত। মন্দিরাকে কিছুই বদলাতে হয়নি। হয়তো হাতে শাঁখা চুড়ি তেমনি আছে, সিঁথিতে সিঁদুর তেমনি আছে, মিহিরের পদবীটি পর্যন্ত সে আজও অসঙ্গতভাবে নিজের নামের সঙ্গে গেঁথে রেখেছে, শুধু মিহির তার পাশে নেই। তার বদলে অন্য পুরুষ তার

কটি জড়িয়ে ধরেছে। অসহ্য। দুঃসহ। এর শোধ যদি না নিতে পারে, মিহির পুরুষ নামের অযোগ্য।

সেদিন কুলীধাওড়ায় এক কাণ্ড হয়ে গেল। সেও একটি নারী নিয়ে দুজনের মধ্যে মারামারি। ঝুমরুর বউয়ের হাত ধরে নাকি মংরু টান দিয়েছিল, ঝুমরু ছুরি মেরে দিয়েছে।

প্রতিবেশী পরেশবাবু এসে সবিস্তারে সেই কাহিনী বর্ণনা করলেন। তারপর ঝুমরুর তারিফ করে বললেন, 'ওরা পারে মশাই, ওরাই পারে। অন্যায়ের শোধ নিতে ওরা পিছ-পা হয় না। আমরা ভদ্রলোকেরা কিল খেয়ে কিল চুরি করি। আর ওরা কিলের বদলে লাথি ঘুষি চালায়। শুনেছি মংরুর জখম নাকি খুব গুরুতর। প্রাণে যদি বেঁচেও যায়, পরের বউয়ের দিকে হাত বাড়াবার সাহস তার আর কোনদিন হবে না।'

পরেশবাবু কী যে বলতে চান তা বুঝতে বাকি থাকেনি মিহিরের।

হাত তো মিহিরেরও নিশপিশ করে। কিন্তু ঝুমরু যা করেছে মিহির তা করতে পারে কই!

মিহির যা আশঙ্কা করেছিল তা হয়নি। দলে দলে কলিয়ারীর লোক এসে তার স্ত্রীর খবর জানতে চায়নি। কারণ, সবাই সব জানে। আর জানবার পর সবাই মিহিরকে এড়িয়ে চলে। একটি অশক্ত দুর্বল পুরুষকে দূর থেকে সবাই অনুকম্পা করে। যে অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে জানে না, যে সমস্ত অবিচার মুখ বুজে সহ্য করে, তার দিকে আড়াল থেকে নিশ্চয়ই সবাই মুখ টিপে হাসে।

ম্যানেজার মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে মিহিরবাবু?'

মিহির অবাক হয়ে বলে, 'না, আমি তো ভালোই আছি।'

ম্যানেজার সহানুভূতির সঙ্গে বলেন, 'আপনার মুখ দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। ইচ্ছে করলে আপনি আরো কিছুদিন ছুটি নিতে পারতেন।'

আর কেউ বড় একটা মিহিরের বাসায় আসে না। কিন্তু প্রবীর আসে। মাঝে মাঝে হই-চই করে। চাকরকে ধমকায়। চা করবার ফরমায়েস করে। মাঝে মাঝে মিহিরকে সুদ্ধ টানাটানি করে, 'চলুন মিহিরদা, বেড়িয়ে আসি আসানসোল থেকে। চলুন না, একটা সিনেমা দেখে আসি। অনেকদিন ছবি-টবি দেখিনি।'

'তুমি যাও প্রবীর।'

'কেন, আপনি যাবেন না?'

'না।'

'একা একা কী করবেন ঘরে বসে?'

'কিছুই করব না, শুধু বসে থাকব।'

'তা হলে আমিও বসে থাকি।'

কিন্তু চুপচাপ বেশিক্ষণ মিহিরের পাশে বসে থাকবার মত ছেলে প্রবীর নয়।

ফের কথা বলে। সহানুভূতি আর সমবেদনার সুরে বলে, 'মিহিরদা, আপনি এভাবে একা একা বেশিদিন থাকলে পাগল হয়ে যাবেন।'

'পাগল হয়ে যাব? কেন, পাগলামির কি লক্ষণ দেখলে আমার মধ্যে?'

প্রবীর সে কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে বলেছিল, 'আপনি যা হয় একটা কিছু করুন। হয় কিছুদিনের জন্যে আপনার মা আর বোনকে এখানে আনিয়ে নিন। আর না হয় এই কোয়ার্টার ছেড়ে দিন। একা একা একটা কোয়ার্টার নিয়ে থাকার কোন মানে হয় না। তার চেয়ে চলুন না আমাদের মেসে।'

'তোমাদের মেসে? তার চেয়ে যদি এই কলিয়ারী ছেড়েই চলে যাই?'

প্রবীর বলেছিল, 'আমি সে কথাও মাঝে মাঝে ভাবি মিহিরদা। যদিও আমরা আপনাকে তাহলে খুবই মিস করব, তবু এক হিসেবে এই পরিবেশ ছেড়ে আপনার পক্ষে অন্য কোথাও চাকরি নেওয়া মন্দ নয়।'

মিহির হেসে বলেছিল, 'মানে পালিয়ে যাব? তুমি কি আমাকে অতই ভীরু অতই দুর্বল বলে মনে কর প্রবীর? আমি পালিয়ে যাওয়ার মানুষ নই। যারা পালায় তারা পালিয়েছে। আমি কেন পালাতে যাব? আমি তো কোন অন্যায় করিনি।'

প্রবীর বলেছিল, 'নিশ্চয়ই করেননি। আপনার সেই জোর আছে, সেই জেদ আছে বলেই তো আপনাকে এত ভালো লাগে। কিন্তু এবার কলকাতা থেকে ফিরে এসে আপনি যেন বদলে গেছেন। আপনি কেবল ব্রুড করছেন আর ব্রুড করছেন। মাঝে মাঝে ভয় হয়, আপনি কোন একটা অ্যাকসিডেন্ট-ট্যাকসিডেন্ট না ঘটিয়ে বসেন। এমন আনমাইন্ডফুল হয়ে পড়েন আপনি। এর চেয়ে যা হয় বরং একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলুন।'

মিহির একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'হেস্তনেস্ত! ঠিক বলেছ প্রবীর। হেস্তনেস্ত একটা করতে হবে। তোমার কোন এক কাজিন যেন আছেন—পুলিসকোর্টে প্র্যাকটিস করেন, তুমি বলছিলে সেদিন।'

'ও! যতীনদা! আমার মাসতুতো ভাই। সম্পর্কে দাদা। কিন্তু বয়সে প্রায় পঁচিশ বছরের বড়। কিন্তু মিহিরদা, উকিলের খবরে আপনার কী হবে?'

মিহির বলল, 'সে তোমাকে পরে বলব। তুমি তাঁর ঠিকানাটা আমাকে দিয়ো তো।'

প্রবীর বলল, 'শুধু ঠিকানা কেন। আমি আপনাকে সঙ্গে করেই তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু ওসবের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই মিহিরদা। ওসব মামলা মোকদ্দমার মধ্যে যাওয়া ভদ্রলোকের কাজ নয়। আপনি ওসব দিকে যাবেন না।'

'তবে যে হেস্তনেস্ত করার কথা বললে।'

'মন থেকে ঝেড়েমুছে ফেলে দিন। মনে করুন একটা দুর্ঘটনা। মানুষের জীবনে কত দুর্ঘটনাই তো ঘটে।'

মিহির হেসে বলল, 'তা ঠিক। হাত কাটা যায়, পা কাটা যায়। এও তেমনি এক অঙ্গচ্ছেদ। তাই না?'

প্রবীর বলল, 'না, তাও না। মন্দিরা বউদি কোনদিনই আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত ছিলেন না। একেবারেই বাইরের ঘরের একটা আসবাবের মত তিনি কাটিয়ে গেছেন। তাই তাঁর বিচ্ছেদে আপনার কষ্ট হওয়া উচিত নয়। আপনার গ্রাহ্য করাই উচিত নয় ওসব।'

গ্রাহ্য মিহির করে না। সে যেমন ছিল তেমনি আছে। নিত্য খাদে নেমে কাজ করছে। এর মধ্যে ফার্স্ট ক্লাস ম্যানেজারশিপের জন্যে পরীক্ষাও দিয়েছে। একেবারে খারাপ দেয়নি। বাইরে থেকে যত আঘাতই আসুক, মনের ভারসাম্য নষ্ট হতে দেয়নি মিহির।

কিন্তু প্রতিকারের জন্যে একটা কিছু তার করা দরকার। সে বড় বেশি সহনশীলতার অনুশীলন করেছে। এই সহিষ্ণুতা মানুষকে দুর্বল করে। ধীরে ধীরে অন্যের চোখে অশ্রদ্ধেয় করে তোলে। ক্রমে ক্রমে এই সহিষ্ণুতা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি কমিয়ে দেয়। ব্যক্তিগত জীবনেই হোক, আর সামাজিক রাজনৈতিক জীবনেই হোক, সহিষ্ণুতাই সব সময় বড় কথা নয়। মিহির ছেলেবেলা থেকে তরুর মত সহিষ্ণুতার চর্চা করে যে সুনাম কিনেছে তা আসলে সুনাম নয়। যেখানে আবর্জনা দেখেছে মিহির সেখান থেকে সরে গেছে। দু হাতে সেই আবর্জনাকে সরিয়ে দেয়নি। অশ্রাব্য কথা শুনলে নিজের কানে আঙুল দিয়েছে। অশ্লীল কথা যে বলে তার মুখ বন্ধ করেনি। দুর্গন্ধে নাকে রুমাল চেপেছে, দূষিত বায়ুর উৎসমূল নষ্ট করবার জন্যে হাত তোলেনি। কলেজে পড়বার সময় মিহিরের দুখানা বই এক বন্ধু চুরি করে নিয়েছিল, মিহির তা জেনেও লজ্জায় বলতে পারেনি। ফলে সেই বন্ধুত্ব রয়েছে। কিন্তু মনে মনে সেই বন্ধুর সম্বন্ধে হীন ধারণাও চিরদিন জীইয়ে রেখেছে মিহির। তাতে নিজের ক্ষতি হয়েছে, সেই বন্ধুরও উপকার হয়নি। সেই বন্ধু আরো অনেক বন্ধুর বই চুরি করে আলমারি সাজিয়েছে। সহিষ্ণুতা সব সময় মানুষকে বড় করে না, বরং বেশির ভাগ সময় ক্ষুদ্রতর করে তোলে। সৌজন্যে শিষ্টাচারে সংযমে পরিচিত মহলে অজাতশত্রু বলে মিহিরের সুনাম আছে। কিন্তু আজ তার মনে হল, এর চেয়ে দুর্নামের কিছু থাকতে পারে না। সে কি কোন দুরাচারীকে আঘাত করেছে যে তার শত্রু থাকবে? সে কি পৃথিবীতে সামান্যতম অন্যায়েরও প্রতিরোধ করেছে যে তার শত্রু থাকবে? কোন অবিচারের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে যে তার শত্রু থাকবে? মিহির যুদ্ধ না করেই যুধিষ্ঠির। তার এই ধীরতা

স্থিরতা শান্তিপ্রিয়তার কোন মানে হয় না। যে বীর, যে নির্ভীক যোদ্ধা সে অজাতশত্রু নয়, সে শত্রুপুরীর নাগরিক। মিহির নিজের স্বভাবকে শুধু ধিক্কার দিয়েই চুপ করে রইল না, স্বভাবকে অতিক্রম করবারও পণ করল।

প্রথমে অবশ্য সেপারেশনই তার উদ্দেশ্য ছিল। নিজের নামের সঙ্গে ব্যভিচারিণী স্ত্রীর নাম সে যুক্ত রাখতে চায় না। সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ করে সে মুক্ত হতে চায়।

কিন্তু কলকাতায় গিয়ে উকিলের সঙ্গে আলাপ করে তার মত ঘুরে গেল।

প্রবীরের কাছ থেকে এসেছে শুনে এডভোকেট যতীন মজুমদার তাকে বেশ আপ্যায়ন করে বসালেন। চা খেতে দিলেন, সিগারেট অফার করলেন। মিহির খায় না শুনে হেসে বললেন, 'আপনি দেখছি একেবারেই ভালো ছেলে।'

কিন্তু নিজের ভালোত্বের ওপর মিহিরের ঘৃণা ধরে গেছে।

'বলুন, 'আপনার জন্যে কী করতে পারি।'

বাংলা ভাষায় এই বিলিতি ভঙ্গি মিহির তেমন পছন্দ করে না। কিন্তু নিজের পছন্দটাই আজ তার বড় অপছন্দের বস্তু হয়ে উঠেছে।

বেশ বড়সড় লম্বাচওড়া চেহারা এডভোকেটের। বয়সে প্রৌঢ়ত্ব অর্জন করেছেন। চুলে ঈষৎ পক্কতা। সুদৃশ্য কাঁচের আলমারিতে আইনের বই। দামি চামড়ায় বাঁধানো। সোনার জলে নাম লেখা। ঘরের আসবাবপত্রে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং সাফল্যের চিহ্ন পরিস্ফুট। তাঁর সাফল্যে এই মুহূর্তে ঈর্ষান্বিত হল না মিহির, বরং আশ্বস্ত হল। বিপদে পড়ে সে যাঁর সহায়তা চাইছে তিনি বহুগুণে ব্যক্তিত্বশালী, শক্তিশালী, সম্পদশালীও। শুধু চেহারায় নয়, ধরণ-ধারণেও কিছু স্থূলতা আছে। কিন্তু মিহিরের এখন ধারণা, স্থূলতা রূঢ়তা কর্কশতার মধ্যেই পৌরুষ। তাতেই শক্তির অধিষ্ঠান। পৃথিবীর সমস্ত চারুতা, মৃদুতা, নমনীয়তা দুর্বলতারই নামান্তর।

'আপনি কী চান বলুন? শুধু কি সেপারেশন চান?' এডভোকেট মোটা চুরুট ধরালেন।

চুরুটের গন্ধ মিহিরের সাধারণত ভালো লাগে না। কিন্তু আজ লাগল। আজ মিহির সম্পূর্ণ অন্য মিহির হবার সচেতন সাধনায় নিযুক্ত। •

মিহির বলল,—যেন এডভোকেটই তাকে দিয়ে বলালেন, 'না, শুধু সেপারেশনই চাই না। যে অন্যায় করেছে তার শাস্তি চাই।'

এডভোকেট হেসে বললেন, 'তাই বলুন। তাই তো হওয়া উচিত। আমরা তা দিতে পারিনে বলে নিজেরাই শাস্তি পাই। তখন সেই অন্যায়কারী হই নিজে।'

এডভোকেটের কণ্ঠে মিহির নিজের মনের কথার প্রতিধ্বনি শুনল।

'ব্যাপারটা আমার কাছে খোলাখুলিভাবে বলুন। দেখুন, গীর্জায় কি মন্দিরে পুরোপুরি মনের কথা মানুষের না বললেও চলে। দেবতারা তা

আন্দাজ করে নেন। কিন্তু নিজের উকিল ডাক্তারের কাছে সব বলা চাই। ডাক্তার যদি রোগের বিবরণ না শোনেন, তিনি চিকিৎসা করতে পারেন না। উকিল যদি ক্লায়েন্টের full co-operation না পান, তাঁর পক্ষে মামলা চালানো কঠিন হয়ে পড়ে।'

সব কথা বলবে বলেই তো মিহির একা এসেছে। সব বলবে বলেই তো মিহির কোন পরিচিত উকিলের কাছে আসেনি। নইলে চেনাজানা আরো তো কেউ কেউ ছিলেন।

মিহির যতটা পারে বলল। যা পারে না তাও উকিল তাকে দিয়ে বলিয়ে নিলেন।

'অ্যাডালটারির চার্জটা না এনে যদি অন্য কিছু—'

মিহির বলেছিল।

'অন্য কিছু কী।' এডভোকেট হাসলেন, 'outraging modesty—মানে শ্লীলতাহানি? তিনশ' ছাপান্ন ধারা। তাতে কি সুবিধে হবে ভেবে দেখুন। লঘু অপরাধে লঘুতর দণ্ড। তাছাড়া আপনার স্ত্রী যদি আপনার পক্ষে থাকতেন সে কথা উঠতে পারত। কিন্তু যা অবস্থা দেখছি তাতে হয় ফোরনাইনটিসেভেন, না হলে কিছুই না।'

কিছু না করবার জন্যে তো মিহির আসেনি। কিছু করবে বলেই এসেছে।

মিঃ মজুমদার বললেন, 'তাহলে পিটিসনের ড্রাফট আমি করে রাখব। আমার ক্লার্কের কাছে থাকবে। কালই ইচ্ছা করলে আপনি দেখে যেতে পারবেন। কি বলেন তো আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। আপনার অত কষ্ট করবার দরকার কি? দরখাস্তখানা ছেড়ে দিয়ে আপনি নিজের জায়গায় চলে যাবেন। নিশ্চিন্ত মনে কাজকর্ম করবেন। কিছু চিন্তা করবেন না। এসব ব্যাপারে কোন মাথা ঘামাতে হবে না আপনার। ঘামাবার জন্যে আমাদের মাথা আছে। আপনারা খনি থেকে কয়লা তুলবেন, মণিমাণিক্য তুলবেন। আর আপনাদের জন্যে ভেবে ভেবে আমরা মাথার চুল পাকাব। এই পারস্পরিক সহযোগিতা, নির্ভরতার নামই তো সমাজ। কী বলুন?'

কী যে বলবে মিহির চট করে কিছু ভেবে পেল না।

এডভোকেট বললেন, 'হ্যাঁ, ঘটনাস্থলটা কোথায়? মানে অ্যাডালটারিটা কোথায় ঘটেছিল তা আপনাকে বলতে হবে।'

মিহির বললে, 'তা কী করে বলব? মীরপুর থেকে পালিয়ে এসেছে—'

এডভোকেট হেসে বললেন, 'পালিয়ে আসাটাই যথেষ্ট নয়। পালিয়ে এসে কোথায় কী করেছে তা আপনাকে বলতে হবে। আইন বড় স্থূল। একেবারে সুনির্দিষ্ট বস্তু চায়। কাব্যসাহিত্যের মত আভাস ইঙ্গিতের ধার ধারে না। ব্যাপারটা যদি কলিয়ারীতে ঘটে থাকে তাহলে কেস হবে আসানসোল কোর্টে। আপনার কি তাতে সুবিধে হবে?'

মিহির বলল, 'না না। কলকাতাতেই—'

'কলকাতার কোথায় তাও আপনাকে নির্দিষ্ট করে বলতে হবে। আসামীর বাড়িতে বলাই ভালো। নাকি আর কোথাও? যদি তেমন কোন সম্ভাব্য জায়গার নাম আপনার মনে আসে—'

মিহির বলল, 'না না, তাহলে বাড়িতেই করুন।'

'হ্যাঁ, বাড়িতেই ভালো। প্রমাণ করা সহজ হবে। খুব সহজ নয়। তবু সাক্ষীটাক্ষী জোগাড়ের চেষ্টায় থাকতে হবে আর কি। দু-একটা চাকর বামুন কি পাওয়া যাবে না? কি আশেপাশের দু-একজন পাড়াপড়শী? আর ইতিমধ্যে আপনার কাছে যেসব ম্যাটেরিয়াল আছে, চিঠি ডায়েরি ফোটো যাবতীয় যা কিছু আছে, সব আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। না না, লজ্জার কিছু নেই। সব দিতে হবে। আমাকে সব পড়ে দেখতে হবে। তবে তো আমি মামলাটা দাঁড় করাতে পারব। এও এক লিটারেচার মিহিরবাবু। হাতের কাছে শুধু ম্যাটেরিয়াল পেলেই চলবে না। উকিলের উদ্ভাবনী প্রতিভা থাকা চাই। সেই প্রতিভার স্ফুরণে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।'

মিহির বলল, 'কিন্তু আমি কোন মিথ্যা কথা বলতে চাইনে।'

এডভোকেট বললেন, 'আপনাকে মিথ্যে বলতে কে বলে? কিন্তু সত্যকে শুধু সূত্রাকারে ধরে রাখলেই চলবে না। তার সম্প্রসারণ চাই। বিশদ ব্যাখ্যা চাই। সত্যকে প্রমাণ করা চাই, প্রয়োগ করা চাই। সেইজন্যেই এত আড়ম্বর আয়োজন। ধর্মকেও প্রচার করতে হয় মিহিরবাবু। মনের ভাবকে ভাষায় সাজিয়ে প্রকাশ করতে হয়।'

উকিলকে কী দিতে হবে জিজ্ঞাসা করেছিল মিহির। মিঃ মজুমদার পাশের ঘর থেকে তাঁর মুহুরীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। প্রিয়লালবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলে তিনি ভিতরে চলে গিয়েছিলেন। তিনি হেসে বলেছিলেন, 'বাবু তো চৌত্রিশ টাকার কমে দাঁড়ান না। তবে রিয়াতমুরোদ সব জায়গাতেই আছে। বিশেষ করে আপনি ওঁর আত্মীয়ের কাছ থেকে এসেছেন। খরচটরচ বাবদ আপনি যা পারেন এখন রেখে যান। আপনার নামেই সব জমা থাকবে। যখনই চাইবেন আপনি হিসেব পাবেন। এ তো আর দু-চার দিনের ব্যাপার নয়।'

এক শ' টাকার একখানা নোট জমা রেখে এসেছিল মিহির। আসতে আসতে ভেবেছিল সত্যিই আর এগোবে কিনা। এই ঝামেলাঝঞ্ঝি সত্য-মিথ্যা প্রমাণ-অপ্রমাণের ভিতর না গিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়ে আসবে কিনা মিহির সেই প্রথম দিনই ভেবেছিল, আজও ভাবছে।

কিন্তু কোন কাজে হাত দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাত গুটিয়ে আনা মিহিরের স্বভাব নয়। যুদ্ধে যখন নেমেছে সে শেষ পর্যন্ত যুঝে দেখবে, বুঝে দেখবে। তার আগে থামবে না।

আত্মীয়স্বজনরা তাকে বেকুব বলে গাল দিচ্ছেন। বন্ধুরা তার এই কাজের

কোন অর্থ খ্ঁজে পাচ্ছে না। যাঁরা এ ব্যাপারে বিজ্ঞ অভিজ্ঞ তাঁরা বলছেন মিছামিছি কতকগ্‌লি টাকা নষ্ট। মিহিরের জিতবার কোন সম্ভাবনাই নেই। অ্যাডালটারি করা সহজ, প্রমাণ করা কঠিন।

মিহির যে সে কথা না জানে তা নয়। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদে আদালতে গিয়ে বাদী হওয়া ছাড়া সে আর কীইবা করতে পারত? মিহির জানে, এই মামলায় তার জয়ের সম্ভাবনা কম। সব সময় ধর্মের জয় হয় না। কিন্তু ধর্মের জন্যে যুদ্ধ করতে হয়।

হার-জিত অনিশ্চিত। কিন্তু মিহির ওই খ্যাতনামা সম্মানিত অধ্যাপককে যে আদালতে দাঁড় করাতে পেরেছে, তার মুখোশ খ্লে দিতে পেরেছে, তাই কি কম?

সেদিন কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসবার সময় এক অপরিচিত ভদ্রলোক মিহিরকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, 'বেশ করেছেন মশাই। উনি যে কতজনের সর্বনাশ করেছেন তার ঠিক নেই। সবাই তো প্রতিকার করতে পারে না, ইচ্ছা থাকলেও পারে না। সাহসে কুলায় না, সামর্থ্যে কুলায় না। আপনি পেরেছেন। দেখবেন, অনেকে খুশি হবে, অনেকে আপনাকে দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করবে।'

ওই ক'টি কথায় যেন নতুন বল পেয়েছে মিহির। সে শুধু ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিচ্ছে না। সমাজের একজন দুষ্কৃতকারীকে চিনিয়ে দিচ্ছে। তার শাস্তি হোক আর না হোক, সে যে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য একথা বলতে পারাটাই কি কম? সুবিচার হবে কি না সে কথা বিচারক জানেন, কিন্তু মিহির যদি অসংকোচে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে সেখানেই তার যোগ্যতা। মিহির তার কর্তব্য করে যাবে। কেউ যদি তার পক্ষে নাও থাকে সে একাই লড়বে। ওই একজন উকিল, একজন মুহুরী আর গুটি-কতক সাক্ষী এই হবে তার ধর্মসেনা।

মিহিরের পক্ষে অবশ্য অনেকেই আছে। পুরোহিত ধোপা নাপিত থেকে শুরু করে বাসর-জাগা মেয়েরা পর্যন্ত সাক্ষ্য দিতে বাধ্য—মন্দিরা তার স্ত্রী। কলিয়ারীতে যারা তাকে চেনে, তারা সাক্ষী হয়ে বলবে, মন্দিরা তার স্ত্রী। অনধিকারী অনাচারী শশাঙ্কের বিপক্ষে আরো অনেক সাক্ষী মিহির সংগ্রহ করতে পারবে। দেশের আইন ধর্ম নীতি সবই মিহিরের পক্ষে। বিপক্ষে শুধু একটি মেয়ের হৃদয়। না, হৃদয় নয়—মিহির তাকে হৃদয় বলে না। ওই যুক্তিহীন, নীতিহীন, সৌষ্ঠব-শোভনতাহীন স্বার্থপর মোহান্ধতা ভালো-বাসা নামের অযোগ্য।

মিহিরের সংগ্রাম প্রেমের বিরুদ্ধে নয়, অনুচিত অকল্যাণকর বাসনা-কামনার বিরুদ্ধে। জয়ী হোক আর না হোক, শত্রুকে ভূপাতিত করতে পারুক আর না পারুক, তাকে আঘাত করতে পারার মধ্যেই পৌরুষ।

সমস্ত প্রাতক্‌লতার মধ্যে নিজের স্বভাবের বৈরিতা সত্ত্বেও মিহির সেই পৌরুষের প্রমাণ দেবে।

খাদের মধ্যে অন্ধকার। খাদের উপরেও আজ আর আলো নেই। শূন্য কর্মক্লান্ত দেহে, নিরাশাক্লিষ্ট মনে নিজের এই সংকল্পটুকু ছাড়া মিহিরের আর সঙ্গী কে আছে?

এত তাড়াতাড়ি এমন একটা কাণ্ড যে মিহির করতে পারবে তা মন্দিরাও ভাবেনি। সে যে এই ব্যাপারটাকে একেবারে কোর্ট পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে, তা যেন ধারণাতীত। মন্দিরা যে অভাবিত কাণ্ড কম করেনি সে কথা তার মনে পড়ল না। যত রাগ গিয়ে পড়ল মিহিরের ওপর। ওই মানুষটিকে ওপর থেকে সবাই যেমন শান্ত নিরীহ নির্বিরোধ বলে ভাবে আসলে সে তা নয়। তার মধ্যেও অসহিষ্ণুতা আছে, প্রতিশোধের প্রবৃত্তি আছে এ-কথা সে কাউকে বিশ্বাস করাতে পারেনি। এখন তো সবাইকে বিশ্বাস করতে হল? অনর্থক একটা মিথ্যা মামলা মিহির শশাঙ্ক আর তার নামে শুরু করে দিল, সত্যাসত্য একবার যাচাই করতে পর্যন্ত এল না। সত্যি সত্যিই তো শশাঙ্ক আর তার মধ্যে কিছু ঘটেনি। মন্দিরা স্বামীর ঘর থেকে পালিয়ে এসেছে এই মাত্র। পালিয়ে না এসে কী করবে? পালিয়ে না এলে কি সহজভাবে আসতে পারত? আসতে দিত মিহির? কিন্তু এসেই বা কী হল? এসেও তো সে যা চেয়েছিল তা পেল না। মিছামিছি দুর্নামই সার হল। দুর্নাম নিন্দা আর কলঙ্ক। লাঞ্ছনা, তিরস্কারের কিছুই আর বাকি নেই। মামলা শুরু হয়েছে এই খবর পেয়ে বাবা আর-একদিন এসেছিলেন। কথা বলেননি। বোধ হয় ঘৃণায় বলতে পারেননি। রাগে মুখ থেকে কথা বেরোয়নি। বাবার মাঝে-মাঝে অমন হয়। বেশি রাগ হয়ে গেলে কথা বলতে পারেন না। ছেলেবেলাতও কত দেখেছে মন্দিরা। রাগ হয়ে গেলে বাবার কথা বন্ধ। কিন্তু তখন শুধু রাগই করতেন না, কোলে পিঠে নিয়ে আদরও করেছেন। এখন শুধুই রাগ। শুধুই শাসন। এখন আর কেউ তাকে ক্ষমা করবে না। কেউ না। বাবা সেদিন এসেছিলেন। এসে কাকাকে বলছিলেন, 'আমার হাতে যদি বেত থাকত নিরঞ্জন, বেত মেরে ওর সর্বাঙ্গে আমি—'

বেত মারবার দরকার হয়নি। তার আগেই সর্বাঙ্গে দাগ হয়ে গেছে মন্দিরার। বাবার কথাগুলি কেটে কেটে মনের মধ্যে বসেছে। শরীরের ঘা শুকায়, মনের ঘা কিছুতেই শুকাতে চায় না। আগে হাতের মারকেই সবচেয়ে বেশি ভয় করত মন্দিরা। বাবার লাঠির ভয় ছিল, বেতের ভয় ছিল। এমন কি চড়-চাপড়কেই কি কম ভয় করত? বেশ কড়া হাত বাবার। কিন্তু এখন মনে হয়, শরীরের কষ্টকে যেন আর ভয় করে না মন্দিরা। শুধু মনের একটু শান্তির জন্যে শরীরের সব কষ্টই যেন সে সহ্য করতে পারে। মন? মীনাক্ষী

সেদিনও তাকে লিখেছে, 'তোর মন বলে কিছু নেই, হৃদয় বলে কিছু নেই। সুখ বলতে তুই শুধু শরীরের সুখ চাস। সে সুখ যে পাসনি ভালোই হয়েছে। উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে তোর। আরো শাস্তি হোক। আমি তাই চাই। তবে যদি তোর মতিগতি ফেরে।'

কিন্তু দেহের সুখ চাওয়ার শাস্তি শুধু দেহের ওপর দিয়েই কেন গেল না মন্দিরার? কেন সঙ্গে সঙ্গে মনকেও এমন করে জড়িয়ে নিল? আজ মন্দিরা নিজের দেহটাকে গাড়ির চাকার নিচে ফেলে দিতে রাজী আছে। সেই চাকাগুলি তার সর্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে দলে থেঁৎলে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যাক। তার বদলে যদি মনের শান্তি মনের আনন্দ পাওয়া যায়, মন্দিরা টুঁ-শব্দটি করবে না। কিন্তু পাবে কি সেই আনন্দ? নিজেকে মেরে ফেললেও কি সেই অমরলোকে পেঁছিতে পারবে?

শুধু দেহের সুখ? শুধু দেহের সুখের জন্যেই শশাঙ্ককে সে ভালো-বেসেছে—মীনাক্ষী যাই বলুক, জগৎসুদ্ধ লোক যাই বলুক, এই বদনাম সে কিছুতেই মানতে রাজী নয়। শশাঙ্ক যখন তাকে ভালোবাসত (এখন আর বাসে না। অন্তত আগের মতো যে বাসে না তাতে মন্দিরার কোন সন্দেহ নেই) তখন তার সেই ভালোবাসায় শুধু দেহই তৃপ্ত হতো, মন আনন্দে ভরে উঠতো না, সেই আনন্দে সমস্ত পৃথিবীকে আনন্দময় বলে মনে হতো না, একথা মন্দিরা কী করে স্বীকার করবে? তেমনি শশাঙ্কের রূপেই সে শুধু ভালোবেসেছে? বহু দোষের মধ্যে তার যে গুণগুলি আছে তাদেরও কি ভালোবাসেনি? তার কথা শুনে মুগ্ধ হয়নি? আবৃত্তিতে কান পেতে থাকেনি? চিঠির ভাষা মুখস্থ করে রাখেনি? তার কাছ থেকে যা-কিছু শিখেছে সব কি ভালোবেসেই শেখেনি মন্দিরা? তবু সবাই বলবে তারা শুধু পরস্পরের দেহকেই ভালোবেসেছে। বেসে থাকলে বেশ করেছে। বেশ করেছি এই কথা দুটি মন্দিরার মত শশাঙ্কও যদি বলতে পারত, কী চমৎকারই না হতো। কিন্তু সেই সাহস শশাঙ্কের নেই। এর আগে নাকি কত দুঃসাহসিক কাণ্ড করেছে শশাঙ্ক। মন্দিরা বিশ্বাস করে না। যারা ওসব কাণ্ড করে বেড়ায়, তারা কি অমন ভীরু হয়? ভীরু। ভীরু ছাড়া কি। ভীরু বলেই শুধু অপবাদ রটতে দিয়েছে নিজের নামে। দুজনেই ভীরু। ভালোবাসা না পেয়েও এক ভীরুর ছেড়ে দেবার মত সাহস হল না; ভালোবাসা পেয়েও আর-এক ভীরুর মন্দিরাকে ধরে রাখবার মত সাহস হল না। বেশ হয়েছে। মিহির যে শশাঙ্কের নামে কেস করে দিয়েছে, বেশ হয়েছে। তবু তো এই কেসের জন্যে মন্দিরার নামের সঙ্গে শশাঙ্কের নাম জড়িয়ে থাকবে। চেষ্টা করলেও এড়াতে পারবে না। দুজনের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরবে। কাগজে কাগজে ছাপা হবে। সেই হবে তাদের বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি। সহজ স্বাভাবিক বিয়েতে তো গোড়াতে রাজী হল না শশাঙ্ক, এই আন্তরিক বিয়ের ফলই সে ভোগ করুক। সেই

ফলের ভাগ অবশ্য মন্দিরাকেও নিতে হবে। তবু তো সে কষ্ট পাবে, দুর্ভোগ ভোগ করবে। মন্দিরা সব কিছু দিতে চেয়েছিল। যখন কিছুই নিল না, লজ্জা দুঃখ অপমানের বরণমালাই মন্দিরা তার গলায় পরিয়ে দেবে।

লজ্জা অবশ্য মন্দিরারও কম নেই। তারও কি কাউকে মুখ দেখাবার জো আছে? অবশ্য মুখ কাউকে দেখাবার দরকার হয় না। কাকার এই বৃহৎ পুরীর মধ্যে সে একা একাই থাকে। কাকীমা দরকারী কথা ছাড়া তার সঙ্গে বড় একটা কথা বলেন না। কাকাও তাঁর কারখানা নিয়ে ব্যস্ত। সেখানেও নাকি নানা রকম অশান্তি শুরু হয়েছে। মজুরদের বাগ মানানো যাচ্ছে না। মন্দিরার ভেবে মাঝে মাঝে অবাক লাগে, তার অশান্তি ছাড়াও পৃথিবীতে আরো অশান্তি আছে। নানা ধরনের অশান্তি। মাঝে মাঝে ভেবে খুশি হয় মন্দিরা, তার মত আরো অনেকে অশান্তি ভোগ করে। সংসারে বিচিত্র রকমের অশান্তি আছে। থাকুক। মন্দিরা যেমন কষ্ট পাচ্ছে তেমনি পৃথিবীতে সবাই কষ্ট পাক, দুঃখ পাক।

কাকীমা সেদিন বলছিলেন, 'আচ্ছা এক মেয়ে হয়েছ বাবা। সবাইকে নাচিয়ে তুলেছ। তোমার জন্যে আরো কত জনের কত কি দুর্গতি হবে কে জানে

মন্দিরা কোন জবাব দেয়নি। মুখ নিচু করে বসে বসে কাকিমার সঙ্গে তরকারি কুটেছে। হয়তো হোক। তার জন্যে পৃথিবীসুদ্ধ লোকের দুর্গতি হোক, তার জন্যে দুটি কাপুরুষ এক হাস্যকর, লজ্জাকর এক মামলার যুদ্ধে নেমেছে। সেকালের বীরপুরুষ তো কেউ নয়। তাই মল্লযুদ্ধে কারো সাহস হয়নি। সেই সাহস যদি থাকত আর সেই পুরাণের যুগে ইতিহাসের যুগে যদি চলে যেতে পারত মন্দিরা, কী চমৎকারই না হতো। দুই বীর যোদ্ধা তরবারি হাতে একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। ফিনিকে ফিনিকে রক্ত উঠত। বুকে রক্ত, মুখে রক্ত, হাতে রক্ত, পায়ে রক্ত, পায়ের তলার মাটি রক্তে মাখামাখি হয়ে যেত। আর রক্তাম্বরা মন্দিরা থাকত রক্তগোলাপের মালা হাতে নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে। মরণ যুদ্ধে আহত, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত বিজয়ীর গলায় নিজের হাতে জয়মাল্য পরিয়ে দিত। তখন কেউ বলতে পারত না, মন্দিরা, তুমি কলঙ্কিনী, মন্দিরা তুমি নিষ্ঠুরা হৃদয়হীনা ব্যভিচারিণী।'

ছেলেবেলায় বাবা-মা'র সঙ্গে একবার থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল মন্দিরা। সেখানে দেখেছিল, এক পরম রূপবতী রাজকন্যার জন্যে রণসাজে সজ্জিত দুই বীরপুরুষের অসিযুদ্ধ। পালার নাম মনে নেই, নায়ক-নায়িকার নাম মনে নেই, কিন্তু দৃশ্যটি মন্দিরার মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। সেই রক্তাক্ত দৃশ্য মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখেছে মন্দিরা। রাজকন্যার বেশে দেখেছে নিজেকে। সেই স্বপ্ন আজ ফলল। কিন্তু ভাগ্যের গুণে কালের গুণে কী মাকালই না ফলেছে!

তার জন্যে দুই কাপুরুষ আজ যুদ্ধে নেমেছে। রক্তের নামগন্ধও কোথাও নেই। শুধু কাদা আর কালি, ধুলো আর বালি। মুঠিতে মুঠিতে তারা একজন আর একজনের গায়ে ছিটাবে। ছিটাক। মনের আক্রোশ এইভাবেই মিটাক তারা। মন্দিরা দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে।

এখানেও মন্দিরা বন্দিনী হয়ে আছে। কাকা একটু উদার হলে কী হবে, কাকিমা ভীষণ কড়া। তিনিই বাড়ির কর্ত্রী। বাড়িতে তাঁর গলাই সবচেয়ে চড়া।

বাবা আর কাকার মধ্যে কি বোঝাপড়া হয়েছে কে জানে; মন্দিরা কাকার বাড়িতেই আছে। কাকিমার অসম্মতি সত্ত্বেও আছে। এই বিশ্রী মামলা যতদিন পর্যন্ত চলবে বাবা তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না। তিনি হয়তো ভেবেছেন, এই সব কেলেঙ্কারীর কথা ছন্দা নন্দার কানে গেলে তাদেরও স্বভাব নষ্ট হয়ে যাবে। কি, তাদের বিয়ের সম্বন্ধ আসবে না। এই জন্যে বাবা তাকে দূরেই রাখতে চান। মন্দিরাও আর তাঁর কাছে যেতে চায় না। বরং আরো দূরে—আরো দূরে যেতে পারলে যেন বেঁচে যায়। কিন্তু যাবে কি, মন্দিরা যতই মুক্তি চায়, যতই ঘর থেকে বাইরে বেরোক, কোন না কোন ঘর তাকে গিলে খাবার জন্যে বিরাট কালো এক গহ্বরের মুখ মেলে রয়েছে। এই তার ভাগ্য।

কাকিমা বলে দিয়েছেন, 'এখানে যতদিন থাকবে আমাদের কথা শুনে চলতে হবে। কোথাও বেরোন চলবে না। বেরোতে হয় আমাদের সঙ্গে বেরোবে। বেরোবার আর দরকারই বা কি। বেড়ানো খেলানো তো কম হয়নি। যথেষ্ট হয়েছে। এখন ঘরে বসে পড়াশুনো কর। সংসারে তো কাজের অভাব নেই—কাজ কর। সেলাই আছে, বোনা আছে—।'

শুধু যে বেরোন বন্ধ তাই নয়, ফোন করা বন্ধ, ফোন ধরা বন্ধ। চিঠি লেখালেখির কথাই ওঠে না। কাকে আর চিঠি লিখবে মন্দিরা। লিখতে ইচ্ছাও হয় না।

মন্দিরা বলেছিল, 'কাকিমা, আপনাদের আর অসুবিধা বাড়িয়ে দরকার নেই। আমাকে বরং কোন হস্টেলে-টস্টেলে ঠিক করে দিন। আমি সেখানে চলে যাই।'

কাকিমা জবাব দিয়েছেন, 'তোমার মত মেয়েকে কোন হস্টেল নেওয়ার জন্যে বসে আছে! তুমি কি তোমার কাকাকে আরো ফাঁসে জড়াতে চাও? যতখানি জড়িয়েছে তা আগে খুলুক। মামলার ঝামেলা মিটুক। যাহোক কিছু একটা হয়ে যাক। তারপর যেখানে যেতে হয় যেয়ো। কোথায় যে যাবে তাও তো আর কারো অজানা নেই।'

কাকিমা যা জানেন তা যে কত অসত্য, মন্দিরা সে কথা ভেবে মনের দুঃখে হাসে। তার আর যাওয়ার জায়গা কোথাও নেই। নিজের জায়গা এবার তাকে নিজেই খুঁজে নিতে হবে। ভেবেছিল কাকার ফ্যাকটরীতেই কিছু একটা কাজ

জুটে যাবে তার। গোড়ার দিকে একটু উৎসাহও তাঁর দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু মামলা-মোকদ্দমা শুরু হবার পর সেই উৎসাহ তাঁর আর নেই। নিরঞ্জনকাকাও এখন বিরক্ত। মন্দিরা বেশ বুঝতে পারে তাঁর মনের ভাব। তাকে তিনি না পারছেন রাখতে, না পারছেন ফেলতে। মন্দিরাকে নিয়ে বাবার সঙ্গেও নাকি তাঁর খানিকটা কথা-কাটাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি হয়ে গেছে। কাকিমা বলছিলেন সেদিন। পরের মেয়ে নিয়ে কেন যে মানুষ অনর্থক ঝামেলা বাধায় তা তিনি ভেবে পাননি।

'কাকিমা, আমার নাকি ফোন এসেছিল?' মন্দিরা বলেছিল সেদিন।

কাকিমা গম্ভীর মুখে বলেছেন, 'হ্যাঁ, এসেছিল। কিন্তু তোমাকে সব ফোন ধরতে দিতে পারব না বাছা। যে বিপদে পড়েছ তা আগে কাটুক। তারপর প্রাণ যত চায় ফোন কোরো। পদে পদে এখন উকিলদের পরামর্শ নিয়ে চলতে হবে, এমন ঝঞ্ঝাট বাঁধিয়েছ তুমি। দিদি যখন ফোন করেন তখন তো তোমাকে দিই। আর কারো ফোনে তোমার এখন তো কোন দরকার দেখিনে।'

হ্যাঁ, মা মাঝে মাঝে ফোন করেন। ফোন করে খোঁজ নেন তার। মাকেও তো কম দুঃখ দেয়নি মন্দিরা। তবু মা তাকে ছাড়তে পারেননি, ভুলতে পারেননি। মা। একাক্ষরী মহামন্ত্র। দুর্দিনের অভয় আশ্রয়; কোথায় যেন কোন কবির লেখায় পড়েছিল মন্দিরা তখন অর্থ বোঝেনি। বুঝলেও বিশ্বাস করেনি। আজ বুঝতে পারছে। আজ মাঝে মাঝে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে মন্দিরার। তাঁর কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে ইচ্ছা করে। বলতে ইচ্ছা করে, 'আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর। আমার সব পাপ তোমার আঁচল দিয়ে মুছে দাও, ছেলেবেলায় যেমন কালি-ঝুলি মুছে দিয়েছ। আমি আর কিছু চাইনে, শুধু তোমার কাছে থাকতে চাই।'

কিন্তু মা'র কাছে যাওয়া হয় না, বলা হয় না। মায়ের কোলের বদলে নিজের মাথার বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে থাকে মন্দিরা।

মা কাল ফোন করেছিলেন। মা রাগও করেন, আবার সান্ত্বনাও দেন।

'হতভাগী, তোর কথা ভেবে রাত্রে আমার ঘুম হয় না। কী গতি যে তোর হবে, ভগবানই জানেন। আমি তো ভেবে কূল-কিনারা পাইনে।'

'আমার কথা তুমি আর ভেবো না মা।'

'তা ভাবব কেন। তুই তো বানের জলে ভেসে এসেছিস।'

'ভেসে না এলেও আমাকে ভাসিয়ে দাও মা। আমার কথা তোমার মন থেকে দূর করে দাও।'

'আমাকে তোর আর উপদেশ দিতে হবে না। আমি যা বলি তাই শোন তো। লক্ষ্মী মা আমার, আমার কথা শোন। এখনো সময় আছে। মিহিরকে একখানা চিঠি লিখে দে। কী লিখবি আমি বলে দিচ্ছি। লিখবি, শ্রীচরণ-কমলেষু—তুমি স্বামী আমি স্ত্রী। তুমি দেবতা, আমি দাসী। তোমার পায়ে

যদি কোন অপরাধ করে থাকি আমাকে ক্ষমা কোরো। তুমি ক্ষমা না করলে কে করবে! তুমি পায়ে ঠেললে আমার কি গতি হবে। লিখে দে। লক্ষ্মী মা আমার। লিখে দে। ভুল যদি করে থাকিস, সে ভুল শুধরে নে অভাগী। তার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নে।'

মা বলতে থাকেন।

বিয়ের আগে বিয়ের পরে কত প্রেমপত্র লিখেছে মন্দিরা। কাউকে বলে দিতে হয়নি। মন যা বলেছে তাই লিখেছে। আর একজনের মন তাতেই খুশি হয়েছে। আজ মা এসেছেন তার দাম্পত্য পত্রের মুসাবিদা করে দিতে।

এমন করে লিখতে পারলে হয়তো ক্ষমা এখনো পায় মন্দিরা। মায়ের কথামত দু-একবার লিখবার যে চেষ্টা না করেছে তাও নয়। কিন্তু লিখতে গিয়ে কলম যেন নড়তে চায় না। হাত আড়ষ্ট, মন বিমুখ হয়ে থাকে। মিহিরের কাছে ক্ষমা কি সত্যিই চায় মন্দিরা? ক্ষমা তো একবার সে পেয়েছিল। তবু কেন সেই ক্ষমা সে দুহাত ভরে নিতে পারল না? সেই দয়া চিরদিনের জন্যে বুক ভরে নিতে পারল না?

এত কাণ্ডের পর ফের যদি ক্ষমা চায়, মন্দিরা আর পাবে? হয়তো মিছামিছি চেয়ে মুখ হারাবে। কি যদি পায়ও, অনুকম্পার অবজ্ঞার সেই কৃপাকণায় চিরদিনের জন্যে তাতে মন ভরবে মন্দিরার? জীবন ভরে উঠবে?

মন্দিরা জানে, মা যা বলছেন তাই তার করা উচিত। তাই চাওয়া উচিত। মামলা তো এখনো বেশি দূর গড়ায়নি, এখনো যদি মিহির মামলা তুলে নেয়, দুদিন বাদে সব কলঙ্ক চাপা পড়বে। সবাই সব কথা ভুলে যাবে। কে আর এ সব চিরদিনের জন্যে মনে করে রাখে? যদি মিহিরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে হাতে পায়ে ধরে ব্যাপারটা অল্পেই মিটমাট করে দিতে পারে মন্দিরা, তাহলে সবাই তার ওপর কৃতজ্ঞ থাকবে। পিতৃকুল শ্বশুরকুলের মান বাঁচবে, শশাঙ্ককেও অনর্থক হয়রান হতে হবে না। চিরদিনের মত দাসখত লিখে দিয়েও যদি এই দুঃসাধ্য ব্রতটুকু করতে পারে মন্দিরা, তাহলে সবাই তার সুখ্যাতি করবে। সেই সৎ কাজের দিকে মাঝে মাঝে মন্দিরার মন যে না যায়, তা নয়; কিন্তু কোত্থেকে যে বাধা আসে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। মন খানিকটা এগিয়ে আর এগোয় না। মন্দিরার মনে হয়, তাহলে গোটা জীবনটাই যেন এক দুর্বহ বোঝা হয়ে যাবে। সেই জীবনে কোন রস থাকবে না, আনন্দ উৎসব থাকবে না। সবাইর মুখ রাখবার জন্যে মন্দিরাকে কেন এমন বোঝা টেনে বেড়াতে হবে? ইচ্ছা করে আবার কেন পায়ে বেড়ী পরবে মন্দিরা? তার চেয়ে স্বাধীন যথেচ্ছ জীবনের মধ্যে সে ছাড়া পেতে চায়। তাহলে কারো শাসন, কারো বন্ধনই আর মানতে হবে না। মামলার এই ক'টা দিন কেটে গেলেই সেই বাঞ্ছিত মুক্তি মিলবে মন্দিরার। সেই ক'টা দিন তাকে শুধু অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

নিজের ঘরে চুপ করে বসেছিল মন্দিরা—সুলতা এসে বললেন, 'তোমার সঙ্গে কে যেন দেখা করতে এসেছেন।'

'কে এসেছেন কাকিমা?'

সুলতা বললেন, 'চিনিনে। বুড়োমত এক ভদ্রলোক। নাম বললেন নিশিকান্ত গুহ।'

মন্দিরা খুশি হয়ে বললে, 'ও মামাবাবু? নিচেই বসে আছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। তোমার কাকা তো বাড়ি নেই। দেখা করবে কিনা ভেবে দেখ। করলেও সাবধানে কথাবার্তা বলবে। বেশিক্ষণ থেকেও দরকার নেই। বাজে কথাটথা বলেও কাজ নেই তোমার। কে কোন পক্ষ থেকে আসে, কার কি মতলব কে জানে। সাবধানে থাকাই ভালো।'

এত ভয়ের কী আছে। মন্দিরা মনে মনে হাসল। সত্যিই তারা যেন কোন যুদ্ধশিবিরে বাস করছে। কাকিমা পদে পদে তাকে সতর্ক করে দিচ্ছেন, গুপ্তচরের ভয় দেখাচ্ছেন, নিজে ভয় পাচ্ছেন তার চেয়েও বেশি।

'আপনিও চলুন না কাকিমা। আলাপ করবেন মামাবাবুর সঙ্গে।'

'আমি অমন যখন তখন বাইরের কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারিনে। তাড়াতাড়ি দেখা-সাক্ষাৎ সেরে চলে এসো। তবে যা বলে দিলাম তা যেন মনে থাকে। নইলে তোমার কাকা এসে আমার ওপরই রাগ করবেন।'

নিচে নেমে এসে মন্দিরা দেখলে মামাবাবু ড্রয়িংরুমেই আছেন। তবে ঠিক বসে নেই। ঘুরে ঘুরে দেয়ালে টানানো ফোটোগুলি দেখছেন। বন্ধুদের সঙ্গে নিরঞ্জন কাকার গ্রুপ ফোটো আছে। ফ্যাক্টরীর বার্ষিক অনুষ্ঠানের ফোটো রয়েছে। ছেলেমানুষের কৌতূহল নিয়ে মামাবাবু সব ঘুরে ঘুরে দেখছেন।

মন্দিরা ঘরে ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ ওঁর সামনে যেতে ভারি লজ্জা হল মন্দিরার। কী বলবেন উনি। মন্দিরাকে দেখে কী ভাববেন। নিশ্চয়ই এতদিনে ওঁর কিছু জানতে বাকি নেই। সবই উনি শুনেছেন। কতটা কি বিশ্বাস করেছেন কে জানে।

একটু বাদে নিশিবাবু ফিরে দাঁড়ালেন। মৃদু হেসে বললেন, 'এই যে মন্দিরা মহারানী, কেমন আছ?'

মন্দিরা প্রণাম করে বলল, 'ভালোই আছি মামাবাবু।'

মামাবাবুর দিকে চোখ তুলে তাকাল না মন্দিরা। মুখ নিচু করে রইল।

নিশিবাবু তার দিকে একটুকাল চেয়ে থেকে হেসে বললেন, 'ভালো আছ? বেশ বেশ। কথাটা শুনে বড় ভালো লাগল। যেখানে যাই কারো মুখেই তো একথা শুনতে পাইনে। সবাই যেন কুইনাইন খাওয়া মুখ করে রয়েছে।'

লম্বা সোফাটার ওপর বসলেন নিশিবাবু। মন্দিরাকে হাত ধরে পাশে বসালেন। তারপর একটু হেসে বললেন, 'কী হয়েছে বল দেখি? আমার দিকে

তাকাচ্ছিস না যে? কোন মহাপাতক করে এসেছিস? কিসের এত ভয়? এত চক্ষুলজ্জা কিসের?'

মন্দিরা একথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'আপনি এতদিন কোথায় গিয়েছিলেন মামাবাবু? কোথায় এমন করে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন?'

নিশিবাবু হেসে বললেন, 'উধাও? তা বলতে পারিস বটে। আমার তো আর কোথাও শিকড়-টিকড় নেই, তাই ধা করে উধাও হতে দেরি লাগে না। আর-একবার ভূভারত ঘুরে এলাম। ভূ নয় শুধু ভারত। ভূ পর্যটনের ইচ্ছাটাই মনে মনে ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গতি কোথায়? হরিদ্বার পর্যন্ত গিয়েছিলাম।'

'তীর্থ করতে?'

'তীর্থ? তা বলতে পারিস। আমি সেকেলে মানুষ। স্থান-মাহাত্ম্য মানি। মনের মধ্যে যখনি কোন গ্লানি জমে, যেদিকে দু-চোখ যায় বেরিয়ে পড়ি। হেঁটে হেঁটে ঘুরে ঘুরে বোঝা নামিয়ে আসি। তাকে তীর্থ পর্যটনও বলা যায়, শুধু পর্যটনও বলা যায়। যে যা ভেবে খুশি হয় হোক।'

সারাটা সময় হরিদ্বারেই ছিলেন না নিশিবাবু। নামবার পথে এলাহাবাদে এসে আটকে পড়েছিলেন। সেখানে তাঁর এক বন্ধুর ছেলে দারুন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। দিনের পর দিন রক্তবমি করে যায়। ডাক্তাররা কেউ সে অসুখ ধরতে পারেন না। বহু দিন ধরে যমে মানুষে টানাটানির পর মানুষের দলই জিতেছে। সেই দলে নিশিবাবু ছিলেন। দিনরাত বন্ধুর ছেলের কাছে বসে থাকতেন। পুরো দুটো মাস রোগীর ঘরই ছিল তাঁর জগৎ। কী উদ্বেগ দুশ্চিন্তার মধ্যে যে দিনগুলি কেটেছে। বিয়ে থা করেননি বলেই যে সর্ব-বন্ধনের বাইরে আছেন, সে অহঙ্কার নিশিবাবুর নেই। একটু আগে বলছিলেন কোথাও কোন শিকড় নেই তাঁর। কথাটা ভুল। নিশিবাবু নিজের ভুল শুধরে হেসে বললেন, 'সব শিকড় কি আর চোখে দেখা যায়? কতকগুলি শিকড় আছে পাতার শিরাগুলির চেয়েও সূক্ষ্ম। অতি সূক্ষ্ম। চোখে ভালো করে দেখা যায় না, কিন্তু তাই বলে তাদের টান কম নয়। সেই টানেই আবার চলে এলাম।'

মন্দিরা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপনিই সবচেয়ে সুখে আছেন মামাবাবু। আমিও আপনার মত ওই রকম পথে পথে ঘুরতে চাই। আর কিছু চাইনে। ফের যখন বেরোবেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন মামাবাবু।'

নিশিবাবু হঠাৎ মন্দিরার হাতখানা ধরে ফেললেন, তারপর তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'আমি এক্ষুণি আবার বেরোচ্ছি। চল আমার সঙ্গে।'

মন্দিরা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায়?'

নিশিবাবু স্মিতমুখে বললেন, 'মীরপুরে।'

মন্দিরা একটু কাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'না, মামাবাবু।'

নিশিবাবু খানিকটা অধীর এবং উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কেন নয় শুনি?

তোদের সবাইর কাণ্ডকারখানাই আলাদা। মিহিরের কাছে গেলাম সে বলল, না। শশাঙ্কবাবুর কাছে গেলাম তিনিও বললেন, না। মানে মিহিরের টার্মস তিনি মানতে রাজী নন। যোগরঞ্জনের কাছে গেলাম সেও বলল, না। বলল, আমি ওসবের মধ্যে নেই নিশিদা। বললাম, না থাকলে চলবে কেন ভাই? তোমারই তো মেয়ে। তাতে কি সে বলল জানিস? তার নতুন নার্সিং হোমের ছোট্ট সাদা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মেয়ে নেই। ওই আমার মন্দির ওই আমার মন্দিরা।'

নিশিবাবু একটু থামলেন।

বাবার মুখখানা মনে পড়ল মন্দিরার। কিন্তু ঠোঁটে ঠোঁট চেপে শক্ত হয়ে বসে রইল।

সুলতা চা আর মিষ্টির প্লেট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মিষ্টিটা আর নিলেন না নিশিবাবু। চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে ফের একটু হেসে বললেন, 'কারো মান অভিমান। আবার কেউ বা মান সম্মানের গুমরে অস্থির। কেউ জেদ ছাড়বে না। নিজের খুঁটি ছাড়বে না। এমন হলে কি আর বিবাদ বিসংবাদ মেটে? এদিকে সবাই মিলে তো এক জাতনাশা কাণ্ড ঘটিয়ে তুলেছিস। এরপর লোকসমাজে কারো কি আর মুখ দেখাবার জো থাকবে?'

মন্দিরা একথার কোন জবাব দিল না। মুখ নিচু করে চুপ করে রইল।

নিশিবাবু বললেন, 'আমি অবশ্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাব। আমি নিমিত্তের ভাগী হয়ে আছি। যাতে মিটমাট হয়, তোদের সবাইর ভালো হয়, সে চেষ্টা আমাকে করতেই হবে। কিন্তু আমার কথা কি কেউ শুনবে!'

নিশিবাবু নিতান্ত নিরাশ্বাসে তাঁর ছাতাটি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মন্দিরা তাঁকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আবার আসবেন মামাবাবু।'

নিশিবাবু এ কথার কোন জবাব দিলেন না।

মন্দিরা একবার ভাবল, এগিয়ে গিয়ে নিশিবাবুকে ফের ডাকে। ডেকে জিজ্ঞাসা করে, 'আমি আপনার সঙ্গে গেলেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে?'

কিন্তু ডাকা হল না।

নিশিবাবু পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

॥ ২৪ ॥

আজ শুনানীর দিন। প্রতিপক্ষ আজ আদালতে তার সাক্ষী-সেনানী নিয়ে হাজির হবে। কথাটা সকাল থেকেই মনে পড়ছিল শশাঙ্কের।

শেষ পর্যন্ত মামলাটা এগিয়েই চলল। কিছুতেই তাকে থামিয়ে দেওয়া গেল না। অবশ্য থামাবার জন্যে একেবারে মরীয়া হয়ে চেষ্টা করেনি শশাঙ্ক।

নিজের উকিল সুধাময় সান্যালকে দিয়ে অন্যপক্ষের উকিলের কাছে মীমাংসার ইঙ্গিত তুলেছিল মাত্র। কিন্তু মিহিরের শর্ত বড় কড়া। সবাইর সাক্ষাতে অপরাধ স্বীকার করতে হবে শশাঙ্ককে। নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইতে হবে। এসব শর্তে শশাঙ্ক রাজী হতে পারে না। যে অপরাধ সে করেনি তার জন্যে ক্ষমা? সেই ক্ষমা পেলে মামলার ঝামেলা থেকে রেহাই পাবে শশাঙ্ক। যাঁরা বৈষয়িক কূটকৌশলের দিক থেকে এই পথই গ্রহণযোগ্য বলবেন, তাঁরা জানেন সেই কুশলতার পক্ষে বাধাও কম নয়। অহমিকাই এক বাধা। অহমিকা না কি মানুষের সাধারণ ক্ষীণতম সম্মানবোধ, যে সম্মানের সঙ্গে তার স্বতন্ত্র সত্তা অভিন্ন? মামলার ঝামেলা বাঁচাবার জন্যে যদি অমন হীনতা স্বীকার করে মিহিরের কাছে গিয়ে সে ক্ষমা চায় তাহলে কারো কাছেই কি তার মান বাঁচবে? সবাই তাকে দুর্বল হীনমনা ক্ষীণপ্রাণ কাপুরুষ বলে জানবে। আর মন্দিরা? সেও মনে মনে হাসবে। ভাববে, এই তোমার পৌরুষ? এই তোমার বীরত্ব? মিথ্যা অপরাধ কবুল করে তুমি আমার স্বামীর কাছ থেকে দয়া চেয়ে নিলে?'

শশাঙ্ক চিরদিনের জন্যে করুণার পাত্র হয়ে থাকবে। মন্দিরার মনে তার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা আর অবশিষ্ট থাকবে না। তার চেয়ে শেষ পর্যন্ত যুঝে মামলায় যদি জয়ী হতে পারে শশাঙ্ক—উকিলদের মতে যার সম্ভাবনা শতকরা নিরানব্বই পয়েণ্ট নয় ভাগেরও বেশি, তাহলে মন্দিরা তারই হবে। এত সব কাণ্ডের পর সে আর তার স্বামীর কাছে ফিরে যাবে না, মিহিরও তাকে ফিরিয়ে নেবে না, শশাঙ্কই তাকে তুলে নেবে। এবার তার মনে হচ্ছে মন্দিরাকে অমন করে ফিরিয়ে না দিলেই হত। সেই ঝামেলা ঝক্কি তো পোহাতেই হল। না হয় ওর মনের সাধ পূর্ণ করেই তা পোহাত শশাঙ্ক। তাতে কি শুধু মন্দিরার সাধই পূর্ণ হতো, শশাঙ্কও তৃপ্ত হতো না? এই মেয়েটির জন্যে মামলায় জড়িয়ে পড়ে মাঝে মাঝে শশাঙ্কের মনে বিরূপতা আসে, আবার কখনো বা ঠিক বিপরীত অনুভূতির সৃষ্টি হয়। মনে হয়, মন্দিরা যেন সত্যিই তার পরম আপন, সত্যিই আদর করে বুকে তুলে নেওয়ার মত রমণী। অমন সর্বস্ব দিয়ে শশাঙ্ককে যেন কেউ আর ভালোবাসেনি। যাকে হাত বাড়িয়েই পাওয়া যেত তাকে বার বার দূরে ঠেলে দুর্লভ করে তুলেছে শশাঙ্ক। দুর্লভ করে তার মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন আর তাকে ফাঁকি দিয়ে পেতে গেলে চলবে না, ভিক্ষা করে পেতে গেলে চলবে না। এখন পেতে হলে তাকে জয় করে নিতে হবে। দুর্জয় সাহস আর পৌরুষের পরিচয় দিয়ে নিতে হবে।

নিজের দুর্বলতার অন্ত নেই শশাঙ্কের। নিজে তা সে ভালো করেই জানে। সে শুধু দ্বিধা বিভক্ত নয়, শতধা বিভক্ত। তবু যেসব দুর্লভ মুহূর্তে নিজের বিচূর্ণিত সত্তা কণিকাগুলিকে সম্বদ্ধ করে দৃঢ় পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে শশাঙ্ক, সেখানেই সকলের সম্মান আর স্বীকৃতি পেয়েছে। অন্য পাঁচজনের

স্বীকৃতির মধ্যে খুঁজে পেয়েছে নিজেকে।

এই সেদিনও কলেজে অমনি একটা কাণ্ড ঘটে গেল। ক্লাস নিতে গিয়ে শশাঙ্ক দেখে দেয়ালে একখানি কাগজ ঝুলছে। লাল পেনসিলে লেখা একটি কবিতা লেখা রয়েছে তাতে :

Desire of the moth for the star
And night for the morrow
And Sasanka for Mandira
Brings immense sorrow.

মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল শশাঙ্ক। ক্লাস ভরতি ছেলে। আর তাদের ঠোঁটে ঠোঁটে এক ঝিলিক করে বিদ্যুৎ। এর আগে আড়ালে তার সম্বন্ধে যে যাই বলুক সামনে এমন স্পর্ধা দেখাতে কেউ সাহস পায়নি। ক্লাসে সে ডিসিপ্লিন রাখতে পারে না এমন অভিযোগ তার নামে কখনো ওঠেনি। এই প্রথম। এই সর্বপ্রথম উচ্ছৃঙ্খল শশাঙ্ক নিজের ক্লাসের ছাত্রদের শৃঙ্খলাহীনতা প্রত্যক্ষ করল।

কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই শশাঙ্ক নিজের বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠেছিল। তারপর ছাত্রদের দিকে চেয়ে হেসে বলেছিল, 'কে লিখেছে কবিতা? আমি জানি তার স্বীকার করবার সাহস নেই। কিন্তু আমি তার কাছ থেকে আরো ভালো কিছু আশা করেছিলাম। ভবিষ্যতে সে আরো ভালো লিখবে এই আশা এখনো করব। আচ্ছা, এবার শেলীর মূল কবিতাটি পড়া যাক।'

সামনের বেঞ্চের একটি ছেলে এসে কাগজখানা তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল। কিন্তু সেদিকে যেন আর লক্ষ্য ছিল না শশাঙ্কের। ও কাগজ টাঙানো থাকলেও যেন তার কিছু এসে যায় না। কারো কিছু এসে যায় না।

মূল কবিতা থেকে শাখাপল্লব বিস্তার করে পৌনে এক ঘণ্টা ছাত্রদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখে শশাঙ্ক ক্লাসরুম থেকে সদর্পে বেরিয়ে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল আরো কয়েকটি ছাত্র, 'স্যার আজকের এই ব্যাপারের জন্যে আমরা দুঃখিত। আমাদের সবাইকে এর জন্যে দায়ী করবেন না।'

শশাঙ্ক হেসে একটি ছেলের পিঠে হাত রেখে বলেছিল, 'আমি সবাইকে তো দায়ী করবই না, যে দায়ী তাকেও ষোল আনা দায়ী করব না। অমন দুষ্টু-বুদ্ধি তোমাদের বয়সী কোন কোন ছেলের মাথায় আসা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাই বলে তার মাথাটা কেবল দুর্বুদ্ধিতেই ভরা এ কথা ভাবাও অসঙ্গত।'

ছাত্রেরা আর একবার অভিভূত হয়ে শ্রদ্ধার চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল। এর আগে বহু নারীর কাজল-কালো চোখের মুগ্ধতায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখেছে শশাঙ্ক। তরুণ হৃদয়ের সশ্রদ্ধ চোখে যে প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে, তাও দেখেছে। আজও দেখল। মনে হল ওদের চোখে আরো শ্রদ্ধের আরো বরণীয় হতে

পারলেই যেন ভালো হতো। সেই তোরণই আসলে বিজয়-তোরণ সিংহ-তোরণ। ছাত্রদের কাছে কি কথাগুলি বানিয়ে বলেছিল শশাঙ্ক? মুরারিদা শুনলে হয়তো তাই বলতেন। কিন্তু শশাঙ্ক জানে বানানো নয়। সত্যি। এইসব কথা তার সত্তারই কথা। তার অনুভূতি উপলব্ধির ক্ষণস্থায়ী অণুপরমাণু।

স্টাফ রুমেও পৌঁছেছিল কাহিনীটা। কোন কোন সহকর্মী মনে মনে হেসে মুখে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। কেউবা ছেলেদের অশিষ্টতায় সত্যিই ক্ষোভ জানিয়েছিলেন। কিন্তু শশাঙ্ক নিজের অটুট গাম্ভীর্যে এক কোণে চুপ করে বসেছিল।

এরপর প্রিন্সিপ্যালের কাছে সে রেজিগনেশন দিতে গিয়েছিল। মামলা আরম্ভ হওয়ার পর তিনি যে শশাঙ্ককে নিয়ে অস্বস্তি ভোগ করছিলেন তা সে জানে। তবু মুখ ফুটে তিনি তাকে কিছু বলেননি। এই ভদ্রতার জন্যে, তার যোগ্যতার স্বীকৃতির জন্যে শশাঙ্ক তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। মানুষের আচরণে এই যে বিন্দু বিন্দু সহৃদয়তা, এর মাধুর্যের যেন অন্ত নেই। শশাঙ্কের মনে হয়, এই মধুই আসলে স্মৃতির মৌচাকে সঞ্চয় করে রাখবার মত। আর সব লোষ্ট্রবৎ। বিপদের দিনে অনুভূতির তীব্রতা বাড়ে। ভাবালুতাও বাড়ে। এই সব সুধাবিন্দু কুড়াতে কুড়াতে পরম সিনিকের চোখেও অশ্রুর মুক্তাবিন্দু দেখা দেয়।

প্রিন্সিপ্যাল বন্ধুর মত ব্যবহার করেছেন। তিনি নিজে থেকে শশাঙ্ককে চাকরি ছেড়ে দিতে বলেননি। শশাঙ্ক ছেড়ে দিতে চাইলেও তার কথা কানে তোলেননি। বলেছেন, 'না না, চাকরি ছাড়বেন কেন? চাকরি ছাড়বার কী হয়েছে। আমি কমিটিকে সব বুঝিয়ে বলব। কোর্টের জাজমেণ্ট আগে বেরোক, তখন দেখা যাবে। আপনি বরং ছুটি নিন। এসব মামলা দু'তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। সেই ছুটির ব্যবস্থা করা কিছু কঠিন হবে না। আপনি ভাববেন না, শশাঙ্কবাবু।'

'ভাববেন না' এই ভরসা অনেকের কাছ থেকেই পেয়েছে শশাঙ্ক। উকিলরা বলছেন, ভাববার কিছু নেই। মুরারিদা তো বলছেনই। দাদারাও প্রথমে খুব রাগ করেছিলেন, 'বংশের নাম অমন করেই ডুবালি? তোর মুখ দেখাও পাপ।'

কিন্তু বিপদের দিনে তাঁরাও পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। জালে যখন জড়িয়েছে সে জট ছাড়াতেই হবে। টাকা পয়সার জন্যে ভেব না। কোন কার্পণ্যও কোরো না। ভালো উকিল দাও। খরচ যা হয় হবে। টাকা না খসলে প্রায়শ্চিত্ত হবে না। পাপের জন্যেই এসব মামলা মোকদ্দমা ঘরে ঢোকে। জলের মত টাকা খরচ করে সেই পাপ ধুয়ে ফেলতে হয়।'

আরো একজনের শুভেচ্ছা পেয়েছে শশাঙ্ক। শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদ। কাশীবাসিনী দূর সম্পর্কীয়া সেই বিধবা বউদি। তিনি এখন প্রৌঢ়া, প্রণয়-বিদ্যায় তাঁর কাছে হাতেখড়ি হয়েছিল শশাঙ্কের। তিনিও এই উপলক্ষে

হিতৈষিণী হয়ে চিঠি লিখেছেন, 'ছি ছি ছি, শুনে লজ্জায় মরে যাই। শেষ পর্যন্ত একটা মেয়েছেলের জন্যে মামলায় জড়িয়েছ? আগে থেকে সাবধান হতে পারনি? নিজেকে শোধরাতে পারনি? বয়স তো কম হল না। আক্কেলবুদ্ধি আর কবে হবে? শুনে অবধি মুখে অন্ন নেই, চোখে ঘুম নেই। রাতদিন বাবা বিশ্বনাথকে ডাকছি। তিনি রক্ষাকর্তা। তিনিই রক্ষা করবেন। এই চিঠির মধ্যে ফুল বেলপাতা পাঠালাম। আদালতের সময় সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো। তুমি তো আবার নাস্তিক। কিছুই বিশ্বাস কর না। কিন্তু দোহাই তোমার, এখন আর গোঁয়ার্তুমি কর না। প্রসাদী ফুল সব সময় সঙ্গে সঙ্গে রেখ। বাবা বিশ্বনাথ তোমার সব অমঙ্গল দূর করবেন।'

'আর একটা কথা। তোমার তো এখন অনেক টাকা পয়সা দরকার। তুমি আমাকে যে টাকা মাসে মাসে পাঠাও এ মাসে আর তা পাঠিয়ে কাজ নেই। আমি যেমন করে পারি চালিয়ে নেব। সর্বদা ভগবানে বিশ্বাস রেখ। যিনি বিপদ দিয়েছেন তিনিই তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ দেখিয়ে দেবেন।'

শুকনো ফুল বেলপাতা সমেত চিঠিখানি ভাঁজ করে রেখে দিয়েছিল শশাঙ্ক। বউদির এই স্নেহপ্রীতিতে অভিভূত না হয়ে পারেনি। এখন তাঁর সঙ্গে শশাঙ্কের যে সম্পর্ক তাতে আর দেহগন্ধ নেই। এখন শুধু ফুলের গন্ধ আছে। তাও প্রসাদী ফুল। কৈশোরের সেই মোহদৃষ্টির কথা এখন ভাবলেও হাসি পায় শশাঙ্কের। কিন্তু একদিনের সেই হাস্যকর সম্পর্ককে ভিত্তি করে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, এখনও স্থায়ী হয়ে রয়েছে তা কিন্তু এখন আর হাসির নয়। স্নেহপ্রীতির সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক আবার তাদের মধ্যে ফিরে এসেছে। সম্পর্কের জন্ম হয়, মৃত্যু হয়। আবার রূপান্তরও যে না হয়, তা নয়। বউদি সম্বন্ধে সেই কিশোরসুলভ মনোভাব এখন আর শশাঙ্কের নেই। যদিও তিনি শশাঙ্কের কৈশোরকেই এখন পর্যন্ত মনের মধ্যে ধরে রেখেছেন। কিন্তু শুধু কি তিনিই ধরে রেখেছেন! শশাঙ্ক নিজেও কি স্থায়ীভাবে সেই কৈশোরকে নিজের মধ্যে বেঁধে রাখেনি? সেইজন্যেই কি অন্যের কৈশোর আর তারুণ্য তাকে এমন করে আকর্ষণ করে? বয়স বাড়লেও নিজের কৈশোরকে কি অতিক্রম করতে পারেনি শশাঙ্ক? নাকি পারতে চায়নি? কোন কোন লোকের নাম থাকে কিশোর। তাদের বয়স বাড়ে, রূপ বদলায়, কিন্তু নাম বদলায় না। তবু সেই অপরিবর্তিত নামের কিশোরকেও প্রাপ্তবয়স্ক বলে চেনা যায়। নামের মত যাদের স্বভাবও অপরিবর্তিত থাকে, তাদের সহজে চেনা যায় না। তাদের সব রকমের বৃত্তি প্রবৃত্তি সমানভাবে বিকশিত হয় না। পূর্ণাঙ্গ পরিণতি বড় আয়াসসাধ্য। বয়সের অঙ্কের সঙ্গে তাল রেখে রেখে শুধু সচেতন চেষ্টায় সেই পরিণতিতে পেঁছানো যায়। বিনা শিক্ষায় বয়স্ক হওয়া যায় না। বয়স্ক হতেও মানুষকে শিখতে হয়। বড়ই দুঃখের ব্যাপার, এখানেও দুর্মেধার অভাব নেই। শিখতে চাইলেও কেউ কেউ শিখতে পারে না। শশাঙ্ক

কি সেই না-পারাদের দলে?

মন্দিরার পূর্ববর্তিনীরা এই মামলার কথা শুনে কী ভাবছে কে জানে? কেউ মজা দেখছে। হয়তো ভাবছে এমন ঘটনা আগেই ঘটা উচিত ছিল। কারো মনে বা একটু-আধটু সহানুভূতি আসতেও পারে। কিন্তু বউদির মত জানাবার সাহস নেই। কি অতখানি উৎসাহ নেই, অতখানি প্রবীণতা আসেনি।

এই বিপদের সময় আরো একজনের কথা মনে পড়ছে শশাঙ্কের। মনে পড়ুক এ তার ইচ্ছা নয়। মনে পড়লে যেন তার পৌরুষের অসম্মান। সুজাতা থাকলে কী করত? সে থাকলে কি আগের মতই চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় করে তুলত? না কি মুখ বুজে সইত? এই বিপদের সময় সে কি পাশে এসে দাঁড়াত? নাকি আরো বিপদের মুখে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে যেত? সুজাতা বাড়িতে থাকলেও কি এ সব কাণ্ড ঘটতে পারত? ঘটতে যে পারত না তা নয়। মুরারিদার স্ত্রী তো ঘরেই আছেন। তবু তো তিনি মাঝে মাঝে জড়িয়ে পড়েন। চতুর মানুষ। তাই সে জট ছাড়িয়ে নিতেও পারেন। শশাঙ্কও অনেক ক্ষেত্রে পেরেছে। কিন্তু আশ্চর্য, যেখানে জড়াবার কথা ছিল না, সেখানেই জড়িয়ে পড়ল। গোপন সম্পর্ক যেন পথের দু'ধারে গোপন সুড়ঙ্গের মতই। কখন যে কোথায় পা পড়বে আর আকণ্ঠ ডুবে যেতে হবে তার ঠিক থাকে না। তবু অভ্যাস সেই বিপদসঙ্কুল পথেই টেনে নিয়ে যায়। তখন বিপদকে আর বিপদ বলে মনে হয় না। মনে হয় জীবনের যত রস আর রহস্য, সব ওই পথে-পথে ছড়ানো।

টেলিফোন এল।

শশাঙ্ক উঠে গিয়ে ফোন ধরল।

'কে? মুরারিদা?'

'হ্যাঁ, সেই নরাধম। তোমার খবর নিচ্ছি। উঠে বসেছ? না শুয়ে আছো?'

'বাঃ, শুয়ে থাকব কেন?'

'বেশ, বেশ। গলাটা স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে। সাগু-বার্লি-খাওয়া গলা নয়। ভাত ডাল মাছ মাংস খাওয়া স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর। শুনে খুব ভরসা পাচ্ছি। শক্তই আছ। যাক, আর ভয়ের কিছু নেই।'

'গলা শুনেই বুঝি তুমি সব বুঝতে পারছ?'

নিশ্চয়ই। তোমরা সব গলাবাজ লোক। গলাই তো তোমাদের ব্যারোমিটার। তা হলে নার্ভ ঠিকই আছে?'

'ঠিক না থাকবার কী হয়েছে?'

'বেশ বেশ। এই তো বীরপুরুষের মত কথা। তোমার জন্যে আমি শ্যুটিং-এর ডেট পালটে দিলাম। ভাবলাম, অন্তত প্রথম দিন আমাকে তোমার পাশে পাশে থাকতে হবে। যদি তোমার মূর্ছা যেতে ইচ্ছে হয়, সঙ্গে সঙ্গে

কাঁধ এগিয়ে দেব। যদি তেষ্টা পায়, জলের গ্লাস সামনে এগিয়ে ধরব। এর জন্যেও তো লোক চাই। তোমার সব ধর্মধ্বজ চরিত্রবান বন্ধুদের দিয়ে তো আর এ-সব কাজ হবে না।'

শশাঙ্ক বলল, 'সত্যি মুরারিদা, তুমি অনেক করছ আমার জন্যে। তোমার ঋণ—'

'আরে দূর। ঋণী তো আসলে আমি। সেই দশ সহস্র মুদ্রার কথা ভুলিনি হে। সে টাকা মেরে দেব না, দিয়ে দেব। বিশেষ করে তোমার এই দরকারের সময় টাকাটা আমার দিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল শশাঙ্ক। আমি চেষ্টায় আছি। এই যে তোমার জন্যে একটু-আধটু ছুটোছুটি করছি, এ হল সেই আসলের সুদ। বার্টার সিসটেম ধরে নিতে পার। টাকার বদলে—'

শশাঙ্ক বলল, 'হৃদয়।'

মুরারিমোহন হেসে উঠলেন, 'মস্ত বড় একটা কথা বলে ফেললে হে। আমি হলে বলতুম, হাত-পা নাক-চোখ-মুখ আর মুখের কথা। যা চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়, হাতে ছোঁয়া যায়। ও-সব হৃদয়-টিদয়ের কথা ছেড়ে দাও। তুমি তা হলে কোর্টে চলে যেয়ো। তোমার তো কাছেই। দু-পা বাড়ালেই শিয়ালদহ। তোমার কাছে এখন অবশ্য পোড়াদহ। আমার যদি যেতে একটু দেরি হয়, তুমি যেন পলকে প্রলয় মনে কোরো না। উকিলের পাশে স্থির হয়ে বসে থেকো। হ্যাঁ, একা যাওয়ার দরকার নেই। বাড়ির কাউকে নিয়ে যেয়ো সঙ্গে।'

কাকে আর সঙ্গে নেব। ছোড়দা অবশ্য একবার বলেছিলেন, 'আসব নাকি কোর্ট পর্যন্ত সঙ্গে?'

শশাঙ্ক মাথা নেড়েছে। এ মামলায় গুরুজনদের সঙ্গে নেওয়া যায় না।

ভাইপো বলাইও আসতে চাইল।

এগিয়ে এসে বলল, 'কোর্টে তুমি একা-একা কেন যাবে ছোটকাকা? আমরা তো আছি।'

শশাঙ্ক তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'তোরা বাড়িতেই থাক।'

'আমরা তো আছি।'

এই কথা ক'টি শশাঙ্কের কানে ভারি মধুর শোনাল। এক গভীর আশ্বাসে মন যেন ভরে গেল।

শশাঙ্ক জানে, দাদাদের চেয়েও তার তরুণ ভাইপোরা তাকে মনে-মনে বেশি ঘৃণা করে। প্রৌঢ়দের যৌন অমিতাচার যুবকেরা একদম সহ্য করতে পারে না। শশাঙ্ক মনে-মনে হাসে। সহ্য করতে পারে না। কারণ, তারা মনে করে, যৌব-রাজ্যে তাদেরই একচেটিয়া অধিকার। অনধিকারী গতযৌবন কামার্তের দল সে-রাজ্যে অহেতুক ভিড় বাড়াক, তা তারা চায় না। তাদের এই না-চাওয়াটা যুক্তির দিক থেকে শশাঙ্ক অস্বীকার করতে পারে না। এ যেন অবসর নেওয়ার পরেও অফিসে গিয়ে পুরোন চেয়ারটি আঁকড়ে বসে থাকা। অবসর নেওয়ার

পরেও মানুষের নিশ্চয়ই কাজ থাকবে। কিন্তু তার জায়গা আলাদা, ধরন আলাদা। যৌবন অপগত হওয়ার পরেও নিশ্চয়ই নারীপুরুষের মনে প্রেম থাকবে। কিন্তু সে প্রেমের রূপান্তর চাই। সেই প্রেমকে সৌখ্যে সৌহৃদ্যে স্নেহে প্রীতিতে অন্তরিত করতে পারা চাই। নইলে সেই বাসনা কর্মনাশিনী কীর্তিনাশিনী সর্বনাশিনী হয়ে ওঠে। এ-তত্ত্ব শশাঙ্কের যুক্তি, কিন্তু আচরণ দিয়ে মানতে পারে না। সীমানা ডিঙিয়ে যেতে তার মুহূর্তের বেশি সময় লাগে না। বাধ্য হয়ে শশাঙ্ক নিজের দ্বিধাবিভক্ত সত্তার কল্পনা করে। রুচিহীন নিয়ম শাসন, শৃঙ্খলাহীন এক দানব এসে যেন তাকে দখল করে বসে—কল্পনা করে শশাঙ্ক। রীতি-নীতি, রুচি শুচিতা, সব সেই জন্তু ভেঙেচুরে চুরমার করে দেয়। তার এই ব্যাখ্যায় মুরারিদা মুখ টিপে টিপে হাসেন। তিনি বলেন, 'তুমি যাকে দানবীয় বল আসলে তাই মানবোচিত। মানুষ জন্তু। তার জান্তবতাকেও সে র‍্যাশানালাইজ করে, কাব্য দর্শনের মোড়ক দিয়ে মুড়ে দেয় এইটুকুই শুধু তফাৎ।'

কিন্তু সবাই তো আর মুরারিদা নয়। বিশেষ করে তার ভাইপোরা, ভাইপোদের বন্ধুরা, শশাঙ্কের তরুণ ছাত্রেরা এ-সব ব্যাপারে যে কত ক্ষমাহীন আর অসহিষ্ণু, তা শশাঙ্ক ভালো করেই জানে। একেক সময় মনে হয়, ওরা যেন ওদের বাপ-দাদাদের চেয়েও রক্ষণশীল। কিন্তু যাকে রক্ষশীলতা মনে করে শশাঙ্ক, তাই কি শীলতা শালীনতা নয়? যারা অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রম, তাদের বাদ দিলে তরুণ আর যুবকের দলই নীতিনিয়ম আদর্শ-শৃঙ্খলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যারা গতযৌবন, যাদের দাঁত নড়েছে, টাক পড়েছে, তারাই যেন আরো বেশি নড়বড়ে। তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূলও শিথিল। কেন এমন হয়? শশাঙ্ক মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে। যাদের বয়স বেশি, তাদের শিকড়ই তো পৃথিবীতে বেশি প্রবিষ্ট হবার কথা। কিন্তু বেশির ভাগ বয়স্ক মানুষ কি অসরল শক্ত, ঝানু, চতুর আর বিচক্ষণ নয়? তবু বয়সের স্বপক্ষেও কি কিছু বলবার নেই? বয়স মানুষকে অনেক সহনশীল করে। পান থেকে চুন খসলে আকাশ থেকে তারা খসেছে বলে তারা মনে করে না। বয়স দৃষ্টির প্রসারতা বাড়ায়।

শশাঙ্ক গাড়িতে গিয়ে পিছনের সীটে হেলান দিয়ে বসল। সদ্য-বিবাহিত যুবক ড্রাইভার গোকুল তার সম্বন্ধে কী ভাবছে, কে জানে? আর কেউ না জানুক, শশাঙ্ক জানে। ও যা ভাবছে, তা তার অনুমানের বাইরে নয়।

রামেশ্বর এগিয়ে এসে বলল, 'বাবু, আমি আসি আপনার সঙ্গে।'

শশাঙ্ক বলল, 'না, আজ নয়। যেদিন তোকে সাক্ষী দিতে হবে, সেদিন যাবি।'

সমন ওর নামেও আছে। শশাঙ্কের চাকর আর ড্রাইভার দুজনকেই বাদীপক্ষ সাক্ষী মেনেছে।

হেমন্তের স্নিগ্ধ শান্ত, উজ্জ্বল রোদের সকাল। দশটার পরে শহর কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আর সব কাজ ফেলে শশাঙ্ক ছুটেছে কোর্টে। ছুটেছে মানে কি, ছুটতে বাধ্য হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের সমন তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। যদিও তার ধনবল আছে, জনবল আছে, মনোবলও একেবারে শূন্য নয়। তবু যেতে সে বাধ্য। এই আত্মকর্তৃত্বহীন পরবশতার সঙ্গে পরিচয় আছে শশাঙ্কের। ভালো করেই পরিচয় আছে। অন্য দিন অসংযত প্রবৃত্তি তাকে ভিন্ন পথে টেনে নিয়ে যায়। আজ সেই প্রবৃত্তি ম্যাজিস্ট্রেটের সমন হয়ে তাকে আদালতের পথে নিয়ে চলেছে।

কিন্তু ব্যাপারটাকে এভাবেই দেখছে কেন শশাঙ্ক? কেন সে ভাবতে পারছে না সে স্বেচ্ছায় যাচ্ছে? নিজেকে দোষমুক্ত করতে যাচ্ছে, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। কেউ যদি তাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেয়, সেই মিথ্যার জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করাই তো তার কর্তব্য। তার সততায় অনেকেরই বিশ্বাস নেই। মামলার রায় তার পক্ষে গেলেও তারা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তাতে কী এসে যায়। শশাঙ্ক নিজে তো জানে, ব্যাপারটা কি। সে জানে আর মন্দিরাও জানে। সে নিশ্চয়ই সত্য কথা বলবে। যদিও তার কথাও কেউ বিশ্বাস করবে না। মুরারিদার পরামর্শমত শশাঙ্ক চেষ্টা করেছিল মন্দিরার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পেরে ওঠেনি। নিরঞ্জনবাবু মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের উকিল কী পরামর্শ তাঁদের দিয়েছেন, কে জানে। মন্দিরার কাকার ব্যবহার ভালো লাগেনি শশাঙ্কের। তবে এইটুকু ভরসা তিনি দিয়েছেন, তাঁর ভাইঝি সত্য ছাড়া মিথ্যা বলবে না। শশাঙ্কবাবু যদি অনেস্ট হন, তাঁর এত ঘাবড়াবার কী আছে। এর পর আর শশাঙ্ক বেশি সাধাসাধি করতে যায়নি। মুরারিদার প্ররোচনাতেও না। তার মর্যাদায় বেঁধেছে। মুরারিদা বলেছিলেন, 'চল হে, তোমার বান্ধবীর সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি। ভয় নেই হে, আমি এখন গজভুক্ত কপিত্থ। আমাকে দিয়ে তোমার কোন ভয় নেই।'

ভয় মুরারিদাকে নয়, ভয় তার মাত্রাধিক স্পর্শকাতরতাকে। নিরঞ্জনবাবুর অবজ্ঞা অবহেলা বিদ্রূপ পরিহাস সে সহ্য করতে পারবে না। আত্মরক্ষার খাতিরেও না।

যদিও এখানে আত্মরক্ষা মানে সত্যরক্ষা। সত্য? বিবাহবহির্ভূত নরনারীর দেহমিলনকে সে কি অতই ঘৃণা ভয় আর লজ্জার চোখে দেখে? বরং তার ধারণা কি সম্পূর্ণ বিপরীতই নয়? সত্যরক্ষা হতো, যদি কোর্টে দাঁড়িয়ে নিজের বিশ্বাসের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারত। কিন্তু তা সে পারবে না, করবেও না। সে শুধু তুচ্ছ একটা ঘটনাগত সত্যতার প্রমাণ দিতে যাচ্ছে। বলতে যাচ্ছে, যে আইন সে বিশ্বাস করে না, সে আইন সে ভঙ্গ করেনি। বিশ্বাস করে না, আদালতে দাঁড়িয়ে একথা বলবার সাহস তার নেই। আইনভঙ্গ

করেনি, এই অর্ধসত্যটুকু সে শুধু উচ্চারণ করবে এবং উকিলের সহায়তায় প্রমাণ করবে।

এর চেয়ে ভালো হতো, যদি যথার্থই বিদ্রোহী হয়ে অভিযুক্ত হতো শশাঙ্ক। যদি কোন পূর্ণ সত্য উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠার কাজে অভিযুক্ত হতো। আজ আসামী হয়েও সে নিজের গাড়িতে সগৌরবে যাচ্ছে। কিন্তু লোকলজ্জায় তাদের মিথ্যা অবিশ্বাসের ভয়ে মাথা উঁচু করে যেতে পারছে না। কিন্তু মহৎ কোন সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে, যথার্থ কোন বিদ্রোহী বিপ্লবীর ভূমিকা সে যদি নিতে পারে, তা হলে হাতে কড়া, কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে যদি রাজপথ দিয়ে কেউ টেনেও নিয়ে যেত, তা হলেও মান যেত না শশাঙ্কের, মাথা উঁচু থাকত, আর তার সেই কয়েদীর বেশই হতো রাজবেশ।

ড্রাইভার বলল, 'বাবু, আমরা এসে গেছি।'

শশাঙ্ক দেখল, কোর্টের সামনে গাড়ি রেখেছে ড্রাইভার।

আর এই দিনদুপুরেও শশাঙ্কের মনে হল, পুরোন বাড়িটা একটা ভুতুড়ে বাড়ির মত দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে বাইরে ছায়ামূর্তির আনাগোনা।

মুহূর্তের জন্যে এক অশরীরী অলৌকিক ভয় তার সর্বাঙ্গ হিমশীতল করে দিল।

পরমুহূর্তেই অবশ্য গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল শশাঙ্ক। নিজের আর্ততাকে উপহাস করে আদালতের দিকে এগিয়ে গেল।

যেন আর এক জগৎ।

আদালতের সা[illegible] দাঁড়িয়ে প্রথমে সেই কথাই মনে হল শশাঙ্কের। অপরিচিত লোকজনের আনাগোনা সবাই কম বেশি ব্যস্ত। দুজন লোক বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে কথা বলছে। যেন কোন গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। গলাবন্ধ কালো কোট পরা বেঁটে ভুঁড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক করিডোরের এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেলেন। শশাঙ্কের মনে হল ভদ্রলোক অমন শোকের পোশাক পরে আছেন কেন। শুধু বেঁটে ভদ্রলোকই নন, আরো দুজন লম্বা ভদ্রলোকের গায়েও কালো কোট। রাজ্যসুদ্ধ লোক কি শোকাভিভূত? না কি এই কৃষ্ণত্ব শশাঙ্কের অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতের প্রতীক?

কালো রঙের প্রতি কোর্টের পক্ষপাত আরো দেখতে পেল শশাঙ্ক। চারদিক বন্ধ বেটপ চেহারার কালো রঙের একটি সিন্দুক কোর্টের সামনে এসে দাঁড়ালো। পুলিস ভ্যান। তারপর সেই সিন্দুকের পিছন দিকটা খুলে দেওয়া হল। তার ভিতর থেকে হাতকড়া পরা কয়েদীদের টেনে টেনে নামানো হতে লাগল। এদের জামা-কাপড় কালো রঙের নয়, তবে ময়লা আধ-ময়লা। আর গায়ের রঙ মুখের রঙ বেশির ভাগই কালো। কেন? শশাঙ্কের মতই লজ্জায় আশঙ্কায় ভয়ে অনুশোচনায়? না কি এই ওদের স্বাভাবিক গাত্রবর্ণ? ওদের

সবাই যে নরম স্বভাবের তা শশাঙ্কের মনে হল না। কারো কারো চোখে মুখে বেশ বেপরোয়াভাব ফুটে উঠেছে। যেন এই সমাজ সংসারের কোন রীতিনীতি ওরা গ্রাহ্য করে না। থোড়াই কেয়ার করে। শশাঙ্কও যদি অমন হতে পারত। অমন নির্ভীক বিদ্রোহী সমাজ-দ্রোহী। কিন্তু শশাঙ্কের সেই স্বভাব নয়। সে যদি ওই কয়েদীদের ভ্যানে থাকত তাহলে তাকেও ভয়ে শঙ্কায় আধমরা হয়ে থাকতে হতো। শশাঙ্কের গড়নের মধ্যে সেই দুর্জয় সাহস, দুর্বার তেজস্বিতা নেই। নেই, কিন্তু থাকলে যেন ভালো হতো। শশাঙ্ক ভাবল, আমরা যা হয়েছি তাতে আমরা সুখী নই। আমরা যা হতে পারিনি তাই হতে চাই। আর সেই চাওয়ার মধ্যে যেন পাওয়ার স্বাদ পাই। আমাদের স্বপ্ন কল্পনা আকাঙ্ক্ষা এক আমিত্ব থেকে আর-এক আমিত্বে নিয়ে যায়।

শশাঙ্ক বীরের দলে নয়, ভীরুর দলে। সার্থক সফল সিদ্ধকামের দলে নয়, নিষ্ফল নিরাশা নিরর্থকের দলে। তাই ভীত, বিপর্যস্ত মুখগুলিই যেন তার বেশি করে চোখে পড়ল। 'I am not alone, I am with thee' একথা এতদিন শুধু প্রণয়িনীদের বলেছে শশাঙ্ক। আজ তার বলতে ইচ্ছা হল, 'আমি তোমাদের সবাইর সঙ্গে আছি।' শশাঙ্কের ভিতরের বন্দী বাইরের বন্দীদের সঙ্গে যেন এক যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছে। সত্যিই এক নতুন জগতে, নতুন বোধের জগতে এসে উপস্থিত হয়েছে শশাঙ্ক।

'স্যার, আপনি এখানে? আসুন, ভিতরে আসুন।'

আমন্ত্রণকারীকে হঠাৎ যেন চিনতে পারল না শশাঙ্ক। বেঁটে-খাটো চেহারা। পরনে খাটো ধুতি। গায়ে একটা আধময়লা ছিটের সার্ট। মাঝখানে সিঁথি, পান দোক্তার রসে দাঁতগুলি কালো। পুরুষের এ ধরনের সিঁথি পছন্দ করে না শশাঙ্ক, বিবর্ণ দাঁতও তার চক্ষুশূল।

'কে আপনি?'

'আমাকে চিনতে পারছেন না স্যার? আমি হরিবাবু।'

নিজেই নিজের নামের সঙ্গে বাবু শব্দটি যোগ করে দিলেন ভদ্রলোক, পাছে শশাঙ্ক যোগ না করে।

'আমি সুধাময়বাবুর মুহুরী। আপনি আমাকে আগেও দেখেছেন স্যার। মনে রাখতে পারেননি। আমরা সাধারণ সামান্য মানুষ।' হরিবাবু তাঁর কালো দাঁতগুলি বার করে ফের একটু হাসলেন।

শশাঙ্ক লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, কিছু মনে করবেন না।'

হরিবাবু বললেন, 'খুবই স্বাভাবিক স্যার, খুবই স্বাভাবিক। এমন বিশ্রী ধরনের মামলায় কারো কি জড়িয়ে পড়লে মাথাটা কিছু ঠিক থাকে? তবে ঘাবড়াবেন না স্যার। খুব স্ট্রং কেস আমাদের। এই তো সব নথিপত্র আমার কাছেই আছে।'

হাতে ভাঁজ করা ফিতেবাঁধা লম্বা কাগজখানার দিকে যেন একটু সন্দেহে তাকালেন হরিবাবু। তারপর ফের সেই অভয়ঙ্কর হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠল।

'আমি সব দেখেছি স্যার। খুব স্ট্রং কেস।'

শশাঙ্কের এতক্ষণে খেয়াল হল। জিজ্ঞাসা করল, 'উকিলবাবু কোথায় গেলেন?

হরিবাবু একটু কৈফিয়তের ভঙ্গিতে হেসে বললেন, 'তিনি একটু ব্যাঙ্কশাল কোর্টে গিয়েছেন স্যার। আর একটা কেস আছে সেখানে। পুরোন কেস। জঘন্য এক খুনের মামলা। তার মধ্যেও স্যার মেয়েছেলে জড়ানো। ওই একটা জাত স্যার। ও-জাত যেখানে আছে সেখানেই কেলেঙ্কারি। আসুন, লাইব্রেরী ঘরে আপনাকে বসতে বলে গেছেন উকিলবাবু।'

শশাঙ্ক অপ্রসন্ন হয়ে বলল, 'তিনি আমার কেস ফেলে সেখানে গেলেন কেন?'

'কিছু ভাববেন না স্যার, আপনার কেসের ডাক হতে অনেক দেরি। বারোটার আগে আপনার কেস আরম্ভ হবে না। উকিলবাবু সব জেনে শুনে ব্যবস্থা করে গেছেন। সব এজলাসের সঙ্গেই তো চেনা পরিচয় আছে। কিছু অসুবিধে হবে না স্যার। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।'

যেতে যেতে চোখে পড়ল দেয়াল ঘেঁষে বেঞ্চ পাতা। তাতে র‍্যাপার জড়ানো কয়েকজন লোক বসে বসে বিড়ি টানছে।

শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করল, 'ওদেরও বোধ হয় কেস আছে?'

হরিবাবু বললেন, 'হ্যাঁ স্যার। কত রকমের কত চোর, জোচ্চোর জালিয়াত মতলববাজ আসে এখানে। এ এক আজব জায়গা স্যার।'

এই সব রাম শ্যাম যদু মধুদের দিকে শশাঙ্ক এর আগে তাকিয়েও দেখত না। অবজ্ঞায় অবহেলায় যে চোখ ফিরিয়ে থাকত তা নয়। এইসব প্রাকৃত জন তার চোখে পড়ত না। এদের অস্তিত্বই যেন ছিল না তার কাছে। শুধু মধুর রসের উপাসক মধুর রসের আস্বাদক, শশাঙ্ক নারীর মধুর মূর্তির দিকে অপলকে তাকিয়ে রয়েছে। আর কোন দিকে তাকাবার তার সময় ছিল না, প্রবৃত্তি প্রবণতা ছিল না। আজ সেই মধুর রসের পাত্র তিক্ততায় ভরে উঠেছে। আজ শশাঙ্ককে নীলকণ্ঠ হতে হবে। যদি তা সে হতে পারে তবেই সে যথার্থ প্রণয়ী, জীবন-প্রেমিক।

দুধারে লম্বা দরজাওয়ালা ম্যাজিস্ট্রেট, অ্যাডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটদের এজলাস। ভিতরে বিচার হচ্ছে। শশাঙ্ক ভাবল, তার মত কত নিরপরাধ অপরাধী হিসাবে অভিযুক্ত হয়েছে কে জানে। আজ তাদের সঙ্গে শশাঙ্ক একাত্ম।

'আসুন স্যার, এই ঘরে আসুন।' হরিবাবু কাটা দরজা ঠেলে বড় একখানা ঘরের মধ্যে তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

মাঝখানে লম্বা একখানা টেবিল পাতা। দুধারে সারি সারি চেয়ার। শামলা কাঁধে কোট গায়ে কয়েকজন উকিল বসে আছেন। নথির পিঠে কী যেন লিখছেন। বুড়ো মত এক ভদ্রলোক বসে বসে ঘুমোচ্ছেন। আর তাঁরই প্রায় সমবয়সী দুজন দাবা নিয়ে বসেছেন। ওঁদের বোধ হয় আজ আর কোন কেস নেই। এজলাসে গিয়ে ওঁদের বোধ হয় আজ আর বাক্‌যুদ্ধে নামতে হবে না। দাবার কোটে ওঁদের আজ অশ্ব-গজের যুদ্ধ।

শশাঙ্ক কী দেখছে তা লক্ষ্য করে হরিবাবু একটু হাসলেন, 'ওঁরা স্যার আজকাল খেলতেই আসেন। কেসপত্তর বড় একটা থাকে না। তবু আসেন। কেউ তিরিশ বছর ধরে আসছেন, কেউ চল্লিশ বছর ধরে। কতকালের অজানা সেই অভ্যাসের জোরে আসেন। না এলে খিদে হয় না, হজম হয় না।'

অভ্যাসের বাঁধন যে কী শক্ত বাঁধন তা শশাঙ্ক জানে। কিন্তু আশ্চর্য সেই অভ্যাসের শক্তি। জীর্ণতাকে তা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নবত্ব দিতে পারে। উপভোগ সম্ভোগের সময় ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি নিজেকে অভিনব মোহন আবরণে আবৃত করে। সেই উজ্জ্বলবর্ণের মুখোশ খুলে পড়ে তারপর। কিন্তু কে বলবে সেই ক্ষণায়ু বর্ণাঢ্যতা অসত্য? এই অনিত্য সংসারে মুখ যদি সত্য হয়, মুখোশও সত্য।

কোণের দিকের একটি খালি চেয়ারের কাছে শশাঙ্ককে নিয়ে গিয়ে হরিবাবু বললেন, 'বসুন স্যার। এই আমাদের উকিলবাবুর চেয়ার। বসুন আপনি এখানে।'

শশাঙ্ক বলল, 'এখানে বসব?'

'বসবেন বই কি স্যার।' হরিবাবু ফের হাসলেন। এখন আর তাঁর কালো দাঁতগুলি তত বিসদৃশ লাগছে না শশাঙ্কের। এখন এই হরিবাবুই তার পরম সহায়। এখন তাঁর কালো দন্তপংক্তিও মুক্তাপংক্তির মত মনোহর।

হরিবাবু বলতে লাগলেন, 'আপনি কি যে-সে মানুষ স্যার? আপনি এর চেয়েও কত বড় বড় আসন অলংকৃত করেছেন। আমি সব জানি। আপনার মত মক্কেল পাওয়া ভাগ্যের কথা। উকিলবাবুদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব স্যার?'

শশাঙ্ক বলল, 'না না, আমার কোন পরিচয় দিতে হবে না।'

এক শশাঙ্ক এতদিন আর-এক শশাঙ্কের নাম ভাঙিয়ে খেয়েছে। আজ তার অবসান হোক।

হরিবাবু মুখ টিপে একটু হাসলেন, 'আপনি মিছামিছি লজ্জা পাচ্ছেন স্যার। কত বড় বড় লোক এখানে আসেন। কত বড় বড় ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন। তাতে লজ্জার কী আছে স্যার। এই আদালত হল সমাজের আয়না। পানের দোকানের সামনে যেমন লম্বা লম্বা আয়না থাকে অনেকটা সেই রকম। ছোট বড় গরীব বড়লোক এই আয়নায় সবাইর মুখেরই ছায়া পড়ে স্যার।

হরিবাবু স্মিতমুখে একটুকাল দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর কী একটা দরকারি কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আমি একটু আসি স্যার। তিন নম্বর এজলাসে আবার একটা কেস আছে। কখন ডাক-টাক হবে পেশকারের কাছে একটু খোঁজ নিয়ে আসি। বেয়ারাকে বলে রেখে যাচ্ছি। চা পান সিগারেট যখন যা দরকার ডেকে বলবেন, দিয়ে যাবে। কোন চিন্তা করবেন না স্যার।'

হরিবাবু চলে যাচ্ছিলেন, শশাঙ্কের হঠাৎ খেয়াল হল। একখানা দশ টাকার নোট তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার কাছে খুচরো নেই। এক প্যাকেট সিগারেট পাঠিয়ে দেবেন। চেঞ্জ ফেরত দিতে হবে না। আপনার কাছে রেখে দেবেন।'

একটু ইতস্তত করে টাকাটা হাত পেতে নিলেন হরিবাবু। সম্মান আর লোভের মুহূর্তব্যাপী দ্বন্দ্ব এই গরীব মুহুরীর মুখে প্রত্যক্ষ করল শশাঙ্ক।

টাকাটা হাতে নিয়েও হরিবাবু বললেন, 'আমি কিন্তু টাকা চাইনি স্যার।'

শশাঙ্ক বলল, 'কিছু মনে করবেন না। রেখে দিন। মামলার ব্যাপারে কতরকম কত দরকার হয়।'

শশাঙ্ক ভাবল এই দ্বন্দ্ব তার নিজের মধ্যেও কি কম? হরিবাবুর মতই সেও বার বার লোভের কাছে পরাজিত হয়েছে। কিন্তু সেই পরাজয়ই কি সব? সংগ্রাম কিছুই নয়? আক্ষেপ অনুশোচনার মধ্যে যে উত্তরণের অঙ্কুর বার বার উদ্গত হয়ে উঠতে চায় তার দাম কি কিছুই নেই।

জানলা দিয়ে নিষ্পত্র বৃহৎ একটি গাছের দিকে চোখ পড়ল শশাঙ্কের। গাছটি হয় মৃত না হয় মুমূর্ষু। শুধু ডাল-পালার কাঠামোটি আছে। আশ্চর্য, আজ শুধুই অশুভ অপ্রীতিকর বস্তুগুলি চোখে পড়ছে শশাঙ্কের। বস্তুগুলি অপ্রীতিকর নয়, এক অকল্যাণের আশঙ্কায় তার মন এমন সঙ্কুচিত হয়ে রয়েছে যে, সে যা দেখছে তারই একটা অশুভ ব্যাখ্যা তৈরি করে নিচ্ছে। শশাঙ্ক হাসল, এরই নাম কুসংস্কার। তার মনে হল, 'আমরা যতই বৈজ্ঞানিক যুক্তি-বুদ্ধির অহঙ্কার করি, বিপদ-আপদের আশঙ্কা মাত্রে অন্ধ সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে অনির্দিষ্ট অবয়বহীন বিভীষিকা আমাদের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দেয়। তখন আমরা ফের সেই আদিম প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে যাই। আমরা কালো রঙের মধ্যে অমঙ্গলের চিহ্ন দেখি, শুকনো ডালকে দুর্দৈবের লক্ষণ বলে মনে করি। আমরা নতুন নতুন অপদেবতা সৃষ্টি করে নিজেদের রক্তে তার পদধ্বনি শুনি।'

শশাঙ্ক লক্ষ্য করল, সে এককোণে এসে বসলেও অনেকের দৃষ্টির কেন্দ্রে রয়েছে। অনেকেই তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন। তার চেহারাটা যে দেখবার মত তা সে জানে। কিন্তু সে দেখতে সুন্দর বলেই যে আজ ওঁরা দেখছেন তা শশাঙ্কের মনে হল না। আজ সে কৌতূহলের পাত্র। হয়তো

উকিলদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে চিনেছেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথাও হয়তো কেউ কেউ জেনেছেন। আজ শশাঙ্কের রূপ ওঁরা কেউ দেখছেন না, দেখছেন একটি কিম্ভূতকিমাকার মানুষকে। কতদিন শশাঙ্ক তার উৎসুক কৌতূহলী দৃষ্টিতে অপরিচিতা মেয়েদের অস্বস্তি বাড়িয়েছে, আজ আর পাঁচজনের দৃষ্টির সামনে তার কুণ্ঠিত আড়ষ্ট হয়ে থাকবার পালা।

'আরে তুমি এখানে চুপচাপ বসে আছ। আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান।'

মুরারিমোহন এসে পাশে বসলেন। শশাঙ্ক ফের উৎসাহিত হয়ে উঠল। একটি পরিচিত মুখ, পরিচিত হাসি, চেনা কণ্ঠ তাকে ফের নিজের দেশে ফিরিয়ে এনেছে। বিরূপ প্রতিকূল পৃথিবী এবার প্রিয় বন্ধুর পিঠের আড়ালে অন্তর্হিত হয়েছে। মুরারির চোখে চোখ রেখে শশাঙ্ক হাসল, 'আমাকে কোথায় খুঁজেছ?'

বন্ধুর দিকে সিগারেট কেস বাড়িয়ে ধরে মুরারিমোহন বললেন, 'কোথায় খুঁজিনি তাই বলো? কোর্টের আনাচে-কানাচে, এ কোণে সে কোণে। শেষে ভাবলাম, বুঝি বা পালিয়ে পগার পার হয়েছ, আমার জামিনের টাকাটা এবার যাবে।'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'তুমি আমাকে ওইরকম ভাব বুঝি? কাণ্ড দেখ। সুধাময়বাবু এখনো এসে পৌঁছলেন না।'

মুরারিমোহন বললেন, 'ঠিক পৌঁছবেন। ওঁরা জানেন কখন কোন ঘাটে পৌঁছাতে হয়। শুধু সুধাময়বাবুর দোষ দিলে কি হবে, আমরা সবাই এমন ঘাটে ঘাটে ফুল ছিটিয়ে বেড়াই। কেউ মক্কেলদের, কেউ বা মহিলাদের।'

শশাঙ্ক বন্ধুকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'আঃ থামো।'

মুরারিমোহন হেসে বললেন, 'এতদূর! মকারের প্রসঙ্গেই কানে আঙুল। কী করছিলে বসে বসে। এর পর শুনানীর তারিখে বগলে করে বইপত্র নিয়ে আসবে। রোমহর্ষক ডিটেকটিভ উপন্যাস-টুপন্যাস পড়বে। হু হু করে কোন দিক দিয়ে যে সময় কেটে যাবে টেরও পাবে না। তুমি তো আবার উচ্চ মার্গের সূক্ষ্ম রুচির মানুষ। তোমার জন্যে গীতা মদ্ভাগবত প্রেসক্রাইব করাই ভালো।'

সুধাময় বারটার কিছু আগেই এসে পৌঁছলেন। মুহুরির মতই ছোটখাটো চেহারা। কিন্তু উকিল হিসাবে বড়। বিপক্ষের উকিলের চেয়ে ফীস আর পসার-প্রতিপত্তি অনেক বেশি। তাঁরও গায়ের রঙ, পোশাকের রঙ সবই কালো। কিন্তু এই কৃষ্ণতা শশাঙ্কের মনে নতুন কোন অশুভ আশঙ্কার সৃষ্টি করল না।

মুহুরির মত বিনয়ী নন উকিল। নিজের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন। শশাঙ্কের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে এসেছেন আপনারা।'

মুরারিমোহন বললেন, 'আমরা অনেকক্ষণ এসেছি মিঃ সান্যাল।'

সুধাময়বাবু বললেন, 'আপনাদের আগেই আসতে হবে। [illegible] বলে

গিয়েছিলাম। ডাক উঠলেও কোন অসুবিধে হতো না। অবশ্য আমি আসবার আগে উঠবে না তা জানতাম।'

চাল-চলনে ধরন-ধারণে সুধাময় একটু দাম্ভিক—শশাঙ্ক তা লক্ষ্য করল। কিন্তু অন্যের দম্ভ আজ তাকে সহ্য করতে হবে। উকিল আজ তার পরিত্রাতার ভূমিকায় নেমেছেন।

কিছুক্ষণ পরেই হরিবাবু এসে বললেন, 'আসুন আপনারা। আমাদের কেস এবার আরম্ভ হবে।'

উকিল-মুহুরির পিছনে পিছনে লম্বা দরজাওয়ালা বিচারকক্ষে গিয়ে ঢুকল শশাঙ্ক। উচ্চ মঞ্চে ম্যাজিস্ট্রেট আসীন। এই উচ্চতা অন্যের মনে শ্রদ্ধা আর সমীহা জাগাবার জন্যে। যারা বিচারপ্রার্থী তারা যেন নিতান্তই প্রার্থীমাত্র।

মুরারির পাশে একটি চেয়ারে বসে শশাঙ্কের মনে হল, কেসটা তার নিজের হলেও সে যেন পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারছে না। খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছে। তার অস্বস্তি আশঙ্কা ভীতি বিহ্বলতা এই সাধারণ একটি আদালতকেও যেন এক অলৌকিকতায় মুড়ে দিয়েছে। এই কোর্ট যেন এক বিরাট বিপুল রহস্যময় জগৎ। আর শশাঙ্ক তার মাঝখানে ক্ষুদ্র এক ব্যক্তি। এই জগতের সব কিছু দেখা শোনা, ধারণা করা, হৃদয়ঙ্গম করা শশাঙ্কের যেন সাধ্যাতীত। শুধু তাই নয়, তার কৌতূহল, ঔৎসুক্যের বহির্ভূত।

আদালত ঠিক লোকে লোকারণ্য হয়নি। আরো পাঁচটা মামলায় যেমন লোক হয় তার চেয়ে হয়তো কিছু বেশি হয়েছে। মজা দেখবার জন্যে তার সহকর্মীরা কেউ আসেনি, ছাত্রেরা কেউ আসেনি। নিশিবাবু, মন্দিরার কাকা নিরঞ্জনবাবু আর তাঁর সেই উকিল বন্ধু এমনি দু'চারজন ছাড়া প্রায় সবাই অপরিচিত। কিন্তু শশাঙ্কের মনে হল, প্রত্যেকের মুখই যেন তার চেনা চেনা। প্রত্যেকের মুখে সেই অলৌকিকতা, ঠোঁটে অলৌকিক হাসি, যে হাসি মনকে অপ্রীতিকর, অস্বস্তিকর অনুভূতিতে ভরে দেয়। বিচারক যেন শুধু উচ্চমঞ্চে বসে নেই। বিচারক যেন এ কক্ষের প্রত্যেকেই। পক্ষের বিপক্ষের সবাই। শশাঙ্ক নিজেই বুঝতে পারছে, এ তার নার্ভাসনেস। এই মারাত্মক ভীতিপ্রবণতা তাকে সুস্থতার সীমান্ত পার করে দেবে, তার মুখে অপরাধের কালিমা মাখিয়ে দেবে। তার আত্যন্তিক প্রীতিপ্রবণতাও কি এমনি? অসুস্থ বিকার মাত্র? শুধু অসংখ্য শিরা-উপশিরার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া?

মুরারিমোহন হেসে বললেন, 'শোন শোন, তোমার বিরুদ্ধে নালিশের নমুনাটা শোন একবার।'

বিরোধীপক্ষের উকিল তাঁর বিপুল চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর ওই রুক্ষ কর্কশ গলা কি স্বাভাবিক? নাকি এই বিশেষ দিনটিতেই তিনি আজ অমন কটুকণ্ঠ?

'হুজুর, আসামী যে-সে লোক নন। সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। শিক্ষা সংস্কৃতির ধারক-বাহকদের একজন। অধ্যাপনা এ'র বৃত্তি। সুকুমারমতি তরুণ-তরুণীর ইনি আদর্শস্থানীয়। ইনি তাদের গুরু, শিক্ষাদাতা। কিন্তু কী শিক্ষাই ইনি তাদের দিচ্ছেন! কী উচ্চ আদর্শই ইনি তাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। হুজুর, শিক্ষার অর্থ কি শুধু আক্ষরিক শিক্ষা? শুধু কতকগুলি তথ্য আর তত্ত্বের সমাবেশ? Does education only inform the mind? না হুজুর, it forms the mind। আর সংস্কৃতি? দেশ-বিদেশের রাশ রাশ কাব্যসাহিত্য পড়লে, মুখস্থ করলেই কি মানুষ সংস্কৃতি-পরায়ণ হয়? সংস্কৃতি তার আচারে আচরণে, প্রতি দিনের জীবনযাত্রায়। কিন্তু 'শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ'—এই অভিশাপ এখনকার শিক্ষা-গুরুদের মজ্জায় মিশে রয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান শিক্ষাগুরুটি এ ব্যাপারে অতুলনীয়। তাঁর কীর্তি-কাহিনী—'

ম্যাজিস্ট্রেট একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'আসামীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগগুলি কি এবার তাই বলুন।'

বিপুলকায় উকিল মোটেই লজ্জিত হলেন না, স্মিতমুখে বললেন, 'বলছি হুজুর। এক্ষুনি কোর্টসুদ্ধ লোক সেই জঘন্য কেলেঙ্কারির কাহিনী শুনতে পাবেন। সেই অবক্তব্য অশ্রোতব্য কথাগুলি আমার না বলে নিস্তার নেই। হুজুর, মামলার মুখবন্ধে যে কথাগুলি আমি বললাম, আমি তার মৌলিকতা দাবি করি না। এ কথাগুলি এক হিসাবে আমাদের পরম বিদগ্ধ, সংস্কৃতিবান আসামীরই বিভিন্ন বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত। ইচ্ছা হলে হুজুর কাগজের কাটিং-গুলিও দেখতে পারেন। কিন্তু আচার্যের বাক্যে আর আচরণে কি পার্থক্য তাও মামলার ঘটনাবলীর ভিতর দিয়ে, আমাদের সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রমাণে ক্রমে ক্রমে দৃশ্যমান হয়ে উঠবে।

'হুজুর, আসামীর এই অপরাধই প্রথম অপরাধ নয়। তাঁর বাসনার যূপকাষ্ঠে মন্দিরাই প্রথম বলি নয়।'

শশাঙ্কের উকিল সুধাময় উঠে দাঁড়িয়ে বাধা দিলেন, 'আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে এ সব মন্তব্য আপত্তিকর। এ সব কিংবদন্তী জনশ্রুতির কোন প্রমাণ নেই। আমার ক্লায়েন্ট এর আগে কখনো অভিযুক্তও হননি। আমার বিজ্ঞ সহযোগী তাঁর অধিকারের সীমানা পার না হলেই তা আইনসঙ্গত হবে।'

অভিযোগকারী বলে চললেন, 'বিনা প্রমাণে কিছু বলতে যাব, আমাকে এমন বেকুব যেন সহযোগী মনে না করেন। আসামীর প্রকৃতি বর্ণনার জন্যই আমি তাঁর পূর্ব জীবনের কথা উল্লেখ করছিলাম। নইলে হুজুরকে উপাখ্যানের পর উপাখ্যান শুনিয়ে আমারই বা লাভ কি। আসামীর গুণের সীমা নেই। তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতায় অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী গৃহত্যাগ করে আশ্রম-বাসিনী হয়েছেন। চরিত্রহীনতার জন্যে ইতিপূর্বে একাধিকবার আসামীর

চাকরি গেছে। আসামী যেমন বহু সদ্গুণের অভ্যাস করেছেন, বিদ্যা পাণ্ডিত্য বাগ্মিতা অর্জন করেছেন, তেমনি সজ্ঞানে সযত্নে বহুবল্লভতারও অনুশীলন করেছেন। ধীরে ধীরে এই প্রবৃত্তিও তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। Habit is the second nature আমরা কে না জানি। হুজুর, এই দ্বিতীয়া প্রকৃতি দ্বিতীয়পক্ষের ভার্যার মতই অসীম প্রতাপশালিনী।'

ম্যাজিস্ট্রেট আর-একবার অধীরতা প্রকাশ করায় ফরিয়াদী পক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগগুলি তুলে ধরলেন।

অল্প বয়সেই মন্দিরা আসামীর ছাত্রী ও স্নেহের পাত্রী ছিল, অভিযোক্তা সে কথা বললেন। নিজের রূপ গুণ বিদ্যাবত্তা রসজ্ঞতা দিয়ে কিভাবে সেই সরলা কিশোরীর মনে ধীরে ধীরে আসামী মোহ বিস্তার করেছেন, উকিল তার বর্ণনা দিচ্ছেন। নিজের মেয়েকে রক্ষা করবার জন্য বাপ অধ্যাপকের কবল থেকে তাকে ছাড়িয়ে এনে সৎপাত্র দেখে তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিলেন। আসামীর যদি সুবুদ্ধি সুবিবেচনা থাকত, তাহলে এখানেই এই ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারত। মন্দিরা সুখে স্বচ্ছন্দে স্বামীর সঙ্গে ঘরসংসার করত। মোহমুক্ত হতে তার দু এক বছরের বেশি সময় লাগত না। হুজুর জানেন, ওই বয়সী ছেলেমেয়েদের বয়স ভুলবারই বয়স। বাস্তব সংসারের স্পর্শে যথার্থ স্নেহ প্রীতি ভালোবাসার স্বাদ পেলে মোহ কতক্ষণ টিঁকে থাকে? মন্দিরারও সেই মোহ স্থায়ী হওয়ার কোন কারণ ছিল না। সেও স্বামী সংসার নিয়ে যথাসময়ে সুখী হতে পারত। কিন্তু, বিজ্ঞ, রসজ্ঞ প্রেমিক কিন্তু হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তা হতে দিলেন না। তিনি দুষ্ট গ্রহের মত ফের গিয়ে সেই সুখের সংসারে হানা দিলেন। আর, একটি তরুণ দম্পতির জীবনকে ভবিষ্যৎ রাহুর মত গ্রাস করলেন। নিশিবাবুর মত এক বৃদ্ধ সরল ভদ্রলোককে সঙ্গী করে মীরপুরের একটি সুখের নীড়ে গিয়ে হাজির হলেন। আতিথ্যের অবমাননা করলেন। মিহিরবাবুর মত অমন একজন সরল সহৃদয় গৃহীর প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করতে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা এল না। খাদের অন্ধকারে তরুণীকে পথ ভোলালেন। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, সুচতুর কলাকৌশলে তার মনে ফের বাসনার ইন্ধন জেলে তুললেন। সেই মশালে নির্বোধ নারী নিজের ঘর পোড়াল। আসামীরই ইঙ্গিতে প্ররোচনায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। উন্মাদিনী আর কাকে বলে। কিন্তু এই মত্ততার জন্যে সেই বালিকাকে দায়ী করলে ভুল হবে। ষোল-আনা না হোক, পৌনে ষোল আনা দায়িত্ব এই প্রৌঢ় প্রণয়-বিশারদের। তারপর বশীভূতা নারীকে নিজের ঘরে পেয়ে আসামী তার হীন বাসনা চরিতার্থ করলেন। কিন্তু আসামী সুচতুর অভিজ্ঞ মানুষ। হাঙ্গামার ভয়ে পাড়াপড়শীদের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভয়ে প্রণয়িনীকে নিজের ঘরে রাখবার সাহস পেলেন না। ভালোমানুষ সেজে গাড়িতে করে তাড়াতাড়ি তার কাকার কাছে পৌঁছে দিয়ে এলেন। গোপন অভিসারের সুড়ঙ্গ খোলাই রইল।

বশীকরণের বাঁধন একটুও শিথিল হল না। তা যদি হতো, মন্দিরা তার স্বামীর কাছে ফিরে যেত। সেই সুযোগ তাকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে ফিরে আসেনি। আসবে কি? সর্বনাশের মোহপাশে সে এখনো আবদ্ধ।

উকিল তাঁর মুখবন্ধ শেষ করলেন। এবার সাক্ষীরা তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রমাণিত করবে।

প্রথম সাক্ষী ফরিয়াদী স্বয়ং। প্রতারিত প্রবঞ্চিত স্বামী মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়।

শশাঙ্ক লক্ষ্য করল, অসংকোচে দৃঢ় পায়ে মিহির সাক্ষীর কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে গেল। সে যেন আর কাউকে চেনে না। আর কোন দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। মাটির মানুষের মুখে আজ পাথরের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ কি বীরত্ব না মরীয়াপনা। প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখে শশাঙ্কের আজ হঠাৎ যেন একটু কষ্ট হল। কী একটা ভুল ধারণার ফলেই না মিহির আজ তার পরম বৈরী হয়ে উঠেছে। কিন্তু, তার ভুল ভাঙবার ক্ষমতা এখন আর শশাঙ্কের নেই। অনেক ভাঙাচুরার ভিতর দিয়েই দুজনকে এগিয়ে যেতে হবে। গন্তব্য যে কোথায় তা কারোরই জানা নেই।

'আপনার নাম মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়?'

'হ্যাঁ।'

'মন্দিরা আপনার বিবাহিতা স্ত্রী?'

'হ্যাঁ।'

মুরারিমোহন মৃদুস্বরে শশাঙ্কের কানে কানে বললেন, 'স্ত্রী আবার অবিবাহিতা হয় নাকি? তা হলে একটি উপসর্গ বসাতে হয়।'

মিহির আর মন্দিরার বিয়ে যে হয়েছিল তা কেউ চ্যালেঞ্জ করেনি। তাই জবানবন্দীর এ অংশ সংক্ষেপেই শেষ হল। বিয়ের সন-তারিখ স্থান-কাল মিহির যথাযথ বলে গেল। শশাঙ্ক খানিকটা শুনল, খানিকটা বা শুনল না। মনে পড়ল, এই বিয়ের দিন মন্দিরাকে একরাশ কবিতার বই উপহার পাঠিয়েছিল। আর যোগ-রঞ্জন সব বই ফেরত পাঠিয়েছিলেন। তার কোন উপহারই গ্রহণ করেননি। আজ শশাঙ্কের মনে হল, খুব হাস্যকর হয়েছিল বইগুলি পাঠানো। ছেলেমানুষি ছাড়া আর কি। শশাঙ্ক কাব্য দিয়ে নিজের অসঙ্গত আচরণকে ঢাকতে চেয়েছিল। তা কি ঢাকা পড়ে? কিন্তু শশাঙ্ক কি সত্যিই কিছু ঢাকতে চেয়েছিল? না কি, পাঠাবার আনন্দেই পাঠিয়েছিল বইগুলি? স্পর্শলোভী শশাঙ্ক হয়তো সেদিন ভেবেছিল, 'এমন কোন জিনিস পাঠাব না যা তার দেহকে স্পর্শ করে। যা তার স্থূল প্রয়োজনে লাগবে। এমন বস্তু পাঠাব যা বস্তু হয়েও বস্তু নয়।'

উকিল এবার গুরুতর প্রশ্ন করলেন, 'আপনার স্ত্রী যে আপনাকে ভালো-বাসেন না তা আপনি কবে থেকে জানলেন?'

'প্রথম দিন থেকে।'

মিহিরের পক্ষের উকিল একটু যেন থমকে গেলেন। তিনি এই জবাব যেন প্রত্যাশা করেননি। হয়তো ভেবেছিলেন, মিহির বলবে ধীরে ধীরে সে জানতে পেরেছে।

এবার উকিল সতর্কভাবে এগোতে লাগলেন, 'প্রথম দিন থেকেই আপনি জানতে পারলেন আপনার স্ত্রী অন্যের প্রতি আসক্ত?'

'হ্যাঁ, বিশেষ করে শুভরাত্রির দিন। সেদিন সে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেছিল, সে কারো কাছে কিছু চায় না। স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা-ক্ষমা কিছুই তার কাম্য নয়।'

উকিল বললেন, 'নিশ্চয়ই এই ধরনের উক্তি সন্দেহজনক। ফুলশয্যার রাত আনন্দের রাত। এ কথা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন। কি নারী কি পুরুষ কারো জীবনেই এমন মধু-রজনী খুব বেশি আসে না। এমন রাত যে মেয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, যে রাত্রে কি মেয়ে কি পুরুষ কারোরই চাওয়া-পাওয়ার সীমা থাকে না, তেমন রাত্রে নতুন বউ যদি বলে 'চাই না, চাই না' তাহলে তার ব্যবহারে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। আপনি কি জানতে চেয়েছিলেন আপনার স্ত্রী কেন কাঁদছে, তার দুঃখ কিসের!'

'না।'

'আপনি নিশ্চয়ই নিজেও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। হুজুর, এমন মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা যেন কারো জীবনে না আসে। নবীন যুবক কত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিয়ে করেছে, শুভরাত্রি আনন্দে আহ্লাদে কাটবে, কিন্তু সেই রাত্রে তিনি শুধু স্ত্রীর কান্না শুনে রাত ভোর করলেন।—তারপর স্বভাবতই আপনি আপনার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। নিশ্চয়ই আপনি সহানুভূতির সঙ্গে বিষয়টা ভেবে দেখলেন। আপনার তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে নিশ্চয়ই প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার আপনি করেছেন?'

মিহির বলল, 'হ্যাঁ। আমি তার সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করিনি।'

ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করলেন, 'দুর্ব্যবহার না করা আর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করা এক কথা নয়। যে মেয়ে বিয়ের আগে অন্য পুরুষকে ভালোবেসেছে বিয়ের পরেই আপনি তার মুখ থেকে সে কথা শুনতে পেলেন। আপনার মনে কোন রকম বিরূপতা এল না, স্ত্রীর প্রতি আপনার মনে কোন রকম ঘৃণা বিদ্বেষ এল না, এ কি স্বাভাবিক?'

মিহির বলল, 'আমি যে একেবারে ঘৃণা-বিদ্বেষমুক্ত ছিলাম তা নয়। কিন্তু এই ঘটনাকে একটা ঘটনামাত্র বলেই আমি মেনে নিয়েছিলাম। আমি নিজেকে বুঝিয়েছিলাম, এ একটা সংস্কার মাত্র। মাঝে মাঝে আমার মনে বিরূপতা যদি এসেও থাকে আমি তাকে উপরে উঠতে দিইনি। যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে আমার মনের সংকীর্ণতাকে আমি জয় করতে চেষ্টা করেছি। আমি আমার

স্ত্রীর অতীত জীবন নিয়ে আলোচনা করিনি, তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিনি, কখনো কোন অপমানের কথা বলিনি। আমি ভেবেছি, আমি যখন আমার স্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছি, শুধু ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নয়, তাকে ভালোবেসে সুখী করবার দায়িত্ব নিয়েছি, তখন আমাকে সহিষ্ণু হতে হবে। আমি যদি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি, আমি তার ভালোবাসা সঙ্গে সঙ্গে না পেলেও ভবিষ্যতে পাব। সেই বিশ্বাস আমার ছিল, ধৈর্যও ছিল। দাম্পত্যজীবনকে আমি এক বছরের মেয়াদে ভাবিনি। এক-জীবনের মেয়াদে ভেবেছিলাম।'

মিহিরের ভাবাবেগ কোর্টসুদ্ধ লোককে স্পর্শ করেছে বলে শশাঙ্কের মনে হল। তাকেও কি করেনি? শশাঙ্কের মনে হল, কোথায় যেন মিহিরের সঙ্গে তার একটু মিল আছে। মিহির একটি নারীর ভালোবাসা না পেয়ে নিজেকে বঞ্চিত মনে করছে, আর বহু নারীর ভালোবাসা পেয়েও শশাঙ্কের সেই দশা। সেই একই আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতা, অচরিতার্থতার মর্মজ্বালা। শশাঙ্ক যতবার পেয়েছে ততবার হারিয়েছে। স্বেচ্ছায় হারিয়েছে, অবহেলায় হারিয়েছে। ভেবেছে, হারানোতেই গৌরব। পুরনোকে না হারালে নতুনকে পাওয়া যায় না। আজ হৃতগৌরব শশাঙ্কের মন অন্য কথা বলছে। আজ শশাঙ্কের মনে হচ্ছে প্রেমকে সে সৃষ্টির কাজে লাগাতে পারেনি। সংসার নয়, সন্তান নয়, কাব্য-সাহিত্য-শিল্পকলা কিছুই নয়। সে শুধু সম্ভোগ করেছে। মুহূর্তের সম্ভোগ মুহূর্তেই শেষ করে দিয়েছে। সেই সম্ভোগকে সে শিল্পের সামগ্রী, সৃষ্টির সামগ্রী করে তুলতে পারেনি। তার সংগ্রহশালা তালাবন্ধ। তার কোন ব্যবহার নেই। তার collection আছে, recollection নেই।

মিহিরও পায়নি, শশাঙ্ক ভাবল। আমিও পাইনি। শুধু এইটুকু তফাত, না পাওয়ার জন্যে আমি আদালতে নালিশ করতে আসিনি।

উকিল এগিয়ে চলেছেন, 'এসব জানা সত্ত্বেও আপনার স্ত্রীকে আপনি ভালোবেসেছেন। নিয়মিত শাড়ি-গয়না, তেল-সাবান কিনে দিয়েছেন, হাসবেন না, ভালোবাসারও তো একটা প্রকাশ চাই। তা তো আর নিরাকার হয়ে থাকতে পারে না।'

মিহির বলল, 'নিশ্চয়ই পারে না। তাকে নতুন শাড়ি-গয়না আমি হয়তো বেশি দিইনি। দেওয়ার দরকার ছিল না। বিয়ের সময় সে প্রচুর শাড়ি-গয়না পেয়েছিল। আমি তাকে ছোটখাটো উপহার হয়তো দিইনি, কিন্তু সংসারের মধ্যে তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম। তাকে মর্যাদার আসন, সম্মানের আসন দিয়েছিলাম।'

'আপনি আপনার স্ত্রীকে কর্মস্থলে নিয়ে গিয়েছিলেন কি ওই একই উদ্দেশ্যে?'

'এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে? একান্নবর্তী পরিবারে সে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে না। পদে পদে তার

অসুবিধা হবে। তা ছাড়া তার মনের এই অবস্থায় আমাদের আলাদা থাকা মোটেই সংগত হবে না। তাই তাকে আমি মীরপুরের কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়েছিলাম। ছোট হলেও একটি পুরো সংসারের সর্বময় কর্তৃত্ব তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম।'

'নতুন জায়গায় গিয়ে আপনার স্ত্রীর কোন মানসিক পরিবর্তন কিছু হয়েছিল কি? যাতে হয় আপনি তার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন?'

'নিশ্চয়ই। আমি আমার সামর্থ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি, শুভ ইচ্ছা তার পরিবর্তনের কাজে লাগিয়েছিলাম। আমি তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি আমার কলীগদের সঙ্গে, আলাপ করিয়ে দিয়েছি তাঁদের পরিবারের সবাইর সঙ্গে, মেলামেশার যাতে সুযোগ পায় সেই ব্যবস্থা করেছি, যাতে জায়গাটা তার একঘেয়ে না লাগে সেই দিকে আমার লক্ষ্য ছিল।'

'আপনি সুবিবেচনার কাজ করেছেন। ঘরেও নিশ্চয়ই স্ত্রীকে আপনি আদর-যত্নে রেখেছিলেন। কোন রকম নিগ্রহ, নির্যাতন করেছিলেন কি?'

মিহির বলল, 'নিশ্চয়ই না।'

উকিল জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কোন মানসিক কষ্টও তাকে দেননি?'

মিহির বলল, 'না। অবশ্য তার প্রফেসর বন্ধুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে না পারায় যদি তার মানসিক কষ্ট হয়ে থাকে সে কষ্ট তাকে পেতে হয়েছে। কিন্তু তার সে কষ্টও যাতে কমে আমি তার চেষ্টা করেছিলাম।'

'কি ভাবে?'

'নিশিবাবু যখন শশাঙ্কবাবুকে নিয়ে মীরপুরে বেড়াতে আসবার প্রস্তাব করেন অনেক ভেবে চিন্তে আমি তাতে রাজী হয়েছিলাম। আমার সম্মতি নিয়েই নিশিবাবু শশাঙ্কবাবুকে নিয়ে এসেছিলেন।'

ম্যাজিস্ট্রেট অবাক হয়ে মিহিরের দিকে তাকালেন, 'আপনি কি আশঙ্কা করেননি এর ফল খারাপ হতে পারে? আপনি কি ভেবে দেখেননি এর একটা ভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা হতে পারে?'

মিহির বলল, 'ভেবেছিলাম। কিন্তু এখানেও আমি আমার ক্ষুদ্রতার সঙ্গে, প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, মানুষকে বিশ্বাস করেই তার মনুষ্যত্বকেও জাগিয়ে তোলা যায়। আমি ভেবেছিলাম. শশাঙ্কবাবু আর যাই হোন, অমানুষ নন। উচ্চসমাজের উচ্চ-শিক্ষিত মানুষ, সংস্কৃতিবান মানুষ। তিনি তাঁর শিক্ষা সংস্কৃতির মর্যাদা রাখবেন এই আশা আমি করেছিলাম। বিয়ের আগে ছাত্রীর সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্কই থাকুক, আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। কিন্তু বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে পবিত্র অঙ্গীকার থাকে, তাকে তিনি শ্রদ্ধা করবেন এই আশা আমার ছিল।'

উকিল বললেন, 'আপনি অপাত্রে শ্রদ্ধা করেছিলেন মিহিরবাবু। যে ব্যক্তি

নিজের দাম্পত্য জীবনে চুক্তি রক্ষা করতে পারেননি, বিবাহবিধির শর্তকে চোথা কাগজের মত উড়িয়ে দিয়েছেন, তাকে বিশ্বাস করে আপনি ভুল করেছিলেন। যিনি নিজের সংসার ভেঙেছেন, তিনি যে অন্যের সংসারকে আস্ত রাখবেন এ ধারণা আপনার কী করে হল? কিন্তু এ আপনার ধারণার ভুল, বিচারের ভুল। আপনি কি আসামীর পরিচয় আগে জানতেন না?'

মিহির বলল, 'কিছু কিছু অখ্যাতির কথা কানে আমারও গেছে। কিন্তু সুখ্যাতি আরো বেশি শুনেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, তিনি সেই খ্যাতির মর্যাদা রাখবেন। যে সিঁদ কাটে, ঘটি-বাটি চুরি করে, তাকেও যদি গৃহস্থ বিশ্বাস করে নিজের ঘরে থাকবার জায়গা করে দেন, সেই চোর অন্তত সেই গৃহস্থের ঘটি চুরি করে না। সেই চোরের মধ্যেও যে একজন সৎ লোক বাস করে, সে তাকে থামায়, তার হাত আটকে রাখে। আমি ভেবেছিলাম, আমি যাঁকে অতিথি বলে গ্রহণ করেছি, মর্যাদা দিয়েছি, তিনি সেই মর্যাদা রাখবেন। বিয়ের আগে তিনি শুধু আমার স্ত্রীর বন্ধু ছিলেন, বিয়ের পরে তিনি আমাদের দুজনের বন্ধু হবেন, সেই বন্ধুত্বের সুযোগ আমি তাঁকে দেব। আলাপ-আলোচনায়, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসে নির্ভরতায় মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যে সম্পর্ক প্রতিটি সভ্য সমাজে স্বীকৃত, যে সম্পর্ক নিয়ে আমরা গর্ব করি, সেই সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে আমারও থাকবে, এই আশা করেছিলাম। অবশ্য এই সংকল্পে পৌঁছানো আমার পক্ষে সহজে হয়নি। তার জন্যে আমাকে অনেক যুঝতে হয়েছে, ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়েছে। কনভেনশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, লোক-অপবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, নিজের নানা রকম ভয় আর আশঙ্কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু কোন যুদ্ধেই আমি হারিনি। আমি আমার নিজের আদর্শ আঁকড়ে ধরেছি। তারপর সেই অতিথি যখন বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন, মানুষের মর্যাদা নষ্ট করেছেন, আমি তার প্রতিকারের জন্যে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। স্ত্রীর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। তার বয়স অল্প, বুদ্ধি আরো অল্প। কিন্তু আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যাবুদ্ধির অধিকারী হয়েও জ্ঞানীগুণী হয়েও যিনি তাকে প্ররোচিত পথভ্রষ্ট করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা আর অভিযোগ জানাতে আমি এখানে এসে দাঁড়িয়েছি।'

সাধারণত সাক্ষ্য দেবার ধরন এ নয়। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বঞ্চিত স্বামীর হৃদয়াবেগকে শ্রদ্ধা করলেন। উকিলও কিছু জিজ্ঞাসা করা দরকার বোধ করলেন না।

সারা আদালত স্তব্ধ হয়ে রইল। আবেগের তুল্য অস্ত্র নেই। সেই আবেগ মিহির সমস্ত শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করতে পেরেছে। ও যে এমন করে কথা বলতে পারে কে জানত? আঘাত মানুষকে মূক করে দেয়, আবার ক্বচিৎ কখনো তার মুখে ভাষাও জোগায়। যন্ত্রণায় মানুষ বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক

ভাবল, এ বিদ্যা তো তারও জানা। মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেও তো হাজার হাজার শ্রোতাকে আনন্দে বিষাদে আন্দোলিত করতে পারে, হাসাতে পারে কাঁদাতে পারে। কিন্তু আজ কি শশাঙ্ক আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজের পক্ষ সমর্থন করতে পারে? বলতে পারে, 'অনুচিত কিছু করিনি?' যদিও ওদের প্রধান অভিযোগ অসত্য, যদিও নারী-পুরুষের দেহস্পর্শকে সে অমন গুরুত্ব দেয় না, ছুঁলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় বলেও সে মনে করে না, তবু শশাঙ্ক কি পারে মিহিরের মত সে কথা সগর্বে ঘোষণা করতে? আর বিশ্বাস-ভঙ্গের অভিযোগ—সে অভিযোগ তো আংশিকভাবে সত্যিই। কলিয়ারীতে গিয়ে শশাঙ্ক যা করেছে তা যে মিথ্যাচার, একথা তো যথার্থ। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে সে কথা শশাঙ্ককে অস্বীকার করতেই হবে। যদিও তারও বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। মন্দিরা ওই ব্যাপার নিয়ে হুলস্থুল কান্ড না করলে কেউ কিছু জানতেও পারত না। পৃথিবীতে তাতে কারো কোন ক্ষতি-বৃদ্ধিও হতো না। কিন্তু মিহিরের অভিযোগ আজ আর এড়াবার জো নেই। মাঝে মাঝে শশাঙ্কের মনে হচ্ছিল, অভিযোক্তা যেন মিহির নয়, শশাঙ্ক নিজেই। এমন অভিযোগ নিজের বিরুদ্ধে সে নিজে যে কত করেছে তার ঠিক নেই। নিজের বয়স, পদমর্যাদা, দায়িত্ববোধ, রুচি, সৌন্দর্য, শালীনতা বোধের সঙ্গে তার অনেক আচরণেরই সামঞ্জস্য নেই। তা নিয়ে শশাঙ্ক আত্মসমালোচনা কম করেনি। মুরারিদা অবশ্য হেসে বলেছেন, 'এও তোমার এক রকম বিলাস। নিজের হাতে নিজের দাদ চুলকানো। শুদ্ধ ভাষায় আত্মমর্ষণ। কখনো কখনো আমাদের এই বিবেকের দংশনও কুন্দদন্তীদের দংশনের মতই মধুর।' কিন্তু শশাঙ্ক তা বিশ্বাস করেনি। আত্মসমালোচনা তার কাছে অমন কৃত্রিম নয়, নিরর্থকও নয়।

কিন্তু আজ সমালোচনার ধারা অন্য রকম। আজ শশাঙ্ককে শুধু অন্যের সমালোচনাই শুনতে হবে না, আজ দণ্ডের জন্যেও তাকে তৈরি থাকতে হবে। আর যা কিছু করেছে শশাঙ্ক, আত্মরক্ষার জন্যে প্রাণপণে সব অস্বীকার করতে হবে। শশাঙ্কের সাহস নেই নিজের মত আর বিশ্বাসের পক্ষে নিজের উকিলকে দাঁড় করায়। বিপক্ষের পেনাল কোড যে তারও মরাল কোড, তাদের শুচিবায়ুতা যে তারও প্রাণবায়ু, এই মিথ্যা কথা বলেই তাকে আজ বাঁচবার পথ খুঁজে নিতে হবে। নিজের এই ভীরুতাই শশাঙ্ককে সবচেয়ে বেশি আঘাত করতে লাগল।

উকিল জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিশ্বাসভঙ্গের কোন প্রমাণ কি আপনি পেয়েছেন?'

মিহির সেই খাদে নামার ঘটনা বর্ণনা করল। শশাঙ্ক আর মন্দিরার পক্ষে খাদে নেমে পথ হারানো অবশ্য খুবই সম্ভব ছিল। কারণ এর আগে কেউ তারা খাদে নামেনি। কিন্তু পথ যে তারা ইচ্ছা করে হারিয়েছে, তার প্রমাণ

ফরিয়াদী পক্ষের উকিল হাজির করলেন। নীল রঙের একখানা ডায়েরিতে মন্দিরা নিজেই সে কথা লিখে রেখেছে।

মন্দিরার সেই গোপন ডায়েরি প্রকাশ্য আদালতে ফরিয়াদীর পক্ষের উকিল গড়গড় করে পড়ে যেতে লাগলেন।

'খাদের অন্ধকারে আজ আমরা পথ হারিয়েছিলাম। ইচ্ছা করেই পথ হারিয়েছিলাম। না হারালে কি দুজনে দুজনকে এমন করে পেতাম। মনে হয়, অনেককাল বাদে যেন যুগ যুগান্তের পর আমি এমন আনন্দ পেলাম। আমার জীবন যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। তার আদরে, তার ছোঁয়ায় আমি আবার বেঁচে গেলাম। যার ছোঁয়ায় আমি বেঁচে উঠলাম সে কিন্তু মরার ভয়ে অস্থির। পুরুষমানুষের এমন ভয় আমি আর দেখিনি। কিসের এত ভয় আমি তো বুঝিনে। ধরা যদি পড়ে থাকি, দুজনে মিলে ধরা পড়েছি। যদি মরতাম, দুজনে মিলে একসঙ্গে মরতাম। চিরদিনের জন্যে যুগলমিলন হতো। আর বিচ্ছেদের জ্বালা সহ্য করতে হতো না।'

শশাঙ্কের উকিল এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কি মিসেস মুখার্জির নিজের হাতের লেখা? তাঁর নিজের ডায়েরী?'

ফরিয়াদী পক্ষের উকিল বললেন, 'যদি চ্যালেঞ্জ করেন তাহলে এই ডায়েরি expert-এর কাছে পাঠাতে হবে। মন্দিরা মুখার্জি কোর্ট উইটনেস হয়েছেন। তাঁকে আমরা আগামী শুনানীর দিন পাচ্ছি। সেদিন তাঁর হাতের লেখা আমরা মিলিয়ে দেখতে পারব।'

শশাঙ্ক তাঁর উকিলকে জানাল, লেখা চ্যালেঞ্জ করবার দরকার নেই। ওই নীল রঙের ডায়েরি, ওই হাতের লেখা, ওই ক্রমশ উঁচু দিকে উঠতে থাকা অসমান পঙ্‌ক্তিগুলি যে মন্দিরারই তাতে শশাঙ্কের কোন সন্দেহ নেই।

ডায়েরির কথাগুলি শুনতে শুনতে শশাঙ্কের চিত্তাকাশে ঘোর ঝোড়ো হাওয়া বইতে লাগল। ফের সেই তীব্র বাসনার মত্ততা জেগে উঠল। লজ্জা নেই, ভয় নেই, আইন নেই, নীতি নেই, পৃথিবীর আর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করবার প্রয়োজন নেই, পরস্পরের প্রতি অনুগত নারী-পুরুষের মিলন-সুখই একমাত্র সুখ।

এর পর মিহিরের উকিল শশাঙ্কের নিজের লেখা চিঠিও টেনে বার করলেন। আসামী পক্ষের উকিল চিঠি চ্যালেঞ্জ করলেন না। চিঠি জাল নয়। আসামীরই লেখা।

পড়া হল চিঠি। শশাঙ্কের মনে পড়ল, এই চিঠিতে সে মন্দিরাকে মৃত্যুর ইচ্ছা ত্যাগ করে জীবনকে ভালোবাসতে বলেছিল। জীবন সম্ভোগের কথা লিখেছিল। এ লেখা এক হিসাবে নিজেকেই লেখা। কিন্তু আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এর ব্যাখ্যা অন্য রকম হবে। সম্ভোগ শব্দটির একটি বিশেষ সংকীর্ণ অর্থই যে ম্যাজিস্ট্রেট ধরে নেবেন তাতে শশাঙ্কের সন্দেহ রইল না।

মিহিরের জবানবন্দীতে মন্দিরার পলায়নের বিবরণ শুনতে পেল শশাঙ্ক। স্ত্রীকে সন্ধানের চেষ্টা, কাকার বাড়িতে সে আছে শুনে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টার কথাও শুনল। অবশ্য সে চেষ্টা তেমন হয়েছিল—সে প্রমাণ ফরিয়াদী পক্ষ বিশেষ দিতে পারলেন না। সে দিক দিয়ে গেলেনও না।

মন্দিরার কাকা নিরঞ্জনবাবুর সাক্ষ্যও শশাঙ্কের বিরুদ্ধেই গেল। তিনি কিছুই গোপন করলেন না। আসামী দুপুররাত্রে গাড়িতে করে মন্দিরাকে তাঁর বাড়িতে পেঁৗছে দিয়েছিল। আসামী বলেছিল স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে মন্দিরা পালিয়ে এসেছে। তাদের ভাবভঙ্গি খুব স্বাভাবিক মনে হয়নি এ কথা নিরঞ্জনবাবু স্পষ্টই বললেন। কেন আশ্রয় দিয়েছিলেন এ কথার জবাবে তিনি বললেন, নিজের ভাইঝিকে তো তিনি আর ফেলে দিতে পারেন না।

আশ্চর্য, নিশিবাবুও শেষ পর্যন্ত শশাঙ্কের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিলেন। আসামীর সঙ্গে কিভাবে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সে কথা বললেন, তাঁর বক্তৃতা শুনে, তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন সে কথা জানালেন। মিহির আর মন্দিরার চিঠি পেয়ে তিনি আসামীকে মীরপুরে সঙ্গী হিসাবে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে কথাও স্বীকার করলেন। কিন্তু খাদের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে আসামী যে মন্দিরাকে নিয়ে ঘুরেছে তা তাঁর ভালো লাগেনি। আসামীর এই আচরণ তিনি সমর্থন করেননি। আসবার সময় মিহিরকে যে সব কড়া কড়া কথা আসামী শুনিয়ে এসেছেন তাও তাঁর মনঃপুত হয়নি। আসামীর ব্যঙ্গবিদ্রূপও তাঁর রুচিবিরুদ্ধ বলে মনে হয়েছে। আসামী আর মন্দিরা যে ইচ্ছা করে পথ হারিয়েছিল, প্রথমে এ সন্দেহ তাঁর হয়নি। কিন্তু ডায়েরিতে মন্দিরা যা লিখে রেখেছে তা শুনে তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছেন।

শশাঙ্ক লক্ষ্য করল, পরম আদর্শবাদী বুড়ো ভদ্রলোকও সাক্ষ্য দেওয়ার সময় নিজেকে সুকৌশলে বাঁচিয়ে গিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর ক্ষীণতম দায়িত্বও তিনি স্বীকার করলেন না। এই বন্ধনমুক্ত মানুষটি পাছে কোন ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়েন—সেই ভয়। তাঁর এই মানবিক দুর্বলতায় শশাঙ্ক নিজের মনেই হাসল। এই দৌর্বল্যে তার নিজের দুর্বলতাই যেন সমর্থন পেল।

প্রবীর আসেনি। অসুস্থ বলে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পাঠিয়েছে।

কিন্তু কলিয়ারীর দুজন সর্দার শশাঙ্ককে সনাক্ত করল। সুন্দরপানা এই বাবুটি খাদে নেমেছিলেন এবং মিহিরবাবুর পরিবারের সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছিলেন। শেষে ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করে খাদসুদ্ধ লোককে ডাকাডাকি করে টেনে এনেছিলেন।

শশাঙ্ক ওদের তেমন করে লক্ষ্য করেনি, ওদের মুখও মনে করে রাখেনি। কিন্তু শশাঙ্ককে তারা ভালো করেই চিনে রেখেছে।

তিনদিন পরে ফের শুনানীর তারিখ পড়ল।

মুরারিমোহন শশাঙ্ককে আর কোন দিকে তাকাবার সুযোগ দিলেন না। তাকে প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে এলেন। কোর্টের বাইরে এসে শশাঙ্কের গাড়িতেই তিনি তাকে নিয়ে উঠে বসলেন।

মুরারিমোহন বললেন, 'দেখলে তো, আসল ব্যাপারের ধারে-কাছেও ওরা আজ যায়নি। পরেও যেতে পারবে না। যাবে কি, প্রমাণ করতে পারলে তো? নিজের ঘরে বসে কোন্ রমণীর সঙ্গে তুমি কি করেছ না করেছ কে তা দেখেছে? ওসব ব্যাপার প্রমাণ করা অত সহজ নয়।'

বন্ধুর এই রসিকতায় শশাঙ্ক আজ আর যোগ দিল না। অন্যমনস্কভাবে চুপ করে রইল।

মুরারিমোহন বললেন, 'তোমার ওই বুড়ো নিশিবাবু তো বজ্জাত কম নয়। হাড়ে হাড়ে বদমাস। আজকে উনি পার পেয়ে গেলেন। আমাদের জেরার দিন আসুক। সান্যাল বুড়োকে তুলো-ধোনা করে ছাড়বে দেখে নিও।'

শশাঙ্ক এ কথারও কোন জবাব দিল না। মুরারিমোহন সিগারেট ধরিয়ে হাসলেন, 'আর তোমার রাইভ্যাল ওই মিহিরচন্দ্র। ঠিক একটি দাঁড়কাকের মত চেহারা। অমন মানুষের ঘরে বউ থাকে নাকি? দূর দূর। কন্দর্পকান্তি তুমি কেন, আমিও ওর বউকে বের করে আনতে পারতাম। কিন্তু একটা ব্যাপারে তোমার সঙ্গে ওর মিল আছে।'

শশাঙ্ক বলল, 'কি রকম।'

মুরারিমোহন বললেন, 'লোকটা তোমার মতই আত্মপীড়ন ভালোবাসে। নইলে নিজের নাক কেটে এমন করে পরের যাত্রা ভঙ্গ করে? আমি যদি উকিল হতাম, তাহলে ওকেও জড়িয়ে দিতাম। বলতাম, আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই ওর যোগসাজসে হয়েছে। এই হতো আমার ডিফেন্স।' মুরারিমোহন হেসে উঠলেন। বন্ধুর পিঠে এক চাপড় দিয়ে বললেন, 'কী বক্তৃতাটাই না দিয়েছে। আচ্ছা শশাঙ্ক, তুমি একটা ম্যানিফেস্টো খাড়া করতে পারো না? এই উপলক্ষে পরকীয়ার সমর্থনে তোমার একটা থীসিস দাঁড় করাও তো ভাই। তাহলে আমরা বাঁচি।'

শশাঙ্ক একটু হেসে বলল, 'করব।'

মুরারিমোহন বললেন, 'বেশ বেশ, এই তো পুরুষের মত কথা। তোমাকে ঘাবড়াতে দেখলে আমি অস্থির হই।'

শশাঙ্ক এবার দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমি ঘাবড়াইনি মুরারিদা। আমি যে কোন পরিণামের জন্যে তৈরি। জীবন-দর্শন আমার কিছু নেই, শুধু রূপ-দর্শন আছে। সেই দেখা আমি দেখে যাচ্ছি।'

ড্রাইভারকে পার্ক স্ট্রীটের দিকে যেতে বললেন মুরারিমোহন।

শশাঙ্ক বলল, 'আবার পার্ক স্ট্রীট কেন?'

'চল হে, একটা হোটেল-টোটেলে গিয়ে উঠি। জলপানি খাইয়ে তোমাকে

চাঙ্গা করে নিই। তারপর স্টুডিয়োতে গিয়ে উর্বশী-মেনকাদের নিয়ে আসর জমানো যাবে।'

শশাঙ্ক চুপ করে রইল। মন সায় না দিলেও বন্ধুর এই জবরদস্তিতে কোন বাধা দিল না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুরারিদা তাকে বেশিদূর নিয়ে যেতে পারবেন না, শশাঙ্ক তা জানে।

॥ ২৫ ॥

আশ্রমের নিয়ম আবার ভঙ্গ করল সুজাতা। আলাদা খবরের কাগজ কিনে মামলার বিবরণ পড়ল। আজকের বিবরণে দু পক্ষের নাম-ধামই বেরিয়েছে। সুজাতার কিছু আর বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু মন্দিরাই হোক আর যে কোন মেয়েই হোক, সুজাতার কাছে একই কথা। এমন বিপদে শশাঙ্ক আগেও পড়তে পারত। কোন কেলেঙ্কারি যে এর আগে ঘটেনি সেই তো আশ্চর্য। কিন্তু যত অঘটনই ঘটুক না তাতে সুজাতার কি। সে তো সংসার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবেই সরিয়ে এনেছে। সংসারের কোন লাভ-ক্ষতি ভালো-মন্দ তাকে তো স্পর্শ করা উচিত নয়।

উচিত নয়। বিচলিত হওয়া উচিত নয়, বিক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়। হয়ে কোন লাভও নেই। সবই জানে সুজাতা। জেনেও যথোচিত নিস্পৃহ নির্লিপ্ত থাকতে পারছে কই। কখনো শশাঙ্কের ওপর রাগ হচ্ছে, কখনো মন্দিরার ওপর সমস্ত অন্তর বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠছে। সে কে? তাকে একবার দেখতে ইচ্ছা করে সুজাতার। যে মেয়ের জন্য সুজাতার স্বামী এমন অপমান অসম্মানের পঙ্কে ডুবে যাচ্ছে, তার কী এমন রূপ, কী এমন গুণ সুজাতা তা নিজের চোখে না দেখে পারবে না। কিন্তু দেখে কী হবে? সে প্রশ্নের জবাব সুজাতা দিতে পারে না। তার নিজের মনের এই অধোগতি কেন। এ প্রশ্নের কি কোন জবাব আছে?

জ্ঞানপ্রভাকে কিছু বলতে হল না, সুজাতা নিজেই গিয়ে তাঁর দোরের সামনে দাঁড়াল।

জ্ঞানপ্রভার কি একটা প্রবন্ধ তাঁদের সঙ্ঘের পত্রিকায় বেরোবে তিনি নিবিষ্ট মনে তার প্রুফ দেখছিলেন। সুজাতা একটুকাল দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যাচ্ছিল, জ্ঞানপ্রভা প্রুফ-সীটগুলি সরিয়ে রেখে বললেন, 'চলে যাচ্ছ কেন সুজাতা, এসো।'

'আপনি কাজে ব্যস্ত আছেন বড়দি।'

'এমন কিছু জরুরী কাজ নয় সুজাতা। কিছুক্ষণ বাদে করলেও চলবে। এসো, বোসো এসে।'

এমন স্নিগ্ধ ব্যবহার জ্ঞানপ্রভার কাছে খুবই কম পেয়েছে সুজাতা। সামান্য একটু প্রীতির স্পর্শও কখনো কখনো কী অসামান্য বলেই না মনে হয়।

ঘরে চেয়ার ছিল, তবু নিচু মোড়াটা তাঁর পায়ের কাছে টেনে নিয়ে বসল সুজাতা।

জ্ঞানপ্রভা একটু আপত্তি করে বললেন, 'আহা ওখানে কেন? বলো, কী নালিশ জানাতে এসেছ, বলো।' মৃদু হাসলেন জ্ঞানপ্রভা।

সুজাতা একটু লজ্জিত হল। তারপর মুখ তুলে বলল, 'নালিশ? হ্যাঁ, নালিশই জানাতে এসেছি, আমার অনেক নালিশ জমেছে।'

জ্ঞানপ্রভা সুজাতার দিকে তাকালেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'নিজের বিরুদ্ধে? সে নালিশ আমাদের কার না আছে সুজাতা?'

বড়দিকে ঠিক এই ভঙ্গিতে কথা বলতে বড়-একটা শোনা যায় না। সুজাতা একটু অবাক হল। তারপর দ্বিধা কাটিয়ে বলল, 'আমি আপনার নিষেধ অমান্য করে আলাদা খবরের কাগজ কিনে পড়েছি।'

'আর?'

'আপনার অসাক্ষাতে আপনার ঘরে ঢুকে দাদাকে ফোন করে মামলার খবর জেনে নিয়েছি।'

'আর?'

সুজাতা চুপ করে রইল।

জ্ঞানপ্রভা একটু হেসে বললেন, 'দারুন অপরাধ। স্কুলের কোন ছাত্রী এই অপরাধ করলে তাকে বোধ হয় নির্বাসন দণ্ডই দিতাম।'

সুজাতা হঠাৎ বলে উঠল, 'আমাকেও সেই দণ্ডই দিন বড়দি। আপনি আমাকে আজ আর মার্জনা করবেন না।'

জ্ঞানপ্রভা একটু হাসলেন, 'জানি সুজাতা। আজ তোমাকে দণ্ড না দেওয়াটাই তো আমার পক্ষে চরম দণ্ড হবে। তুমি কি আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে চাইছ, সুজাতা?'

সুজাতা হঠাৎ অশ্রুভরা চোখে জ্ঞানপ্রভার দিকে তাকাল, তারপর আবেগ-রুদ্ধ স্বরে বলল, 'বড়দি, আমি মহা পাপিষ্ঠা। আমি সংসার ছেড়ে এসেও সংসার ছাড়তে পারিনি। মনের মধ্যে এক মহাসংসার মিলিয়ে সেখানে বাস করছি। বাসনা কামনার জড় কিছুতেই আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে না বড়দি।'

জ্ঞানপ্রভা একটুকাল চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'সেই জড় ছাড়ানো খুব সহজ নয় সুজাতা। তোমার দুঃখ করবার কোন কারণ নেই।'

সুজাতা বলল, 'কিন্তু আমি যে হেরে গেলাম বড়দি, সর্বদিক থেকে হেরে গেলাম।'

জ্ঞানপ্রভা ফের খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে যেন

আত্মগতভাবে বললেন, 'সব হারজিতকেই কি বাইরে থেকে তখন স্পষ্টভাবে চেনা যায় সুজাতা? এমনও হতে পারে, বাইরে থেকে যাকে হার বলে মনে হয় আসলে তাই হয়তো জয়। আবার যাকে আমরা জয় বলে জাহির করি, ভিতরে ভিতরে জানি সেখানে আমাদের হারের তুলনা নেই। আর একটি হারজিতের গল্প শুনবে সুজাতা?'

সুজাতা অবাক হয়ে জ্ঞানপ্রভার দিকে তাকাল। আশ্রমের মধ্যে সবচেয়ে ব্যস্ত সবচেয়ে দায়িত্ববতী মহিলাটি আজ সুজাতাকে গল্প শোনাতে চাইছেন। কিন্তু আর কারো গল্প কি সুজাতা আজ মন দিয়ে শুনতে পারবে? অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশের শক্তি তার কি আজ আছে?

'গল্প বড়দি?'

'হ্যাঁ গল্পই। গল্প ছাড়া কি।'

'বলুন।' সুজাতা আগ্রহ দেখাল।

জ্ঞানপ্রভা বলতে লাগলেন, 'তোমার গল্পের সঙ্গে এ গল্পের কোন মিল নেই। একেবারেই মিল নেই। তবু তোমাকে কেন যেন বলতে ইচ্ছে করছে। আর কাউকে এ কাহিনী বলিনি। তোমাকে বলবার উপলক্ষও হয়তো কোনদিন আসবে না। না আসুক, তাই চাই।'

ভূমিকাটুকু শেষ করে জ্ঞানপ্রভা থামলেন।

সুজাতা বলল, 'বলুন বড়দি।'

ঘর অন্ধকার হয়ে আসছিল। কিন্তু জ্ঞানপ্রভা সুজাতাকে আলো জ্বালতে দিলেন না।

বললেন, 'থাক না। এই বেশ আছে। তোমার গল্পের সঙ্গে এ গল্পের কোন মিল নেই সুজাতা। তারা—একটি ছেলে আর একটি মেয়ে পরস্পরকে ভালোবেসেছিল। কেউ দ্বিতীয় আর কাউকে ভালোবাসেনি। তবু তারা বিয়ে করতে পারল না। তবু তারা একজন আর একজনের কাছে নিজেকে একান্ত ভাবে ধরে দিতে পারেনি।'

সুজাতা বলল, 'কেন বড়দি?'

জ্ঞানপ্রভা বললেন, 'কেন? সে কথা শুনলে আজ তোমার হাসি পাবে। মেয়েটি বামুনের ঘরের আর ছেলেটি কায়েত। আজকাল এমন বিয়ে কত ঘরে ঘরে হচ্ছে। কিন্তু তারা পারেনি। মেয়েটি তার গোঁড়া বুড়ো বাপকে কষ্ট দিতে চায়নি, আর ছেলেটি বার বার এর ভুল ব্যাখ্যা করেছে। বাপের ওপর মেয়েটির যে স্বাভাবিক মমতা ছিল তাকে বার বার আঘাত দিয়েছে। আর তার ফলে ছেলেটিকে মেয়েটির মনে হয়েছে নিষ্ঠুর চণ্ডাল। ধীরে ধীরে তারা বুঝতে পেরেছে, তাদের মধ্যে মিল যতখানি আছে অমিল তার চেয়ে কম নেই। দুজনের মধ্যেই অহং বোধ বড় প্রবল। কেউ কারো কাছে সামান্য নিচু হতেও রাজী নয়, মাথা নোয়ানো তো দূরের কথা। প্রেম তাদের আত্ম-

বিলোপ শেখায়নি। সমর্পণের কথা শোনায়নি। তারা শুধু নিজেকেই ভালোবেসেছে। আর কাউকে ভালোবাসেনি।'

'তারপর বড়দি?'

'মেয়েটির বাবা মারা গেলেন। আর কোন বাধা নেই, তবু দূরত্ব ঘুচল না। ছেলেটি বিজ্ঞানের নামকরা ছাত্র ছিল। প্রফেসর হিসাবেও নাম করল। তারপর ঢুকল গিয়ে লেবরেটরীতে। তার বাইরে যেন আর কোন জগৎ নেই।'

'আর মেয়েটি?'

'মেয়েটি হার মানল না। সে একেবারে উল্টোমুখে হাঁটতে শুরু করল। বিজ্ঞানকে জড় বিজ্ঞান বলে সে ধিক্কার দিল আর সংসার যে ছলনার সংসার, এই বিশ্বাস মনের মধ্যে স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে চাইল। খানিকটা পারলও। মেয়েটির জেদ তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি সুজাতা।'

'জানি বড়দি, শুধু জেদই নয়, তাঁর শক্তিও অনেক বেশি। তারপর?'

'তারপর সেই ছেলেটি—ছেলেটি এখন আর বলা চলে না। তিনি এখন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সেই ভদ্রলোক এখন ক্যান্সার হাসপাতালে। ডাক্তাররা জবাব দিয়েছেন।'

সুজাতা নিজের দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে, জ্ঞানপ্রভার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে তাঁর হাতখানা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'বড়দি, তবু আপনি যাননি?'

জ্ঞানপ্রভা চুপ করে রইলেন। একটু বাদে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে মৃদু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'না, মহিলাটি যেতে পারেননি। তিনি ধর্মের অনুশাসনে বাঁধা। সেই শাসন তিনি অনেকের ওপর চালিয়েছেন। তাছাড়া তিনি তো আর পূর্ব আশ্রমকে স্বীকার করেন না। নিজেও তিনি সব স্বীকৃতির বাইরে পড়ে আছেন।'

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন জ্ঞানপ্রভা। সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন ঘরে। তারপর খানিকটা যেন আদেশের সুরেই বললেন, 'তুমি চলে যাও সুজাতা। কালই চলে যাও।'

সেই আদেশের আড়াল থেকে সুজাতা যেন একটি কোমল করুণ অনুনয়ের সুর শুনতে পেল। 'তুমি চলে যাও সুজাতা। তোমার স্বামীর ব্যাধি এখনো হয়তো চিকিৎসার বাইরে চলে যায়নি। এখনো হয়তো তাকে বাঁচালেও বাঁচাতে পারো।'

সুজাতা চলে যাচ্ছে শুনে রমাদি রত্নাদিরাও খুশি হলেন।

রমাদি বললেন, 'আগে যদি বলতিস একটা ফেয়ারওয়েলের ব্যবস্থা করা যেত। স্কুলের মেয়েরা তোকে কত ভালোবাসে। এমন লুকিয়ে লুকিয়ে চলে গেছিস জানলে তারা খুব দুঃখ পাবে।'

সুজাতা বলল, 'তোমরা যে ফেয়ারওয়েল দিচ্ছ এই আমার কাছে সবচেয়ে বড় রমাদি।'

রত্নাদি বললেন, 'হতভাগী, সেই যাওয়া তো গেলি কিন্তু আগে গেলিনে কেন। তখন যদি যেতিস, এই সব কেলেঙ্কারি কাণ্ড বাঁধত না, হয়তো এতদিনে দিব্যি গিন্নীবান্নী হয়ে বসে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার করতিস।'

সুজাতা বলল, 'আমি ঘরসংসার করতে যাচ্ছিনে রত্নাদি।'

রত্নাদি সাদরে তার থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, 'আহাহা। তবে কী জন্যে যাচ্ছিস। ঘরে গিয়ে নতুন এক আশ্রম খুলবি? স্বামীকে গেরুয়া পরিয়ে স্বামীজি করবি?'

সুজাতাকে বিদায় দিতে হচ্ছে বলে আশ্রমবাসিনীদের অনেকেই যেমন দুঃখিত হল, তেমনি একটি বঞ্চিতা নারী ফের তার নিজের সংসারে ফিরে যাচ্ছে শুনে তাদের আনন্দও কম হল না। সুজাতা জানে, রমাদি রত্নাদিদের অনুমান পুরোপুরি সত্যি নয়। তার ভাগ্য এখনো অনিশ্চিত। নিজের মনে ঘর-সংসারের কোন একটি সুস্পষ্ট ছবি সুজাতা এখন আর আঁকতে পারে না। যত আঁকে তত যেন মুছে মুছে ঝাপসা হয়ে যায়।

তবু নিজের মনের সেই উদাস বৈরাগ্যের কথা রমাদি রত্নাদিদের বলল না সুজাতা। বললে কি ওঁরা বুঝতে পারবেন? বিশ্বাস করবেন? ওঁদের সুখেই যেন সুজাতার সুখ, ওঁদের আনন্দেই যেন সুজাতার আনন্দ। সুজাতার মনে হল বিয়ের পর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার সময় বাপ-মা'র যে সুখ হয়, তাঁদের যেমন চোখে জল আর মুখে হাসি ফুটে ওঠে, এই আশ্রমবাসিনী-দেরও যেন তাই হচ্ছে। সংসারে নানাদিক থেকে নানা কারণে বঞ্চিতা এই সব নানা বয়সী নারীর মধ্যে আজ শুধু একটি শুভেচ্ছার মূর্তিকেই দেখতে পেল সুজাতা। কেউ মনে করছে না সুজাতার অবতরণ হল, অধ্যাত্মমার্গ থেকে তার অধঃপতন হল। হয়তো সেই মার্গে সুজাতাও যেমন পৌঁছুতে পারেনি, এই অশিক্ষিতা অর্ধশিক্ষিতা মেয়েরাও তেমনি তার কাছাকাছি যেতে পারেনি। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতার কথা ভুলে এই যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, এই যে একজনের সত্তাকে আর একজনের মধ্যে প্রসারিত করে দেওয়া, অহংবোধ থেকে বিশ্ববোধে উত্তীর্ণ হওয়া—এর চেয়ে বড় মুক্তির ধারণা সুজাতার নেই।

রমাদি রত্নাদিরা চোখের জলের ভিতর দিয়েই তাকে বিদায় দিলেন। জ্যোৎস্না তো সুজাতাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেই ফেলল। মুক্তির সাধনা করতে এসে এরা কী বন্ধনজালেই না জড়িয়ে পড়েছে।

ট্যাক্সিতে বসে সুজাতা ভাবতে ভাবতে চলল। সেও তো এক বন্ধন থেকে আর এক বন্ধনের মধ্যে ধরা দিতে যাচ্ছে। কিন্তু ধরা তো শুধু দিতে চাইলেই হয় না, আর একজন যদি দু'হাত বাড়িয়ে ধরে নিতে চায় তবেই তো সেই

বস্তু সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু সেই প্রত্যাশা কি সব সময়ে মেটে? সংসারে অনেক দানেরই প্রতিদান পাওয়া যায় না। সেই দানই কি প্রকৃষ্ট দান যার মধ্যে ফিরে পাওয়ার কোন স্পৃহা থাকে না? জ্ঞানীরা বলেছেন, সেই আকাঙ্ক্ষাহীন প্রেমেই মুক্তি। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মেই মুক্তি। বন্ধন শুধু গ্রহণের মধ্যে। মুক্তি দানের মধ্যে, ত্যাগের মধ্যে, মুক্তি এই বোধের মধ্যে, জ্ঞানের মধ্যে। এই ক্ষুধাতৃষ্ণাক্লিষ্ট জরামৃত্যু শাসিত, মৈত্রী আর বৈরিতার অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ জীবদেহে অন্য মুক্তি যে কী হতে পারে সুজাতার তা ধারণায় আসে না। এই বোধ ধর্ম-সঙ্ঘের ভিতরেও থাকতে পারে, আবার তার বাইরেও থাকা সম্ভব।

সুজাতার মনে পড়ল এই দান আর গ্রহণ নিয়ে শুদ্ধানন্দের সঙ্গে একদিন তার কথা হয়েছিল। মন অশান্ত হয়ে ওঠায় সুজাতাই তাঁর সঙ্গে সেদিন দেখা করতে গিয়েছিল।

সুজাতা বলেছিল, 'নিঃস্বার্থভাবে কিছু দেওয়া কি সম্ভব? আমরা যখন ভিখিরিকে ভিক্ষা দিই, তখনই শুধু তার কাছে কিছু আশা করিনে। ভিক্ষের বদলে ভিক্ষে চাইনে আমরা। কিন্তু আর সব জায়গায় আমরা চাই। ছাত্রীদের আমি স্নেহ করি তাদের কাছে শ্রদ্ধা চাই, বন্ধুদের ভালোবাসি তাদের কাছে ভালোবাসা চাই। ধনরত্ন বিষয়-আশয় তো চাইনে, শুধু ভালোবাসা চাই। যে ভালোবাসা শুধু মুখের কথায় চোখের চাওয়ায় জানানো যায়। এই চাওয়াটুকুও কি অন্যায়?'

গেরুয়া-পরা কর্মব্যস্ত সন্ন্যাসী হাতের কাজ সরিয়ে রেখে সুজাতার মুখের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেসেছিলেন, 'অন্যায় নয় সুজাতা, কিন্তু তোমার সেই যৎসামান্য প্রত্যাশাটুকু সব সময় না মিটতেও পারে। নিজের হাতে তুমি দিতে পার কিন্তু নেওয়ার সময় তোমাকে অন্যের হাত থেকে নিতে হয়। সেই হাত কখন যে উদারতায় প্রসারিত হবে, কখন যে কার্পণ্যে গুটিয়ে থাকবে তা তুমি জানো না। আমাদের সব সময় অবশ্য চোখে পড়ে না; কিন্তু সুজাতা, সংসারে এমন প্রাপ্তিও আছে যা শুধু দানের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। সেখানে প্রতিদান শুধু যে আমরা আশা করিনে তাই নয়, অনাবশ্যক মনে করি।'

'যেমন?'

শুদ্ধানন্দ একটু ভেবে নিয়ে বলেছিলেন, 'যেমন ধরো, আমরা যখন কোন শিশুকে ভালোবাসি।'

সঙ্গে সঙ্গে সুজাতার বুকের মধ্যে কিসের একটা অবর্ণনীয় ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। শিশু তো তার কোলে আসেনি। শিশুকে ভালোবাসার কী জানে সুজাতা।

শুদ্ধানন্দ যেন তার মনের কথা বুঝতে পেরে বলেছিলেন, 'নিজের শিশুর কথা বলছিনে। সেই শিশু তোমারও নেই, আমারও নেই।'

সুজাতা একটু লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করেছিল। শুদ্ধানন্দ তাকে নিজের অভাবের অংশভাগিনী করেছেন, এর মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন মাধুর্য কল্পনা করে লজ্জা পেয়েছিল সুজাতা।

কিন্তু শুদ্ধানন্দ অসংকোচে বলে গিয়েছিলেন, 'মানুষ যখন নিজের শিশুকে ভালোবাসে তখন হয়তো তার মধ্যে একটা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে। কিন্তু মানুষ যখন পরের শিশুকে ভালোবাসে, পথের শিশুকে ভালোবাসে, তখন? তখন শুধু ভালোবেসেই সুখ। তখন সেই শিশুর হাসিটুকু দেখেই সুখ।'

সুজাতা তর্ক করতে পারত, 'আদর পেয়েও সেই শিশু যদি গোমড়ামুখো হয়ে থাকে, তখন কি আমরা ভালোবাসার আনন্দ পাই?'

কিন্তু তর্ক করল না। শুদ্ধানন্দের বক্তব্য মূলত মেনে নিল।

শুদ্ধানন্দ বলতে লাগলেন, 'আমরা লক্ষ্য করিনে তাই দেখিনে। এমনি বিনা প্রত্যাশার দান আমাদের অনেক আছে। যাকে তুমি ম্যাটেরিয়্যাল গেইন বলতে পারো না এমন পাওয়ারও আমাদের অভাব নেই। বহু ক্ষেত্রে আমরা যেমন কিছু না পেয়েও দিই, তেমনি অনেক জায়গায় আমরা কিছু না দিয়েই পাই। বিনা আদরেও শিশু তোমাকে এসে জড়িয়ে ধরে। বিনা কারণে, কোন প্রত্যাশা না রেখে পথের মানুষ তোমাকে পথের নিশানা দিয়ে যায়। মানুষের কামনার আর কামনাহীনতার দুটি ধারাই আছে সুজাতা। কখনো সেই দুই ধারা পাশাপাশি চলে, কখনো বা একটি প্রকট আর একটি প্রচ্ছন্ন। একটি কলকল্লোলে ছুটে চলেছে আর একটি অন্তঃসলিলা। তার শব্দ নেই। তবু তো আছে।'

বাপের বাড়িতে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সুজাতাকে সাদরে কাছে টেনে নিলেন।

প্রভাস এগিয়ে এসে বলল, 'কী, সেদিন তোকে বলিনি আমি? তোকে ফিরে আসতেই হবে। ওখানকার হাওয়া আর খাওয়া-দাওয়া তোর সহ্য হবে না। বলিনি, তুই না এসে পারবিনে?'

সুজাতা বলল, 'ঠিকই বলেছিলে দাদা। না এসে আর পারলাম কই?'

কিন্তু মনে মনে ভাবল, 'যে সুজাতা গিয়েছিল সেই সুজাতাই কি ফিরে এসেছে? তার কি কিছুই বদলায়নি? সে কি কিছুই নিয়ে আসেনি? একেবারেই খালি হাতে ফিরে এসেছে? মানুষ যেখান থেকে বৃথা ফিরে আসে সেখান থেকেও অন্তত এই বোধটুকু নিয়ে আসে, সে ঠিক জায়গায় যায়নি। এই জন্যেই বোধ হয় জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই মানুষের ফেলা যায় না।'

প্রভাস বলল, 'কই, তোর গেরুয়া কই, রুদ্রাক্ষের মালা কই? ত্রিশূলখানাই বা কী হল?'

বউদি বলল, 'আর ওকে খুঁচিয়ো না। ত্রিশূল কেন, হাজার শূলের খোঁচা ও খেয়েছে। ও যে কেন এসেছে তা আমি জানি।'

ভাইপো এগিয়ে এসে বলল, 'পিসি, আমার জন্যে কী এনেছ?'

সত্যিই, নতুন কোন খেলনা কি কিছু মিষ্টি নিয়ে আসতে ভুলে গেলে সুজাতা। লজ্জিত হয়ে তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করল। চুমু খেল গালে কপালে।

কিন্তু বাবলু অত সহজে ভুলল না। তার একটি মাত্র রহস্য জিজ্ঞাসা, 'আমার জন্যে কী এনেছ?'

শুদ্ধানন্দ যাই বলুন, শিশু মোটেই নিষ্কাম নয়। না কি যে নিষ্কাম নয়, সে যে-কোন বয়সেই শিশু?

সবচেয়ে শেষে বাবার ঘর। আরো যেন বুড়ো হয়েছেন বাবা। আরো দুর্বল আর অসুস্থ। ইজিচেয়ারে চুপচাপ শুয়েছিলেন। সুজাতাকে দেখে মৃদু হেসে উঠে বসলেন।

সুজাতা তাঁকে প্রণাম করে বলল, 'কেমন আছ বাবা?'

প্রশান্তবাবু স্মিতমুখে বললেন, 'আছি। ভাবছিলাম, তোর সঙ্গে বুঝি আর দেখা হবে না।'

সুজাতা বলল, 'কেন দেখা হবে না বাবা? দেখা না হওয়ার কী হয়েছে?'

প্রশান্তবাবু একটু হাসলেন, 'আমি চিরকালের জন্যে অদেখা হয়ে যাওয়ার কথা বলছিনে খুকি। সে কি আর কেউ বলতে পারে? ভাবছিলাম, আবার একটু পশ্চিমে বেরোব।'

সুজাতা বলল, 'এই রোগা শরীর নিয়ে তুমি একা একা যেতে পারবে?'

প্রশান্তবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'তুই যাবি আমার সঙ্গে?'

সুজাতা চুপ করে রইল। বাবাকে কী করে বলে সে যেতে আসেনি, থাকতে এসেছে। সংসারের দুর্বার আকর্ষণে আবার সে ফিরে এসেছে।

প্রশান্তবাবু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা থাক। তুই আর কোথায় যাবি? দেখ তো, শশাঙ্ক কি আবার মামলা মোকদ্দমা বাধিয়ে বসেছে। লোকের কাছে বলাও যায় না, এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার।'

সুজাতা বলল, 'তোমরা কি তাকে কোন সাহায্য করবে না বাবা?'

প্রশান্তবাবু সোজা হয়ে বসলেন, 'সাহায্য! তুই বলিস কি খুকি? তা ছাড়া সাহায্য তো সে আমাদের কাছে চায়নি।'

সুজাতা তেমনি মুখ নিচু করে বলল, 'কোন মুখে চাইবে?'

প্রশান্তবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তার পয়সা আছে। উকিল ব্যারিস্টারের অভাব নেই। পরামর্শ দেওয়ার লোক যথেষ্ট রয়েছে। এ কোর্টে হারলে সে হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়বে। তার ভয় কিসের?'

সুজাতা তেমনি মুখ নিচু করেই বলল, 'কিন্তু সেখানেও যদি হারে!'

প্রশান্তবাবু বললেন, 'তাহলে শাস্তি পাবে। কর্মফল ভোগ করবে। Law will take it's course, তুইই বা কী করবি, আমরাই বা কী করব?'

বাবার কোন কথাই অসত্য নয়। তাঁর কথার মধ্যে যুক্তিও আছে। তবু এই জীর্ণদেহ ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ বাপকে ভারি নির্মম নিষ্ঠুর পুরুষ বলে মনে হল সুজাতার। তার মনে পড়ল না, নির্মমতায় সেও একদিন কারো চেয়ে কম যায়নি। কিন্তু স্বামীকে যত দণ্ডই দিক নিজের হাতে দিয়েছে সুজাতা। এমনকি সেদিন বোধ হয় সে প্রাণদণ্ডও দিতে পারত। কিন্তু আর কারো হাতে শশাঙ্কের সামান্য দণ্ডের সম্ভাবনাও যেন তার সহ্য হচ্ছে না। যেমন করেই হোক, হয় এই মামলা থামাতে হবে, না হয় স্বামীকে জয়ী করতে হবে। কিন্তু সুজাতার শক্তি কতটুকু?

প্রশান্তবাবু বললেন, 'আমি তো আর কোর্টে যাইনে। বিশেষ কোন খোঁজ খবরও রাখিনে। প্রভাস বেরোয়। ও বন্ধুদের কাছে সব খোঁজ খবর পায়। শুনেছি কেস একবারে খারাপ নয়। বেরিয়ে আসবার ফাঁক যথেষ্টই আছে। তবে মামলা মোকদ্দমার কথা কেউ বলতে পারে না।'

সুজাতা বাবাকে আর দ্বিতীয় বার কোন অনুরোধ করল না। এ প্রসঙ্গই তুলল না তাঁর কাছে। তাঁকে নাওয়া-খাওয়ার জন্যে তাগিদ দিল, নিয়মিত ওষুধপথ্য না খাওয়ার জন্যে অনুযোগ করল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ফের দাদার ঘরে বৈঠক বসল। বাবা যা মৃদু স্বরে বলেছিলেন দাদা তা চড়া সুরে বলল, 'আমাদের কিছু করবার নেই। থাকলেও ওর জন্যে কিছু করতাম না। কি আইনের দিক থেকে, কি নীতির দিক থেকে ওই স্কাউণ্ড্রেলটার শাস্তি হওয়াই উচিত।'

বউদি বাধা দিয়ে বলল, 'আঃ থামো। কী যা-তা আরম্ভ করলে। যা হবার হবে। তোমার অত চেঁচামেচি করবার কী দরকার। তুমি তো আর ম্যাজিস্ট্রেট নও।'

প্রভাস বলল, 'আমি ম্যাজিস্ট্রেট হলে ওকে জেলে পাঠাতাম তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমনিতেও জেলে যাবে। যাক। আমি তাই চাই। তোর পক্ষে ডিভোর্স পাওয়া সহজ হবে সুজাতা।'

বউদি স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি একটা দস্যু। পুরুষ হয়ে জন্মেছ। মেয়েমানুষের মন তোমরা কোনদিনই বুঝতে পারবে না।'

প্রভাস বলল, 'সত্যিই বুঝতে পারছিনে সুজাতা। তুই তো সদ্য এক ধর্মের আখড়া থেকে ফিরে এলি। সেই ধর্ম কি বলে? ধর্ম কি বলে না, দোষী দণ্ড পাক। অপরাধীর শাস্তি হোক?'

সুজাতা বলল, 'কিন্তু এ ব্যাপারে অপরাধ তো তার নাও থাকতে পারে!'

প্রভাস হেসে উঠল, 'এ কথা বোধ হয় শশাঙ্ক নিজেও বিশ্বাস করে না। ওই মিথ্যে কথা বলে তোকে বুঝি ডেকে এনেছে? আর তুই বুঝি সব ধর্মকর্ম

ফেলে সাফাই সাক্ষী দেওয়ার জন্যে ছুটে এসেছিস? কী বলবি কোর্টে দাঁড়িয়ে? ধর্মাবতার, আমার স্বামী আমার মুখ ছাড়া জীবনে আর কোন স্ত্রীলোকের মুখ দেখেননি। আর আসামীর ধর্মপত্নীর সেই সত্যভাষণ শিরোধার্য করে ধর্মাবতার তাকে বেকসুর খালাস দেবেন।'

সুজাতা মুখ তুলে বলল, 'আমাকে কেউ সাক্ষী মানেওনি, আমি তেমন সাক্ষী দেবও না দাদা। আমি যা করব আমার পথে থেকেই করব। আমি অন্য পথে যাব না।'

প্রভাস বলল, 'মিছিমিছি মন খারাপ করিসনে। যা, এবার শুতে যা।'

একটু বাদে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল সুজাতা। ঘরের চেহারা এই ক'মাসে বেশি বদলায়নি। খাট আলমারি বইপত্র যেখানে যা ছিল মোটামুটি সব যথাস্থানেই আছে। কিন্তু সুজাতা নিজে? সে কি তার নিজের জায়গাটিতে এসে পৌঁছতে পেরেছে?

সুজাতা বুঝতে পারছে এ ব্যাপারে আর কেউ কিছু করবে না। যা করবার তা নিজেকেই করতে হবে। করবার সময়ও আর বিশেষ বাকি নেই। মাঝখানে মাত্র একটি দিন। তারপরেই তো ফের শুনানী আরম্ভ। তখন মামলা কোন দিকে গড়াবে কে জানে? তার আগে কি কিছু করা যায় না?

আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল সুজাতা। গভীর অন্ধকারে পথ খুঁজতে লাগল।

॥ ২৬ ॥

সুজাতার পক্ষে সবচেয়ে সহজ আর স্বাভাবিক কাজ ছিল শশাঙ্কের সঙ্গে দেখা করা। তার অপরাধ সত্য কিনা, এই বিপদে সুজাতা তাকে সত্যিই কোন সাহায্য করতে পারে কিনা, তাই আগে সে জেনে নিতে পারত।

সুজাতার বউদিও সেই কথাই বলল, 'এসেছ যখন একেবারে নিজের বাড়িতে গিয়েই ওঠো। আর মান অভিমানে কাজ নেই। আমি টেলিফোনে শশাঙ্কবাবুকে খবর দিচ্ছি। তিনি এসে তাঁর হারামণিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।'

কিন্তু সুজাতা বলল, 'না বউদি।'

তার কেমন আশঙ্কা হল খবর পেয়েও যদি শশাঙ্ক না আসে। কি কোন সাড়া-শব্দ না দেয়। তাহলে অপমানের আর শেষ থাকবে না। তার চেয়ে সুজাতা যা করবে আড়ালে থেকেই করবে। পরে যদি শশাঙ্ক জানতে পেরে তার খোঁজখবর করে, তখন কি করা উচিত, সুজাতা তা ভেবে দেখতে পারবে।

বউদি হেসে বলল, 'আর একবার সাধিলেই খাইব, এই হল তোমার মনের ইচ্ছা। আচ্ছা, আর একবার সাধাসাধির ব্যবস্থা করছি। দেখবে রানীকে নিয়ে

যাবার জন্যে আমাদের কুঁড়ে ঘরের সামনে শ্বেতহস্তী এসে হাজির হবে।'

বউদি ফোন করল কি করল না সুজাতা তার খোঁজ নিতে গেল না। নিজেও শশাঙ্ককে ফোন করল না। কিন্তু তার কেবলি মনে হতে লাগল কিছু করা উচিত। এই কেলেঙ্কারি কাণ্ড যাতে আর না এগোয়, একমাত্র তারই চেষ্টা সে করতে পারে। শশাঙ্ক সুজাতাকে নিক, আর না নিক, একসঙ্গে বসবাস করতে রাজী হোক আর না হোক, সুজাতা যে তার শুভাকাঙ্ক্ষিণী এই প্রমাণটুকু সে অন্তত রেখে যেতে চায়। তার এই কল্যাণকামনার মধ্যে কোন স্বার্থগন্ধ নেই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মই সুজাতার এখন একমাত্র কৃত্য।

কিন্তু কী করে সুজাতা এই নিষ্কাম কর্মের পথে অগ্রসর হবে? এ ক্ষেত্রে তো শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মীমাংসা নয়। অপরপক্ষ—শত্রুপক্ষের সঙ্গে মীমাংসা। সেই পক্ষের মুখোমুখি হতেই হবে সুজাতাকে। তাতে তার ব্যক্তিগত অহমিকা যতই চুরমার হয় হোক, অসম্মানে অপমানে মাথা নুয়ে পড়ুক, সুজাতা তাতে ভ্রূক্ষেপ করবে না। এই অপমান তার নিজের কোন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে নয়, সকলের কল্যাণের জন্যে। বিশ্বহিতের সাধ্য সকলের থাকে না। সেই হিতের কথা সাধারণ মানুষ শুধু তার ভাবনা কল্পনার মধ্যে আনতে পারে। হাতে-কলমে যে কল্যাণ কর্মটুকু সে করতে পারে তার সীমা স্বজন প্রিয়জন বন্ধুজনের মধ্যে। দাক্ষিণ্যের শিক্ষা গৃহেই শুরু হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে তা শেষও হয় গৃহের গণ্ডীর মধ্যে। তাতে লজ্জার কিছু নেই। গৃহের বাইরে বৈরী ভাব না থাকলেই হল। গৃহের কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের কল্যাণের নিরন্তর সংঘাত না লাগলেই হল। গৃহও তো অণুবিশ্ব। প্রতিটি মানুষ যদি তার গৃহকে সজ্জিত করে, সমস্ত বিশ্ব সুন্দর হয়ে ওঠে। নিজের ঘরে বসে মনকে বোঝাল সুজাতা। সামান্য হলেও স্বার্থগন্ধহীন একটি কল্যাণকর্মে নিজেকে প্রবৃত্ত করতে পেরে তৃপ্তি পেল।

প্রথমে ভাবল মিহিরের কাছে সে একাই চলে যায়। গিয়ে বলে, 'আমি আমার স্বামীর পক্ষে সাফাই সাক্ষী দেওয়ার জন্যে আশ্রম ছেড়ে আসিনি। তিনি আগে যেসব অপরাধ করেছেন সেগুলি অস্বীকার করাও আমার ইচ্ছা নয়। আমি তাঁর হয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছি। আপনি ক্ষমা করুন। এই অনর্থক বাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে ফেলুন। যে শাস্তি পাবার তিনি ইতিমধ্যেই তা পেয়েছেন। কাগজে তাঁর কলঙ্কের কথা ছাপা হয়েছে। সবাই উপহাস করছে, ছি ছি করছে। শিক্ষা যদি হয়, এতেই হবে। এর চেয়ে জেল জরিমানার গুরুত্ব কি বেশি?'

কিন্তু অপরিচিত এক ভদ্রলোকের কাছে একা যেতে কেমন সংকোচ বোধ করল সুজাতা। বাবা কি দাদাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু তাঁরা কি রাজী হবেন। অযাচিত ভাবে এসব মামলা মোকদ্দমার মধ্যে গিয়ে পড়তে তাঁদের আত্মসম্মানে বাধে। তাঁরা নিজেরা উকিল। কেউ না বললে কারো ব্রীফ

নেন না। সুজাতাও ওঁদের দ্বিতীয়বার কোন অনুরোধ করবে না। করে লাভ নেই। শুধু নিজের মুখ হারানো নয়, বার বার ওঁদের বিরক্ত করে কী হবে। ওঁদের প্রবল অনিচ্ছার কথা সুজাতার তো অজানা নেই। ওঁরা নিজের মান-মর্যাদাকেই সবচেয়ে বড় করে দেখছেন। আর কারো সুখ-শান্তির কথা ভাবছেন না।

আর এক কাজ করতে পারে। বউদিকে জানাতে পারে সুজাতা। তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বউদিও তো ওই দলে। তা ছাড়া সুজাতা সফল হয় কি না হয় তার তো কিছু ঠিক নেই। যদি হেরে যায়, সেই পরাজয়ের সাক্ষী না রাখাই ভালো। বীজমন্ত্র যেমন গোপন করে রাখতে হয়, তেমনি মনের কোন কোন সদিচ্ছা গোপন রাখাই শ্রেয়। মন্ত্র যেমন একা একা জপ করতে হয় তেমনি কোন কোন দুরূহ দুঃসাধ্য কাজ একা করাই বিধেয়।

বউদি ছাড়া আর কে আছে যাকে সঙ্গে নিতে পারে সুজাতা? যাকে নিলে কাজ হয়? হঠাৎ মন্দিরার কথা মনে পড়ল সুজাতার। দুঃখের সঙ্গে লজ্জার সঙ্গে তীব্র এক বেদনার সঙ্গে মনে পড়ল। মনে সেই প্রথম থেকেই পড়ছিল। তবু বার বার তার নামটা এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যে সমস্ত দুর্ভোগ দুর্ভাগ্যের মূল তাকে এড়িয়ে কোথায় যাবে সুজাতা? তার সামনে যেতেই হবে। যার মুখ দেখা সুজাতার উচিত নয়, তার মুখোমুখি হতেই হবে তাকে। এই তো সুজাতার জীবনে কঠিনতম পরীক্ষা। কিন্তু এমন কঠিন নয় যে, পরীক্ষা দিতেই সে ভয় পাবে। গিয়ে কী বলবে সুজাতা। বলবে, 'চল, আমাকে তোমার স্বামীর কাছে নিয়ে চল। সেখানে আমরা দুজনে মিলে যাই। তোমাকে দেখলে তাঁর মন শান্ত হবে। যুদ্ধ জয়ের আগেই যদি জয়লক্ষ্মী ঘরে এসে পৌঁছায়, তবে কে আর ফের লড়াইকে জীইয়ে রাখে? তোমাকে কিছু করতে হবে না। কিছু বলতে হবে না। যা বলবার আমি বলব। আমিই সবাইর হয়ে ক্ষমা চাইব। বলব, মানুষ মাত্রেই ভুল করে, কিন্তু সেই ভুলই বড় কথা নয়। সেই ভুলকে ছাড়িয়ে ওঠা তার চেয়েও বড়। মানুষ মাত্রেই দোষ করে। সেই দোষের জন্যে শাস্তি দেওয়াটাই বড় কথা নয়। মার্জনা করা তার চেয়েও মহৎ।'

টেলিফোন গাইড থেকে মন্দিরার কাকার ঠিকানা সংগ্রহ করা সুজাতার পক্ষে কঠিন হল না। একবার ভাবল, বাড়ির গাড়িতেই বেরোয়। চাইলে দাদা নিশ্চয়ই গাড়িখানা দেবে। কিন্তু কি ভেবে নিরস্ত হল সুজাতা। দেবে বটে, কিন্তু হাজার কথা জিজ্ঞাসা করবে। কোথায় যাওয়া উচিত, কোথায় যাওয়া উচিত নয় তা নিয়ে ঝাড়া বক্তৃতা দেবে। কিন্তু উকিলের কূট পরামর্শ তো শুনতে চায় না সুজাতা। নিজের শুভবুদ্ধি, হিতাকাঙ্ক্ষার আলোর সে পথ চলতে চায়। সেই দীপই তার একমাত্র সহায়।

প্রভাস কোর্টে বেরিয়ে গেলে নাওয়া-খাওয়া সেরে নিয়ে সুজাতাও বেরিয়ে পড়ল। কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে কাউকে কিছু জানাল না। বউদি মৃদু হেসে

বলল, 'বুঝতে পারছি। গোপন দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা হচ্ছে। বেশ বেশ। হলেই ভালো। তোমারই অভিসারে যাব অগম পারে, চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে। তাই নাকি?'

হয়তো তাই। কিন্তু অভিসার নয় অভিযান। পথ দুর্গম। কৃচ্ছ্রতার শেষ নেই। এ তো পায়ে হেঁটে যাওয়া নয়। পাহাড়ের সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে আঁধারে আঁধারে বুকে হেঁটে এগোন। তবু এগোন। অগ্রসর হওয়া। আর এই অগ্রসর হওয়ার নামই অভিযান। সেই কৃচ্ছ্রসাধনের পথ সুজাতার একার। সেখানে সে নিঃসঙ্গ অভিযাত্রিনী।

একা একা চলাফেরা করার অভ্যাস সুজাতার আছে। স্বামী শুদ্ধানন্দের কাছে তো সে একা একাই যেত। তীর্থে গিয়েও সে একা একা ঘুরত। বরং কেউ সঙ্গে থাকলেই যেন অস্বস্তি। একাকিত্বের মধ্যে পূর্ণ মুক্তি, পূর্ণ স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করত সুজাতা। যে সঙ্গে থাকবার সেই যখন সঙ্গী হল না, কী হবে অন্য কারো সঙ্গ খুঁজে, সুজাতা ভাবত। আজও একাই বেরোল। যে মেয়েটির সঙ্গে সে দেখা করতে যাচ্ছে তার সঙ্গে কি তার বাড়ির অন্য কারো সঙ্গে সুজাতার পরিচয় নেই, এভাবে দেখা সাক্ষাৎ সভ্য সমাজের নিয়মও নয়, কিন্তু এক দুর্দম ভাবোন্মাদনায় সুজাতা সব ভুলে গেল। এর আগে পরিচিতা অপরিচিতা, বাস্তব, কল্পিতা স্বামীর সমস্ত প্রণয়িনীর সঙ্গে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক ছিল সুজাতার। আজ সে তার বাইরে আসতে চায়। শত্রুতার মধ্যে বন্ধন। প্রীতির বাঁধনের চেয়েও সেই হিংসা দ্বেষ বিদ্বেষের বাঁধন বেশি দুশ্ছেদ্য আর বেশি কঠোর। সেই বন্ধনের বাইরে মুক্তি। মুক্তি দূরে কোথাও নয়। গ্রন্থির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন। গ্রন্থি উন্মোচনের মধ্যে।

গাড়ি না নিক, ট্যাকসি নিতে পারত। কিন্তু বাস বদলাতে বদলাতে বেলেঘাটায় এল সুজাতা। পথকে আরো দীর্ঘ, আরো দুর্গম করাই যেন তার উদ্দেশ্য। কৃচ্ছ্রতা যত বাড়বে চিত্ত যেন তত বিশুদ্ধ হবে, লক্ষ্যের গৌরব, লভ্যের মহিমা যেন আরো বৃদ্ধি পাবে তাতে।

নিরঞ্জন চ্যাটার্জির বাড়ির বিশালতা সুজাতাকে বিমূঢ় করল না। সে তো প্রার্থিনী নয়, [illegible]ণী নয়, অন্তরে অন্তরে সে সন্ন্যাসিনী হয়েই এসেছে। পরনে শান্তিপুরী সাদাখোলের শাড়ি। কিন্তু অন্তর যেন উদাস গৈরিকে রঞ্জিত। গৃহীর বৈভব, শক্তি সামর্থ্য কিছুই তার ঈর্ষার বস্তু নয়। সুজাতা তো কিছু নিতে আসেনি, দিতে এসেছে। প্রীতি শুভেচ্ছা সহায়তা দাক্ষিণ্য যা চায় মন্দিরা, তাই আজ সুজাতা তাকে দিতে পারবে।

সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলাকে দেখে দারোয়ান আর কোন আপত্তি করল না। গেট খুলে দিল। বসতে দিল ড্রয়িং রুমে। বাবু অবশ্য বাড়ি নেই। ফ্যাক্টরী থেকে এখনো ফেরেননি।

সুজাতা বলল, 'আমি বাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। তাঁর ভাইঝিকে

ডেকে দাও। তার সঙ্গে দুটো কথা বলে চলে যাব।'

বেশিক্ষণ বসতে হল না। একটু বাদেই দীর্ঘাঙ্গী তরুণী একটি মেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। পরনে গাঢ় সবুজ রঙের শাড়ি। গায়ে কোন গয়না নেই, বিবাহিতা হলেও সিঁথিতে সিঁদুর নেই। সমস্ত শুভ চিহ্ন যেন স্বেচ্ছায় বর্জন করেছে। রুক্ষতা রূঢ়তাই যেন ওর একমাত্র অলঙ্কার। সুজাতার মনে হল, ওর এই মূর্তি যেন চেনা চেনা। কোথায় যেন ওকে দেখেছে ঠিক করতে পারল না সুজাতা। দেখে থাকলে যে নিজের আয়নাতেই দেখেছে, সে কথা তার মনে পড়ল না। বরং মন্দিরার যৌবনের ঐশ্বর্য থাকলেও রূপ যে সুজাতার চেয়ে বেশি নয়, তা দেখে সে খুশী হল। এ যে মন্দিরা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মন্দিরা যুক্তকর কপালে ছুঁইয়ে একটু নমস্কারের ভঙ্গি করে বলল, 'কে আপনি? আপনাকে তো কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

যেন স্কুলের কোন ছাত্রীকে সুজাতা সস্নেহে নির্দেশ দিচ্ছে, তেমনি ভঙ্গিতে সামনের আসনটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'বোসো। আমাকে তুমি দেখনি ঠিকই। কিন্তু আমার কথা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। আমার নাম সুজাতা। সুজাতা সেনগুপ্ত।'

মন্দিরা উঠে গিয়ে দোরটা বন্ধ করে দিয়ে এল। তারপর সামনের ছোট সোফাটায় সোজা হয়ে বসল।

সুজাতা লক্ষ্য করল, তার নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরার মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠেছে। লজ্জায় কি রাগে সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারল না সুজাতা। ভ্রূ যেভাবে কুঁচকে উঠেছে তাতে মনে হয় রাগই। অপরাধিনীর এই অসহায় ক্রোধটুকু উপভোগ করল সুজাতা। মৃদু হাসল। মনে মনে বলল, 'আমাকে দেখেই তুমি জ্বলে উঠেছ। তুমি কি ভেবেছিলে আমি কোথাও নেই? বিশ্বসংসার থেকে আমি একেবারে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছি?'

মন্দিরা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি শশাঙ্কবাবুর—'

সুজাতা অনুক্ত পদটি বসিয়ে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি তাঁর স্ত্রী।'

স্ত্রী কথাটার ওপর একটু বেশি জোর এসে গেল। হয়তো সুজাতার ইচ্ছা ছিল না। তবু এল।

মুহূর্তের জন্যে সেই উদ্ধত স্পর্ধিতা প্রতিদ্বন্দ্বিনী ম্লান আর মূক হয়ে গেল। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই দ্বিগুণ বেগে দীপ্ত হয়ে উঠল মন্দিরা। ঠোঁটে একটু হাসি টেনে বলল, 'স্ত্রীই হোন আর যাই হোন, আপনার সঙ্গে তো আমার কোন পরিচয় নেই। কোন আইডেন্টিটি কার্ডও আপনি সঙ্গে করে আনেননি।' সুজাতার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তার অঙ্গেও সধবার কোন চিহ্ন এখন আর নেই।

মন্দিরা বলল, 'আপনার মুখের কথাই আমাকে বিশ্বাস করে নিতে হবে।

তাও না হয় নিলাম। কিন্তু আপনি আমাকে তুমি বলছেন কোন অধিকারে? আমি তো অনুমতি দিইনি।'

অনুমতি! এই নির্লজ্জা, দুর্বিনীতা, দুশ্চরিত্রা মেয়েটির কথা বলবার ভঙ্গি দেখে সুজাতার সমস্ত সংযম ভেঙ্গে পড়বার জো হল। কিন্তু কঠিন চেষ্টায় আত্মসংবরণ করে হেসে বলল, 'না, অনুমতি তুমি দাওনি। তুমি আমার স্বামীর ছাত্রী। স্নেহের পাত্রীও ছিলে শুনেছি। বয়সে ঢের ছোট। কাজও এমন কিছু বড় রকমের করোনি।'

শেষ কথাটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেন সুজাতার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ফের অসহিষ্ণু আর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল মন্দিরা। তীব্রস্বরে বলল, 'বড় কাজ কি ছোট কাজ সে আমি জানি। আপনার স্বামীও জানেন। অযাচিতভাবে বাড়ি বয়ে এসে আমাকে অপমান করবার অধিকার আপনাকে কে দিল?'

সুজাতা তীব্রদৃষ্টিতে মন্দিরার দিকে তাকাল। শশাঙ্কের সমস্ত প্রণয়িনী যেন একসঙ্গে আজ এই তরুণী মন্দিরার রূপ নিয়েছে। একটি কটুস্বরে সহস্র সূচের জ্বালা। ওই স্বর কি স্তব্ধ করে দেওয়া যায় না?

কিন্তু নিজের বিভ্রান্তিতে সুজাতা পরক্ষণে নিজেই হাসল। চঞ্চল বিক্ষুব্ধ চিত্তকে শান্ত করতে একটু সময় নিল। তারপর একটু হেসে বলল, 'অধিকার কেউ কাউকে দেয় না মন্দিরা। যার হাতে যাবার তা আপনিই গিয়ে পৌঁছায়। এখন যেমন তোমাদের বিচারের ভার আদালতে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু আমি চাইনে এ নিয়ে আরো কেলেঙ্কারি বাড়ুক। তাতে কারোরই গৌরব নেই। তাতে সবাইরই লজ্জা। আমি বলি, তুমি তোমার স্বামীর কাছে যাও। যদি বল, আমিও সঙ্গে যেতে পারি। আমার তাতে কোন অপমান নেই। চল, আমরা তাঁকে এই বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার জন্যে বলি। তারপর নিজেরা বিচার-বিবেচনা করে যাতে ভালো হয় তাই করবে।'

মন্দিরা সুজাতার দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনার স্বামী বুঝি এই জন্যেই আপনাকে পাঠিয়েছেন?'

সুজাতা স্থিরদৃষ্টিতে মন্দিরার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটু হেসে বলল, 'তিনি আমাকে পাঠাননি। আমি নিজেই এসেছি। কিন্তু পাঠালেও অন্যায় হত না। কেন, উদ্দেশ্যটা কি তোমার কাছে খারাপ লাগছে?'

মন্দিরা বলল, 'ভালো কি খারাপ আমি জানিনে। জানতেও চাইনে। আপনার কি আর কিছু বলবার আছে?'

'না, আর কিছু বলে লাভ নেই।' সুজাতা উঠে দাঁড়াল।

মন্দিরা বলল, 'আপনি তো আশ্রমে ছিলেন শুনেছি। ফের বুঝি ঘর-সংসারের দিকে মতি হয়েছে?'

সুজাতা যেতে যেতে ফিরে তাকাল, 'যদি হয়েই থাকে তোমার কি তাতে

কোন আপত্তি আছে? তুমি ভেবেছ, বিশ্বসুদ্ধ লোক তোমার সেই আপত্তি শুনবে?'

সুজাতা আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে নেমে লন পেরিয়ে সোজা গেট দিয়ে বেরিয়ে এল। মোটামত একজন ভদ্রমহিলা পিছনে পিছনে এসে কী যেন বললেন। কিন্তু তাঁর কোন কথা তার কানে গেল না। কোনদিকে আর তাকালও না সুজাতা।

বাসে উঠে নিজের আচরণের জন্যে সুজাতার মন ফের গ্লানি আর অনুশোচনায় ভরে উঠল। ছি ছি ছি, সে কী ভেবে এসেছিল আর কী ঘটে গেল। এতদিন ধরে সংযমের অনুশীলনে এই ফলই কি লাভ করল সুজাতা? আর কিছুই তার পক্ষে করা সম্ভব হল না। মন্দিরাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই তার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুঞ্জপুঞ্জ বিদ্বেষ এসে সঞ্চিত হল। যে জ্বালা যে প্রতিশোধস্পৃহা মনের মধ্যে মূর্ছিত হয়ে ছিল, তা যেন নতুন জীবন পেয়ে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। অবাধ্য ছাত্রীর গায়ে কখনো কোনদিন হাত তোলেনি সুজাতা। কিন্তু মন্দিরার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার ইচ্ছা হচ্ছিল ওর প্রতিটি কথার জবাবে গালে একটি করে চড় বসিয়ে দেয়। কিন্তু তা তো মারতে পরেনি, সেই চড় নিজের গালেই ফিরে এসেছে সুজাতার। কয়েক মুহূর্ত ধরে যে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সে পেয়েছে তার যেন আর তুলনা হয় না। কিছুক্ষণের জন্যে সুজাতাও যেন আঠের উনিশ বছরের এক চঞ্চলমতি অসূয়াবতী তরুণী বনে গিয়েছিল। কেন? মন্দিরা অন্যায় কাজ করেছে বলে নয়, সুজাতার স্বামীর প্রেমের অংশভাগিনী হয়েছে বলে। যে স্বামীর সঙ্গে এতকাল ধরে সুজাতার কোন সম্পর্কই ছিল না, তার প্রণয়ের ভাগ দিতেও এত কষ্ট! আর শুধু কি মন্দিরা? সেই প্রণয়ভাগিনী এই এগারো বারো বছরে আরো কতজন হয়েছে তার ঠিক কি। তাদের কারো সঙ্গে তো সুজাতার দেখা হয়নি। শুধু মন্দিরার সঙ্গেই দেখা হয়েছে। আর মনের সমস্ত বিদ্বেষ সমস্ত আক্রোশ দিয়ে ওই একটি মেয়েকে দগ্ধ করতে চেয়েছে। পেরেছে কি? একটুও পারেনি। সুজাতা নিজেই পুড়ে মরেছে। আর একজনকে মারতে গিয়ে সুজাতা নিজের হাতে নিজেই প্রহৃত হয়েছে। সেই প্রহারের যন্ত্রণার তুলনা নেই।

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর এক হাতে কিসের একটা থলি, আর এক হাতে অতিকষ্টে মাথার ওপরের হ্যাণ্ডেলটা ধরে রেখেছেন। সুজাতার খেয়াল ছিল না। এবার দেখতে পেয়ে তাঁকে পাশে বসতে বলল। পাশের সীটটা এতক্ষণ খালিই পড়ে ছিল।

ভদ্রলোক কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। তারপর যেন সুজাতাকেই লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, 'আর পারিনে মা। বয়েস হয়েছে তবু ঘানিটানার বিরাম নেই। ছেলেরা কুঁড়ের বাদশা। নড়ে বসবে না। সব আমার ওপর। গুষ্ঠিসুদ্ধকে রোজগার করে খাওয়াব। আবার মোটও বইব। পাপ আর কাকে বলে।'

সুজাতা চোখের দৃষ্টিতে সহানুভূতি জানাল। কিছু বললে ভালো হতো। কিন্তু কী বলবে।

সামনের দিকে বসবার জায়গা নিয়ে দুজন যাত্রীর মধ্যে বাদবিতণ্ডা শুরু হয়েছে।

একজন বলছেন, 'মশাই, আপনার কোন রাইট নেই ওখানে বসবার।'

দ্বিতীয় উপবিষ্ট ভদ্রলোকটি জবাব দিচ্ছেন, 'আপনারই বুঝি রাইট আছে। সীট বুঝি আগে থেকে রিজার্ভ করে রেখেছিলেন?'

'আর কথা বলবেন না মশাই, চুপ করে থাকুন। বিন্দুমাত্র সিভিক সেন্স যদি আপনার থাকত তা হলে অমন কাণ্ড করতে পারতেন না। কোথায় কোন জায়গায় আপনি ছিলেন, সীটটি খালি হওয়ার সঙ্গে কোত্থেকে টপকে এসে বসে পড়লেন। কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে পা মাড়িয়ে—। আপনি আবার কথা বলছেন? শুধু ফর্সা জামাকাপড় পরলেই মানুষ ভদ্রলোক হয় না।'

মধ্যস্থ এক ভদ্রলোক বিবাদ মিটাবার চেষ্টা করছেন। 'আরে মশাই যেতে দিন, যেতে দিন। কতক্ষণেরই বা মামলা। বাস থেকে নেমে গেলে কারো কথা কি কারো মনে থাকবে? কেউ কাউকে কি চিনতে পারবেন? মাত্র কয়েক মিনিটের তো মেয়াদ। একটুখানি তো বসবার জায়গা। তাই নিয়ে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলেছেন।'

যাত্রী দুজন চুপ করলেন।

সুজাতা ভাবল, তা ঠিক। মামলা খুব বেশী দিনের নয়। কিন্তু সে কথা কে মনে রাখে? নাকি মনে রাখতে পারে? প্রতিদিন জরামৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও মানুষ তার মৌরসীপাট্টা ছাড়তে চায় না। যত সে হৃতসর্বস্ব হয়, তত দুর্বল মুঠিতে প্রাণপণে নিজের স্বত্ব আঁকড়ে ধরে।

কোন দরকার ছিল না, তবু কি খেয়াল হল সুজাতার, একবার শশাঙ্কের সঙ্গে দেখা করে যাবে। বলে যাবে, 'তুমি যেমন একদিন আমাকে দেখতে গিয়েছিলে আমিও তেমনি দেখতে এলাম। শুধু দেখতে। আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আর যদি আমাকে দিয়ে তোমার কোন কাজ হয়, সত্য পথে থেকে যদি তোমাকে আমি কোন সাহায্য করতে পারি সেই একটু আকাঙ্ক্ষা আছে। ভয় নেই, তার বিনিময়ে কিছু আমি চাইব না। আর কিছুই আমার চাইবার নেই।'

দীর্ঘকাল বাদে নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতি হল সুজাতার। অশরীরী আত্মা যেন ফিরে এসে তার মৃতদেহটাকে দেখছে। সেই দেহ এক সময়ে তার ছিল, অনেক সুখদুঃখের অনুভূতির আধার ছিল। এখন শুধু ক্ষীণ স্মৃতিটুকু আছে। আর কিছু অবশেষ নেই।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। একটি ছেলে এসে সামনে দাঁড়াল, বলল, 'কী চাই আপনার?'

সুজাতা বলল, 'বাবু বাড়িতে আছেন?'

'না। অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছেন। ফিরতে অনেক দেরি হবে। বন্ধুর কাছে যাবেন। বন্ধুকে নিয়ে উকিলের কাছে যাবেন।'

সুজাতা একটু হতাশ হল। আবার কিসের যেন একটা স্বস্তিও বোধ করল। স্বামীর মুখোমুখি হতে হল না। এক হিসাবে ভালোই হল। এবার ফিরে গেলেই হয়। অশরীরী আত্মা কি তার শবদেহের কাছে এতক্ষণ থাকে?

ছেলেটি বলল, 'আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভিতরে আসুন না। বসবেন এসে একটু। আপনি কী হন বাবুর?'

সুজাতা বলল, 'আগে চেনাজানা ছিল।'

ছেলেটি একটু হেসে বলল, 'ও বুঝেছি। ভিতরে আসুন না।'

শশাঙ্কের চাকর কী বুঝেছে তা অনুমান করে সুজাতা নিজের মনেই একটু হাসল। নিশ্চয়ই তাকে শশাঙ্কের প্রণয়িনীদের একজন বলে ভেবেছে। সুজাতা একবার বলেছিল, 'আমি তোমার স্ত্রী না হয়ে তোমার বান্ধবী হলে বোধ হয় অনেক বেশী আদর পেতাম।'

শশাঙ্ক বলেছিল, 'তুমি ভুল করছ। শুধু আদরের সম্পর্ক কি বেশিদিন থাকে?'

কিন্তু অনাদরের সম্পর্কই বা বেশী দিন রইল কই?

'আসুন না ভিতরে। একটু বসে যাবেন। চা খেয়ে যাবেন এক কাপ।'

সুজাতা খুশী হয়ে বলল, 'আচ্ছা চল। তোমার নাম কি?'

'আমার নাম রামেশ্বর।'

'বাঃ, রাম নাম খুব ভালো নাম। আর তুমি ছেলেও খুব ভালো।'

রামেশ্বর হাসিমুখে আর একবার তাকে ভিতরে যাওয়ার জন্যে আপ্যায়ন করল।

অশরীরী কি অন্য-শরীরী আত্মা বোধ হয় তার পূর্বদেহে আর ঢুকতে পারে না। কিন্তু সুজাতা ফের ভিতরে ঢুকল। জানে যে, এই প্রবেশ গৃহপ্রবেশ নয়।

ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখে সুজাতা বলল, 'তোমার বাবু কি এখনো এমন অগোছালো হয়ে থাকতেই ভালোবাসেন?'

রামেশ্বর বলল, 'ভালো যে বাসেন তা নয়। কিন্তু কেমন যেন অগোছালো করে ফেলেন। মাঝে মাঝে নিজেই একদিন সব গোছাতে বসেন। সারাদিন গোছান। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতে আবার যা তাই। আমি কি কম সাজিয়ে গুছিয়ে রাখি? কিন্তু গুছালে কী হবে, কখন যে বাবু এখানকার জিনিস ওখানে টেনে নেবেন, ওখানকার জিনিস সেখানে—'

সুজাতা একটু হেসে বলল, 'জানি, ওই ওঁর স্বভাব। সে স্বভাব একটুও বদলায়নি।'

রামেশ্বর বলল, 'আপনি বসুন। আমি চা করে নিয়ে আসি।'

'চা করবার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আচ্ছা, ওপরের শোবার ঘরে সেই দুখানা খাটই কি পাশাপাশি আছে?'

'না, একখানা সরিয়ে দিয়েছি। দরকার তো আর হয় না।'

'আর পাশে যে বসবার ঘরটা ছিল—'

রামেশ্বর বলল, 'আপনি সব জানেন দেখছি। সে ঘর সেই রকমই আছে। বাবু তো ওপরে আজকাল আর যানই না। দুদিন ধরে তো দিনরাত নীচের ওই পড়বার ঘরেই পড়ে ছিলেন।'

'রাত্রেও পড়ে ছিলেন? কেন রাত জেগে জেগে আগের মত পড়াশুনো করেন নাকি?'

'আগে আগে পড়তেন। কিন্তু কাল আর পরশু পড়েননি। রাতভোর ছবি এঁকেছেন।'

সুজাতা একটু অবাক হয়ে বলল, 'ছবি এঁকেছেন? সে বাতিক ওর এখনো আছে নাকি?'

সুজাতার মনে পড়ল, শশাঙ্ককে এক সময় কী ভাবে পেয়ে বসেছিল। যত্ন আর নিষ্ঠা নিয়ে বড় আর্টিস্টের কাছে শিক্ষা করেছিল শশাঙ্ক। কিন্তু সেই নিষ্ঠা বেশিদিন রইল না। শিল্পচর্চা নিছক খেয়ালে পরিণত হল। তার প্রেম যেমন ভিন্ন ভিন্ন আধার খুঁজে বেড়িয়েছে, চিত্তও তেমনি অস্থিরভাবে ছুটো-ছুটি করেছে। কোন কাজেই মন বসেনি। সৃষ্টি তো আর খেলা নয়, খেয়াল নয়, কাজই।

রামেশ্বর বলল, 'মাঝখানে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আবার কী খেয়াল হয়েছে। ফের ওই সব শুরু করে দিয়েছেন। কাণ্ড দেখুন। ওদিকে মামলা চলছে। আর এদিকে উনি ওই সব নিয়ে আছেন।'

কথাটা বলে ফেলে একটু লজ্জিত হল রামেশ্বর। বলবার যেন তার ইচ্ছা ছিল না। অসতর্ক মুহূর্তে বলে ফেলেছে।

'বসুন আপনি। আমি চা করে নিয়ে আসি।'

সুজাতা হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা, তোমার বাবু কী আঁকছিলেন আমি একটু দেখতে পারি?'

রামেশ্বর একটু ইতস্তত করে বলল, 'উনি কাউকে দেখতে দিতে চান না। কিন্তু আপনি যখন বন্ধু—' লজ্জিত হয়ে একটু জিভ কাটল রামেশ্বর, কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে যখন এত চেনাজানা—। দেখুন আপনি। ঘর খোলাই আছে।'

বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে রামেশ্বর বোধ হয় চা করবার জন্যেই ভিতরে চলে গেল।

পা টিপে টিপে পাশের ঘরখানার দিকে এগোল সুজাতা। নীল পর্দাটা

সরিয়ে ভিতরে ঢুকল।

আলমারিভরা বই, র‍্যাকভরা বই। এলোমেলো কাগজপত্র ছড়ানো। পোড়া সিগারেটের টুকরো। ছাই উপচে পড়ছে অ্যাসট্রে থেকে। ছেঁড়া কাগজের রাশ। কী যেন লিখে লিখে সব ছিঁড়ে রেখেছে। নোংরার একশেষ ঘরখানা। কোথাও কিছুমাত্র পরিচ্ছন্নতা নেই, এক কোণে জানালার ধারে শশাঙ্কের ইজেল। ক্যানভাসে পূর্ণাবয়ব একটি নারীমূর্তি। পাশেই সরু মোটা কতকগুলি তুলি আর রঙের বাটি এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে।

সুজাতা সেই মূর্তিটির দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল। চিনতে দেরি হয় না এ মূর্তি কার, কিন্তু যে মন্দিরাকে সুজাতা খানিক আগে দেখে এসেছে তার চেয়ে অনেক কোমল পেলব আর মধুর। শিল্পী যেন তার মনের সমস্ত সাধ আহ্লাদ আর ভালোবাসা দিয়ে এই মূর্তিটিকে এঁকে তুলেছেন।

কিন্তু সেই মধুর চিত্রও সুজাতার মনে কিছুক্ষণের জন্যে দুঃসহ প্রদাহের সৃষ্টি করল। সেই দাহের যেন শেষ নেই। দগ্ধ ক্ষতের যন্ত্রণার অবধি নেই।

সুজাতার ইচ্ছা হল ছবিখানা টেনে নামিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে অন্তর্দাহে দগ্ধ হতে লাগল সুজাতা। একটুও এগোল না, একটুও নড়ল না।

ছোট্ট একটু কাগজে লাল কালিতে আলাদা করে কী যেন লেখা আছে। সুজাতা একটু ঝুঁকে পড়ে দেখল—'ম্যানিফেস্টো।'

মৃদু হাসল সুজাতা। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সেই দাহ নির্বাপিত হল। আত্মা তার পরিত্যক্ত গলিত শবদেহ থেকে ফের বেরিয়ে এসেছে।

রামেশ্বর এসে দাঁড়িয়েছে চায়ের কাপ হাতে। একটু হেসে বলল, 'কী নোংরা করে রেখেছেন ঘরখানা। ঝাড়পোছ করতে এলে মারতে আসেন। কেমন দেখলেন ছবি।'

সুজাতা বলল, 'ভালো।'

রামেশ্বর বলল, 'চলুন, ওঘরে বসে বসে চা খাবেন। নাকি এঘরেই বসবার কিছু একটা এনে দেব!'

সুজাতা বলল, 'না না, ওঘরেই চল।'

বাইরের ঘরে এসে সোফায় বসল সুজাতা। রামেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চমৎকার চা করেছ।'

রামেশ্বর লজ্জিতভাবে হাসল।

এই মুহূর্তে শশাঙ্ককে দেখলেও যেন বলতে পারত সুজাতা, 'চমৎকার ছবি এঁকেছ।'

চায়ের সুখ্যাতিতে ভৃত্যের মুখে যে হাসি ফুটেছে ছবির সুখ্যাতিতে প্রভুর মুখেও কি সেই পরিতৃপ্তির হাসি ফুটত? হয়তো ফুটত। মানসদৃষ্টিতে

হাসিটুকু দেখে, এখান থেকে চলে যেতে চায় সুজাতা। আর কিছু চাইতে গেলে জ্বলতে হয়, পুড়তে হয়। এক জীবন সেই অগ্নিকুণ্ডে জ্বলে পুড়ে মরেছে সুজাতা। দ্বিতীয়বার আর সেই অনলে প্রবেশ করতে চায় না। মুহূর্তের জন্যে ভুল হয়েছিল। পতঙ্গের মত ফের ছুটে এসেছিল। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে পড়েনি। একটুকুর জন্যে বেঁচে গেছে।

সুজাতা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলি এবার।'

রামেশ্বর বলল, 'কিন্তু বাবুকে কী বলব। আপনি তো নামটাম কিছু বলে গেলেন না। কিছু লিখে যাবেন?'

'লিখে যাব?' সুজাতা একটু ইতস্তত করল। তারপর বলল, 'আচ্ছা, দাও একটু কাগজ কলম। লিখে রেখেই যাই। নইলে তোমাকে হয়তো কৈফিয়ৎ দিতে হবে।'

শশাঙ্কের প্যাডের কাগজে, তার কলমে তাকেই চিঠি লিখতে লাগল সুজাতা। বহুকাল পরে স্বামীর কাছে এই তার প্রথম চিঠি। সুজাতা মনে মনে বলল, 'এই শেষ।'

লেখা শেষ করে একবার পড়ে দেখল সুজাতা।

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। দেখা হল না। তোমার ম্যানিফেস্টো দেখে গেলাম। ভেবেছিলাম তোমার এই বিপদের সময় যদি আমাকে দিয়ে তোমার কোন দরকার হয়—যদি তোমার কোন কাজে লাগি। কিন্তু এসে দেখলাম তার কোন দরকার নেই। তোমাকে সাহায্য করব এমন কোন শক্তিও নেই আমার। তোমার ম্যানিফেস্টোর সঙ্গে আমার কোন মিল নেই। তুমি সমস্ত জীবনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শুধু একটি সুন্দর শিল্পমূর্তির মধ্যে তাকে ধরে রাখতে চাও। জীবন তোমার কাছে মাটি কাঠ পাথরের মত উপাদান ছাড়া কিছু নয়। প্রতিটি বাক্যকে সুন্দর আর যথাযথ করে বলতে পারলে, প্রতিটি রেখাকে সবল করে তুলতে পারলেই তুমি চরিতার্থ। আর কোনদিকে তোমার ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু আমার সাধ অন্যরকম। আমি চিন্তায় ধারণায় আচরণে জীবনের সুন্দর মূর্তি দেখতে চাই। জীবন আমার কাছে শুধু শিল্পের উপাদান নয়। জীবনই শিল্প।'

'আমি আশ্রম ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু তাই বলে ধর্মবিশ্বাসকে ছাড়িনি। তোমার কাছে শিল্প যা, আমার কাছে ধর্মও তাই। ঈশ্বর আমার কাছে সেই মহোচ্চ কল্পনা। পূর্ণতার আধার। যেখানে আমি কখনোই গিয়ে পৌঁছতে পারব না। কিন্তু বার বার পৌঁছতে চেষ্টা করব। বাবা যাচ্ছেন তীর্থ ভ্রমণে। ভাবছি, আমিও তাঁর সঙ্গে যাব। তীর্থের জন্যে নয়। সেই তীর্থ আমার হাতের কাছেই আছে। তার জন্যে দূরে যাওয়ার দরকার হয় না। তবু যাচ্ছি। ধরো ভ্রমণের জন্যেই যাচ্ছি। মাঝে মাঝে তাও তো দরকার। তাতে চোখ বদলায়, মন বদলায়। সবই বদলায়। কিন্তু মানুষ বোধ হয় মূলত বদলায় না।

তোমাকে দেখে আর নিজেকে দেখে এই কথাই আজ আমার নতুন করে মনে হল। কিন্তু আমি বদলাতে চাই। বদলে বদলে সুন্দর হতে চাই, শুদ্ধ হতে চাই। এই চাওয়া কোনদিন পূরণ হয় না জানি। তবু তো চাওয়ার শেষ নেই।'

রামেশ্বর বলল, 'নাম লিখলেন না?'

সুজাতা একটু হেসে বলল, 'নামের দরকার নেই। তিনি বিনা নামেই আমাকে চিনতে পারবেন।'

॥ ২৭ ॥

ভোরে উঠেই মন্দিরার মনে পড়ল, আজ তাকে কোর্টে সাক্ষ্য দিতে যেতে হবে। শুধু ভোরে উঠেই বা কেন, রাত্রে ঘুমোবার আগে, ঘুমের মধ্যে ঘুম ভেঙে যাবার পরেও, এই একটি চিন্তাই কি প্রতি মুহূর্তে বার বার তার মনকে বিদ্ধ করেনি? কোর্টে কী বলবে মন্দিরা, অন্য পক্ষের উকিল তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন, সে-সব প্রশ্নের সে কীই-বা জবাব দেবে, কিসে ভালো হবে কিসে মন্দ—সব যেন অস্পষ্ট, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে মন্দিরার। অবশ্য কাকার উকিল বন্ধু তাকে খুব ভরসা দিয়েছেন, খানিকটা তালিমও দিয়েছেন। বার বার বলেছেন, 'তোমার কোন ভয় নেই। যা সত্যি সত্যি হয়েছিল, তাই বলবে। বলবে, তুমি ঝগড়াঝাটি করে চলে এসেছ। এমন ঝগড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কতই হয়। আবার তুমি ফিরে যাবার জন্যে তৈরী। শশাঙ্কবাবুর সম্বন্ধে ওঁরা কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলবে, তিনি তোমার প্রফেসার ছিলেন, তাঁকে তুমি শ্রদ্ধা কর, তিনি তোমাকে স্নেহ করেন। এছাড়া তোমাদের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক নেই। খুব সম্ভব আজ তোমাকে ওঁরা কেউ ক্রস করবেন না। দু' একটা কথা যদি জিজ্ঞেস করেন, বলবে। স্কুলে থাকতে ওরাল এগজামিনেশনও তো দিয়েছ। ব্যাপারটাকে তাই মনে করবে। তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবে না।'

মন্দিরা মুখ নিচু করে সব শুনে গেছে। কোন তর্ক করেনি, বাদ-প্রতিবাদ করেনি।

উকিল বলেছেন, 'তোমার কোন ভয় নেই। তোমার সম্মানের হানি হয় তেমন আপত্তিকর ভঙ্গিতে আপত্তিকর কথা কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, তার জন্যে আমি আছি। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রোটেস্ট করব। ব্যাপারটা [illegible] নোটিশে আনব। আজকাল আর সে যুগ নেই। আদালতকে কবি-তর্জার আখড়া বানাতে আজকাল আর কেউ পারে না।'

আদালতে মন্দিরার কেউ সম্মান হানি করতে পারবে না। উকিল ভরসা দিয়েছেন। তার মান রক্ষার জন্য কাকা শুধু বন্ধুপ্রীতির ওপর ভরসা করেননি।

মোটা টাকা ফিজ দিয়ে রেখেছেন। কাকা সবান্ধবে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, যতক্ষণ কেস চলবে উকিল তার কাছছাড়া হবেন না। কোন ভয় নেই মন্দিরার। মর্যাদাহানির কোন ভয় নেই। ভয় তো শুধু মান-মর্যাদা নিয়েই। প্রাণ তো কেউ আর নিতে পারবে না। যদি নিত তাহলে যেন বেঁচে যেত মন্দিরা। প্রতি-মুহূর্তে এই অনিশ্চিত। অজ্ঞাত আশঙ্কার অস্বস্তি থেকে মৃত্যুভয় কি খুব বেশি যন্ত্রণাকর? সম্মান হারাবার ভয়? সম্মানের কিছু অবশিষ্ট আছে! বাবা কুলত্যাগিনী মেয়েকে ত্যাগ করেছেন। আত্মীয়-স্বজনরা ছি-ছি করছে। স্বামী প্রীতি-ভালোবাসার সম্পর্ক ছেদ করে আদালতে তার নামে ব্যভিচারের মামলা এনেছে। সবচেয়ে মজা এই, যার জন্যে সমস্ত ত্যাগ করে এসেছে মন্দিরা, লজ্জা অপমান গ্লানির বোঝা মাথা পেতে নিয়েছে, সেই পরম ভালোবাসার মানুষটি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে এনে দু'পায়ে ঠেলেছে। এখন সেই আশ্রমবাসিনী সন্ন্যাসিনী স্ত্রীকে ফের গৃহিনী বানিয়ে তার আঁচলের তলায় মুখ লুকোতে যাচ্ছে কাপুরুষ। মন্দিরার ঘর-সংসার সব কেড়ে নিয়ে নিজে ফের সংসারী হতে যাচ্ছে। সুজাতার কথা, গায়ে পড়ে বাড়ি বয়ে সেই অপমান করে যাওয়ার কথা, মনে হতেই এক দুঃসহ আক্রোশে বিদ্বেষে বুক পুড়ে যেতে লাগল মন্দিরার। কোন প্রতিকার নেই? এই অহেতুক অপমান বঞ্চনা প্রতারণার প্রতিকার করবার কোন সাধ্যই কি নেই মন্দিরার? না, নেই। মন্দিরা আগেও যেমন অসহায় ছিল, এখনো তেমনি অসহায়। যে ক'জন এখনো তার সহায় রয়েছেন, নিরঞ্জনকাকা আর তাঁর উকিল বন্ধু, মন্দিরা তাঁদের কথামতই চলবে। আর কোন দিকে তার ভ্রূক্ষেপ করবার দরকার নেই। শুধু নিজেকে দোষমুক্ত করে নিতে হবে। তার কোন পাপ নেই, অপরাধ নেই, আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এই বানানো কথা বলে তাকে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। তারপর মামলার পাট চুকে গেলে কাকা তাকে সত্যিই ফ্যাক্টরীতে কাজ জুটিয়ে দেবেন। কাজকর্ম শিখিয়ে একটা আলাদা ডিপার্টমেণ্টের চার্জে বসিয়ে দেবেন তাকে। চাই কি, বিলাত থেকে ঘুরিয়ে আনবেন। মন্দিরা আরো ভালো করে লেখাপড়া শিখবে, কাজকর্ম শিখবে, নিজের হাতে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে বড় হবে। নিজের শক্তিতে গাড়ি করবে, বাড়ি করবে, খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়াবে। নিরঞ্জনকাকা অন্য এক পৃথিবীর, অন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র মন্দিরার সামনে মাঝে মাঝে তুলে ধরেন। কে বলে, আজকালকার মেয়েদের সার্থকতার শুধু ওই একটি পথ ছাড়া পথ নেই? স্বামী-পুত্র ঘর-সংসার ভালোবাসা—সুখের ওই একটি প্যাটার্ন ছাড়া প্যাটার্ন নেই—কে বলে একথা? আজকাল কত মেয়ে ওই প্যাটার্ন ভেঙে বেরিয়ে আসে। কিন্তু বেরিয়ে এসেই উচ্ছন্নে যায় না, আগেকার মত তারা পথের ধুলোয় কি নর্দমার নোংরা জল-কাদায় গড়াগড়ি যায় না। তারা ফের শক্ত হয়ে, মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। তাদের মন শক্ত হয়, হৃদয় শক্ত

হয়, কাজ করতে করতে দুখানা হাত শক্ত হয়ে ওঠে। যে হাতে তারা ছোট একটি সংসার গড়ে তুলতে পারে না, সেই হাতেই তারা হয়তো বড় বড় কলকারখানা গড়ে তোলে। তার দামও সমাজে কম নয়। তাতেও দশের অন্নসংস্থান হয়, দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়।

'তারপর নিজেকে গড়ে তোলার পর, যোগ্য হওয়ার পর, তুই যদি আবার কাউকে ভালোবাসতে চাস, বাসবি। ভালোবাসার দিন কি ফুরিয়ে গেল না কি? না কি, তখন পৃথিবী থেকে সব পুরুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে?'

নিরঞ্জনকাকা অসংকোচে তার মুখের দিকে তাকিয়ে এ-সব কথা বলেন।

'তবে হ্যাঁ, নিজে যোগ্য হয়ে যোগ্য পুরুষকে ভালোবাসবি। যাকে ভালো-বাসলে যোগ্যতা বাড়ে, কর্মক্ষমতা বাড়ে, তাকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসতে যাসনে।'

মন্দিরা মনে মনে হাসে। যেন ভালোবাসা অমন হিসেব করে আসে, হিসেব করে যায়। কিন্তু এখন থেকে হিসেব করেই চলবে মন্দিরা। আর তার ভালোবাসাবাসিতে কাজ নেই। আর কাউকে ভালোবাসতে চায় না মন্দিরা, কারো ভালোবাসা পেতেও চায় না। ভালোবাসার সাধ মিটে গেছে। এখন এই মামলার ঝামেলাটা কাটলেই সে বেঁচে যায়। উকিল বলেছেন, সব মিলিয়ে দু দিনের বেশি তাকে কোর্টে যেতে হবে না। আজ যাবে, আর জেরার দিনটিতে যাবে। তারপর মামলা মিটে গেলে মন্দিরা চলে যাবে বিদেশে। সে দেশ কোন্ দেশ, তা এখনো ঠিক করেনি মন্দিরা। তবে কল্পনা করে—সে-দেশ সোনার দেশ, স্বপ্নের দেশ। সে দেশের সবাই তাকে বন্ধুর চোখে দেখবে, প্রীতির চোখে দেখবে। সেখানে কেউ তো তার কলঙ্ক-কেলেঙ্কারির কথা জানতে পারবে না। সেই অপরিচিত দেশে নতুন পরিচয়ে পরিচিত হবে মন্দিরা। নতুন মেয়ে হয়ে জন্ম নেবে। যে মেয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপবান গুণবান পুরুষকে দেখেও চঞ্চল হবে না, ভালোবাসার জন্যে ব্যাকুল হবে না।

খানিকটা বেলা হতেই মা এলেন। মুখখানা করুণ বিষণ্ণ। দেখলেই বোঝা যায়, সারারাত ঘুমাননি।

মন্দিরা বলল, 'তুমি আবার কেন এলে মা?'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'না এসে যদি পারতাম, তাহলে বেঁচে যেতাম। যে পারবার, সে পেরেছে। কই, আমি তো পারলাম না। তোকে বলে দিতে এলাম, ভগবানের নাম স্মরণ রাখিস। মা কালী গঙ্গার নাম স্মরণ রাখিস। তাঁরাই যেন তোকে রক্ষা করেন। কী আর তোকে বলব। আমার আর কিছু বলবার নেই।'

কাকিমা বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না দিদি। অত ভাববেন না আপনি। মন্দিরার কোন ভয় নেই। ও শুধু সাক্ষী দিয়ে চলে আসবে।

মামলার যে-ই জিতুক-হারুক ওর জেলও হবে না, কিছুই হবে না। অত ভাবছেন কেন?'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'আমি ওর পরিণামের কথা ভাবছি। এর চেয়ে জেল ফাঁসও যে ভালো ছিল। মেয়েমানুষের স্বামী-সংসার গেলে আর কী থাকে বলো। তার জীবনের আর কী থাকে।'

মাও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মেয়েও মুখ ফিরিয়ে নিল।

একটু বাদে মা বিদায় নিলেন। কাকিমা বললেন, 'দিদিকে প্রণাম করো মন্দিরা।'

মন্দিরা একটু হাসল, 'প্রণাম-ট্রনাম ফিরে এসে করলেই হবে কাকিমা। শ্বশুরবাড়িতে তো আর যাচ্ছি না। অত ঘটা কিসের।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'কথা শোন মেয়ের। সেখানে তোমাকে তো ঠিকই পাঠিয়েছিলাম বাছা। সে সুখ তোমার কপালে সইল না, আমি তার কী করব। আমাকে প্রণামের দরকার নেই। আমি কারো প্রণাম চাইনি। আমি অমনিই আশীর্বাদ করি, ভগবান যেন তোমার সুমতি দেন। ধর্মে মতি দেন। হেসো না, টুকু। ওপরে একজন আছেন, একথা বিশ্বাস রেখো। এখনো দিন-রাত হচ্ছে, চন্দ্র-সূর্য উঠছে। তুমি যেখানে যাচ্ছ, সেও এক ধর্মস্থান। যিনি বিচার করবেন, তিনি জজই হোন, ম্যাজিস্ট্রেটই হোন, সেই ওপরের বিচার-ওয়ালার হুকুম ছাড়া তাঁরও নড়বার জো নেই।'

ইন্দ্রাণী চলে গেলেন।

অনেক, অনেক দিন পরে মন্দিরা ফের আকাশের দিকে তাকাল। সকালের আকাশে সূর্য নেই। খুব খুশি হল দেখে, বাবার সূর্য এখন মেঘে ঢাকা। ওই সূর্যকে চিরদিনের মত ঢেকে রাখতে পারলে যেন গায়ের জ্বালা মেটে মন্দিরার। একটি চন্ড সূর্য-উপাসককে মনের সাধ মিটিয়ে জব্দ করতে পারে।

কাকা আজ আর ফ্যাক্টরিতে যাননি। উকিল বন্ধুকেও সকালে খবর দিয়ে এনে বসিয়ে রেখেছেন। এই বাড়িতেই তিনি নাওয়া-খাওয়া সেরে নিলেন।

ওঁদের তাগিদে বেরোবার জন্যে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল মন্দিরা। এত তাড়াহুড়ো করবার তার ইচ্ছা ছিল না। স্কুলে বাধ্য হয়ে সময়মত গেছে, কলেজে পার্সেন্টেজের ভয়ে সময়মত গেছে। কিন্তু আজ তার ভয় কিসের? কোর্টে একদিন কি দু'দিন তো মোটে যাবে মন্দিরা। কেন নিজের ইচ্ছামত যাবে না? কেন সময়ের পিছু পিছু হাঁটবে? আজ সময় তার পিছনে পিছনে আসুক। মন্দিরাকে যাদের আজ দরকার তারা হা-পিত্যেশ করে বসে থাকুক ঘন্টার পর ঘন্টা।

কিন্তু কাকার বসবার ঘর থেকে বার বার তাড়া আসতে লাগল। তাই মন্দিরাকে নাইতে হল, খেতে হল, সাজতে হল। হ্যাঁ, সাজতেও হল। প্রথমে মন্দিরা ভেবেছিল, সাজবে না। যেমন সাধারণ আটপৌরে একখানা

শাড়ি পরে সারাদিন সারারাত ঘরের মধ্যে বন্দিনী হয়ে পড়ে থাকে মন্দিরা—কখনো স্বে- ।বন্দিনী, কখনো কাকা-কাকিমার, আজও আদালতের ঘরে সেই বেশেই যাবে। সবাইর চোখকে পীড়িত করবে মন্দিরা, কারো নয়ন ভোলাবে না। যাকে ভোলাতে চেয়েছিল সেই যখন ভুলল না, কী হবে আর কারো চোখের কথা ভেবে! সারা পৃথিবী তার দিকে রক্তচক্ষু হয়ে তাকিয়ে রয়েছে, মন্দিরাও তাদের চক্ষুশূল হয়েই দাঁড়িয়ে থাকবে। কারো নয়ন-মনোমোহিনী হবে না।

কিন্তু কাকিমার ধমকে সাজতে হল মন্দিরাকে। তিনি বললেন, 'উঁহু, আর বাড়াবাড়ি কোরো না। যা বলছি শোন।'

তিনি কাপড়ের আলমারি খুলে দিলেন। গয়নার বাক্স বের করে দিলেন। তাঁর আগেকার দিনের গয়না—যখন তিনি মোটা হননি, যখন তিনিও তন্বী আর তরুণী ছিলেন।

কাকিমা বললেন, 'বাড়াবাড়ি কোরো না। ভদ্র ঘরের বউ-ঝিরা যা পরে, তাই পরো। শাঁখা পরো, সিঁদুর পরো, কাজল পরো, আলতা পরো। এসো, চুল বেঁধে দিই। অযত্নে অযত্নে চুলের কী দশাই না হয়েছে।'

সাজতে হল। একবার ভাবল, কালো রঙের শাড়ি পরে। মনের অন্ধকারকে সারা অঙ্গে মেখে নিয়ে যায়। মনের অন্ধকারকে নিশীথিনীর মত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে দিতে চলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরিয়ে রাখল কালো রঙের শাড়ি। নীল সবুজ বাসন্তী নানা রঙের শাড়িই আছে কাকিমার। নানা রঙের দিনগুলি চলে গেছে, শাড়িগুলি আছে। মন্দিরা তার ভিতর থেকে বেছে বেছে বের করল গাঢ় রক্ত রঙের বেনারসী।

কাকিমা অবাক হয়ে বললেন, 'ওমা, ওই শাড়ি পরবে? ও যে আমার সেই বিয়ের দিনের—'

'এক দিনের জন্যে আমাকে পরতে দিন কাকিমা।'

মন্দিরা ফের যেন বাসরঘরে যাচ্ছে। একদিন সবাই তাকে জোর করে সেই ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল, আজ যাচ্ছে নিজের ইচ্ছায়।

সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা টেনে দিল, কপালে কুঙ্কুম। কাজলে ঘনতর হল কালো চোখ। আলতোভাবে রঞ্জিত করল ওষ্ঠাধর। পায়ে আলতা পরল অনেকদিন পরে। ব্রেসিয়ারের শাসনে বক্ষযুগল আরো উদ্ধত হয়ে উঠল। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মন্দিরা নিজের মনেই হাসল, 'তোমাকে আজ পরম সতীসাধ্বীর রোল প্লে করতে হবে। সেই ভূমিকা যেন পঞ্চকন্যার খ্যাতি ছাড়িয়ে যায়।'

গাড়িতে কাকার ভুঁড়িওয়ালা টাকপড়া চুরুটমুখো উকিল বন্ধুটি নানা ছলে তার দিকে বার বার তাকাতে লাগলেন। মন্দিরা ওঁদের অলক্ষ্যে নিজের মনেই হাসল। কাজ হয়েছে, তার সাজে কাজ হয়েছে। তার রূপ দেখে

উকিলের মন টলেছে আর ম্যাজিস্ট্রেটের মন গলবে না?

কোর্টে গিয়ে যাতে বসে থাকতে না হয় সে ব্যবস্থা কাকা আর তাঁর বন্ধু আগে থেকেই করে রেখেছিলেন। তাই কেস আরম্ভ হবার ঠিক আগেই তারা গিয়ে পৌঁছল। শুধু পনের বিশ মিনিটের মত অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি ঘরে মন্দিরাকে বসে থাকতে হল।

চেয়ারে আরো দু'তিনজন ভদ্রঘরের মহিলা বসে আছেন। কে জানে, ওঁরা আসামী না ফরিয়াদী। সাধারণ সাক্ষী, না রাজসাক্ষী। এখানে সুজাতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে মন্দ হতো না। কিন্তু সে বোধ হয় আসতে ভরসা পায়নি।

কাকার বন্ধু এসে বললেন, 'কোন ভয় নেই। ভালো করে জিরিয়ে নাও। ডাব খাবে একটা? না কি চা?'

মন্দিরা হেসে মাথা নাড়ল, 'আমার কিছু দরকার নেই। আপনারা খান।'

• কিছুক্ষণ বাদে ডাক উঠল। মন্দিরাদের মামলা আরম্ভ হয়েছে।

বিচারের ঘরে এসে কাকা আর তাঁর বন্ধুর মধ্যবর্তিনী হয়ে বসল মন্দিরা। কোর্ট আজ ভরতি। যেন উপচে পড়ছে মানুষ। রোজ কি এত ভিড় হয়? নিশ্চয় না। মন্দিরা জানে, সবাই তার কেলেঙ্কারির কথা শুনতে এসেছে, কলঙ্কিনীকে দেখতে এসেছে। দেখুক। মন্দিরা কোন দিকে তাকাচ্ছে না। কিন্তু সবাই তার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। তাকাক। সহস্রলোচন তার দিকে অপলক হয়ে থাকুক। অভিশপ্ত ইন্দ্রের অঙ্গভরা সহস্র লোচন।

প্রথমে রামেশ্বর দাঁড়াল সাক্ষীর কাঠগড়ায়। প্রভুভক্ত ভৃত্য রামেশ্বর। সত্য ছাড়া মিথ্যা বলব না—শপথ বাক্য পাঠ করল। একটু হেসে বলল, 'বাবু আমাকে এই কথা প্রথমে লিখতে শিখিয়েছিলেন। আমি প্রথমে বাবুর পকেট থেকে পয়সা চুরি করতাম, বাজারে টাকা থেকে আট আনা দশ আনা সরিয়ে রাখতাম। কিন্তু বাবু আমাকে ভালোবেসে লেখাপড়া শেখালেন। আমি সেই থেকে চুরি করা ছেড়ে দিয়েছি, মিথ্যা কথা বলাও ছেড়ে দিয়েছি।'

ফরিয়াদী পক্ষের উকিল বললেন, 'হ্যাঁ, তোমরা দুজনেই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। বাজে সময় নষ্ট কোরো না। আমি যা বলছি তার জবাব দাও। তোমার মন্দিরা দিদিমণিকে তোমার বাবুর বাড়িতে দেখেছ কি না তাই বলো।'

'দেখেছি।'

'বিয়ের আগেও দেখেছ, বিয়ের পরেও দেখেছ।'

'দেখেছি।'

'দিদিমণি কেন আসতেন?'

'বিয়ের আগে পড়তে আসতেন।'

'পড়ার নমুনা তো দেখতে পাচ্ছি। আর বিয়ের পরে কেন আসতেন?'

'বিয়ের পরে তো বেশি আসেননি। মাত্র দু'দিন এসেছিলেন।'

'মাত্র দু'দিন! বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

'একদিন হয়নি। চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন।'

'কী ছিল সেই চিঠিতে?'

রামেশ্বর একটু হাসল, 'কী করে জানব উকিলবাবু? পরের চিঠি কি আমি পড়েছি!'

উকিল মন্তব্য করলেন, 'ওরে বাবা। জ্ঞানের নাড়ি বেশ টনটনে দেখছি। সেয়ানা ছেলে।'

'আপনি যতই রাগ করুন বাবু, পরের চিঠি আমি পড়িনে। আগে লেখাপড়া জানতাম না। তখন নিজের চিঠিও পড়তে পারতাম না, পরের চিঠিও পড়তে পারতাম না। এখন অল্প-স্বল্প পড়তে পারি। তাই বলে পরের চিঠি কেন পড়ব! বাবু আমাকে অনেক বই কিনে দিয়েছেন, তাই পড়ি।'

উকিল প্রথম দিনের বিবরণ ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় দিনের বিবরণ নিয়ে পড়লেন। রামেশ্বর যেটুকু দেখেছে শুনেছে, সবই স্বীকার করল। 'দিদিমণি সেদিন রাত্রিবেলায় গাড়ি করে এসেছিলেন। বাবুর পড়বার ঘরে বসে কথা বলেছিলেন, গল্প করেছিলেন। কিন্তু আর কিছু করেননি। রামেশ্বর সব সময় তাঁদের কাছে কাছে ছিল। তাঁদের চা দিয়েছে, খাবার দিয়েছে। তারপর গল্পসল্প শেষ হলে, রাত বেশি হয়ে যাচ্ছে দেখে বাবু নিজেই গাড়িতে করে দিদিমণিকে তাঁর কাকার বাড়িতে পেঁ‍াছে দিয়ে এসেছেন।'

'তাঁরা নিশ্চয়ই ঘরের দরজা বন্ধ করে গল্প করছিলেন।'

'না। দরজা বন্ধ করবেন কেন। ভেজানো ছিল, পর্দা টানা ছিল। আমি পর্দা সরিয়ে বার বার সেই ঘরে ঢুকেছি।'

'ঢুকে তুমি নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে ওঁদের আপত্তিকর অবস্থায় দেখেছ।'

এ কথার উত্তরে রামেশ্বর জিভ কাটল।

'তুমি লজ্জায় স্বীকার করছ না, কি তোমাকে বলতে বারণ করা হয়েছে। নিশ্চয়ই তুমি তা দেখেছ। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে থাকতে দেখেছ, আদর করতে দেখেছ। তুমি ঢুকে পড়ায় তাড়াতাড়ি ওঁরা সরে গেছেন। তুমি আরো খারাপ অবস্থায় আরো খারাপ কাজ করতে দেখেছ। নিশ্চয়ই দেখেছ। তুমি হয় লজ্জায়, আর না-হয় ওঁদের সুযোগ দেওয়ার জন্যে আর ও-মুখো হওনি। শুধু জিভ কেটে থাকলে চলবে না, বলো, কথা বলো।'

রামেশ্বর বলল, 'কী করে বলব বাবু। ও-কথা বললে জিভ খসে পড়বে যে। বাবুর কি কাণ্ডজ্ঞান নেই, বাইরের ঘরে ওসব করবেন?'

'ও, তাহলে অন্য ঘরে গিয়েছিলেন। কোন ঘরে গিয়েছিলেন সত্যি করে বলো। দিদিমণিকে নিয়ে দোতলায় শোবার ঘরে উঠেছিলেন নিশ্চয়ই। তুমি নিচে বসে দরজা আগলাচ্ছিলে।'

'বাবু ও-সব করেননি। ওঁরা নিচের ঘরেই বসেছিলেন। বাবু শুধু গল্প

করছিলেন আর কথা বলছিলেন। দুজনের মধ্যে বরং কথা কাটাকাটি চলছিল। বাবুর কি কাণ্ডজ্ঞান নেই, ও-সব করতে যাবেন? দিদিমণির বিয়ে হয়ে গেছে। বাবুরও নিজের পরিবার আছে।'

'সে পরিবার তো দুশ্চরিত্র স্বামীর মুখদর্শন করেন না। তিনি তো আশ্রমে থাকেন।'

রামেশ্বর এবার একটু হাসল, 'আশ্রম থেকে তিনি ফিরে এসেছেন উকিলবাবু। ঝগড়া-ঝাটি মিটিয়ে নেওয়ার জন্যে এসেছেন। বাবু যদি অতই খারাপ হবেন, তাহলে কি তিনি আসতেন? বাবুকে ভালবাসতেন। দেখবেন, এসব মামলা-টামলা মিটে গেলে আবার ওঁরা সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করবেন।'

উকিল যেন একটু হতাশ হয়েই রামেশ্বরকে ছেড়ে দিলেন। এবার দ্বিতীয় সাক্ষীর ডাক পড়ল। শ্রীমতী মন্দিরা মুখোপাধ্যায়।

মন্দিরা ধীরে কিন্তু দৃঢ় পায়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল। একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল সারা আদালত। উচ্চ মঞ্চে ম্যাজিস্ট্রেট বসে আছেন। দু-এক ধাপ নিচে পেশকাররা, তার নিচে চেয়ারে সারি সারি উকিলরা। ভিন্ন ভিন্ন সারিতে স্বামী আর আসামী দুইজনকেই দেখতে পেল মন্দিরা। শশাঙ্কের সেই মোটা কালোমত বন্ধুটি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে হেসে হেসে কী যেন বলছেন। বোধ হয়, অভয় দিচ্ছেন বন্ধুকে। দর্শকদের ভিড়ে অচেনা মুখের আড়ালে আড়ালে নিশ্চয়ই বহু চেনা মুখ ওত পেতে আছে। থাকুক। মন্দিরা আজ কাউকে চেনে না। কাউকে স্বীকার করে না। পৃথিবীর কারো সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

'আপনার নাম?'

'মন্দিরা—হ্যাঁ, এখনো মুখোপাধ্যায়।'

'মিহির মুখোপাধ্যায় আপনার স্বামী?'

'হ্যাঁ ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল।'

'শুধুই বিয়ে হয়েছিল? আপনি পুরো এক বছর ধরে তাঁর সঙ্গে ঘর-সংসার করেননি? স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করেননি?'

'করেছি। কীভাবে করেছি, বলছি। আমি সব বলব, কিছুই লুকোব না। কিন্তু আমাকে জেরা করবেন না। আমাকে নিজে থেকে সব বলতে দিন।'

একটু বিস্মিত একটু-বা উৎসাহিত হয়ে উকিল বললেন, 'বলুন, বলুন।'

'আমি আসামীকে বিয়ের অনেক আগে থেকেই ভালোবাসতাম।'

মন্দিরা প্রফেসার বলল না, মাস্টারমশাই বলল না, শশাঙ্কবাবু বলল না। ইচ্ছা করেই আসামী শব্দটি ব্যবহার করল।

এ কাহিনী নিশ্চয়ই এতদিনে অনেকেই শুনেছে। তবু তার মুখ থেকে সব শুনবার জন্যে সারা কোর্ট উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে, অপলক হয়ে রয়েছে, মন্দিরা তা টের পেল। কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করল না। কোর্টে যেন মানুষ নেই,

পুরুষ নেই, মানুষের অতি বৃহৎ এক জড়পিণ্ড স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। লজ্জা করবার কোন হেতু নেই মন্দিরার। কাকে লজ্জা করবে। সারা কোর্ট জুড়ে এক বিরাট বিশাল পিণ্ড মানুষের মূর্তি ধরে পড়ে রয়েছে। তার অসংখ্য কান কিন্তু শুনতে পায় না, অসংখ্য চোখ কিছু দেখতে পায় না, ভিতরে বিরাট এক হৃদয় কিন্তু স্পন্দিত হয় না।

মন্দিরা সেই বিপুলাকার জড়পিণ্ডের পাহাড়ের কাছে নিজের মনের কথা বলতে লাগল।

'আমি তের-চোদ্দ বছর বয়েস থেকেই আসামীকে ভালোবাসতাম। তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের ঢের তফাত্ ছিল। কিন্তু তাঁর দিকে তাকিয়ে সেই বয়সের কথা আমার মনে হয়নি। তার আগে অমন সুন্দর পুরুষ আমি দেখিনি, আত্মীয়-স্বজন কোন পুরুষ মানুষই তার আগে আমি দেখিনি। ছোট হোক বড় হোক, কারো সঙ্গে মিশবার আমাদের হুকুম ছিল না! কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমি মিশেছিলাম। প্রথমে সবাই দেখত, আমি মিশতাম। আমি তাঁর কাছে পড়তাম। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ির কাউকে না দেখিয়ে মিশতাম। তাঁকে না দেখে আমি থাকতে পারতাম না। তাঁর কথা না শুনে আমি থাকতে পারতাম না। তাঁর মুখের কথা শোনার জন্যে আমি তাঁকে ফোন করতাম। তখন আমাদের বাড়িতে ফোন ছিল না। আমি পয়সা আঁচলে বেঁধে ফোন করতে যেতাম। দোকান থেকে হোক রেস্টুরেন্ট থেকে হোক, যেখানে ফোন আছে আমি সেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে চলে যেতাম। সেই হাটের মাঝে কোন গোপন কথা বলতে পারতাম না। কিন্তু কথা বলতে পারলেই আমার আনন্দ হতো, তাঁর গলা শুনতে পারলেই আমি হাতে স্বর্গ পেতাম।'

ঠিক এমনি আবেগভরা, অনুরাগভরা ভাষায় মন্দিরা তার সমস্ত কাহিনী বলে যেতে লাগল। তার বিবাহ-পূর্ব দিনগুলির অনুরাগ-মধুর স্মৃতি যেন শুধু অতীত স্মৃতি নয়, কোন এক অলৌকিক স্পর্শে তা যেন ফের বর্তমান হয়ে উঠেছে।

তারপর প্রিয়-মিলনে নানা বাধার কথা বলল মন্দিরা। বাবা-মা'র শাসন, কঠিন পাহারা। আর-একজনের কোমল মধুর প্রশ্রয়। সেই মাধুর্যের যেন শেষ নেই। সবাই যখন তাকে ছোট ভাবে, অবুঝ ভাবে, শুধু শাসন আর শাস্তির যোগ্য মনে করে, তখন একটি মাত্র রূপবান, গুণবান, বিদ্যাবান পুরুষ তাকে পূর্ণ নারীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে কৈশোর উত্তীর্ণ হতে না হতে যৌবন পার হয়ে এসেছে মন্দিরা। প্রণয়ীর সঙ্গে তার সমস্ত অসাম্য দূর হয়েছে। সে তার সিংহাসনের সমভাগিণী। রূপ গুণ বিদ্যা যশের সম অংশীদার। সে শুধু বয়সে ছোট, আর কোন কিছুতে ছোট নয়। সেই বয়সের বাধা যখন ঘুচল, মন্দিরা ভাবল, এবার আর বিয়েতে তাকে কেউ আটকাতে পারবে না, কিন্তু তখনো আটকানো হল। বাবা আটকালেন।

যিনি সামনে এসে দাঁড়াতে পারতেন, তিনি লুকিয়ে রইলেন। নিজের মতের বিরুদ্ধে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মন্দিরার বিয়ে হয়ে গেল।

উকিল জিজ্ঞাসা করলেন, 'তখন কেন আপনি জোর করলেন না? কেন আপনি মুখ বুজে সব মেনে নিলেন? বিয়ের পরে অমন অনেক সাহসিক কাণ্ডই তো আপনি করেছেন। তখন কেন সামান্য সাহসটুকু দেখাতে পারলেন না?'

মন্দিরা বলল, 'না, সে সাহস হয়নি। তাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। তারপর যা করতে গেছি, সবাই তাকে বলেছে দুঃসাহস। আমি তখন মরতে চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি। কী করে পারব? চারদিকে পাহারা। তারপর ভাবলাম, আমার পক্ষে বিয়েও যা মরণও তাই। সেখানে কোন পাহারা নেই আমি তিলে তিলে মরব।'

'আপনি আপনার স্বামীকে ভালোবাসেননি?'

'না।'

'আপনি কি জানেন না তাঁকে ভালোবাসা আপনার কর্তব্য? অগ্নিসাক্ষী করে, শালগ্রাম সাক্ষী করে বিয়ে যখন হয়ে গেছে, বিয়ের নিয়ম মেনে চলাই আপনার ধর্ম, আপনি কি জানতেন না?'

'জানতাম। কিন্তু জেনেও মানতে পারিনি। চেষ্টা করেছি, পারিনি। কী করব?'

'আপনার স্বামীর কাছ থেকে কি আপনি ভালোবাসা পাননি? আদর পাননি?'

'পেয়েছি। কিন্তু তাঁর সেই আদরই আমার কাছে সবচেয়ে অসহ্য লেগেছে। অত্যাচার বলে মনে হয়েছে।'

আদালতের কোন কোন কোণ থেকে ছি-ছি-ছি ছি-ছি-ছি শব্দ উঠল।

কে যেন বলল, 'এমন নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে জন্মেও দেখিনি।'

মন্দিরা অটল হয়ে রইল।

চতুর উকিল ধিক্কার দিলেন না। তিনি আস্তে আস্তে ফের মোলায়েম ভঙ্গিতে বললেন, 'স্বামীর আদর আপনার কাছে অত্যাচার বলে মনে হয়েছে তাই যাঁর আদরে আপনি তৃপ্তি পান, ফের তাঁর আদর খুঁজতে লাগলেন কেমন, না?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি চিঠিপত্র লিখে ফের তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর শশাঙ্কবাবু আপনার গোপন নিমন্ত্রণ পেয়ে মীরপুরে গেলেন সবাই মিলে আপনারা খাদে নামলেন। ওপরে আর পাঁচজনের চোখের সামনে আপনাদের মেলামেশার সুযোগ হল না, খাদের অন্ধকারে সেই সুযোগ

আপনারা করে নিলেন। কী করলেন তার আভাস আপনার ডায়েরিতে লেখা আছে।'

উকিল ডায়েরি দেখালেন মন্দিরাকে।

'এ লেখা নিশ্চয়ই আপনার?'

'আমার ছাড়া আর কার?'

'ডায়েরিতে যা আপনি লিখেছেন তা সত্যি?'

'সব সত্যি।'

'সবই কি লিখেছেন, না কিছু বাকি রেখেছেন?'

'যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু লিখিনি।'

'কী বাকি ছিল?'

'যেটুকু বাকি ছিল তা পরে হয়েছে।'

এই ব্যাপারই সবাই অনুমান করছে, শুনতে চাইছে। তবু মন্দিরা বুঝতে পারল, কোর্টসুদ্ধ সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেছে। অস্ফুট স্বরে ছি-ছি-ছি করবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত তাদের নেই। এই তো চেয়েছিল মন্দিরা, ঠিক এমনটিই চেয়েছিল। সবাই রুদ্ধ-বাক্ হয়ে থাকবে। আর, মন্দিরা যা খুশি তাই বলে যাবে। সত্য আর মিথ্যার মধ্যে কোন ভেদ রাখবে না। দিনকে রাত করবে, রাতকে দিন। সৌরজগতের সমস্ত নিয়ম-কানুন উলটে-পালটে দেবে। সূর্যকে কখনোই আর মুখ বাড়াতে দেবে না।

ফরিয়াদী পক্ষের উকিল খুশি হয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'আচ্ছা, আচ্ছা। খুব স্বাভাবিক। বাকিটুকু কোথায় হয়েছিল? কবে হয়েছিল? নিশ্চয়ই মীরপুর থেকে যেদিন পালিয়ে এলেন সেই রাত্রে?'

'হ্যাঁ।'

'আসামীর বসবার ঘরে—তাঁর লাইব্রেরী কাম স্টুডিওতে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি তাহলে ঐ রাত্রে ঐ ঘরের মধ্যেই আসামীর সঙ্গে খারাপ কাজ করেছেন!'

মন্দিরা সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল। উকিল পাশ থেকে জেরা করছিলেন। শেষ কথার জবাবে মন্দিরা ঘাড় ফিরিয়ে স্থির-দৃষ্টিতে তাঁর দিতে তাকাল। তারপর দীপ্ত দৃঢ় স্বরে বলল, 'না, আমি খারাপ কাজ করিনি। খারাপ কাজ করেছেন আমার বাবা আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে। খারাপ কাজ করেছেন আমার স্বামী জোর করে আমাকে আটকে রেখে; তাঁকে ভালোবাসি না জেনেও জোর করে আমার ওপর অত্যাচার চালিয়ে। সবাইর চেয়ে বেশি খারাপ করেছেন আপনাদের আসামী। বার বার ভীরু কাপুরুষের মত লুকোচুরি খেলে। আমি খারাপ কাজ করিনি। আমি শুধু আমার দেহ-মন যা চায়, তাই তাকে দিয়েছি; আমি যাকে ভালোবাসি,

আমি স্বেচ্ছায় সব তাকে ধরে দিয়েছি।'

যেন দূর স্বপ্নাচ্ছন্নতার ভিতর থেকে কথা বলতে লাগল মন্দিরা। যে অভ্রান্ত কল্পিত মিলনস্বর্গ সে বচনে বচনে গড়ে তুলেছে, এই মুহূর্তে সে যেন তারই অধিবাসিনী।

কিন্তু আসামী পক্ষের উকিল তাঁর বিরাট দৈত্যাকার চেহারা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। স্বর্গলোক থেকে নামিয়ে আনলেন মন্দিরাকে।

'আমি বলছি মিসেস মুখার্জী, আপনি মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছেন। আক্রোশ আর জ্বালা থেকে আপনি আসামীর ওপর শোধ নেওয়ার জন্যে এইসব কথা বলছেন। রামেশ্বর যা বলেছে তাই সত্যি। আপনি যা বলছেন তা বানানো।'

মন্দিরার জেদ বেড়ে গেল, 'আমি যা বলছি তা বর্ণে বর্ণে সত্যি।'

'এই মাত্র রামেশ্বর বলেছে—আপনাদের দরজা খোলা ছিল। সে বার বার সেই ঘরে ঢুকেছে। দরজা খোলা রেখে কী করে আপনাদের পক্ষে অমন কাজ করা সম্ভব হল?'

কিন্তু মন্দিরা মরীয়া। আজ সে নিজেকে সত্যবাদিনী বলে প্রমাণ করবেই। মিথ্যাই তার কাছে আজ সত্যের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। মন্দিরা অনর্গল বলে যেতে লাগল, 'দরজা ভেজানো ছিল। মোটা পর্দা টানানো ছিল। রামেশ্বরের সঙ্গে বোঝাপড়া ছিল। সে সদর বন্ধ করে দিয়ে ভিতরের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। অনেকক্ষণের মধ্যে আসেনি।'

আসামী পক্ষের উকিল বললেন, 'কিন্তু তা কি সম্ভব? আসামীর well-furnished বেড্রুম আছে। আপনিও দু চার মিনিটের জন্যে আসেননি। তাড়াহুড়ো কিছু নেই। তবু সে-সব ছেড়ে লাইব্রেরী ঘরে কেন তিনি—। আপনি অসম্ভব কথা বলছেন মিসেস মুখার্জী।'

মন্দিরা ফের জ্বলে উঠল, 'অসম্ভব? আসামী অসম্ভব অসম্ভব জায়গাই তো বেশি ভালোবাসেন আর অসম্ভব অসম্ভব সময়। চলন্ত গাড়ির মধ্যে, চলন্ত নৌকোয়, পর্দাঢাকা রেস্তরাঁর কোণে, কয়লাখনির অন্ধকারে তিনি আমাকে আদর করেছেন। অন্ধকার আমার ভালো লাগত, গোপনতা আমার ভালো লাগত, লুকোচুরি আমার ভালো লাগত। কিন্তু সারাজীবনটাই একটা লুকোচুরি হয়ে যাক, আমি তো তা চাইনি।'

মন্দিরার মুখ খুলে গেছে। আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত বেরিয়ে আসছে ভিতর থেকে।

আসামী পক্ষের উকিল কী যেন ভেবে আর এগোলেন না। হয়তো ভাবলেন, পরে জেরা করবেন। এখন বিপক্ষকে নিজেদের আত্মরক্ষার পথ দেখতে দিয়ে কাজ নেই।

মন্দিরা কাঠগড়া থেকে নেমে নিজের চেয়ারটিতে গিয়ে বসল। মনে হল, চারদিকে চাপা হাসি আর ছি-ছি-ছি-র শব্দ উঠছে। কাকা আর কাকার বন্ধু।

দুজনেই হতবাক্ হয়ে রয়েছেন। আসামী আর ফরিয়াদী দুজনেই বিমূঢ়। মন্দিরা এই চেয়েছিল। সে নিজে তো মরেইছে। কাউকে বাঁচতে দেবে না, কাউকে না।

ফরিয়াদী পক্ষের আর কোন সাক্ষী নেই জেনে ম্যাজিস্ট্রেট সেই দিনই চার্জ গঠন করলেন।

'আসামী, আপনি ১৬ই জুলাই রাত ন'টার সময় আপনার বেনেপুকুর রোডের বাড়িতে মিহির মুখার্জীর স্ত্রী মন্দিরা মুখার্জীর সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছেন। আপনি স্বীকার করছেন, না কি করছেন না? গিল্টি অর নট গিল্টি?'

শশাঙ্ক মন্দিরার দিকে একবার তাকাল। মন্দিরা চোখ ফিরিয়ে নিল। ওই ঘৃণা আর বিদ্বেষের ঘোলাটে দৃষ্টি দেখে তার কী হবে? ওই চোখে কত মধুর, কত সুন্দর দৃষ্টি সে দেখেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে শুভদৃষ্টি।

শশাঙ্ক উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

'I loved her. I adored her, I admit. But I am not guilty of that particular charge. I am not guilty.'

মন্দিরা ভেবেছিল, আরো কত কীই না যেন বলবে শশাঙ্ক। কিন্তু অত বড় বক্তা আর একটি কথাও বলতে পারল না। মন্দিরা তার সমস্ত বাক্য কেড়ে নিতে পেরেছে।

'আমি নির্দোষ।' শশাঙ্কের এ ঘোষণা আর পাঁচজনের হাসি টিটকিরিতে ডুবে গেছে। সে নিরপরাধ—একথা আর কে বিশ্বাস করবে এখন! অপরাধের কলঙ্ক ওর সমস্ত মুখে মেখে দিয়েছে মন্দিরা। অবশ্য নিজের মুখেও কালি মাখতে বাকি নেই। কোর্টসুদ্ধ লোক ছি-ছি করছে। তবু তারা মন্দিরাকেই বিশ্বাস করবে। শশাঙ্কের কোন কথা তারা কানে তুলবে না। বার বার হেরে যেতে যেতে এই একটি বার জয়ী হয়েছে মন্দিরা। একটি মিথ্যার অস্ত্রে সমস্ত সত্যকে ধূলিসাৎ করেছে।

কোর্টের ভিড় পাতলা হতে শুরু করেছে। নিরঞ্জনকাকা বললেন, 'আর বসে থেকে কী হবে। চলো, এবার ফেরা যাক।'

ফিরে যাবার মত কোন স্থান কি আর পৃথিবীতে আছে?

মন্দিরা তবু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'চলুন।'

॥ ২৮ ॥

গাড়িতে উঠে কাকা আর তাঁর উকিলবন্ধু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। মন্দিরা বুঝতে পারল, তার আচরণ এই দুই হিতৈষীর কাছেও অপ্রত্যাশিত এবং ধিক্কারযোগ্য হয়ে উঠেছে। তাতে যেন কিছু এসে যায় মন্দিরার! কে কি মনে করল না-করল, সে যেন এখন আর কিছু গ্রাহ্য করে!

কাকার বন্ধু বললেন, 'সাতদিন পরে হিয়ারিং-এর ডেট পড়েছে। এবার ওপক্ষ জেরা করবে। আমাদের এখন কাজ হবে সেই জেরার মুখে শক্ত হয়ে টিঁকে থাকা। যা বলেছে, কিছুতেই যেন তার নড়চড় না হয়। মন্দিরা তা পারবে। সান্যাল কেন, তার বাপেরও সাধ্য নেই ওকে কাৎ করতে পারে।'

নিরঞ্জন একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'ও সব থাক এখন। পরে শুনব। আচ্ছা ধরো, যদি কনভিকসন হয়—'

'অ্যাক্টে তো পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রভিসন আছে।'

কাকা আর কোন কথা বললেন না। তাঁর বন্ধু চড়কডাঙার মোড়ে নেমে গেলেন। বললেন, 'কাল আসব।' মন্দিরার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। যাও, এবার রেস্ট নাও গিয়ে। এ সব নিয়ে কিছু এখন আর ভাববার দরকার নেই।'

ভাবতে বয়ে গেছে মন্দিরার। যারা ভালোমন্দ ভাববার জন্যে সংসারে এসেছে, তারা ভেবে মরুক। মন্দিরা নির্ভাবনায় বেঁচে থাকবে। যা খুশি তাই করবে। যা খুশি তাই বলবে। শুধু নিজের ইচ্ছা আর খুশি ছাড়া সে আর কিছুকে আমল দেবে না। এখন থেকে তাকে কেউ আর কোন বাঁধনে বাঁধতে পারবে না। শাসন-তিরস্কার স্নেহ-মায়া ভালোবাসা কোন কিছুর দাবি নিয়েই কেউ আর আসবে না তার কাছে।

ঘরে এসে সাজসজ্জা ছেড়ে ফেলল মন্দিরা। কাকিমাকে তাঁর শাড়ি-গয়না ফিরিয়ে দিল।

কাকিমা বললেন, 'সব খুলে ফেলছ কেন?'

মন্দিরা বলল, 'আর দরকার নেই।'

শুধু খুলে ফেলা নয়, মন্দিরা সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে। একটি সুতীক্ষ্ম মিথ্যার অস্ত্রে সংসারের সমস্ত সত্যবন্ধন টুকরো টুকরো করে পথের ধুলোয় ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে মন্দিরা। এবার নিজেকেও পথে দাঁড়াতে হবে। না, মন্দিরা দাঁড়িয়ে থাকবে না। শুধু চলবে। যেদিকে চোখ যায়, চলতে থাকবে। সেই পথে তার আর কেউ সঙ্গী থাকবে না। এখন থেকে পথই তার সঙ্গী। পথই তার প্রণয়ী। এখন থেকে কারো জন্যে পথের মোড়ে, পার্কের কোণে অপেক্ষা করার দিন শেষ হল। কোথাও আর কারো জন্যে তাকে প্রতীক্ষা করতে হবে না।

ঘরে একটু চুপ করে বসে থাকবার জো নেই। কাকিমা তাগিদের ওপর তাগিদ দিচ্ছেন, 'যাও, হাতমুখ ধুয়ে এসো।'

ঢুকতে হল বাথরুমে। বেরোতেও হল তাঁর তাগিদে। নইলে সারারাত সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারত মন্দিরা।

খাওয়া নিয়ে আজও পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন কাকিমা। অসহ্য। যেন আজকের দিন বছরের অন্য দিনগুলির সমান! এই ধুলোয় ধোঁয়ায় মেঘে আচ্ছন্ন দিনটির সঙ্গে যেন পৃথিবীর অন্য কোন দিনের মিল আছে!

'বড্ড মাথা ধরেছে কাকিমা। কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'খাও, তাহলেই মাথা-ধরা ছাড়বে।'

'কাকা কোথায়?'

কাকিমা গম্ভীর মুখে বললেন, 'তিনি ফ্যাক্টরীতে চলে গেছেন। আজকাল তো নাইট সিফটেও কাজ হচ্ছে।'

কিছু খেয়ে গেছেন কি না, সে কথা আর মন্দিরা সাহস করে জিজ্ঞাসা করল না।

চা আর খাবার রেখে কাকিমা সামনে থেকে সরে গেলেন। মন্দিরা হাসল। কারোরই আর তার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার সাধ্য নেই। সর্বাঙ্গে কাঁটার বর্ম পরে মন্দিরা আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে পেয়েছে। কেউ আর তাকে বিরক্ত করতে সাহস পাবে না।

কোর্ট থেকে মন্দিরা ফিরে আসবার পর সেখানে কি হল না হল, কাকিমা তাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেননি। কিন্তু তার মুখের ভাব দেখে মন্দিরার বুঝতে বাকি রইল না, তিনি সব শুনেছেন। কাকা তাঁকে কিছুই বলতে বাকি রাখেননি।

চা ছাড়া কিছুই খেল না মন্দিরা। ঝিকে ডেকে সব নিয়ে যেতে বলল। তারপর জানলার ধারে চুপ করে বসে রইল।

জেলে কি জানলা থাকে? এত বড় জানলা? না, কোনরকম জানলা-দরজা যেন না থাকে সেই বিশেষ জেলটিতে। অন্ধকার—ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে আসামীর চির-নির্বাসনদণ্ড চায় মন্দিরা। যেমন অন্ধকারকে ভালোবাসে শশাঙ্ক, আঁধারে আঁধারে ভালোবাসতে ভালোবাসত, তেমনি চির-অন্ধকারে সে বসবাস করুক।

জেল খাটতে তো তার ভয় পাওয়া উচিত নয়। জেল তো মন্দিরাও খেটেছে। বাপের বাড়িতে, স্বামীর বাড়িতে, পালিয়ে এসে এই কাকার বাড়িতে, সব আগারই তো মন্দিরার পক্ষে কারাগার হয়ে উঠেছে। মুক্তি ছিল শুধু এক-জনের বাহুবন্ধনে। সেই মুক্তি যখন সে কিছুতেই দিল না, তখন সে জেল খেটে মরুক। একজন ভিতরে খাটবে, আর-একজন বাইরে। এই অপরাধে পাঁচ বছর পর্যন্ত শাস্তির নাকি ব্যবস্থা আছে। হ্যাঁ, পাঁচ বছরই ভালো। তার

একটি দিনও যেন কম না হয়। পাঁচ সংখ্যা শশাঙ্কের খুব প্রিয় সংখ্যা। পঞ্চ পুষ্প, পঞ্চ পল্লব, পঞ্চ মধু, পঞ্চ শর, পঞ্চ ইন্দ্রিয়। শশাঙ্ক বলত আর হাসত শব্দগুলি যেন চেখে চেখে উচ্চারণ করত শশাঙ্ক। যেন সব রস ওই শব্দের মধ্যে। বর্ণ, গন্ধ, রূপ, রস, সর্বসম্ভোগ সুখ যেন ওই ধ্বনির মধ্যে—'আমি শরশয্যায় শুয়ে মরতে চাই। পঞ্চ শরের শয্যায়।'

শশাঙ্ক মন্দিরার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলত। সেই মৃত্যুর ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছে মন্দিরা। মেয়াদ যেন পাঁচ বছরের একটু কম না হয়।

মন্দিরা চুপ করে জানলার ধারে বসে বসে অন্ধকার দেখতে লাগল।

রাত ন'টার আগেই নিরঞ্জন ফিরে এলেন। তাঁর মুখ এত ভার কেন! কারখানায় কি নতুন অশান্তি দেখা দিয়েছে? সেদিন বলছিলেন তিনি, বরং কারখানার তালা বন্ধ করে দেবেন, তবু মজুরদের অন্যায় আবদার মানবেন না। হোক বন্ধ। চার দিক থেকে সব বন্ধ হবার তোড়জোড় চলেছে।

মুখ-হাত ধুয়ে এসে কাকা বললেন, 'চল, খেয়ে নিবি।'

মন্দিরা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার গাড়িটা আমাকে একটু দেবেন কাকা? আর ড্রাইভারকে একটু বলে দেবেন, আমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবে?'

নিরঞ্জন অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী, এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছিস?'

মন্দিরা বলল, 'ফিরে এসে বলব।'

নিরঞ্জন কঠিন সুরে বললেন, 'না। আগে বলো, কোথায় যাবে।'

না বললে কাকা কিছুতে ছাড়বেন না, হয়তো গাড়িও দেবেন না। তাই পরম অনিচ্ছায় মন্দিরা তার গন্তব্যস্থানের নাম করল, 'আনোয়ার শা রোড।'

কাকা আর কাকিমা দুজনেই একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর তাঁরা প্রায় সমস্বরে বলে উঠলেন, 'সেখানে আবার কেন? সেখানে কি আর মুখ দেখাবার আমাদের জো আছে?'

মন্দিরা বলল, 'আমি তো আপনাদের কাউকে যেতে বলছিনে, আমি একাই যাব। একটি কথা শুধু বলতে যাব। যাব আর চলে আসব।'

'কী এমন জরুরী কথা? সে কথা কি আর-একদিন বলা যায় না? কাল সকালে বলা যায় না?'

কাকা আর কাকিমা কখনো ধমকাতে লাগলেন, কখনো শান্তভাবে বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু মন্দিরা যেন বোঝাবুঝির ওপারে চলে গেছে। তার শাস্তির ভয় নেই, শান্তিরও স্পৃহা নেই। কাকা যদি গাড়ি না দেন, মন্দিরা নিজেই ট্যাক্সি করে চলে যাবে।

শেষ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী পাশের ঘরে গিয়ে কী যেন একটু পরামর্শ করলেন। তারপর কাকা ফিরে এসে বললেন, 'আচ্ছা, চল। একা যাওয়ার দরকার নেই। আমি যাচ্ছি তোর সঙ্গে।'

ড্রাইভার নিলেন না। নিরঞ্জন নিজেই গিয়ে বসলেন তাঁর আসনে। তিনিও যেন মন্দিরার মতই মরীয়া হয়ে উঠেছেন।

ভাড়াটে ট্যাক্সিতে স্বামীর পাশে বসে প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাত্রার কথা মনে পড়ল মন্দিরার।

সেদিনের মত আজও কোন্ পথ দিয়ে যাচ্ছে, কিছু ঠিক করতে পারল না। কেন যাচ্ছে, সে উদ্দেশ্যও যেন বার বার অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। এত আলো শহরে। কোন আলোরই যেন দীপ্তি নেই। বিশ্বসংসারব্যাপী অন্ধকারের পটভূমিতে মন্দিরার পথের আলোগুলি যেন জোনাকির আলোর মতই নিষ্প্রভ। ক্ষণে ক্ষণে জ্বলছে আর নিভছে।

মন্দিরা একসময় বলল, 'কাকা, গাড়িটা একেবারে বাড়ির সামনে নিয়ে যাবেন না। খানিকটা দূরে রাখবেন।'

'দূরে রাখব?'

'হ্যাঁ।'

'তুই বাড়ির ভিতরে যেতে চাসনে?'

'না। ভিতরে হয়তো ওঁরা আর আমাকে যেতে দেবেন না।'

'তা হলে কী করে দেখা হবে?'

'আপনি তাঁকে ডেকে আনবেন।'

নিরঞ্জন বললেন, 'আমার ডাকে সে আসবে কেন? যদি না আসে?'

'তখন যা হয় করা যাবে। তখন ফিরে যাব।'

নিরঞ্জন আরো খানিকদূর এসে গাড়ি থামালেন। পাড়া এরই মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। সামনে একটু ফাঁকা মাঠের মত। দিনের আকাশে সূর্য ছিল না। রাতের আকাশেও চাঁদ নেই, তারা নেই। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ সব ঢেকে দিয়েছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝে মাঝে।

কাকা বললেন, 'তুই আয় আমার সঙ্গে। অন্ধকারে একা-একা থাকতে পারবি কেন?'

মন্দিরা বলল, 'পারব কাকা।'

মনে মনে ভাবল, 'আমি না পারি কী।'

নিরঞ্জন বললেন, 'ফিরে আসতে আমার অবশ্য মিনিট পাঁচেকের বেশি লাগবে না। সামনেই বাড়ি।'

মন্দিরা বলল, 'হ্যাঁ। বেশি দেরি করবেন না কাকা।'

নিরঞ্জন দ্রুত পায়ে চলে গেলেন।

মন্দিরা প্রতীক্ষা করতে লাগল। বৃষ্টিবাদলের দুর্যোগে অভিসার-যাত্রা তার এই প্রথম নয়। পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষাও সে এর আগে অনেকবারই করেছে। কিন্তু সে অন্য মন নিয়ে অন্য পুরুষের জন্য।

পাঁচ মিনিট যেন যুগ-যুগান্তরের দৈর্ঘ্য নিয়ে এসেছে। মন্দিরার মনের

মধ্যে আশার আলো জ্বলতে লাগল, নিবতে লাগল।

তারপরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কাকা একা আসেননি। আরো একজন এসেছে।

সে এসে গাড়ির সামনে দাঁড়াল। মন্দিরা লক্ষ্য করল, কাকা তাদের দাম্পত্য আলাপের সুযোগ দিয়ে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন।

মিহিরই প্রথম কথা বলল, 'কেন ডেকেছ। কী বলবে বলো।'

মানুষ তো নয়, মানুষের ছায়া। তা-ও অন্ধকারে মিশে আছে। একটি মানুষ এখন একটি কণ্ঠস্বর মাত্র। সেই সুরে কোন মায়া-মমতা নেই, কোন কৌতূহল, ঔৎসুক্য নেই। সে স্বর শুষ্ক, কঠিন, নিতান্তই একছিটে সাধারণ সৌজন্য।

মন্দিরা গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'ভিতরে এসো।'

মিহির পরম ঘৃণায় দু-পা পিছিয়ে গেল। গলার স্বরেও তাঁর সেই ঘৃণা ফুটে উঠল।

'না, ভিতরে যাবার দরকার নেই। যা বলবার ওখান থেকেই বলো।'

মন্দিরা তখন গাড়ি থেকে নেমে এল। স্বামীর সামনে এসে দাঁড়াল।

কালো রঙের শাড়ি পরা মন্দিরাও এখন প্রায় আঁধারের সঙ্গে মিশে আছে। সে-ও এখন আর পুরো একটি মানবী নয়, তার ছায়ামূর্তি।

মন্দিরা বলল, 'আমি তোমাকে একটি কথা বলতে এসেছি।'

'বলো।'

মন্দিরা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি কোর্টে মিথ্যে কথা বলেছি।'

'শুধু কি কোর্টে?'

'না, শুধু কোর্টে নয়। আরো নানা জায়গায়, নানা সময়, জীবনভোর আমি মিথ্যে কথা বলেছি।'

'এখনো যে বলছ না, তার প্রমাণ? এখনই যে তুমি সত্যি কথা বলছ, তা কে বিশ্বাস করবে?'

'তুমি।'

মিহির হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না। এমন সরাসরি জবাব, এমন তর্জনীর অগ্রভাগে সনাক্তকরণ, সে-ও বোধ হয় প্রত্যাশা করেনি।

একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি কি আমাকে অতই বোকা ভেবেছ মন্দিরা!'

'না, বোকা ভাবিনি। তোমাকে আমি কখনো বোকা ভাবিনি।'

মন্দিরার দু-চোখ জলে ভরে উঠল। মিহির হয়তো তা দেখতে পেল না। পেলেও কি গ্রাহ্য করত? শুধু চোখেই তো নয়, মন্দিরার গলাও তো আর্দ্র হয়ে উঠেছিল।

মিহির বলল, 'এতে অবশ্য আমার উকিলের সুবিধে হয়েছে। তিনি এই

তো এস্টাবলিস করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন তুমি পিছিয়ে যাচ্ছ কেন? দিনের বেলায় সবাইর সামনে যা তুমি সত্যি বলে ঘোষণা করে বলে এসেছ, আজ এই রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি এসে বলছ, তা মিথ্যে। তোমার কোন্ কথাটা সত্যি মন্দিরা?'

'তোমার কাছে যা বলছি, তাই সত্যি।'

'তোমার এ কথা আমি বিশ্বাস করব, এমন ধারণা কী করে তোমার হল?'

'তুমি আমাকে ভালোবেসেছ বলে।'

মিহির আর-একবার স্তব্ধ হয়ে গেল। এই সহজ সত্যি কথাটা এই মুহূর্তে ওই মুখ থেকে সে যেন একেবারেই প্রত্যাশা করেনি।

মন্দিরা বলল, 'আমি ভালোবাসিনি। তুমি একা একাই ভালোবেসেছ। দুঃখ পেয়েছ, যন্ত্রণা পেয়েছ, তবু ভালোবেসেছ। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে আসিনি। আমি যে অন্যায় করেছি, তার ক্ষমা নেই। শুধু এই আশা নিয়ে এসেছি, তুমি আমাকে একটিবার বিশ্বাস করবে। তুমি আমাকে ভালো-বেসেছিলে। আমার কাছ থেকে কিছু না পেয়েও ভালোবেসেছিলে। সেই ভালোবাসার জোরে তুমি বুঝতে পারবে, আমার কোন্ কথাটা সত্যি, কোন্ কথাটা মিথ্যে।'

মিহির ফের একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'বুঝতে পারা কঠিন মন্দিরা। আমার সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি, আমার অস্থির বিশ্বাসের কতটুকুই বা শক্তি। সেখানে কতটুকুই বা আলো। হিংসায় দ্বেষে সন্দেহে সংশয়ে সেখানেও তো আঁধারের রাজত্ব। তুমি সত্যি বলছ কি মিথ্যে বলছ, তথ্যের দিক থেকে আমার কাছে এখন তা সমান অর্থহীন। তবে যে-জন্যে তুমি এসেছ, অথচ লজ্জায় ভয়ে যে-কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারছ না, তা আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি মামলা তুলে নেওয়ার অনুরোধ নিয়ে এসেছ।'

মন্দিরা চুপ করে রইল।

মিহির বলল, 'সকালে আর-একজন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। তিনি সব ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে ওই একই অনুরোধ রেখে গেছেন।'

সেই মহিলা যে কে, মন্দিরার তা বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু এই মুহূর্তে সেজন্যে তার চিত্ত ঈর্ষায় বিদীর্ণ হল না। তাঁর আর মন্দিরার হৃদয় অভিন্ন নয়, কিন্তু উদ্দেশ্য এখন অভিন্ন।

মিহির বলল, 'তোমাদের অনুরোধের কথা আমি ভেবে দেখব মন্দিরা। তোমরা না এলেও ভাবতাম। শেষ পর্যন্ত মনের জোর হয়তো রাখতে পারতাম না। এর সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ আসত। অনেক গালমন্দের পর বাবা আমার সাহায্যে নেমেছিলেন। কিছু টাকা-পয়সাও তাঁর খরচ হয়েছে। তাঁর কাছে আর-একদফা গালাগাল আছে আমার কপালে।'

মিহির একটু হাসল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে গ্রাম্য লোকের মত উঁচু গলায়

ডেকে উঠল, 'নিরঞ্জনবাবু, চলে আসুন। এর পর জোর বৃষ্টি আসবে, চলে আসুন।'

বৃষ্টি আসবার আগেই নিরঞ্জন গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। খানিকদূর এগিয়ে বললেন, 'মিহিরের কাছ থেকে কথা পেয়েছিস? তুলে নেবে কেস?'

মন্দিরা বলল, 'হুঁ।'

নিরঞ্জন বললেন, 'আশা তো করা যায়, আস্তে আস্তে সবই আবার— ছেলেটি সত্যিই ভালো।'

মন্দিরা এ-কথার কোন জবাব দিল না। তেমন কোন আশ্বাস তো সে পায়নি। পাওয়ার প্রয়োজনবোধও যেন লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু যা পেয়েছে, তা কম নয়।

মন্দিরা মনে মনে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করল, 'তা কম নয়।'

বৃষ্টি-বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিরঞ্জন গাড়ি চালাতে লাগলেন। এক সময় বললেন, 'অসময়ে এ কি কাণ্ড। ওয়েদার ফোরকাস্টে সাইক্লোনের কথা অবশ্য ছিল। ওদের ভবিষ্যদ্বাণী তো সাধারণত ফলে না। আজ ফলে গেল। বে অব বেঙ্গলে কোথায় নাকি প্রলয়কাণ্ড হচ্ছে, তারই দু-একটা ঝাপটা—'

বড় রকমের ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পড়বার আগেই নিরঞ্জন তাকে নিয়ে বাড়িতে এসে পৌঁছলেন।

খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না মন্দিরার। কিন্তু পাছে এই নিয়ে আরো বেশি কথা হয়, অনুরোধ-উপরোধের মাত্রা আরো বাড়ে, তাই কাকা-কাকিমার সঙ্গে টেবিলে গিয়ে বসল। খেতে খেতে আজ আর কোন গল্প হল না। আজ আর কারোরই কথা বলবার মুড নেই।

খানিক বাদে কাকিমা এলেন মন্দিরার ঘরে। তার খাটের ধারে বসে বললেন, 'আজ আমি তোমার কাছে থাকি মন্দিরা। তোমার কাকা তাই বলে দিলেন।'

মন্দিরা বলল, 'কেন?'

'তোমার হয়তো ভয় করবে।'

মন্দিরা বুঝতে পারল, ভয় কাদের। একটু হেসে বলল, 'আমার জন্যে আর ভাববেন না কাকিমা। আপনি শুতে যান।'

কাকিমা বললেন, 'কাল তোমার বাবাও তোমাকে নিতে আসবেন।'

মন্দিরা বলল, 'আমি গেলে তো। আমি কোথাও যাব না।'

কাকিমা বললেন, 'তিনি তোমার সব খোঁজখবরই রাখেন। খরচপত্রও দিতে চেয়েছিলেন। তোমার কাকা নেননি। সব দিয়েও যদি শান্তি পাওয়া যেত!'

কাকিমাকে প্রায় জোর করেই মন্দিরা তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দিল।

আজ সে কারো সঙ্গ চায় না। একা থাকতে চায়। একা-একা ভাবতে চায়। যদিও ভেবে কোন লাভ নেই। কিন্তু মানুষ কি শুধু লাভ-লোকসানের জন্যেই

ভাবে? লাভ-লোকসানের কথাই ভাবে? তার ভাবনার মধ্যে সব সময় কি অর্থ থাকে? সঙ্গতি সামঞ্জস্য থাকে?

মন্দিরা নিজের চিন্তা, কর্ম ও চরিত্রের অসঙ্গতির কথা ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু চেষ্টা করলেই কি ঘুম আসে! মাঝে মাঝে বৃষ্টির শব্দে কান পাতল। বৃষ্টির ধ্বনির মধ্যে ঘুমপাড়ানি সুর আছে। কতদিন এই সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে মন্দিরা। কিন্তু আজ আর ঘুম নেই। এই মুহূর্তে আর কিছুই কামনা নেই মন্দিরার। শুধু একফোঁটা ঘুম আর একছিটে বিশ্বাস। স্নেহ নয়, প্রীতি নয়, ভালোবাসা নয়, শুধু একফোঁটা বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস কেউ আর তাকে করবে না। মিহির কেস তুলে নেবে। কিন্তু মন্দিরাকে বিশ্বাস না করেই নেবে। শশাঙ্ক বেঁচে যাবে। কিন্তু এই নিষ্কৃতিকে দৈবের আশীর্বাদ বলে মনে করবে। ভাবতে পারবে না, মন্দিরা যেমন তাকে ডুবাতে চেয়েছিল, তেমনি তার রক্ষার জন্যে চেষ্টাও করেছিল। শুনলেও বিশ্বাস করবে না।

ওদের দুজনকেই মুক্তি দিয়ে নিজের জন্যে ঘৃণা, বিদ্রূপ, সংশয়, অবিশ্বাসের চির কারাবাস মন্দিরা বেছে নিয়েছে।

এপাশ ওপাশ করতে করতে অস্বস্তিতে ছটফট করতে করতে এক সময় একটু ঘুমের মত এল মন্দিরার।

হঠাৎ টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দে তার বহু আরাধনার ঘুমটুকু ভেঙে গেল। চমকে উঠল মন্দিরা। এত রাত্রে কে তাকে ফোনে ডাকছে? কে? মন্দিরা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে কাকিমাকে ডাকাডাকি করে জাগাল। 'একটা ফোন এসেছিল কাকিমা?'

কাকিমা অবাক হয়ে বললেন, 'কোথায় ফোন? ফোন এলে আমরা শুনতে পেতাম না? তুমি স্বপ্ন দেখেছ। যাও, ঘুমোও গিয়ে।'

ফের এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল মন্দিরা। ফোনটাকে স্বপ্নের ফোন বলে মন মানতে চাইল না। কিন্তু সত্যিই কি সে ফোন করেছিল? ফোন করে কী কথা বলতে চেয়েছিল? কোন ধিক্কার কোন অভিশাপ দিতে চেয়েছিল মন্দিরাকে? মন্দিরাও যেমন! সে কি আর কোনদিন মন্দিরাকে ফোন করবে? কোনদিন তার সঙ্গে কথা বলবে? কোন দিন না। কোন দিন না। একটি মিথ্যা কথায় মন্দিরা সব শেষ করে দিয়ে এসেছে। মন্দিরা স্মৃতিরেখা ধরে ফের পিছু ফিরে হাঁটতে শুরু করল। অফুরন্ত সুখে আর সোহাগে ভরে ওঠা পথ। কিন্তু সে পথে এখন কাঁটা। আর কে যেন তাকে বর্শার ফলায় বিঁধে নিয়ে এসে বর্তমান মুহূর্তটির ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। আড়াল থেকে নির্মম সুরে বলে, 'সব শেষ, সব শেষ।'

সেই আলোর মালায় ফুলের মালায় সাজানো স্মৃতিপথে মন্দিরা দু'পা করে এগোয়, আর কে যেন তাকে জোর করে মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে

আঙুল বাড়িয়ে দেয়। সেখানে সব অন্ধকার, সব অন্ধকার।

সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মন্দিরার হঠাৎ মনে হল—আচ্ছা, মিহি যদি তার কথা না রাখে। নিশ্চিত স্পষ্ট কথা তো দেয়নি। মন্দিরা কারে বিশ্বাস রাখেনি। সে কোন সাহসে আর-একজনের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবে? যদি সে এর পরেও কেস চালিয়ে যায় আর শশাঙ্ক যদি হেরে যায় নিচু উঁচু সব আদালতেই যদি হেরে যায়, তাহলে? সেই পরিণামের কথা ভাব যায় না। মন্দিরা সভয়ে চোখ বুজল। কিন্তু চোখ বুজেও কি নিস্তার আছে? সেখানে অন্ধকার আরো গাঢ়। যন্ত্রণা আরো দুঃসহ আর নিশ্বাসরোধী। সেই অতলান্ত গহ্বর থেকে বেরোবার কোন পথ নেই। পথের কোন নিশানা মাত্র নেই

মন্দিরা ঘুমোবার চেষ্টা করল। একবার এদিকে ফিরল, আর একবার ওদিকে ফিরল। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। এপাশে অস্বস্তি, ও-পাশেও স্বস্তি নেই। দু-চোখ পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই জ্বালা কি শুধু চোখে? মন্দিরার মনে হল, কতকাল ধরে যেন সে ঘুমোয় না। আরো কত রাত যে ঘুমোবে না তার ঠিক নেই। তার মনে হতে লাগল, এই নিঃসঙ্গ বিনিদ্র যন্ত্রণাদগ্ধ এক-একটি মুহূর্ত যেন এক একটি যুগ। একটি রাত যেন অনন্ত রাত্রির সীমাহীন অন্ধকার নিয়ে এসেছে।

মন্দিরা বিছানা থেকে নেমে পুব দিকের জানলায় এসে দাঁড়াল। সে আর কিছু চায় না। শুধু ভোর হওয়া দেখতে চায়।

আস্তে আস্তে অন্ধকার পাতলা হয়ে এল। উষার অস্ফুট আলো দেখা দিয়েছে। সেই ক্ষীণ আলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মন্দিরা কিসের একটি ইশারা দেখতে পেল। আশ্চর্য, এতক্ষণ তো কথাটা তার মনে হয়নি। স্বামী.. কাছে যেমন সব স্বীকার করে এসেছে মন্দিরা, তেমনি কোর্টে দাঁড়িয়েও তো সে স্বীকার করতে পারে। বলতে পারে, 'আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম।' আবার উপহাস বিদ্রূপ অবিশ্বাসের ঝড় বইবে। দু-পক্ষের উকিল দু-দিক থেকে তাকে জেরা শুরু করবেন। কোন আড়াল আবডাল কিছু রাখবেন না। কিন্তু মন্দিরা ম্যাজিস্ট্রেটের মুখের দিকে তাকিয়ে নির্ভয়ে বলবে, 'আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম। আমি শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম, এখন আমি শাস্তি পেতে চাই। কারো কোন দোষ নেই। সব দোষ আমার। সব দণ্ড আমাকে দিন। যত কঠিন দণ্ডই হোক, আমি মাথা পেতে নেব।'

ম্যাজিস্ট্রেট কি তার কথা বিশ্বাস করবেন না? নিশ্চয়ই করবেন। যদি বলবার মত করে বলতে পারে মন্দিরা, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন। মন্দিরার মিথ্যা কথাটা বিশ্বাস করেছিলেন, আর সত্যি কথাটা বিশ্বাস করবেন না? নিশ্চয়ই করবেন।

নিজের সংকল্প আর শক্তির কথা ভেবে মন্দিরার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটল।